পূজাবার্ষিকী ১৩৮৪
আনন্দমেলা
এক গাড়ি আনন্দ
আনন্দমেলা এক্সপ্রেস
পূজা স্পেশাল

হরিতা ওষধিমা ওষধিঃ সোমঃ সাদন্যঃ বিদুথ্য সতেয়ঃ।
হিরণ্যগর্ভা এচ্ছিবাপ্সু শোণিতঃ ইচ্ছন্তি
গাবাশঃ সার্মিধানে অগ্নৌ ॥

VOGUE

Approximate nutritional composition of Ground Turmeric (Haldi) per teaspoon.

Wt/tsp	1·9 gms
Water	110 mg
Fat	169 mg
Protein	163 mg
Ash	129 mg
Calcium	3 8 mg
Niacin	91 mcg
Iron	902 mcg
Sodium	0.19 mg

Present in Trace Amounts:

Riboflavin	3·61 mcg
Potassium	47·5 mg
Phosphorous	4.94 mg
Food Energy	7 Cal
Fibre Carbohydrate	131 mg
Carbohydrate	1328 mg
Ascorbic acid	946 mcg
Thiamine	1·71*mcg
Vit 'A'	3 Int'l Units

Analyses Performed by Research 900 Laboratories, St Louis, U.S.A.

অর্থাৎ হে হরিদ্রে !
তোমার বর্ণ সূর্য্যের একটি উজ্জ্বল কিরণের মত, তাই হরিৎ। তুমি দেবতাদের দেহ উজ্জ্বল স্বর্ণ বর্ণ করে দাও ! শোনিত মন্থন করে তাকে স্বর্ণ বর্ণ করে দাও ॥

ঋক বেদের ঋষি হইতে আয়ুর্বেদাচার্য বাণভট্ট, চরক সুশ্রুত, চক্রদত্ত সকলেই হরিদ্রার গুণে পঞ্চমুখ। প্রাগবৈদিক যুগ হইতে হরিদ্রা রন্ধনে ব্যবহৃত।

আয়ুর্বেদ মতে হলুদের গুণ :
কটু-তিক্ত-রস, কফ ও পিত্তনাশক বর্ণকর, ত্বকদোষ মেহ-রক্ত শোথ-পাণ্ডু-ব্রণ নিবারক। কুষ্ঠ ও বিষদোষ নাশক ॥

- চন্দন বাটার মত মিহি।
- স্বাদ-গন্ধ-বর্ণ একটি নির্দ্দিষ্ট মানে রাখার জন্য Compounded ও Blended করা।
- Oleoresin বের করা হয়নি, এমন ভালজাতের হলুদই গুড়ো করা যাতে Vitamin অক্ষুন্ন থাকে।
- ইনকা হলুদের দাম একটু বেশি, কিন্তু রান্নাতে ঢের কম লাগে তাই মূল্যায়নে দাম অনেক কম।

খুচরা মূল্য (স্থানীয় কর আলাদা)
৫০ গ্রাম প্যাক···১.০০
১০০ ,, ,, ১.৮৫

গুড়ো হলুদ জলে কাদার মত গুলে ১০ মিনিট রেখে, তবে রান্নাতে ব্যবহার করবেন-তাতে হলুদের গুণ গুলি প্রকাশিত হয়।

প্রডাকটস

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - রতীশ সরকার ও রাজর্ষি সরকার

স্ক্যান করেছেন - মাধব রায়

এডিট করেছেন - অপ্টিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা
স্ক্যান করতে চান কিংবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান
তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com
optifmcybertron@gmail.com

আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৩৮৪

বিশেষ রচনা

উপন্যাস

ছবিতে কাহিনী

বড় গল্প

জঙ্গলের গল্প

ভ্রমণ-কাহিনী

গল্প

দাম : বারো টাকা

ছড়া

আবৃত্তির আসর

পরীক্ষার্থীদের জন্য

খেলাধুলো

রচনা-বিচিত্রা

ব্যঙ্গচিত্র

প্রচ্ছদ ঃ অলোক ধর
অঙ্গবিন্যাস ঃ আনন্দবাজার ডিজাইনার্স

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডএর পক্ষে বাদপাদিত্য রায় কর্তৃক
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে
প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮
সি. আই. টি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

কিছু রঙরূপ এমনও আছে সময় হার মানে যার কাছে!

সাজের সময় মজা কর
Kwality
আইসক্রীম
KW/G/72
মজা আর প্রোটীন কোয়ালিটি আইসক্রীম

রাত যখন বারোটা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অ—আ—ই—ঈ—উ—ঊ—ঋ—ঌ—এ—ঐ—ও—ঔ—
কেও কেটা নয় মোরা কেউ।
শিখাধারী গালভারি ঠিকাদারি
মাসির বাড়ি করি কেউ কেউ।
কেউ বই পালকী, কেউ বই নালকি
তালপাত্তি সেফাইশাল্পি কেউ কেউ।

রাত যখন বারোটা, জল হাওয়ার ঝাপোটা
জাগি মোরা ঝামপোটা মাকোটা
পালকি ওঠাতে মাসির কোঠাতে নাই যখন কেউ
মেনি বেড়ালটা কাঁদে মেউ মেউ
জেগে নেই কেউ।

খাঁচার ময়না কথা কয় না
দাঁড়ে আত্মারাম ভয়ে কপচায় না
ঘুমে বক্‌বকায় আড়ে আবডালে বকম পায়রা
আরে রাতকানা কাকটা ডানা দেয় ঝাপটা
মাসির দাঁতভাঙা কুত্তো কটা
কোঠার দোরে কোটাল হেঁকে বলে
কেও ! কেটা ! কে রে এউ ! কেওউ।

(শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীঅনাথ দাশের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

ছবি বিমল দাশ

রবীন্দ্রনাথের

এক কবিতা, দুই রূপ

স্বপ্ন

ইঁটের টোপর মাথায় পরা সহর কলিকাতা
অটল হয়ে বসে আছে ইঁটের আসন পাতা।

ফাল্গুনে বয় বসন্ত বায় না দেয় তারে নাড়া—
বৈশাখেতে ঝড়ের দিনে ভিৎ রহে তার খাড়া।
শীতের হাওয়ায় থামগুলোতে একটু না দেয় কাঁপন
শীত বসন্তে সমানভাবে করে ঋতু যাপন।
অনেক দিনের কথা হোলো, স্বপ্নে দেখেছিনু,
হঠাৎ যেন চেঁচিয়ে উঠে বললে আমায় বিনু,
"চেয়ে দেখো,"—ছুটে দেখি চৌকিখানা ছেড়ে
কলকাতাটা চলে বেড়ায় ইঁটের শরীর নেড়ে।

উঁচু ছাদে নীচু ছাদে পাঁচিল-দেওয়া ছাদে
আকাশ যেন সওয়ার হয়ে চড়েছে তার কাঁধে।
রাস্তাগুলি যাচ্ছে চলি অজগরের দল,
ট্র্যাম গাড়ি তার পিঠে চেপে করচে টলমল।
দোকানবাজার ওঠে নামে যেন ঝড়ের তরী,
চউরঙ্গির মাঠখানা ঐ যাচ্ছে সরি সরি।
মনুমেণ্টে লেগেছে দোল উল্টিয়ে বা ফেলে.
ক্ষ্যাপা হাতির শুঁড়ের মতো ডাইনে বাঁয়ে হেলে।

ইস্কুলেতে ছেলেরা সব কর্ত্তেছে হৈ হৈ,
অঙ্কের বই নৃত্য করে ব্যাকরণের বই।
মেঝের পরে গড়িয়ে বেড়ায় ইংরেজি বইখানা.
ম্যাপগুলো সব পাখীর মতো ঝাপটা মারে ডানা।
ঘণ্টাখানা দুলে দুলে ঢং ঢঙা ঢং বাজে—
দিন চলে যায় কিছুতে সে থামতে পারে না যে।
রান্নাঘরে কেঁদে বলে রান্নাঘরের ঝি,
লাউ কুমড়ো দৌড়ে বেড়ায় আমি করব কী!

হাজার হাজার মানুষ চেঁচায় আরে থামো থামো
কোথা যেতে কোথায় যাবে কেমন এ পাগ্‌লামো।
"আরে আরে চল্‌ল কোথায়" হাবড়ার ব্রিজ বলে
একটুকু আর নড়লে আমি পড়ব খসে জলে।
বড়োবাজার মেছোবাজার চীনেবাজার থেকে—
স্থির হয়ে রও, স্থির হয়ে রও, বলে সবাই হেঁকে।

আমি ভাবচি, যাক না কেন ভাবনা কিছুই নাই,
কলকাতা নয় দিল্লি যাবে, কিম্বা সে বোম্বাই।

হঠাৎ কিসের আওয়াজ হোলো তন্দ্রা ভেঙে যায়—
তাকিয়ে দেখি কলকাতা সেই আছে কলকাতায়—

একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু

একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু—
"চেয়ে দেখো" "চেয়ে দেখো" বলে যেন বিনু।
চেয়ে দেখি, ঠোকাঠুকি বরগা-কড়িতে,
কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে।
ইঁটে-গড়া গণ্ডার বাড়িগুলো সোজা
চলিয়াছে, দুদ্দাড় জানালা দরোজা।
রাস্তা চলেছে যত অজগর সাপ,
পিঠে তার ট্রাম গাড়ি পড়ে ধুপ্‌ধাপ।
দোকান বাজার সব নামে আর উঠে,
ছাদের গায়েতে ছাদ মরে মাথা কুটে।
হাওড়ার ব্রিজ চলে মস্ত সে বিছে
হ্যারিসন রোড চলে তার পিছে পিছে।
মনুমেণ্টের দোল, যেন খ্যাপা হাতি
শূন্যে দুলায়ে শুঁড় উঠিয়াছে মাতি।
আমাদের ইস্‌কুল ছোটে হন হন,
অঙ্কের বই ছোটে, ছোটে ব্যাকরণ।
ম্যাপগুলো দেয়ালেতে করে ছটফট,
পাখি যেন মারিতেছে পাখার ঝাপট।
ঘণ্টা কেবলি দোলে, ঢঙ্ ঢঙ্ বাজে—
যত কেন বেলা হোক তবু থামে না যে।
লক্ষ লক্ষ লোক বলে, "থামো থামো,
কোথা হতে কোথা যাবে, একি পাগলামো!"
কলিকাতা শোনে নাকো চলার খেয়াল ;
নৃত্যের নেশা তার স্তম্ভে দেয়ালে।

আমি মনে মনে ভাবি, চিন্তা তো নাই,
কলিকাতা যাক নাকো সোজা বোম্বাই।
দিল্লী লাহোরে যাক, যাক না আগ্‌রা—
মাথায় পাগ্‌ড়ি দেব পায়েতে নাগ্‌রা।
কিম্বা সে যদি আজ বিলাতেই ছোটে
ইংরেজ হবে সবে বুট-হ্যাট-কোটে।
কিসের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল যেই—
দেখি, কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই।

কবিতা-পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথের দু'টি কবিতা তোমরা পড়লে তো? দ্বিতীয় কবিতাটি তোমাদের খুবই পরিচিত—'সহজপাঠ'—দ্বিতীয় ভাগে আছে। সেখানে অবশ্য কবিতাটির কোনো নাম নেই, তবে 'সঞ্চয়িতা' খুলে দেখবে তাতে এর নাম দেওয়া হয়েছে "একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু"।

প্রথম কবিতাটি (ইঁটের টোপর মাথায় পরা) হল "একদিন রাতে..."র পাঠান্তর—প্রথম সংস্করণ বা প্রথম রূপ। রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৬ সালের পৌষ মাসে একটি এক্‌সারসাইজ বুকের প্রথম পাতাতেই লিখেছিলেন এই কবিতাটি। ওই এক্‌সারসাইজ বুকটি এখন শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবনে সযত্নে রাখা আছে। বিশ্বভারতীর উপাচার্য মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে আমরা তা দেখেছি, এবং সেখান-থেকেই তোমাদের জন্য ছবি তুলেছি। এ সি পাল কোম্‌পানির তৈরি 'দি ইউনিভারসাল এক্‌সারসাইজ বুক'—তার পিছনে আছে ১৯২৯ সালের ক্যালেনডার আর সেই সঙ্গে স্কুলের টাইম-টেবলের ছক। রবীন্দ্রভবনে অবশ্য খাতাটির পরিচয় এখন ২২ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিরূপে।

ওই এক্‌সারসাইজ বুকে দেখা যাচ্ছে, "ইঁটের টোপর মাথায় পরা" কবিতাটি লেখার পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন অন্য একটি কবিতা, যার প্রথম পংক্তি হল—"একটুখানি জায়গা ছিল রান্নাঘরের পাশে"। এর পরই লিখেছেন সহজপাঠের—"একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু"। অবশ্য এই কবিতার শুরু করেছিলেন অন্যভাবে

"এ কী হল শহর বুঝি চলে
শহর ছেড়ে
কলকাতা ঐ চলে বেড়ায় ইঁটের
দেহ শরীর নেড়ে।"

যা হোক—এই পংক্তিগুলি কেটে দিয়ে পরে শুরু করেছেন "একদিন রাতে..."। এখন, তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ, দুটি কবিতার বিষয়বস্তু বা গল্প একই—তফাত শুধু ছন্দে। দুটিই পয়ার—প্রথমটি দলবৃত্ত রীতির আর দ্বিতীয়টি কলাবৃত্ত রীতির—প্রতি পর্বে চার মাত্রা। ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সহজপাঠে কলাবৃত্ত রীতিতে রচিত কবিতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রথমভাগে তোমরা "আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে" পড়েছ তো?—সেটি আর "একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু" একই ছন্দে লেখা।

"ইঁটের টোপর মাথায় পরা" কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে কোথাও ছাপা হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর বিশ্বভারতী পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫১ সংখ্যায় কবিতাটি প্রথম ছাপা হয়। তারপর আবার ১৩৬১ (১৯৫৪) সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত 'চিত্রবিচিত্র' নামে কবিতার বইতে স্থান পায়। তখন তার নাম হয় 'স্বপ্ন'।

ওদিকে প্রথমটির পরে জন্ম হলেও 'একদিন রাতে..." কবিতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছাপিয়েছিলেন তাঁর স্কুল-পাঠ্য বই 'সহজপাঠ' দ্বিতীয় ভাগে, সে হল ১৩৩৭ সালের কথা।

তাতেই মনে হয়, প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টিকে রবীন্দ্রনাথ বেশি পছন্দ করেছেন। তোমরাও তো এখন পাশাপাশি দুটি কবিতাই পড়লে—তোমাদেরও কি দ্বিতীয়টি বেশি ভালো লাগেনি?

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর

হেলাফেলার কাজ

"আজ ছবি আঁকা থাক, তার বদলে তুমি এই কাগজটা একেবারে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেল তো দেখি।"

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর কথা শুনে তো আমি অবাক। আমাকে ইতস্তত করতে দেখে তিনি বললেন, "যা বলছি করো, বেশ একটা মজার খেলা হবে।"

খেলার কথা শুনে আমি খুব খুশি, তখন আমার অল্প বয়েস তো! হাতের কাগজটা আমি কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেললাম। তিনি বললেন, "ওগুলো এবার আমাকে দাও।" দিলাম। তিনি ওই কাগজের টুকরোগুলোর ওপর মাত্র কয়েকটা আঁচড় দিতেই দেখতে-দেখতে সেগুলো চমৎকার সব ছবি হয়ে গেল। কোনও টুকরো হল ভুঁড়িওয়ালা লোক, কোনও টুকরো হল দাড়িওয়ালা মানুষ। এইভাবে মাছ, পাখি, গম্ভীর হনুমান—কত কিছু। অথচ কাগজের টুকরোগুলোর আকার তিনি একটুও পালটালেন না। যেটা যেমন ছিল, সেটা ঠিক তেমনি রেখে বুদ্ধি খাটিয়ে ছবিগুলো এঁকে ফেললেন। টুকরো কাগজের এই খেলার নাম দিলেন তিনি—"হেলাফেলার কাজ"।

খেলার নাম এরকম হলে কী হবে, খেলাটা কিন্তু আসলে একটুও হেলাফেলার নয়। এই খেলায় উদ্ভাবনী শক্তি আর বুদ্ধি বাড়ে।

নন্দলাল বসু বললেন, এই খেলার কয়েকটা নিয়ম ঠিক করা হয়েছে, নিয়মগুলো কিন্তু সবাইকে মেনে চলতে হবে। যেমন :

১। হাতে কাগজ নিয়ে টুকরো করার সময় কোনো নির্দিষ্ট আকারের কথা ভাবলে চলবে না।

২। ছেঁড়া কাগজের টুকরো নিয়ে যা-খুশি তাই বানাতে পারো।

৩। কাগজ অন্য কাউকে দিয়ে ছিঁড়িয়ে নিতে পারলে ভাল হয়।

৪। ছেঁড়া কাগজের আকার ঠিক রেখে কয়েকটি মাত্র আঁচড়ের সাহায্যে ছবি আঁকতে হবে।

আমার ছেঁড়া কাগজের টুকরোর ওপর নন্দলাল বসু যে অসামান্য ছবিগুলো এঁকে দিয়েছেন সেগুলো তোমাদের দেখতে দেওয়া হল। দেখে নিয়ে আজ থেকেই তোমরা বসে যেতে পারো মজার এই হেলাফেলার কাজে।

হেলাফেলার এই কাজের জন্ম শান্তিনিকেতনে। আমি তখন শান্তিনিকেতনের ছাত্র। ছবি আঁকার ঝোঁক ছিল খুব, সেই ঝোঁককে একশো গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন নন্দলাল। যখন-খুশি-তখন কাগজ কলম তুলি নিয়ে তাঁর কাছে ছুটতাম আমরা। কতই বা বয়েস তখন আমাদের, কিন্তু ছোট বলে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখতেন না তিনি। আমাদের আঁকা সব ছবি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতেন। বলে দিতেন, বুঝিয়ে দিতেন, কী ভাবে আঁকলে আরও ভাল আঁকা যায়। নিজে ছবি এঁকে, আমাদের আঁকা ছবি সামান্য অদল-বদল করে তিনি ছাত্রদের
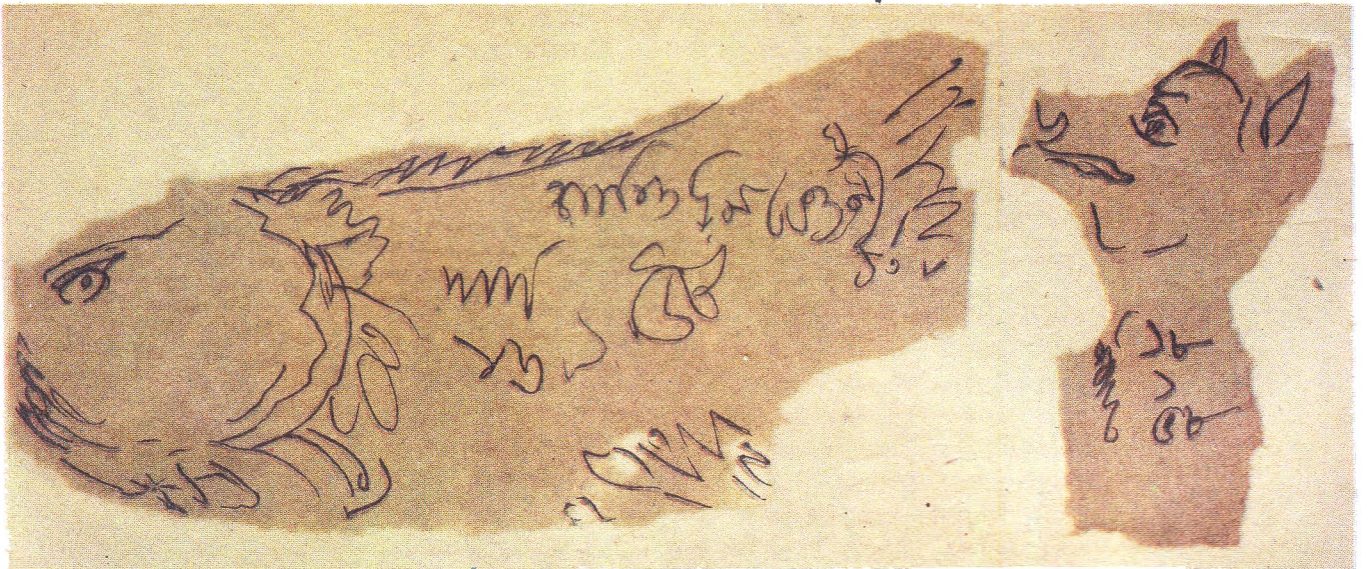
ছবি আঁকার চোখ তৈরি করে দিতেন।

বিরাট বড় শিল্পী ছিলেন নন্দলাল, কিন্তু শুধু বড়দের ছবি আঁকার মধ্যেই নিজেকে ধরে রাখেননি তিনি, ছোটদের জন্যেও তাঁর দান অসামান্য। মনে পড়ে 'সহজ পাঠ'-এর কথা, পাতায় পাতায় দারুণ-দারুণ ছবি সব ছোটদের জন্যে অগাধ ভালবাসা আর নিখুঁত শিল্পরুচি না থাকলে এসব ছবি আঁকা যায় না।

শুধু বইয়ের পাতাই নয়, ছোটদের বাড়ির চার দেয়ালেও তিনি অসংখ্য ছবি এঁকেছেন, সে-সব ছবি দেখলে মন ভরে যায়। হঠাৎ তুলি হাতে নিয়ে এ-সব ছবি আঁকা যায় না, এ-সব ছবির পেছনে দীর্ঘদিনের ভাবনা থাকা দরকার, তা ছিল নন্দলালের। হেলাফেলার কাজের পরিকল্পনাও এসেছিল এই ভাবনা থেকে। আমার হাতে কাগজ দিয়ে টুকরো-টুকরো করতে বলেছিলেন তিনি, এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো আকস্মিক চিন্তা ছিল না। তিনি হয়ত খেলার ছলে শিল্পের গভীর কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন আমাদের। পৃথিবীতে এমন কোনো আকার নেই, যা যথাযথ রেখে শিল্পরূপ দেওয়া অসম্ভব। এর জন্য চোখ থাকা দরকার, সেই চোখ নন্দলালের ছিল বলেই এলোমেলোভাবে-ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলো সামান্য কয়েকটা আঁচড়ের সাহায্যে চমৎকার সব মাছ, পাখি, হনুমান হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়ে ছবি আঁকা আর ভাবনার জন্যে অবনীন্দ্রনাথের সুযোগ্য ছাত্র নন্দলাল বসুকে চেয়ে নেন। নন্দলালের ওপর ছবি আঁকা ও ভাবনার রীতি গড়ে তোলার ভার পড়ে।

এই ছবি আঁকার ভাবনা আর শেখানোর মধ্য দিয়েই আজকের কলা-ভবনের জন্ম হয়। এই শান্তিনিকেতনের মাটিতেই নন্দলাল তাঁর সঙ্গী-সাথী, ছাত্রছাত্রী নিয়ে রেখা আর রঙের খেলায় বিভোর হয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে গেছেন।

শুধুই ছবি আর রঙ নয়, হাতের নানান ধরনের কাজ শেখার কথাও ভেবেছেন তিনি, আর সেইসব কাজ জানার জন্যেই কলাভবনের প্রতিষ্ঠা।

পুজোর ছুটির আগে শান্তিনিকেতন আশ্রমের সবাই একটা মেলার আয়োজন করে। এতে কেউ দোকান দেয়, কেউ নাটক করে, কেউ ফোঁটা-তিলক কেটে গণকঠাকুর হয়ে বসে। ছোট্ট ছেলে-মেয়েরা নিজের গড়া ফুলের মালা ফেরি করে বেড়ায়। ছোট-বড় সবাই যোগ দেয় এই মেলায়। মেলায় বিক্রির সব টাকা জমা পড়ে সাহায্য-ভাণ্ডারে।

এই মেলায় অংশ নেবার জন্য ছোটদের অনেকে সেবার ছুটেছিল নন্দলাল দাদুর কাছে ছবির জন্যে। তিনি পরম আনন্দে তাদের ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন।

রমানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
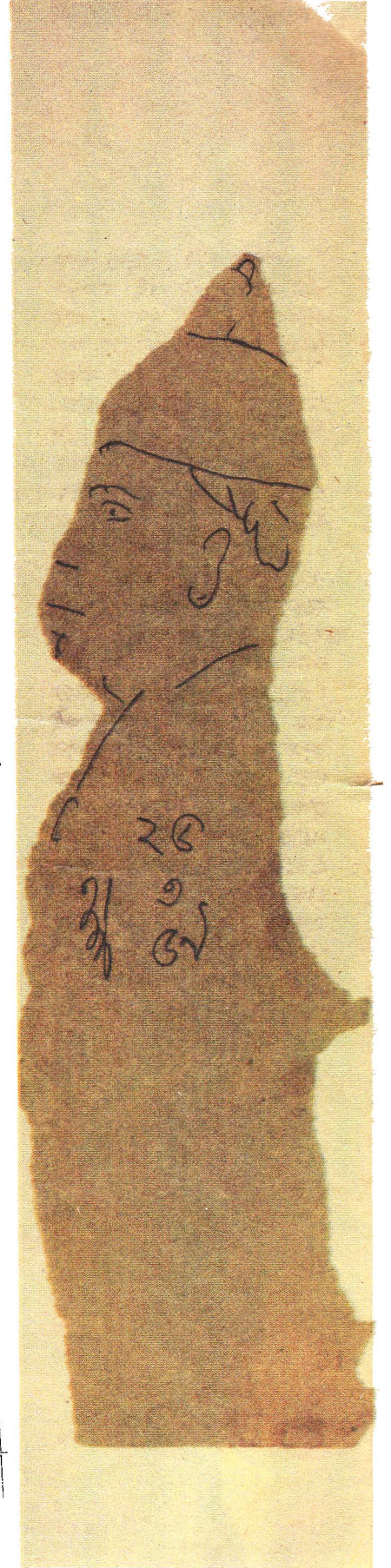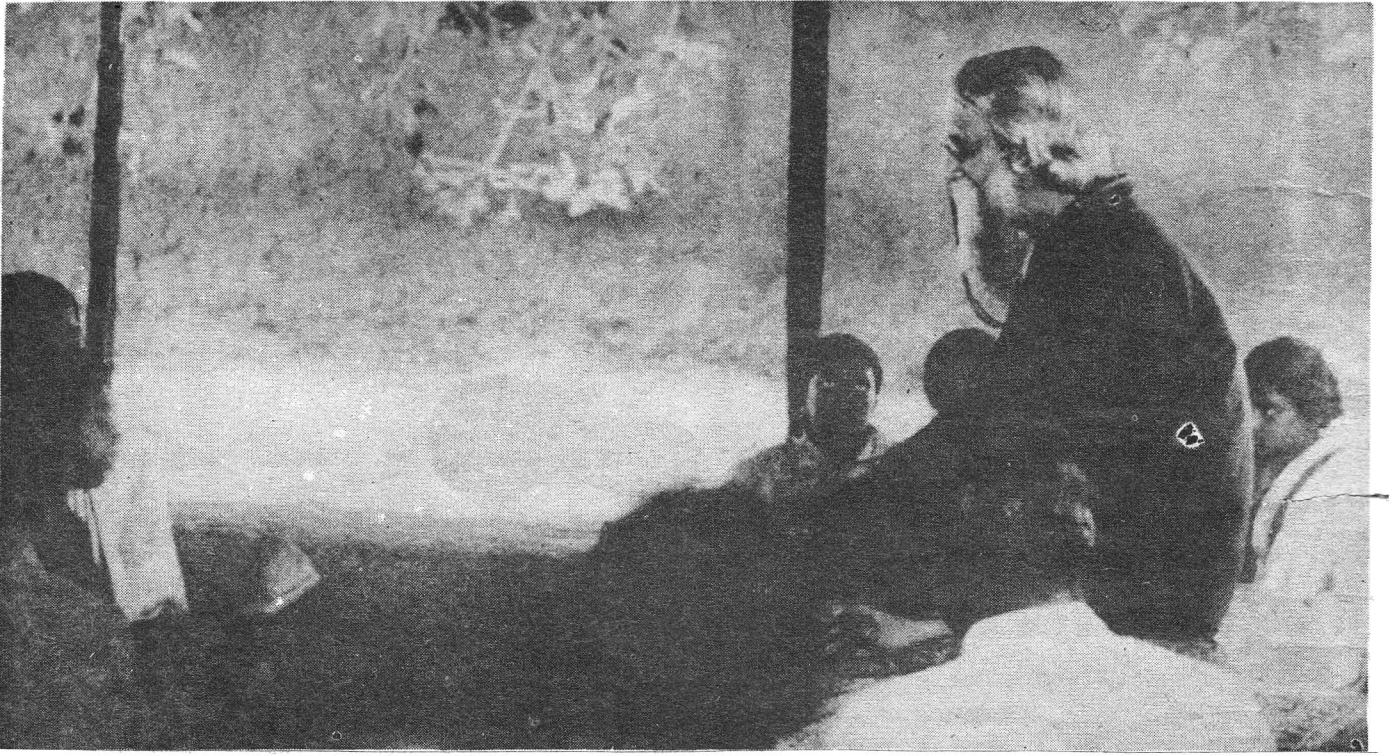
রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে ইংরেজি শেখাতেন

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

What is this? It is a slate
What is that? That is a book.
What is here? It is a chair
What is there. That is a board
What is there on the table? It is a pen (There is a pen on the table)
What is there in the box. It is a marble. There is a marble in the box.
What is there in the inkpot. There is ink in the inkpot.
What is there on this page. There is a picture on this page.
What is there on your head? There is a cap on my head.
What is there in this cup. There is milk in this cup.
What is there on the floor?
What is there near the door, under the table, on this chair, under this chair, on that tree, under that tree, near that tree,

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথকে পাটীগণিত বীজগণিত সংস্কৃত বাংলা বিজ্ঞানের সঙ্গে ইংরেজি ভাষাটাও শিখতে হয়েছিল মাস্টারমশাইদের কাছ থেকে। বাল্যকালের সেই ইংরেজি শিক্ষার স্মৃতি তাঁর কাছে মোটেই মনোরম ছিল না। অঘোর মাস্টারের হাত থেকে ছুটি পাবার উপায় ছিল না। সন্ধ্যায় জল ঝড় বৃষ্টিতে রাস্তা ভেসে গেলেও ছাতা হাতে ইংরেজির শিক্ষক অঘোরবাবুর কামাই নেই। সারা দিনের শেষে চোখ যখন ঘুমে জড়িয়ে এসেছে তখন টিমটিমে বাতির আলোয় শিক্ষকের কাছে আউড়ে যেতে হত—I am up আমি হই উপরে, He is down তিনি হন নীচে। সেই বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবতেন—গাছে গাছে পাখির বাচ্চাদের কত সুখ। ইংরেজি ভাষা শেখবার জন্য রাত্তির বেলায় তাদের বাসায় বাতি জ্বালাবার দরকার হয় না। তারা যে-ভাষা শেখে সেটা সকাল বেলাতেই শেখে আর মনের আনন্দেই শেখে।

রবীন্দ্রনাথ বড় হয়ে ছোটদের জন্য নিজেই একটি মনের মত স্কুল করেছিলেন শান্তিনিকেতনে; আর অঘোর মাস্টারের জায়গায় সেই বিদ্যালয়ে ইংরেজির শিক্ষক যিনি হয়েছিলেন তিনি স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ।

পাখি যে-ভাষায় গান গায় সে তার নিজের ভাষা, আমরা যে-ভাষায় মাকে মা বলে ডাকি সে হল আমাদের মাতৃভাষা; কিন্তু I am up, He is down—এটি হল ইংরেজি ভাষা, বিদেশের ভাষ, ভাল করে শিখতে না পারলে একে কিছুতেই তেমনভাবে রপ্ত করা যাবে না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশবের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন—সন্ধে বা রাত্রি ছেলেদের ভাষা-শিক্ষা দেবার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত সময় নয়। প্রভাতে শালিখ-চড়াইয়ের দল যখন কলতান শুরু করে দেয় তখন ছেলের দলকেও শুরু করতে হবে বি এ টি ব্যাট এম এ টি ম্যাট, কিংবা নরঃ নরৌ নরাঃ নরম্ নরৌ নরান্।

রবীন্দ্রনাথ জানতেন, শুধু ব্যাকরণের সূত্র আর পাঠ্য বইয়ের পড়া মুখস্থ করে ভাষা শিক্ষা হয় না। তাই শান্তিনিকেতনে স্কুলের শিক্ষক রূপে তিনি যখন ছোটদের ক্লাসে আসতেন তখন তাঁর হাতে না-থাকত নেস্‌ফিল্ডের গ্রামার, না-থাকত প্যারি সরকারের ফার্স্ট বুক অব রিডিং। কোন্ দিন কোন্ ক্লাসে কী পড়াবেন, কেমনভাবে পড়াবেন, তা আগের দিনই দুপুর বেলায় বসে ভেবে-চিন্তে তৈরি করে ফেলতেন, তারপর নিজের একটি খাতায় কিছু-কিছু লিখে

What is this? It is
What is that? That
What is here? It i
What is there. Tha
~~What is on your head?~~
What is there on the table
~~What is in your hand~~
What is there in the box.
What is there in the inkpot. The
What is there on this page. The
What is there on your head?
What is there in this cup.
What is there in my hand?
What is there in Madhu's h
What is there in this envelop
What is there on the floor?
What is there near the door, u
under this chair, on that tree,
a marble. There is a marble in the box.
ink in the inkpot.
picture on this page.
is a cap on my head.
is milk in this cup.
is a rupee in your hand?
Bipin's hand? Indu's hand
There is a letter in the enve
the table, on this chair,

সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতেন। রবীন্দ্রনাথ বলতেন "আমি-যে ছেলেদের পড়াই সে তো দায়ে পড়ে নয়, সে তো নিজের ইচ্ছায়।" বলতেন "এ-রকম কাজ করতে পারা তো সৌভাগ্য।"

ছুটির দিন বাদে প্রতিদিনই গুরুদেব ক্লাস নিতেন। শৌখিনভাবে একটি-দুটি ক্লাস নয়—রুটিন ধরে প্রত্যহ তিন-চারটি শ্রেণীতে পড়াতেন। ছোটদের আদ্যবিভাগের ক্লাস শুরু হত সকাল সাড়ে ছটায়। প্রথম ঘণ্টায় তাঁর ক্লাস থাকত না, পড়াতেন দ্বিতীয় ঘণ্টা থেকে। কিন্তু ঘুম থেকে উঠতেন ছেলেদেরও আগে, সেই ভোররাতে। যখন সবে পূর্বদিকের আকাশের অন্ধকার অল্প অল্প ফিকে হয়ে আসছে, দুটো-একটা শালিখ পাখি উস্‌খুস্‌ করছে, সাড়ে চারটার সময় যখন আদ্যবিভাগে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে থাকে তখন কবিও চটপট উঠে মুখ ধুয়ে এসে পুবের বারান্দায় বসেন। ধীরে ধীরে সূর্য ওঠে। তারপর সকালের জলখাবার সেরে সাড়ে ছটার মধ্যেই বিদ্যালয়ের সামনের মাঠে এসে উপস্থিত হন। ছাত্র শিক্ষক সকলে একত্রে দাঁড়ান। একটি কোনো গান হয়, তারপরে স্কুলের কাজ আরম্ভ হয়। প্রথম ঘণ্টায় ক্লাস না থাকলেও সুগন্ধি মাধবীবিতানে কবি তাঁর পড়াবার নির্দিষ্ট কোণটিতে এসে বসেন—গত দিনের খাতা খোলেন, কী পড়াবেন আর কেমনভাবে পড়াবেন, মনে-মনে আর-একবার তা স্থির করে নেন।

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়লেই পড়ুয়ার দল কবির কাছে চলে আসে। ছাত্ররা আসার সঙ্গে-সঙ্গেই ক্লাস শুরু হয়ে যায়।

Come here কুমুদ, Come here প্রফুল্ল, Come here অবনী, Come here ইন্দু। কুমুদ sit here, প্রফুল্ল sit there, অবনী stand here, ইন্দু go there.

রবীন্দ্রনাথ সব সময়ই বলতেন—মুখস্থ করিয়ে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া মোটেই কাজের কাজ নয় এবং ভাল কাজও নয়। অক্ষর-পরিচয়ের পর ছেলেরা যখন ইংরেজি ভাষাটা শিখবে, তখন কীভাবে শিখবে? বই পড়ে বা মুখস্থ করে একেবারেই নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রদের এই ইংরেজি ভাষাটা কেবল কানে শুনিয়ে আর মুখে বলিয়ে অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত করিয়ে নিতেন। কানে শুনে ছাত্ররা যখন ইংরেজি বুঝতে পারবে তখনই তাদের ওই ভাষাতে কথা বলার সময় আসবে। রবীন্দ্রনাথ যখন দেখলেন come here বলাতে কুমুদ প্রফুল্ল অবনী ইন্দু সকলেই এল, তখন শুরু হল গুরু-শিষ্যের কথোপকথন।

গুরুদেব ॥ কুমুদ, have you come here?
কুমুদ ॥ Yes, I have come here.
গুরু ॥ Have you sat here?
কুমুদ ॥ Yes, I have sat here.
গুরু ॥ প্রফুল্ল, have you sat there?
প্রফুল্ল ॥ Yes, I have sat there.
গুরু ॥ অবনী, have you stood here?
অবনী ॥ Yes, I have stood here.
গুরু ॥ ইন্দু, have you gone there?
ইন্দু ॥ Yes, I have gone there.

কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে come go stand sit প্রভৃতির মত আরও অজস্র ক্রিয়ার ব্যবহার চলতে থাকে—run kneel lie walk এমনি কত কী। রবীন্দ্রনাথের ক্লাসে শুধুই যে ক্রিয়া-পদের ব্যবহার হত তা নয়, সেই সঙ্গে বালক-বালিকাদের পদযুগলের ব্যবহারও হত। Come to me বললে কাছে আসতে হত, go there বললে দূরে যেতে হত, come back বললে ফিরে আসতে হত। তার মানে হল—বসে বসে মাথা দুলিয়ে পড়া মুখস্থ করার ক্লাস এটা নয়। এ ক্লাস হল হেঁটে চলে দৌড়িয়ে ঝাঁপিয়ে ইংরেজি শেখার ক্লাস। রবীন্দ্রনাথ নিজের ক্লাসকে কখনো পড়ার ক্লাস বলতেন না। তা ছিল পড়া-পড়া খেলার ক্লাস। কবি বলতেন—ড্রিলের ক্লাস—ভাষাশিক্ষার ড্রিল।

ওয়ান টু শেখাতেন কীভাবে? ব্ল্যাক বোর্ডে ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত লিখে? মোটেই না। ছাত্রদের ইংরেজিতে এসব শেখাবার জন্য কবি সঙ্গে করে তাদের জন্য সুন্দর দেখে দশটা মার্বেল নিয়ে আসতেন। তারপর ক্লাসের মাঝে সেগুলি রেখে একে একে বলতেন—কুমুদ give me one marble, প্রফুল্ল give me two marbles, অবনী give me three marbles, ইন্দু give me four marbles. মার্বেলের আকর্ষণে ওয়ান টু শিখতে আর বেশি সময় লাগত না।

ইংরেজি শেখার সঙ্গে-সঙ্গে অঙ্ক জ্যামিতি সব কিছুই শেখা চলে। ব্ল্যাক বোর্ডে কবি অনেকগুলি রেখা চক্‌ দিয়ে এঁকে রেখেছেন—একদিকে সরল ও বক্র রেখা; আর এক দিকে বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ।

ছবির মধ্যে দিয়ে ছেলেরা ভাষা শিখত। গুরুদেব বলতেন—কুমুদ draw a straight line on the black board, প্রফুল্লকে বলতেন—Draw a curved line, অবনী আর ইন্দুকে হয়তো বললেন—Draw a circle, a square, a triangle.

ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি-পরিচয়ের কাজও চলতে থাকে। ক্লাসে আসবার আগে

ছোটদের কাছে শেখো
পিঁপড়ে দেখতে ছোট
হাতি ও এদের ভয় পায়
দিনরাত খাটে, কখনো ঘুমোয় না
নিজেদের চেয়ে ঢের বড় পোকা মাকড় দল বেঁধে ঘাড়ে করে নিয়ে যায়
দেশরক্ষার জন্য প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করে
রানীমার কথা এরা মেনে চলে
অসময়ের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে
ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংক লি:
১৭/২ রিচি রোড
কলকাতা – ১৯
(ছোটদের ব্যাঙ্ক)
ছোট ছোট পিঁপড়েদের মত
ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও
এখন সঞ্চয় করছে
ABC UIB 1/77

কবি সংগ্রহ করে আনতেন লবঙ্গ এলাচ কর্পূর দারচিনি কিংবা গোলাপ জুঁই করবী লেবুপাতা। কবি তাঁর থলি থেকে মুঠো করে এক-একটি জিনিস বের করতেন, তারপর হাত না খুলে গন্ধ শুঁকিয়ে ছেলেদের চিনিয়ে দিতেন কোন্‌টি কী।

গুরুদেব বলতেন—Smell it and tell me what it is. তারপর থলি থেকে একে একে বেরতো : Clove—লবঙ্গ, Camphor—কর্পূর, Cinnamon—দারুচিনি, Rose—গোলাপ, Jasmine—জুঁই, Sandal wood—চন্দন, Lemon leaves—লেবুপাতা, Cardamom—এলাচ, Gardenia—গন্ধরাজ, Lotus—পদ্ম, Mint—পুদিনা, Chilly—লঙ্কা, Marigold—গাঁদা, Oleander—করবী।

কখনো বা এক দুই তিন থেকে বারো ইঞ্চি পর্যন্ত মাপের বারোটি কাঠি ও এক দুই তিন থেকে ছয় ফুট মাপের ছটি কাঠি নিয়ে কবি ক্লাসে এসে উপস্থিত হতেন। ছাত্রদের বলতেন—Find or pick up the three-inch stick. Pick up a longer stick. Pick up a shorter stick. Pick up the longest, the shortest.

এরপর ছাত্রদের এক সারিতে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন—Who is the tallest ? Find the shortest. Who is shorter than four feet ? How tall is Amita ? Who is taller than Uma ? Who are shorter than Bina ?

ছেলেমেয়েদের ইংরেজি শিক্ষা যখন বেশ কিছুটা এগোত তখন শুরু হত ট্রানস্লেশনের পালা। ছেলেরা মনের আনন্দে ট্রানস্লেশন করত, কবি ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের সাহায্য করতেন।

কখনো বা কবি বোর্ডের উপর অনেকগুলি ইংরেজি শব্দ লিখে দিলেন। সেই শব্দগুলির সাহায্যে ছোট ছোট বাক্য-রচনা করতে হবে।

MORNING:—

Dark, Night, Pass, Fade, Day, Dawn, Break, Wake up, Awake, Feel, Fresh, Lazy, Like, Hate, Leave, Bed, Wash, Face, Mouth, Hands, Teeth, Brush, Fresh, Clothes, Well, Bed, Make, Morning, Breeze, Cool, Cold, Shiver, Room, Clean, Floor, Sweep, Slowly, Quickly, Briskly, Carefully, Outside, Go, Find, Grass, Wet, Dew, Bud, Open.

A CLASS:—

School, Time, Collect, Take, Book, Pencil, Pen, Fountain pen, Exercise book, Carry, Put, Together, Start, Hear, Bell, Ring, Run, Walk, Arrive, Late, Timely, Very, Little, Other, Boy, Girl, Already, Absent, Present, Teacher, Mistress, Come, Stand, All, Tidy, Shabby, Lesson, Work, Begin, Open, Write, Recite, Poem, Prose, Well, Badly, Loudly.

এই শব্দগুলির সাহায্যে এমন ভাবে বাক্য-রচনা করতে হবে যাতে বাক্যগুলির মধ্যে একটা অর্থের যোগ থাকে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রছাত্রীদের যে-সব অংশ ইংরেজিতে ট্রানস্লেশন করতে দিতেন তার থেকে দুটি অনুচ্ছেদ এখানে তুলে দিলাম।

১ ॥

দিদি, কাল আমরা কোপাই নদীর পারে পিক্‌নিকে যাবো। ঠাকুর চাকর সঙ্গে যাবে না, আমরা নিজেরাই রান্না করবো। চাল ডাল তরকারী তেল ঘি ও মস্‌লা সবই আজ সকালবেলা কিনেছি। আমরা সবশুদ্ধ (All together) একুশ জন। একটা গরুর গাড়ি ভাড়া করেছি। সেটা কাল খুব সকালে আসবে। জিনিসপত্র সেটায় তুলে দেবো। আমরা হেঁটে যাবো। অনেক দূরে যখন যাই তখন আমরা গান করি। তাই আমরা ক্লান্ত হই না। আমার বন্ধু শান্তি খুব ভাল গান করে। সেও আমাদের সঙ্গে যাবে। আমার গলা ভাঙা। এখন সন্ধ্যা ৯টা বেজেছে। শুতে যাচ্ছি। কাল খুব ভোরে উঠবো। ইতি— স্নেহের বীণা

২ ॥

মা, এখন এখানে বেশ শীত। বড়দিনের ছুটিতে এখানে মেলা হবে। অনেক লোক জড়ো হয়। কেউ কাছ থেকে আসে, কেউ বা অনেক দূরের। মেলা দু-দিন ধরে হয়। অনেকে প্রথম দিন বাড়ি ফেরে না। তারা পাশের গ্রাম থেকে শুক্‌নো খড় নিয়ে আসে। তাই রাত্রে মাটিতে বিছায়। তার উপরে শুয়ে রাত কাটায়। ওদের কেন অসুখ হয় না ? কখনও বা ওরা দিনের বেলায় শুক্‌নো ডাল ও গাছের গুঁড়ি সংগ্রহ করে রাখে। রাত্রে আগুন জ্বালায়। আগুনের চারিদিকে ঘিরে বসে। দোকানগুলো সারারাত খোলা থাকে। একদল স্বেচ্ছাব্রতী (Volunteer) মেলা পাহারা দেয়।

তুমি ও রানী এবার এসো। আমার গরম শালটা সঙ্গে এনো। আমি স্টেশনে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবো। ইতি— স্নেহের উমা

এই দুটি অংশ এবার তোমরা বসে ট্রানস্লেশন করে ফেলো দেখি। হ্যাঁ, আর ইংরেজি শব্দগুলো যে আগে দেওয়া হয়েছে সেগুলি দিয়ে বাক্য-রচনা করো বেশ গল্পের মত করে। তার পর চটপট বাংলায় অনুবাদ করে ফেলো নিজেরই লেখা ওই দুটি ইংরেজি অংশ। এটাই রইলো তোমাদের এবারের ছুটির পড়া।

রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি-চিত্র বিশ্বভারতীর উপাচার্য মহাশয়ের অনুমোদনক্রমে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-ভবন থেকে সংগৃহীত।

মানুষের গন্ধ পাচ্ছি!

ঐ যে মানুষটা!

বাঘ দিল লাফ...

মানুষটার মাথা ডিঙিয়ে বাঘ চলে গেল অনেক দূরে...

তোর লাফটা জুতসই হয়নি! বেশি জোর দিয়ে ফেলেছিলি!

মানুষটা যে নোলেদা, তা আর বলতে হয় না! বনের বাঘের লাফে ভুল হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়

চল, তোকে ট্রেনিং দিই!
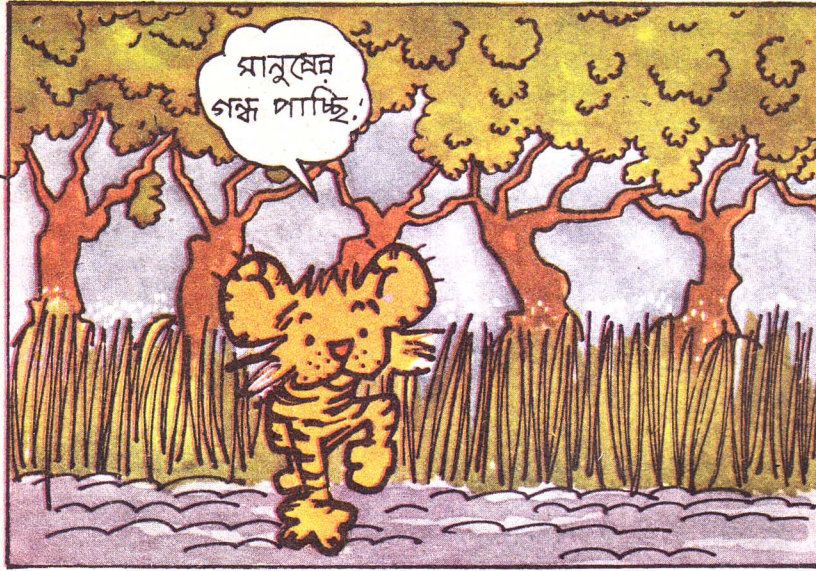
ছোট্ট ঘোড়সওয়ার

অন্নদাশঙ্কর রায়

টাট্টু ঘোড়া ! টাট্টু ঘোড়া !
তা ধিন তা ধিন !
কোথায় তোমার লাগাম, ঘোড়া,
কোথায় তোমার জীন !
রেকাব তোমার কোথায়, ঘোড়া,
চেহারা মলিন !

খোকাবাবু ! খোকাবাবু !
দুঃখ শোনো, দাদা,
মালিক আমার বলে কিনা—
ঘোড়া তো নয়, গাধা।
দেয় না দানা, দেয় না চানা,
গতর হলো আধা।

টাট্টু ঘোড়া ! টাট্টু ঘোড়া !
নাকে পরাই দড়ি
রুমাল পেতে রাখি পিঠে,
লাফ দিয়ে চড়ি।
কদম চালে চলো, ঘোড়া,
গড়িয়ে না পড়ি।

খোকাবাবু ! খোকাবাবু !
তা ধিন তা ধিন।
খাসা তোমার লাগাম, খোকা,
খাসা তোমার জীন !
দানাপানি পেলেই, খোকা,
চলব সারাদিন।

চ্যাম্পিয়ানের হার

অজিত দত্ত

ফার্স্ট পিরিয়ড শুরু হতেই উড়ু উড়ু মনটা
ভাবছে বিশু কতক্ষণে বাজবে ছুটির ঘন্টা।
খেলার মাঠটা বিশুর মনকে সদাই বিষম টানে,
স্কুলের ঘরে বন্ধ থাকার পায় না কোনো মানে।
লেখাপড়ার ব্যাপারে তার হোক না যতো ভুল,
খেলার মাঠের হিরো হবার স্বপ্নে সে মশগুল।
অদ্ভুত তার খেলা দেখে লাগবে সবার তাক
সব খেলাতেই হবে বিশুর দুরন্ত নামডাক।
ক্রিকেটে সে ব্র্যাডম্যান আর ফুটবলেতে পেলে,
ধ্যানচাঁদকে হার মানাবে দারুণ হকি খেলে।
অনেক সোনার মেডেল জিতে অলিম্পিকের থেকে
আনবে যখন সবাই তখন অবাক হবে দেখে।
এমনিতরো ভেবে ভেবে বছর গেল ঘুরে,
প্রমোশনের পরীক্ষাটা রইল না আর দূরে।
খেলার স্বপ্ন ছেড়ে তখন হবু চ্যাম্পিয়ান
পরীক্ষাতে বসল গিয়ে দুরু-দুরু প্রাণ।
ইংরেজিতে বারো পেল, ইতিহাসে চার,
সব খেলাতে জিতে হল পরীক্ষাটার হার।

খাঁটি ব্যবসা

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)

পানাগড়ের রাজা
মগরাহাটে দোকান খুলে
বেচেন খাজা-গজা।
খানাকুলের রানী,
ঝগড়া করে মগরা এলেন,
সঙ্গে চাকর ভজা।
ঝোলাগুড়ের রসে
ইচ্ছে করে উচ্ছে ভেজে
বানান মুগের পিঠে।
চানাচুরের খোঁজে
কিনল রাজা, গিলল তাই,
বলল, "বড়ই মিঠে!"
খানাকুলের রানী
ব্যাজার হয়ে রাজার মাথায়
মারল কষে চাঁটি।
ভজা ঘুমের ঘোরে,
চমকে উঠে থমকে বলে—
"ব্যবসা দুটোই মাটি!"

মেঘ-বিদ্যুৎ-ঝড়

অশোকবিজয় রাহা

মেঘ-বিদ্যুৎ-ঝড়
বাজ ডাকে কড় কড়
জটায় সাপের জিভ
খেপল পাগল শিব
ডম্বরু ডুম ডুম
ভাঙল ভূতের ঘুম
নন্দী ভৃঙ্গী দুই
লাফিয়ে কাঁপায় ভুঁই
দৈত্য দানার দল
তুলল কোলাহল
জুড়ল এসে সব
উন্মাদ তাণ্ডব ॥

ছবি বিমল দাশ
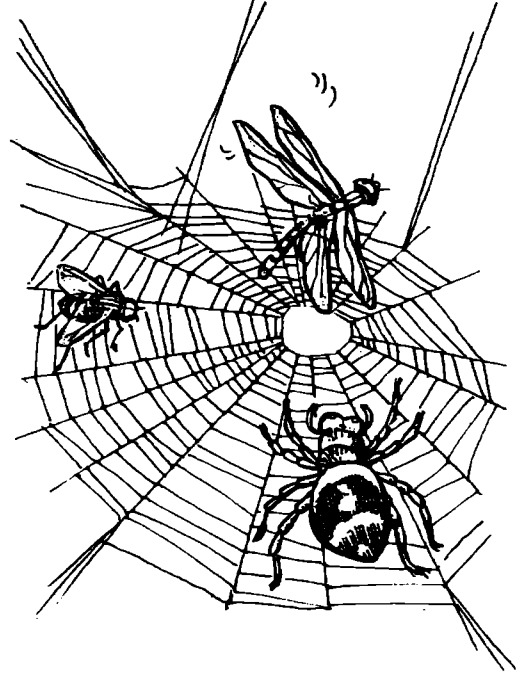
মাকড়শা

অরুণকুমার সরকার

ছড়িয়ে আছে ডুমুরগাছে
মাকড়শার জাল;
মধ্যিখানে ধ্যানে মগ্ন
রঙিন মাকড়শা।
বিরাট সাম্রাজ্য তার।
আশমান পাতাল
রেশমি সুতো দিয়ে তৈরি
বিচিত্র নকশা।
পাড়ে-পাড়ে ঝলক দিচ্ছে
মুক্তো শিশিরের,
দুলছে হলদে পালক। দ্বারে
তিনটে মাছি বাঁধা।
ফড়িঙ একটা চেষ্টা করছে
ছিঁড়বে গোলকধাঁধা।
কিন্তু রাজার চালচলনের
নেইকো রকমফের।

প্রোফেসর শঙ্কুর অ্যাডভেঞ্চার

সত্যজিৎ রায়
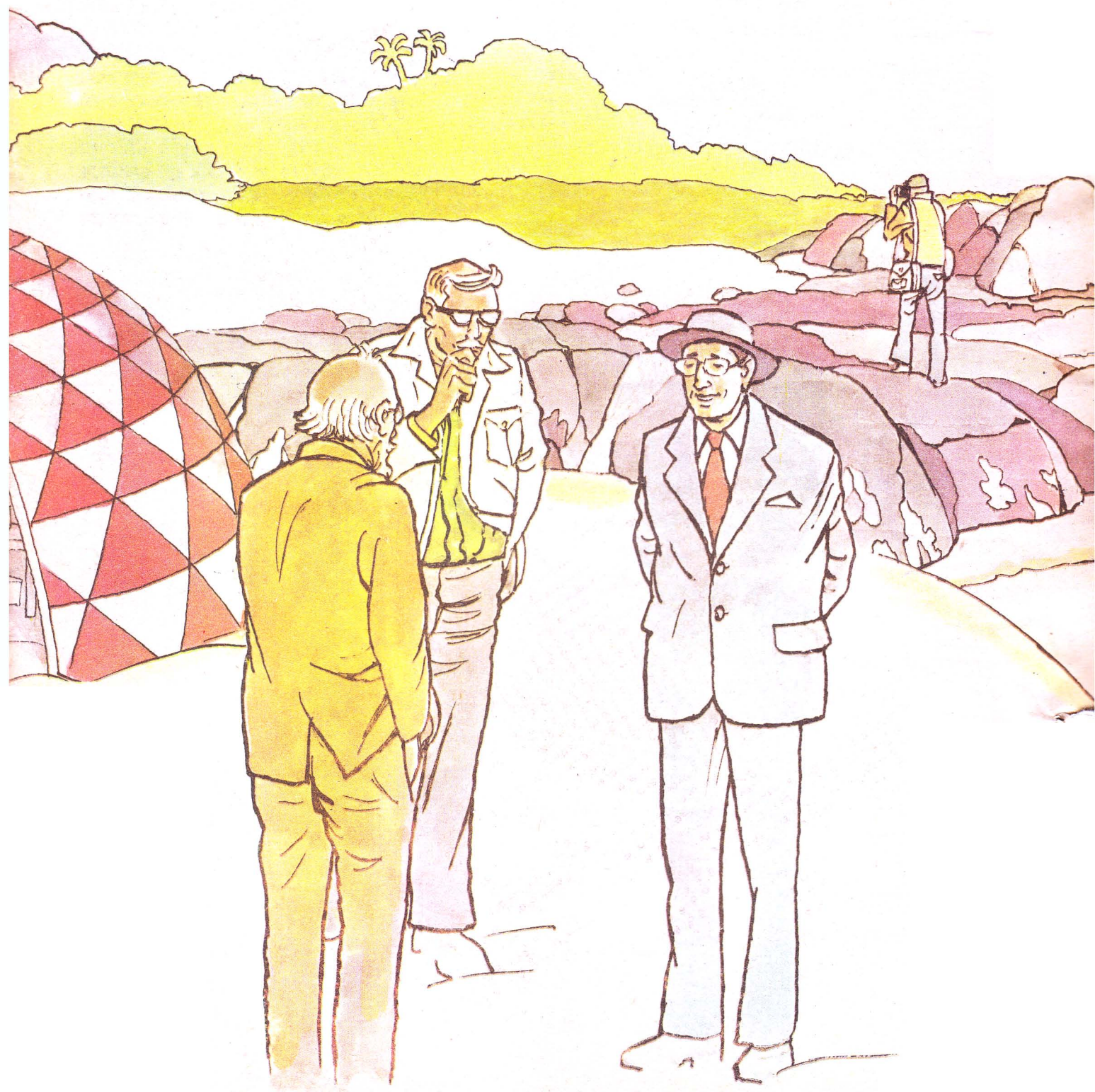
মানরো দ্বীপ, ১২ই মার্চ

এই দ্বীপে পৌঁছানর আগে গত তিন সপ্তাহের ঘটনা সবই আমার ডায়রিতে বিক্ষিপ্ত-ভাবে লেখা আছে। হাতে যখন সময় পেয়েছি তখন সেগুলোকেই একটু গুছিয়ে লিখে রাখছি।

আমি যে আবার এক অভিযানের দলে ভিড়ে পড়েছি, সেটা বোধহয় আর বলার দরকার নেই। এই দ্বীপের নাম হয়ত একটা থাকতে পারে, কারণ আজ থেকে তিনশ বছর আগে এখানে মানুষের পা পড়েছিল, কিন্তু সে-নাম সভ্য জগতে পৌঁছায়নি। আমরা এটাকে আপাতত মানরো দ্বীপ বলেই বলছি।

আমরা দলে আছি সবশুদ্ধ পাঁচজন। তার মধ্যে একজন হল আমার পুরনো বন্ধু জেরেমি সন্ডার্স—যার উদ্যোগেই এই অভিযান। এই উদ্যোগের গোড়ার কথা বলতে গেলে বিল ক্যালেন-বাখের পরিচয় দিতে হয়। ইনিও আমাদের দলেরই একজন। ক্যালিফর্নিয়ার অধিবাসী, দীর্ঘকায়, বেপরোয়া, শক্তিমান পুরুষ, পেশা ছবি তোলা। বয়স পঁয়তাল্লিশ হতে চলল, কিন্তু চলনবলন তার অর্ধেক বয়সের যুবার মতো। ক্যালেনবাখের সঙ্গে সন্ডার্সের পরিচয় বেশ কয়েক বছরের। গত ডিসেম্বরে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকার তরফ থেকে ক্যালেনবাখ গিয়েছিল উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার কয়েকটি শহরে কিছু স্থানীয় উৎসবের ছবি তুলতে। মোরক্কোর আগাদির শহরে এসে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। আগাদির সমুদ্রতীরের শহর, সেখানে অনেক জেলের বাস। ক্যালেনবাখ জেলেপাড়ায় গিয়েছিল সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে তাদের ছবি তুলতে। একটি জেলের বাড়িতে ঢুকে তার চোখ পড়ে মালিকের বছর তিনেকের একটি ছেলের উপর। ছেলেটি হাতে একটা ছিপিআঁটা বোতল নিয়ে খেলা করছে। বোতলের ভিতরে কাগজ দেখতে পেয়ে ক্যালেনবাখের কৌতূহল হয়। সে ছেলেটির হাত থেকে বোতল নিয়ে দেখে তার ছিপি সীল করে বন্ধ করা এবং ভিতরের কাগজটা হল ইংরাজিতে লেখা একটা চিঠি। হাতের লেখার ধাঁচ থেকে মনে হয় সে-চিঠি বহুকালের পুরনো। ছেলেটির
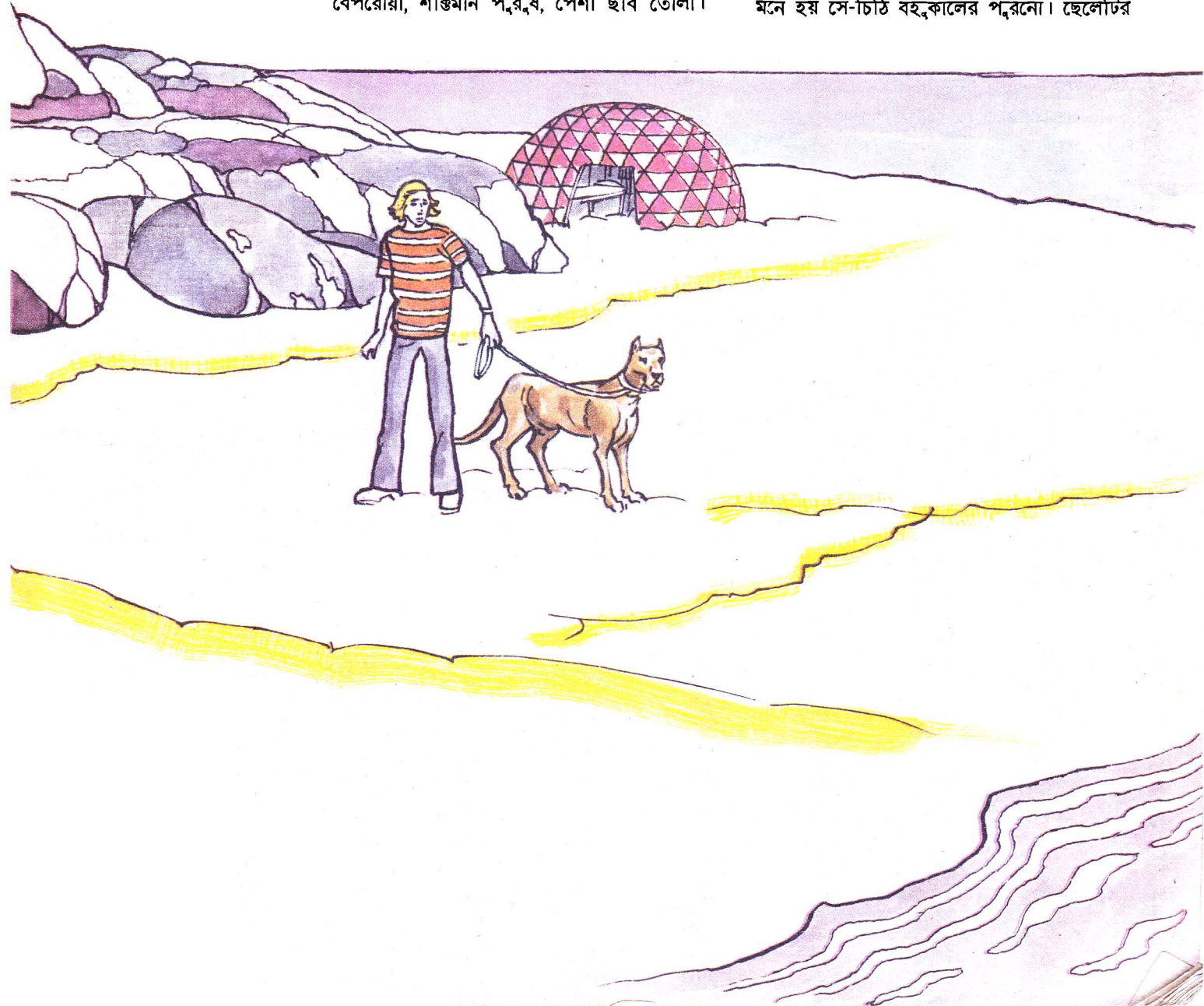
বাপকে জিগ্যেস করে ক্যালেনবাখ জানে যে ওই বোতল নাকি তার ঠাকুরদাদার আমল থেকে তাদের বাড়িতে আছে। জেলেরা জাতে মুসলমান, আরবী ভাষায় কথা বলে, তাই বোতল থেকে চিঠি বার করে পড়ার কোনো প্রশ্ন ওঠেনি।

সেই চিঠি ক্যালেনবাখ বোতল থেকে বার করে পড়ে এবং পড়ার অল্পদিনের মধ্যেই তার কাজ সেরে সোজা চলে যায় লণ্ডনে। সেখানে সণ্ডার্সের সঙ্গে দেখা করে চিঠিটা তাকে দেখায়। পেনসিলে লেখা মাত্র কয়েক লাইনের চিঠি। সেটার বাংলা করলে এই দাঁড়ায়—

> ল্যাটিচিউড ৩৩° ইস্ট—লঙ্গিচিউড ৩৩° নর্থ, ১৩ই ডিসেম্বর ১৬২২
>
> এই অজানা দ্বীপে আমরা এমন এক আশ্চর্য উদ্ভিদের সন্ধান পেয়েছি যার অমৃততুল্য গুণ মানুষের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। এই সংবাদ প্রচারের জন্য ব্র্যাণ্ডনের নিষেধ সত্ত্বেও এ-চিঠি আমি বোতলে ভরে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছি। ব্ল্যাকহোল ব্র্যাণ্ডন এখন এই দ্বীপের অধীশ্বর। অতএব এই চিঠি পড়ে কোনো দল যদি এই উদ্ভিদ্ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এখানে আসে, তারা যেন ব্র্যাণ্ডনের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসে। আমি নিজে ব্র্যাণ্ডনের হাতের শিকার হতে চলেছি।
>
> হেকটর মানরো

সণ্ডার্স চিঠিটা পেয়ে প্রথমেই যে-কাজটা করে, সেটা হল লণ্ডনের নৌবিভাগের আপিসে গিয়ে ১৬২১-২২ সালে আটলাণ্টিক মহাসাগরে কোনো জাহাজডুবি হয়েছিল কিনা সে-বিষয়ে অনুসন্ধান করা। সমুদ্রযাত্রা সংক্রান্ত অতি প্রাচীন দলিলও রাখা থাকে নৌবিভাগে। ১৬২২ সালের তিনটি জাহাজডুবির মধ্যে একটির যাত্রী-তালিকায় ডাঃ হেকটর মানরোর নাম পাওয়া যায়। এই জাহাজটি —নাম 'কংকুয়েস্ট'—জিব্রলটার থেকে যাচ্ছিল আটলাণ্টিক মহাসাগরে অবস্থিত ভার্জিন দ্বীপ-পুঞ্জে। বারমুডার কাছাকাছি এসে জাহাজডুবি হয়। কারণ জানা যায়নি। নৌবিভাগের রিপোর্টে বলছে কেউ বাঁচেনি ; কিন্তু হেকটর মানরো যে বেঁচেছিল তার প্রমাণ এখন পাওয়া যাচ্ছে। তবে মানরোর চিঠিতে যে ব্র্যাণ্ডন ব্যক্তিটির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, এই নামে কোনো যাত্রী কংকুয়েস্ট জাহাজে ছিল না। সণ্ডার্স অনুসন্ধান করে জানে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গ্রেগ ব্র্যাণ্ডন নামে এক দুর্ধর্ষ জলদস্যু ছিল। ব্র্যাণ্ডনের নাকি একটা চোখ ছিল না; তার জায়গায় ছিল একটি গহ্বর। সেই কারণে তার নাম হয়ে গিয়েছিল ব্ল্যাকহোল ব্র্যাণ্ডন। সোনার লোভে এই ব্র্যাণ্ডন নাকি এক হাজারেরও বেশি মানুষ খুন করেছিল। জামাইকা দ্বীপ সেই সময়ে ছিল ইংরাজ জলদস্যুদের একটা প্রধান আস্তানা। এমন হতে পারে যে, কংকুয়েস্ট জাহাজ ব্র্যাণ্ডনের দস্যু-জাহাজের কবলে পড়ে এবং তার ফলেই ধ্বংস হয়। মানরো যে বেঁচেছে তার একটা কারণ হয়ত এই যে, ব্র্যাণ্ডনই তাকে বাঁচিয়েছে। এটা ভুললে চলবে না যে মানরো ছিল ডাক্তার। দস্যু জাহাজে তখনকার দিনে একজন ভালো ডাক্তারের কদর ছিল খুব খুব বেশি। সেকালে সমুদ্রযাত্রায় স্কার্ভি, পেল্যাগ্রা, বেরি-বেরি ইত্যাদি ব্যারাম জাহাজে একবার দেখা দিলে নাবিকদের বাঁচবার আশা প্রায় থাকত না বললেই চলে। তাই একজন ভালো ডাক্তার—যিনি এইসব ব্যারামের চিকিৎসা করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে অস্ত্রোপচার করতে পারবেন—সে যুগে ছিল সমুদ্রযাত্রার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। হেক্টর মানরো নিশ্চয়ই এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তবে মানরো আর ব্র্যাণ্ডন শেষকালে এই অজানা দ্বীপে কী ভাবে হাজির হয় তার কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।

মোটকথা, এই সব তথ্য জেনে সণ্ডার্সের রোখ চাপে সাড়ে তিন শ' বছর পেরিয়ে গেলেও সে একবার এই অজানা দ্বীপে পাড়ি দেবে। আমাকে এ ব্যাপারে লেখামাত্র আমি অভিযানে যোগ দিতে রাজি হয়ে সাতদিনের মধ্যে লণ্ডনে চলে আসি। এসে দেখি, যাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। ক্যালেনবাখ অবিশ্যি প্রথমেই জানিয়ে রেখেছিল যে, অভিযান হলে সে তাতে যোগ দেবে। তার সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম সে টেলি-ভিশনের জন্য ছবি তুলে অনেক পয়সা রোজগারের স্বপ্ন দেখছে।

দলের চতুর্থ ব্যক্তি হলেন একজন জাপানী বৈজ্ঞানিক। এ'র নাম হিদেচি সুমা। এনার অনেক গুণের একটির পরিচয় আমার সামনেই সমুদ্রতটে বিরাজমান। এটি একটি জেটচালিত সমুদ্রযান। নাম সুমাক্রাফ্ট। এ যে কী আশ্চর্য জিনিস তা আমরা এই দেড়হাজার মাইল সমুদ্রপথে এসেই বুঝেছি। নানান প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েও এই সুমাক্রাফ্ট আমাদের একটিবারের জন্যও অসুবিধায় ফেলেনি। এই নৌকার ডিমনস্ট্রেশন দিতেই সুমা লণ্ডনে এসেছিলেন, আর তখনই সণ্ডার্সের সঙ্গে আলাপ হয়। সুমা শুধু এই জেটবোটের জনক নন। তাঁর তৈয়ারি আরো অনেক ছোটখাটো যন্ত্রপাতি তিনি সঙ্গে এনেছেন, যা তাঁর মতে আমাদের অভিযানে সাহায্য করবে। তাছাড়া সুমা একজন প্রথম শ্রেণীর জীব-রাসায়নিক। সব শেষে আরো একটি বিশেষ গুণের কথা না বললে সুমার পরিচয় সম্পূর্ণ হবে না : এনার মতো পরিপাটি ফিটফাট মানুষ আমি আর দ্বিতীয় দেখিনি। এ'কে যে-কোনো সময় দেখলেই মনে হবে ইনি বুঝি তাঁর নিজের শহর ওসাকাতেই রয়েছেন, এবং এই মুহূর্তে ব্রীফকেসটি হাতে করে আপিসে রওনা দেবেন।

পঞ্চম ব্যক্তিটির নাম বলার আগে তিনি কী-ভাবে দলভুক্ত হলেন সেটা বলি।

সণ্ডার্স এই অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েই লণ্ডনের সমস্ত কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দলে যোগ দেবার জন্য লোক আহ্বান করে। যোগ্যতা হিসেবে পাঁচটি শর্ত দেওয়া হয়েছিল।—এক, সমুদ্রযাত্রার

পূর্ব অভিজ্ঞতা; দুই, অন্তত দুটি বৈজ্ঞানিক অভিযানে অংশ গ্রহণের পূর্ব অভিজ্ঞতা; তিন, বিজ্ঞানের যে কোনো শাখায় একটি উচ্চমানের ডিগ্রী; চার, সুস্বাস্থ্য; পাঁচ, অস্ত্রচালনার অভিজ্ঞতা। আমাদের এই পাঁচ নম্বর ব্যক্তিটি শুধু প্রথম শর্তটি ছাড়া আর কোনটিই পালন করতে পারেননি। ইনি বিজ্ঞানী নন। ইনি সাহিত্যিক; ইনি বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক কোনো অভিযানেই কখনো অংশগ্রহণ করেননি; কেবল ইস্কুলে থাকতে একবার দলে পড়ে স্কটল্যাণ্ডের বেন নেভিস পাহাড়ের গা বেয়ে দেড় হাজার ফুট উঠেছিলেন। বেন নেভিসের উচ্চতা যেখানে প্রায় সাড়ে চার হাজার ফুট, সেখানে এটাকে খুব বড় রকম কৃতিত্ব বলা চলে না। তবে এঁকে দলভুক্ত করার কারণ কী?

কারণ এই যে ডেভিড মানরো হল হেকটর মানরোর বংশধর। আমরা যে কথাটা প্রায়ই ব্যবহার করি, সেই চোদ্দ পুরুষ পিছিয়ে গেলেই দেখা যাবে, হেক্টর মানরোর সঙ্গে ডেভিড মানরোর সরাসরি সম্পর্ক। এই ডেভিড সন্ডার্সের বিজ্ঞাপন দেখে সোজা তার বাড়িতে এসে তাকে অনুরোধ করে এই অভিযানে তাকে সঙ্গে নেবার জন্য। সে বলে যে বাপঠাকুর্দার কাছে সে শুনেছে শেকস্‌পিয়রের সমসাময়িক ডাঃ মানরোর কথা। ব্রিটিশ নৌবাহিনী যখন স্প্যানিশ আরমাডাকে জলযুদ্ধে পরাজিত করে, তখন ব্রিটিশদের সেনাপতি ডিউক অফ এফিংহ্যামের নিজের জাহাজে ডাক্তার ছিলেন হেক্টর মানরো। তাছাড়া ব্ল্যাকহোল ব্র্যাণ্ডন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত জেনে ডেভিডের আরো রেখে চেপে যায়। সে ছেলেবেলা থেকে জলদস্যুদের কাহিনী পড়ে এসেছে; এমন কী, ব্ল্যাকহোল ব্র্যাণ্ডনকে ঘিরেও অনেক গল্প তার জানা। এই দ্বীপে যদি ব্র্যাণ্ডনের কোনো সিন্দুক থেকে থাকে, এবং তাতে যদি ধনরত্ন পাওয়া যায়, তাহলে ডেভিডের পক্ষে সেটা হবে এক অবিস্মরণীয় অ্যাডভেঞ্চার। এখানে বলা দরকার যে, ডেভিডের বয়স মাত্র বাইশ।

তরুণ ডেভিড মানরোকে দেখে তার স্বাস্থ্য

এবং শ্রমক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগতে বাধ্য। তার হাত দেখলেই বোঝা যায়, সে-হাত কলম ছাড়া আর কোন হাতিয়ার ধরেনি। তার চোখের উদাস দৃষ্টি, তার মৃদুস্বরে কথা বলার ঢং, তার কাঁধ-অবধি নেমে আসা অবিন্যস্ত সোনালি চুল, সবই প্রমাণ করে যে, তার কল্পনার জোর যতই হোক না কেন, তার শারীরিক বল সামান্যই। কিন্তু এই ডেভিডকেই সন্ডার্স শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছে, কারণ তার একটা গুণকে সে অগ্রাহ্য করতে পারেনি—ওই বোতলের চিঠি যার লেখা তার রক্ত বইছে ডেভিড মানরোর ধমনীতে।

এ ছাড়াও আরেকজন আছেন দলে, তিনি হলেন একটি শ্বাপদ; ডেভিডের পোষা গ্রেট ডেন কুকুর রকেট। আমাদের সকলের মধ্যে এ'রই স্বাস্থ্য যে সবচেয়ে ভালো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমরা আজই সকালে এখানে এসে পেশছেছি। দিনে তিনশ মাইল পথ অতিক্রম করেও গত দুদিনে ডাঙার কোনো চিহ্ন দেখতে না পেয়ে সন্দেহ হচ্ছিল, আটলান্টিক মহাসাগরের এ অংশে আদৌ কোনো দ্বীপ আছে কিনা। আজ ভোরে যখন দূরবীনে চোখ লাগিয়ে সন্ডার্স বলল কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ডাঙা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ক্যালেনবাখ তৎক্ষণাৎ মুভী ক্যামেরা নিয়ে তৈরি। আমার অবাক লাগছিল এই কারণে যে, সচরাচর ডাঙা আসার অনেক আগেই সীগালের দল উড়ে এসে কর্কশ গলায় জানিয়ে দিয়ে যায় আসন্ন ভূখণ্ডের কথা। এবারে দেখলাম তার ব্যতিক্রম।

এখানে এসে বুঝছি এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ আজ সারাদিন প্রায় পাঁচ কিলোমিটার ঘুরেও কয়েকটি পোকা এবং সমুদ্র-তটে কিছু কাঁকড়া ছাড়া আর কোনো প্রাণীর সাক্ষাৎ পাইনি। শুধু তাই নয়; নতুন ধরনের কোনো উদ্ভিদও চোখে পড়েনি। এসব অঞ্চলে যেমন গাছপালা ফলমূল আশা করা যায়, তার বাইরে কিছুই দেখিনি। অবিশ্যি আজ আমরা দ্বীপের কেবলমাত্র পশ্চিম অংশের খানিকটা ঘুরে দেখেছি।

আমরা ক্যাম্প ফেলেছি সমুদ্রতটের কাছেই। এটা দ্বীপের দক্ষিণ অংশ। এদিকটায় গাছপালা বিশেষ নেই; কেবল বালি আর পাথর। দ্বীপটা আয়তনে ছোট, এবং মোটামুটি সমতল; কিন্তু মাঝখানের অংশটা—যেটা আমাদের ক্যাম্প থেকে পাঁচ-সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার দূরে—খানিকটা উঁচু, আর বেশ বড়-বড় টিলায় ভর্তি।

ডেভিড বেশ ফুর্তিতে আছে; সমুদ্রতটে রকেটের সঙ্গে তার ছুটোছুটি দেখতেও ভালো লাগছে। লণ্ডনে বা সমুদ্রযাত্রায় তার যা চেহারা দেখেছি, এখানে এসে এই কয়েক ঘণ্টাতেই যে তার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

গোলমাল করছে এক ক্যালেনবাখ। দ্বীপে পদার্পণমাত্র সে একনাগাড়ে ত্রিশটা হাঁচি দিল, আর তার পরেই এল কম্প দিয়ে জ্বর। বলা বাহুল্য আজ ওকে সঙ্গে নিতে পারিনি। সুমা আর ও ক্যাম্পেই ছিল। সুমা তার যন্ত্রপাতি-গুলোকে ব্যবহারের উপযোগী করে রাখছে আর সেই সঙ্গে একটি খুদে ল্যাবরেটরিও খাড়া করছে। নতুন কোনো উদ্ভিদ যদি পাওয়া যায় তাহলে তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন হবে।

জ্বর সত্ত্বেও ক্যালেনবাখ ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, আমরা দু-তিন দিনের মধ্যেই এখান থেকে পাততাড়ি গোটাব। তার মতে এমন দ্বীপ নাকি সারা আটলান্টিক মহাসাগরে ছড়ানো।

আমি কিন্তু হেকটর মানরোর চিঠির কথা ভুলতে পারছি না। ল্যাটিচিউড-লঙ্গিচিউড যখন মিলেছে তখন এই দ্বীপই সেই চিঠির দ্বীপ। এই দ্বীপেই মানরো সেই আশ্চর্য উদ্ভিদের সন্ধান পেয়েছিল।

১৩ই মার্চ, দুপুর বারোটা

ক্যালেনবাখের ভবিষ্যদ্বাণী ফলল না। দু-একদিনের মধ্যে এ দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। ব্যাপারটা খুলে বলি।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে সমুদ্রে স্নান আর ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা বেরোনর আয়োজন করছি, এমন সময় ডেভিড হঠাৎ এসে বলল সে রকেটকে নিয়ে একটু একা ঘুরে আসতে চায়। তার সাহস যে বেড়েছে, সেটা কালকেই বুঝে-ছিলাম। আসলে সাহিত্যিক মানুষ তো, তার পক্ষে আমাদের মতো বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান বেশ কষ্টকর। আমরা এসেছি সব কিছু ভালো করে খুঁটিয়ে দেখার জন্য, আর সেটার জন্য চাই সময় আর ধৈর্য। ডেভিড বলল, সে ওই দূরের টিলাগুলোর দিকে গিয়ে দেখতে চায় ওগুলোতে কোনো গুহা-টুহা আছে কিনা। তার ধারণা তার মধ্যে হয়ত ব্ল্যাকহোল ব্র্যান্ডনের গুপ্তধন থাকতে পারে। "আমি যাব আর আধ ঘণ্টায় দেখে ঘুরে আসব," বলল ডেভিড।

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে, এইসব দ্বীপে বড় জানোয়ার না থাকলেও বিষাক্ত সাপ, বিছে ইত্যাদি থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি। কাজেই তার পক্ষে এ ঝুঁকি নেওয়ার কোন মানে হয় না। ডেভিড তবুও মানতে চায় না; বলে, ক্যালেনবাখের পিস্তল আছে, সেটা সে সঙ্গে নিয়ে নেবে; তাছাড়া রকেট আছে, সুতরাং ভয়ের কোনো কারণ নেই।

এই নির্বোধ বালকের ছেলেমানুষী গোঁ কীভাবে নিরস্ত করা যায় ভাবছি, এমন সময় শুনি—"নো—নো নো নো নো!"

সুমা বেরিয়ে এসেছে তার ক্যাম্প থেকে মাথা নাড়তে নাড়তে।

"নো—নো নো নো নো!"

কী ব্যাপার? হাসি হাসি মুখের সঙ্গে এমন দৃঢ় নিষেধাজ্ঞা বেশ মজার লাগছিল। সুমা হাত থেকে একটা ছোট যন্ত্রজাতীয় জিনিস বালির ওপর নামিয়ে রেখে বলল, "দেয়ার ইজ সামথিং
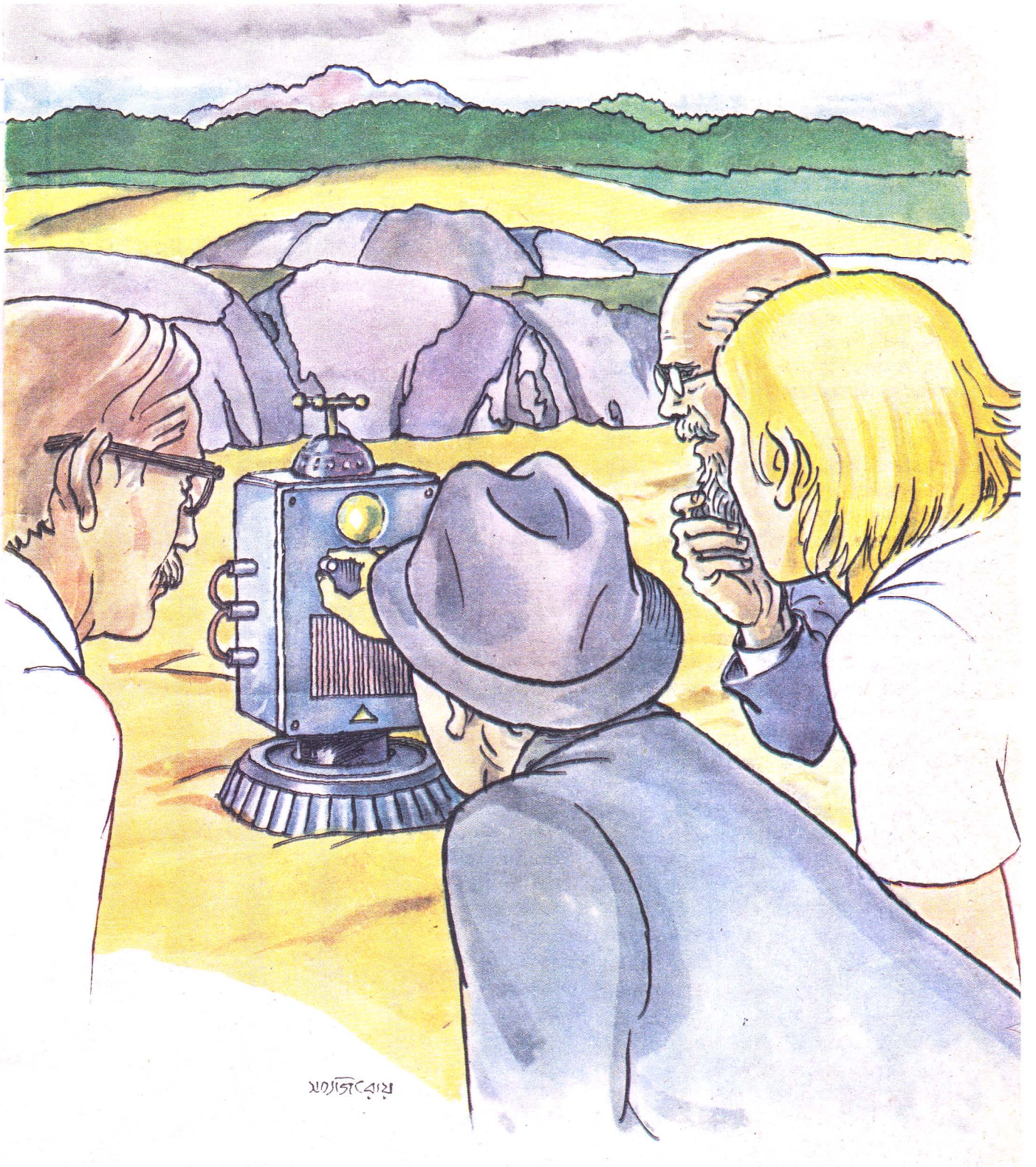
বিগ হিয়ার। সাম লিভিং থিং। ফাইভ পয়েন্ট সেভেন কিলোমিটার ফ্রম হিয়ার—ওই দিকে।"

সুমা হাত দিয়ে দূরে টিলাগুলোর দিকে দেখিয়ে দিল। তারপর তার তৈরি আশ্চর্য যন্ত্রটা দেখাল। নাম দিয়েছে টেলিকার্ডিওস্কোপ। এই যন্ত্রের সাহায্যে বহুদূরের প্রাণীর হৃৎস্পন্দন শুনতে পাওয়া যায়। এর দৌড় দশ কিলোমিটার পর্যন্ত। প্রাণী ঠিক কোনদিকে কতদূরে আছে সেটা যন্ত্রের রিসিভারের মুখ আর সেই সঙ্গে একটি নব্ ঘুরিয়ে বোঝা যায়। দিক এবং দূরত্ব মিলে যাওয়ামাত্র যন্ত্রের মধ্যে শুরু হয় হৃৎস্পন্দনের শব্দ, আর তার সঙ্গে তাল রেখে জ্বলতে নিভতে থাকে একটা রঙীন বাতি। দশ কিলোমিটারে বাতির রঙ হয় গাঢ় বেগুনী। প্রাণী কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে রং রামধনুর নিয়ম মেনে নীল সবুজ হলদে কমলা ইত্যাদি অতিক্রম করে, যখন প্রাণী এক কিলোমিটার দূরত্বে এসে পড়ে তখন লাল হয়ে জ্বলতে থাকে।

সেই সঙ্গে অবিশ্যি হৃৎস্পন্দনের শব্দও বেড়ে যায়। প্রাণী এক কিলোমিটারের বেশি কাছে এসে পড়লে আর এ যন্ত্রে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না।

"একই জায়গায় রয়েছে প্রাণীটা," বলল সুমা। "অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইট ইজ কোয়াইট বিগ।"

"বিগ মানে? কত বড়?" আমি জিগ্যেস করলাম।

"মানুষের চেয়ে বড় বলেই মনে হয়। প্রাণীর আয়তন যত বড় হয় তার হৃৎস্পন্দন তত ঢিমে হয়। একজন সাধারণ মানুষের হার্টবীট মিনিটে সত্তরের মতো। এর দেখছি পঞ্চাশের একটু ওপরে।"

"কচ্ছপ হতে পারে কি?" আমি জিগ্যেস করলাম। এসব অঞ্চলে কচ্ছপ থাকা অস্বাভাবিক নয়। আর অন্য যা বড় জানোয়ার থাকতে পারে, যেমন হরিণ বা বাঁদর, তার হৃৎস্পন্দনের রেট মানুষের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত।

"যে ভাবে এক জায়গায় চুপ করে পড়ে আছে, তাতে কচ্ছপ হতে পারে," বলল সুমা। "কিন্তু সমুদ্র থেকে এত দূরে দ্বীপের মাঝখানে গিয়ে সে-কচ্ছপ কী করছে সেটা একটা প্রশ্ন বটে।"

সণ্ডার্স অবিশ্যি কচ্ছপের কথাটা উড়িয়েই দিল। তার বিশ্বাস এটা অন্য কোনো প্রাণী, এবং হয়ত দ্বীপের একমাত্র বড় প্রাণী। সুতরাং এ অবস্থায় ডেভিডকে কখনই একা বেরোতে দেওয়া চলে না।

আমরা আরো মিনিটখানেক এই শব্দ আর আলোর খেলা দেখার পর সুমা সুইচ টিপে যন্ত্রটা বন্ধ করে দিল। আমি সুমার কৃতিত্বের তারিফ না করে পারলাম না। গ্রেট ডেনের মতো কুকুর মানুষের অনেক আগেই বুঝতে পারে কাছাকাছির মধ্যে অন্য কোন প্রাণী আছে কিনা; কিন্তু এই যন্ত্রের কাছে রকেটও শিশু।

আমরা সকলেই বেরিয়ে পড়ার জন্য তৈরি, সমস্যা কেবল বিল ক্যালেনবাখকে নিয়ে। তার নিজের সঙ্গে আনা নানারকম ওষুধ খেয়েও কোনো ফল হয়নি। ফিরে এসে ওকে একটা মিরাকিউরলের বড়ি খাইয়ে দেব। আমার তৈরি এই ওষুধে এক সর্দি ছাড়া সব অসুখই একদিনের মধ্যে সেরে যায়। এখন বেচারা বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে। কারণ দ্বীপে প্রাণী আছে জেনে ওর মনে আশার সঞ্চার হয়েছে হয়ত টেলিভিশন ক্যামেরাটা একেবারে মাঠে মারা যাবে না। সুমা আজও ক্যাম্পেই থাকবে। আর ঘন্টাখানেক কাজ করলেই নাকি ওর খুদে ল্যাবরেটরিটা তৈরি হয়ে যাবে।

আমরা তিনজন রকেটকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কাছাকাছির মধ্যে কোনো জানোয়ার এসে পড়লে রকেটই জানান দিয়ে দেবে, আর জানোয়ার যতক্ষণ না কাছে আসছে ততক্ষণ ভয়ের কোনো কারণ নেই।

আমাদের লক্ষ্য কিন্তু দ্বীপের মাঝখানের ওই টিলাগুলো নয়। ও অঞ্চলে গাছপালা বিশেষ আছে বলে মনে হয় না। আজ আমরা দ্বীপের পুব দিকটা ঘুরে দেখব। সমুদ্রের উপকূল ধরে এগিয়ে গিয়ে গাছপালা বাড়তে শুরু করলেই উপকূল ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকব। আমাদের তিন-জনের সঙ্গেই অস্ত্র রয়েছে। সণ্ডার্সের কাঁধে তার জার্মান মানলিখার রাইফল, ডেভিডের পকেটে ক্যালেনবাখের বেরেটা অটোম্যাটিক, আর আমার ভেস্টপকেটে অ্যানাইহিলিন বা নিশ্চিহ্নাস্ত্র। ক্যালেনবাখকে আমার এই যন্ত্রের কথা বলতে সে শাসিয়ে রেখেছে যে, ও সঙ্গে থাকলে যে কোনো জানোয়ারই আসুক না কেন, আমার অস্ত্রটি ব্যবহার করা চলবে না, কারণ যে-জিনিস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তার ছবি তোলা যাবে না।

হাঁটতে হাঁটতে ঠিক হল যে, কেউ যদি দল ছেড়ে একটু এদিক-ওদিক যেতে চায়, তাহলে তাকে ঘন-ঘন ডাক ছেড়ে সে কত দূরে আর কোনদিকে আছে সেটা জানিয়ে দিতে হবে। দল ছেড়ে বেশিদূর যাওয়া অবশ্যই চলবে না। নিয়মটা অবিশ্যি ডেভিডের জন্যই, কারণ বেশ বুঝতে পারছি যে তার স্বাভাবিক উদাস, অলস ভাবটা কেটে গিয়ে তার জায়গায় একটা ছটফটে ভাব দেখা দিয়েছে। এখন যেরকম জায়গা দিয়ে চলেছি তাতে কিছুটা দূরে সরে গেলেও চোখের আড়াল হবার উপায় নেই। কারণ বড় টিলা বা বড় গাছ জাতীয় কিছুই নেই কাছাকাছির মধ্যে।

একটা কথা মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছে—সুমার যন্ত্র কেবল একটিমাত্র প্রাণীর কথা বলল; আরো প্রাণী আছে কি? যদি থাকে তারা কি সব দশ কিলোমিটারের বেশি দূরে রয়েছে? বোধহয় না, কারণ আমার বিশ্বাস দ্বীপের আয়তন দৈর্ঘ্যে বা প্রস্থে দশ কিলোমিটারও নয়। দিন সাতেক ঘুরলেই এখানে যা কিছু দেখার সবই দেখা হয়ে যাবে।

উপকূল ধরে মাইলখানেক হাঁটার পর দৃশ্য পরিবর্তন হল। এবার সমুদ্রের ধার ছেড়ে দ্বীপের অভ্যন্তরে ঢুকতে হবে। এখানে আমাদের বাঁয়ে—অর্থাৎ সমুদ্রের উলটো দিকে—প্রথমে বেঁটে পামগাছের জঙ্গল; তারপর ক্রমে সে জঙ্গল আরো ঘন হয়ে গিয়েছে। সেখানে কলা, পেঁপে, নারকোল ইত্যাদি গাছের পাশাপাশি আরো বড় গাছও রয়েছে। এদিকটায় পাথর আর নেই, আর পায়ের নীচে বালির বদলে রয়েছে ঘাস আর আগাছা।

রকেট সমেত আমরা তিনজনে ঢুকলাম জঙ্গলের ভিতর। যেটা সত্যিই অবাক করে দিচ্ছে সেটা হল পাখির ডাকের অভাব। এমন নিস্তব্ধ বন—বিশেষ করে পৃথিবীর এই অংশে, যেখানে কাকাতুয়াই পাওয়া যায় অন্তত আট-দশ রকমের—আমি আর দেখিনি। তাছাড়া এসব জঙ্গলে ঘাসের মধ্যে দিয়ে সরীসৃপের চলাফেরারও একটা শব্দ প্রায়ই পাওয়া যায়, সেটা এখানে নেই। এ যেন এক অভিশপ্ত বন। গাছগুলো যে বেঁচে আছে, তাও হয়ত আর বেশিদিন থাকবে না।

আরো মিনিট দশেক হাঁটার পর জঙ্গলটা একটু পাতলা হল, আর তার কিছু পরেই একটা খোলা জায়গায় এসে আমাদের চারজনকেই থমকে থেমে যেতে হল। ডেভিড এগিয়ে ছিল, সে-ই

প্রথমে একটা ভয় ও বিস্ময় মেশানো শব্দ করে থেমে গেল। আমরা এগিয়ে গিয়ে যা দেখলাম তা এই—

জঙ্গলের মাঝখানে খোলা অংশটায় বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে জানোয়ারের হাড়, খুলি আর পাঁজরার অংশ। তার মধ্যে বেশ কষ্ট করে চিনতে পারা গেল দুটো হরিণ, গোটা চারেক গিরগিটি জাতীয় বড় সরীসৃপ—সম্ভবত ইগুয়ানা—আর বেশ কয়েক রকমের বাঁদর। হাড়গুলো যে বহুকালের পুরনো সেটা তাদের অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়।

তার মানে এ দ্বীপে এককালে জানোয়ার ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। এরা লোপ পেল কী করে সেটা জানার মতো তথ্য এখনো আমাদের হাতে নেই।

ডেভিড কিছুক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকার পর তার মুখ দিয়ে কথা বেরোল।

"দ্যার্ট মনস্টার! —ওই রাক্ষসই খেয়ে ফেলেছে এই সব জন্তু জানোয়ার।"

বুঝতে পারলাম, সুমার যন্ত্রে এই কিছুক্ষণ আগেই যে প্রাণীর হার্টবীট শোনা গেছে, ডেভিডের কল্পনায় এরই মধ্যে সেটা হয়ে গেছে রাক্ষস! অবিশ্যি এগুলো যে কেউ খেয়েছে সেটা ভাববার সময় এখনো আসেনি; স্বাভাবিক মৃত্যুও হতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর জানোয়ার সব এক জায়গায় এসে মরবে কেন?

আমরা এগিয়ে চললাম।

সামনে একটা মেহগনি গাছের বন, তার মধ্যে কিছু সীডার গাছও রয়েছে, আর আশে-পাশে ছড়িয়ে আছে জুঁই আর জবা জাতীয় ফুল গাছ, আর বুগেনভিলিয়া গাছ। মেহগনি গাছ আমি অনেক দেখেছি, কিন্তু এখানে এক একটার গুঁড়িতে একটা উজ্জ্বল নীলের ছোপ দেখছি যেটা আগে কখনো দেখিনি।

আরো কাছে যেতে বুঝলাম রঙের কারণ। রঙটা গাছের নয়, গাছের গায়ে মৌমাছির চাকের মতো লেগে থাকা অজস্র ছোট ছোট ফলের মতো জিনিসের। আর সেই সঙ্গে গন্ধের কথাটাও বলা দরকার। এক অনির্বচনীয় সৌরভ ছেয়ে আছে বনের এই অংশটায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য এই উদ্ভিদের আশ্চর্য রঙ ও গন্ধ আমাদের তিনজনকেই অনড় অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে দিল। মোহ কাটলে পর ছেলেমানুষ ডেভিড উল্লাসে দৌড়ে গিয়ে ফলে হাত দিতে যাচ্ছিল,
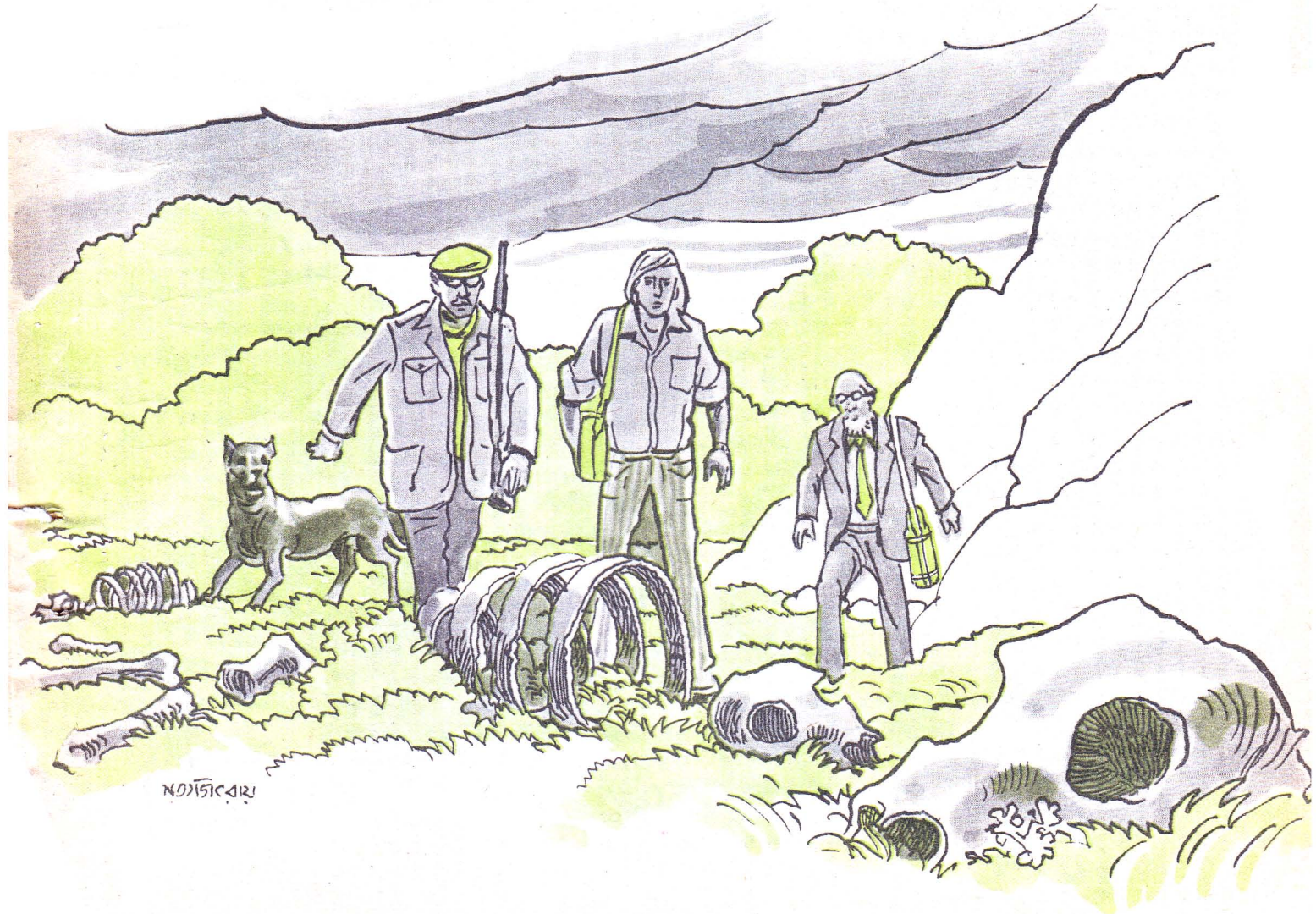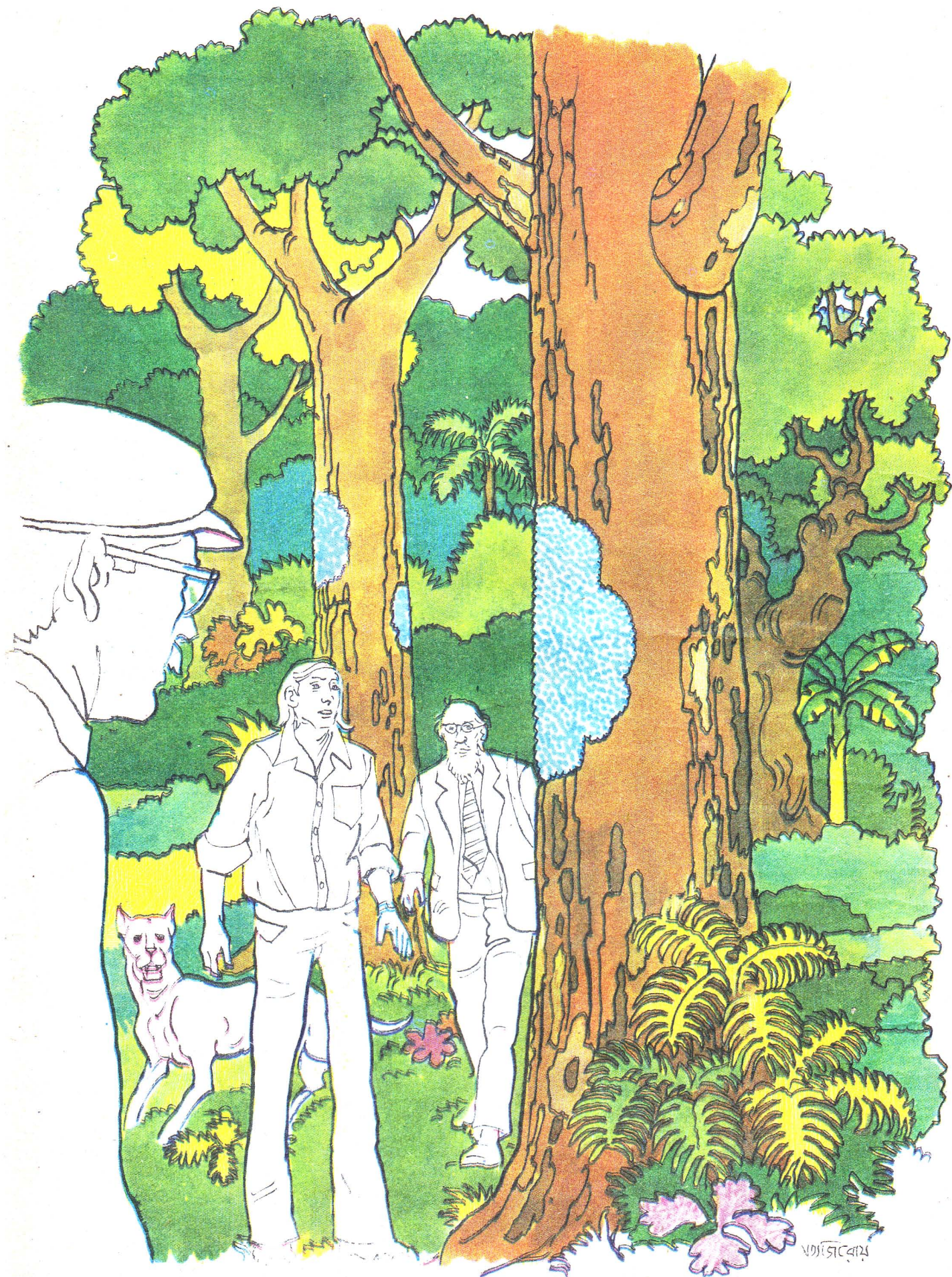
আমি আর সণ্ডার্স তাকে ধমক দিয়ে নিরস্ত করলাম। তারপর সণ্ডার্স রবারের দস্তানা পরে গাছের গায়ে হাত বুলোতেই ফলগুলো ঝরঝর করে আলগা হয়ে মাটিতে পড়তে লাগল। আমরা প্লাস্টিকের ব্যাগে প্রায় শ'খানেক ফল ভরে নিয়ে ফিরতি পথ ধরলাম। সুমাকে দিয়ে অবিলম্বে এই ফলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করানো দরকার। এ জিনিস এর আগে আমরা কখনো দেখিনি। আমার মন বলছে এই ফলই মানরোর চিঠির সেই আশ্চর্য উদ্ভিদ। পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ সেটা বোঝাই যাচ্ছে ; মেহগনির গাছ থেকে রস টেনে নিয়ে এই উদ্ভিদ জীবন ধারণ করে।

সুমার মিনিয়েচার ল্যাবরেটরি তৈরি, সে এর মধ্যেই নীল ডুমুরের রাসায়নিক বিশ্লেষণ শুরু করে দিয়েছে। এটা জানতে পেরেছি যে, এই ফল হাতে ধরলে কোনো ক্ষতি নেই। ক্যালেন-বাখের তাঁবুতে গিয়ে তাকে একটা ফল দেখিয়ে এসেছি। সে সেটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশের টেবিলে রেখে দিল। বুঝতে পারছি এই ফল আবিষ্কারের বিশেষ মুহূর্তটি সে টেলিভিশনে তুলে রাখতে পারেনি বলে তার আপশোস। আমি তাকে একটা মিরাকিউরলের বড়ি দিয়ে এসেছি। তাকে যে করে হোক চাঙা করে তুলতেই হবে। নিজের দেশের ওষুধ ছাড়া কিছুই খেতে চায় না ক্যালেনবাখ, কিন্তু এখন বেগতিকে পড়ে রাজি হয়েছে।

১৩ই মার্চ, রাত ন'টা

বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছে যে আমাদের অভিযান বিফল হবে না। এর পরিণতি কী হবে অনুমান করা অসম্ভব, কিন্তু যেভাবে ঘটনার মোড় ঘুরছে তাতে মনে হয় কিছু চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা দেশে ফিরতে পারব।

আজ লাঞ্চে ক্যালেনবাখকে শুধু একটু চিকেন সুপ খেতে দিলাম। তার নাড়ী বেশ দুর্বল। এই দু-দিনের অসুখেই তার চেহারা দেখলে রীতিমত ভাবনা হয়। অথচ এই অবস্থাতেও সে জানতে চাইল সেই প্রাণীটার কথা। তার দেখা পেয়েছি কি আমরা? সে প্রাণী কি আরো এগিয়ে এসেছে, না যেখানে ছিল সেখানেই আছে?

টেলিকার্ডিওস্কোপ যন্ত্র অবশ্যি আপাতত বন্ধই আছে। সুমা এখন একাগ্র মনে চালিয়ে যাচ্ছে ওই ফলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ। তার কাজ যে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে মাঝে মাঝে তার হুঙ্কার থেকে। আমি আর সণ্ডার্স উদগ্রীব হয়ে দেখছি সুমার গবেষণা। যে প্রক্রিয়াটা চোখের সামনে ঘটছে সেটা আমাদের অজানা নয়। এই ফলে যে ক্রমে ক্রমে সমস্তরকম ভিটামিনের অস্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে সেটা দেখতেই পাচ্ছি। মানরোর যুগে ভিটামিন কথাটাই তৈরি হয়নি। বিজ্ঞান তখন শিশু, আর খাদ্যদ্রব্যের চর্চা শুরু হতে তখনো আড়াইশো বছর দেরি।

সাড়ে তিনটের সময় চেয়ার ছেড়ে উঠে সুমা কেবল দুটি কথাই বলল। প্রথমে বলল "অ্যামেজিং", আর তার পরে তার পকেটের রুমালটাকে সিকি ইঞ্চি ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল "অ্যাণ্ড মিসটিরিয়াস"।

ইতিমধ্যে ক্যালেনবাখ যে কখন তার বিছানা ছেড়ে উঠে আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা বুঝতেই পারিনি। তার দিকে চোখ পড়তে সে হাত বাড়িয়ে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে আমার হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "গ্রেট! তোমার ওষুধের কোনো তুলনা নেই। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ!"

"সে কী? এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই?"

"দেখতেই তো পাচ্ছ," হেসে বলল বিল ক্যালেনবাখ।

আমার ওষুধ যে এমন অসম্ভব দ্রুত গতিতে অসুখ সারাতে পারে সেটা আমি নিজেও জানতাম না।

"আর এই নাও—এটা আমার টেবিলের উপর ছিল।"

"সে কী! এ যে আমারই ওষুধের বড়ি!"

রহস্য সমাধান হতে সময় লাগল না। জ্বরের ঘোরে আমার বড়ি না-খেয়ে ক্যালেনবাখ খেয়েছে টেবিলে রাখা সেই নীল ফলটি। আর তাতেই এই আশ্চর্য আরোগ্য লাভ। আর ফলের গুণ যে শুধু আরোগ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে তা নয় ; ক্যালেনবাখের চাহনিতে এই দীপ্তি এর আগে কখনো দেখিনি। সণ্ডার্স সুমাকে বলল, "তোমার গবেষণার আর কোনো প্রয়োজন নেই ; এখন এই ফল যত পারা যায় সঙ্গে নিয়ে চলো দেশে ফিরে যাই। এর চাষ করে আমরা সব ডাক্তারি কোম্পানিকে ফেল করিয়ে দেব!"

কথাটা সণ্ডার্স রসিকতা করে বললেও সুমা জবাব দিল অত্যন্ত গম্ভীরভাবে। সে বলল যে তাকে এখনো গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে। অন্তত আরো একটা দিন। ভিটামিনের বাইরেও আরো অনেক কিছু রয়েছে এই ফলের মধ্যে, যেগুলোর নাগাল ও এখনো পায়নি।

ক্যালেনবাখের পীড়াপীড়িতেই সুমাকে তার কাজ বন্ধ করে একবার টেলিকার্ডিওস্কোপটা চালু করতে হল। দেখা গেল প্রাণীটা ঠিক যেখানে ছিল সেখানেই আছে। "বাট হিজ হার্টবীট ইজ স্লোয়ার," বলল সুমা।

সে তো শব্দ শুনেই বুঝতে পারছি। কাল ছিল পঞ্চাশ, আর আজ চল্লিশের নীচে।

"সর্বনাশ!" বলে উঠল ক্যালেনবাখ। "এ কি মরে যাবে নাকি? এমন একটা প্রাণী এই দ্বীপে থাকতে তোমরা ওই ফলের পিছনে সময় নষ্ট করছ?"

"ফল তো পেয়েই গেছি, বিল," বলল সণ্ডার্স। "আমরা কালই দ্বীপের মাঝের অংশটার

দিকে যাব। তুমি অসহিষ্ণু হয়ো না।”

ক্যালেনবাখ তাও গজগজ করতে করতে তার ক্যাম্পের দিকে চলে গেল।

১৪ই মার্চ

আজ আর আমাদের বেরনো হল না। সারাদিন ঝড়-বৃষ্টি বজ্রপাত। ক্যালেনবাখ অগত্যা তার ক্যামেরা দিয়ে আমাদেরই ছবি তুলল, আর টেপ রেকর্ডারের সাহায্যে আমাদের সকলের ইণ্টারভিউ নিল।

দুপুরে লাঞ্চের পর ডেভিড আমাদের সকলকে জলদস্যুদের গল্প শোনাল। সত্যি, ছেলেটার আশ্চর্য স্টক আছে এই সব গল্পের।

একটা দুঃসংবাদ এই যে, সুমা বলল ফলে ভিটামিন ছাড়া আর যাই থাক না কেন, সেটা এই খুদে ল্যাবরেটরিতে বিশ্লেষণ করে বার করা সম্ভব না। সে কাজটা দেশে ফিরে গিয়ে বড় ল্যাবরেটরিতে করতে হবে। অবিশ্যি আমাদের এখানে আসার পিছনে যে প্রধান উদ্দেশ্য সে তো সফলই হয়েছে। কাজেই দেশে ফিরে যেতেও আর বেশি দিন বাকি নেই। আপাতত সুমা আমাদের এই ফল খেতে বিশেষ করে বারণ করে দিয়েছে। একটা ফলেই যদি ক্যালেনবাখের কঠিন ব্যারাম এক ঘণ্টার মধ্যে সারতে পারে তাহলে এই ফলের তেজ যে কীরকম সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। সুমার মতে, এই ফল খেলে উপকারের সঙ্গে অনিষ্টও হওয়া কিছুই আশ্চর্য না। বিস্ময়কর রকম ক্ষুধাবৃদ্ধিটা অপকার কিনা জানি না, কিন্তু ক্যালেনবাখ আজ লাঞ্চে একাই তিন টিন হ্যাম খেয়ে ফেলেছে।

১৫ই মার্চ, সকাল সাতটা

দুঃসংবাদ।

ক্যালেনবাখ একা বেরিয়ে পড়েছে কাউকে কিছু না বলে।

ডেভিড মানরোই খবরটা দিল আমাদের। সে আর ক্যালেনবাখ একই তাঁবুতে রয়েছে, অন্য দুটোর একটাতে আমি আর সণ্ডার্স, আর একটাতে তার যন্ত্রপাতি সমেত সুমা। ডেভিড সাড়ে ছটায় ঘুম ভেঙে দেখে ক্যালেনবাখের বিছানা খালি, এবং টেবিলের উপর তার ক্যামেরার যে সরঞ্জাম ছিল সেগুলোও নেই। তৎক্ষণাৎ তাঁবুর বাইরে এসে ডেভিড বার কয়েক ক্যালেনবাখের নাম ধরে ডাক দেয়। কিন্তু কোনো সাড়া পায় না। অবশেষে তার কুকুর রকেটের সাহায্য নেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্যালেনবাখের বালিশের পাশে পড়ে থাকা রুমালটা নিয়ে রকেটকে শোঁকায়। যখন দেখে যে রকেট সেই দূরের টিলাগুলোর দিকে ধাওয়া করেছে, তখন আবার তাকে ডেকে ফিরিয়ে আনে।

সুমা সারারাত কাজ করে সকালের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল; তাকে তুলে খবরটা দেওয়া হয়। সে তৎক্ষণাৎ তার টেলিকার্ডিওস্কোপ চালু করে হলদে বাতির স্পন্দন দেখিয়ে প্রমাণ করে দিল যে, ক্যালেনবাখ ক্যাম্প থেকে তিন কিলোমিটার দূরে রয়েছে এবং ওই টিলাগুলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

আমরা আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রওনা দেব। আজ দিন ভালো। আজ চার জনেই যাব। সন্ডার্সের আক্ষেপের শেষ নেই; বার-বার বলছে, "কী কুক্ষণেই না বেপরোয়া লোকটাকে সঙ্গে এনেছিলাম।"

১৫ই মার্চ, বিকেল সাড়ে পাঁচটা

একসঙ্গে এতগুলো চমকপ্রদ ঘটনার সমাবেশে মাথার মধ্যেটা কেমন যেন সব ওলট-পালট হয়ে যায়।

আমরা এখন দ্বীপের মধ্যিখানের সেই প্রস্তরময় টিলা অঞ্চল থেকে পূবে প্রায় দু-কিলোমিটার এসে সমুদ্রের ধারে বালির উপর বসেছি। সন্ডার্স তার খাতায় নোট লিখছে। লন্ডনের তিনটে দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে সে চুক্তি-বন্ধ আমাদের এই অভিযান সম্পর্কে লেখার জন্য। এখানে এসে এই প্রথম সে খাতা খুলল।

ক্যালেনবাখকে পাওয়া যায়নি; শুধু পাওয়া গেছে তার ক্যামেরার বাক্স আর টেপ রেকর্ডার। দুটোরই অবস্থা বেশ শোচনীয়। মুভী ক্যামেরাটা তার কোমরে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা থাকে সে যদি সেই অজ্ঞাত প্রাণীর কবলে পড়ে থাকে তাহলে ক্যামেরা সমেতই পড়েছে।

ডেভিড সুমার কাছ থেকে তার জাপানী মিকিকি রিভলভারটা চেয়ে নিয়ে পঞ্চাশ গজ দূরে একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর নুড়ি পাথর রেখে তার টিপ পরীক্ষা করে চলেছে। রকম দেখে মনে হচ্ছে আর দিন তিনেক অভ্যাস করলেই তার নিশানা জবরদস্ত চেহারা নেবে।

সুমা সমুদ্রতটে পায়চারি করছে। গুনে গুনে চল্লিশ পা এদিকে চল্লিশ পা ওদিকে। আট ঘণ্টা ভ্রমণের পরও তার কাপড়ে একটি ভাঁজ পড়েনি, মাথার একটি চুলও এদিক ওদিক হয়নি।

তার কাঁধ থেকে যে চামড়ার ব্যাগটা ঝুলছে, তাতে রয়েছে তারই তৈরি এক আশ্চর্য অস্ত্র। এর নাম সুমাগান। লম্বায় এক হাত, ঘোড়ার বদলে রয়েছে একটা বোতাম, যেটা টিপলে গুলির বদলে বেরিয়ে আসে ছুঁচ লাগানো একটা ক্যাপসুল, যার ভিতরে রয়েছে সুমারই তৈরি এক মারাত্মক বিষ। এই ক্যাপসুল যে-কোনো প্রাণীর যে-কোনো অংশে প্রবেশ করলে তিন সেকেন্ডের মধ্যে মৃত্যু।

এবারে আমাদের আশ্চর্য আবিষ্কারগুলোর কথা বলি। প্রথম আবিষ্কার হল এই যে এ-দ্বীপে যে ব্র্যান্ডন ও মানরো ছাড়া আরো মানুষ ছিল তার প্রমাণ পেয়েছি একটা গুহার মধ্যে ছড়ানো কিছু কঙ্কাল, আর বেশ কিছু গেলাস, বোতল, ছুরি, কানের মাকড়ি ইত্যাদি ধাতুর ও কাঁচের জিনিস থেকে। মনে হয় ব্র্যান্ডনের জাহাজের সবাই এখানে এসে আস্তানা গেড়ে-ছিল। জলদস্যুরা যে ধরনের তলোয়ার বা "কাটল্যাস" ব্যবহার করত, সে রকম কাটল্যাস পেয়েছি বাইশটা। দুঃখের বিষয় কোনো সিন্দুক পাওয়া যায়নি। তবে এ রকম গুহা এ-দিকটায় অনেক আছে; তার কোনটার মধ্যে কী রয়েছে কে জানে!

আমরা গুহা থেকে বেরিয়ে এসে মিনিট-দশেক পরিভ্রমণের পরেই রকেটের গর্জন শুনে এক জায়গায় গিয়ে দেখি ক্যালেনবাখের ক্যামেরার বাক্স আর টেপ রেকর্ডার পড়ে আছে। মনে হয় ও জিনিস-দুটোকে ফেলে হাল্কা হয়ে পালাতে চেষ্টা করেছিল। তারপরে সে রক্ষা পেয়েছে কিনা সেটা অবিশ্যি জানা যায়নি। ওখানে থাকতেই সুমাকে বলে টেলিকার্ডিওস্কোপ চালু করেছিলাম। ফলাফল যা পাওয়া গেল তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। আমাদের চেনা প্রাণী ছাড়া আর কোনো প্রাণীর হৃৎস্পন্দন পাওয়া যায়নি রিসীভারের মুখ চারিদিকে ঘুরিয়েও। এক যদি ক্যালেনবাখ এক কিলোমিটারের মধ্যে থেকে থাকে তাহলে আলাদা কথা; কিন্তু সেখানে থেকে সে করছেটা কী? সে কি জখম হয়ে পড়ে আছে? তার কাছে পিস্তল আছে তার একটা ফাঁকা আওয়াজ করেও তো সে তার অস্তিত্বটা জানিয়ে দিতে পারে। প্রাণীটার হৃৎস্পন্দনের গতি আবার পঞ্চাশে ফিরে গেছে। আলোর রঙ হলদে আর সবুজের মাঝামাঝি; অর্থাৎ প্রাণীটা রয়েছে এখান থেকে তিন কিলোমিটারের কিছু বেশি দূরে।

ক্যালেনবাখের জিনিস দুটো নিয়ে আমরা এখানে চলে আসি বিশ্রাম আর কফির জন্য। এখানে এসেই সুমা প্রথমে যে জিনিসটা করল সেটা হল ক্যালেনবাখের তোবড়ানো টেপ রেকর্ডারটাকে বালির উপর রেখে সেটাকে চালু করা। দিব্যি চলল। জাপানী জিনিস বলেই বোধ হয় সুমার মুখে আত্মতৃপ্তির হাসি। আমরা যন্ত্রটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বিকেলের পড়ন্ত রোদে ক্যালেনবাখের গলা শুনলাম।

> "দিস ইজ বিল ক্যালেনবাখ। ১৪ই মার্চ, সকাল আটটা দশ। আমার একক অভিযান সার্থক হয়েছে। আমি এইমাত্র প্রাণীটির দেখা পেয়েছি। আমার সামনে আন্দাজ পঞ্চাশ গজ দূরের গুহাটা থেকে সে বাইরে এসেছিল। মানুষের চেয়ে বড়। মনে হয় চতুষ্পদ। যদিও মাঝে মাঝে দু পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখে। আমি গাছের আড়ালে থাকায় আমাকে দেখতে পায়নি। ক্যামেরায় টেলিফোটো লেন্স লাগানোর আগেই প্রাণীটা আবার গুহায় ফিরে যায়।

দূর থেকে দেখে তেমন ভয়াবহ কোনো জানোয়ার বলে মনে হল না। হাঁটার গতি দেখে মনে হচ্ছিল অসুস্থ, কিম্বা জরাগ্রস্ত। আমি খুব সন্তর্পণে গুহার দিকে এগোচ্ছি।"

এইখানেই বক্তব্য শেষ।

এবার আমাদের ফেরার সময় হয়েছে। কাল কী আছে কপালে কে জানে!

১৬ই মার্চ, সকাল সাড়ে ছ'টা

ভয়াবহ অভিজ্ঞতা।

কাল রাত আড়াইটায় রকেটের মুহুর্মুহু গর্জন আর সেই সঙ্গে ডেভিডের চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায়। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি রকেট উত্তর দিকে মুখ করে গর্জন করে চলেছে এবং সেই সঙ্গে ডেভিডের হাতে ধরা লাগামে প্রচণ্ড টান দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে। অমাবস্যার রাত, তার উপর আকাশে মেঘ, কাজেই রকেটের এই অস্থিরতার কারণ জানা গেল না। সণ্ডার্স তাঁবুতে ঢুকেছিল টর্চ আনতে কিন্তু তার আগেই রকেট ডেভিডকে টান মেরে বালির উপর ফেলে দিয়ে অন্ধকারে ছুট লাগাল উত্তর দিক লক্ষ করে। সুমা ইতিমধ্যে টেলিকার্ডিও-স্কোপ চালু করেছে, কিন্তু তাতে কোন ফল পাওয়া গেল না। সে প্রাণী যদি এসে থাকে তো এক কিলোমিটারের মধ্যেই রয়েছে।

কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ, টর্চ ফেলেও কিছু দেখা যাচ্ছে না, কারণ, একটি ছোট টিলার পিছনে রকেট অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমাদেরও এগিয়ে গিয়ে অনুসন্ধান করা উচিত কিনা ভাবছি এমন সময় রকেটের চিৎকারে আমাদের রক্ত হিম হয়ে গেল। এ চিৎকার আস্ফালন বা আক্রোশ নয়। এ হল আর্তনাদ।

এবার টর্চের আলোয় দেখা গেল রকেট ফিরে আসছে। ডেভিড ছুটে এগিয়ে গেল তার প্রিয় কুকুরের দিকে। আমরাও ছুটলাম তার পিছু পিছু। গিয়ে দেখি আর্তনাদের কারণ স্পষ্ট; রকেটের পিঠে গভীর ক্ষতচিহ্ন থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও জানা গেল যে, প্রাণীটি শুধু জখম করেননি, নিজেও জখম হয়েছেন; রকেটের মুখে লেগে রয়েছে তার রক্ত।

রকেটের ক্ষতে যে ওষুধ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে সে কালকের মধ্যেই সেরে উঠবে।

রকেটের মুখের রক্ত পরীক্ষা করে সুমা জানিয়েছে রক্তের গ্রুপ হল 'এ'। 'এ' গ্রুপের রক্ত যেমন মানুষের হয়, তেমনি অনেক শ্রেণীর বাঁদরেরও হয়। প্রাণীটি যে বানর শ্রেণীর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আধ ঘন্টা আগে গিয়ে তার পায়ের ছাপ দেখে এসেছি বালির উপর, আমাদের ক্যাম্প থেকে পঞ্চাশ গজ উত্তরে। পায়ের ছাপের সামনে রয়েছে মুঠো করা হাতের

ছাপ। পায়ে পাঁচটা আঙুল, সাইজে মানুষের পায়ের চেয়ে সামান্য বড়।

আজকের অভিযানে এই হিংস্র জীবটির সঙ্গে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। যে দ্বীপে এই অমৃতসদৃশ ফল, সেই একই দ্বীপে এই রাক্ষুসে বানরের বিভীষিকাময় কার্যকলাপ আমাদের সকলেরই মনে বিস্ময় ও আতঙ্কের সঞ্চার করেছে।

১৭ই মার্চ, রাত ন'টা

কাল সকালে আমরা ফিরে যাচ্ছি। মনের অবস্থা বর্ণনা করে লাভ নেই। কারণ, এ ধরনের অভিজ্ঞতার পরে সুখ-দুঃখ বিস্ময় ইত্যাদি মামুলি শব্দ ব্যবহার করে সে বর্ণনা সম্ভব নয়। আসলে এটা আমি লক্ষ করেছি যে আমার কোনো অভিযানই সম্পূর্ণ সফল বা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় না ; যেমন চমকপ্রদ লাভও হয়, তেমনি আবার অপূরণীয় ক্ষতিও হয়। এবারের অভিযান সম্পর্কে একটাই সত্যি কথা বলা যায় যে, আমার জীবনের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, জ্ঞানের ভাণ্ডার, বিস্ময়ের ভাণ্ডার—এ সবই আরো পরিপূর্ণ হয়েছে।

কাল যেখানে ক্যালেনবাখের ক্যামেরার ব্যাগ আর টেপ রেকর্ডার পাওয়া গিয়েছিল, আজ সেখানে ফিরে গিয়ে সুমা টেলিকার্ডিও-স্কোপ চালু করে দিল। আজও কেবল একটি-মাত্র প্রাণীরই হৃৎস্পন্দন পাওয়া গেল যন্ত্রে। স্পন্দনের রেট মিনিটে পঞ্চাশ, আর বাতির রঙ কমলা। প্রাণী আমাদের পশ্চিমদিকে দুই পয়েন্ট চার কিলোমিটার দূরে রয়েছে। কিন্তু সে এক জায়গায় থেমে নেই, কারণ সুমাকে বার বার রিসীভারের মুখ ঘোরাতে হচ্ছে। প্রাণীটা যে দ্রুতগামী নয় সেটা ক্যালেনবাখের বর্ণনা থেকেই আমরা জেনেছি, সুতরাং সে যদি আমাদের দিকে আসেও, অন্তত আধ ঘণ্টা সময় আমাদের হাতে আছে আরেকটু ঘুরে দেখার জন্য। ক্যালেনবাখ যে মরে গেছে একথা এখনো কিছুতেই বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। হয়ত সে কোথাও গুরুতরভাবে জখম হয়ে পড়ে আছে, এবং এক কিলোমিটারের মধ্যেই আছে বলে যন্ত্রে তার হৃৎস্পন্দন শোনা যাচ্ছে না।

কিন্তু আমাদের এ আশা নির্মমভাবে আঘাত পেল দশ মিনিটের মধ্যেই। একটা পয়েনসেটিয়া ফুলের ঝোপের পেছনে ক্যালেনবাখের মৃতদেহ আবিষ্কার করল জেরেমি সন্ডার্স। দেহ বলতে পুরো দেহ নয় ; নীচের দিকের বেশ কিছুটা অংশ নেই। সেটা যে এই রাক্ষুসে প্রাণীর খাদ্যে পরিণত হয়েছে সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।

ক্যালেনবাখের মুভী ক্যামেরা এখনো তার কোমরে স্ট্র্যাপ বাঁধা রয়েছে, তার লেনস ভেঙে চুরমার, তার সর্বাঙ্গে ক্ষত-বিক্ষত, কিন্তু তাও সেটা রয়েছে। আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমাদের জাপানী বন্ধুটির প্রতিক্রিয়া দেখে। [illegible] ইন্টারেস্টিং ফিল্ম" বলে সে ক্যামেরাটা ফিল্ম-সমেত খুলে নিল মৃতদেহ থেকে। আমরা এই বীভৎস অথচ করুণ দৃশ্য আর দেখতে পারলাম না। ক্যালেনবাখকে গোর দেবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে, কিন্তু সেটা এখন নয় এখন আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

সামনের ওই গুহাটার কথাই কি বলেছিল ক্যালেনবাখ ? একটা বেশ বড় টিলার গায়ে অন্ধকার গহ্বরটা আমাদের সকলেরই চোখে পড়েছে।

আমরা এগিয়ে গেলাম। আমাদের ক্যাম্প থেকে এই অংশটাকে দেখে মনে হয় যে এখানে পাথর ছাড়া আর কিছু নেই, কিন্তু কাছে এসে বুঝেছি যে, ফাঁকে ফাঁকে গাছও আছে। তবে এটাও আমরা বুঝেছি যে, সেই আশ্চর্য ফল সম্ভবত দ্বীপের ওই একটি বিশেষ জায়গাতে ছাড়া আর কোথাও নেই।

গুহাটার কাছাকাছি পেঁছে ডেভিড আমাদের ছেড়ে দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে আগেই তার ভিতরে প্রবেশ করল। গুহার লোভ ডেভিড সামলাতে পারে না। এ ক-দিনে যতগুলো ছোট-বড় গুহা আমাদের পথে পড়েছে, তার প্রত্যেকটিতে ডেভিড হাতে টর্চ নিয়ে ঢুকে তার ভিতরটা একবার বেশ ভালো করে দেখে এসেছে। এটা অবিশ্যি সে করে চলেছে গুপ্তধনের আশায়। অবশেষে আজকে যে তার আশা পূরণ হবে সেটা কি সে নিজেও ভেবেছিল ?

'ইয়ো হো হো!' বলে যে চিৎকারটায় সে তার আবিষ্কারের কথাটা আমাদের জানিয়ে দিল, এটা হল খাঁটি জলদস্যুদের চিৎকার। শুনে মনে হল বুঝি বা ডেভিডের দেহে মানরোর নয়, ব্র্যান্ডনের রক্ত বইছে।

চিৎকারের কারণটা অবিশ্যি একেবারে খাঁটি। পাইরেটের সিন্দুকের চেহারা আমাদের সকলেরই চেনা। ঠিক তেমনি একটি সুপ্রাচীন সিন্দুক রাখা রয়েছে গুহার এক কোণে। বাইরে থেকে বোঝা যায়নি এ-গুহার ভিতরটা এত বড়। এতে অন্তত একশোজন লোকের থাকার জায়গা হয়ে যায়। বোঝাই যাচ্ছে ব্র্যান্ডনের দস্যুরা যে-সব গুহা ব্যবহার করেছে, তার মধ্যে এটাই প্রধান

ডেভিড সিন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বন্ধ ডালাটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। সে এগিয়ে গেছে ডালা খোলার জন্য, কিন্তু কোনো অদৃশ্য শক্তি যেন তার হাত দুটোকে পাথর করে রেখেছে।

শেষে

আর খোলামাত্র ডেভিড আরেকটা অমানুষিক চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। সুমা অবিশ্যি তৎক্ষণাৎ তার ডান হাতের তর্জনীর ডগাটা দিয়ে ডেভিডের কপালের ঠিক মাঝখানে তিনটে টোকা মেরে তৎক্ষণাৎ তার জ্ঞান ফিরিয়ে দিল। কিন্তু এটা স্বীকার করা

যাবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তার ছেলেবেলার সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে ; সিন্দুক বোঝাই হয়ে

রয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীর স্প্যানিশ স্বর্ণমুদ্রা; ব্র্যাকহোল ব্র্যান্ডনের লুণ্ঠিত ধন।

ইতিমধ্যে আরেকটি আবিষ্কার আমাদের মধ্যে নতুন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এটিও একটি তোরঙ্গ—যদিও আগেরটার চেয়ে ছোট। এর গায়ে তামার পাতের অক্ষরে এখনো লেখা স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে—ডাঃ এইচ মানরো।

এই তোরঙ্গ খুলে তার ভিতর থেকে জীর্ণ জামাকাপড় আর কিছু ডাক্তারির জিনিসপত্র ছাড়া একটি আশ্চর্য মূল্যবান জিনিস পাওয়া গেল—হেকটর মানরোর ডায়রি। ডায়রি শুরু হয়েছে এই দ্বীপে এসে নামার পরদিন থেকে। মানরো কীভাবে এখানে এলেন সে-খবরও এই ডায়রিতে আছে। আমাদের অনুমান একেবারে ভুল হয়নি। কংকুয়েস্ট জাহাজ জলদস্যুদের হাতে পড়ে জলমগ্ন হয়। মানরোকে ব্র্যান্ডনই উদ্ধার করে তার নিজের জাহাজে তোলে। তারপর তারা রওনা দেয় জামাইকা। পথে প্রচণ্ড ঝড়ে পড়তে হয় জাহাজকে। দিগভ্রম হয়ে জাহাজ ভুল পথে চলতে শুরু করে। এই সময় নাবিকদের মধ্যে ব্যারাম দেখা দেয়। সাতদিন পর এই অজানা দ্বীপের কাছে এসে জাহাজডুবি হয়। ব্র্যান্ডন আর মানরো ছাড়া আরো তেত্রিশজন লোক কোনোমতে ডাঙার নাগাল পেয়ে আত্মরক্ষা করে। র‍্যাগল্যান্ড নামে একজন নাবিক ঘটনাচক্রে ওই নীল ফলের সন্ধান পায়। র‍্যাগল্যান্ড তখন অসুস্থ। এই ফল খেয়ে সে এক ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্যলাভ করে। তারপর এই ফল খেয়ে দলের সকলেরই ব্যারাম ম্যাজিকের মতো সেরে যায়। মানরো এই ফলের নাম দিয়েছিল অ্যামব্রোজিয়া অর্থাৎ অমৃত। এই দ্বীপের জানোয়ার আর পাখিও এই ফল খায় কিনা সে প্রশ্ন মানরোর মনে জেগেছিল। সে লিখছে—

> "আর কোনো জানোয়ার না হোক, বাঁদরে যে খায় সেটা আমি বুঝেছি তাদের স্বাস্থ্য ও ক্ষিপ্রতা দেখে। শুধু তাই না; এখনকার বাঁদরগুলো উদ্ভিদজীবী নয়, এরা মাংস খায়। আমি এদের গিরগিটি আর ব্যাঙ ধরে খেতে দেখেছি।"

মানরোর এ-কথা বলার কারণ তার নিজের পরের কথাতেই পরিষ্কার হচ্ছে। সে সুস্থ অবস্থাতেই এ-ফল খেয়ে দেখে লিখছে—

> "আমি আজ অমৃতের স্বাদ পেলাম। অবিশ্বাস্য এই ফলের ক্ষুধাবৃদ্ধিশক্তি। আজ সকালে আমরা অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে হরিণের মাংস খেলাম। ফলমূলের অভাব নেই এখানে, কিন্তু তাতে ক্ষুধা মেটে না। এই আশ্চর্য ফল কি এই অজানা দ্বীপেই থেকে যাবে? পৃথিবীর লোক কি এর কথা জানতে পারবে না?"

এর পরে ইঙ্গিত আছে, ডাক্তারের আর প্রয়োজন নেই দেখে ব্র্যান্ডন মানরোকে সরাবার চেষ্টা করছে। আত্মরক্ষার জন্য মানরো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সে বুঝতে পারছে ব্র্যান্ডনের হাত থেকে তার নিস্তার নেই। এদিকে খাদ্য-সমস্যা দেখা দিতে শুরু করেছে। দ্বীপের হরিণ মারা শেষ করে ব্র্যান্ডনের দস্যুদল পাখি বাঁদর ইত্যাদি শিকার করে খাচ্ছে। ফলমূল শাকসবজিতে আর কারুর রুচি নেই।

সব শেষে মানরো যে কথাটা বলেছে সেটা পড়ে আমাদের মনে এক অদ্ভুত ভাব হল। সে লিখছে ঃ

> "আমি বোতলে চিঠি পাঠিয়ে ঠিক করলাম কিনা জানি না। এই ফলকে অমৃত বলা উচিত কিনা সে বিষয়েও আমার মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছে। আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি এই তিন মাসের মধ্যে মানুষগুলো সব পশুতে পরিণত হতে চলেছে। আমিও কি পশুর স্তরে নেমে যাচ্ছি? এই যে চিরকালের জন্য রোগমুক্তি, আর তার সঙ্গে এই যে অদম্য ক্ষুধা, এটা কি মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর?"

মানরোর ডায়রিটা শেষ করে আমরা সকলেই মন ভার করে গুহার মধ্যে বসে আছি, এমন সময় খেয়াল হল যে একবার টেলিকার্ডিওস্কোপটা চালিয়ে দেখা উচিত।

সিদ্ধান্ত নেবার সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্র চালু করা হল, কিন্তু কোনো ফল পাওয়া গেল না। তার মানে প্রাণীটা এক কিলোমিটারের মধ্যে চলে এসেছে।

ঠিক এই সময় আমিই প্রথম অনুভব করলাম গুহার ভিতরে একটা গন্ধ যেটা এতক্ষণ পাইনি। আমরা গুহার মুখটাতেই বসেছিলাম বাইরের আলোতে মানরোর ডায়রিটা পড়ার সুবিধা হবে বলে। গন্ধটা কিন্তু আসছে গুহার ভিতর থেকেই, আর সেটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তার মানে গুহার ভিতরে পিছন দিকেও একটা ঢোকার রাস্তা আছে। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে প্রাণীটা, কারণ পায়ের শব্দ পাচ্ছি না এখনো।

এবারে একটা মৃদু শব্দ। একটা প্রস্তরখণ্ড স্থানচ্যুত হল। পরমুহূর্তে একটা রক্ত-হিম-করা হুঙ্কারের সঙ্গে অন্ধকার থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে একটা পাথরের খণ্ড এসে পড়ল সন্ডার্সের মাথায়। সন্ডার্স একটা গোঙানির শব্দ করে সংজ্ঞা হারিয়ে গুহার মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল, আর আমাদের অবাক করে দিয়ে ডেভিড মানরো সন্ডার্সের হাত থেকে পড়ে যাওয়া দো-নলা বন্দুকটা তুলে নিয়ে সেই অন্ধকারের দিকে লক্ষ করেই পর পর দুটো গুলি চালিয়ে দিল।

এবারে বাইরে থেকে আসা ফিকে আলোতে দেখলাম প্রাণীটাকে, আর শুনলাম তার মর্মভেদী আর্তনাদ। সে চার পা থেকে দুপায়ে উঠে দাঁড়িয়ে দুটো লোমশ হাত বাড়িয়ে আমাদের দিকে ধাওয়া করে আসছে। আমি আমার অ্যানাইহিলিনটা বার করার আগেই একটা তীক্ষ্ণ

শিসের মতো শব্দ করে সুমাগানের একটা বিষাক্ত ক্যাপসুল প্রাণীটির বক্ষদেশে গিয়ে বিঁধল, আর মুহূর্তের মধ্যে সেটা নির্জীব অবস্থায় চিত হয়ে পড়ল গুহার মেঝেতে।

এই প্রথম সুমাকে উত্তেজিত হতে দেখলাম। সে চিৎকার করে বলে উঠল, "ওই ফলের বিশেষ গুণটা কী এবার বুঝে দেখ শঙ্কু। আমি বুঝেছিলাম, আর তাই তোমাদের খেতে নিষেধ করেছিলাম। এই ফল যে একবার খাবে এক অনাহারে বা অপঘাত মৃত্যু ছাড়া তার আর মরণ নেই। এই প্রাণী একা এই দ্বীপের অন্য সমস্ত প্রাণীকে ভক্ষণ করে অবশেষে খাদ্যের অভাবে মরতে বসেছিল, ক্যালেনবাখকে খাদ্য হিসাবে পেয়ে তার মধ্যে আবার প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল। এখন তার খিদে চিরকালের জন্য মিটে গেছে!"

এই বলে সুমা তার বাঁ হাতের কবজিটা প্রাণীটার দিকে ঘুরিয়ে হাতঘড়ির বোতামটা টিপতেই ঘড়ির কেন্দ্রস্থল থেকে একটা তীব্র রশ্মি বেরিয়ে প্রাণীটার মুখের উপর পড়ল।

"যাকে মৃত অবস্থায় দেখছ তোমরা," বলল সুমা, "তার বয়স ছিল চারশোরও বেশি।"

"ব্ল্যাকহোল ব্র্যান্ডন!" —গুহা কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠল ডেভিড মানরো।

সন্ডার্সেরও জ্ঞান হয়েছে। আমরা চারজন চেয়ে আছি মৃত প্রাণীটির দিকে। এই দীর্ঘকায় লোমশ জানোয়ারকে আর মানুষ বলে চেনার উপায় নেই, কিন্তু এর ডান চোখের জায়গায় যে গভীর গর্তটা সুমার টর্চের আলোতে আরো গভীর বলে মনে হচ্ছে, সেটাই এর পূর্বপরিচয় ঘোষণা করছে।

ডেভিড মানরোর গুলিই একে প্রথম জখম করেছে, আর সুমার বিষাক্ত ক্যাপসুল এর হৃৎস্পন্দন বন্ধ করেছে।

এবারে আমার অস্ত্র শেকস্‌পিয়রের সমসাময়িক এই নৃশংস জলদস্যুকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরকালের মতো নিশ্চিহ্ন করে দিল।

চিরকিঘাটের আশ্চর্য মানুষ

সুবোধ ঘোষ

চিরকিঘাটের এই জঙ্গলে শাল-সেগুনের চেয়ে খেজুর আর বাঁশের ভিড় বেশি। তার চেয়ে বেশি ভিড় করেছে মহুয়া আর শিরীষ। তার চেয়েও কেঁদ গামহার আর পিয়ামের ভিড় বেশি। বর্ষাকালে চিরকিঘাট নামে পাহাড়ী ঘাটের দু-দিকের পাথুরে চটানের গা বেয়ে দুই রঙের দুই ঝরনার জল যেন দুই রঙের দুই আনন্দের প্রপাত হয়ে ঝরে পড়ে। গিরিমাটির কাদার ঢল নিয়ে গেরুয়া রঙের, আর কেওলিনের কাদার ঢল নিয়ে দুধিয়া রঙের জল। কিন্তু চিরকিঘাট নামে ছোট বস্তিটাকে ঘন জঙ্গলের ছায়ার মধ্যে খাপরার চালা নিয়ে লুকিয়ে থাকা কয়েকটা নিঝুম জীবনের ঘর বলে মনে হয়।

এই চিরকিঘাটের জঙ্গল আর বস্তিটা ঠাকুরসাহেবদের সম্পত্তি। বদলি হয়ে এখানে এসেছে তসিলদার রামতনু। এসেই রামতনুর দুই চোখের আশা যেন হঠাৎ-ব্যর্থতার দুঃখে চমকে উঠেছে। জংলী বস্তি তো বটে, কিন্তু এখানে এত বাইরের লোকের বসতি কেন? আর, একটা চৌকিদারই বা কেন লাঠি হাতে নিয়ে ছোট একটা নেড়া ডাঙার এক জায়গায় পাহারাদারের ভঙ্গী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিসের পাহারা কী ব্যাপার!

ভাণ্ডারী কৈলাসবাবুর কাছ থেকে ঘটনার সব কথা শোনবার পর তসিলদার রামতনুর মনের আর চোখের আশা যেন আবার একটা চমক খেয়ে এলোমেলো হয়ে গেল। পরশু রাতে চিরকিঘাটের এই বস্তিতে চুরি হয়েছে। চোরের পায়ের কয়েকটা ছাপ ডাঙার বুকের কাদার উপর জেগে রয়েছে। ছাপগুলি যেন রোদের তাপে শুকনো হয়ে আর ধুলো হয়ে উড়ে না যায়, কিংবা আবার এক পশলা বৃষ্টির জলে গলে না যায়, তাই রোদের মধ্যে এক-ঠাঁই দাঁড়িয়ে চোরের পায়ের ছাপ পাহারা দিচ্ছে একজন চৌকিদার। তার চেহারার অবস্থাটা বড়ই করুণ। থানার হুকুম, সাবধান, যেন একটা পিঁপড়েও চোরের ওই পায়ের ছাপের উপর দিয়ে যাওয়া-আসা করে ছাপের চেহারাটাকে খারাপ করে দিতে না পারে। থানার বড় দারোগা মহেশপ্রসাদের হুকুম। সে থানা খুব বেশি দূরে নয়। চিরকিঘাট থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে জেলা বোর্ডের সড়কের উপর ডুমরিচক থানা। হুকুমের চাকর ওই চৌকিদার তাই এদিকে-ওদিকে তাকায় না, রোদের তাপে মাথাটা পুড়ে যাচ্ছে, তবু মাথা নাড়ে না অন্য দিকে চোখ ফেরায় না।

বিকেল হবার আগেই গিরিডিহির এক ফটোগ্রাফারকে সঙ্গে নিয়ে চিরকিঘাটে এলেন ডুমরি থানার ছোট দারোগা। চোরের পায়ের ছাপের ফটো তুলে নিয়ে চলে গেলেন।

বুদ্ধিনাথ রায় নামে এক ভদ্রলোক মাত্র ছয় মাস আগে এখানে এসে ঠাঁই নিয়েছেন, তাঁরই ঘরের সামনে এক টুকরো নেড়া ডাঙার কয়েকটা কাদাটে জায়গার উপর চোরের পায়ের ছাপ পড়েছে। কী আশ্চর্য, চোর যেন তার কাজ সেরে নিয়ে ভয়ানক ঠাসা খেজুর জঙ্গলের দিকে চলে গিয়েছে। বুদ্ধিনাথ রায় ও তাঁর সঙ্গে থানাতে গিয়ে চুরির ঘটনা ডায়েরি করিয়েছে

যে শান্তারাম, তাঁরা দু'জনেই বলেছেন, ধূর্ত চোর ইচ্ছে করে খেজুর জঙ্গলের কিনারা পর্যন্ত গিয়ে তারপর পায়ের ছাপ লুকোবার জন্য ঘেসো পথে ঘুরে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকেছে। তাঁরা এই বলে ডায়েরি করিয়েছেন যে, চোর বাইরের কোন লোক নয় ; এই চিরকিঘাট বস্তিরই কোন লোক।

বুদ্ধিনাথ রায়, যিনি যুদ্ধের সময় মেসোপর্টেমিয়াতে কুলিফৌজের দরকারে লোক যোগাড় করে দিয়ে সরকারের কাছ থেকে কমিশন হিসাবে অনেক টাকা পেয়েছিলেন, তিনি অনেক বছর মহকুমা গিরিডিহির বাজারে আস্তানা করে সুদ আর তেজারতির কারবার করেছেন, কিন্তু বিশেষ রকমের কোন লাভ করতে পারেননি। তাই এই জংলী চিরকিঘাট বস্তিতে এসে ঘর বেঁধেছেন। এখান থেকে জঙ্গলের তিন মাইল ভিতরে তিনটে নতুন কয়লাখনি চালু হয়েছে। অনেক লোক এই তিন কয়লা-খনিতে ছোট-বড় অনেক রকম কাজ করে। এদেরই চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়ার মহাজন হয়েছেন বুদ্ধিনাথ রায়। কয়লা-খনির লোকেরা প্রতি রবিবারে মহাজন বুদ্ধিনাথ রায়ের ঘরের কাছে এসে ভিড় করে। টাকা ধার নেয় আর চলে যায়। ভিড়ের চেহারার দিকে তাকালেই বোঝা যায়, বুদ্ধিনাথবাবুর কারবার এই ছয় মাসের মধ্যে বেশ জমে উঠেছে।

বুদ্ধিনাথ রায়ের ঘর থেকে সামান্য একটু দূরে শান্তারাম নামে লোকটার ঘর। এই শান্তারামও একজন নতুন আগন্তুক, মাত্র ছয় মাস আগে তারও আগমন। শান্তারাম নিজেই বলেছে তাই সবাই জেনেছে যে, ত্রিশ বছর বয়সের এই জীবনে সোনা-চাঁদির বেচাকেনার কারবার করে অনেক টাকা রোজগার করেছে শান্তারাম কিন্তু আর তার রোজগার করবার দরকার নেই। ঠিক কথা। বেশ সুখেই আছে শান্তারাম। ঘরের বাইরের দাওয়াতে মখমলের গালিচার উপর বসে থাকে।

ঘটনাটা এই ঃ পরশুদিনের আগের দিন শুধু এক রাতের জন্য গিরিডিহি গিয়েছিলেন মহাজন বুদ্ধিনাথ রায়। ফিরে এসে দেখেন, সেই রাতেই দরজা ভেঙে তাঁর ঘরে চোর ঢুকেছে আর ঘরের মেজের মাটি খুঁড়ে দশটা কাঁসার ঘটের সবই বের করে নিয়ে সরে পড়েছে। ওই দশটি কাঁসার ঘটের মধ্যে দশ হাজার টাকা ছিল। বুদ্ধিনাথ রায় তাই ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। সত্যিই যে তাঁর সর্বস্ব চুরি হয়ে গিয়েছে।

বুদ্ধিনাথ রায়ের দুঃখে খুব দুঃখী হয়েছে শান্তারাম। বুদ্ধিনাথ রায়ের সঙ্গে বারবার কয়েকবার থানাতে গিয়ে আর নালিশের কথা বলতে গিয়ে, এই শান্তারাম বার বার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে।

২

প্রথম দিনেই চিরকিঘাট বস্তির ঘটনা আর চেহারা দেখে অখুশি হয়েছে রামতনু। চিরকিঘাটের বস্তিতে এইসব বাইরের লোকের ঠাঁই নেওয়া যে জঙ্গলের জীবনের পক্ষে একটা ভয়ানক অস্বস্তির ব্যাপার! দেখে মনে হয়, শহুরে লোভের আর অপকর্মের একটা চক্রান্ত যেন এখানে এসে জঙ্গলের বুকের উপর ওত পেতে বসেছে।

ভাণ্ডারী শর্মাজী বলেন ঃ আপনি এসে একদিনেই বিরক্ত হয়ে উঠলেন তসিলদারজী! তাহলে ভেবে দেখুন আমি কী করে একটানা দশ বছর ধরে এখানে আছি।

—কিন্তু এ কে ?

সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যে লোকটা তারই দিকে তাকিয়ে আর বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে কথা বলে রামতনু।

ভাণ্ডারী বলেন—হ্যাঁ, এই লোক এখানে প্রায় দুই বছর হল আমার কাছে আছে। দুঃখের বিষয়, লোকটি বোবা এবং কানে খুব কমই শোনে। রান্নার জন্য কাঠ কেটে দেওয়া, আর এই জঙ্গলের ভিতরের ঝর্না থেকে রোজ এক কলসি জল এনে দেওয়া, এ ছাড়া আর কোন কাজই করতে জানে না, পারেও না আমার এই লোকটা, যার নাম হিরু। আপনার এই কাছারির দুই পেয়াদার দেওয়া নাম। আমি স্রোতের জল ছাড়া কোন কুঁয়ো কিংবা পুকুরের জলে সন্ধ্যা-সকালের আহ্নিক করতে পারি না। বলতে গিয়ে হেসে ফেললেন বুড়ো ভাণ্ডারী কৈলাস শর্মা। বেশ লম্বা চেহারা, গায়ের রং ধবধবে সাদা, শান্ত চোখের দৃষ্টিতে বেশ মিষ্টি রকমের একটা ভাব। এই শর্মাজীর ঘরে হিরু যেন একটা কঠোর বিপরীত। ঘুটঘুটে কালো আর বেঁটে চেহারার হিরু যেন শর্মাজীর ঘরে পোষ মানানো একটা অদ্ভুত বিস্ময়।

শর্মাজী বলেন—হ্যাঁ, এই হিরু সত্যিই একটা আশ্চর্য মানুষ। প্রায় দুই বছর আগে বরযাত্রী হয়ে আমি আমার বগোদর চটির বেয়াইবাড়ির দশ জনের সঙ্গে চিরকিঘাটের পথ ধরে এই বস্তির দিকে আসছিলাম। গিরিডিহি যাবার কথা। দেখে চমকে উঠলাম, একটা প্রায়-ন্যাংটো চেহারার মানুষ দৌড়ে দৌড়ে ছুটছে, আর তাকে তাড়া করে পিছু পিছু ছুটে যাচ্ছে একটা ভালুক।

সর্বনাশ মরেছে লোকটা! চেঁচিয়ে উঠেছিল বরযাত্রী দলের সবাই। দলের সঙ্গে টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে আগে আগে যাচ্ছিল বেয়াইয়ের ছেলে যে ইন্দ্রনাথ তার হাতে একটা গাদা বন্দুকও ছিল। আঃ লোকটাকে বাঁচাতেই হবে। ইন্দ্রনাথ চেঁচিয়ে একটা হাঁক দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। এগিয়ে গিয়ে ভালুকটার পথ রোধ করে দাঁড়াল। কী আশ্চর্য, ভালুকটা সেই মুহূর্তে পথ ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়ল। আর সেই প্রায়-ন্যাংটো মানুষটা হঠাৎ থমকে গিয়ে জঙ্গলের সেই পথের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল, যে-পথে ভালুকটা পালিয়ে গেল। এ কী ব্যাপার, ভালুকটা কি তবে এই লোকটাকে তাড়া করেনি ? লোকটা কি খুশি মনে ভালুকটার সঙ্গে ছুটোছুটির খেলা খেলছিল ?

লোকটার গায়ে আচ্ছাদন বলতে শুধু এক টুকরো হাফ প্যাণ্ট কোমরের সঙ্গে দড়ি বাঁধা হয়ে ঝুলছে। বরযাত্রী দলের হীরালাল চেঁচিয়ে ওঠে। —আরে আরে, এই লোকটাকে আমি গত শীতের সময়ে দেখেছি, গিরিডিহি স্টেশনের কাছে হালুইকর রামদয়ালের পুরী-তরকারির দোকানে জ্বলন্ত উনুনের কাছাকাছি বসে এঁটো পাতা চাটছে। লোকে বলে, এ একটা অদ্ভুত ভিখারী। পয়সা নেয় না, পয়সার মর্ম বোঝে না। এক আধটা পুরী আর কিছু তরকারি দিলে চেটেপুটে সব খেয়ে ফেলে। কাপড় পরতে জানে না লোকটা। স্টেশনের কাছের বাজারের লোকেরা একটা হাফ প্যাণ্টকে শক্ত করে এর কোমরের সঙ্গে বেঁধে দেয়। ছিঁড়ে গেলে আবার নতুন একটা হাফপ্যাণ্টকে ওর কোমরে চড়িয়ে দেয়। কিন্তু কী আশ্চর্য, গিরিডিহির বাজারের লোক বলে, ভিখিরীটা মাঝে মাঝে কোথায় যেন চলে যায়। শীতের পৌষ মাস শুরু হলে আবার ওকে দেখা যায় রামদয়ালের পুরী-তরকারির দোকানের সামনে বসে এঁটো পাতা চাটছে।

ভাণ্ডারী শর্মাজী বলেন—মনে পড়ছে, সেদিন আমরা বনমানবের মতো আশ্চর্য সেই লোকটাকে এক রকম ধরে-বেঁধে আর জোর করে, আবার আদরের ভঙ্গীতে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে এখানে নিয়ে এসেছিলাম। সেই মানুষটাই হল, এই যে দেখছেন, এই হিরু। এখনও দেখতে পাই ডালভাত খাওয়ার চেয়ে জঙ্গলের ডুমুর মহুয়া আর তাল কুড়িয়ে খেতে ওর আনন্দ বেশি। অনেক চেষ্টা করে ওকে কাপড় পরতে শিখিয়েছি। ও এখন আমার ইশারার ভাষাও বুঝতে পারে।

সত্যিই তো, শর্মাজীর কাছে চাকরের মতো নয়, একটা পোষা মানুষের মতো থাকে, এই হিরুর জীবনের সব কিছুই

একটা আশ্চর্যময় রহস্য বলে মনে হয়। কলকাতা থেকে জাদুঘরের এক ডক্টর চক্রবর্তী কে জানে কার কাছ থেকে গল্প শুনে এখানে একবার এসেছিলেন। চোখের নজর দিয়ে যতটুকু পরীক্ষা করা যায়, তাই তিনি করলেন। হিরুর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেছিলেন আর শর্মাজীকে প্রশ্ন করেছিলেন—ওর হাতে ওটা কী জিনিস মশাই ?

শর্মাজী—চোপ দড়ি দিয়ে তৈরী একটা ফাঁদ কাঠবিড়ালী আর খরগোশ ধরার ফাঁদ।

—তাই বলুন। এই তো প্রমাণ, লোকটা বিরহোর জাতের একটা লোক। জানেন না তো, বিরহোরেরা কী ভয়ানক খারাপ স্বভাবের মানুষ, বনমানুষের চেয়ে এমন কিছু উঁচু মানের মানুষ নয়। ওরা ওদের জীবন্ত বুড়ো বাপ-মা'র মাংস কেটে-কুটে খেয়ে ফেলে। আপনার এই চাকরটার হাতের এই ফাঁদই হল একেবারে নির্ভুল প্রমাণ, লোকটা দলছাড়া একটা বিরহোর।

শর্মাজী মুখ টিপে হাসেন—কিন্তু বিরহোর কি চোপ দড়ির ফাঁদ পেতে ধরা খরগোশ ও কাঠবিড়ালীকে কিছুক্ষণ আদর করে নিয়ে আবার ছেড়ে দেয় ?

ডক্টর চক্রবর্তী চেঁচিয়ে ওঠেন—আরে না না। কখ্খনো না। ফাঁদ পেতে ধরা খরগোশ আর কাঠবিড়ালীর মাংস খাওয়াই বিরহোরের অভ্যেস।

শর্মাজী—কিন্তু আমার এই হিরু, যাকে আপনি দলছাড়া একটা বিরহোর বলছেন, সে কখনও খরগোশ কিংবা কাঠবিড়ালীকে মারে না।

ডক্টর চক্রবর্তী—তা হলে তো বলতেই হবে, লোকটা বিরহোর জাতের মানুষ নয়। কিন্তু যা শুনলাম আর দেখলাম তাতে ওর পরিচয় বুঝে ওঠা আমার সাধ্যি নয়।

সব শুনে তসিলদার রামতনুও আশ্চর্য হয়। আরও একটি কথা বলে শর্মাজী রামতনুর বিস্মিত মনটাকে আরও বিস্মিত করে দিলেন—হিরুর আরও একটা অভ্যাসের কথা শুনলে আপনি আরও আশ্চর্য হবেন। হিরু প্রায় রোজই শেষরাতে ঘর থেকে বের হয়ে এই জঙ্গলের ভিতরে ঘুরে বেড়ায়। কে জানে কেন ওর প্রাণে বাঘ-ভালুকের ভয় নেই।

৩

শান্তারাম কয়েকজন সাক্ষী জোগাড় করেছে। তারা হল মুখিয়া ছোটুলালের চার ছেলে। তারা সে রাতে দেখেছে ভাণ্ডারী শর্মাজীর চাকর এই হিরু মহাজন বুদ্ধিনাথবাবুর ঘরের সামনের ছোট ডাঙার উপর দিয়ে দৌড়ে-দৌড়ে চলে গেল। তবু কেস তৈরি করবার মতো ভাল প্রমাণ খুঁজে পাচ্ছিলেন না বড় দারোগা মহেশপ্রসাদ। শান্তারামই একদিন আদালতে গিয়ে মহেশ-প্রসাদের কানের কাছে ফিসফিস করে চমৎকার প্রমাণের একটা খবর শুনিয়ে দিল। —আপনি একবার ভাণ্ডারী শর্মাজীর চাকরটার পায়ের তলার চেহারাটা দেখুন। তবেই বুঝবেন এই চুরির কাণ্ডটা কার কীর্তি।

চিরকিঘাট বস্তির তসিল-কাছারির ঘরে সাতটি দিন বাস করে পরের দিন আবার একটি ঘটনার চেহারা দেখে খুবই উদ্বেগ বোধ করে, খুবই কষ্টকর একটা অস্বস্তি সহ্য করতে চেষ্টা করে রামতনু। দুপুর হতেই ডুমরি থানার বড় দারোগা মহেশপ্রসাদ চার জন সেপাই সঙ্গে নিয়ে ভাণ্ডারী শর্মাজীর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালেন। দেখা যায় মখমলের গালিচার মানুষ সেই শান্তারামও এসেছে।

শান্তারামই চেঁচিয়ে ডাক দিল—আপনার চাকর হিরু কোথায় ?

শর্মাজী—কেন ? হিরু এখানেই ঘরের ভিতরের বারান্দাতে ঘুমোচ্ছে।

শান্তারাম—ওকে এখানে দারোগাজীর কাছে নিয়ে আসুন।

শর্মাজী—কেন ?

শান্তারায়—ওর পায়ের ছাপ পরীক্ষা করা হবে।...এই সিপাহী, ঘরের ভিতর গিয়ে লোকটাকে টেনে নিয়ে এস।

হিরু বাইরে এসে বড় দারোগা মহেশপ্রসাদের চোখের সামনে দাঁড়াতেই থানার চার সেপাই শক্ত করে হিরুকে জড়িয়ে ধরে। শান্তারাম হিরুর একটা পায়ের পাতা তুলে বড় দারোগাকে দেখায় —ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন হুজুর। তবে বুঝবেন, আমি আপনাকে ঠিক খবর দিয়েছি কি-না।

চোরের পায়ের ছাপের সেই ফটোর সঙ্গে হিরুর পায়ের তলার চেহারাটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়েই উত্তপ্ত মেজাজের কড়কড়ে স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন বড় দারোগা মহেশ-প্রসাদ। —মিলে গেছে, একবারে লাইনে লাইনে মিলে গেছে। এই বদমাশটার পায়ের তলার চেহারা আর এই ফটোতে চোরের পায়ের ছাপের চেহারা হুবহু মিলে গেছে। এ......এ সেপাই-লোক, শালেকো কসকে বাঁধো।

হিরুর কোমরে চার পাক দড়ির বাঁধন এঁটে দিয়ে, আর দুই কাঁধের উপর দুই লাঠির খোঁচা চাপিয়ে দিয়ে দৃশ্যটা ভয়ানক রকমের উগ্র হয়ে উঠতেই কেঁদে ফেললেন শর্মাজী। বোবা হিরুর গলা থেকে যেন ওর ভীরু বুকের একটা অদ্ভুত আওয়াজ ঠিকরে বের হচ্ছে। বার-বার পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে শর্মাজীকে দেখতে চেষ্টা করছে। থানার চার সেপাইয়ের হাতের ধাক্কা খেতে খেতে চলে যাচ্ছে হিরু।

এর পর সমস্যার চেহারাটা একের পর এক এমনই জটিল-কুটিল আর কঠোর হয়ে উঠল যে, শর্মাজী একেবারে ভেঙে পড়লেন।

হিরুর পক্ষ নিয়ে মামলা লড়বার আর্থিক সাধ্য শর্মাজীর নেই। তসিলদার রামতনুরও নেই। পুজো করতে বসে শর্মাজী ভাবেন, হিরুর নামে এত ভয়ানক মিথ্যে একটা অভিযোগ কি আদালতের বিচারে মিথ্যে প্রমাণিত হয়ে যাবে না ? রামতনু বলে—না, জঙ্গলের বাইরের পৃথিবীতে সুবিচার থাকে না, সুবিচারের কোন জোরও শহরের জীবনের নেই। শর্মাজী বলেন—তবে বেচারা হিরুর কি সত্যই সাজা হয়ে যাবে? আদালতের হাকিম কি বুঝবেন না যে, হিরু চোর নয়; হিরুর পক্ষে চুরি করা সম্ভব নয়, হিরুর চুরি করবার দরকার হয় না, হিরু একটা আশ্চর্য মানুষ ?

ওই শান্তারাম, প্রতি সপ্তাহে সদর ডুমরিতে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের নাজিরবাবুর কাছ থেকে খবর নিয়ে আসছে, চিরকিঘাটের সব মানুষকে সেই খবর শুনিয়ে দিচ্ছে। হিরুর খুব কড়া সাজা হবে। হিরু তো একা নয়, চোরের দলের মধ্যে হিরুর সঙ্গে আরও অনেকে ছিল। দারোগা মহেশপ্রসাদ খুব জবর তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন, অন্য চোরদেরও খুব শিগ্গির ধরে ফেলবেন।

বড় দারোগা মহেশপ্রসাদ মাঝে একদিন চিরকিঘাট বস্তিতে এসে ভাণ্ডারী শর্মাজীর আর রামতনুর ঘর তল্লাসী করলেন। পাহাড়ী ঘাটের ঢালুতে, যেখানে দশ ঘর ওরাঁও বাস করে চোপের দড়ি তৈরী করে আর ঝুমচাষ করে মকাই ফলায়, তাদের প্রত্যেকটি পুরুষকে লাঠিপেটা করলেন ; কড়মড়ে গলার স্বরে হাঁক ছাড়লেন—বলো, চুরির মাল কাঁহা হ্যায়? বলো কে কে চোরের দলে ছিল ?

শান্তারাম তার গলার স্বরে সান্ত্বনা ভরে দিয়ে মহাজন বুদ্ধি-নাথবাবুকে বুঝিয়ে দেয়, মাল হয়তো পাওয়া যাবে না, কিন্তু চোর হিরুর সাজা হবেই হবে। কথা শুনে মহাজন বুদ্ধিনাথ রায়ের বিষণ্ণ প্রাণটা যেন বিরক্ত হয়ে আর রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে—চুরির মালই যদি পাওয়া না গেল, তবে আর কী হল।

হিরু নামের একটা আধা-মানুষ ও আধা-জানোয়ারের কালাপানি হলেই বা কী?

এমনি করেই এক একটা দিন পার হয়ে যাচ্ছে। হিরুর অদৃষ্টের এক একটা কঠোর খবর এসে এই বস্তির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। হাজতের ভিতরে হিরুর উপর তিন-চারটে ভোজপুরী লাঠির মার পড়েছে দুই দিনে চার বার। মহেশ-প্রসাদ বলেছেন, আরও একদিন মার চালাতে হবে, মারের চোটে বোবার মুখের ভিতর থেকে কথা বের হয়ে যায়।

শেষ খবর শুনে সবাই ভয় পায়। বোবার মুখও কথা বলে ফেলে। নাজিরবাবু বলেছেন, হিরুর অন্তত চার বছর কয়েদের হুকুম হবে। তিন-চার দিনের মধ্যেই হাকিমের রায় বের হবে। শান্তারাম সারা বস্তি ঘুরে আর হেসে হেসে সবাইকে এই খবর জানিয়েছে।

সন্ধ্যা হলে ওরাঁওদের নাচের আসরে মাদল বেজে ওঠে ঠিকই। কিন্তু মাদলের শব্দ যেন ভীরু হয়ে গিয়েছে। আস্তে আস্তে যেন নেতিয়ে নেতিয়ে বাজে। জঙ্গলের ভিতরে অন্ধকারটাও যেন ভয় পেয়ে নিরেট হয়ে গিয়েছে। রাত্রি হলে শুধু একটা শব্দ শোনা যায়, হায়েনার দল কড়মড় করে শুকনো হাড্ডি চিবোচ্ছে। মনে হয় কেউ যেন জঙ্গলের নিরেট অন্ধকারের হাড়গোড় চিবিয়ে খাচ্ছে। একদিন রাত্রিতে শর্মাজী এসে তসিলদার রামতনুকে ভজন শোনালেন। তুলসীদাসের ভজন, নির্বলকে বল রাম! তারপর ফুঁপিয়ে উঠলেন, হিরুর মতো নির্বল একটা মানুষকে বিপদ থেকে রাম কি সত্যিই রক্ষা করবেন?

সেই রাতে মেঘের গর্জন শুনে আর বিদ্যুতের আলোকের ঝলক লেগে চিরকিঘাটের জঙ্গলের সব ভীরু অন্ধকার যেন ভয় হারিয়ে দুরন্ত হয়ে উঠল। পাহাড়ী ঘাটের দু'দিকে পাথুরে চটানের বুক ভাসিয়ে দিল দুই ঝর্নাধারা।

মাঝ রাতে বৃষ্টির ধারার সব শব্দ যখন থেমে গেল ঠিক তখন ভয়ানক করুণ একটা ভয়ের চিৎকার শুনে চমকে উঠল সবাই। শর্মাজী আর রামতনু জেগে ওঠেন, মহাজন বুদ্ধিনাথ-বাবু আর তাঁর দুই শালাবাবুও জেগে উঠলেন। কে এত ভয় পেয়ে চিৎকার ছেড়েছে? তসিল কাছারির দুই পেয়াদা টাঙি হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়।

সবাই শুনতে পায়, মখমলের গালিচার মানুষ সেই শান্তা-রামের ঘরের দিক থেকে আতঙ্কিত প্রাণের চিৎকারটা বাতাসে ভেসে আসছে। ছোট ছোট লণ্ঠন হাতে নিয়ে সবাই শান্তারামের ঘরের দিকে দৌড়তে থাকে।

কী অদ্ভুত দৃশ্য। শান্তারামের ঘরের সামনের ঝিঙে ক্ষেতের ভিতরে কেরোসিনের একটা আলো জ্বলছে। আলোর কাছে মস্ত একটা গর্ত। দেখেই বোঝা যায়, এখনই কেউ গর্তটাকে খুঁড়েছে। সেই গর্তেরই কাঁচা আর কাদা-কাদা মাটির ঢিপির এক পাশে শান্তারামের রক্তমাখা শরীরটা গড়িয়ে গড়িয়ে ছটফট করছে।

কী হল, কী হল? কে তোমাকে এ রকমভাবে জখম করেছে? সবারই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কঁকিয়ে ওঠে শান্তা-রাম—আমাকে জলদি ডুমরি চকের হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। দেরি হলে আমি মরে যাব।

ঠিকই বলেছে শান্তারাম, সবাই দেখতে পায়, কে জানে কার হাতের টাঙির আঘাতে শান্তারামের মাথার খুলির জোড় খুলে গিয়েছে। গলগল করে রক্তের স্রোত খুলির জখমের ভিতর থেকে গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু এ রকম করে মানুষের মাথার খুলির জোড় খুলে দেওয়া তো ভালুকের নখের আর আক্রোশের নিয়ম।

হঠাৎ গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মহাজন বুদ্ধিনাথ রায়—এ কী? এ কী? চুরির সব মাল যে কাদা-মাখা হয়ে এই গর্তের
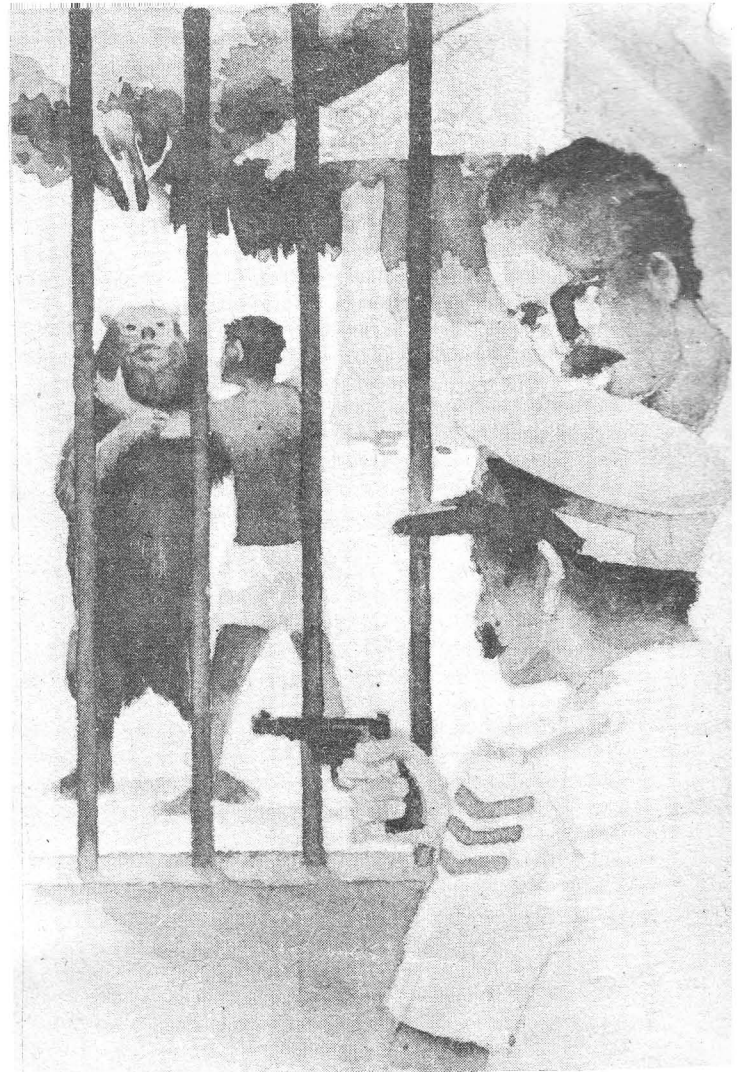
মধ্যে পড়ে রয়েছে। এই দেখুন। সবাই দেখুন।

সবাই দেখতে পায়, মহাজন বুদ্ধিনাথের টাকায় ভর্তি দশটা কাঁসার ঘট সেই গর্তের মধ্যে পড়ে রয়েছে। একটি একটি করে কাঁসার ঘট গর্তের ভিতর থেকে তুলতে থাকেন মহাজন বুদ্ধিনাথ রায়। শান্তারামের রক্তাক্ত মাথাটার দিকে এগিয়ে একটি একটি করে গালি ছাড়েন—চোর মিথ্যুক ভণ্ড।

তসিল কাছারির দুই পেয়াদা তখনই ওরাঁও বস্তি থেকে একটা গো-গাড়ি নিয়ে এসে তার উপর শান্তারামের রক্তমাখা শরীরটাকে চাপিয়ে দেয়। ছোট গো-গাড়ির রোগা রোগা গরু দুটো যেন পা চালাতে চায় না। ওরাঁও গাড়োয়ান অনেক আদর করে আর বুঝিয়ে সুঝিয়ে গরু দুটোকে পা চালাতে রাজি করে। চল্ বেটা চল্—ডুমরিচকের হাসপাতালে চল্! তসিল কাছারির দুই পেয়াদা হাঁক দেয়।

মহাজন বুদ্ধিনাথের দুই শালাও চেঁচিয়ে ওঠে—চলো ডুমরি থানা। ডায়েরি করতে হবে চোরাই মাল আর টাকা কার ঘরের আঙিনাতে একটা গর্তের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে, তারই নামে ডায়েরি করাতে হবে। চোর চোর কী ভয়ানক চোর এই শান্তারাম।

সকাল হতে চিরকিঘাট বস্তির সব মানুষের দুই চোখে আশ্চর্যের ভাব ছটফট করে। শান্তারামের ঘরের চারদিকে আর নেড়া ডাঙা জমিটার উপর ঠিক সেই রকম পায়ের ছাপ ছড়িয়ে রয়েছে কেন? শর্মাজীর চাকর হিরু তো দু'মাস ধরে জেল হাজতে বন্দী হয়ে রয়েছে। তবে হিরুর পায়ের ছাপ কেমন করে আবার এখানে ছড়িয়ে পড়বে? হিরু কি ভূত হয়ে হাজত ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে এক রাতের মধ্যে চিরকিঘাটের ওই জায়গাতে ঘোরাঘুরি করেছে আর ফিরে গিয়েছে? অসম্ভব ব্যাপার; কিন্তু সরকারী ফুটপ্রিণ্ট এক্সপার্ট মশাই তো আদালতে

হাকিমের সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে ঃ বিজ্ঞানে যা বলে আমি তাই বলছি হুজুর। ফটোতে চোরের পায়ের ছাপ।

শুনে চমকে উঠেছেন ডুমরি থানার বড় দারোগা মহেশপ্রসাদ। অ্যাঁ, এই নতুন পায়ের ছাপ তবে কার পায়ের ছাপ? মানুষের না ভূতের? যা-ই হোক না কেন চুরির মাল যখন ধরা পড়েছে তখন নতুন করে মামলা দায়ের করতেই হবে। কিন্তু ভয় হয়, কড়া মেজাজের ঝোঁকে হাকিম বোধহয় বড় দারোগার বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য করে বসবেন নিতান্ত একটা মিথ্যে মামলা সাজিয়েছেন ডুমরি থানার এই বড় দারোগা।

দেরি করলেন না বড় দারোগা মহেশপ্রসাদ। আদালতের কাছে আবেদন করলেন, হিরু আসামীকে আপাতত মুক্তি দেবার আদেশ হোক। আসল চোরের সন্ধান না পাওয়া গেলেও চুরির সব মালের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। তবে নতুন একটা রহস্যের প্রশ্নও দেখা দিয়েছে। চোর শান্তারামকে মাঝ রাত্রিতে মারাত্মক রকমে জখম করেছে কে? আমি তাই আবার তদন্ত করে এই প্রশ্নেরও জবাব পেতে চাই। আদালত আমাকে যেন মাপ করেন। সাক্ষীদের মিথ্যে কথার ছলনা আমার আগের তদন্তকে বিভ্রান্ত করেছিল।

৪

তিনদিন পার হতেই যেদিন হাজত থেকে ছাড়া পেয়ে চিরকিঘাটে ফিরে এল হিরু, সেদিন ওরাঁও বস্তির সব মানুষ নেচে নেচে গান গেয়ে আর মাদল বাজিয়ে হিরুকে সমাদর জানাল। আর সেদিনই সন্ধ্যাবেলা স্বয়ং বড়দারোগা মহেশপ্রসাদ দুই সেপাই সঙ্গে নিয়ে চিরকিঘাটে এসে আর তসিল কাছারির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন—তসিলদারজী।

রামতনু—বলুন।

—শুনলাম, আবার সেই রকমের পায়ের ছাপ দেখা দিয়েছে। পায়ের ছাপ শান্তারামের ঘরের সামনেই সব চেয়ে বেশি।

শর্মাজী এসে বলেন—হ্যাঁ, তাতে আপনার তদন্তের তো কোন অসুবিধে হবার কথা নয়।

বড় দারোগা মহেশপ্রসাদ খুব গম্ভীর স্বরে কথা বলেন—ও কথা আপনার না বললেও চলবে। আমি রহস্যটাকে বুঝতে চাই। এ কেমনতর কার পায়ের ছাপ? ...আমি ঘটনাটাকে নিজের চোখে দেখতে চাই।

শর্মাজী—দেখুন তাহলে।

মহেশপ্রসাদ—তাহলে আজকের রাতটুকুর মতো আপনাদের এখানেই থাকতে হয়।

রামতনু বলে—হ্যাঁ, থাকুন।

মহেশপ্রসাদ—আপনাকে ধন্যবাদ।

রামতনু মুখ টিপে হাসে। —আমার আশা হয়, আজই আপনি দেখতে পাবেন, এগুলি কার পায়ের ছাপ।

—অ্যাঁ, ঠিক বলছেন?

—হ্যাঁ, খুব ঠিক বলছি, আমরাও তদন্ত করে বুঝেছি যে, যার পায়ের ছাপের ফটো আপনারা তুলেছেন, সেটা কোন চোরের পায়ের ছাপ নয়। শান্তারামকে ঘায়েল করেছে যে, চুরির মাল ধরা পাড়িয়ে দিয়েছে আর হিরুকে চার বছরের শক্ত কয়েদের শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে যে, তারই পায়ের ছাপ।

মহেশপ্রসাদ ভ্রূকুটি করেন—তদন্ত করে আর কী বুঝেছেন?

রামতনু—চোর শান্তারাম মাঝরাত্রিতে লুকনো চোরাইমাল সরিয়ে ফেলছিল, ঠিক সেই সময় কেউ একজন সেখানে এসে চোর শান্তারামকে মারাত্মকভাবে ঘায়েল করে চলে গিয়েছে।

—সে তবে চুরি-করা মাল নিয়ে গেল না কেন?

—সে চুরি করে না।

—কে সে?

বড়দারোগা মহেশপ্রসাদের মেজাজ তপ্ত হয়ে ওঠে। —তাহলে তো আপনাদের দু-জনকে গ্রেপ্তার করতে হয়। আপনারা অনেক কিছু জেনেও থানাকে কিছু জানাননি।

শর্মাজী হাসেন—হ্যাঁ, তাই করবেন। তার আগে নিজের দুটি চোখ দিয়ে একবার তদন্ত করে নিন, তার চেহারাটা চিনে রাখুন।

রামতনু—রাত জেগে বসে থাকুন, সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকুন, তবেই দেখতে পাবেন।

মহেশপ্রসাদ—আপনারা তাকে দেখতে পেয়েছেন?

রামতনু—পেয়েছি।

পিস্তল হাতে নিয়ে রামতনুর ঘরের ভিতরে খোলা জানলার কাছে একটা চৌকির উপর বসে রইলেন বড়দারোগা মহেশপ্রসাদ। মেজের উপর তাঁর থানার দুই লাঠিধারী সেপাই। একটা চারপায়ার উপর বসে রইলেন শর্মাজী ও রামতনু।

নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারও ঘুমের ঘোরে নিঝুম হয়ে গেল। এক দুই তিন চারটি ঘণ্টার সময় পার হয়ে গেল। মহুয়া ফুলের গন্ধে বাতাস ভরে গিয়েছে। হঠাৎ নিঝুম চোখ দুটোকে টান করে যেন একটা বিস্ময়ের দুরন্ত চমক লেগে আর ব্যস্ত হয়ে ডেকে উঠলেন বড়দারোগা মহেশপ্রসাদ—এ কী দৃশ্য, তসিলদারজী?

ডাক শুনে শর্মাজী ও রামতনু উঠে এসে জানালার কাছে দাঁড়ায়। রামতনু বলে—হ্যাঁ, এই তো সেই দৃশ্য যেটা আমরা আগেই দেখেছি।

বড়দারোগা মহেশপ্রসাদ দুই চোখ অপলক করে দেখতে থাকেন, একটা ভালুক কাছারির দরজার বাইরে রাস্তাটার উপর এসে দাঁড়িয়েছে। সেই মুহূর্তে শর্মাজীর চাকর হিরুও ঘরের দরজা খুলে আর বাইরে এসে দাঁড়াল।

আকাশে মেঘ নেই। বৃষ্টিও নেই। চাঁদের আলো সারা জঙ্গলের মাথার উপর চিকচিক করে হাসছে। ভালুকটার দিকে তাকিয়ে হিরুর চোখ দুটোও হাসছে। তেমনই হাসছে হিরুর সাদা-সাদা দাঁতের জ্যোৎস্না। ভালুকটারও খোলা মুখের মস্ত বড় একটা হাঁ-এর মধ্যে সাদা-সাদা দাঁত চিকচিক করে হাসছে। এগিয়ে এসে হিরুর দুই কাঁধের উপর দুই পা তুলে দিল আগন্তুক ভালুকটা। যেন দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুর কোলাকুলি হবে এখনই।

মহেশপ্রসাদ ভয় পেয়ে আর কাঁপতে কাঁপতে কথা বলেন—এটা কী রকমের রহস্যের ব্যাপার, তসিলদারজী?

রামতনু—ভালুকটা আমাদের হিরুর একজন বন্ধু জানোয়ার। এই ভালুকেরই পায়ের ছাপগুলিকে আপনারা হিরুর পায়ের ছাপ বলে বুঝেছিলেন। চোর শান্তারামের মাথার খুলি দু-ভাগ করে দিয়েছে এই ভালুক। কিন্তু আর দেরি করছেন কেন? ওকে গ্রেপ্তার করে ফেললেই তো পারেন।

আরও ভয় পেয়ে, আরও বেশি কাঁপতে থাকেন মহেশপ্রসাদ—কিন্তু এ কী দৃশ্য দেখছি।

রামতনু—আপনাদের আইনের অনেক দৃশ্য তো দেখিয়েছেন। এখন জঙ্গলের আইনের একটা দৃশ্য দেখুন।

মহেশপ্রসাদ—কিন্তু কে এই হিরু, একটা ডাইন নাকি?

শর্মাজী হেসে ফেলেন—না মশাই, না।

মহেশপ্রসাদ—তবে কি ভালুকের ঘরে পোষা কোন মানুষের ছেলে?

শর্মাজী—হতে পারে। না হতেও পারে। ঠিক বলতে পারি না।

মহেশপ্রসাদ—তবে ঠিক করে কী বলতে পারেন?

রামতনু—শুধু বলতে পারি, হিরু একটি আশ্চর্য মানুষ।

ছবি মদন সরকার

ক্ষ্যামা দিন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

থালা বাটি গামলা
কুকুরটাকে সাম্‌লা।

হাতুড়ি কোদাল কাস্তে
দাদু ঘুমোচ্ছেন, আস্তে।

ছুরি কাঁটা চাম্‌চে
বেড়াল দিল থাম্‌চে।

চিরুনি কাঁচি নরুন
চোর পালাচ্ছে, ধরুন।

রাস্তা গলি ফুটপাথ
মশার বড় উৎপাত।

বই কাগজ ম্যাগাজিন
ঢের হয়েছে, ক্ষ্যামা দিন॥

ছবি বিমল দাশ

কলকাতা

শঙ্খ ঘোষ

ইন্দ্র বরুণ অমর যম
বৃষ্টি করুন ঝমর্‌ ঝম্‌।

বৃষ্টি করুন রাতদিনই
নামব পথে সাধ্যি নেই।

চিত্রগুপ্ত খোল্‌ খাতা
ডুবল বলে কলকাতা।

দুলছে গাড়ি চৌকোনা
বাসটা যেন নৌকো না?

সেটাও যদি কম দোলায়
যাও চলে যাও গণ্ডোলায়।

কলকাতা কি ভেনিস হয়?
ব্রহ্মা ভাবেন সবিস্ময়।

বরং বলো হরিদ্বার
জুটবে কিছু খরিদদার।

ছবি বিমল দাশ

বাবুই

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বাবুই বাবুই করে মা
বাবুই গেছে কাদের গাঁয়
কী পারে তাই জানতে
বসেছে ধান ভানতে
চুল্লি ধরায় ছোবড়ায়
কোন্ গাঁ থাকে ঢোকরা?
এইটুকুনি প্রশ্নে
বাবুই কথা কস্‌নে,
বলেছে ভাট-গিন্নি
ধান কি? —ও তো বিন্নিই
ওইটুকুনি ভানতে
বাবুই, বসিস কান্দতে!
শোউরোবিবি, তাইতো
নইলে কী আর গাইতো
মেমসায়েবের গানটি—
ফাণ্টা ফানি ফানটি!

ছবি বিমল দাশ

চারজন

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ডোডোর বন্ধু তাতাই,
মাঝে মাঝে চুল তার হাতাই.
সুন্দর মুখ-চোখ, নাক যথেষ্ট,
পড়াশোনায় ক্লাসে নাকি বেস্ট ও।
তাতাইয়ের বন্ধু ডোডো
গুজব শুনছি জুডো শিখতে
যাবে হোক্কাইডো।
কী সাংঘাতিক
সব্বাইকে কাত করার এই বাতিক!
তাদের বন্ধু রাহুল,
সবকিছুতেই কি ভুল!
ফলকে বলে ফুল,
ভূগোল স্যারের প্রশ্নে
(এই তোরা হাসিসনে)
হিমালয়ের তুষারকে সে
বলে ফেলেছে তুরস্ক!
রাহুল অন্যমনস্ক।
রাহুলের ভাই পুঁচকু
নাকটা একটু বুঁচকু,
নাকের কথায় হয় না নাকাল
হাসে মুচকু মুচকু।

ছবি অহিভূষণ মালিক

একটি ভুতুড়ে ঘড়ি

বিমল কর

আমার বন্ধু নিত্যপ্রিয় কলকাতায় এলে আমার সঙ্গে দেখা করে যেত। সবসময় পারত না, কিন্তু সময় পেলে ঠিকই আসত। নিত্য আমার কলেজের বন্ধু, আমরা দু' চার জন খুবই গলায়-গলায় ছিলাম। ওর বাড়ি সালানপুর। জায়গাটা কলকাতার খুব কাছে নয়—আবার এমন একটা দূরে নয় যে, যাওয়াই যায় না। কলেজে পড়ার সময় নিত্য হোস্টেলে থাকত। তখন থেকেই সে কতবার আমাদের বলেছে তাদের সালানপুরের বাড়িতে যেতে। লোভ দেখিয়েছে অনেক, পুকুরে মাছ ধরার, পাখি শিকার করার, এখানে ওখানে বেড়াতে নিয়ে যাবার—তবু আমাদের যাওয়া হয়নি। মাছ ধরার কিংবা পাখি শিকার করার আমরা কিছু জানি না, বেড়াতে যাবার ইচ্ছে থাকলেও আলসেমি করে যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

গতবার শীতের মুখে নিত্যপ্রিয়র বাবা মারা গেলেন। চিঠি লিখেছিল নিত্য। শ্রাদ্ধের ছাপানো চিঠিও পেয়েছিলাম। যাব যাব করেও শেষপর্যন্ত যেতে পারিনি আমার মায়ের অসুখের জন্যে। হঠাৎ একটু বাড়াবাড়ি হয়েছিল মায়ের।

মা ভাল হয়ে যাবার পর নিত্যর চিঠি পেলাম। মায়ের খবর জানতে চেয়েছে। আমার নিজেরই খারাপ লাগছিল। এতদিন হয়ে গেল—বেশ কয়েকটা বছর—নিত্যর বাড়ি যাওয়া হল না। তার বাবার কাজের সময় অন্তত যাওয়া উচিত ছিল। তাও হল না।

আমাদের আর-এক বন্ধু বিভূতিকে বললাম, "যাবি? নিত্যর কাছে এবার যাওয়া উচিত, এই সময়টায় অন্তত। দিন তিন-চার ঘুরে আসি।"

বিভূতি রাজি। সে স্কুলে মাস্টারি নিয়েছে। পরীক্ষা-টরিক্ষা শেষ, ক্লাস প্রমোশানও হয়ে গেছে। হাতে তার কোনো কাজ নেই।

বড়দিন পেরিয়ে গিয়ে নতুন বছর পড়ছিল তখন। শীত পড়েছিল ভালই। এসময় দিনকয়েকের জন্যে বাইরে থেকে বেড়িয়ে আসতে ভালই লাগে মানুষের।

সালানপুর জায়গাটা আসানসোল থেকে মাত্র দু-তিনটে স্টেশন, মধুপুরের লাইনে। প্যাসেঞ্জার গাড়িতে না চাপলে মেরেকেটে ঘণ্টা ছয়-সাতের ব্যাপার।

বিভূতি আর আমি সত্যি-সত্যি ট্রেনে চেপে বসলাম বছরের একেবারে শেষ দিনটিতে।

চিঠি লেখা ছিল। সালানপুরে গাড়ি পৌঁছতেই দেখি নিত্যপ্রিয় স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে।

প্লাটফর্মে পা ছোঁয়াতেই নিত্যপ্রিয় ছুটে এল। "শেষ-পর্যন্ত এলি তাহলে? আয়।"

নিত্যপ্রিয়কে কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছিল। অশৌচ, শ্রাদ্ধ, নিয়মভঙ্গ সবই কেটে গেছে যদিও, তবু তার জের যেন এখনও মিলিয়ে যায়নি ওর শরীর থেকে। সামান্য রোগা রোগা, শুকনো দেখাচ্ছিল। মাথায় এখনও চুল গজায়নি তেমন, ছোট-ছোট খোঁচা-খোঁচা হয়ে রয়েছে। মুখটা বেশ ফ্যাকাশে।

বিভূতি নিত্যর পিঠে হাত রেখে বলল, "তোর অবস্থা আমার আগেই হয়ে গিয়েছে। কেমন আছিস এখন?"

"আছি এক রকম। আমরা সামলে নিয়েছি খানিক। মা এখনও ঠিক সামলে উঠতে পারেনি। মাকে নিয়েই মুশকিল।...নে, চল।"

নিত্যপ্রিয়র মুখে আগে শুনেছি অনেক, ধারণা করতে পারিনি। জায়গাটা সত্যি চমৎকার। যেদিকে তাকাও আকাশ যেন ঢলে-পড়েছে। যেমন ফাঁকা, কত গাছপালা, শালুক পাতায় ভরে আছে পুকুর, শ্যাওলা রয়েছে, কিন্তু ঘোলাটে জল কোথাও নেই বড়। হা-হা করছে মাঠ, সবজির ক্ষেত, ঘাসের ওপর জমে থাকা রাতের হিম এখনও শুকিয়ে ওঠেনি। রোদ টলটল করছে। বাতাসের গন্ধটাই আলাদা।

নিত্যদের বাড়ি এসে আরো অবাক হয়ে গেলাম। চার-দিকে উঁচু পাঁচিল, বাড়িটাও এক বিচিত্র ছাঁদের, দুর্গ-দুর্গ দেখতে লাগে, জলে-জলে শ্যাওলা জমে গেছে বাইরের দেওয়ালে, জানলাগুলো ছোট-ছোট, কার্নিশে লোহার শিক পোঁতা। বাড়ির পেছন দিকে বাগান। ফলের গাছ অনেক রকম। বাগানের অন্যপাশে লোহা-লক্কড়ের স্তূপ, মায় একটা ভাঙা বাড়ি।

দোতলার কোনার ঘরে আমাদের জায়গা করে রাখা হয়েছে। খাট-বিছানা সাজানো।

এই বাড়িটা নিত্যদের দু পুরুষের। তার ঠাকুরদা শুরু করেছিলেন; বাবা শেষ করেছেন।। নিত্যকে কিছু করতে হবে না। জমি-জায়গা দেখাশোনা করে আর কোলিয়ারির ঠিকাদারি করে দু' পুরুষে অবস্থা বেশ সচ্ছলই করে গেছেন নিত্যর পূর্বপুরুষরা। নিত্যও ঠিকেদারি কাজ নিয়ে আছে। একসময়ে এদিকে ডাকাতির খুব উপদ্রব ছিল। কাজেই বাড়িটাকে ওইরকম দুর্গের মতন চেহারা করে গড়ে তুলতে হয়েছে। বন্দুক-টন্দুকও আছে বাড়িতে।

খাওয়া-দাওয়া গল্পগুজব করে দুপুরটা কাটল। বিকেলে বেরোলাম বেড়াতে। ভালই লাগছিল। তবে শীতটা বড় বেশি। আমাদের মতন কলকাতার শহুরে বাবুদের গায়ের চামড়ায় এ-শীত সহ্য হয় না। উত্তুরে বাতাস দিতে লাগল কনকনে, ঝপ করে আকাশ থেকে অন্ধকারটাও খসে পড়ল। আর বেড়ানো হল না। বাড়ি ফিরলাম।

বাড়ি ফিরে চা, মুড়ি, আলুর ঝাল-ঝাল বড়া, বেগুনি খেতে-খেতে হাজার রকম গল্প। একটা ছোট পেট্রোম্যাক্স বাতি জ্বালিয়েছিল নিত্য সেটা জ্বলতেই লাগল। বাইরে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার।

গল্পে গল্পে রাত হয়ে গেল খানিকটা। নিত্যর ছোট ভাই বার কয়েক তাগাদা দিল। আমরা খেতে চললাম অন্য ঘরে।

নিত্য তার শোবার ব্যবস্থা আমাদের সঙ্গেই করেছিল। কারণ আর কিছু নয়, আড্ডা আর গল্প। সর্বক্ষণ সে আমাদের আঁকড়ে থাকতে চায়।

খেয়ে এসে আবার আমরা বসলাম। এবারে আর পেট্রো-ম্যাক্স নয়, লণ্ঠন জ্বলতে লাগল ঘরে।

তিন বন্ধু সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে-বসে গল্প করছি। করতে-করতে নিত্যর বাবার কথা উঠল। তার বাবার মৃত্যু থেকে কথাটা গড়িয়ে-গড়িয়ে আত্মা, পরলোক, পুনর্জন্ম, জাতিস্মর এইসব প্রসঙ্গ থেকে একেবারে ভূতের প্রসঙ্গে চলে গেল।

আমি বরাবরই একটু ভিতু গোছের লোক। ভূত মানি আর না-মানি গা-ছমছমে গল্প শুনলে অস্বস্তি হয়। তার-ওপর ওই নতুন জায়গা। ঘরের মধ্যে তাকালে ছাদটাও ভাল করে চোখে পড়ে না—এত উঁচু ছাদ, আর এমনই মিটমিটে আলো। তিন চারটে কুলুঙ্গিতে যেন অন্ধকারের তাল জমে আছে। দেওয়াল-তাক গোটা দুই, দেখতে চোরা-দরজার মতন।

বিভূতি স্কুলের সায়েন্স টিচার। ফিজিক্স আর অঙ্ক পড়ায়। নিজেকে সে কী ভাবে জানি না; তবে আমার মতন ভিতু নয়। ভূতটুত মানে না। ভূতের গল্পে তার রুচি থাকলেও ভূতে নেই। বিভূতি ইয়ার্কি ঠাট্টা করছিল। তামাশা করছিল।

রাত হয়ে যাচ্ছে। লম্বা একটা হাই তুলে বিভূতি বলল, "ভূতের ব্যাপারে আমার থিয়োরি হচ্ছে—যার ভূত ভবিষ্যৎ কোনোটাই নেই সেইটেই হচ্ছে আসল ভূত, আদি ভূত।"

আমি ঠাট্টা করে. বললাম, "প্রায় তোর মতন অবস্থা তাহলে!"

বিভূতি বলল, "ঠিক বলেছিস। আমরাই যথার্থ ভূত।"

এমন সময় নিত্য হঠাৎ বলল, "তোদের একটা জিনিস দেখাব। দেখবি?"

"ভূত দেখাবি?" বিভূতি তামাশা করে বলল, "তোদের এই বাড়ির চারপাশে যত নিম, বেল, কাঁঠাল গাছ, তাতে দু-চারটে ভূত থাকলেও থাকতে পারে।"

নিত্য বলল, "না. বাইরে নেই। ভেতরেই এক জিনিস আছে, যার ভয়ে আমি মরছি। দাঁড়া আসছি।"

নিত্য উঠে গেল।

আমার ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। দুপুরে এক চোট ঘুমিয়েছি। তবু। বাইরে এলে বোধহয় একটু বেশি ঘুম পায়। তার ওপর বাইরে শীতের হাওয়ার শব্দ, ঘরে কনকনে ঠাণ্ডা, লেপের আরাম, ঝাপসা ঘর—ঘুমের আর দোষ কোথায়! নিত্য কোন্ জিনিস এনে দেখায়, তার জন্যে কৌতূহলও হচ্ছিল।

দুটো খাট পাশাপাশি আমাদের জন্যে পাতা। নিত্যর জন্যে একটা নেয়ারের খাট। মশারি রয়েছে, শোবার সময় টাঙিয়ে নেব।

শীতটা বাস্তবিকই এখানে বেশি। ঘরের মধ্যেও হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। লেপ চাপা দিয়ে বসে আছি আমরা।

নিত্য ফিরে এল।

ফিরে এসে বিছানায় বসল। বলল, "এই জিনিসটা দেখ্।"

দেখার মত অদ্ভুত কিছু নয়। একটা পকেট ঘড়ি। মান্ধাতার আমলের।

বিভূতি হাত বাড়িয়ে ঘড়িটা নিল। এ-রকম ঘড়ি আজ-কাল আর দেখা যায় না। ব্যবহার করে না কেউ। আগে খুব চল ছিল। চেন-বাঁধা পকেট-ঘড়ি আমিও দেখেছি. আমার বড় মামা বরাবর ব্যবহার করত।

ঘড়ির উপর ঢাকনা ছিল। বুড়ো আঙুল দিয়ে আঙটা টিপতেই খুলে গেল।

ঝুঁকে পড়ে আমরা দেখতে লাগলাম। ডায়ালটা ময়লা হয়ে এলেও রোমান হরফের দাগগুলো পড়া যায়, কাঁটা দুটোও ঠিক আছে। কোন্ কম্পানির ঘড়ি বোঝা গেল না, লেখাটা মুছে গেছে—দু একটা অক্ষরই শুধু চোখে পড়ে আবছা ভাবে।

বিভূতি বলল, "তোর বাবার ঘড়ি?"

নিত্য বলল, "না, আমার ঠাকুরদার।"

"তা এতে দেখবার কী আছে? পকেট-ঘড়ি। বাইরের ডালাটায় কারুকাজ রয়েছে। এই তো?"

আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে নিত্য কেমন করে যেন হাসল, মরা হাসি। বলল, "ঘড়িটা এখনও চলে। দেখবি?" বলে ঘড়িটা নিয়ে পুরো দম দিল নিত্য। দম দিয়ে বিভূতির হাতঘড়ির সঙ্গে সময় মিলিয়ে দিল। দশটা পঞ্চান্ন। বলল, "ঘড়িটা চলছে। কানে নিয়ে শোন।"

কানের কাছে ঘড়ি নিয়ে শুনল বিভূতি। আমারও হাতে দিল। আমিও শুনলাম। টিকটিক শব্দ হচ্ছে। সেকেলে ঘড়ি,

সেকেণ্ডের কাঁটা নেই—থাকলে কানে শুনতে হ'ত না।
ঘড়িটা ফেরত নিয়ে নিত্য বিছানার ওপর রেখে দিল। বলল, "ঘণ্টা খানেক আমাদের জেগে থাকতে হবে।"

"কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

নিত্য বলল, "ঘড়িটা এখন ঠিক চলবে। বারোটা বেজে সাত মিনিটের পর আর চলবে না।"

"তার মানে?"

"দেখ না। ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা কর।"

বিভূতি বলল, "তুই বলছিস—বারোটা বেজে সাত মিনিটে ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যাবে?"

"কাঁটায় কাঁটায়।"

"কেন?"

"তা জানি না।" বলে একটু থেমে আবার কী বলতে যাচ্ছিল, না বলে থেমে গেল।

বিভূতি বিশ্বাস করল না। আমিও না। যে ঘড়িটায় এইমাত্র দম দেওয়া হল সেই ঘড়ি কী করে ঘণ্টাখানেক পরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে? যদি এমনই হয় ঘড়িটা খারাপ, তবে সেটা বারোটা বেজে সাত মিনিটের আগেও বন্ধ হতে পারে, পরেও পারে। ঠিক বারোটা সাতে বন্ধ হবে কেন?

বিশ্বাস করার কারণ ছিল না। আমরা বিশ্বাস করলাম না। অবশ্য কৌতূহল হল।

ঘড়িটা বিছানার ওপর রেখে আমরা বসে থাকলাম। বিভূতি এটা সেটা জিজ্ঞেস করতে লাগল। নিত্য বলল, এখন সে কিছুই বলবে না, আগে আমরা দেখি সে যা বলেছে তা সত্যি কিনা!

বিভূতি দু-চারবার ঠাট্টা তামাশা করল। তারপর আমরা সময় কাটাবার জন্যে অন্য গল্প করতে লাগলাম। মন আর চোখ পড়ে রইল ঘড়ির কাঁটায়।

শীতের দিন। আগে বুঝিনি, ঘড়িতে রাত দেখার পর ঘুম যেন চোখের পাতায় চেপে বসছিল। ঘন ঘন হাই উঠছিল। কথা জড়িয়ে আসছিল ঘুমে।

এই ভাবে বারোটা বেজে এল।

আমরা চোখের পাতা রগড়ে সোজা হয়ে বসলাম। আর কিছুক্ষণ মাত্র। দেখা যাক, নিত্য আমাদের সঙ্গে তামাশা করল কিনা!

বিভূতি বলল, "নিত্য, তুই যদি ধাপ্পা মেরে থাকিস, তোকে আমি বাইরে বার করে দেব।"

নিত্য জবাব দিল না কথার, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকল।

কাঁটায়-কাঁটায় বারোটা। বাইরে কোনো সাড়াশব্দ নেই, এই বাড়িটাও নিঃসাড়। সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। নিঝুম চারদিক। আমরা তিনজন মাত্র জেগে আছি।

চোখের পাতা থেকে ঘুম যেন একটুর জন্যে সরে গেল। দেখি, নিত্য একদৃষ্টে ঘড়ির দিকে চেয়ে আছে। তার চোখে-মুখে কেমন যেন উত্তেজনা। ভয়। বিভূতি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখছিল ঘড়িটা। আমার হঠাৎ কেমন গা শিউরে উঠল। ভয়ভয় করতে লাগল। যদি নিত্যর কথা সত্যি হয়, তবে?

বারোটা তিন হল। আমার বুক ধকধক করছিল। বারোটা চার। নিত্য একদৃষ্টে চেয়ে, চোখের পাতা পড়ছে না। বিভূতি ঝুঁকে পড়ল।

বারোটা পাঁচ। ঘড়ি চলছে। মিনিটের কাঁটাটা এত আস্তে নড়ছে কিছুই বোঝা যায় না। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

বারোটা ছয়। বিভূতি একবার আমার দিকে তাকাল। তারপর নিত্যর দিকে। কোনো কথা বলল না। আমি আরও ঝুঁকে পড়লাম। বুক কাঁপছিল।

বারোটা সাত।

আমাদের তিনজনের চোখ ঘড়ির কাঁটার ওপর স্থির হয়ে আছে, নড়ছে না। তাকিয়ে আছি, তাকিয়ে আছি... সময় কাটছে তবু কাঁটা আর নড়ছে না। বিভূতি ধৈর্য হারিয়ে তার হাতঘড়ি দেখল, বারোটা নয়। তারপর পকেট-ঘড়িটা তুলে নিয়ে কানের কাছে রাখল। তার মুখ কেমন থম মেরে গেল। অবাক, বিমূঢ়, ভীত। বলল, "বন্ধ হয়ে গেছে।"

নিত্য এতক্ষণ পিঠ নুইয়ে বসেছিল। পিঠ সোজা করল এবার। হাঁফ ফেলল স্বস্তির। অন্যমনস্কভাবে বলল, "এই রকমই হয়। বারোটা সাতে বন্ধ হয়ে যায়।"

আমি বেশ ভয় পেয়েছিলাম। বললাম, "কেন?"

নিত্য বলল, "এখন আর বলব না। কাল শুনিস।"

বিভূতি বলল, "দিনের বেলা বন্ধ হয় না? বারোটা সাতে?"

"না।"

"অসম্ভব। এ-রকম হতেই পারে না।"

"হয়।"

"আমি কাল দেখব।"

"আমি দেখেছি কতবার।"

"আমি নিজের চোখে দেখব।...কেমন করে এটা সম্ভব?"

"কী জানি কেমন করে হয়! আমিও বুঝি না।"

আমি বেশ ভয় পেয়েছিলাম। ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, "ঘড়িটা ভূতুড়ে। ওটা সরা। আমার বিছানা থেকে সরিয়ে নে। সারা রাত আজ আর আমার ঘুম হবে না।"

পরের দিন সকাল থেকেই বিভূতি ঘড়িটা নিয়ে পড়ে থাকল। তার জেদ। সে দেখতে চায় কেন একটা ঘড়ি এই রকম বিচিত্র ব্যবহার করবে। এ তো মানুষ নয় যে, তার খেয়াল-খুশি থাকবে। ঘড়ি হল যন্ত্র। যন্ত্রর কোনো খেয়ালখুশি থাকতে পারে না, যদি-বা থাকে, তাকে আমরা যান্ত্রিক গোল-

যোগ বলি; যান্ত্রিক কারণ ছাড়া তা হতে পারে না।

সকালের দিকে বিভূতি ঘড়িটা চেয়ে নিয়ে আবার একটু দম দিল, নাড়াচাড়া করল, সময় মিলিয়ে দিল। ভুতুড়ে ঘড়িটা চলতে লাগল আবার।

নিত্য আমাদের নিয়ে কাছাকাছি বেড়াতে বেরুল। হাঁটা-হাঁটি করলাম খানিক। স্টেশনের সামনে একটা মেঠো চায়ের দোকানে বসে চা খেলাম। রোদ, ধুলো, শীতের বাতাস খেয়ে বাড়ি ফিরলাম বেলা করে। যাই করি না কেন, মাথার মধ্যে ঘড়ি। ঘড়ি ছাড়া চিন্তা নেই। নিত্যকে কিন্তু মনমরা দেখাচ্ছিল।

খুবই আশ্চর্যের কথা, দিনের বেলায় ঘড়িটা ঠিকই চলছিল। কে বলবে অত পুরনো এক পকেট-ঘড়ি এইভাবে চলতে পারে। বেলা বারোটা পেরিয়ে গেল। আমি আর বিভূতি ভেবেছিলাম—ঘড়িটা থেমে গেলেও যেতে পারে। থামল না। বারোটার কাঁটা ছাড়িয়ে ছোট কাঁটাটা একটায় পেঁৗছল, তারপর দুটোয়। বিভূতি রীতিমত ঘাবড়ে গেল। নানা রকম যুক্তি বার করতে লাগল, আঙ্কিক যুক্তি। কাগজ কলম নিয়ে অঙ্ক কষতে বসল খেপার মতন। শেষে বিরক্ত হয়ে বলল, ধ্যুত্, এ আমার মাথায় ঢুকছে না। তবে আজ আর-একবার রাত্রে দেখব সত্যিই ঘড়িটা বারোটা সাতে বন্ধ হয় কিনা!"

আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না, ঘড়িটা ভুতুড়ে। যথা-সময়ে ওটা আবার বন্ধ হবে।

বিভূতি তবু জেদ ধরে থাকল। নিত্য আপত্তি করল। কী হবে আর ঘড়ি দেখে? বিভূতি শুনল না। তার বড় জেদ।

রাত্রে আবার আমরা তিনজন ঘড়ি নিয়ে বসলাম।

আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। নিত্যকে বললাম,

"ঘড়িটা তোরা তো ব্যবহার করিস না?"

"না।"

"এতকাল ওটা ঠিক আছে কেমন করে?"

"তাও জানি না। বাবা দু-চারবার ঘড়িটা কলকাতায় নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিলেন।"

"তখনও কি এই রকম ভাবে বন্ধ হত?"

"হত। বাবার নজরেই ব্যাপারটা প্রথম ধরা পড়ে। বাবাও বিশ্বাস করেননি, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছেন। দোকানের লোকরাও কিছু বলতে পারেনি।"

"আশ্চর্য!"

"ঘড়িটা বাবার ঘরে থাকত। ড্রয়ারের মধ্যে। বাড়ির কারও আপদ-বিপদ ঘটলে দম দিতেন।"

"কেন, আপদ-বিপদ ঘটলে কেন?"

"সে একটা ব্যাপার আছে।" শুকনো মুখে নিত্য বলল।

"তুইও দমটম দিস?"

"না।"

"কেন?"

"কী হবে দম দিয়ে?"

আমি নিত্যর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ওকে কেমন অন্যমনস্ক, গম্ভীর, মনমরা দেখাচ্ছিল।

কথায় কথায় রাত বাড়ল। এগারোটা বাজল। দেখতে-দেখতে সাড়ে এগারো। তারপর ঘড়ির ছোট কাঁটা বারোটার দিকে এগুতে লাগল।

আমি বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম ঘড়িটা ঠিক সময়ে থেমে যাবে। বিভূতির সন্দেহ যায়নি।

ঠিক যখন বারোটা তখন নিত্য কেমন চঞ্চল-বিহ্বল হয়ে বিভূতির হাত ধরে ফেলল। তারপর থরথর করে কাঁপতে লাগল। আমরা হতভম্ব।

বিভূতি বলল, "কীরে, তোর হল কী?"

নিত্যর দু চোখে জল। ঠোঁট ফুলে উঠেছে। কেঁদে ফেলল নিত্য।

ঘড়ির দিকে একবার তাকালাম আমি। পলকের জন্যে। বারোটা বেজে দু মিনিট।

বিভূতি আবার বলল, "তুই অমন করছিস কেন? কী হয়েছে তোর?"

নিত্য কান্না জড়ানো অস্পষ্ট গলায় বলল, "বাবা মারা যাবার দিন ঘড়িটা বারোটা সাতের পরও চলছিল। আমি দেখেছি।"

"তার মানে?"

"ঘড়িটা আমাদের সংসারের অমঙ্গলের কথা, মৃত্যুর কথা বলে দেয়। আমার কাকা, আমার মেজ ভাই, বাবা—এই তিনজনের মৃত্যুর দিনই ঘড়িটা চলেছে, বাবা চালিয়েছিলেন। আর কোনোদিন কখনো চলেনি। আমার আজকাল আর ঘড়িটা দেখতে ইচ্ছে করে না। ভয় হয়।...আজ দুপুর থেকে মায়ের শরীর খারাপ...।"

নিত্য কাঁদতে কাঁদতে ঘড়ির দিকে তাকাল।

বিভূতি কেমন যেন চমকে গিয়ে ঘড়িটা তুলে নিল। নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ডালাটা বন্ধ করে দিল।

আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। নিত্যর মুখ সাদা।

ঘড়ির কাঁটাটা বারোটা সাতে থামার জন্যে আমরা ভগবানের পায়ে মাথা খুঁড়ছিলাম। বিভূতির হাত কাঁপছিল। আমার বুক ধকধক করছিল। আর নিত্য কাঠ হয়ে বসে ছিল।

বারোটা সাতের দিকে ঘড়ির কাঁটাটা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছিল। ডালার তলায় কী হচ্ছে, তা দেখার সাহস আমাদের হচ্ছিল না।

ছবি মদন সরকার

ছেড়ে দে

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

ছেড়ে দে রে, ছেড়ে দে রে, ছেড়ে দে,
পারিস তো, দুটো আম পেড়ে দে।
ছেড়ে দে।

করিস না ঘ্যান্‌ঘ্যান্, প্যান্‌প্যান্,
ঘুষি মেরে করে দেব অজ্ঞান।
চাস যদি, ল্যাজখানা নেড়ে দে।
ছেড়ে দে।

হাঁউমাউ করে কাকে পাবি রে?
তার চেয়ে, দোল খেল্ আবিরে।
যার খিদে, তাকে ভাত বেড়ে দে।
ছেড়ে দে॥

লক্ষ্মী

লীলা মজুমদার

বোর্ডিংয়ের মাসিমা মাখনের কৌটো, জ্যামের শিশি, সব জালের আলমারিতে বন্ধ করে বললেন, "লক্ষ্মী বড় দুষ্টু মেয়ে। কেউ এসে খাবার টেবিলে বসবার আগেই, কোথাকার এক পাতিবেড়ালকে অর্ধেক মাখন জ্যাম খাইয়ে দিয়েছে। কেন?"

লক্ষ্মী বলল, "ওর যে খিদে পেয়েছিল, ম্যাও-ম্যাও করে কাঁদছিল।"

মাসিমা রেগেমেগে বললেন, "তা হলে বেড়াল নিয়ে আজ তুমি আমার স্নানের ঘরে বন্ধ থাকো। আমরা সকলে ঝরনা-তলায় চড়িভাতি করতে যাচ্ছি।"

শুনে লক্ষ্মী এমনি অবাক হয়ে গেল, সে আর কী বলব। তারপর যখন মণি, ফেনি, ললিতা, বুলু এমন কী বোকা মুকুল পর্যন্ত মাসিমার সঙ্গে ঝরনা-তলায় যাবার জোগাড় করতে লেগে গেল, লক্ষ্মীর মুখে কথা সরে না।

হিংসুটি মালতী একটা টফির বাক্সে শুকনো পাঁউরুটি আর এক বোতল জল স্নানের ঘরে তাকের ওপর রেখে, ফ্যাচ-ফ্যাচ করে হাসতে হাসতে বলল, "এই রইল তোমার খাবার। আমরা লুচি, কপি-ভাজা, আলুর দম আর ক্ষীরের সন্দেশ নিয়ে যাচ্ছি।" তখন তার চুলের মুঠি ধরে দেয়ালে দুবার মাথা ঠুকে দিয়ে, ঠেলে দরজার বাইরে বের করে না-দিয়ে লক্ষ্মী করে কী?

মালতীটা এমনি ছিঁচকাঁদুনে যে ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করতে করতে অমনি চলল নালিশ করতে। লক্ষ্মী স্নানের ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে, একটা জল-চৌকিতে ভাবতে বসল। ভুলে জানলা বন্ধ করেনি, সেখান দিয়ে বড় মেয়ে অনুদিদি যেই না মুখ বাড়িয়ে বলতে শুরু করেছে, "ছিঃ! তোমার কি লজ্জাও নেই! কিন্তু মাসিমা বলেছেন আর যদি কখনো এমন খারাপ কাজ না করো, তাহলে তোমাকে ক্ষমা—" এই অবধি বলে আর কিছু বলা হল না, কারণ টবের হাতলে একটা বড় মাকড়শা বসে ছিল, লক্ষ্মী সেটাকে ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে অনুদির মুখে ছুঁড়ে মারল। অনুদি আঁউ-আঁউ করতে করতে দৌড়ে পালাল। লক্ষ্মী জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে, তাক-ঢাকা কাগজ পাকিয়ে নল বানিয়ে, নলের মাথা ভিজিয়ে সাবানের গায়ে ঘষে, রাশি রাশি ছোট ছোট বুদ্বুদ ওড়াতে লাগল। দেখতে-দেখতে ঘরময় সাবান-জলের ফোঁটা পড়ে বিশ্রী দেখতে হয়ে গেল। তা ছাড়া আর বুদ্বুদ ওড়াতে ভালও লাগছিল না। লক্ষ্মী দু হাত কনুই অবধি ডুবিয়ে জল ঘাঁটতে বসে গেল, কাপড়চোপড় ভিজে চুপ্‌চুপ্‌।

যাবার আগে মাসিমা নিজে এসে দরজায় ঠেলাঠেলি করতে লাগলেন, "দরজা খোলো, লক্ষ্মীটি, সত্যি কি আর তোমাকে ফেলে যেতে পারি আমরা? ঐ একটু শিক্ষা দিলাম। চলো, আমরা এবার রওনা হব।"

লক্ষ্মী জানলাটা একটু ফাঁক করে মাসিমাকে কাঁচকলা দেখাল।

মাসিমার নরম ফরসা গালটা রাগের চোটে লাল শক্ত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "বেশ, তবে থাকো ওখানে!" বলে বাইরে থেকে দরজা-জানলার শিকলি তুলে দিয়ে, দুম-দুম করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

একটু পরেই বাইরে ওদের কলকল শব্দ শোনা গেল। সবাই রওনা হয়ে গেল, চৌকিদারের ছেলে সাঁইলা ওদের

খাবার-দাবার নিয়ে চলল। জানলা ফাঁক করে লক্ষ্মী সব দেখল।

ওরা সত্যি-সত্যি চলে গেলে পর বোর্ডিং-বাড়িটা একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল। সে কী ভয়ঙ্কর চুপচাপ যে ভাবা যায় না। কানের মধ্যে কী রকম ঝিম-ঝিম শব্দ হতে লাগল। কাঠের সিঁড়ি, কড়িবরগা থেকে কেমন মট্-মট্ আওয়াজ শোনা গেল। চৌকিদার, মালী, এদের ঘর অনেক দূরে, ডাকলেও কেউ শুনতে পাবে না। জ্যোঠি বলে যে বুড়ি ওদের রান্নাবান্না করত, সে-ও এ-বেলার মতো কাজ সেরে নিশ্চয় নিজের ঘরে চলে যাবে। তিনটের আগে তার টিকির ডগা দেখা যাবে না। চারটের সময় চাঁড়ভাতি-ওয়ালীরা ফিরবার আগে চা-জলখাবার বানাবে। লক্ষ্মীর কথা হয়তো তার মনেও থাকবে না। রেগে গিয়ে লক্ষ্মী মাসিমার চুল কালো করার ওষুধের শিশি থেকে সব ওষুধটা নর্দমায় ঢেলে দিয়ে, শিশিটা টবের পিছনে লুকিয়ে রাখল। বুঝুক মাসিমা খারাপ ব্যবহার করার ফল!

টবের পিছনের দেয়ালটা কিন্তু বেশ অদ্ভুত। রঙটাতে কেমন ছোপ ধরে, বিকট সব মুখ হয়ে আছে। এই বাড়িটাই একটু অদ্ভুত, আগে নাকি এখানে এক চা-বাগানের সায়েব থাকত, তার স্ত্রীরা সবাই মরে যেত। তারপর থেকে রাতে কী সব আওয়াজ হত, বড় বাড়িতে চাকর-বাকররা শুতে চাইত না। এসব জ্যোঠির মুখে শোনা। শেষটা টিঁকতে না পেরে বাড়িটা বাস্তু বিভাগকে দান করে সায়েব বিলেত চলে গেল। সেও প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে চলল। সেই ইস্তক বাড়ি খালি পড়ে ছিল। পয়সা দিলেও কেউ থাকত না। জ্যোঠিকে একশো টাকা দিলেও রাত দশটার পর সে এ-বাড়িতে থাকতে রাজি নয়। দশ বছর আগে বাড়ি মেরামত করে, সাজিয়ে-গুজিয়ে এই সরকারি স্কুল হয়েছে। একজন মন্ত্রী নিজে এসে লাল রেশমী ফিতে কেটে ইস্কুল খুলে দিয়েছিলেন। বড়-লোকরা ভাল কাপড় চোপড় পরে, হাততালি দিয়েছিল। নতুন চৌকিদাররা মুরগি বলি দিয়ে দেওয়ের পুজো দিয়েছিল। হুঃ! তাতে তো ভারি ফল হল! যাক গে, জ্যোঠি এ-বিষয়ে কিছু বলতে চায় না, মাসিমা আসছেন! বেড়ালটাকেও আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। এই ছিল, এই নেই। ঘরের দরজা-জানলা তো বন্ধ, তাহলে সে গেল কোথায়। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে লক্ষ্মী স্নানের ঘরের বাইরের জানলাটা খুলে চারদিকে দেখতে লাগল। ঠিক সেই সময় রান্নাঘরের দরজা খুলে জ্যোঠি বেরিয়ে এসে, দরজা বন্ধ করে, এই বড় একটা তালা লাগিয়ে দিল। তারপর দোতলায় লক্ষ্মীর দিকে চোখ পড়তেই, ঠোঁট কুঁচকে বলল, "নাও, এবার বোঝো ঠেলা! রোজ-রোজ আমার দুধের সর ছিঁড়ে খাওয়া, ময়লা আঙুলে ময়দা ঘাঁটা, কলের জল খুলে রাখা, এবার বেরুচ্ছে সব!"

শুনে লক্ষ্মী এমনি অবাক হয়ে গেল যে, শুধু জিব ভ্যাঙানো ছাড়া কিছু করতেই পারল না। কারণ ও-সব ও মোটেই করেনি। কিন্তু যে করেছে সে বেশ করেছে, খুব ভাল কাজ করেছে, লক্ষ্মী খুব খুশি হয়েছে। জ্যোঠি খোবানি গাছের তলা দিয়ে ঘুরে সামনের গেটের দিকে চলে গেল। লক্ষ্মী বাইরে চেয়ে রইল। নীল আকাশের ওপর বরফের পাহাড়গুলোকে মনে হচ্ছে আঁকা। রান্নাঘরের পেছনের রাস্তা বেজায় পিছল। তার ওপারে ছোট্ট একটা ঝরনা, অনেক ওপর থেকে পড়ছে। কান খাড়া করলে তার ঝর-ঝর শব্দ শোনা যায়। ওর নাম নাকি "মণি-ঝোরা"। জ্যোঠি বলে, মনে পাপ থাকলে, মণি-ঝোরার জল খেলেই পেট কামড়ায়।

মণি-ঝোরার দিকে যাওয়া বারণ। অনেক বছর আগে প্রকাণ্ড ধস নেমে মণি-ঝোরার ওপারের পাহাড়ের গা খসে, বাড়ি-ঘর লোক-জন নিয়ে একেবারে নীচে, সেই সোনেরি-চঙে পড়ে গেছিল। আগে ওখানে নাকি খুব ভাল একটা ফলের বাগান ছিল, মস্ত একটা বাড়ি ছিল, সেখানে দুষ্টু মেয়েদের ভাল হতে শেখানো হত। মাসিমা একদিন বলেছিলেন, সেটা এখন থাকলে লক্ষ্মীকে ভরতি করে দিতেন। ভেবেও এমনি রাগ হল লক্ষ্মীর যে, মাসিমার সুগন্ধী সাবানটা টবের জলে ফেলে দিয়ে গোলাপ-এসেন্সের তেলটার অর্ধেক নিজের মাথায় আর পায়ে মেখে ফেলল।

তারপর আবার জল-চৌকিতে বসে রইল। হঠাৎ কানে এল বাইরে ধুপধাপ, কলকল শব্দ। এ আবার কী? অমনি জানলার কাছে গিয়ে দেখে কী, না আজ ছুটির দিনে একপাল মেয়ে এসে স্কুল-বাড়ির বাগানে ঢুকেছে। নিশ্চয়ই পেছনের কাঠের গেট দিয়ে। সামনের দিকে তো চৌকিদারের ঘর। ওদের দেখেই লক্ষ্মীর মনটা খুশী হয়ে উঠল। মেয়েগুলোর সব কটার দুটো করে বেণী বাঁধা, গায়ে গাঢ় নীল জামা পরা, এই শীতের দেশেও খালি পা। কিন্তু কী দুষ্টু, কী দুষ্টু! এসেই মাসিমার শাকের গাছ মাড়িয়ে গাঁদাফুল গাছ উপড়ে, তরতর করে গাছে চড়ে কাঁচা খোবানি ছিঁড়ে সে যে কী অসভ্যতা আরম্ভ করে দিল, দেখে লক্ষ্মীর চুল খাড়া। শেষটা আর থাকতে না-পেরে ওপর থেকে ডেকে বলল, "অ্যাই অসভ্য মেয়েরা! আমাদের বোর্ডিংয়ে এসে কী লাগিয়েছিস? পালা বলছি!"

তাই শুনে ওপর দিকে তাকিয়ে তারা হেসেই কুটোপাটি! "কেন মারবি নাকি। তাহলে অত বোলচাল না ঝেড়ে, নেমে এসে মার না।" এই বলে ভেংচি কেটে, বক দেখিয়ে, এক পায়ে নেচে, দুকানে দুই বুড়ো আঙুল পুরে আঙুল নেড়ে, যাচ্ছেতাই কাণ্ড বাধাল। স্নানের ঘরের কাঠের সিঁড়ি দিয়ে যে-কটা উঠে আসছিল, লক্ষ্মী তাদের গায়ে এক মগ ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিল। তারা যে কী খারাপ কথা বলতে লাগল সে ভাবা যায় না! তারপর টপটপ করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এসে, বৃষ্টির জল যাবার পাইপ ধরে ঝুলতে লাগল।

লক্ষ্মী বলল, "আমাকে যদি ছেড়ে দাও, তাহলে আমি আর তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করব না।"

মেয়েগুলো থমকে থেমে গেল। "ঘরে বন্ধ? ছুটির দিনে তোমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছে! কী খারাপ! কী খারাপ! দাঁড়াও, এক্ষুনি খুলে দিচ্ছি।" এই বলে পাইপ থেকে দোল খেয়ে দুটো রোগা মেয়ে স্নানের ঘরের জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকল। লক্ষ্মী একেবারে হাঁ! পকেট থেকে পুরনো একটা চাবি বের করে, কাঠের সিঁড়ির মাথায় স্নানের ঘরের বন্ধ দরজায় মাসিমা যে তালা লাগিয়ে গেছিলেন, সেটাকে কট্ করে খুলে ফেলল।

লক্ষ্মী অবাক হয়ে বলল, "ও কীরকম চাবি, ভাই, বিলিতী তালাও খোলে?"

ওরা খিলখিল করে হেসে বলল, "সব তালা খোলে এই চাবি দিয়ে। তোমাদের রান্নাঘরের তালাও!"

লক্ষ্মী যেন আকাশ থেকে পড়ল, "তোমরাই তাহলে জ্যোঠির সর ছেঁড়ো, ময়দা ছড়াও?"

ওরা বেজায় হাসতে লাগল, "তা ছাড়া উনুনে জল ঢেলে রাখি, মুরগি ছেড়ে দিই, দুধে তেঁতুল ফেলি, আরো কত কী করি।"

লক্ষ্মী একটু গম্ভীর হয়ে গেল, "কোথায় থাকো তোমরা?"

ওরা বলল, "কেন, আমাদের ইস্কুলে। মণি-ঝোরার ওপারে।"

"দেখেছ, মাসিমা কী খারাপ! বলে নাকি ওদিকে যেও না, ওদিকে কিচ্ছু নেই!"

মেয়েগুলো এ ওকে ঠেলা দিয়ে বলল, "কিচ্ছু নেই তো আমরা এলাম কোত্থেকে? চলো, দেখবে চলো।"

তাই নিয়ে গেল ওরা পিছল পেছনের রাস্তা দিয়ে, মণি-ঝোরার ঝরনার ঠিক মাথার ওপর দিয়ে। সেখানে দাঁড়িয়ে সবাই আঁজলা-আঁজলা জল খেয়ে নিল। তারপর খাড়া খানিকটা পাহাড় বেয়ে। সেখানে ঝোপে-ঝাড়ে থোপা-থোপা লাল-কালো বেরি হয়েছিল। কী মিষ্টি, কী মিষ্টি! একটাতেও পোকা নেই।

তাই শুনে মেয়েগুলো কী খুশি! "ঠিক তাই! একটা খারাপ জিনিস পাবে না আমাদের ইস্কুলে।"

বাস্তবিকই তাই। চারদিকে ফুল-ফলের বাগান ফুটফুট করছে। গাছে গাছে পাকা কমলা, কলা, আপেল, ঝোপে-ঝোপে লাল, সাদা, গোলাপী, হলদে গোলাপ ফুল। মস্ত লম্বা একটা একহারা বাড়ি। তার সব দরজা-জানলা খোলা। ঘরের মধ্যে তাকের ওপর সারি-সারি ছবির বই, গল্পের বই, বোয়ম-বোঝাই লজঞ্চুস, টফি, ভাজা মশলা, কুলের আচার, চীনে-বাদামের তক্তি, আম-সত্ত্ব। যার যত খুশি নাও আর খাও। চারদিকে কত কুকুর, কত বেড়াল, কত ছাগলছানা, মুরগির বাচ্চা, কেউ বন্ধ নেই, সব ছাড়া। তাদের মধ্যে সেই পাতিবেড়ালটাও।

লক্ষ্মী একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, "আমরা মণি-ঝোরার জল খেলাম, পেট-ব্যথা করবে না?"

ওরা বলল, "দূর, বোকা! ব্যথা তো থাকে পেটে, জলে থাকবে কেন?"

তাই তো, এ-কথা তো লক্ষ্মীর আগে মনে হয়নি। লক্ষ্মী তখন বলল, "তোমরা বড় ভাল, তোমাদের নাম কী ভাই?"

ওরা বলল, "আমরা তোমার বন্ধু।" বলে তরতর করে এক গাছে উঠে, ডাল ধরে ঝুলে আরেক গাছ দিয়ে নামল। ওরা নাকি খিদে পেলেই খায় আর ঘুম পেলেই ঘুমোয়।

লক্ষ্মী বলল, "তাহলে পড়ো কখন?"

ওরা হেসেই কুটোপাটি, "কী যে বলো! দুষ্টু মেয়েরা আবার পড়ে নাকি? যে-বইতে ছবি নেই, সে-বই আমরা পড়ি না। আর যে-বইতে ছবি আছে, সে-বই তো পড়ার বই নয়। তবে আর পড়াশুনোর কথা কেন বলো!"

এই বলে দৌড়, দৌড়, দৌড়! যাদের সাহস বেশি তারা মণি-ঝোরার জলের ধারা বেয়ে বেয়ে নীচে নেমে যেতে লাগল, আবার জলের ধারের রডোডেনড্রন গাছের ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে ফিরে এল।

শেষটা কখন যে বিকেল হয়ে এল, লক্ষ্মীর খেয়াল নেই। যেই না গুম্ফার লামা ঘণ্টা পিটল, অমনি লক্ষ্মী লাফিয়ে উঠল, "এই রে! চারটে বাজে যে! মাসিমারা এক্ষুনি ফিরবেন।"

ওরা সবাই হাসতে-হাসতে ওকে হাত ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে বোর্ডিংয়ের মাসিমার স্নানের ঘরের কাঠের সিঁড়ির ওপরে পৌঁছে দিয়ে বলল, "তুমি একটু বোসো। আমরা সব সাফ করে দিই।" এই বলে তারা স্নানের ঘরে ঢুকে গেল।

লক্ষ্মী বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাসিমার ডাকে ওর ঘুম ভাঙল। মাসিমা কাঠের সিঁড়িতে ওর পাশে বসে পড়ে, ওর পিঠে হাত রেখে বললেন, "ও মা! কোথায় যাব! একলা-একলা সারাদিন কাটল, এখন সিঁড়ির মাথায় বেড়াল-কোলে ঘুমিয়ে রইলি! যদি গড়িয়ে পড়ে যেতিস?"

লক্ষ্মী বলল, "ওরা ধরে ফেলত।"

মাসিমা হেসে বললেন, "কারা ধরত রে? স্বপন দেখছিলি বুঝি? চল, মাংসের সিঙাড়া কিনে এনেছি। সারাদিন কিছু খায়নি, আহা মরে যাই! স্নানের ঘরে তালা দিতে ভুলে গেছিলাম নিশ্চয়ই, পালিয়ে যাসনি যে বড়?"

বেড়ালটা বলল 'মিউ'। অর্থাৎ, পালিয়ে গেছিল বই কী।

স্নানের ঘরের ভিতরটা পরিষ্কার ঝকঝক করছিল। যেটি যেমন ছিল, ঠিক তেমনটি আছে। তাকের ওপর চুল কালো করার ওষুধের শিশিটাও। মাসিমা জল গরম করে ওর হাত মুখ ধোয়ালেন। বললেন, "কী জানি, চোখটা কেমন চকচক করছে, জ্বরটর আসবে না তো? তুই বরং শুয়ে থাক, আমি তোর লুচি, কপিভাজা, আলুর দম, ক্ষীরের সন্দেশ রেখে গেছিলাম যে। শিকলি তো লাগাইনি, ডুলিতে দেখলি না কেন?"

আরো পরে জেঠি খাবার নিয়ে এসে, ওর থুতনির নীচে আঙুল রেখে, চোখের দিকে চেয়ে বলল, "জ্বর না আরো কিছু! তুমি মণি-ঝোরার জল খেয়েছ, এবার থেকে তুমি যা নেই তাই দেখবে।"

ছবি বিমল দাশ

ভূত-শিকারী মেজকর্তা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বাইরের উঠোন বাগান পেরিয়ে বাড়িটায় ঢোকাই এক দায়। বাগান মানে তো এখন ঝোপঝাড়, বুনো লতা-পাতা আর আগাছার জঙ্গল। আর চারদিকের ধসে-পড়া দেওয়ালের নোনা-শ্যাওলা-ধরা ভাঙা-চোরা ইটের টুকরো-ছড়ানো উঠোনটা যেন ছোটখাট ভূমিকম্পের সাক্ষী।

রীতিমত লড়াই করে ঢুকতে হয়েছে বলা যায়। ভাগ্যে গুপ্তিটা সঙ্গে এনেছিলাম। তার ওপরের লাঠির খাপটা খুলে গুপ্তিটা বার করে কাঁটা-ঝোপ, লতা-পাতার জঙ্গল্ কেটে-কেটে দোতলার সিঁড়ি পর্যন্ত এসে পোঁছেছি।

সিঁড়িটা দোতলায় গিয়ে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু রেলিং ভাঙা নোনা-আর শ্যাওলা-ধরা ধাপগুলোর যা অবস্থা, তাতে উঠতে গেলে আমার ভারেই ধসে পড়বে কিনা কে জানে।

সাবধানে, বুঝে-বুঝে পা ফেলে, ওপরে উঠতে উঠতে মনটা কিন্তু খুশিই হয়ে উঠছিল। না, বটকেষ্টকে এবার আর বাজে খবর দেবার জন্যে বকাবকি করতে হবে না। তার সেবারের সেই মাথায়-চন্দ্রবিন্দু মুল্লুকের মত এবারের সুলুক-সন্ধানটাও মিছে হবে না বলেই মনে হচ্ছে। ঠিকানাটার হালচাল যা দেখছি তাতে যে-আশায় আসা, তা এখানে না মিটলে আর মিটবে কোথায়! সবদিক দিয়ে এমন একটা জুতসই আস্তানা একেবারে বেদখল পড়ে থাকবে তা হতেই পারে না। কেউ না কেউ মৌরসী পাট্টা নিয়ে জুড়ে বসে আছেন নির্ঘাত, আর যিনি আছেন, তিনি আমার মত শ্বাস-টানা বুক-ধুকধুক-করা খিদে-তেষ্টার গোলাম নিশ্চয়ই নন।

ধসে পড়পড় নড়বড়ে সিঁড়িটা দিয়ে ওপরের দালানটায় উঠে কিন্তু অবাক হবার সঙ্গে মেজাজটা রীতিমত খারাপ হয়ে গেল।

এ যে সাফসুফ সাজানো-গুছোনো গেরস্থালি বললেই হয়। মালপত্রের চেহারাটা নিতান্ত দুখিনী গোছের, কিন্তু গাড়ু, গামছা, ভাঙা তোবড়ানো তোরঙ্গ, থোলো হুঁকো, কলকে, টিকের মালসা, আর আগুনে পোড়া মেটে হাঁড়িকড়ি দেখে তো আমারই মত এ পারের কেউ আস্তানা পেতেছে বলে মনে হয়। হাঘরের হদ্দ কেউ নিশ্চয়, নইলে ছুঁচো চামচিকেও যেখানে বাসা বাঁধতে ডরায়, তেমন জায়গায় এসে ডেরা পাতে।

কিন্তু এ হতভাগা এখানে জুড়ে বসে থাকলে আমার সব মতলব যে ভেস্তা।

লোকটা যেই হোক, তাকে তাড়াতেই হবে তাই!

"কেমন করে?"

চমকে উঠে এদিক-ওদিক তাকালাম। কে বললে কথাটা?

কই, কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না! আমার নিজের মনের কথাটাই নিজের কানে বেজে উঠল নাকি?

না, তা নয়। যে বলেছে, তাকে এবার চাক্ষুষই দেখা গেল। চিমসে খিটখিটে পাকানো চেহারার এক বুড়ো খাটো ধুতি পরে আদুড় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গায়ে ধবধবে এক গোছা পৈতে ঝুলিয়ে থোলো হুঁকো হাতে নিয়ে খড়ম খটখট করতে করতে কোথা থেকে হঠাৎ আবির্ভূত হল, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিষ মাখানো খ্যানখেনে

গলার সে কী টিটকিরি! হাতের হুঁকোটাকেই যেন মোচড় দিয়ে নাড়তে নাড়তে বললে, "আমায় তাড়াতে এসেছ, কেমন? আমায় তাড়িয়ে একেশ্বর হতে চাও এখানে?"

জবাব দেব কী, বুড়োর কাণ্ড দেখে আমি তখন অস্থির হয়ে উঠেছি। যেন আমাকেই কান মলা দিতে হুঁকোটাকে এমন মোচড় দিয়েছে যে, কলকেটা কাত হয়ে তার জ্বলন্ত টিকে-তামাক বুড়োর গায়ে আর কাপড়ের ওপরেই পড়ছে ঝপঝপ করে।

সেদিকে চেয়ে হাঁ হাঁ করে বলে উঠলাম, "আরে করছেন কী? পুড়ে মরতে চান নাকি?"

আমার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে গায়ের আর কাপড়ের আঙরার টুকরোগুলো গায়েই ঘষে দিতে-দিতে বুড়ো গা-জ্বালানো গলায় জিজ্ঞাসা করলে, "বলি, কদিন খোলস ছেড়েছ শুনি? বেশি দিন তো হবে না। খোসাগুলো সব এখনো ভাল করে ছাড়েনি মনে হচ্ছে।"

বুড়ো বলছে কী! আমি তখন তার দিকে চেয়ে যেমন কাঠ, তেমনি আবার একেবারে হাঁ হয়ে গিয়েছি। বুড়ো যা বলছে তার তো একটাই মানে হয়! আর সে মানে তো তাহলে......

না, আগের লাইন পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে তা আমার নিজের কথা নয়। সব সেই খেরোখাতা থেকে তোলা, মেজকর্তার সেই খেরোখাতা, কলকাতার সব চেয়ে লম্বা পাড়ির 'বাস'-এ দমদমের এয়ারপোর্টে যাবার পথে যা একটা খালি বেঞ্চির ওপর পুঁটলি-বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। পুঁটলিটা বেওয়ারিশ দেখে আর তার ভেতরের ছেঁড়াখোঁড়া একটা খেরোখাতার পাতাগুলো একটু নাড়তে চাড়তে দু একটা কথা চোখে পড়ায় ভেতরে নাম-ঠিকানা কিছু পেলে যথাস্থানে ফেরত দেব বলে পুঁটলিটা চেয়ে নিয়েছিলাম। নেহাত একটা ছেঁড়াখোঁড়া হলদে-হয়ে-আসা বেরঙা কাগজের হাতে-লেখা খেরোখাতা বলেই কেউ আর আপত্তি করেনি।

খেরোখাতাটা ছোটখাট নয়, বেশ ঢাউস। প্রায় মহাভারত-প্রমাণ। ছেঁড়াখোঁড়া পাতাগুলোয় অনেক ওলট-পালট হয়ে গেছে। যতটা সম্ভব সে-সব পাতা গুছিয়ে এ পর্যন্ত যতখানি ঘাঁটাঘাঁটি করেছি তাতে কারুর নাম-ঠিকানা কিছু কিন্তু পাইনি। পেয়েছি শুধু মেজকর্তা বলে একটি নাম। তিনি কোথাকার, তা জানি না। কোন্ যুগের মানুষ, তারও হদিস পাওয়া ভার।

কিন্তু মানুষটি একেবারে অদ্ভুত। অদ্ভুত তাঁর শখ বা বাতিকের দিক দিয়ে। লোকের কত রকম শখ আর বাতিকই তো থাকে। কারুর মাছ ধরার শখ, কারুর বাতিক দেশ-বিদেশের ডাকটিকিট জমানো, কারুর আবার শিকারের নেশা। এসব শখ আর বাতিকের জন্যে কী কষ্ট না করে মানুষ, আর কত না খরচ!

তাঁর খেরোখাতা-বৃত্তান্ত পড়ে বোঝা যায়, মেজকর্তাও তাই করেন। তবে তাঁর শখ বা নেশা বা বাতিক যাই বলি, সেটি একেবারে সৃষ্টিছাড়া। জলের মাছ কি বন-জঙ্গলের জানোয়ার নয়, তিনি শিকার করে বেড়ান যাদের নামেই গায়ে কাঁটা দেয় সেই ভূতপ্রেত। যেখানে এই রকম অশরীরীদের ঘুণাক্ষরে একটু খবর পান, সেখানেই তিনি ছুটে যান সরে-জমিনে সন্ধান করতে। এসব ভুতুড়ে খবর আনবার জন্যে তিনি মাইনে-করা দালাল লাগিয়ে রেখেছেন সারা মুল্লুকে। দালালরা খাঁটি খবর আনলে মাইনের ওপর মোটা বখশিস পায়।

ভূতের পেছনে এইসব ছোটাছুটির বিবরণ তিনি একটি মোটা খেরোখাতায় লিখে গেছেন। কবে যে লিখে গেছেন, তা সঠিকভাবে জানবার কোনো উপায় নেই, কিন্তু বর্ণনা-টর্ননা পড়ে ব্যাপারগুলো যে হালের নয়, এটুকু অন্তত বোঝা যায়।

এই খেরোখাতাটিই বেওয়ারিশ একটি পুঁটলির মধ্যে লম্বা পাড়ির একটা বাসের বেঞ্চিতে পাওয়ার পর সামান্য একটু নেড়েচেড়ে দেখবার সময়ই 'হানা বাড়ি', 'ভুতুড়ে গাঁ' গোছের কয়েকটা কথা পেয়েই আগ্রহভরে সেটা নিয়ে এসেছিলাম। কথা দিয়েছিলাম যে, খেরোখাতা থেকে মালিকের কোনো হদিস পেলে তাঁকে খাতাটা পাঠিয়ে দেব। সঠিক হদিস কিছু না পেলেও শুধু মেজকর্তা নামটুকু পেয়ে খেরোখাতার প্রথম একটা বৃত্তান্ত ছাপবার ব্যবস্থা করেছিলাম, আসল মালিক তা দেখে যদি নিজের হারানো খাতা দাবি করতে আসে।

দাবিদার কেউ কিন্তু আসেনি।

প্রথমের পর দ্বিতীয় বৃত্তান্ত ছাপাবার সময় আগেরবারের আশাটা কিন্তু ভয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ সত্যি আসুক, তা আর তখন চাইছি না।

মনের বাসনাই পূর্ণ হয়েছে শেষ পর্যন্ত। কেউ আর আসেনি।

কেউ আর আসবে না বলেই এখন আমার ধারণা। খেরোখাতার যিনি মালিক কোনো কিছু দাবি করতে আসার অবস্থাই হয়ত তিনি পার হয়ে গেছেন। তিনিই হয়ত আর নেই।

নিজের কৌতূহল মেটাবার সঙ্গে মেজকর্তার স্মৃতির মান রাখতে তাঁর খেরোখাতা থেকে যত দূর সাধ্য তাঁর বিচিত্র সব বিবরণ উদ্ধার করে তাই বার করবার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

কিন্তু উদ্ধার করা কি সোজা! একে ছেঁড়াখোড়া খেরোখাতার পাতাগুলোই সব মজুত আছে কিনা সন্দেহ। যা আছে, তাও গিয়েছে ওলট-পালট হয়ে। এ ছাড়া মেজকর্তার লেখার ধারাটাই কেমন খামখেয়ালী। কোথাকার খেই কোথায় গিয়ে যে আবার ধরেছেন, তা খুঁজে পাওয়াই দায়।

যে বিবরণ দিয়ে এ কাহিনী আরম্ভ করেছি, তাও মাঝপথে অমন আচমকা ছেড়েছি কি প্যাঁচ কষবার জন্যে?

মোটেই না।

লেখাটা একটা পাতার শেষ লাইনে ওই পর্যন্তই পেঁাছে থেমেছে। পরের পাতায় তার বাকি অংশটা পড়তে গিয়ে চক্ষুঃস্থির। পরের পাতাটাই সেখানে নেই।

গেল কোথায় সে পাতা? একেবারে হারিয়েই গেছে নাকি? না, মেজকর্তা তাঁর স্বভাব-মাফিক এ-পাতার খেই-এই মহাভারতপ্রমাণ পুঁথির তাড়ার আর-কোনো পাতায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে বসে আছেন?

তা যদি তিনি না করে থাকেন, তাহলে তো মাঝপথে হঠাৎ অন্তর্ধান হওয়া এই বৃত্তান্তের শেষ না জানার যন্ত্রণা সহ্য করাই শক্ত হবে।

কী বললে থোলো-হুঁকো-হাতে সেই চিমসে বুড়ো? তার কী এমন দারুণ মানে বুঝলেন মেজকর্তা? আর কী হল তাঁদের সেই মোলাকাতের ফলাফল?

এ-সব কথা কি আর কোনদিন জানা যাবে না?

অস্থির হয়ে তাই খেরোখাতার পাতার পর পাতা তন্নতন্ন করে খোঁজবার চেষ্টা করেছি।

সে চেষ্টা একেবারে বিফল হয়নি। আশাতীতভাবে সে বৃত্তান্তের ধারাটা আর এক জায়গায় খুঁজে পেয়েছি।

মাঝখানের কিছু বাদ পড়েছে কিনা বলা শক্ত। তবে আসল খেইটা তাতে একেবারে ছিঁড়ে যায়নি।

মেজকর্তা লিখেছেন ঃ

সমস্ত শরীরের ভেতরটা শিরশির করে উঠল। এমন ভাগ্য যে হয়েছে তা তো বিশ্বাস করতেই পারছি না। এতদিন যে সুযোগের স্বপ্নই শুধু দেখেছি, তা সত্যি সত্যি একেবারে হাতের মুঠোয়!

হুঁকো হাতে চিমসে বুড়ো যা বলছে তাতে তো একটা কথাই বোঝায়! না, একটা নয়, দুটো। সোনায় সোহাগা ছাড়া কিছু নয়। এখন শুধু একটু সামলে ঘুঁটি নাড়লেই আমি যা চাইছি সেই কিস্তি মাত।

বুড়ো নিজেই শুধু ধরা দিয়ে ফেলেনি, আমাকেও তার দলের বলে ধরে নিয়েছে। বেশ একটু বুঝেসুঝে সব চাল চেলে এই ভুলটা যদি জিইয়ে রাখতে পারি তাহলে আমার প্রেতপুরাণ সারা দুনিয়ায় একেবারে তাক লাগিয়ে দেবে।

চিমসে বুড়োর টিটকিরির প্রথম জবাবটা বেশ ভালই দিলাম! "খোসা কি আপনারই সব ছেড়েছে নাকি?"—দালানের কোণে তার মালপত্র দেখিয়ে বললাম, "ওগুলো তাহলে পুষে রেখেছেন কেন?"

এ জবাব শুনে সে কী খ্যানখেনে হাসি চিমসে বুড়োর! হাসতে হাসতে কল্কের আগুন আবার গায়ে কাপড়ে ছিটিয়ে পড়ল। আগের মতই সেগুলো যেন চন্দন-বাটার মত গায়ে ঘষে নিয়ে বললে, "ঠিক ধরেছ! ঠিক! তবে ওগুলো তোমার ওই পুঁটলি আর গুপ্তিভরা লাঠির মত পুরনো অভ্যেসে জমিয়ে রাখা নয়।"

"অভ্যেসে নয় তো শখে?" আমি একটু ভুতুড়ে ঝাঁঝই দেখালাম।

"আরে না, না। অভ্যেসও নয়, শখও না।" বুড়ো হাসতে হাসতেই বললে. "ও শুধু উৎপাত ঠেকাতে একটু ভড়কি!"

"উৎপাত ঠেকাতে ভড়কি!" এবার আমি সত্যিই হতভম্ব। "কিসের উৎপাত আর কী ভড়কি?"

"কিসের উৎপাত তা বুঝলে না?" বুড়োর গলায় আবার টিটকিরির সুর, "তোমায় আগে যা ভেবেছিলাম. সেই হতভাগাদের উৎপাত। বিশ্বাস তো ওদের নেই. লোভ করে কি সত্যি হাঁড়ির হালের হাঘরে হয়ে কেউ পাছে সেঁধুতে এসে জ্বালায়, তাই তৈরি থাকতে হয় সারাক্ষণ।"

উৎপাত করবার হতভাগা মানে যে মানুষ, তা বুঝলাম. কিন্তু ঘরকন্নার মালপত্র দিয়ে তাদের ভড়কি দেওয়াটা কী ব্যাপার? সেই কথাই জানতে চাইলাম।

আমার বোকামিতে বুড়ো এবার খুশি। বললে, "একেবারে আনকোরা আনাড়ি তো! কিছুই এখনো জানো না। ভড়কিটা কী রকম তাহলে শোনো। হতভাগারা একবার সেঁধুলে তো সহজে নড়তে চায় না। তাই তাদের তাড়াবার দাওয়াইটা কড়া করবার জন্যে প্রথম মুখশুদ্ধিটা বেশ মোলায়েম মিষ্টি লাগাবার ওই ভড়কি! হতভাগা যে আসবে. ঘরকন্নার ওই ব্যবস্থা দেখে তার মনে একটু ভরসাই হবে নিজের মত আরেকজনকে সঙ্গী পেয়ে। নিশ্চিন্ত হয়ে তারপর যেই একটু গুছিয়ে বসবার কথা ভাবছে. তখন আচমকা গায়ের ওপর কলকের আগুন ছড়াবার মত একটি প্যাঁচ. কি তেমন জবরদস্ত দুঁদে কেউ হলে মুণ্ডুটার ছাল ছাড়ানো এই চেহারা একবার হঠাৎ দেখালেই কাম ফতে! এ বাড়ি মুখো তো নয়ই, এ তল্লাটে আর কোনোদিন সে পা বাড়াবে না।"

চিমসে বুড়োর দিকে চেয়ে সমস্ত শরীরটা আপনা থেকে শিউরে উঠে বুকের ভেতরটা যেন হিম হয়ে গেল। বুড়ো তার প্যাঁচ বোঝাতে তার বিকট ফরমাসী চেহারাটাই আমায় তখন দেখাচ্ছে।

এক গোছা পৈতে ঝোলানো, চিমসে পাকানো আবলুসের কাঠির মত আদুড় দেহটির ওপর কোটর-বার-করা দাঁত-ছির-কোটানো একটা মড়ার মাথা!

বুকের ভেতর থেকে যে চিৎকারটা আপনা থেকে বেরিয়ে আসছিল, কোনো রকমে সেটা চেপে মুখটা নির্বিকার রাখতেই তখন গায়ে ঘাম দিচ্ছে। তবু প্রাণপণে ধাক্কাটা সামলে ঠোঁটে একটু বাঁকা হাসি টানবার চেষ্টা করে বললাম, "হ্যাঁ, এ-প্যাঁচ একেবারে মোক্ষম! কিন্তু মানুষকে তাড়াবার জন্যে এত গরজ কেন? মানুষকে ভয়টা কী?"

"কী ভয়?" চিমসে বুড়ো এবার চটেই উঠল আমার ওপর, "খোলস তো সবে ছেড়েছ, দুদিন বাদেই বুঝবে মানুষকে কী ভয়, আর কেন। অজাত-বেজাত খোলস-ছাড়া সক্কলের সঙ্গে মানিয়ে বনিয়ে থাকতে পারো কিন্তু মানুষের সঙ্গ কখনো নয়। সঙ্গে থাকবার একটু সুবিধে দিয়েছ কি, কেন কেমন, কোথায় সব বৃত্তান্ত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করতে চেয়ে জ্বালিয়ে মারবে একেবারে। কেউ আবার ভূতের ওঝা ডাকে আমাদের তাড়াতে। সেই দুদিন বাদে তো নিজেরাই খোলস ছাড়বি, তা অত ছটফটানি কিসের? সাধে কি ভয় দেখিয়ে ওদের তাড়াতে হয়!"

একটু থেমে বুড়ো মড়ার মুণ্ডুটা পাল্টে হেসে বললে, "যাক, তোমাকে যখন সেথো পেয়েছি, তখন আর ভাবনার কিছু নেই। দুজনে মিলে এ পোড়ো ভিটের এমন সুনাম ছড়াব যে, হাঘরে-টাঘরে তো ছার, গোরা মিলিটারি পর্যন্ত এধার মাড়াবে না। তোমায় পুরনো-নতুন কটা প্যাঁচ শিখিয়ে দেব ধীরে-সুস্থে। এখন দুদিন একটু জিরিয়ে টিরিয়ে টনকো হয়ে নাও। কাঁচা খোলস ছাড়লে প্রথমটা কেমন একটু সব এলানো-এলানো মনে হয় কিনা। ও হ্যাঁ, এক আস্তানায় থাকব। সময়ে অসময়ে দেখা হবে, তা তোমায় একটা কিছু বলে ডাকতে পারলে ভাল হত না? তোমার পুরনো অভ্যাসের ওই চিহ্ন ধরে গুপ্তি বলে ডাকতে পারি বটে, তুমিও পারো আমায় হুঁকোদা বলতে। কিন্তু তার চেয়ে নাম একটা থাকাই ভাল। কী নাম ছিল খোলস ছাড়বার আগে?"

"নাম?" এক মুহূর্ত একটু থতমত খেয়ে বলে দিলাম, "নাম বটকেষ্ট!"

"বটকেষ্ট! তা বেশ বেশ!" নামটা দুবার আওড়ে যেন খুশি হয়ে বুড়ো বললে, "তা বটকেষ্ট করত কী ওপারে?"

"এই মানে," একটু আমতা আমতা করে বললাম, "মুহুরি ছিল এক মোক্তারের।"

"মোক্তারের মুহুরি!" বুড়ো রীতিমত খুশি হয়ে বললে, "ভাল, ভাল। খুব ভাল। দুনিয়ার ঘোর-প্যাঁচ তাহলে সবই জানা আছে। আমারও বড় মন্দ নয়। ছিলেম জমিজমা বাড়ি ঘরের দালাল। নাম ছিল ভজহরি। তখন মফস্বলের বোকা জমিদারদের গড়ের মাঠই কতবার বিক্রি করে দিয়েছি। বলব তোমায় সেসব গল্প। তুমি আমায় ভজাদা বলেই ডেকো।"

গড়ের-মাঠ-বিক্রি-করা ধুরন্ধর দালাল ভজাদার কাছ থেকে শুধু দালালির গল্প নয়, আরো অনেক কিছু টেনে বার করে আমায় প্রেতপুরাণ ভরে দিতে পারব আশা ছিল। কিন্তু সে আশায় অমন করে ছাই পড়বে কে জানত!

সব কিছু ভেস্তে দিল শেষ পর্যন্ত শুধু কটা হাঁচি!

হ্যাঁ, স্রেফ কটা হাঁচি এত বড় একটা যুগান্তকারী কাণ্ড দিল ভণ্ডুল করে।

কী মোলায়েমভাবেই না সব কাজ এগোচ্ছিল। ভজুদার একটু অস্থির চঞ্চল স্বভাব। স্বভাবটার মূলে আছে অবশ্য ভয়। ভজুদার কেবলই ভয়, কোথা থেকে কেউ যদি এসে এ ডেরায় ঢুকে পড়ে।

'কেউ' মানে অবশ্য মানুষ। মানুষজনের আসা ঠেকাতে ভজুদা দিনরাত খাড়া পাহারায় থাকে। ত্রিসীমানায় কাউকে ঘেঁষতে না দেবার জন্যে দিন-দুপুরেও এ-বাড়ির বাইরে পর্যন্ত ভয় দেখিয়ে ফেরে। এ বাড়ির ধারে কাছে কেউ আসছে আঁচ পেলে আর ভজুদাকে রোখা যায় না। আর কিছু না পারলে নিদেন পক্ষে গোখরো, কেউটে সেজেও পায়ের তলায় সড়-সড়িয়ে ঘুরে মানুষটাকে তল্লাট-ছাড়া করে আসবে।

এই অস্থিরতার ফাঁকে-ফাঁকে যখন যতটুকু পারি ভজুদাকে ধরে আমার খেরোখাতার পাতা ভরাবার মশলা জোগাড় করে নিই।

তারই মধ্যে হঠাৎ সেদিনকার সেই হাঁচি। হাঁচি কি একবার! হাঁচির পর হাঁচি আর থামাতে পারি না। পুরনো নোনাধরা ঝুরঝুরে পলস্তারার চুনবালি-খসা বাড়ি। দোষের মধ্যে যে-কোণে থাকি তার মেঝে আর দেয়ালগুলো একটু পরিষ্কার করবার জন্য ঝাড়াঝুড়ি করেছিলাম। ব্যস, তাতেই নাকেমুখে মান্ধাতার আমলের ধুলো ঢুকে এমন সুড়সুড়ি ধরিয়েছে যে, প্রাণপণ চেষ্টা করেও তা সামলাতে পারছি না।

ভজুদা তখন কাছে-পিঠে ছিল না। উত্তর দিকের একেবারে জংগল হয়ে-ওঠা বাগানে কাছের গাঁয়ের কে বুড়ি দুটো কাঠকুটো কুড়োতে এসেছে টের পেয়ে গেছল তাকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে।

ভজুদা ফিরে আসার আগে কী চেষ্টাই না করলাম হাঁচিটা বন্ধ করতে। কিন্তু তা আর পারলাম না কিছুতেই।

ভজুদা ফিরে এসে প্রথমে অবাক, তারপর রীতিমত বিরক্ত। প্রায় খিঁচিয়ে উঠে বললে, "ও আবার কী ন্যাকামি! হাঁচি-কাসির শখ এখনো মেটেনি নাকি?"

"না ভজুদা!" হাঁচির ফাঁকে কোনরকমে জানাবার চেষ্টা করলাম, "এটা অ-অ-অভ্যাস! হ্যাঁচ্চো!"

"অভ্যাস!" ভজুদা তেমনি খাপ্পা, "বলি হাঁচতে-হাঁচতেই খোলস ছেড়েছিলে নাকি যে, এখনো অভ্যেস ছাড়তে পারছ না! আর তাই বা হবে কেন? ও সব বদভ্যেস-টদভ্যেস সংগে তো কখনও আসে না।"

"হ্যাঁ, আসে না, মানে......" যা বলতে চাইলাম, পরপর কটা হাঁচিতে তা চাপা পড়ে গেল।

আর ওদিকে ভজুদার ফরমাসী মুখই তখন ফ্যাকাসে মেরে গিয়ে জিভ তোতলা হয়ে এসেছে।

"এ তো সে-সে-সে হাঁ-হাঁ-হাঁচি নয়। তু-তুমি তা-তা-তাহলে মা-নু-ষ!"

শেষ কথাটা যেন উচ্চারণ নয়, একেবারে আর্তনাদ। সেই সংগেই ভজুদাও একেবারে সত্যি সত্যি হাওয়া!

"ভজুদা! ও ভজুদা! শুনুন, শুনুন!" গলা চিরে গেল চিৎকার করতে করতে। কিন্তু কোথায় পাব আর ভজুদাকে। ধারে-কাছে ঘেঁষবার ভয়ে যে মানুষকে ভজুদা তাড়িয়ে বেড়ায়, বাঘের ঘরে ঘোঘের মত সেই মানুষই তাকে ঠকিয়ে তার আস্তানায় ডেরা পেতেছে, এ আর সে সহ্য করতে পারে?

মানুষের ভয়েই ভজুদা একেবারে মুল্লুক-ছাড়া। আমার প্রেতপুরাণ মনের মত করে লেখা আর হল না।

মেজকর্তার খেরোখাতার বৃত্তান্তও এইখানেই শেষ। আঁতিপাতি করে ঘেঁটেও ভজুদার কথা আর কোথাও খুঁজে পাইনি।

ছবি সুধীর মৈত্র

আপনাকে আমার পোরট্রেট আঁকতে হবে
আমাকে খুব সুন্দর করে দেখাবেন

নোলেদা মি: টনটনির প্রতিকৃতি আঁকা শুরু করল...

একটু বাঁ দিকে ফিরুন!

ছবি আঁকার সময় কাউকে দেখতে দিতে নেই। নোলেদাও দেখায়নি।
তিন মাস হয়ে গেল, এতকী আঁকছে নোলেদা?

শেষ হয়েছে! এবার, মি: টনটনি দেখতে আসুন
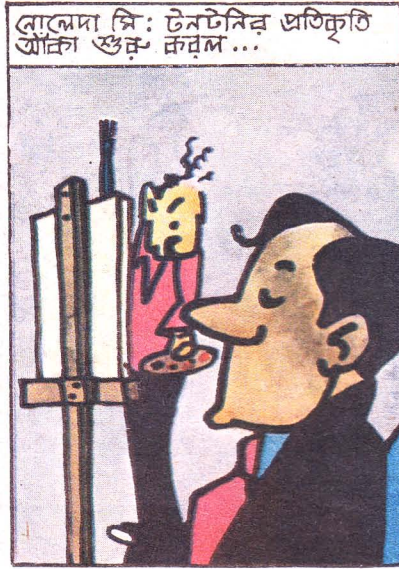
রান্না শেখা

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

বাবা বলেন, "শুনছি নাকি নতুন সিলেবাসে
দরকারী সব কাজকর্ম শিখিয়ে দেবে ক্লাসে !
যেমন ধরো কাপড় কাচা, ছেঁড়া সেলাই করা,
দু-চার কিলোর টিনের থেকে সাবধানে তেল ভরা।
একেই বলে শিক্ষা। আমি শুনে হলাম খুশি,
চাইনে আমি কেতাবমুখো ভয়ংকর বিদুষী।
পরবে শাড়ি, বাঁধবে খোঁপা, করবে পরিবেশন,
তাকেই বলি সত্যিকারের ওয়ার্ক এডুকেশন।
দেখাও খুকু খাতায় তোমার কী নোট আছে লেখা,
কেমন হচ্ছে ইশকুলেতে রান্নাবান্না শেখা।
ভালোই হল এখন থেকে তরকারি আর রুটি,
তোমার হাতে দিয়ে তোমার মায়ের হবে ছুটি।
বাদাম চিনি পেস্তা মাখন চারটে ডিম আর ময়দা,
এ যে দেখি মারাত্মক এক কেক বানাবার কায়দা।
পেস্তা বাদাম মাখন চিনি সব যে বেজায় মাগ্গি,
মাখন পাবেন কোন্ দোকানে ? যে পাবে তার ভাগ্যি।
আমরা যখন ছোট ছিলাম বাদাম তখন ছিল,
কিন্তু খুকু বাদাম এখন একশো টাকা কিলো।
পেস্তা বাদাম থাকুক না হয়, সহজ কিছু হোক
কেক পুডিঙের কায়দা বরং শিখুক অন্য লোক।
চায়ের চামচ, কাপের হিসেব বেজায় গণ্ডগোল
তার চেয়ে তো অনেক সহজ ভাত কি মাছের ঝোল।"

খুকু বলে, "ভাত আছে তো ক্লাস নাইনের কোর্সে,
মাছের ঝোলে জিরে ফোড়ন নয়তো বাটা সর্ষে।"

বাবা বলেন, "এও তো মজা, রুটির আগেই কেক !
আমরা বুঝি ইতিহাসের মারি আন্তনেট !
আর কতদিন আছে খুকু পৌঁছতে ক্লাস নাইনে ?
তার আগে না ফুরিয়ে বসি এক বছরের মাইনে !"

ছবি বিমল দাশ
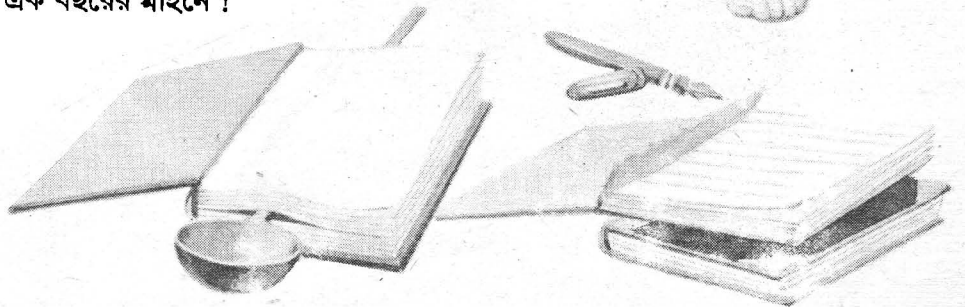
দুম করে একেবারে পাশের ফ্ল্যাটে এক ভয়াবহ খুন হয়ে যাওয়ায় গুপি মোক্তার যেন বেভ্যুল হয়ে গেলেন। হবারই কথা, ব্যাপারটা শুধু ভয়াবহই নয়, রোমহর্ষকও।

গজপতি উকিলের লম্বা চওড়ায় দশাসই চেহারাখানি পাড়ার মধ্যে একটি প্রসঙ্গ ছিল, সেই তাগড়াই লোকটাকে কিনা দিনে-দুপুরে শুধু গলায় একখানা গামছা বেঁধে, যাকে বলে 'নিহত' করে রেখে, কে বা কারা কে জানে তাঁর লোহার আলমারির লকার খুলে যথাসর্বস্ব নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল, কেউ টের পেল না!

একেবারে পাশের ফ্ল্যাটের গুপি মোক্তারও না। ভাবা যায়?

তবু সেটাই শেষ কথা নয়।

বেভ্যুল হবার আরও কারণ আছে। ঘটনাটা যখন ঘটে, ঠিক তার ঘণ্টা দুই আগে গুপি মোক্তার নিজের ফ্ল্যাট থেকে ও ফ্ল্যাটে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ দাবা খেলে এসেছেন।

আরও খেলতেন হয়তো, গজপতি তো ছাড়তেই চাইছিলেন না, 'আর একটা দান হয়ে যাক না'—বলে ফের বোড়ে ঘোড়া নৌকো মন্ত্রী নিয়ে সাজাতে বসছিলেন। কিন্তু এদিক থেকে গেনুপিসির ঘন ঘন ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে বাধ্য হয়ে উঠে আসতে হয়েছে গুপিবাবুকে।

গেনুপিসি ছাড়া ত্রিভুবনে আর তো কেউ নেই গুপি মোক্তারের, তাই তাঁর শাসনেই চলতে হয় বেচারাকে, তাঁর হেফাজতেই থাকতে হয়। কাজেই গজপতি উকিলের মতো সকাল থেকে দুপুর, আর দুপুর গড়িয়ে বিকেল অবধি দাবা খেলা গুপি মোক্তারের চলে না। একটু এদিক-ওদিক হলেই

হত্যা-রহস্য

আশাপূর্ণা দেবী

ছবি অলোক ধর

প্রথমে চলে আসে চাকর মলয়কুসুম ; গভীর গম্ভীর গলায় বলে, "বাবু, ঠাকুমা তপ্ত হয়েছেন।"

মলয়কুসুমকে শুধু মলয় বলে ডাকলে সে বড়ই দুঃখিত হয়, পুরো নামটি বলে ডাকলেই ভাল হয়। তবে সব সময় কে আবার অত বড় নামটা ধরে ডাকে? ডাকা হয় না। তবে মলয়কুসুম যখন ঠাকুমার হয়ে ডাক পাড়তে আসে, তখন গুপি মোক্তার খুব আদরের গলায় বলেন, "যাচ্ছি বাবা মলয়-কুসুম, তুই পিসিকে বুঝিয়ে-বাঝিয়ে একটু ঠান্ডা করগে যা। বেশী তপ্ত হয়ে উঠলে ওনারই ক্ষতি। মাথা গরমের ব্যামো তো!"

কিন্তু মলয়কুসুম গোঁ ছাড়ে না, ঘাড় গোঁজ করে বলে, "আপনার পিসিকে ঠান্ডা করা স্বয়ং ভগবানেরও কম্মো নয় বাবু, ওসব ঘুঁটি-টুটি রাখুন, চলে আসুন।"

গুপি মোক্তারের চাকরের ভ্যাজভ্যাজানিতে গজপতি উকিল দারুণ চটে যান, বলেন, "তুমি কেটে পড় তো হে বাপু, মেলা বকবক কোর না।"

মলয়কুসুম হাত উল্টে বলে, "ঠিক আছে। আমি আর বকবক করছি না, এবার ঠাকুমা নিজেই এসে যাক 'হাঁস হাঁস' করতে করতে। তখন কিন্তু আপনাদের উভয়কেই হাঁসফাঁস করতে হবে, তা বলে দিচ্ছি।"

মলয়কুসুম খটখটিয়ে চলে যায়, তার একটু পরেই গেনু-পিসির চড়া গলার ডাক দেয়াল ফুঁড়ে এপারে আসে, "গুপে, আজ খাওয়া দাওয়া হবে? নাকি হরিমটর করে থাকতে হবে?"

গজপতি এ-শব্দ প্রায়ই শুনতে পান, তবু শুনলেই চমকে ওঠেন। চমকে উঠে বলেন, "হরিমটর মানে কী গুপিবাবু?"

গুপি সংক্ষেপে বলেন, "উপোস।"

"তা উনি, মানে পিসিমা খেয়ে নিলে পারেন—"

গুপি হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলেন, "তা হলে তো কোনো ভাবনাই ছিল না। খেয়েও নেবেন না, আমাকেও বকাবকি করতে ছাড়বেন না!"

গজপতিবাবু গুম হয়ে বলেন, "তা এসব তো ছেলে-বেলাতেই হয়, আমি যখন ছোট ছিলাম আমার ঠাকুমা আমায় একদিনের তরে প্রাণভরে খেলতে দেয়নি। কেবলই চান করে নে, ভাত খেয়ে নে, ঘুমোবি আয়, রোদে ঘুরিসনি, জলে ভিজিসনি—এই সব নানান উৎপাত করেছে। কিন্তু এই বয়েসে?"

গুপি মোক্তার কাতর হয়ে বলেন, "আর বলবেন না। বয়েসটা যে আমার পঞ্চাশের দিকে দৌড়চ্ছে, সে-কথা পিসি মানলে তো?"
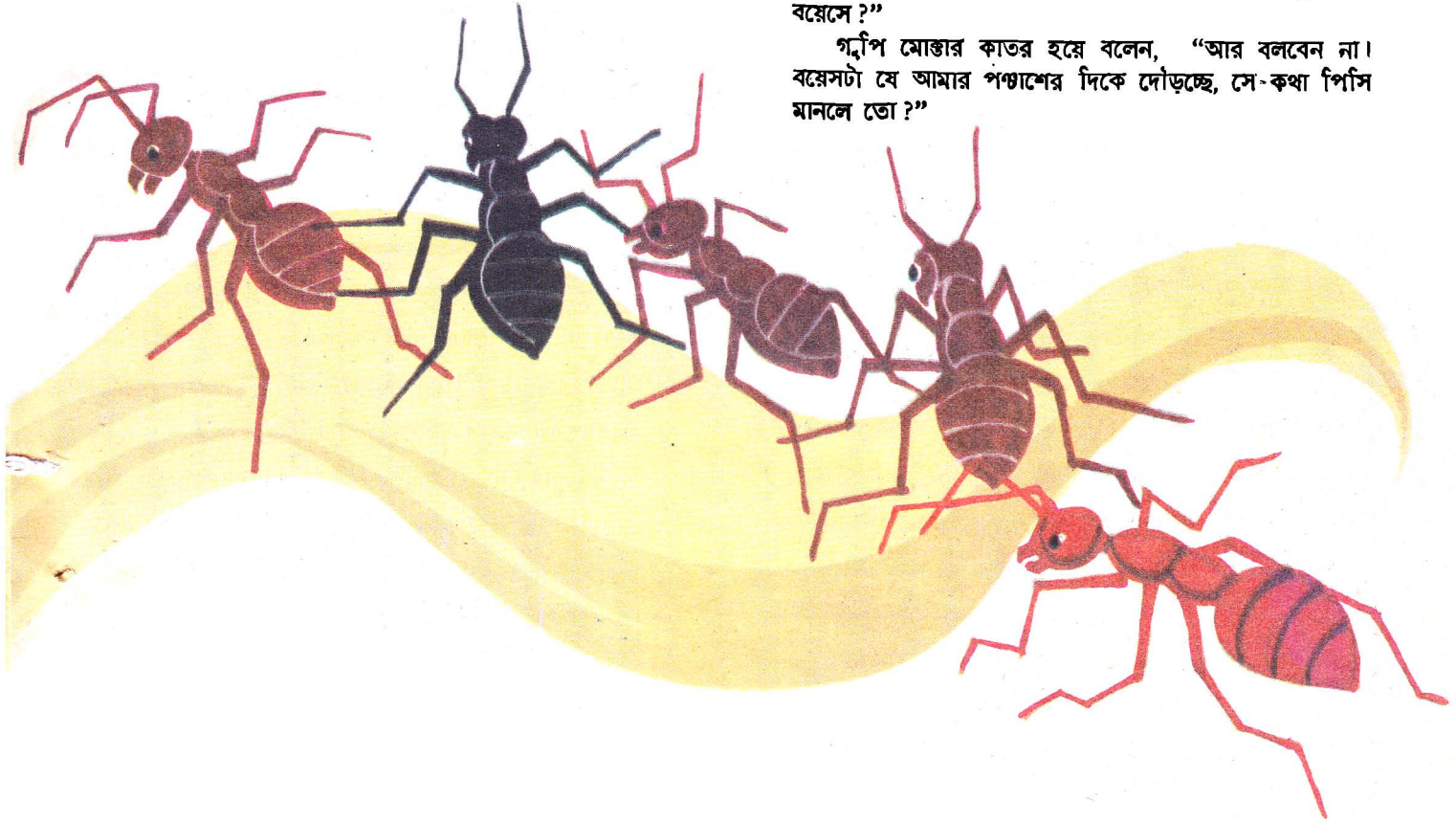
এইসব কথার মধ্যেই দু-একটা বোড়ের চাল হয়ে যায়, হয়তো বা ঘোড়ার ঝুঁটি চেপে ধরাও হয়। আর সেই রকম মোক্ষম সময় গেনুপিসি তাঁর ফর্সা ধবধবে মোটাসোটা শরীরটি নিয়ে সত্যিই প্রায় হাঁস-হাঁস করতে করতে এসে গম্ভীর গলায় বলেন, "গুপে, না খাস তো জবাব দে। ডেকে ডেকে গলা ব্যথা করি, এতো শস্তা গলা নয় আমার।"

তারপর আর কারও বসে থাকবার সাহস হয়? আর যার হোক গুপি মোক্তারের হয় না। সুড়সুড় করে চলেই যেতে হয় পিসির সঙ্গে। ত্রিভুবনে ওই মাসতুতো পিসিটা ভিন্ন আর কেউ নেই যখন, তখন এছাড়া আর কী করবার আছে?"

গজপতি ব্যাজার মুখে ওই পিসি-ভাইপোর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলেন, "ধুত্তোর! কাল থেকে একা একাই খেলব। সঙ্গী-ফঙ্গিতে দরকার নেই।"

কিছুক্ষণ হয়তো বা খেলেনও একা-একা, নিজেই দুপক্ষ হয়ে। তারপর উঠে চান করতে খেতে যান। কিন্তু পরদিন সকালেই আবার প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে ডাক দেন, "ও গুপি-বাবু, আসবেন না কি? হয়ে যাক এক দান।"

নয়তো মলয়কুসুমকে বাজার করতে যেতে বা বাজার করে ফিরতে দেখলেও ডাক দেন, "ওহে মস্তান, তোমার বাবু কোথায়? একবার ডেকে দাও না।"

মলয়কুসুম ওই 'মস্তান' কথাটা আদৌ পছন্দ করে না। বলতে কী, সহ্যই করতে পারে না, তাই ওকথা শুনলে হাঁড়ি মুখ করে বলে, "'একবার ডেকে দাও' কেন, বলুন না বাবু 'আজকের মতো ডেকে দাও।' বাচ্চাদের মতো কী যে এক ঘুঁটিখেলা আপনাদের!"

বলে চলে যায়, তবে ডেকেও দেয়।

ডেকে দেয়, সেটা গেনুপিসির ওপর আক্রোশ করে। তিনি ভুলেও কোনোদিন মলয়কুসুমের পুরো নামটা ধরে ডাকেন না ; আর উঠতে-বসতে বকেন। বেচারী যদি কোনোদিন বলে, "'মলা মলা' করেন ক্যানো ঠাকুমা, আমার নামটা কি এতোই শক্ত যে উচ্চারণ করতে পারেন না? দাঁত তো আপনার নেইও যে, দাঁত ভাঙবার ভয়?" পিসি অগ্রাহ্যের হুমকি দিয়ে বলেন, "দাঁত ভেঙে যাবার ভয়ে তোর নাম ডাকি না? মুখপোড়ার কথা তো কম নয়? জানিস আমার শ্বশুরবাড়িতে চাকর ছিল অক্রুরনন্দন, তাকে সবসময় পুরো নামে ডেকেছি।"

"তবে? তবে আমার বেলায় 'মলা' কেন শুনি?"

গেনুপিসি গরগরিয়ে বলেন, "সে আমার পুশি! বাবুর নাম গুপি, আর চাকরের নাম মলয়কুসুম। ওরে আমার কে রে! কক্ষনো বলব না। মলা বলব, ময়লা বলব, ব্যস।"

এই রাগেই মলয়কুসুম গুপিবাবুকে খেলতে যেতে ডেকে দেয়। দেরি হোক, ভুগুক বুড়ি।

কোর্ট যখন বন্ধ থাকে, তখনই তো যত খেলার ধুম। উকিল মোক্তার দুজনেই তখন বেকার। এখন কী জন্যে যেন কদিন কোর্ট-কাছারি বন্ধ যাচ্ছে, তাই খেলার ধুম বেড়েছে। সকালে খেলা, সন্ধেয় খেলা।

কিন্তু এসব না-হয় গুপিবাবুর দিকের কথা। কিন্তু গজপতিবাবুরও কি ত্রিসংসারে আর কেউ নেই?

না না, তা নয়। গজপতিবাবুর সব আছে। স্ত্রী, পুত্র; কন্যা জামাতা, আরও কারা সব। তবে তারা গজপতি উকিলের কাছে তো দূরের কথা, কাছাকাছিও থাকে না। মানে—গজপতি রাখেন না। তিনি বলেন, "ওই সব বৌ ছেলে মেয়ে জামাই, এরা হচ্ছে টাকা-পয়সা খরচা করিয়ে দেবার রাজা, বুঝলেন গুপিবাবু? কাছে রাখলে আর রক্ষে ছিল? একটা পয়সা জমত না। দূরে আছে, তাই যা হোক দু'চার পয়সা রাখতে পারছি। ওরা দেশের বাড়িতে আছে।"

গুপি মোক্তার জানেন, দু'চার পয়সা মানে হচ্ছে, দু-দশ হাজার টাকা। লক্ষও হতে পারে। বহুত টাকা জমিয়েছেন গজপতি। ব্যাঙ্কে ট্যাঙ্কে রাখেন না, পাছে বৌ-ছেলে টের পেয়ে যায়। সব এই ফ্ল্যাটের মধ্যেই কোথায় না কোথায় গুঁজে লুকিয়ে রাখেন. তাই প্রাণ গেলেও সহজে এই ফ্ল্যাটটি ছেড়ে নড়েন না। নেহাত কোর্টে টোর্টে বেরোতে হলে দরজায় আংটা বসিয়ে আটটা-আটটা ষোলটা তালা লাগিয়ে যান।

হঠাৎ হু হু করে যেন গলার মধ্যে কান্না উঠে এল গুপি মোক্তারের. আর কখনো তালা লাগাবে না গজপতি উকিল। লোকটাকে যে এত ভালবাসতেন, তা' জানতেন না গুপি মোক্তার।

ঘটনাটা টের পেলেন গুপি মোক্তার বিকেল বেলা।

পিসির তাড়নায় নেয়ে-খেয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, হঠাৎ কিসের যেন গোলমালে ঘুমটা ভেঙে গেল। কী সেই গোলমাল? খুব কাছেই যেন। মনে হচ্ছে কারা সব আসছে যাচ্ছে, কী সব বলাবলি করছে।

'মলয় মলয়' বলে হাঁক পাড়লেন, সাড়া পেলেন না। মনে পড়ল, মলয় তো কোনো দিনই দুপুরে বিকেলে বাড়ি থাকে না। ভাত খেয়ে উঠেই বেরিয়ে যায়. ফেরে সেই সন্ধ্যায়।

স্থির হয়ে কান পাতলেন, মনে হল শব্দটা যেন পাশের ফ্ল্যাটের দিক থেকে আসছে। গজপতি উকিলের বাড়ির লোকেরা মানে ছেলেমেয়ে গিন্নি-টিন্নি হঠাৎ দেশের বাড়ি থেকে চলে এসেছে বুঝি। তারাই সব আসছে যাচ্ছে।

কিন্তু তাই কি? ভারী-ভারী বুটের শব্দ যেন। চেঁচিয়ে ডাকলেন, "পিসি! পিসি।"

পিসিরও নো সাড়া।

হঠাৎ ভয়ে বুকটা গুর-গুর করে এল গুপি মোক্তারের। পা দুটো কেঁপে গেল। আবার বসে পড়ে ডাকলেন, "এক গেলাশ জল।"

না, জলের গেলাশকে ভেবে ডাকেননি, তবে বারবার ওই রকম ডাকলেই তো চলে আসে সে, হয় পিসির হাতে, নয় চাকরের হাতে। আজ কিন্তু এল না।

ওদিকে পাশের ফ্ল্যাট থেকে অনেক রকম গলার আওয়াজ আসছে। তার সঙ্গে ভারী-ভারী জুতো-পরা পায়ের আওয়াজ। আর ক্রমশ বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে আসছে।

গুপি মোক্তার কাঁপা-কাঁপা বুক নিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন মাথা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে। নিশ্চয় কিছু দুর্ঘটনা ঘটে গেছে এই সময়টুকুর মধ্যে। কিন্তু কী হতে পারে? পিসি হারিয়ে গেছে? মলয় তাঁকে খুঁজতে গেছে? পাড়ার লোকে এসে জটলা করছে?

কিন্তু তাই কি সম্ভব?

বরং গোটা কলকাতা শহরটাই হারিয়ে যেতে পারে. কিন্তু পিসি? পিসি হারাবার পাত্রী নয়।

তবে কি মলয়? আবার মনে পড়ে গেল, কিন্তু সে তো রোজই দুপুরে হারিয়ে যায়, সন্ধ্যা পার না করে ফেরে না। তাহলে?

তবে কি কোথাও চুরি-টুরি?

গজপতির বাড়িতে নয় তো? উঁহু! গজপতি তো তাহলে এতক্ষণে বুক চাপড়ে মাথা চাপড়ে পাড়া মাথায় করে তুলতেন। একবার পকেটমার হয়ে তিন টাকা তিরিশ পয়সা হারিয়ে যাওয়ায়, পাড়ার লোককে বোধ হয় মাস তিনেক ধরে তিষ্ঠোতে দেয়নি সেই দুঃখের কথা শুনিয়ে শুনিয়ে।

এখন তো কই ওর গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। তাহলে ওর কিছু নয়।

তবে কী? কী? কী?

হায়! অবোধ গুপি মোক্তার কি তখন স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছেন গজপতি উকিলের গলার আওয়াজ গামছা-মোড়া দিয়ে চিরকালের মত বন্ধ করে দিয়ে গেছে দুর্বৃত্ত পাপিষ্ঠ খুনে গুন্ডারা?

ওদিকে বুটের আওয়াজ সিঁড়িতে নামছে উঠছে। মনে হচ্ছে যেন লাঠিও ঠোকা হচ্ছে কোথাও।

এই শীতের অবেলায় গলগলিয়ে ঘেমে উঠলেন গুপি মোক্তার। আর হঠাৎ জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "পিসি, মলয়, তোমরা সব্বাই মরে গেছ নাকি?"

এই চেঁচানিতে কাজ হল।

কোন দরজা দিয়ে যেন চলে এসে পিসি বলে উঠলেন, "বালাই ষাট, সব্বাই মরবে কেন? মরেছে শুধু গজ উকিল। আহা, কিপ্টে হতভাগার সর্বস্ব নিয়ে গেছে গো! না-খেয়ে না-পরে পয়সা জমিয়ে মরে ছিল হতভাগা!"

তবে তাই!

গুপি মোক্তার থতমত খেয়ে বলেন, "তা গজপতির চেঁচামেচি শুনছি না যে?"

গেনু পিসি কপালে হাত থাবড়ে বলেন, "আ আমার কপাল! তোর কি বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেল গুপে? মরে গেলে কেউ চেঁচাতে পারে? বললাম না, মরে গেছে গজ উকিল। খুনেরা এই দিন-দুপুরে চড়াও হয়ে বেচারাকে গলায় গামছা পেঁচিয়ে খতম করে ফেলে সব নিয়ে গেছে। চোখ দুটো নাকি ঠিকরে উঠেছে। তাই বলি, গুলি নয়, বন্দুক নয়, ছোরা নয়, ছুরি নয়, শুধু একখানা গামছা দিয়ে মানুষ খুন! তবে আর মানুষ সাবধান হবে কিসে বল্? গামছা তোয়ালে আবার কোন ঘরে না থাকে? কে জানত সে-সবও একটা অস্তর!"

গেনুপিসি আরও কত কী বলে চলেন।

কারণ কথা শুরু করলে তো সহজে শেষ করেন না তিনি। কিন্তু গুপি মোক্তারের কানে ওই 'গামছা' কথাটা ছাড়া আর কোনো কথাই ঢোকেনি। কান ভোঁ-ভোঁ করছিল তাঁর। মনশ্চক্ষে শুধু নিজের গামছাখানি দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি। লাল টুকটুকে রং, বারান্দার তারে মেলা আছে। তার মানে লাল টুকটুকে নিরীহ চেহারা নিয়ে একটি ভয়াবহ 'নিধন অস্ত্র' ঝুলে পড়ে আছে গুপি মোক্তারের ধারে কাছে।

নাঃ, ঐ ভয়ংকর জিনিসটাকে আর বাড়িতে রাখা ঠিক নয়, এই দন্ডে পুঁটুলি পাকিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে তবে আর কাজ!

গুপি মোক্তার উঠলেন।

ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, "পিসি, এক গেলাস জল।"

গেনু পিসি বললেন, "শুধু জল খাবি? সেই কখন দুটো ভাত খেয়েছিস! দাঁড়া, দুটো আনন্দনাড়ু নিয়ে আসি, সকালে ভেজেছিলাম!"

আনন্দনাড়ু!

শুনে গুপি মোক্তারের মাথার ইলেকট্রিক তার জ্বলে ওঠে। গজপতি উকিল মরে গেল, আর আমি এখন আনন্দনাড়ু খেতে বসব?

গেনুপিসি উদাস গলায় বলেন, "তা তুই তো আর মারিস নি! এ দুনিয়ায় কে কার? ভগবান যখন যাকে নেন। তবে হ্যাঁ, খেলাধুলোর সঙ্গী ছিল তোর লোকটা। তা কী করবি বল? আয়, হাতটা মুখটা ধুয়ে নে!"

কিন্তু গুপি মোক্তারের মাথায় এসব কথা ঢুকছে না, তিনি যেই ভাবছেন—শুধু একখানা গামছার জোরে গজপতির মতো ওই তাগড়াই লোকটাকে ফিনিশ করে ফেলা হয়েছে, অমনি মাথাটা বোঁবোঁ করে ঘুরে উঠছে, আর ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে, উপরে, নীচে শুধু রাশি-রাশি গামছা ঝুলতে দেখছেন। লাল টুকটুকে, তারে মেলা।

নাঃ, রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলা চলবে না। লোকে সন্দেহ করবে। ছাতে নিয়ে গিয়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে দিলে হয়। কিন্তু তাতেই কি সন্দেহের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে?

গুপি মোক্তারের মাথার মধ্যে ইঞ্জিন চলতে থাকে। আশপাশের লোক এখন সজাগ, হঠাৎ যদি আগুন জ্বলার দৃশ্য দেখে, কি ন্যাকড়া পোড়ার গন্ধ পায়, নির্ঘাত ছুটে আসবে। ...নাঃ এখানে নয়, দূরে চলে গিয়ে কোথাও—গঙ্গায়? গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়াই ঠিক। গঙ্গায় অমন কত গামছা ভাসে। নাইতে গিয়ে গামছা হারিয়ে আসা তো লোকের ডাল ভাত।

আর কোনো চিন্তা নয়, একটি পুরনো খবরের কাগজে মুড়ে গামছাটিকে স্রেফ গঙ্গায়! আচ্ছা কোন গঙ্গায়? পাড়ার গিন্নিদের গঙ্গার ঘাটে? উঁহু, নো নো! সেও কোন সূত্রে ফিরে আসতে পারে। হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে বড় গঙ্গায় দেওয়াই ভাল।

অতঃপর গুপি মোক্তার ভবিষ্যতে জীবনে আর কখনো গামছা ব্যবহার করবেন না ঠিক করে ফেলেন। এত বড় একটা মারণাস্ত্রকে কাঁধে পিঠে বয়ে লালন পালন করবার কেনো মানে হয় না। পিসি আনন্দনাড়ু আনতে গেছে, এই অবসরে গুপি মোক্তার পিসির ভাঁড়ার থেকে একখানা পুরনো খবরের কাগজ হাতিয়ে নিয়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে যান।

কিন্তু এ কী?

কোথায় সেই লাল টুকটুকে মোলায়েম গামছাখানি? তারে যাকে দুলে থাকতে দেখতে পাবার কথা! নাঃ, নেই। সামনে, পিছনে, ধারে, কাছে কোথাও নেই। তাহলে? গেল কোথায়?

তবে কি—

হঠাৎ আচমকা একটা সন্দেহে গুপি মোক্তারের হৃৎপিণ্ডটা দুম দুম করে দুলে ওঠে। দুর্বৃত্তরা আগে গুপি মোক্তারের বাড়িতেই এসে ঢোকেনি তো? তারপর হাতাবার মতো কিছু না পেয়ে ওই গামছাখানা নিয়েই সটকেছে? নিশ্চয়ই তাই। ওইটা নিয়ে গিয়ে হানা দিয়েছে গজপতি উকিলের বাড়ি। হয়তো বাসন-কোসন জিনিসপত্র গামছাটায় বেঁধে নিয়ে যাবার মতলবে ছিল, তারপর শূন্য বাড়িতে একা গজপতিকে দেখে ভয়ঙ্কর হিংস্র ইচ্ছেটা জেগে উঠেছে তাদের।

হ্যাঁ, একেবারে একা বাড়ি। একটা চাকরও রাখেন না গজপতি, নিজের সব কাজ নিজে করে নেন। মানে 'রাখতেন না', 'নিতেন'। এখন তো গজপতিবাবু 'ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের' প্রথমটি হয়ে বসে আছেন। এখন তাঁর ব্যাপারে সবই 'তেন' দিয়ে বলতে হবে।

গুপি মোক্তার আর-এক দুর্ভাবনায় পড়লেন। এরপর পুলিসী তদন্তে যদি প্রকাশিত হয়ে পড়ে গামছাটা গুপি মোক্তারের, আর হত্যাকাণ্ডের মাত্র দু ঘণ্টা আগেও গুপি মোক্তার নিহতের বাড়িতেই ছিলেন, তাহলে?

গুপি মোক্তার আর ভাবতে পারেন না।

শুধু এইটুকু ভাবেন, এখানে আর এক দণ্ডও তিষ্ঠোনো নয়। চোঁ চাঁ পালাতে হবে। হ্যাঁ, পালাতেই হবে। শুধু পুলিসের সন্দেহের ভয়েই নয়, ওই ভয়ানক কাণ্ডটাও কারণ! জলজ্যান্ত একটা লোক সত্যি সত্যি খুন হয়ে

গেছে! কিছুক্ষণ আগেও যার সঙ্গে দাবা খেলেছিলেন গুপি মোক্তার!

বাড়ি থেকে বেরোতে-আসতে ওই তেরো নম্বর ফ্ল্যাটটার সামনেটি দিয়ে ছাড়া তো গতি নেই। কোনো কোনোদিন বেড়িয়ে ফিরতে কত রাত্তিরও তো হয়ে যায়। ওরে বাবা!

সর্বনাশ। অসম্ভব। কে বলতে পারে ভূত হয়ে যাওয়া গজপতি খোনা গলায় ডেকে উঠবেন কিনা, এঁই যে গুঁপি. আঁসবে নাকি? এক দাঁন হয়ে যাঁক না।

গুপি মোক্তার চারিদিক তাকালেন। দেখলেন, দেয়ালের পেরেকে বাজারের থলিটা ঝুলছে। ফ্যাঁস করে টেনে নিলেন সেটা। তাড়াতাড়ি তার মধ্যে কিছু টাকা, একখানা ধুতি, একটা লুঙ্গি একটা জামা, আর টুথব্রাশটা ভরে নিয়ে বাথ-রুমের মধ্যে ঢুকে তার পিছনের দরজাটা খুলে জমাদার ওঠবার ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

বুকের মধ্যে ভারী বুটজুতোর শব্দ!

যেখানে এসে পড়লেন, সেখানটা এই মস্ত ফ্ল্যাট বাড়ির পিছন দিক, যত রাজ্যের বাথরুমের নর্দমার মুখ। সবখানে নোংরা জল থই থই করছে, জমাদারটা যে কিছু কাজ করে না তা বোঝাই যাচ্ছে। অন্য সময় হলে এরকম নোংরা জায়গায় পা দেবার কথা ভাবতেই পারতেন না গুপিবাবু, কিন্তু এখন তো আর মাথার ঠিক নেই। এখন শুধু চিন্তা—কেউ না দেখতে পায়।

ওই নোংরা গলিটা দিয়ে বেরোতে হলেও যে ঘুরে সামনের গেট দিয়েই বেরোতে হয়, গুপি মোক্তারের এটা জানা ছিল না, পা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পাক দিয়ে বেরিয়ে এসেই দেখেন, ওরে বাবা, সামনে সাক্ষাৎ যম। গেটের সামনে পুলিসের সেই জালঘেরা কালো গাড়ি একখানি গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

গুপি মোক্তার পিছু হঠতে থাকেন।

হঠে হঠে আবার সেই নোংরা গলিতে গিয়ে পড়েন, আর এখন গুপি মোক্তারকে ঠিক একটি পাকা চোরের মতো দেখতে লাগে। কারণ গুপি এখন পাঁচিল ডিঙোবার তাল করছেন।

ছাত থেকে নেমে আসা রেনওয়াটার পাইপ বেয়ে খানিকটা উঠে গিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পাঁচিলের উপর গিয়ে পড়লেন গুপি। এখন ওদিকে নেমে যেতে হবে ঘষটে, ছেঁচড়ে, যে করে হোক। খুব বেশি উঁচু পাঁচিল নয়, এই যা।

কিন্তু অন্য বিপদ আছে।

পাঁচিলের মাথায় ভাঙা কাঁচের টুকরো পোঁতা। তার মানে ঘষটে নামতে গেলে, জামা ছিঁড়বে, বুকের ছাল-চামড়া ছিঁড়ে ওয়াড় হয়ে যাবে। কিন্তু গেলেই বা কী? পালাতে তো হবে।

বেভ্যল হয়ে যাওয়া গুপি-মোক্তারের এখন মাথার মধ্যে পিন ভাঙা গ্রামোফোন রেকর্ডের মত ওই একটা কথাই বেজে চলেছে, পালাতে হবে। যেন 'ভূত' হয়ে যাওয়া গজপতি উকিল তাঁকে তাড়া করেছে।

যে থলিটায় কাপড়-লুঙ্গি নিয়েছিলেন গুপি মোক্তার, সেটা কাঁধ থেকে নামিয়ে ওই ভাঙা কাঁচের খোঁচার উপর পেতে আস্তে পাঁচিলে বুক রেখে সাবধানে ওপারে নেমে পড়লেন। যদিও ধুপ করে একটা শব্দ হল, আর বুকটাও কিছু জখম হল, তবু হাত বাড়িয়ে থলিটা নিয়ে চটপট এগিয়ে গেলেন।

ফ্ল্যাট-বাড়ির পিছন দিকটায় যে একটা বস্তি আছে তা জানতেন না গুপিবাবু, তাকিয়ে দেখেনওনি কোনোদিন।

এখন এর মধ্যে দিয়ে যেতে গিয়ে অবাক হলেন। অত ভাল ফ্ল্যাট-বাড়িটার পিছন দিকটা এমন নোংরা গলি. পচা গন্ধ!

নাকে রুমাল চেপে গলিটা পার হয়ে গেলেন গুপি-মোক্তার। এখন কোনো মতে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে পড়ে, যে কোনো একটা ট্রেনে চেপে কলকাতাছাড়া হওয়া! তারপর যা আছে অদৃষ্টে।

খুনের ব্যাপারটা পুরনো হয়ে গেলে, আর তেরো নম্বর ফ্ল্যাটের সামনের গা-ছমছমানি কমলে, তবে ফেরা যাবে।

ততদিনে নিশ্চয় খুনী ধরা পড়বে। হয়তো তার ফাঁসিও হয়ে যাবে। তখন আর গুপি মোক্তারের গামছার কথা উঠবে না।

মনটা একটু নিশ্চিন্ত করে জোরে-জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে গেলেন গুপি।

২

"পাখি উড়ে গেল রে মদনা।"

বস্তির মধ্যে দাওয়ায় বসে ট্যাঁপা আর মদনা ভাঙা কলাই-করা বাটিতে চা খেতে খেতে নিজেদের সুখ দুঃখের কথা বলাবলি করছিল।

মানুষ-জন ভারী চালাক হয়ে গেছে আজকাল, বুঝলি? হয় পকেট গড়েরমাঠ করে রেখে দেবে, নয় পকেটের ওপর যেন একশো জোড়া চোখের পাহারা বসিয়ে ঘুরবে। ভাল-মতো একখানা পকেট কতদিন মারিনি বল্ তো?

ট্যাঁপার আক্ষেপে মদনাও হতাশ-হতাশ গলায় বলে, "যা বলেছিস! পয়সাকড়িওলা লোকগুলো যে কেন এত নিষ্ঠুর হয়! তোদের কত আছে, তবু পয়সার কী মায়া! আচ্ছা, আমাদেরও তো খেতে পরতে হবে? না কি হবে না?"

"সেই তো। বাজার বড়ই খারাপ। টাকাওলা লোক-গুলোকে দেখলে এত হিংসে হয়।" বলল মদনা।

ট্যাঁপা বলল, "তবে আবার টাকা থাকার বিপদও আছে রে। দেখলি তো চোক্ষের সামনে আজ? দিনদুপুরে খুন হয়ে গেল উকিলবাবুটা। টাকার জন্যেই তো?"

"তা বটে। শুনেছি নাকি হাড়-কেপ্পন ছিল লোকটা। কষ্ট করে কাটিয়ে সব টাকা জমিয়েছিল।"

"হাতে টাকা নিয়ে মানুষ যে কী করে কেপ্পন হয় রে মদনা!" ট্যাঁপা নিশ্বাস ফেলে বলে, "আমার যদি অনেক টাকা থাকত, দেখিয়ে দিতাম খরচা করা কাকে বলে!"

কথার মাঝখানে হঠাৎ দু'জনেরই চোখ কপালে ওঠে।

কে ও?

ফ্ল্যাট-বাড়ির পিছনের পাঁচিলে বসে পাঁচিল টপকাবার জন্যে লড়বড় করছে।

ট্যাঁপা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে মদনাকে চেঁচাতে বারণ করে নিঃশব্দে চোখ ড্যাবা করে তাকিয়ে থাকে। হুঁ, লোকটা পাঁচিল টপকাল। থলির মতো কী একটা টেনে নামিয়েও নিল।

তার মানে চোর! ট্যাঁপা মদনার মতে চোর নিকৃষ্ট জীব। উঁচুদরের মানুষ নয়।

চোরকে পকেটমাররা খুব নিচু চোখে দেখে।

ট্যাঁপারাও দেখল।

নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে আছে তারা, দেখতে হবে কে লোকটা।

মদনা ফিসফিস করে বলে, "ব্যাটা তাহলে সেই খুনে! দুপুরে কাজ সাঙ্গ করে মালপত্তর নিয়ে পেছনের নোংরা গলিতে লুকিয়েছিল, এখন সন্ধের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালাবার তাল।"

"আমরা কি চেঁচাব?" বলল ট্যাঁপা।

মদনা বলল, "এই, খবরদার। কেন মিথ্যে ঝামেলা বাধাবি? দেখবি তাহলে পুলিস এসে আমাদের ধরবে।"

"তাই বলে হত্যেকারী সামনে দিয়ে চলে যাবে?"

"যেতে দে!"

তারপরই চমকে ওঠে দুজনে।

আরে চোর কোথায়! এ যে সেই গুপি মোক্তার। গজ উকিলের পাশের পড়শি! রোজ দুজনে নাকি দাবা-খেলা চলে। মানে চলত।

আর চলবে না। উকিল তো পরপারে চলে গেল।

হঠাৎ দুই বন্ধুরই চোখ গুলি হয়ে ওঠে, আর মাথার চুল হরিসংকীর্তন করতে শুরু করে।

"ট্যাঁপা, বুঝেছিস?"

"বুঝলাম রে মদনা।" ট্যাঁপা আস্তে আস্তে বলে, "প্রাণের বন্ধুটিকে খতম করে এখন মালপত্তর নিয়ে হাওয়া হচ্ছেন।"

এই কথা-টথার মাঝখানে সামনে দিয়ে তড়বড় করে এগিয়ে গেলেন গুপি মোক্তার।

ট্যাঁপা বলল, "পাখি উড়ে গেল রে মদনা।"

উত্তেজনায় ওদের মাথা চক্কর খেয়ে উঠল। সামনে দিয়ে একটা চেনাশোনা খুনী আসামী চোরাই মাল নিয়ে ভেগে যাবে। আর ট্যাঁপা মদনা জুলজুল্ করে তাকিয়ে দেখবে?

অথচ দেখছেও তাই।

যাচ্ছেই লোকটা ভেগে।

"মদনা!"

ট্যাঁপা ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, "লোকটা কী রকম চালাক দেখেছিস? বাকস নয়, সুটকেস নয়, সেরেফ একটা চটের থলি। যাতে কেউ না সন্দেহ করতে পারে।"

মদনা ট্যাঁপার গায়ে একটা খামচি কেটে বলে, "বাটপাড়ি কি নিচু কাজ ট্যাঁপা?"

ট্যাঁপা গম্ভীর গলায় বলে, "তাই ভাবছি। মনে হচ্ছে নিচু নয়। বরং উঁচু দরেরই। লোকটার পাপের বোঝা একটু হালকা করে দেওয়া হবে।"

"তবে চল্।"

"চল্।"

তড়াক করে দাওয়া থেকে লাফিয়ে পড়ে নিঃশব্দে হন হন করে এগিয়ে যায় দু'জনে।

গুপি মোক্তারকে ধরে ফেলতে আর কতক্ষণ? ওদের হল পকেটমারের পা।

পরদিন সকাল।

হাওড়া স্টেশনে টিকিট কাটতে লম্বা লাইন।

তবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুর্গাপুরের ট্রেনের একখানা সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট কেটে চটপট এগিয়ে গেলেন গুপি! এই গাড়িটাই এক্ষুনি ছাড়বে।

কোণের দিকের একটা সিটে বসে পড়ে কপালের ঘাম মুছে একটু নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেললেন গুপি মোক্তার। যাক, এতক্ষণে একটু বাঁচা গেল। ভূতেরা কি রেলগাড়ি চাপে? বোধহয় নয়। তা'হলে আশা হচ্ছে এবার বাঁচা গেল। উঃ সারাক্ষণ ধরেই মনে হচ্ছিল, পিছনে পায়ের শব্দ, কে যেন পিছু পিছু আসছে।

আর কে?

গজপতি উকিলের প্রেতাত্মা ছাড়া?

ভাল করে গুছিয়ে বসে গুপি মনে মনে বলেন, খেলায় হারজিত আছেই, আমি যে কেবলই জিততাম, আর তুমি মশাই কেবলই হারতে, তার জন্যে কি আমি দায়ী? ওসব তো লাক্-এর ব্যাপার। বুদ্ধিরও। তা' বলে তুমি মরে ভূত হয়ে আমার ওপর প্রতিশোধ নেবে?...

যাক্ আর শোধ নিতে হবে না। এবার মিটে গেল। রেলগাড়িতে তো আর পরলোকগতরা আসে না।

নিশ্চিন্তির নিশ্বাস ফেলার পর হঠাৎ পিসির আনন্দ-নাড়ুর কথা মনে পড়ে মনটা হায় হায় করে উঠল গুপির। ইশ, খেয়ে এলেই হত। এখন কখন কী জুটবে কে জানে। টাকা পয়সা যা আনা হয়েছে, তা' টিপে টিপে খরচা করতে হবে।

সেইটুকুই তো সর্বস্ব।

সেই চটের থলিটা বাগিয়ে ধরে কোলের কাছে টেনে নিলেন গুপি মোক্তার, বলা যায় না কে কখন চক্ষুদান করে বসে।

সামনের বেঞ্চের কোণে যে দুটো ছেলে বসে বসে চিনে-বাদাম ছাড়িয়ে-ছাড়িয়ে খাচ্ছিল, তারা দু'জনে দুজনকে চিমটি কাটল। যার মানে হচ্ছে, 'বুঝতে পারছিস?'

বুঝব না আবার কেন? আসল মাল ওইটির মধ্যে।

স্টেশন থেকে একখানা দৈনিক বার্তাবহ কিনে-ছিলেন গুপি, সেইটাকে মুখের সামনে ধরে বসে চোখ বুলিয়েই চলেছিলেন। ঠিক পলাতক আসামীরা যেমন করে।

গুপি-মোক্তার আসামী না হলেও পলাতক তো বটে!... অতএব পলাতকদের মনের মধ্যে যা হয়, তাঁর মনের মধ্যেও তাই হচ্ছিল। যাতে অন্যেরা তাঁর মুখ দেখতে না পায়, এবং তিনি অন্যদের মুখের ভাব দেখতে পান। তাই দেখতে পাচ্ছিলেন 'চিনেবাদাম খাওয়া' ছেলে দুটো যেন কেবলই তাঁর দিকে যাকে বলে কটাক্ষপাত করছে। আবার নিজেদের মধ্যে কী যেন ইশারাও করছে।

কারণ কী?

ওদের গুপি জীবনেও চোখে দেখেননি।

তবে?

ওরা কি তবে পুলিসের চর?

আবার বুকের মধ্যে উথাল-পাথাল করে উঠল। ভাবলেন, সামনে যে স্টেশনটা পড়বে, সেটাতেই নেমে পড়বেন। টুক্ করে একবার নেমে পড়েই ভিড়ে মিশে অন্য কামরায় উঠে পড়বেন।

থলিটা বাগিয়ে ধরে অপেক্ষা করতে থাকলেন গুপি।

ছেলে দুটো জানলার বাইরে মুখ রেখে চিনেবাদাম চিবোচ্ছে। ভালই হয়েছে। এখন একটা স্টেশন এলে হয়।...

স্টেশন এল।

গাড়ি থামল। কিন্তু এমনি কপাল গুপি মোক্তারের যে, হবি তো হ' কিনা বর্ধমান! তার মানে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকবে গাড়ি। কামরা সুদ্ধ লোক নেমে পড়ে খেতে ছুটবে।

শুধু যে সীতাভোগ মিহিদানা তা' নয়, হ্যাংলার মত যা পাবে তাই গিলবে। মাটন কাটলেট, ফিশ চপ, ফুলকপির সিঙ্গাড়া, খাস্তা কচুরি, আলু মটরের ঘুগনি, কলাইডালের ফুলুরি, আরও কত কী!

আশ্চর্য্যি বাবা, এত সব খেতে ইচ্ছে করে লোকের? করেই তো দেখা যাচ্ছে। ওসব জিনিস তো বটেই, কাঠের থালায় সাজানো পোকাধরা ছোলাসেদ্ধগুলো পর্যন্ত ফিনিশ হয়ে যাচ্ছে। এমন কী, তাতে গোঁজা কাঁচালঙ্কাগুলো এবং পাকা-পাকা পাতিলেবুর টুকরোগুলো পর্যন্ত।

বাবা কী পেটুক সব। প্ল্যাটফর্ম সুদ্ধ লোক সবাই যেন এক একটি বকরাক্ষস। কথাটা ভাবতে গিয়েই কিন্তু তাঁর নিজেরই পেটের মধ্যে একটি বকরাক্ষস 'সব খাই সব খাই' করে ওঠে। তাঁরও সব কিছুই খেতে ইচ্ছে করে হাঁউ হাঁউ করে।

সেই গতকাল দুপুরে পিসির ডাকা-ডাকিতে খেলা ছেড়ে উঠে এসে ভাত খেয়েছিলেন, তারপর থেকে স্রেফ দু' এক ভাঁড় চায়ের ওপর আছেন।

রাত্রে ওয়েটিং রুমের একটা বেঞ্চে শুয়ে থেকেছেন, আর পেটে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে পেটের জ্বালা নিবারণ করেছেন। হাতের কড়ি খরচা করে খেয়ে নিলে তো চলবে না, এখন দূরে পালাতে হবে তো।

হায়! হায়! আনন্দনাড়ু কটা যদি এই থলিটায় ফেলে নিয়ে চলে আসতেন! আচ্ছা, গুপিকে হঠাৎ হাওয়া হতে দেখে পিসি কী ভাববে?

পিসিও হঠাৎ সন্দেহ করে বসবে না তো গুপিকে? না, সে অসম্ভব।

কিন্তু এ কী জ্বালা হল আমার।

নিশ্বাস ফেলে ভাবলেন গুপি-মোক্তার, কোনো দোষে দোষী নই, অথচ খুনে গুণ্ডার মতো ভয়ে ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

তবে কি ফিরেই যাব?

ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

ওরে বাবা! গেলে তো সেই তেরো নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে দিয়ে?

থলিটি বাগিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ে পঞ্চাশ পয়সা খরচ করে এক পাতা ছোলা সেদ্ধ কিনলেন গুপি, আর পঁচিশ পয়সায় এক ভাঁড় চা।

তবু যাক্ পুরো টাকাটা গেল না।

গাড়ি এখন অনেকক্ষণ থেমে থাকবে, গুপি নিশ্চিন্ত হয়ে একটু সরে গিয়ে চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে-দিতে ছোলাসেদ্ধ চিবোতে লাগলেন। মন্দ লাগছে না। বড় হয়ে গিয়ে পর্যন্ত এ জিনিস তো কই আর খেয়েছেন বলে মনে পড়ছে না। নাঃ, বেশ তোফাই লাগছে। তাছাড়া আরও একটা সুবিধে, এই পোকা-পোকা গন্ধ (ছেলেবেলায় গুপির বাবা যাকে ঘোড়ার ছোলা বলতেন) ছোলাসেদ্ধ একপেট খেয়ে থাকলে নির্ঘাত তিনটি বেলা আর কিছু খেতে হবে না। পেট ভার থাকবে, কামড়াতেও পারে। তার মানে অন্তত আর তিন বেলা পয়সা খরচ নেই।

ছোলা শেষ হলে, নুন-ঝালের পাতাটা চেটে চেটে সাফ করছিলেন গুপি, হঠাৎ দেখলেন চোখের সামনে দিয়ে গদাই লস্কর চালে ট্রেনটা বেরিয়ে গেল।

সেরেছে!

এখন উপায়?

দুর্গাপুরের টিকিটটা গুপিবাবুর পকেটে পড়ে রইল, আর ও'কে না নিয়ে ট্রেনটা দিব্যি বেরিয়ে গেল! গুপিবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ভাবলেন, পৃথিবীটাই বিশ্বাস-ঘাতক। নইলে গাড়ি একটা জড় পদার্থ, সেও এরকম বিশ্বাস-ঘাতকতা করে বসে? কিন্তু—

গাড়ি কি জড় পদার্থ?

গুপি-মোক্তার ভুরু কোঁচকালেন, ভুরুর সঙ্গে নাকও। ভাবলেন, গাড়িকে কী করেই বা জড়পদার্থ বলা যায়? গাড়ি চলে। রীতিমত চলে। বিশেষ করে রেলগাড়ি, 'চলে' বললে কিছুই বলা হয় না, ছোটে। তাছাড়া ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে, কু করে ডাকে, এবং কোর্টের বিপিনবাবুর মতো গল-গলিয়ে ধোঁয়াও ছাড়ে নাক মুখ দিয়ে।

তবে? নাঃ, রেলগাড়ি জড়পদার্থ নয়।

আর সেই জন্যেই এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল।

একটুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে গুপি-মোক্তারের হঠাৎ দিব্য দৃষ্টি খুলে গেল। আচ্ছা আমার কাছে দুর্গাপুরই বা কী আর বর্ধমানই বা কী? কোনোখানেই তো কেউ নেই আমার। তবে এখানেই থেকে যাই। তাই ভাল। হ্যাঁ বেশীই ভাল। এখানে কিছুতেই আর সেই চিনেবাদাম খাওয়া ছেলে দুটোর প্যাট্‌প্যাটে চোখ দেখতে হবে না।

ভারী আরাম বোধ করে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে শহরের দিকে হাঁটতে লাগলেন গুপি।

আর একবার পিসির কথা মনে পড়ল। বুড়ি বোধহয় কান্নাকাটি করছে। যাক্ গে, কী আর করা! মলয়কুসুম রয়েছে এই যা ভরসা।

ট্যাঁপা আর মদনার দাঁতেরা চিনেবাদাম চিবোলেও চোখ চারখানা লক্ষ্যে স্থির ছিল। গুপি যখন নেমেছেন, ওরাও তখন নেমে পড়েছে। গুপি যখন ছোলা কিনেছেন, ওরাও তখন ঝালমুড়ি কিনেছে।

একটা সুবিধেও হয়ে গেছে।

এক ভদ্রলোক ট্রেন থেকে নেমে পড়ে তাড়াতাড়ি দু চাঙারি সীতাভোগ আর মিহিদানা কিনে নিচ্ছিলেন, পকেট থেকে পার্সটা বার করে মিষ্টিওলার ঠেলাগাড়ির ওপর রেখেছেন, সেই ফাঁকে ট্যাঁপা তা থেকে একখানি দশ টাকার নোট সরিয়ে নিয়েছে।

এখন দু' চারদিন চলে যাবে।

ঝালমুড়ি চিবোতে-চিবোতে ওরা দেখল, ট্রেন ছেড়ে দিল, গুপি মোক্তার উঠলেন না। কাজেই এরাও উঠল না।

মদনা বলল, "দূরে থেকে 'ফলো' করতে হবে, লোকটার আমাদের ওপর সন্দ হয়েছে।"

ট্যাঁপা হতাশ গলায় বলে, "কতদিন যে ভোগাবে কে জানে! 'মালকড়ি'গুলো ওর ওই চটের থলিতেই আছে না আর কোথাও রেখে এসেছে তাই বা কে জানে।"

মদনা বলে, "উঁহু, আর কোথাও না। দেখছিস না সব-সময় কেমন বুকে আগলে ধরে রেখেছে!"

ট্যাঁপা উদাস মুখে বলে, "পৃথিবীতে আর থাকতে ইচ্ছে করে না রে মদনা। জগতে এত টাকা, বস্তা বস্তা টাকা, পাহাড় পাহাড় টাকা, তার থেকে সামান্য দু-চার টাকা পেলেই আমাদের জীবন চলে যায়, অথচ দ্যাখ্, তাও জোটে না। ওই ভদ্দরলোকের মনিব্যাগটার পেটটা যে কী মোটকা ছিল রে মদনা, তোকে কী বলব। যেন বর্ষার রাতের কোলাব্যাঙ!"

মদনা রাগ-রাগ গলায় বলে, "তবে একটা মাত্তর নোট নিলি কেন? সবটা সাঁটলেই হত।"

ট্যাঁপা বলে, "খেপেছিস? তাহলে হৈ চৈ পড়েযেত না?

আর ধরতে পারলে এই পেলাটফরম সুদ্ধ লোক আমায় বিন্দাবন দেখিয়ে ছাড়ত না?...একটা নোট ব্যাগ থেকে মুখ বাড়িয়ে ছিল, তাই। বাবু বোধহয় মিষ্টিওলাকে দেবে বলে বার করছিল—"

ঝালমুড়ির ঠোঙা দুটো ফেলে দিয়ে দু'জনে আবার নিঃশব্দে হন হন করে হাঁটতে থাকে। লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়।

"খবরের কাগজে হয়তো 'পুরস্কার' ঘোষণা করেছে," মদনা ফিসফিস্ করে বলে, "হয়তো লোকটাকে ধরিয়ে দিতে পারলে হাজার দু'হাজার পাওয়া যেত।"

ট্যাঁপা অবহেলাভরে বলে, "তা সে আর কে জানতে পারছে? তোরও যত বিদ্যে, আমারও তত বিদ্যে! কাগজটা পড়বে কে? ওসব কিছু না, ওই চটের থলিটা হাতাতে পারলেই বাকি জীবন কেটে যাবে।"

"কত আছে বলে মনে হয় তোর ট্যাঁপা?"

"দশ-কুড়ি হাজার কি আর না হবে?"

মদনা মলিন মুখে বলে, "তবেই তো মুশকিল। গুনে ঠিক করবে কে?"

"তুই থাম তো মদনা—"

ট্যাঁপা বলে, "গুনে ঠিক করবার দরকার কী? বলি গুনতে না জানলেও খরচা করতে তো জানিস? না কি ভাগ নিয়ে ঝগড়া করবি?"

মদনা আধহাত জিভ বার করে বলে, "তুই আমায় ভেবেছিস কী ট্যাঁপা? চিরকালের বন্ধু না আমরা?"

ট্যাঁপা উদাস মুখে বলে, "গজ উকিল আর গুপি মোক্তারও বন্ধু ছিল রে মদনা!"

মদনা গম্ভীর গলায় বলে, "বড়লোকের কথা বাদ দে।"

৩

গেনুপিসিও ঠিক তখন ওই কথাটাই বলছিলেন। অবিশ্যি 'বড়লোক' বলেননি, বলছিলেন "গুপে? গুপের কথা বাদ দিন বাছা! ওর মতিগতির কোনো ঠিক নেই।"

কাকে বলছিলেন?

বলছিলেন স্বয়ং পুলিস ইন্সপেক্টর কেবু ঘোষকে।

গুপি মোক্তারের ভয় তো আর মিথ্যে নয়, পুলিস তো আগে তাঁর বাড়িতে এসেই জেরা করেছে।

গতকালই এসেছিল, কিন্তু গেনুপিসি ঝেড়ে জবাব দিয়েছিলেন, "ভাইপো বাড়ি নেই, আমার এখন আহ্নিকের সময়, মেলা ফ্যাচফ্যাচ করতে আসবেন না।"

তবু ফ্যাচফ্যাচ করেছিল সে। "তা' তিনি গেছেন কোথায়?"

গেনুপিসি রেগে টং হয়ে বলেছিলেন, "কোথায় যাচ্ছে তাই যদি বলে যাবে তো আমার এত জ্বালা কেন বাছা?"

"সাধারণত কোথায় যান?"

গেনুপিসি কড়া গলায় বলেন, "তার কোনো ঠিক আছে? যেদিন যেখানে ইচ্ছে যায়।"

"তা' ফেরেন কখন?"

"বলি তারই কোনো ঠিক আছে?" গেনুপিসি হাঁড়িমুখে বলেন, "এখনকার ছেলেপুলে একদণ্ড বাড়ি থাকতে চায়? যতক্ষণ পারে বাড়িছাড়া হয়ে থাকাই একালের ছেলেপুলের স্বভাব।"

কাল কেবু ঘোষ আসেননি, এসেছিল আর একজন কে। গেনুপিসির কথায় হেসে ফেলে বলে উঠেছিল, "শুনলাম তো গুপিবাবু গজপতি উকিলেরই সমবয়সী, তার মানে বছর পঞ্চাশ বয়েস। তিনি আবার একালের ছেলে হলেন কী করে?"

একথার পরেও গেনুপিসি মেজাজ ঠাণ্ডা রাখবেন এমন আশা করা যায় না। রাখেননি। রাগে গরগরিয়ে বলেছেন, "দেখ বাছা, অনেকক্ষণ আপনি-আজ্ঞে করেছি, আর নয়। গুপি আমার ষেটের কোলে এই ক'টা মাস হল মাত্তর উনপঞ্চাশে পড়েছে, আর তুমি ওকে পঞ্চাশে পাঠিয়ে দিচ্ছ? বাছার বয়স খুড়ো না বাপু!"

তবু সে লোক বলেছিল, "বেশ নাহয় তেনার বয়েস বায়ো-তেয়োই হল, কিন্তু গজপতিবাবুর সঙ্গে ভাব তো ছিল?"

তখন গেনুপিসি চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, "মলা, মলা, একটা পুলিস ডাক তো! বাড়িতে একটা বেটাছেলে নেই, মাত্তর তুই একটা বাচ্চা ছেলে, আর আমি একটা অবলা মেয়েমানুষ। আর এই লোক কিনা জেরা করে জ্বালিয়ে মারছে।"

পুলিস ডাকার কথা শুনে সেই ছোট ইন্সপেক্টর হতভম্ব হয়ে চলে গিয়েছিল। আজ বড় ইন্সপেক্টর কেবু ঘোস এসেছেন জেরা করতে।

ভার-ভারিক্কে লোক, প্রথমেই গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করেছিলেন, "গুপিবাবু আপনার আত্মীয়?"

গেনুপিসিও গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, "আপনার ছেলে আছে?"

উনি ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন, "একথার মানে?"

"মানে হচ্ছে, আপনার ছেলে যদি আপনার আত্মীয় হয় তো গুপিও আমার আত্মীয়।"

"ওঃ! উনি আপনার ছেলে।"

গেনুপিসি বলেন, "ছেলে আর ভাইপোতে তফাত কী, বাছা?"

"ওঃ! তাই বলুন, ভাইপো! তা বেশ। আপনিই বুঝি ওঁকে মানুষ করেছেন?"

গেনুপিসি কড়া গলায় বলেন, "মানুষ করেছি, কী ভূতপ্রেত করেছি সে কথায় কাজ কী? আপনার যা জানবার সাফ-সাফ বলে যান। মানুষ হলে কি আর আনন্দনাড়ু ক'টা ফেলে রেখে চলে যায়?"

কেবু ঘোষ বলেন, "ও, চলে গেছেন? কখন চলে গেছেন?"

"সেই কথাই তো বলছি," গেনুপিসি ঝঙ্কার দিয়ে বলেন, "জল চাইল, বললাম, শুধু জল খাবি? তাই কৌটো খুলে ক'টা আনন্দনাড়ু বার করে আনতে গেলাম। তাড়াতাড়ির সময় যা হয়, কৌটোটাও বিগড়ে বসে। খুলতেই চায় না। খুন্তি দিয়ে চাড় মেরে তবে খুলে নিয়ে এসে দেখি, বাবু হাওয়া!"

"ও! সেই অবধি আর ফেরেননি?" কেবু ঘোষ গোঁফের ফাঁকে হেসে বলেন, "এটা বোধহয় গতকাল বিকেলে?"

গেনুপিসি ভরাট গলায় বলেন, "তবে আর বলছি কী! বুড়ো পিসিটা যে না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে পড়ে থাকবে, সে জ্ঞান নেই। সাধে আর বলছি—মানুষ করেছি না ভূত-প্রেত করেছি জানিনে।"

কেবু ঘোষ এবার একটু ধমকের সুরে বলেন, "বাজে কথা থামান। পষ্ট কথা বলুন, গুপিবাবু রোজ গজপতিবাবুর সঙ্গে দাবা খেলতে যেতেন কিনা?"

গেনুপিসি কটকটিয়ে বলে ওঠেন, "না গেলে ছাড়ত লোকটা মরে গেছে, সগ্গে নরকে, যেখানে হোক গেছে, বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না তবু বলি, লোক বড় 'ইয়ে' ছিল। রাতদিন

ডাকাডাকি, গুপি গুপি। ওর যেন খেয়ে-শুয়ে কাজ নেই!"

কেবু ঘোষ আবার ধমক দেন, "দাবা খেলতে যেতেন, কেমন? ঠিক কিনা?"

"আমি বলেছি বেঠিক?"

"হুঁ! কালও গিয়েছিলেন?"

"গিয়েছিলই তো। ডেকে ডেকে তবে ভাত খাওয়াতে নিয়ে আসি।"

"কে ডাকতে গিয়েছিল?"

"কে আবার?" গেনুপিসি আরও চড়া গলায় বলেন. "এই আমি। নইলে সেই বুড়ো আমার বাছাকে ছাড়ত? চাকরকে তো ডোন্টো কেয়ার করে।"

"আপনি যখন গেলেন, দু'জনকে কী অবস্থায় দেখলেন?"

গেনুপিসি বলেন, "শোনো কথা, অবস্থা আবার কী? দুই খোকায় হুক্ পেতে ঘুটি সাজিয়ে বসে আছেন এই তো দিশ্য।"

কেবু ঘোষ গোঁফে তা' দিয়ে বলেন, "হুঁ। তা আপনি ডেকে আসবার কত পরে গুপিবাবু ও-ফ্ল্যাট থেকে চলে এসেছিলেন?"

গেনুপিসি চোখ কপালে তুলে বলেন, "কত পরে মানে? আমি ডাকতে যাবার পর আরও বসে থাকবে, এত সাধ্যি হবে ওর? আমার সংগে-সংগেই চলে এসেছে।"

কিন্তু কেবু ঘোষ কি এইটুকুতেই ছাড়বেন? গুপি মোক্তারের নাড়ি নক্ষত্র সব জেনে নেবেন না? তারপর কী করেছিলেন তিনি, তারপর কী করেছিলেন, তার আগে কী করেছিলেন, সারাজীবন কী করতেন, সব জিগ্যেস করবেন না?

গেনুপিসি ঠকঠক করে সব কিছুরই উত্তর দিচ্ছিলেন, কিন্তু কেবু ঘোষ যখন বললেন, "আসল কথাটা আমি বলব? ...আপনি যখন ভাবছেন আপনার ভাইপো খেয়ে-দেয়ে ঘুমোচ্ছেন, তখন তিনি চুপিচুপি উঠে, বন্ধুর গলায় একটি ফাঁস লাগিয়ে তাঁর চাবিটি নিয়ে সর্বস্ব হাতিয়ে বাড়ি ফিরে ভাল মানুষের মত আবার শুয়ে পড়েছেন। তারপর—"

তখন গেনুপিসি চেঁচিয়ে হাঁক পেড়েছেন, "মলা! এ পুলিস ডাকার কম্মো নয়। জজ ডাক। অ্যাঁ, বলে কিনা গুপী আমার খুন করে এসে আবার ভালোমানুষের মতো—ওরে মলা, জজ না পাস, কোনোখান থেকে একটা মন্ত্রী-মান্ত্রী ডেকে আন। এ অত্যেচার আর সহ্য হচ্ছে না। ওরে বাবা রে, বাছা আমার শোকে-তাপে বেভুল হয়ে নিরুদ্দিশ হয়ে গেল, আর বলে কিনা সেই খুন করেছে—ও মাগো—"

এমন চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলেন গেনুবালা যে, পাড়ার লোক ছুটে এল। দেখে শুনে কেবু ঘোষ তখনকার মত বিদায় নিলেন।

বাইরে এসে অবশ্য আবার মলয়কুসুমকে ধরেছিলেন।

"নাম কী তোমার?"

মলয় টান টান হয়ে উত্তর দিল, "শ্রীমলয়কুসুম দাস রায়।"

"এখানে কী কর?"

"কী না করি, সেটাই বরং জিগ্যেস করুন।"

"সোজা করে জবাব দাও", কেবু ঘোষ ধমক দিয়ে বলেন, "পাশের ফ্ল্যাটে কাল একটা খুন হয়েছে তা জানো?"

"আজ্ঞে সন্ধেবেলা বেড়িয়ে ফিরে জানলাম।"

কেবু ঘোষ আরো ধমকে বলেন, "কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে?"

মলয়কুসুম মাথা চুলকে বলে, "আজ্ঞে পুরনো পাড়ায়, তাস খেলতে।"

"এসে তোমার বাবুকে দেখেছিলে?"

"আজ্ঞে না।"

"তার মানে, খুনের পর তিনি ফেরার হয়েছেন?"

মলয়কুসুম ডাইনে বাঁয়ে দুদিকে মাথা হেলিয়ে বলে, "আজ্ঞে, হিসেবমত তাই দাঁড়াচ্ছে।"

"তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে না, খুনটা উনিই করেছেন?"

মলয়কুসুম আধহাত জিভ বার করে বলে, "খেপেছেন? বাবু করবেন মানুষ খুন? বলে একটা মশা-ছারপোকাকে খুন করার দরকার হলে, মাঝরাত্তিরে আমায় ডাক পাড়ে।"

কেবু ঘোষ গোঁফ ঝুলিয়ে বলেন, "হুঁ, তুমিও একটি ঘুঘু। বাড়ি কোথায়?"

"আজ্ঞে যেখানেই থাকি, সেটাই বাড়ি।"

"ফের বাজে কথা? দেশের বাড়ি কোথায়?"

মলয়কুসুম মনমরা গলায় বলে, "আজ্ঞে সে শুনলে আপনার হাসি পাবে। গাঁয়ের নাম ব্যাদড়াপাড়া।"

কেবু ঘোষ কষ্টে হাসি চেপে বলেন, "ঠিক নাম। তা সে-দেশে তোমার এমন বাহারি নামটি কে রাখল?"

মলয়কুসুম এখন তার এক ফুট লম্বা চুল ঝাঁকিয়ে বলে, "হুঁ! সেখেনে এই নাম? তাহলেই হয়েছে! এ আমার নিজের ছিষ্টি করা নাম! মা-বাপ তো নাম রেখেছিল 'পচা'।"

"বাঃ বাঃ, বেশ! তা বাপু, তোমার বাবু কোথায় যেতে পারে তোমার ধারণা?"

মলয়কুসুম গম্ভীর গলায় বলে, "ধারণার কথা বলতে নেই সাহেব, ভুল হয়।"

এত চালাক-চালাক কথা বলেও রেহাই পেল না বেচারা মলয়কুসুম। তাকে থানায় ধরে নিয়ে গেল। বাবুকে যখন পাওয়া যাচ্ছে না, চাকরকেই ধরা যাক। শুধু ওকেই নয়, এই ফ্ল্যাট-বাড়ির অনেককেই ধরপাকড় করা হল। আস্ত একটা মানুষ খুন হওয়া তো চারটিখানি কথা নয়।

মলয়কে ধরে নিয়ে গেল দেখে গেনুপিসি হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন।

আর কী করবার আছে?

অথচ বস্তিতে ট্যাঁপার মা, আর মদনার ঠাকুমা মুখে তালা-চাবি লাগিয়ে বসে আছে। ছেলে হারিয়ে গেছে, সে-কথাটি বলছে না। এখন যদি ছেলে-ছেলে করে কাঁদতে বসে, তাহলে তাদের উপরও হয়তো পুলিসের নজর পড়বে।

ওরা জানে না, এদিকে ট্যাঁপা মদনাই স্রেফ ডিটেকটিভ পুলিসের মত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যেখানে গুপি মোক্তার, সেখানে ওরা। তবে দূরে থেকে। দেখাটি দিচ্ছে না।

কিন্তু দেখতে না পেলেও কি কিছু টের পাওয়া যায় না? কেউ পিছু-পিছু এলেই অনুভবে ধরা পড়ে। গুপি মোক্তারও তাই কেবলই অনুভব করছেন, পিছনে কার যেন পায়ের শব্দ, কোথায় যেন ফিসফিস গলার আওয়াজ।

কার? কার?

আর 'কার?'

ভেবে মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে গুপির। অপঘাতে মরলে তো মানুষ অপদেবতাই হয়।

অতএব দৌড় দৌড়।

যেদিকে দুচক্ষু যায়।

মাঠ ময়দান, ঝোপ জঙ্গল, আমবাগান, কাঁঠাল বাগান, ভাঙা শিবমন্দির, পোড়ো বাড়ি, যেখানে সেখানে ঢুকে পড়ছেন, ঢুকে পড়ে কোথাও বসে হাঁপাচ্ছেন, শুয়ে পড়বেন ভাবছেন, আবার কেমন কেমন যেন আওয়াজ পেয়ে দৌড় মারছেন। দৌড় মেরে যে 'ওনা'দের হাত এড়ানো যায় না, এ খেয়াল হয় না গুপি মোক্তারের।

মাথার মধ্যে সেই পিনভাঙা গ্রামোফোন রেকর্ডটা এখনো বেজেই চলেছে।

পালাই বাবা। পালাই বাবা।

রামনাম করে করে জিভ ব্যথা, খাওয়া দাওয়া তো নাস্তি। দৌড় দিতে দিতে শহর অঞ্চল ছাড়িয়ে কখন যে বর্ধমানের সব গন্ডগ্রামের মধ্যে ঢুকে ঢুকে পড়ছেন, তাও জানেন না। কখনো পাড়াগাঁয়ের কোনো পচা চায়ের দোকানে একটু চা আর দুখানা লেড়ো বিস্কুট, কখনো কোনো চালাঘরের দোকানে দশ-কুড়ি পয়সার মুড়ি-মুড়কি, কখনো কোনো 'আদর্শ হিন্দু হোটেলে' পাঁচসিকের ভাত-ডাল এই চলছে। কিন্তু আর কতদিন চলবে? কত টাকাই বা এনেছিলেন সঙ্গে?

৪

এদিকে ট্যাঁপা আর মদনা কাহিল হয়ে পড়ছে।

ট্যাঁপা বলে, "আর তো পারা যাচ্ছে না মদনা। ওই বেঁটে বুড়ো যে এতো দৌড় মারতে পারে, তা কে জানত।"

মদনা বলে, "যা বলেছিস ট্যাঁপা। হয়রান হয়ে যাচ্ছি। যেই ভাবি বুড়ো বোধ হয় এইবার চান করতে যাবে, কি একটু ঘুমোবে, সেই দেখি চোঁ চোঁ দৌড় মারছে। না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে আর কত ঘুরে মরব!"

তা না-খাওয়া না-দাওয়াই বলতে হয়, সেই দশটা টাকা হাপিস করে ফেলার পর, ওরা আর-একদিন সোনাথলি গ্রামের এক হাটে ঘোরাঘুরি করে, একটা মুগ-কড়াইয়ের ব্যাপারীর তবিল থেকে কিছু হাতিয়েছিল, তাতেই চলছে এতদিন। কিন্তু তাকে কি আর চলা বলে? সেও সেই গুপি মোক্তারের মতই। কোনোদিন মুড়ি চিঁড়ে, কোনোদিন বা পাইস হোটেল। সুবিধের মধ্যে ওই হাটেই সে-দিন হাত সাফাই করে দুজনে দুটো লুঙ্গি বাগিয়েছে, তাই চান করে নেবার সুবিধে হচ্ছে। নইলে চানই হচ্ছিল না প্রায়।

পাঁচ সাত দিন পরে-পরে প্যান্ট শার্ট সমেত পুকুরে ডুব দিয়ে কি রাস্তার ধারের টিউবওয়েলে মাথা ভিজিয়ে, ভিজে জামা প্যান্ট পরেই ঘুরে ঘুরে গায়ে শুকিয়ে নিয়েছে। এখন তবু অসুবিধেটা ঘুচেছে।

ট্যাঁপা বলে, "আচ্ছা মদনা, এই যে আমরা না বলিয়া পরের দব্যি তুলে নিচ্ছি, এতে কি আমাদের পাপ হচ্ছে না?"

মদনা বলে, "হলে হবে, কী করা যাবে? খেতে পরতে তো হবে? ওই হাটের লোকগুলো যে তিন টাকার জিনিস দশ টাকায় বেচছে, তাতে বুঝি পাপ হচ্ছে না?"

"হচ্ছে না কি আর? হচ্ছে। ভগবান টের পাচ্ছে।"

"তা ভগবান যদি টের পায় তো বুঝবে আমাদের অবস্থাটা কী।"

ট্যাঁপা একটু গুম হয়ে বলে, "আচ্ছা আমরা কেন ঘুরে মরছি বল দিকি?"

"ওই হত্যেকারী বুড়োকে ধরবার জন্যে আর ওর হাতের থলিটার জন্যে। আর কেন?"

"তোর কি মনে হয় ওতে সত্যি অনেক টাকা আছে?"

"না থাকলে আর এমন করে বুকে আগলে পালিয়ে বেড়াচ্ছে?"

ট্যাঁপা আবার একটু গুম হয়ে থেকে বলে, "তবে বুড়ো এতটা কষ্ট করছে কেন? টাকা ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে খাচ্ছে না কেন?"

মদনা পকেটের চিরুনিটা বার করে জোরে-জোরে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলে, "আহা, এটা বুঝিস না, ওসব হচ্ছে একশো টাকা হাজার টাকার নোট, যেখানে-সেখানে ভাঙাতে গেলে হঠাৎ ধরা পড়ে যেতে পারে। নিষ্যস তো ওর নামে পুলিসের হুলিয়া বেরিয়েছে।"

ট্যাঁপাও চিরুনিটা বার করে।

ভাগ্যিস সবসময় পকেটে চিরুনি রাখা অভ্যেস, তাই এক কথায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেও মাথাটা রক্ষে হচ্ছে। নইলে আবার হয়তো দুখানা চিরুনিও 'বাণিজ্য' করতে হত। বরং পেটে ভাত না পড়লে চলে। কিন্তু মাথায় চিরুনি না পড়লে তো আর চলে না।

চুলে চিরুনি চালাতে-চালাতে ট্যাঁপা বলে, "আর এভাবে ওঁত পেতে পেতে বেড়ানো যাচ্ছে না মদনা, বুঝলি? এবার কোনো ঝোপে-ঝাড়ে কি কোণে-খাঁজে দুজনে মিলে বুড়োর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে থলিটা কেড়ে নিয়ে সটকান দেওয়া যাক। হত্যেকারীকে আর ধরে কাজ নেই, অনেক ঝামেলা।"

মদনা বলে, "মন্দ বলিসনি। সত্যিই আর পারা যাচ্ছে না। ভাঙামন্দির কি পোড়ো বাড়ি দেখলেই বুড়ো খানিক খানিক আশ্রয় নেয় দেখেছি।"

"তা দেখেছি। কেড়ে নেওয়াটা কিছু না, তবে কাড়তে গেলে চিনে ফেলবে এই ভাবনা। পাড়ার লোক তো। আমরা এতদিন পাড়ায় নেই, কে জানে আমাদের নামেও হুলিয়া বেরিয়েছে কিনা।"

মদনা একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, "ঠাক্‌মা বুড়ি কেঁদে কেঁদে মরেই গেল কিনা কে জানে। তোর মা-ও—"

ট্যাঁপা আরও গভীর নিশ্বাস ফেলে বলে, "আমার মার কথা বাদ দে। সৎমা তো। সে তো বলে, অমন ছেলে থাকার চেয়ে যাওয়াই ভাল।"

মদনা দুঃখু-দুঃখু গলায় বলে, "সে-কথা ঠাক্‌মাও বলে। একবার যদি অনেক টাকা পেতাম রে, পিথিবীকে দেখিয়ে দিতাম আমরাও কত ভাল ছেলে হতে পারি।"

সেই তো।

ট্যাঁপা চিরুনিটা ফের পকেটে রেখে দিয়ে প্যান্টে হাত মুছতে মুছতে বলে, "আমিও তো তাই ভাবি। ওই ঝাঁপিয়ে পড়াই ঠিক। ভেবে দেখছি, বুড়ো আমাদের চিনে ফেললেও ধরিয়ে দিতে পারবে না। কার টাকা কে নিচ্ছে বল্? এটা চুরিও নয়, ডাকাতিও নয়, বাটপাড়ি।"

"হ্যা হ্যা হ্যা! তাই তো! এটা খেয়াল ছিল না।"

দুই বন্ধুতে অনেকদিন পরে গলা খুলে হাসতে থাকে।

হাসির পর দু'জনেই আবার পরামর্শ করে, আচ্ছা তারা যদি ওই চোরাই টাকাটা নিজেরা না নিয়ে টাকা ফাকা সুদ্ধু স্রেফ আসামীটাকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে পুলিসের হাতে ধরে দেয়, পুরস্কার টুরস্কার পাবে না? এমন কী পুলিসে একটা চাকরিও পেতে পারে। এ তো প্রায় ডিটেকটিভের মতনই কাজ হচ্ছে।

ভেবে খুবই উৎসাহ পায় দু'জনে।

বেশ খানিকক্ষণ ওই কথা নিয়েই চালায়, কিন্তু ট্যাঁপা হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, "আমাদের কি আর এ-জগতে কেউ বিশ্বাস করবে রে? আমরা যে পকেটমার।"

মদনা রেগে উঠে বলে, "বাঃ, এরপর তো আমরা ভাল হয়ে যাব।"

ট্যাঁপা মলিন গলায় বলে, "হলেও। আসল কথা, জীবনের গোড়া থেকেই ভাল হতে হয়, বুঝলি? একবার খারাপ হলে, পরে কেউ আর তাদের বিশ্বাস করতে চায় না।"

মদনা মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, "ইশ! গোড়া থেকে আমরা যদি পকেটমার না হয়ে বাজারের মুটে হতাম!"

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে, তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে বলে, "তা হোক, ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিসের হাতে সমোপ্পন করে দিয়ে নিজেরাও আত্মোসমোপ্পন করব। যা থাকে কপালে। চল চল, বুড়ো আবার না চোখছাড়া হয়ে যায়। একটু আগে ওই পুকুরটার ধারে দেখেছি। এতক্ষণে বোধ হয় চান হয়ে গেল।"

"হয়নি। চান করে আবার বুড়ো সুয্যিমুখো হয়ে পুজো করে।"

"ঠিক আছে, চল পা চালিয়ে, একেবারে ক্যাঁক করে ধরে ফেলিগে। এখনো আছে তাহলে।"

তা সত্যি, পুজোর অভ্যাসটা বজায় রেখেছেন গুপি মোক্তার, ওটা বরাবরের অভ্যাস। বাড়িতে ঠাকুরের ছবিতে ফুল দেন।

মাঝে-মাঝে মন কেমন করে, ভাবেন, কেন এমন বোকার মত ঘুরে মরছি, বাড়ি ফিরে যাই। কিন্তু ভাবলেই আতঙ্ক আসে। মনে হয়, তেরো নম্বর ফ্ল্যাটটাই যেন গলায় গামছা জড়িয়ে গোল গোল দুটো চোখ ঠিকরে তাকিয়ে বসে আছে।

কাজেই এলোমেলো ভাবে আরও গভীর গন্ডগ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েন।

কিন্তু ঢুকে পড়েও মহাবিপদ।

শহর অঞ্চলের লোকেরা অচেনা লোকের দিকে ফিরেও তাকায় না, কিন্তু গ্রামের লোকের চোখ-কান খাড়া।

কোন গাঁয়ে ঢুকে পড়েছে বুঝতে না পেরে গুপি মোক্তার যেই একদিন একজনকে জিগ্যেস করেন, "এই গাঁটার নাম কী মশাই?"

'মশাই' বলেই বলেন। চাষা-টাষা হলেও, না-বললে কী জানি বাবা কে খাপ্পা হয়ে উঠবে।

কিন্তু সে-লোক উত্তর না দিয়ে বলে উঠবে, "মশাইয়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?"

গুপি মোক্তার থতমত খেয়ে বলেন, "ইয়ে—কলকাতা থেকে—"

"অ। তা কাদের বাড়ি উঠেছেন?"

গুপি আরও বিপদগ্রস্ত হয়ে বলেন, "কারুর বাড়ি উঠিনি। মানে সামান্য কাজে এসেছি, আজই চলে যাব।"

"অ। তা কী কাজে আসা হয়েছে?"

গুপি এবার রাগ দেখিয়ে বলেন "তাতে আপনার দরকার?"

সে লোক রাগে না। অমায়িক গলায় বলে, "আজ্ঞে রাগ করছেন কেন? কাজে এসেছেন বলছেন অথচ গাঁয়ের নামটাও জানেন না, কলকেতা থেকে এসেছেন, অথচ সঙ্গে ব্যাগ সুটকেস নেই, শুদু একটা চিরকুট্টি চটের থলি। এমন তো দেখি না।"

শুনে গুপি মোক্তার গটগট করে চলে যান। ঠিক করেন, আর কাউকে গাঁয়ের নাম জিগ্যেস করবেন না।

কিন্তু জিগ্যেস না করলেই বা কী?

এমনিই লোকে ওঁকে দেখে জিগ্যেস করবেই। "কোথা থেকে আসা হচ্ছে?"

গুপি মোক্তার এখন আর কলকাতা বলেন না। চালাকি

করে বলেন, "বর্ধমান থেকে।"

"এখানে কোথায় উঠেছেন?"

"ওই ওদিকে, হলদে-মতো বাড়িটায়।"

কিন্তু গাঁয়ের লোক এত সহজে ছাড়ে না। বেশ কাছে এগিয়ে এসে বলে, "হলদে বাড়ি? সে তো ওই ভূধর চাটুজ্যের বাড়ি। আপনি ওনাদের কুটুম বুঝি?"

গুপি মোক্তার কপাল ঠুকে বলেন, "হুঁ।"

"অ। তা নাম কী মশায়ের?"

গুপি মোক্তার যা ইচ্ছে একটা বানিয়ে বলেন, "মুকুন্দ মুখুজ্যে।"

"অ। তা কী কাজে আসা হয়েছে?"

"আপনার তাতে কী কাজ?"

বলে হনহন করে চলে যান বটে গুপি, কিন্তু ভয়ে বুক কাঁপে। এক্ষুনি তো লোকটা ওই ভূধর না কার বাড়িতে খোঁজ নিতে যাবে।

কাজেই আবার পলায়ন। যেদিকে দু চোখ যায়। ঝোপ-জংগল ডিঙিয়ে ভাঙা-ভাঙা বাড়ির পাশ দিয়ে মজা পুকুরের পাড় দিয়ে।

কিন্তু আবার তো কোনো লোকালয়ে গিয়ে পড়তেই হবে? যেখানে অন্তত দু-একটা দোকান টোকান আছে।

খেতে তো হবে কিছু।

তা তাতেও রক্ষে নেই, চায়ের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেও চা-ওলা বলে উঠবে, "মশাই, কোতা থেকে আসতেছেন? কোনো দিন তো দেকি নাই এদিগরে?"

গুপি মোক্তার রেগে বলেন, "আগের দেখা না হলে চা পাওয়া যাবে না?"

"এই দেখেন! আপনি উত্তপ্ত হচ্ছেন। দেখি নাই তাই শুদুচ্চি! তা আসচেন কোথা থেকে?"

"বর্ধমান থেকে।"

"ও! ক'দিন থাকা হবে?"

"আঃ এ তো মহা জ্বালা! চা পাওয়া যাবে কিনা?"

"কী মুশকিল! পাওয়া যাবে না কে বলছে। ন্যান না। তবে বলতে বাধা কী? কোন্ কাজে এদিকে আগমন?"

গুপি মোক্তার হতাশ গলায় বলেন, "আগে চা'টা দাও তো বাবা, গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে সব বলছি—নাম কী, দেশ কোথায়, কোথা থেকে আসছি, এখানে কোন কাজে, কার বাড়িতে উঠেছি, কতদিন থাকব, কী চাকরি-বাকরি করি, রাশ গণ কী, সব বলব।"

বলেন না অবশ্য, চা খাওয়া হলেই হনহন করে চলে যান।

কিন্তু কোথায় চলে যাবেন?

সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে, যেদিকেই যান, মুখের সামনে প্রশ্ন, "মশাই কি এখানে নতুন এসেছেন?"

ক্রমশ আর কেউ 'আপনি' করে বলছে না, বলছে 'তুমি'। প্রথম 'তুমি' বলল একটা মুড়িওয়ালী, বলল, "কোথা থেকে আসছ বাছা? এদিকে তো আগে দেকিনি।"

তারপর সবাই বলছে।

কোথাকার লোক হে? এখানে কোথায় উঠেছ? কাদের কুটুম? বসাক বাড়ির? নাকি শাঁখারি বাড়ির?

প্রথমটা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন গুপি।

ফট্ করে 'তুমি' বলছে মানে? ক্রমে বুঝছেন এখন আর তাঁকে বাবু ভদ্দরলোক মনে হচ্ছে না।

তেল না মেখে-মেখে চুল রুক্ষু, নাপিতের অভাবে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি গোঁফ, না খেয়ে-খেয়ে রোগা হাড়গিলে চেহারা। আর বর্ধমানের রাঙামাটির গুণে কাপড় জামা প্রায় গেরুয়া।
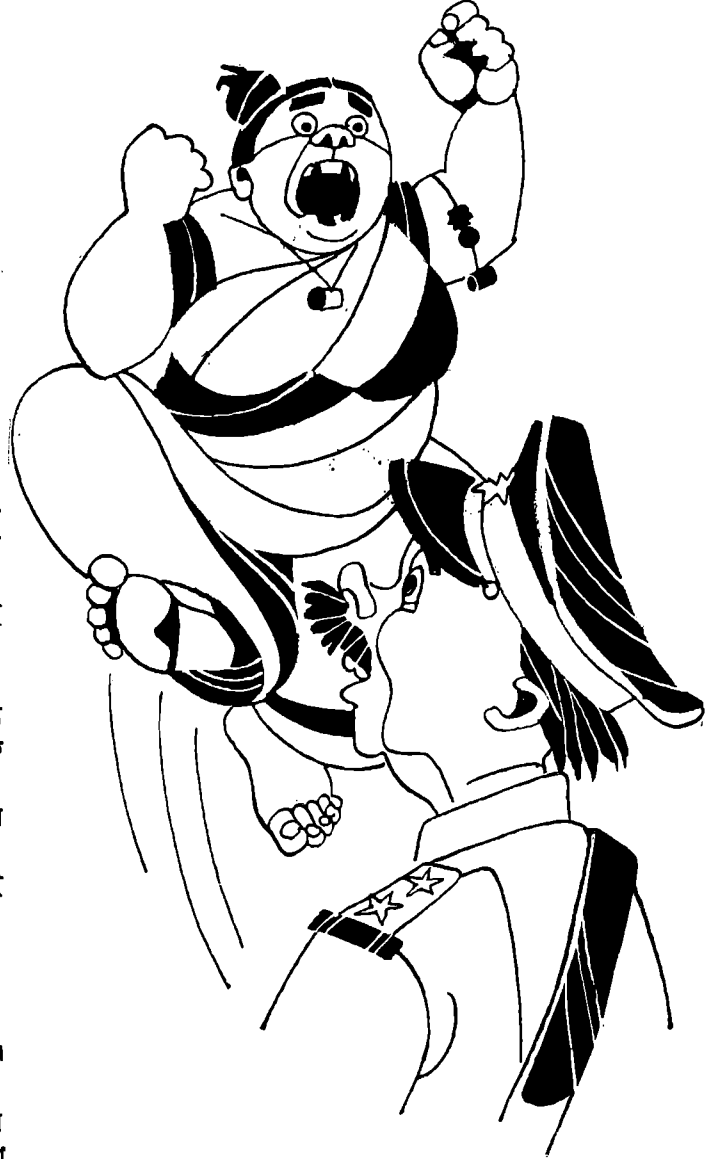
একদিন একটা ছোট্ট মুদির দোকান থেকে দশ পয়সা দিয়ে এক টুকরো সাবান কিনে নিয়ে জামাটা কাপড়টা পুকুরে কেচে নিয়েছিলেন, তাতে আরও লালচে মেরে গেল। পুকুরের জলটাও লাল্‌চে ছিল বোধ হয়।

বুঝেছেন, 'বাবু' বলবার চেহারা আর নেই।

এখন আর তাই 'তুমি' শুনলে চমকে ওঠেন না, বরং নিজেই কারুকে দেখলে আপনি-মশাই বলেন। বলেন, "ও মশাই, শুনুন, আমার নাম হচ্ছে গোবর্ধন গড়াই। বাড়ি পাঁচ-পাড়া, বয়েস সত্তর। কাজকর্ম কিছু করি না—"

যখন যা মুখে আসে বলেন।

কখনো বলেন, "নাম চরণদাস চাকলাদার, বাড়ি করঞ্জলি, এখানে কোনো কাজে আসিনি, শুধু বেড়াতে এসেছি।" কখনো ভজহরি সরখেল, কখনো জগদ্দল জানা, কখনো তপন তফাদার। বাড়ি কখনো পাটুলি, কখনো বীরভদ্রপুর, কখনো হাড়মাসড়া। বয়েস কখনো বত্রিশ, কখনো সাতচল্লিশ, কখনো সত্তর।

হঠাৎ বলে বলে ওঠেন, "আগে থেকেই বলে রাখছি মশাই। আমার নাম অমুক—"

লোকে ক্রমশ পাগল ভাবতে শুরু করছে। একদিন কোনো গ্রামের এক ছোট্ট পানের দোকানে ঝোলানো সাড়ে তিন ইঞ্চি আরশিতে নিজের মুখ দেখে তো হাঁ। 'হাঁ'টাই সাড়ে তিন ইঞ্চিতে পেঁৗছে যায় বাড়তে-বাড়তে। আরশিতে আর ধরে না।

এ মুখ কার?

গুপি মোক্তারের?

পাগল নাকি? বোধ হয় কোনো সাধুসন্নিসীর। চুলেতে দাড়িতে গোঁফেতে কিম্ভূত-কিমাকার।

'হাঁ' বোজার পর গুপি মোক্তারের মনে হল সাধু হয়ে গেলেও মন্দ হত না। পিসি হয়তো একটু কাঁদবে, তারপর ভুলেও যাবে।

সত্যি, মানুষই তো সাধু হয়।

ভাবলেন, কিন্তু সাধু হতে হলে কী করতে হয় জানা নেই বলেই সাধু হওয়া হয় না। শুধু দাড়ি গোঁফ আরও বাড়তে থাকে। হাড় চামড়া আরও শুকোতে থাকে।

সাধু হননি, তবু হঠাৎ একদিন একটা বুড়ো লোক দুম করে পথের মাঝখানে একটা পেন্নাম ঠুকে বলে ওঠে, "বাবা-ঠাকুর গো, আমার ছাগলটা হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে, একটু মন্তর পড়ে দাও বাবাঠাকুর।"

ছাগলটা পাগল হয়ে গেছে।

গুপি মোক্তার ইহজীবনে এমন কথা শুনেছেন কখনো? তাই বলে না উঠে পারেন না, "কে পাগল হয়ে গেছে? তোমার ছাগলটা, না তুমি নিজে?"

বুড়ো এতে লজ্জা পায় না, হাউমাউ করে বলে, "তা সে একপ্রেকার তাই। আমার বড় আদরের ছাগল, বাবাঠাকুর, কত-দিন থেকে পালতেছি। কাল রাতেও বেশ ছেলো, সকালে উঠে দেখি, মাথা চালতেছে, আর পা ঠুকছে। ভয়ে ভয়ে বেঁদে রেখিছি, তা যেন খুঁটি উপড়ে ছুটে পাইলে যেতে চাইছে। চলো না বাবাঠাকুর, একটু মন্তর-টন্তর পড়ে দাও।"

হতভম্ব গুপি বলে ওঠেন, "আমি মন্তর পড়ব? আমি মন্তরের কী জানি?"

বুড়ো এতে টলবে না কি?

সে হঠাৎ মাটিতে হুমড়ে পড়ে দুহাতে গুপির পা জড়িয়ে ধরে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, "ছলনা করলি চলবেনি বাবা, তোমায় আমি দেখেই চিনিছি। সাধুসন্ত লোক। তোমরা কী না জানো? একটা ফুঁ দিয়েও রোগ-ব্যামো সাইরে দিতে পারো। চলো বাবাঠাকুর, গরিবের কুঁড়েয় একবার পায়ের ধুলো দেবে চলো। আর ছাগলটারে—"

এ তো ভাল জ্বালা।

গুপি মোক্তার রেগে বলেন, "বলছি আমি মন্তর-ফন্তর জানি না—"

কিন্তু কে শোনে সে-কথা।

বুড়ো নাছোড়বান্দা। "মন্তর যদি খরচা নাও করেন তো পাগল-হয়ে-যাওয়া ছাগলটার মাথায় একটু চরণধুলি দিতে চলুন। আর এই অভাগার ঘরে আজকের দিনটা একটু সেবা লাগান।"

সেবা! সেবা মানে? ওঃ!

কথাটা শুনে হঠাৎ কানটা জুড়িয়ে যায় গুপি মোক্তারের। 'সেবা' মানে তো ভোজন।

মানে সাধু-সন্নিসীর ভোজন। তার মানে চর্ব্যচোষ্য আহার। গোরু-ছাগল ইত্যাদি পালে যখন, তখন অন্তত দুধ-ক্ষীর-দই-ছানা তো দেবেই।

গুপি মনের আহ্লাদ চেপে গম্ভীর মুখে বলেন, "বেশ চলো দেখি, কী হয়েছে তোমার ছাগলের।"

ঝোপঝাড় ভেঙে, সরু সরু পথ ধরে খানিকটা হেঁটে গিয়ে দেখেন, ডনডনে রোদে একটা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে একটা ছাগল বাঁধা রয়েছে আর সেটা ব্যা ব্যা করে পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে।

গুপি মোক্তার বলে ওঠেন, "এত রোদে বেঁধে রেখেছ কেন ওকে?"

"আজ্ঞে বাবাঠাকুর, কেষ্টর আমার কাল থেকে জোর সর্দি, তাই ওকে রোদে বেঁধে রেখিছি।...রোদেই তো খেলে-বেড়ায়।"

"খেলে বেড়ায়, সে আলাদা, বেঁধে রেখেছ কী বলে? যাও একটু জল নিয়ে এসো চটপট—"

ছুটে গিয়ে এক কলসি জল নিয়ে আসে বুড়ো।

গুপি মোক্তার তা' থেকে খানিকটা করে জল নিয়ে নিয়ে বুড়োর সাধের কেষ্টর মাথায় ছিটিয়ে-ছিটিয়ে দেন, আর কলসি থেকে ঢেলে-ঢেলে খেতেও দেন একটু।

চিৎকার থামান কেষ্টবাবু।

"যাও, বাঁধন খুলে ঘাসটাস খেতে দাও।"

বুড়ো গদগদ গলায় বলে, "কেষ্ট আমার ঘাস খেতে ভালবাসে না ঠাকুর, দুধভাত খায়।"

"তবে তাই দাও।"

এখন বুড়োর বুড়ি বেরিয়ে এসে গুপি মোক্তারের পায়ের ওপর পড়ে প্রণাম করে তারপর বড় এক বাটি দুধভাত নিয়ে এসে কেষ্টর মুখে ধরে। কেষ্ট এক মিনিটে সেটা সাবাড় করে।

বুড়ো এক গাল হেসে বলে, "তবে নাকি মন্তর জানো না বাবাঠাকুর? আমার সঙ্গে চালাকি করতেছিলে? এখন একটু সেবা হোক আজ্ঞে।"

তা' সেবা ভালই হল।

বাটি ভর্তি ক্ষীর, পাথরের খোরা ভর্তি দই, চিঁড়ে, মুড়কি, মর্তমান কলা, আর কাঁচাগোল্লা সন্দেশ। কতকাল এসব জিনিস, খাওয়া তো দূরের কথা, চোখেও দেখেননি গুপি মোক্তার।

খেয়ে দেয়ে, এখন যেন ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে।

"যা খাওয়ালে বাবা, একটু তো শুতে হয়।" বললেন গুপি মোক্তার।

বুড়ো তাড়াতাড়ি একখানা চৌকি খালি করে দিয়ে একটা কম্বল বিছিয়ে দেয়। শুয়ে পড়েন গুপি।

এদিকে ট্যাঁপা আর মদনা হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে।

"গুপি মোক্তার হঠাৎ কোথায় হাওয়া হয়ে গেল বল দিকি?"

"তাই তো ভাবছি। কূলে এসে তরী ডুবল। এতদিন চোখে চোখে রাখছি।"

ইস্, আরও আগেই ধরে ফেললে হত।

"আচ্ছা কোন দিকে যেতে পারে?"

"তাইতো ভাবছি রে—"

এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে দুই বন্ধুতে সম্পূর্ণ অন্য দিকে চলে যায়। খিদেয় পেটের মধ্যে ইঞ্জিন চলছে।

এদিকটা বেশ লোকালয়, দু-একটা পাকা বাড়িও রয়েছে। মদনা বলল, "এই বাড়িটায় ঢুকে পড়ে কিছু খেতে চাইলে কেমন হয়?"

"ধরে ঠ্যাঙানি দেবে।"

"আহা, অতিথি নারায়ণ না?"

"আমাদের দেখে নারায়ণ মনে হচ্ছে না কি?"

মদনা বলে, "বলেই দ্যাখা যাক না, মারতে এলে পালাব।"

ট্যাঁপা বলে, "চল তবে, খিদেয় তো পেটের মধ্যে শেয়াল ডাকছে।"

"তাহলে যা থাকে কপালে অ্যাঁ।"...মদনা দুহাত জোড় করে চোখ বুজে বলে, "জয় মা কালী কলকাত্তাওয়ালী।"

তারপর এগিয়ে যায় ওই বাড়িটার দিকে।

গ্রামের বাড়ি-টাড়িতে বাইরের দরজা—মানে সদরদরজা—কলকাতা শহরের মত সব সময় বন্ধ থাকে না, তাই কড়া নেড়ে ডাকাও যায় না।

বাড়ির বাইরে একটা বেড়ার দরজা, সহজেই সেটা ঠেলে ঢুকে পড়া যায়, ঢুকে পড়লে—একটা মেটে উঠোন, তার ধারে-ধারে সারি দিয়ে অনেক গাঁদা গাছ, তুলসী গাছ।

মদনা সাহস করে আগে ঢুকে পড়ে গলা খুলে ডাক দেয়, "বাড়িতে কে আছেন?"

ট্যাঁপা গলা নামিয়ে বলে, "মদনা, যা করছিস, নিজের দায়িত্বে করছিস, তা' মনে রাখিস, আমি কিন্তু বেগতিক দেখলেই টেনে লম্বা দেব।"

মদনা ভারী মুখে বলে, "দিস! তারপর কিন্তু বলিসনি, মদনা, যা পেয়েছিস ভাগ দে।"

ট্যাঁপা শুনে রেগে আগুন হয়ে বলে, "আমি অমন হ্যাংলা নই। যা পাবি একাই খাস।"

মদনা আরও ভারী মুখে বলে, "তা তো বলবিই, মনে জানছিস এখন খেতে পাবার মধ্যে পাব পিটনচণ্ডী, তাই একা খেতে বলছিস, কেমন?"

এ কথায় ট্যাঁপা আরো রেগে গিয়ে কী যেন বলতে গিয়েই থমকে তাকায়।

তারপরই হঠাৎ মদনার কাঁধটা খিমচে ধরে আর্তনাদ করে ওঠে, "মদনা!"

মদনা এর কারণটা বুঝতে না-পেরে বাড়িটার এদিক-ওদিক তাকায়, হঠাৎ চোখ পড়ে দোতলার ঘরের সামনের জানালায়। সঙ্গে সঙ্গে সেও 'ট্যাঁপা' বলে আরও আর্তনাদ করে হঠাৎ উল্টোমুখো হয়ে পাঁই পাঁই করে দৌড়তে থাকে।... দৌড়চ্ছে তো দৌড়চ্ছে, দিগ্‌বিদিক জ্ঞান নেই।

দুজনের মুখে একই শব্দ—ভূ-ভূ-ভূ।

ছুটতে ছুটতে ঘাম ছুটে যায়, খালি পেট কুঁকড়ে গিয়ে মোচড় শুরু করে, পা টনটনিয়ে ওঠে, তবু ছুটছে। কিন্তু এ তো আর খেলার মাঠের দৌড়-রেসের মত সুখের ছোটা নয়, এ হচ্ছে কাঁটাবন বাঁশবন এড়িয়ে বিচ্ছিরি রাস্তায় ছোটা।... তার ওপর আবার সারাক্ষণ মনে হচ্ছে পিছনে কে দুহাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে ধরবার জন্যে।

কিন্তু উল্টোদিক থেকে যে আরও একজন, মুখে ওই একই শব্দ করতে করতে এদিকে ছুটে আসছিল, তা তো জানত না এরা, পড়বি তো পড় একেবারে তার ওপর।

তারপর?

তারপর তিনজনে মিলে এ ওকে আঁকড়ে ধরে তালগোল পাকিয়ে মাঠের মাঝখানে গড়াগড়ি। তিনজনেরই মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে, আর আওয়াজ উঠছে—ভূ-ভূ-ভূ!

৫

সাড়াহীন, শব্দহীন, চেতনাহীন এক গভীর অন্ধকারের জগতে কতদিন বা কতক্ষণ যে তলিয়ে পড়ে ছিলেন গজপতি উকিল, কে জানে।...

সাড় ছিল না, চৈতন্য ছিল না।

আস্তে আস্তে যেন অলৌকিক ধরনের একটা চেতনা এল। টের পেলেন—ভীষণ, ভয়ঙ্কর, অসম্ভব, অস্বাভাবিক একটা ঠান্ডার মধ্যে পড়ে রয়েছেন তিনি।

কেন? কেন? কেন?

কোথায় এই ঠান্ডার রাজ্য?

গজপতি কি নদীর জলের তলায় রয়েছেন?

নাকি শীতল জলের কুয়োর মধ্যে?

অথবা কি ফ্রিজের মধ্যে?

না, কোনো কোল্ড স্টোরেজে?

কিন্তু তাই বা কেন? তিনি কি আলু? নাকি মাছ? যে কোল্ড স্টোরেজে থাকতে যাবেন? তিনি না গজপতি উকিল?

তবে তাঁকে আম-কলার মতো ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখা হবে কেন? অথবা কোল্ড স্টোরেজে? অবাক হয়ে ভাবতে থাকেন।

হতভম্ব গজপতি কিছুক্ষণ পর্যন্ত ভেবে কূল পান না।

কিন্তু গজপতি হচ্ছেন উকিল।

শুধু হতভম্ব হয়ে পড়ে থাকবার পাত্র তো আর নন। আর কথাতেই আছে, স্বভাব যায় না মলে।

কাজেই এই অলৌকিক-অলৌকিক হাড়-হিম-হয়ে যাওয়া অবস্থাতেও তিনি জেরা করতে শুরু করলেন।

কিন্তু কাকে? কাকে আর, নিজেকেই। নিজে ছাড়া আছে কে সামনে? অবশ্য জেরাটা মনে মনেই চলে। যথা—গজপতি, তুমি এখন কোথায়?...কী, চুপ কেন? বলো না হে, তুমি এখন রয়েছ কোথায়? ওঃ, কোথায় রয়েছ বুঝতে পারছ না? আচ্ছা ওটা না হয় থাক এখন, এ-কথাটার উত্তর দাও তো বাপু, তুমি বেঁচে আছ কি বেঁচে নেই?

কী? মনে হচ্ছে বেঁচে নেই? আচ্ছা তাহলে বলো তো শুনি শেষ কবে পর্যন্ত তুমি বেঁচে ছিলে?...মনে পড়ছে না? ভাবো, ভাবো, স্মৃতিশক্তির ওপর হাতুড়ি মেরে-মেরে মনে পড়াতে চেষ্টা করো।

চেষ্টা করছ?

মনে পড়ছে, হঠাৎ একটা বেকায়দা অবস্থায় পড়ে গিয়েই তোমার এই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। নইলে তার আগে পর্যন্ত ঠিক ছিলে। দাবা খেলছিলে গুপি মোক্তারের সঙ্গে।

পিসির ধমক খেয়ে গুপি মোক্তার সুড়সুড় করে চলে যাবার পর কী করলে তুমি?...হুঁ, আস্তে আস্তে মনে পড়ছে কেমন? চলে যাবার পর তুমি তোমার সেই থাক্ থাক্ নোটের গোছা গোছাতে বসলে।

তারপর আলমারি খুলে তোমার মক্কেলের নথিপত্র-টত্র গোছালে, একটা দরকারি কাগজ খুঁজে পাচ্ছিলে না বলে অনেক হাঁটকালে, আর সেই সময় সেই কাঠ-পিঁপড়েটা—'টা' না 'গুলো'?

একটায় কি অতটা করতে পারে?

আচ্ছা—ঘরের মধ্যে কাঠ-পিঁপড়ে এল কোথা থেকে?

গজপতি উকিল কি তাঁর ঘরের মধ্যে রসগোল্লার হাঁড়ি বসিয়ে রাখে? না কি বালিশের তলায় ল্যাবেনচুষ রেখে দেয়?

শুকনো খটখটে ঘর।

চিনির গুঁড়োটি পর্যন্ত থাকে না। ঝামেলার ভয়ে দু' বেলা দু গেলাস চা—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওসব তো মনে পড়ছে। শুধু কাঠ-পিঁপড়ে নিয়েই অনুসন্ধান করছিলে, কেমন? তা' সে যাক—

তারপর কী হল?

তারপর? তারপরই তো সব তালগোল পাকিয়ে গেল। তাই না? তবু—তারপর? তারপর? আরে গলায় হাত বুলোচ্ছ কেন? গলায় দাগ পড়ে আছে না কি? মরে গিয়ে সগ্গে চলে এসেও পৃথিবীর দাগ-টাগ থাকে?...তা, তাই তো দেখছি। কিন্তু...সগ্গেই যদি এসে থাকো, তো এত হিম কেন? সগ্গে কি হিম-প্রবাহ বয়? নাকি রাজ্যটাই বরফের? ...তবে আবার লোকে সগ্গে যাবার জন্যে এত হ্যাংলামি করে কেন হে?...হুঁ হুঁ, করে বই কী। করে! চিরকাল তো শুনে আসছি, "দান করো, ধ্যান করো, পুণ্য-কাজ করো, হ্যানো করো ত্যানো করো, সগ্গে যাবে!"

এই সেই সগ্গের ছিরি?

ও গজপতি, নাকি এটা আর কিছু? গজপতি, তাহলে তাই। এটা বোধহয় নরক। নরকেই এসেছ তুমি।...

কী বলছ? নরকে আসতে যাবে কী দুঃখে? কবে কী পাপ করেছ?...তা পাপ কি আর কিছুই করোনি হে? এই যে আদালতে গিয়ে যত চোর-ডাকাত-খুনে-গুন্ডাদের পক্ষ হয়ে তাদের জিতিয়ে দিয়েছ...আরে, রেগে উঠছ কেন? কী বলছ? সেই জেতানটাই তোমার পেশা?...পাঁচ-সাত বছর ধরে ল পড়ে-পড়ে ওই বিদ্যেটাই শিখেছ?...তা' অবশ্য ঠিক। ...তাছাড়া—শুধুই যে দোষীদের পক্ষ হয়ে লড়েছ তা'ও তো নয়, অনেক বিনা দোষে সাজা পাওয়া নির্দোষকেও বাঁচিয়েছ। কাজেই কাটাকাটি হয়ে গেল।...

কিন্তু বাপু, নরকে যে এসে পড়েছ তাতেও তো ভুল নেই। আশেপাশে তাকিয়ে দেখে বুঝতে পারছ?...তোমার ধারে পাশে পায়ে মাথায় রাশিরাশি মড়া! হ্যাঁ হে, মড়া! মাংসর দোকানের বরফ-আলমারির মধ্যে যেমন ছাল-ছাড়ানো ছাগল-ভেড়াগুলোকে থাক দিয়ে-দিয়ে সাজিয়ে রাখে, তোমাকে এবং তোমার চারধারের রাশি-রাশি মড়াকে সেইভাবে বরফ-পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে গুঁজে রেখে দিয়েছে।...এর নামই নরক। এরপর হয়তো একটা-একটা করে তুলে নিয়ে গিয়ে গরম তেলের কড়াইতে চুবোবে।...পড়োনি ছেলেবেলায়—

'অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুন্ড!

তাহাতে ডুবায়ে ধরো পাতকীর মুন্ড!'

উকিল গজপতি আবার তখনি বলে ওঠেন, কী হে! কথাটায় তোমার যেন খুব আপত্তি হচ্ছে মনে হচ্ছে?... 'পাতকী' শুনে রাগ হচ্ছে?

কী বলছ? তুমি পাতকী হতে যাবে কী দুঃখে? দোষের মধ্যে সারা জীবন কিপটেমি করে করে, না খেয়ে না দেয়ে টাকা জমিয়েছ, স্ত্রী-পুত্রকে ভাল করে খেতে পরতে দাওনি, আর নিজের জমানো টাকা নিজেই লুকিয়ে-লুকিয়ে রেখেছ! এক জায়গায় রেখে স্বস্তি পাওনি, সেখান থেকে নিয়ে অন্য জায়গায় লুকিয়েছ; শুধু এই! অর্থাৎ 'এটা এমন কিছু পাতক নয়? এটুকুর জন্যে নরকে নিয়ে আসা যমদূতেদের উচিত হয়নি?

তা ওহে মরে-যাওয়া গজপতি, বলেছ তুমি ঠিকই। এটা এমন কিছু পাপই নয় যে, তার জন্যে তোমায় নরকে ঠেলে দেবে।...আমার মনে হচ্ছে, যমদূত ব্যাটাদের ভুলই হয়েছে। কাকে আনতে কাকে এনেছে।...

তবে?

তবে তুমি পালাও হে গজু!

আমি গজপতি উকিল, তোমায় সাহস দিচ্ছি, পালাও এখান থেকে। আমি সঙ্গে থাকলাম।

বরফ-কুন্ড থেকে গা ঝাড়া দিয়ে বেরিয়ে এলেন গজপতি। আস্তে, নিঃশব্দে। চারিদিকের মৃতদেহগুলোর দিকে চোখ পড়বার ভয়ে প্রায় চোখ বুজেই বরফের দেওয়াল হাতড়ে-

স্টেট ব্যাঙ্কের সারাজীবন ব্যাপী পেনশন যোজনা'র সুযোগ নিন
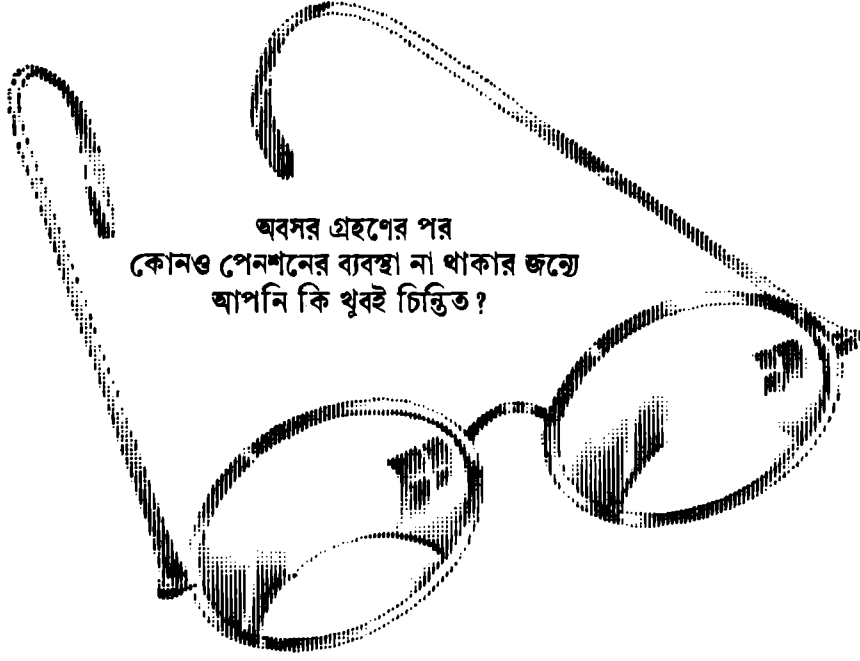
নিজেকে দুশ্চিন্তামুক্ত করুন

আজ আপনি হয়তো একটা পাকা চাকরী করেছেন যেখান থেকে আপনার একটা নিয়মিত রোজগার আছে। কিন্তু, আপনি যখন চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করবেন তখন কি হবে? বিশেষকরে আপনার যে চাকরী আছে তাতে যদি পেনশন পাওয়ার কোনও ব্যবস্থাই না থাকে, কিংবা পেশায় যদি আপনি স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তি হন, তাহলে?

তাহলে, আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন। আপনি যাতে আপনার সারাজীবন ধরে নিয়মিতভাবে একটা পেনশন পেতে থাকেন তার সুব্যবস্থা আমরাই করে দেব।

অবসর গ্রহণের পর আয়ের ব্যবস্থার পরিকল্পনা এখন থেকেই শুরু করে দিন—স্টেট ব্যাঙ্কের সাহায্য নিন

এখনই স্টেট ব্যাঙ্কে আপনার নামে একটা সারাজীবন ব্যাপী পেনশন যোজনা অ্যাকাউন্ট খুলুন। এরজন্যে আপনাকে, মোটেই কোনও রকম মোটা টাকা জমা দিতে হবে না। আপনার খুসিমত, কমপক্ষে ১০ টাকা বা তার গুণিতক টাকা প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে জমা দিতে থাকুন ৮৪ মাসের (৭ বছরের) জন্যে অথবা ১৩২ মাসের (১১ বছরের) জন্যে।

যখনই নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পূর্ণ হবে তারপর থেকেই ব্যাঙ্ক আপনাকে প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে একটা পেনশন দিতে থাকবেন—আপনার সারাজীবন ধরে। যদি আপনি এই পেনশন নেওয়া আর না চালিয়ে, বন্ধ করে দিতে চান, তাহলে আপনি আপনার জমানো সব টাকা সুদসহ তুলে নিতে পারবেন—সব একসঙ্গে।

এখানে ২টি বিশেষ পরিকল্পনা দেওয়া হল—আপনার পছন্দমত যে কোনওটা বেছে নিন

পরিকল্পনা ১: ৮৪ মাস ধরে প্রতিমাসে ১০০ টাকা জমা করতে থাকুন। ঠিক ৮৬ মাস থেকে আপনি প্রতিমাসে ১০২ টাকা পেনশন পেতে শুরু করবেন, অথচ আপনার জমানো টাকা পুরোপুরি বজায় থাকবে। যেকোনও সময়, আপনি ইচ্ছে করলে পেনশন নেওয়া বন্ধ করে, সুদসহ সব মূলধন তুলে নিতে পারবেন—ভাবুন দেখি, একটা মোটারকম টাকা—১২,১৯৬ টাকা!

পরিকল্পনা ২: ১৩২ মাস ধরে প্রতিমাসে ১০০ টাকা জমা করতে থাকুন। ঠিক ১৩৪ মাস থেকে আপনি প্রতিমাসে ২০১ টাকা পেনশন পেতে শুরু করবেন, অথচ আপনার জমানো টাকা পুরোপুরি বজায় থাকবে। এরপর কোনও সময় আপনি যদি পেনশন নেওয়া বন্ধ করে, সুদসহ সব মূলধন তুলে নিতে চান তো সঙ্গেসঙ্গেই তা পাবেন—আর বেশ মোটারকম টাকাই পাবেন—২৪,০৮৫ টাকা।

এমনকি, যাঁদের চাকরীতে পেনশন পাওয়ার ব্যবস্থা আছে, তাঁদের পক্ষেও স্টেট ব্যাঙ্কের এই সারাজীবন ব্যাপী পেনশন যোজনা, একটা অতিরিক্ত আয়ের অভাবনীয় সুযোগ।

বিশদ বিবরণের জন্যে সারাভারতে ছড়ানো আমাদের ৪,২০০টির বেশী শাখার যেকোনও শাখা অধিকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

স্টেট ব্যাঙ্ক

CHAITRA-SBI-229 Ben

হাতড়ে কেমন করে যেন সেই ঠান্ডা কুন্ড থেকে বেরিয়ে এলেন।

বাপ্‌সে! যমদূত ব্যাটাদের কী কান্ড! একটা পুণ্যাত্মা লোককে কিনা স্বর্গের বদলে নরকে এনে ঠেলে দিয়েছে!

যাক এখন বেরিয়ে পড়া গেছে!

এইবার স্বর্গের সিঁড়িটা খুঁজে বার করতে পারলেই হল! ছেলেবেলায় ঠাকুমার মুখে শোনা গল্প মনে পড়ে গেল। কেমন করে একটা পাপী বামুন আর একটা পুণ্যাত্মা চাষীর জায়গা বদল হয়ে গিয়েছিল যমদূতেদের ভুলে।...স্বর্গে যাবার লোকটা নরকে চালান হয়ে গিয়েছিল, আর নরকে যাবারটা স্বর্গে। শেষে কত কষ্টে ওই চাষীটা স্বর্গের সিঁড়ি খুঁজে পেয়ে সো-জা উঠে গিয়ে একেবারে বৈকুণ্ঠে নারায়ণের কাছে হাজির। তারপর নারায়ণের সেই যমদূতেদের কী বকাবকি! চাকরি যায়-যায়, শেষে ওই পুণ্যাত্মা চাষীটার দয়াতেই তাদের চাকরি বজায় থাকল।

ঠাকুমা বলেছিল, "দ্যাখ গজু, শুধু ভালমানুষ হলেই চলে না, লড়তে শিখতে হয়। যেখানে ভুল কি অন্যায় দেখবি, লড়ে যাবি। দ্যাখ, ওই চাষীটা যদি ভালমানুষি করে ভাবত, আমায় যখন নরকে এনেছে, তখন নরকেই পড়ে থাকি, তাহলে কি তার বৈকুণ্ঠ-বাস হত?"

আর সেই পাপী বামুনটা?

সে তো স্বর্গে আসা মাত্রই ধরা পড়ে গেছে। তাকে সো—জা নরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গজপতি উকিল এখন ঠাকুমার উপদেশ মনে রেখে স্বর্গের সিঁড়ি খুঁজতে চেষ্টা করতে লাগলেন।...ক্রমশ শীতের অনুভূতিটা কমতে থাকে।

নরক-কুণ্ডের ভিতরটায় তবু কেমন যেন একটা হালকা-হালকা ছায়া-ছায়া আলো ছিল, কিন্তু ওর থেকে বেরিয়ে এসে যেখানে পড়লেন গজপতি, সেখানটা ঘোর অন্ধকার।...তার মানে এখানে এখন রাত্তির। তা পলায়ন দেবার পক্ষে সুবিধের সময়। তবু অন্ধকারে চোখ ঠিকরে ঠিকরে যেতে যেতে গজপতির মনে হল যেন লম্বা একটা করিডরের মত জায়গায় এসে পড়েছেন তিনি। তার দু'পাশে টানা দেওয়াল, সেখানে মাঝে মাঝে এক একটা প্রহরী। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে ঢুলছে।

কে জানে এরাই নরকের প্রহরী কিনা।

নিঃশব্দে হাঁটতে হাঁটতে সেই করিডরটা শেষ হতেই সত্যিই একটা সিঁড়ি দেখতে পেলেন গজপতি।

কিন্তু এটা তো ওঠবার নয়, নামবার। ওঠবার সিঁড়িটা কোথায়?

দেখা যাক সেটা কোনদিকে।

গজপতি ঠিক করলেন, স্বর্গে উঠে গিয়ে উপর থেকে একবার অবলোকন করবেন দেশের বাড়িতে তাঁর স্ত্রী, পুত্র, মেয়ে, জামাই, ভাই, ভাজ এরা সব কে কী ভাবে দিন কাটাচ্ছে।

গজপতির খবরটা কি তারা পেয়েছে?

পেলে কোন্ খবর পেয়েছে?

নাকি আদৌ কোনো খবর পায়নি?

কোথা থেকে পাবে? কে আমায় দেশের বাড়ির ঠিকানা জানে?...ভেবেও গজপতি হিসেব করলেন, খবর নিশ্চয়ই পেয়েছে। কথাতেই আছে 'মন্দ খবর বাতাসের আগায় ছোটে।'

যাক্, দেখি তো গিয়ে। যদি দেখি আমার অভাবে ওরা খুব কাতর, তাহলে ওদের কাছে যে করেই হোক আমার লুকনো টাকাকড়ির সন্ধানটা পৌঁছে দেব।

দৈববাণী তো হয়, অপদৈববাণীই বা হবে না কেন? স্বর্গ থেকেই বাণী পাঠাব। নয়তো নিজে একবার নেমে এসেও বলতে পারি। শুনেছি তো মৃত্যুর পর ভৌতিক দেহটা যথেচ্ছ বিচরণ করতে পারে।...আর, আর...আর যদি দেখি, আমার জন্যে কারুর কিছু এসে যায়নি, খাচ্ছে দাচ্ছে হাসছে ঘুমোচ্ছে, তাহলে সব টাকাকড়ি কোনো সাধুর কাছে অশরীরীভাবে গিয়েও পৌঁছে দেব।

ভাবার পর আবার সিঁড়ির জন্যে হাতড়াতে লাগলেন গজপতি। অথবা তাঁর আত্মা। স্বর্গে উঠে গিয়েই তাঁর বোড়ো গ্রামের বাড়ির দিকে তাকাবেন। ঠিকানাটা একবার মনে মনে আউড়ে নিলেন। গ্রাম—বোড়ো, পোঃ অঃ—বোড়ো, জিলা—বর্ধমান।

গজপতি সিঁড়ির ধাপে পা দিলেন।

কিন্তু ওঠার সিঁড়ি কোথা? সেই তো নামার সিঁড়ি, স্বর্গে তো আর নেমে যাওয়া যায় না, উঠেই যেতে হয়। গজপতি একটু দাঁড়িয়ে থেকে বুঝলেন তিনি স্রেফ্ নেমে এসেছেন। আর এসেছেন মর্তে। এই সব রাস্তা তাঁর চেনা। হ্যাঁ, সবই চেনা-চেনা। নিঃঝুম রাত্তিরের রাস্তা বটে, চারিদিকের দোকান-পসারও বন্ধ, তবু চিনতে ভুল হয় না। এটা কলকাতা... রাস্তায়-রাস্তায় আলো।

হঠাৎ চমকে উঠলেন গজপতি।

এ কী!

কী সর্বনাশ!

আরে ছি ছি! এই অবস্থায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন তিনি?

এ রকম হবার মানে?

'মানে'টা ভাবতে বসার আগে গজপতি দিশেহারা হয়ে চারিদিকে তাকালেন।...কোথায় কী।...গজপতি পাগলের মত বড় রাস্তা থেকে পালিয়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন, আর সেখানেই পেলেন মুশকিল আসানের উপায়।...

একটা একতলা বাড়ির ছাদ থেকে একখানা ধুতি ঝুলছে। বোধহয় ঠাকুর-চাকর কারো ধুতি। শুকোতে দিয়েছিল, রাত্রে তুলতে ভুলে গেছে।...

গজপতি মনে মনে বললেন, কে বলে ভগবান নেই? আছেন, আছেন, দারুণভাবে আছেন! শুধু মানুষের জন্যেই নয়, আছেন মরে-ভূত-হয়ে-যাওয়াদের জন্যেও। তা নইলে এমন সুবিধে হয়?

ধুতির ঝুলন্ত কোণটা ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারলেন গজপতি! উপরের কোণটা বোধহয় ছাদে কোনো তারে বাঁধা ছিল, কোণটা ছিঁড়ে—গজপতির হাতে নেমে এল।

হোক কোণ-ছেঁড়া, হোক ময়লা চিরকুট্টি, গজপতি এখন একখানা গামছা পেলেও বর্তে যেতেন, আর এ তো জলজ্যান্ত একখানা ধুতি।

ধুতিটাকে বাগিয়ে পরে নিয়ে গজপতি এখন 'মানে'টা বুঝতে চেষ্টা করলেন।...বোঝা গেছে! মরার পর তো তাকে চিতায় তুলেছিল? সেই সময় কাপড় জামা সব ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। উঃ, ভাগ্যিস এখন রাত্তির! দিনের বেলা হলে কী সাংঘাতিক অবস্থা হত!

কিন্তু আমায় কি কেউ দেখতে পাবে?

গজপতি ভাবলেন, এখন তো আমি ভূত হয়ে গেছি। ভূতদের কি দেখতে পাওয়া যায়? ঠিক বুঝতে পারলেন না, দারুণ ঘুম পাচ্ছিল, একটা দোকানের ধারের কাঠের সিঁড়িতে ঘাড় গুঁজে বসে পড়লেন।

ঘুম ভাঙল হঠাৎ একটা 'হঠ্‌হঠ্‌' শব্দে। দোকানটা যে খুলতে এসেছে, সে তাড়া দিচ্ছে, 'হঠ্‌ হঠ্‌!'...রাগে মাথা প্রায় জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারী একটা আনন্দ বোধ করলেন। হঠ্‌ হঠ্‌ করছে! তার মানে লোকটা গজপতিকে দেখতে পাচ্ছে। ...তার মানে তিনি এখনো পুরোপুরি ভূত হয়ে যাননি, হাফ ভূত হয়ে রয়েছেন। তার মানে ভাগ্যি রক্ষে যে, কাল ধুতিখানা পাওয়া গিয়েছিল।

দিনের আলোয় তাকিয়ে দেখলেন নিজের দিকে। এখন আমায় হঠ্‌ বলবে না তো কি 'আপনি মশাই' বলবে? মান্য টান্য যা কিছু তো জামাকাপড়কেই। ...তাহলে এখন সব-আগে দরকার ভাল জামা কাপড়। অর্থাৎ চটপট বাড়ি ফেরা।

গজপতি রাস্তার চারদিক তাকিয়ে বুঝলেন, এটা কলেজ স্ট্রীট। ভবানীপুরে আমার সেই কমলা ভবনের তেরো নম্বর ফ্ল্যাটে যেতে হলে বাসে চেপে বসতে হবে। কিন্তু বাস-ভাড়া কোথায়? চোখে যখন দেখতে পাচ্ছে আমায়, তখন কি আর ভূত বলে রেয়াত করবে? কণ্ডাক্টার মশাই ঠিক ভাড়া চেয়ে বসবেন।...না হলে 'ভাগো ভাগো' করে নামিয়ে দেবেন।

আচ্ছা আমি কি সত্যিই ঁ হয়ে গেছি?

নিজের গায়ে নিজে চিমটি কাটলেন গজপতি, খুব জোরে। উঃ করে উঠলেন।

তাহলে?

চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাবার পর কি সাড় থাকে? তার মানে আমি সত্যি মরিনি।

গজপতি একটা বাড়ির রোয়াকে বসে পড়ে আকাশ পাতাল ভেবে ভেবে সেদিনের সব কথা মনে আনতে চেষ্টা করলেন।... মনেও পড়ল।... শুধু 'সেইদিন'টি যে কতদিন তা বুঝতে পারলেন না। তবে সেই দিনগুলো যে কোথায় কাটিয়ে এলেন, তা অনুমান করতে পারলেন।...

অনেক দিন আগে 'যমালয়ে জ্যান্ত মানুষ' নামের একটা সিনেমা দেখেছিলেন গজপতি, এক বন্ধুর পয়সায়। নিজের পয়সায় সিনেমা দেখবেন এমন পাগল তো নন তিনি। যাই হোক, সেই ছবিটার কথা মনে পড়ল। ভাবলেন, তাঁকে নিয়েও একটা ছবি করা যায়। 'যমালয়-ফেরত জ্যান্ত মানুষ'। পয়সা হতে পারে তাতে। কিন্তু সে তো পরের কথা—এখন যে ট্যাঁক গড়ের মাঠ। উপায়?

উপায় আর কী হাঁটা মারা ছাড়া?

শরীর তো ভেঙে পড়তে চাইছে, খিদে-তেষ্টাও কম নয়, তবু হাঁটতেই শুরু করেন গজপতি উকিল। ভিখিরির মত দেখতে লাগছে বলেই তো আর ভিখিরির মত ভিক্ষে চাইতে পারেন না?

গজপতির হঠাৎ একটু হাসি এল।

আমার টাকায় ছাতা ধরছে, অথচ আমি বাস-ভাড়ার ক'টা পয়সার জন্যে চার-পাঁচ মাইল রাস্তা হাঁটতে যাচ্ছি। যাক—বাসায় গিয়ে পড়লে সবই পাওয়া যাবে। কিন্তু ফ্ল্যাটের চাবি? সেই ষোলটা চাবির তোড়া? সেটা কোথায়?

বরাবর তো কোমরে ঘুনশির সঙ্গে বাঁধা থাকে, কই সেটা? কোমরে হাত দিতে গিয়ে মনে পড়ল, সেও তো ঘুচে গেছে। এখন একমাত্র উপায় ফ্ল্যাটবাড়ির যে কেয়ার টেকার আছে, তার কাছ থেকে ডুপ্লিকেট চাবিটা চেয়ে নিয়ে—

হাঁটতে হাঁটতেই ভাবছিলেন গজপতি, ভাবতে ভাবতে হঠাৎ থামলেন।...আচ্ছা, প্রথমে গুপি মোক্তারের ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠে, ওর একটা ফর্সা জামা-কাপড় পরে, কোন্‌না কিছু খেয়ে টেয়ে, আর নিজের দুরবস্থার কথা জানিয়ে, খানিকটা হাসা-হাসি করে নিয়ে তারপর দুজনে মিলে কেয়ার টেকারের কাছে হানা দিলে কেমন হয়?...ঠিক তাই দেওয়া যাবে।

গজপতি ভাবলেন, শুনেছি—জ্যান্ত মানুষের মৃত্যুসংবাদ রটলে, তার নাকি পরমায়ু বাড়ে। গজপতিরও তাহলে পরমায়ু বাড়বে। ভেবে ভারী আহ্লাদ হল গজপতির। আরও অনেক দিন বাঁচলে, আরও অনেক টাকা জমাতে পারবেন।

হাঁটতে হাঁটতে ভবানীপুরে চলে এলেন গজপতি।

কলকাতা শহরে কেউ কারো দিকে তাকিয়ে দেখে না। কেউ লক্ষ্যও করল না উকিল গজপতি খালি-গায়ে একখানা ময়লা ধুতি পরে রাস্তা হাঁটছে তো রাস্তা হাঁটছে।

পাড়ার মোড়ে ঢুকেই আহ্লাদে প্রাণ নেচে উঠল। আঃ, সেই পুরনো চেনা দৃশ্য। রাস্তার তিন মাথার মোড়ে পাড়ার ছেলের দল ইঁট পেতে ক্রিকেট খেলছে।

আগে অবশ্য মনে মনে ওদের গালমন্দ করতেন গজপতি এবং মুখে খুব গম্ভীরভাবে বলতেন, রাস্তাটা খেলবার জায়গা নয় হে! লোকের চলবার জায়গা।

আজ কিন্তু একগাল হেসে বলে ওঠেন, "কী হে, বেশ জোর খেলা চালিয়েছ যে।"

বলাটা শেষ করতে হল না, ছেলেরা ঘাড় ফিরিয়ে দেখেই "উরে ব্বাস" বলে চোঁ-চোঁ দৌড়। কেউ ব্যাট হাতে, কেউ ব্যাট ফেলে। দৌড়ের ধাক্কায় সাজানো ইঁটগুলো মাটিতে গড়াগড়ি।

ব্যাটারা আমায় দেখে ভয় পেয়েছে।

বলে গজপতি একটু হেসে মোড়ের পানের দোকানের সামনে গিয়ে বলে ওঠেন, "কী হে, চিনতে পারছ? নাকি ভূত বলে ভয়ে ছুটে দেবে?"

বলতে যা দেরি।

পানওলা লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পান সাজার সাজ-সরঞ্জাম

উল্টে ফেলে, তার উঁচু দোকানটা থেকে নেমে পড়ে ছুট্ ছুট!

ছুটতে ছুটতে তার কাছা খুলে যায়, সেই কাছায় পা আটকে হুড়ুম করে রাস্তায় আছাড়ও খায়, তবু আবার উঠে পড়ে গায়ের ধুলো না ঝেড়েই ছুট মারে।

এ তো বড় মুশকিল হল। ভাবলেন গজপতি, এই রোদে-ভরা দিনের বেলায় জলজ্যান্ত একটা লোককে সবাই ভূতই বা ভাবছে কী বলে? হাড় চামড়া রক্তমাংস, এই সব থাকে ভূতের?

কিন্তু রাগ করলে আর কী হবে?

পাড়ায় যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে সে-ই 'ও বাবা' 'উরে ব্বাস' 'কে? কে?' বলে দৌড় মারছে।

আরে বাবা, এ-বুদ্ধি নেই, ভূতই যদি হয়, তার কাছ থেকে পার পাবি তুই দৌড় মেরে? দাঁড়িয়ে কথাটা শোন্।

চেষ্টা অনেক করলেন।

যাদের-যাদের সঙ্গে বিশেষ চেনা, যেমন, পাড়ার স্টেশনারি দোকান 'বিজয়া ভাণ্ডার'-এর কর্তা সুবোধবাবু, 'মাধব লণ্ড্রি'র কর্মচারী খগেন, মুদির দোকানের মালিক গগন, ভুজাওয়ালা ঝগড়ুলাল, তাদের সক্কলের সঙ্গেই দেখা করতে গেলেন। সবাই পিটটান দিল। মুখে সেই বাণী 'কে? কে? কে?'

তারপর সেই একই ব্যবস্থার, ছুট ছুট্ ছুট।

তার মানে, সাধারণ বুদ্ধি কারো নেই। 'কমলা ভবন'-এর বাড়িওয়ালারাই কি থাকবে? তাহলে ওদিকে যাবেনই বা কী করে?

অবশেষে গজপতি ঠিক করলেন, যেমন করে হোক দেশের বাড়িতে চলে যাই। নিজের লোকেরা তো আর ভূত বলে ছুট মারবে না?

কিন্তু যাওয়া কী করে যায়?

যেতে হলে তো পয়সা লাগবে?

নিজের লুকনো সেই থাক্ থাক্ নোটের গোছায় চেহারা স্মরণ করে গজপতির বুক ফেটে কান্না এসে যাচ্ছিল। উঃ! কী মতিচ্ছন্নই হয়েছিল সেদিন!

নাঃ! মতিচ্ছন্নই বা কী? সবই ভাগ্যচক্র।

যাক, এখন দরকার একটা ফর্সা জামা কাপড়, আর কিছু টাকা-পয়সা। অবশ্য টাকা-পয়সাটাই আসল, ওটা হলে সবই হবে। শুধু জামা-কাপড় কেন, ছাতা, জুতো সবই হতে পারে।

কিন্তু চুরি আর ভিক্ষে, এ ছাড়া নিঃসম্বল লোকের চট করে টাকা পয়সা হয় কী করে? অথচ—ওটা তো করতে পারবেন না। বড় জোর করতে পারেন চালাকি। তা সেটাই করতে হবে।

*

পরদিন সকালে হঠাৎ কালীঘাটে মা কালীর মন্দিরের ধারে চাতালে এক জ্যোতিষীকে বসতে দেখা গেল। পরনে ময়লা ধুতি, কপাল ভর্তি সিঁদুর মাখা, সামনে কয়লা দিয়ে আঁকা রাশিচক্র। গম্ভীরভাবে সেই দাগগুলোর ওপর দাগা বুলোচ্ছে, আর বিড়বিড় করে কী সব বলছে।

ব্যস! খদ্দেরের অভাব হয় না।

মন্দিরে যাওয়া-আসার পথে একবার করে বসে পড়ছে অনেকেই। বিশ্বাস থাক না থাক, কৌতূহল।

তা' জ্যোতিষীটা বোকা নয়।

এক-একটি প্রশ্নের উত্তরের দাম পাঁচ নয়া পয়সা।

"বলুন তো বাবা, আমার সময়টা এখন কেমন যাচ্ছে?"

উত্তর, "খুব খারাপ নয়, একটু গোলমেলে যাচ্ছে।"

জ্যোতিষী মনে মনে বলেন, সময় 'খুব' খারাপ হলে, তুমি কি আর এমন ধোপ-দুরস্ত সাজ করে রাস্তায় বেরিয়েছ?

আর একজনের প্রশ্ন, "একটা বিপদে পড়েছি, কী করে উদ্ধার পাব বলতে পারেন?"

জ্যোতিষী বলেন, "পয়সা কড়ি খরচ করলেই হবে।"

মনে মনে বলেন, যে বিপদই হোক, উদ্ধার হতে পয়সা টাকা লাগবেই। অসুখ-বিসুখ, মামলা-মকদ্দমা, ভুল-ভ্রান্তি, যা-কিছুই সারাতে যাও, টাকা চাই।

কথায়-কথায় পয়সা আসছে।

টাকা-পয়সা জমে যায় ঝপাঝপ।

এর ওপর আবার 'স্পেশাল গণনা' মামলা মকদ্দমা। ও'র কাছে বিশদ বললেই উনি পরামর্শ দেন। দেবেন না কেন, উকিল মানুষ, ওই কাজই তো করে এসেছেন চিরকাল।

এতে লোকে লাইন দিয়ে ভিড় করছে।

'মামলা মকদ্দমার ফলাফল বলিয়া দেওয়া হয়। স্পেশাল গণনা।'

স্পেশাল কেসের গণনায় ফী বেশি।

কাজেই কিছু দিনের মধ্যেই জামা কাপড় জুতো চিরুনি কেনবার এবং শুধু রেলভাড়ার মত টাকা কেন, যথেষ্টই টাকা জমে যায়। খাওয়া দাওয়ায় তো বেশী খরচা করেননি। কৃপণ মানুষ, করেনও না কখনো। একা একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকতেন, নেহাত মক্কেলরা আসবে বলে।

রাতারাতি হঠাৎ একদিন জ্যোতিষীর পাততাড়ি গুটিয়ে বেমালুম হাওয়া। সকালে লোক এসে অবাক। কয়লার দাগ-গুলো পড়ে আছে, কপাল-ভর্তি সিঁদুরমাখা লোকটির চিহ্ন নেই। তিনি ততক্ষণে নাপিতের কাছে চুল-টুল ছেঁটে, দাড়ি-ফাড়ি কামিয়ে, নতুন জামা-কাপড়-জুতো পরে, হাওড়া স্টেশনে
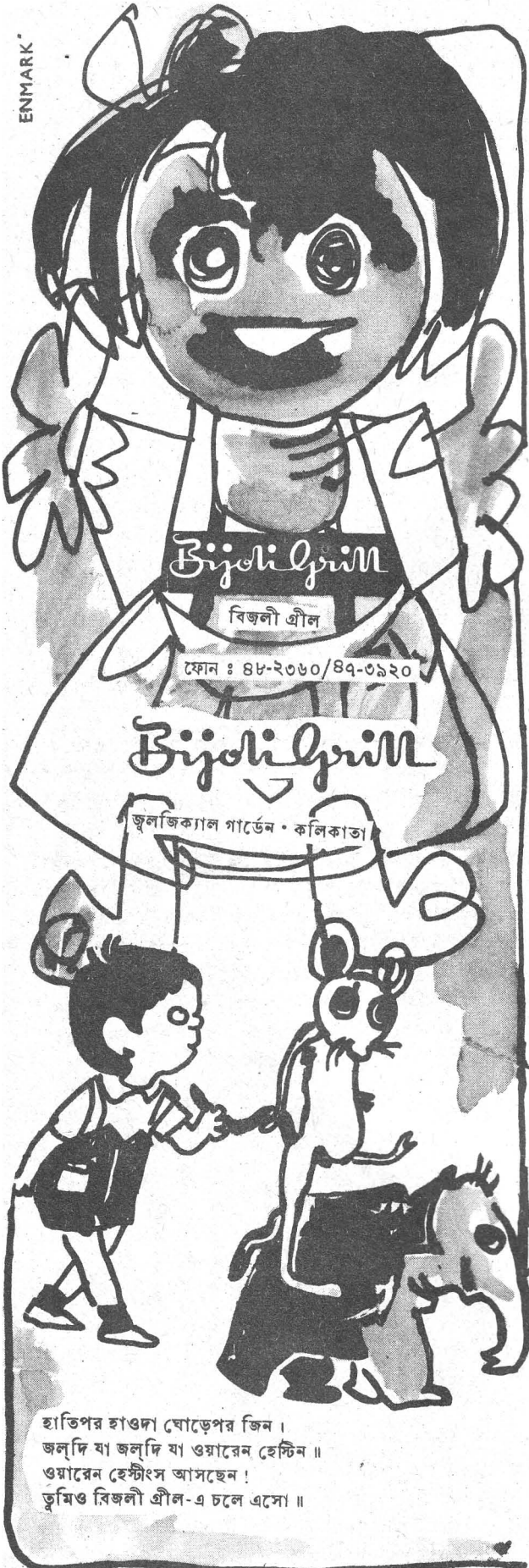
গিয়ে বর্ধমানে যাবার টিকিট কাটছেন।

বর্ধমানে নেমে, খানিকটা সাইকেল রিকশায়, আর খানিকটা হেঁটে, তবে বোড়ো গ্রামে পৌঁছতে হয়।

৬

এখন দেখা যাক্ গজপতির সেই বোড়ো গ্রামের বাড়িতে কী অবস্থায় আছে বাড়ির লোক। তা অবস্থা খুব খারাপ। বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ বাড়ির 'কর্তা' লোকটি নিহত হয়ে বসলে কি আর অবস্থা সুখের হয়? ওদেরও হয়নি। গজপতির অবিকল গজপতি-সদৃশ ভাই গণপতি, ছেলে ভবপতি, মেয়ে গন্ধেশ্বরী, জামাই বটুক, আর গিন্নী জগদ্দলবাসিনী, সবাই মুষড়ে পড়ে আছে। তাছাড়া খবরটা তো পেয়েছিল নেহাতই লোকের মুখে।

খবরটা বেরিয়েছিল খবরের কাগজে।

তবে গ্রামে তো আর ঘর-ঘর খবরের কাগজ আসে না। এই বোড়ো গ্রামে দু কপি 'দৈনিক বার্তাবহ' আসে, এক কপি পতিতপাবনী প্রাইমারী স্কুলের হেড্ মাস্টার মশাইয়ের নামে, আর এক কপি আসে বড় মুদির দোকানের মালিক নিতাই মণ্ডলের নামে।

তা নিতাই মণ্ডল প্রায় আকাশবাণীর মত কাজ করে, গ্রাম-সুদ্ধ লোককে খবর শোনায়। অনেকেরই ঘরে-ঘরে অবশ্য ট্রানজিসটার আছে, তা থেকে অন্য খবর শোনে, কিন্তু 'ঘটনা ও দুর্ঘটনা'?

সে খবরের সাপ্লায়ার তো ওই খবরের কাগজ।

সেদিন কাগজে দুর্ঘটনার খবরের হেডিংয়ে হঠাৎ গজপতি উকিলের নাম দেখে নিতাই শিউরে, চমকে, হেঁচে, কেসে, বিষম খেয়ে একাকার। এ কোন্ গজপতি উকিল?

অনেকের সঙ্গে গজপতির ভাই গণপতিও সকালবেলা কেরোসিনের বোতল হাতে করে খবর শুনতে এসেছিল। শোনার পর কেরোসিনটা নিয়ে চলে যাবে।

বুড়ো নিতাই মণ্ডল তার দিকে তাকিয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "গণ, এই খবরটা একবার নিজে পড় তো?"

গ্রামে অমন মুদি, চাষী সবাই বয়েসে ছোট হলে বাবুদের 'তুমি-তুমি' করে, নামও ধরে।

গণপতির দিকে কাগজখানা বাড়িয়ে ধরতেই অন্য সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ওপর। যারা পড়তে জানে না, তারাও।

গণপতি কাগজটায় চোখ বুলিয়ে আরও কাঁপা গলায় বলে উঠল, "নিতাইকা, কেরোসিনের বোতলটা ধরো, আমার মাথা ঘুরছে।"

তারপর সেখানে প্রশ্নের ঢেউ।

কী ব্যাপার? কী ব্যাপার?

ব্যাপার এই। "দিনেদুপুরে জনৈক উকিল নিহত।... আততায়ীরা তাঁহার গলায় গামছা বাঁধিয়া হত্যা করিয়া পলাতক। খুব সম্ভব অর্থের জন্যই এই হত্যা! উকিল ভদ্রলোক বিশেষ কৃপণ ছিলেন বলিয়া খ্যাত। পুলিস তাঁহার কমলাভবনস্থিত তেরো নম্বর ফ্ল্যাটের ঘর হইতে দরজা ভাঙিয়া মৃতদেহ বাহির করে।...প্রকাশ, তিনি ওই ফ্ল্যাটে একাই থাকিতেন, বিকালবেলা কোনো এক চায়ের দোকানের বয় তাহার জন্য চা লইয়া আসিত, সেদিনও আসিয়াছিল, কিন্তু দরজায় টোকা দেওয়া সত্ত্বেও দোর খোলা না পাইয়া এবং ঘরের মধ্যে গোঁগোঁ শব্দ শুনিয়া ভয়ে ভয়ে ওই ভবনের কেয়ার

টেকারকে জানায়, কেয়ার টেকার পুলিসকে খবর দেয়। পুলিস দরজা ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখে লোহার আলমারি খোলা, বিছানা তচনচ, উকিল গজপতি সাহা মৃতাবস্থায় মাটিতে পড়িয়া আছেন। আলমারিতে টাকাকড়ির চিহ্নমাত্র নাই। গজপতি সাহার পরিবারবর্গ তাঁহার দেশের বাড়িতে থাকিতেন বলিয়া প্রকাশ, পরিচিত কেহই তাঁহার দেশের বাড়ির ঠিকানা বলিতে পারে নাই। পুলিস তাঁহার মৃতদেহ মর্গে পাঠাইয়া দিয়াছে।"

এরপর আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

গণপতি কেরোসিনের বোতল ফেলে রেখেই বাড়ি ফিরে যায়। সেখানে তুমুল কান্না ওঠে। পাড়ার লোক ভেঙে পড়ে সাহা-বাড়িতে। তিনদিন তিনরাত বাড়িতে রান্না-খাওয়া বন্ধ থাকে। থাকবেই তো, এই ঘটনা জানার পর কার আর খেতে ইচ্ছে হয়?

কিন্তু ক্রমে আবার অবস্থা শান্ত হয়। শ্রাদ্ধ শান্তি চোকে। বিধবা হয়ে যাওয়া জগন্দলবাসিনী ছেলেকে বলে, "ভব, তুই একবার কলকাতার সেই বাসাটা খোঁজ করে আয় দিকি, যদি কোনো লেখা-পত্তর থাকে।"

ন্যাড়া-হওয়া ভবপতি গম্ভীরভাবে বলে, "আমি ছেলেমানুষ, আমায় হয়তো ঢুকতেই দেবে না, কাকা যাক।"

জগন্দলবাসিনী রেগে বলে, "ঢুকতে দেবে না মানে? মালিক কে? ...কাকা যাবে না। ও চিরকালের উদোসাদা। হয়তো চোখের সামনের জিনিসও দেখতে পাবে না। তোর বাপের স্বভাব তো জানতিস? নোটের গোছা যেখানে-সেখানে লুকিয়ে রাখত! হয়তো খুনেরা সব খুঁজে পায়নি। আছে কোথাও। পঁচিশ বছর বয়েস হল তোর, ছেলেমানুষ কী?"

লজ্জা পেয়ে ভবপতি একদিন তোড়জোড় করে কলকাতায় চলে যায়, বাবার ফ্ল্যাটের ঠিকানা খুঁজে খুঁজে বারও করে, কিন্তু টাকাকড়ি কিছু নিয়ে আসে না, নিয়ে আসে শুধু তার অভিযানের রিপোর্টটি।

গজপতির ফ্ল্যাটের দরজায় চাবি, কেয়ার টেকার ভবপতিকে হুট আউট করে দিয়েছে। বলেছে, "তুমি যে তেনার ছেলে তার প্রমাণ কী?" ভবপতি চেঁচামেচি লাগিয়েছিল, তাই শুনে পাশের ঘর থেকে এক জাঁদরেল মহিলা বেরিয়ে এসে ভবপতিকে যাচ্ছেতাই করেছেন। বলেছেন, "তুমি যদি বাছা সত্যিই গজ উকিলের ছেলে হও তো বলি, তোমার বাপ নিজে খুন হয়ে, আমাকেও খুন করে গেছে। আমার সোনার ছেলে গুপি বন্ধুর শোকে সেই অবধি নিরুদ্দেশ।...সে আমার দুধের বালক, জগতের কিছুই জানে না, কোথায় খাচ্ছে, কোথায় থাকছে, ভগবান জানেন; তুমি বাছা যাও দিকিন। তোমায় দেখে আমার রাগে দুঃখে মাথা জ্বালা করছে।... তোমার বাপের টাকা-ফাকা কিছু পাচ্ছ না, সব চোরে নিয়ে গেছে।"

এরপর আর ভবপতি ফিরে না এসে কী করবে?

জগন্দলবাসিনী রেগে বলে, "তোকে না পাঠিয়ে আমারই যাওয়া উচিত ছিল দেখছি। দেখতাম সেই গিন্নীটি কেমন।"

কিন্তু এখন আর কী হবে?

তেরো নম্বর ফ্ল্যাট চাবিবন্ধ হয়ে পড়েই থাকে, আর গজপতির বাড়ির লোকেরা পড়ে থাকে সেই দেশের বাড়িতেই।

এখন যদি কেউ পুলিসকে ধরে প্রমাণ টমান দেখিয়ে বাড়ির ভাড়া মিটিয়ে মালপত্তর নিয়ে যায় তো যাক। বাড়িওলার আপত্তি নেই।

কিন্তু কীই বা মালপত্তর আছে কিপটে গজপতির? যত সব টুটা-ফুটা বাসন-কাপড়। থাকার মধ্যে একটা দেড়ফুট পুরু গদি। এই একটাই বিলাসিতা ছিল গজপতির, পুরু গদিতে শোওয়া। কিন্তু সেও কি আর আস্ত? মনে হয় না। কে যাবে সেই তুলো-ছেঁড়া গদিটা আনতে? আনতে যা খরচা হবে, তাতে তো একটা নতুন গদি হয়ে যেতে পারে। কাজেই কেউ যায়নি।

শুধু জগন্দলবাসিনী এক একদিন মনের দুঃখে আকাশ ফাটিয়ে কাঁদে। এমনি একদিন বিকেলবেলা বসে বসে চক্ষু বুজে কাঁদছে। হঠাৎ শুনতে পেল কে যেন বলে উঠল, "আর কান্নাকাটি করে কাজ নেই জগন্দল, আমি এসে গেছি।"

কে বলল?

কোথা থেকে বলল? কার গলা?

ভবর বাপের না?

জগন্দলবাসিনী হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠে চোখ খুলে দেখে সামনে সেই চিরপরিচিত মূর্তি।

যে লোকটা নাকি কতদিন যেন হয়ে গেল খুন হয়ে গেছে।

জগন্দলবাসিনী মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে চেঁচায়, ভূ-ভূ-ভূ!

সামনের ছায়ামূর্তি দুঃখের গলায় বলে, "জগন্দল, তুমিও আমায় ভূত ভাবলে? তাকিয়ে দেখো, চিনতে পারো কিনা।"

কিন্তু কে তাকাচ্ছে?

জগন্দলবাসিনী চোখ বুজে হাতজোড় করে বলে, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যাও। তোমায় দেখে আমার ভীষণ ভয় করছে।"

সামনের মূর্তি তখন রেগে ভেঙিয়ে বলে ওঠে, "আর এই যে এতক্ষণ কান্না হচ্ছিল, ওগো তুমি কোথায় গেলে গো—একবার দেখা দাও গো—"

জগন্দল আরও কাতর হয়ে বলে, "আর কক্ষনো বলব না গো! এই নাক মলছি, কান মলছি, বল তো নাকে খত দিই।"

গজপতি কড়া গলায় বলে, "থাক্, আর অতয় কাজ নেই। গনা কোথায়? ভবা কোথায়?"

তা কোথায়, সেটা আর বলতে হয় না, জগন্দলবাসিনীর কান্নার চোটে কোন্ ঘর থেকে যেন বেরিয়ে এসে গণপতি হঠাৎ সামনে ওই মূর্তি দেখেই একেবারে সপাটে শুয়ে পড়ে মাটিতে মাথা ঠুকে প্রণাম করে বলে ওঠে, "দোহাই দাদা, তুমি আর এ-বাড়িতে দিষ্টি দিতে এসো না। দেখো, মাত্তর তিন মিনিটের বড় হলেও, আমি চিরকাল তোমায় 'দাদা' বলে এসেছি, ভক্তিমান্য করেছি, সেই ছোট ভাই বলে খ্যামাঘেন্না করে আমাদের রেহাই দিয়ে চলে যাও।"

গজপতির মূর্তি প্রাণপণ চেষ্টায় ওদের বোঝাতে চেষ্টা করে, সে ভূত নয়, বর্তমান, কিন্তু ওরা কেন বুঝবে? কেনই বা একটা ভূতের আবদার রাখতে যাবে?

গণপতি এখন বলে ওঠে, "ভবা, এইখানে সামনে একটা আঁশচুপড়ি রাখ তো। শুনেছি, ওনারা পাহাড় ডিঙোতে পারে, আঁশ-চুপড়ি ডিঙোতে পারে না।"

এদিকে গণপতির বৌ চেঁচাতে থাকে, "ওগো, কেউ একটা রোজা ডেকে আনো না গো, চারদিকে সর্ষেপড়া ছড়িয়ে দিক। নইলে যে বটঠাকুরের ভূত ঘরে উঠে পড়বে।"

তবু অনেকক্ষণ চলে এই টাগ্ অফ্ ওয়ার।...গজপতির 'প্রেতাত্মা'ও বলতে ছাড়ছে না, "আরে বাবা আমি মরিনি, চিমটি কেটে দেখো।"

এরাও তত রোজা রোজা করে হাঁপায়।

বলতে-বলতে এসেও পড়ে ভূতের রোজা পঞ্চু খাঁড়া। এসে আর কথাবার্তা নেই, উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা গজপতির প্রেতাত্মার সামনে বড় এক সরা গন্ধক জেবলে দেয়। গন্ধকের ধোঁয়ায় বাড়ির লোকেরা সরে-সরে দাঁড়ায়।...

এবার পূজোয়
ছোটদের জন্য এইচ এম ভি'র উপহার
হিংসুটে দৈত্য
অসকার ওয়াইল্ডের সেই হিংসুটে দৈত্যের গল্প জানো তো? সেই যে, এক ছিল ভারি হিংসুটে দৈত্য! তার মস্ত সুন্দর বাগানে ছোটদের ছিল ঢুকতে মানা। তারপর একদিন একটি ছোট্ট ছেলে এসে দৈত্যের মনটাকে একদম বদলে দিল।
কী করে? তাহলে তো এই নতুন গীতিনাট্যের রেকর্ড সবটা শুনতে হয়। এইচ এম ভি'র এই নতুন লং প্লে রেকর্ডটির জন্যে হিংসুটে দৈত্যের গল্প বিশেষ ধরনে রচনা করেছেন ভাস্কর বসু। সুধীন দাশগুপ্তের মন-মাতানো সুরে এতে অংশ নিয়েছেন ছোটবড়ো সকলের প্রিয়শিল্পী মান্না দে, অংশুমান রায়*, অশোক রায় আর তোমাদের মত ছোট ছোট অনেক ছেলেমেয়ে—তাদের সকলের নাম রেকর্ডটিতেই আছে।
ছোট্ট শ্রোতারা আজই এইচ এম ভি ডিলারের দোকান থেকে এই রেকর্ডটি আনিয়ে নাও। তারপর সকলে মিলে হৈ হৈ করে মজার কাণ্ডকারখানা শোনো।
*হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্ট্স্ লিঃ-র সৌজন্যে
HMV
হিজ মাস্টার্স ভয়েস
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি

পণ্ডু তখন একটা বিছুটি গাছের ডাল জলে ভিজিয়ে গজপতির প্রেতাত্মার দিকে আছড়ে আছড়ে জোর মন্তর পড়তে থাকে, "লাগ্ মন্তর লাগ্! ভূতের বাপ ভাগ্। ভাগ্ ভাগ্ ভাগ্! আঁদাড় পাঁদাড় পেরিয়ে শ্যাওড়া গাছ ডিঙিয়ে, বাঁশবন, ঝাদাবন, কচুবন, ঘেঁচুবন, কাঁটাবন, বিছুটি বন, চৌষট্টি বন ছাড়িয়ে ভাগ্!"

জল-বিছুটির ডালটাকে নিয়ে আস্ফালনই করছিল, হঠাৎ সেটা প্রেতাত্মার গায়ে লাগতেই সে চেঁচিয়ে ওঠে, "পণ্ডা, ভাল হবে না বলছি। তোকে আমি জল-বিছুটি মেরে শায়েস্তা করব বলে রাখছি।"

এ-কথায় গণপতির বৌ ডুকরে কেঁদে উঠে ওই গন্ধকের সরায় আরো খানিক গন্ধক ছুঁড়ে দেয়। ধোঁয়ায় ঘুরঘুট্টি হয়ে ওঠে চারদিক। আর ততক্ষণে তো প্রায় সন্ধেও হয়ে এসেছে। ওই গন্ধক-জ্বলার আলোতেই যা চারিদিকের মানুষগুলোকে ছায়া ছায়া ভূত ভূত দেখাচ্ছে। সবগুলোই যেন প্রেতাত্মা।

পাড়ার লোক যারা ভূত ঝাড়ানো দেখতে এসেছে, তারা নীরবে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে, কথা যা বলছে বাড়ির লোক। জগদ্দলবাসিনী কেঁদে কেঁদে বলছে, "ওগো তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাও না গো! কেন মিথ্যে দাঁড়িয়ে জল-বিছুটি খাবে? কক্ষনো একটা মশার কামড় সহ্য করতে পারো না। ও পণ্ডু, একটু আস্তে আস্তে মারো বাবা!"

পণ্ডু এখন মহোৎসাহে একটা মশাল জেবলে বাড়ির চারিদিকে সর্ষেপড়া দিচ্ছিল, গজপতি-গিন্নীর কথায় মশালটা নাচিয়ে বলে, "আস্তে কী গো মাঠান্! ইনি যে নড়তেছে না। অপঘাতের মিত্যু তো! একেবারে রামভূত হয়ে রয়েছেন। সহজ মড়ার ভূত হলে ওই গন্ধকের ধোঁয়াতেই পগার পার হয়ে যেত।" বলেই আবার মশালটা নাচাতে-নাচাতে মন্তর আওড়ায়, "যাঃ যাঃ যাঃ। যেখেনে তোর গ্যাঁত-কুটুম সেইখেনে যাঃ। গোভূত, মামদো ভূত, পেঁচোয় পাওয়া যারা—তোর কুটুম তারা। তাদের কাছে যা। তাদের সঙ্গে পাত পেতে গন্ধগোকুল খা।"

গজপতির প্রেতাত্মা আকাশ ফাটিয়ে বলে, "পণ্ডা, বিদেয় হ' বলছি—নইলে তোকে আমি দেখে নেব। আচ্ছা—"

পণ্ডু খ্যা খ্যা করে হেসে বলে, "তুই আমায় কী দেখবি? আমার সব্ব শরীলে ভূতবন্ধন। লেঃ লেঃ লেঃ।"

হঠাৎ একটা ধস্তাধস্তির শব্দ! তারপর ভূত মাটিতে পড়ে যায়। আবার একগাদা ধোঁয়া করে পণ্ডু, তারপর মাটিতে পড়া ভূতকে লক্ষ করে সেই জল-বিছুটির ছপটি মারতে থাকে সপাসপ। সঙ্গে-সঙ্গে দারুণ আর্তনাদ ওঠে, "ওরে পণ্ডা রে, কাকে মারছিস? আমি আমি! দেখতে পাচ্ছিস না?"

পণ্ডুর এক হাতে জল-বিছুটি আর এক হাতে মশাল। সেই মশালের আলোয় দেখে নিয়ে খ্যাঁকখেঁকিয়ে বলে, "তা তো জানিই হে, তুমি তুমি তুমি!...তা' বিদেয় হও!"

ধোঁয়ায় চক্ষু অন্ধকার, তবু জোর করে আশপাশের ভিড় ঠেলে উঠোন থেকে দালানে উঠে এসে গজপতির যমজ ভাই গণপতি চেঁচিয়ে বলে ওঠে, "যে বিদেয় হবার হয়েছে রে পণ্ডা, আমায় ঠেলে উঠোনে ফেলে দিয়ে দাদার ভূত ভেগেছে। আর তুই আমাকে...ওরে ভবা, জল আন্, চোখে দিই। চোখ জ্বলে গেল। ব্যাটা পণ্ডা, পাজী লক্ষ্মীছাড়া, মোক্ষম মারটা কিনা আমায় মারলি?"

ভূত বিদায় হয়েছে শুনে এখন সবাই এগিয়ে আসে। ততক্ষণে হ্যারিকেন জ্বলে, কুপি জ্বলে। পাড়ার কেউ কেউ পকেট থেকে টর্চ বার করে জ্বালে, দেখা যায়, বেচারা গণপতির সারা গায়ে দাগড়া-দাগড়া, চোখ লাল টকটকে।

গণপতি ডুকরে ডুকরে বলে, "তিন মিনিটের বড় দাদাকেও আমি 'দাদা' বলে মান্য করে এসেছি চিরকাল, এই তার পুরস্কার? জল-বিছুটির মুখে আমায় ঠেলে ফেলে দিয়ে নিজে সট্‌কান দিল?"

এখন মজা-দেখা লোকেরা আর কিছু দেখবার নেই দেখে হতাশ হয়ে যে যার আস্তানায় ফিরে গেল।...আর তারপর ভেবেচিন্তে ভবপতি বলে উঠল, "আচ্ছা কাকা, যে হাতটা তোমায় ঠেলে ফেলে দিল, সে হাতে হাড় মাংস ছিল?"

হাড় মাংস!

গণপতি চমকে বলে, "তা' তো ছিল। ছিল বলে ছিল। সাঁড়াশির মতন আঙুলে আমার কাঁধটা একেবারে খিমচে ধরে—"

"তবে? ওনাদের কি হাড় মাংস থাকে?"

গণপতি অন্যমনা গলায় বলে, "তা তো থাকে না শুনেছি।"

জগদ্দলবাসিনী বলে ওঠে, "তবে কি ও সত্যি মরেনি?"

শুনে গণপতি জোর গলায় বলে, "তাও কখনো হয়? কাগজে লিখেছিল না, 'পুলিস মৃতদেহ মর্গে পাঠাইয়া দিয়াছে?'— আসলে ওনারা ইচ্ছে করলে দেহ ধারণ করতে পারেন। তাই করেছে আর কি দাদা।"

রোজার ব্যাপারে, আর বাড়ির লোকের ব্যাভারে রাগে জ্বলেপুড়ে উঠোনে নিজের জায়গায় যমজ ভাই গণপতিকে ঠেলে ফেলে দিয়ে, জ্বলতে জ্বলতেই উঠোনের পিছনের বাগান দিয়ে বেরিয়ে এলেন গজপতি।

উঃ, কী অসহ্য!

নিজের বাড়ির লোকও মরা লোককে ফিরে আসতে দেখে আহ্লাদে দু-বাহু তুলে নাচার বদলে স্রেফ ভূত বলে রোজা দিয়ে জলবিছুটি লাগাতে এল। সর্ষেপড়া দিল। গন্ধকের ধোঁয়ায় চোখের বারোটা বাজিয়ে দিল।

জগদ্দলবাসিনী না হয় বোকাসোকা, ভবা না হয় ছেলে-মানুষ, কিন্তু গনা? আমার তিন মিনিটের ছোটভাই গণপতি? তারও বুদ্ধি হরে গেল? এমনিতে তো ধুরন্ধর, আর এর বেলায় হুঁশ হল না, ভূতের গায়ে হাড়মাংস থাকে না?

খেয়াল হল না, ভূত অমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তর্কাতর্কি করে না? ন্যাকাচণ্ডী না কি?

আচ্ছা আমিও দেখাচ্ছি।

ভূত বলেই যখন ধরেছ, আর মন্তর ঝেড়ে মেরে তাড়িয়েছ, তখন ভুতুড়ে উৎপাত করেই তোমাদের জীবন মহানিশা করে ছাড়ছি। আর ওই ব্যাটা পণ্ডা ঠগ জোচ্চোর, ভাঁওতাবাজ, পাজী ছুঁচো ইঁদুর আরশোলা, মশামাছি, ছারপোকা, কাঠপিঁপড়ে, তুই যদি সত্যি রোজা হতিস, ভূত কি মানুষ বুঝতে পারতিস না?

তার মানে সত্যি রোজা নয়।

লোক ঠকিয়ে বেড়ায়।

ওকে আমি শুধু জল-বিছুটি নয়, জল-বিছুটির সঙ্গে আঝাড়া বাঁশের গোড়া দিয়ে পেটাব।

আবার কিনা মন্তর পড়া হচ্ছে!

রোসো, তোমার হয়েছে কী!

অনেক বাকি আছে।

গটগট করে চলতে চলতে একটু থমকে দাঁড়ালেন গজপতি।...সামনের ওই মাঠটায় ওটা কী জন্তু?...ছায়া-ছায়া জ্যোৎস্না উঠেছে, বোধহয় চতুর্থীর কি ষষ্ঠীর চাঁদের, তাতেই

খুকু ডাকে পুসি
পুসি ডাকে ম্যাও
সুলেখা জল রঙে
ছবিটা রাঙাও
সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
কলিকাতা • গাজিয়াবাদ
ADMAN/SW/B
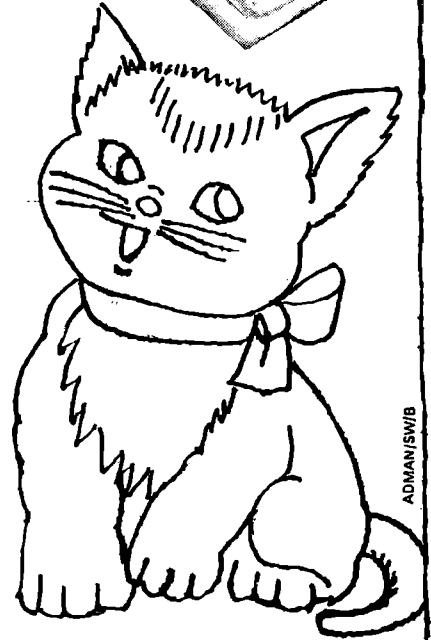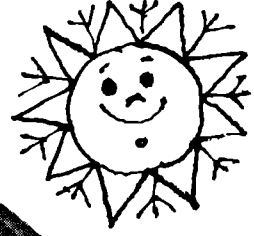
আবছা দেখা যাচ্ছে, মাঠে কেমন যেন একটা বৃহৎ জানোয়ার নড়ানড়ি করছে, গড়াগড়ি খাচ্ছে।

কী ও? বুনো মানুষ? সার্কাস পার্টি থেকে পালানো হাতি? ওর কি কোনো অসুখ করেছে, তাই মাটিতে পড়ে ছটফট করছে?

কাছে যেতে ভয় করছে, অথচ কৌতূহলও প্রবল। যদি সার্কাস-পালানো হাতি হয়, খবর দিতে পারলে বাহাদুরি। আর যদি মোষও হয়, মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে যখন তখন কি আর লাফিয়ে উঠে শিং দিয়ে পেট চিরে দিতে আসবে?

গুটি-গুটি এগিয়ে গেলেন। কেমন একটা 'বু বু' শব্দ শুনতে পেলেন। তারপর অবাক হয়ে দেখলেন তিন-তিনটে মানুষ পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে বু বু করছে। কেউ কাউকে ছাড়ছে না।

কে এই তিনজন?

তা দুজনের হিসেব গজপতির জানা না হলেও আমাদের জানা। ট্যাঁপা আর মদনা।...সেই বড়সড় দোতলা বাড়িটায় খাওয়া জুটবে কিনা সন্ধান করতে গিয়ে, দোতলার জানলায় একটি মুখ দেখে 'ভূ ভূ' করতে করতে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসতে-আসতে আর-একজন তেমনি জোরে ছুটে আসা লোকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে তালগোল পাকিয়ে পড়ে গিয়েছে। যে আসছিল তার মুখেও ওই একই শব্দ—'ভূ ভূ'।

ভয়ে কেউ কাউকে ছাড়ছে না, আঁকড়ে ধরে বসে আছে, অথচ আবার ছাড়াবার জন্যেও লড়ালড়ি করছে, তাই এই গড়াগড়ি কাণ্ড!

কিন্তু এই আর-একজনটি কে?

আবার কে?

আমাদের গুপি মোক্তার। যাঁর জন্যে ট্যাঁপা আর মদনা এত দুঃখবরণ করে মরছে। আহা। স্বপ্নেও কি ভেবেছিল ওরা, তিনি নিজেই সেই 'ঐতিহাসিক' চটের থলিটি হাতে নিয়ে ওদের হাতে ধরা দেবেন!

ব্যাপার এই—অনেক দিন পরে চাষী-বাড়িতে ভালমত আহারটি করে আর ঘুমিয়ে গুপি বেশ পরিতৃপ্ত হয়ে পড়ন্ত-বেলায় যখন ধীরে-ধীরে একটি সরু মেঠো রাস্তা ধরে আসছিলেন তখন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পেলেন, ফর্সা ধবধবে কাপড়জামা পরা গজপতি উকিল সেই রাস্তার উল্টোদিক থেকে বেশ গটগটিয়ে আসছেন।

দেখেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল গুপি মোক্তারের। গজপতি উকিল মানে তো আর উকিল নয়, এ হচ্ছে তার প্রেতাত্মা। তবে? তবে আর ভয়ে পাগল হয়ে ছুটে পালাবে না মানুষ?

যে যত বুদ্ধিমানই হোক, সেই একই ভুল করে। ভূতের কাছ থেকে ছুটে পালাতে চেষ্টা করে। অথচ জানে—ভূত তার কঙ্কাল হাতটা বার করে যত ইচ্ছে লম্বা করতে পারে।

জানলেও, ওই মানুষের স্বভাব।

ছুটতে-ছুটতে কাঁটাগাছে গা ছড়েছে, বাঁশবন পার হতে বাঁশপাতায় চোখমুখ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, তার পর হুড়মুড়িয়ে ওই ছেলে দুটোর ঘাড়ে এসে পড়েছেন।

গজপতি একটুক্ষণ এদের প্রতি লক্ষ্য স্থির করে দেখে বলে ওঠেন, "হাতিও নয়, মোষও নয়, এ তো দেখছি মানুষ, এখানে হচ্ছেটা কী?"

যেই না বলা, ওরা ছটফটিয়ে তিড়বিড়িয়ে তিনজনে একত্রে কুমড়ো-গড়াগড়ি দিতে থাকে। পালাত, কিন্তু পালাবে কী, ট্যাঁপার জামার বোতামের সঙ্গে মদনার লম্বা চুলের গোছা আটকে গেছে, আর গুপি মোক্তারের ধুতি ছিঁড়ে গিয়ে সেই ফুটোর মধ্যে মদনার পা ঢুকে গেছে, ছাড়াতে পারছে না।

সেই অবস্থাতেই গুপি মোক্তার কাতরভাবে বলে ওঠেন, "হেই গজপতি, তুমি আমার ওপর নেকনজর দিও না ভাই! দাবা খেলায় তুমি বরাবর আমার কাছে হেরেছ সত্যি, তাই বলে ভূত হয়ে আমার ঘাড়ে চাপতে আসবে?"

বললেন একেবারে বম্বেমেল চালিয়ে।

শুনে গজপতি, থমকে বলেন, "কে? কার গলা? গুপি তুমি এভাবে এখানে? ব্যাপার কী?"

ভূতের গলা? এত পরিষ্কার?

খোনা নয়, কিছু নয়, কী হল?

তবু গুপি আর্তনাদ করেন, "গজপতি, তু-তুমি আমায় ভয় দেখাতে এসেছ?"

গজপতি রেগে উঠে বলেন, "আমি তোমায় ভয় দেখাতে এসেছি? আগে থেকেই তো তোমরা তিন তিনটে বীরপুরুষ —কিসের ভয়ে কে জানে— কুমড়ো-গড়াগড়ি খাচ্ছিলে। মানেটা কী? এ দুটো কে?"

বলে বিশালকায় গজপতি ল্যাংবেঙে টিকটিকির মত ছেলে-দুটোকে ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিয়ে টেনে তোলেন। আর তারপর কড়া গলায় বলে ওঠেন, "চেনা বলে মনে হচ্ছে! পকেটে দেশলাই আছে নিশ্চয়, জ্বালা শিগগির!"

আগুনের সঙ্গে ভূতের চিরকালের বিরোধ, আগুন দেখলেই ওরা পালায়, অথচ এ ভূত নিজেই দেশলাই জ্বালতে বলছে? তাহলে? তাছাড়া এ যখন বজ্রমুষ্টিতে তাদের তুলে ধরল, সে হাত ঠাণ্ডাও নয়, অশরীরীও নয়।

ফশ করে একটা দেশলাইকাঠি জেলে দেখে নিয়েই ট্যাঁপা বলে উঠল, "উ-উকিলবাবু, আ-আপনি তাহলে মরেননি?"

উকিলবাবু এদের চেনা।

দু দুবার গজপতির সামনে কোর্টে গিয়ে জরিমানা দিয়ে এসেছে পকেট মারার অপরাধে।

গজপতি ওদের একবার দেখে নিয়ে ঠাট্টার গলায় বলেন, "নাহে, মরে উঠতে পারলাম না। যমের অরুচি তো, সে-ব্যাটা আমায় ধরে আবার ছুড়ে ফেলে দিল।...সে-কথা যাক, তোমরা মানিকজোড় দুটি এখানে এসে জুটলে কী করে? মোক্তারের সঙ্গে কোনো ষড়যন্ত্রে নাকি?"

এতগুলো স্বাভাবিক কথা বলার পর ওদের আর যেন তেমন সন্দেহ থাকে না। গুপি মোক্তার তাই বলে ওঠেন, "দোহাই ভাই, ও-কথা বোলো না। এই মানিকজোড়কে আমি জীবনেও চিনি না। তুমি হঠাৎ খুন হয়ে যাওয়ায় মন মাথা কেমন হয়ে গিয়ে পিসিমার হাতের আনন্দনাড়ুগুলো পর্যন্ত ফেলে রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম নিরুদ্দেশ হব বলে। কেন জানি না এই ছোকরা দুটো তদবধি আমার পিছনে লেগে আছে। তবে এখান পর্যন্ত ধাওয়া করেছে, তা জানতাম না। আমি হতভাগা না-খেয়ে, না-দেয়ে ঘুরে ঘুরে মরছি, তার সঙ্গে ওরাও যে কেন! পিসির চর নাকি হে?"

কথার মাঝখানে গজপতি বলে ওঠেন, "কিন্তু তুমিই বা কেমন বল তো হে? আমি খুন হওয়ায় আমার ছেলে-বৌ-ভাই-ভাইপো দিব্যি রইল, আর তুমি কিনা না খেয়েদেয়ে—এত ভালবাস তুমি আমায়?

গুপি মোক্তার হতাশ গলায় বলে, "তুমি ভূত কি ভগবান এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না ভাই, তোমার কাছে বানানো কথা বলব না, বাড়ি থেকে কেটে পড়েছিলাম ভয়ে। থাকলে তো ওই তেরো নম্বর ফ্ল্যাটের দরজা দিয়ে যেতে আসতে হত? ...আর আমার হারানো গামছাখানার জন্যে পুলিসের জেরার মুখে পড়তে হত, তাই!"
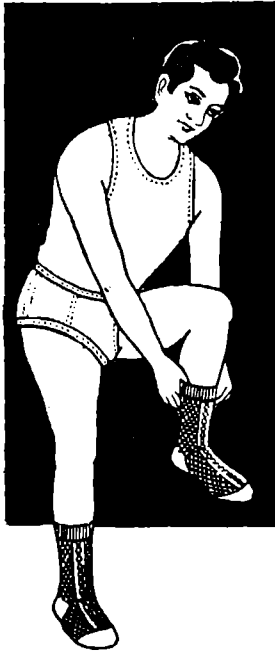
হারানো গামছা! পুলিসের জেরা!

গজপতি বলেন, "তুমি যে আমায় ক্রমশ রহস্য-রোমাঞ্চের গাড্ডায় ফেলে দিচ্ছ হে গুপি! তা এভাবে তো দাঁড়িয়ে শোনা যাবে না, চল কোথাও গিয়ে বসিগে।"

কিন্তু ট্যাঁপা আর মদনা ততক্ষণে একসঙ্গে বলে উঠেছে, "আহাহা মোক্তারমশাই, আপনি নাকি কথা বানাবেন না? বলি খুনটা করেছিল কে?"

ওদের কথা শুনে গজপতি হঠাৎ হা হা করে হেসে ওঠেন, "খুনটা তো কেউই করেনি রে ব্যাটা, জলজ্যান্ত বেঁচেই যখন রয়েছি।"

আরও হাসতে থাকেন, হা হা হা।

যেমন বিশাল চেহারা গজপতির, হাসিও তেমনি বিশাল। খোলা মাঠে, রাত্তিরের আকাশের নীচে ভৌতিক হাসি বলেই মনে হয়।

আবার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে এদের।

অনেক দূরে থেকে সে হাসি শুনতে পাওয়া যায়, সাহা-বাড়িতে গিয়েও পৌঁছয়। বাড়িসুদ্ধ সবাই চিৎকার করে রামনাম জপ করতে থাকে, আর জগদ্দলবাসিনী চমকে চমকে বলে, "ভবা, তুই কালই গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিয়ে আয়।"

একটু পরে মদনা গুজগুজ করে বলে, "তা সে না হয় আপনি মরণ নেই বলে বেঁচে গেছেন, হাসপাতালের ডাক্তাররা হয়তো বাঁচিয়েছে। কিন্তু মোক্তার মশাই বলুন, ওনার ওই চটের থলিটিতে কী আছে?"

চটের থলিটিতে কী আছে?

গুপি মোক্তার রেগে আগুন হয়ে বলেন, "ওঃ, এর লোভে তোরা আমার সংগ নিয়েছিলি বুঝি? ভেবেছিস আমিই উকিলবাবুকে মেরে তাঁর টাকাকড়ি নিয়ে সটকান দিয়েছি, কেমন? নে নে দ্যাখ, কী আছে।"

রাগ করে থলিটা উপুড় করে ঝাড়েন গুপি।

ট্যাঁপারা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখে, একখানা ধুতি একটা জামা, একটা লুংগি, একটা খুদে চিরুনি, একটা টুথব্রাশ, একটুকরো কাপড়কাচা সাবান, একটা ছোট শিশিতে একটু সর্ষের তেল, আর কিছু খুচরো পয়সা।

ব্যস! খতম!

চিরুনি আর তেলের শিশি সংগে নিয়ে বেরোননি গুপি, পরে সংগ্রহ করেছেন। জিনিস দেখে ট্যাঁপা কোম্পানি লজ্জায় লাল। এই? এর জন্যে তারা দু-দুটো ছেলে ঘরবাড়ি ছেড়ে ওই বুড়োর পিছনে ছায়ার মত ঘুরে মরছে!

মাথা হেঁট করে বসে থাকে ওরা।

তারপর আবার একটা পোড়োবাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে চারজনে মিলে বেশ আসর জমিয়ে বসে। নিজের নিজের বুদ্ধির দোষে কে কেমন দুর্গতি ভোগ করেছে, তার কাহিনীর অবতারণায় মাঝে-মাঝেই খুব হাসির শব্দ ওঠে, তবে বিশালকায় গজপতির বিশাল হাসিটা যেন আকাশে ওঠে। হয়তো বা ইচ্ছে করেই মজা দেখতে এত জোরে হাসিটা ছাড়েন তিনি।...তা ও'র মজা, আর-এক জায়গায় সাজা। আমবাগান, কাঁঠালবাগান, বাঁশবাগান সব পেরিয়ে সে-হাসি পাড়ার অনেক বাড়িতে গিয়েই পৌঁছয়।...সন্ধেবেলা ওদের রোজা ডাকার ব্যাপার পাড়ার কারও তো আর জানতে বাকি থাকেনি, সকলেই এখন রাত-গভীরে এই আকাশ-ফাটানো 'হাঃ হাঃ হাঃ হাসির শব্দে নিঃসন্দেহ হয়, এ হাসি স্রেফ ভৌতিক হাসি।

যে যার মাথার বালিশের তলায় রামনাম লেখা কাগজ রাখে, বাচ্চাদের মাথার কাছে মা-দুর্গার পুজোর ফুল রাখে, ঘুম আসতেই চায় না।

৭

হল কী, এই ব্যাপারে দারুণ বিপদে পড়তে হল গজপতির ভাই গণপতিকে।

গণপতি যেই না সকালে উঠে পুকুর-ধারে গেছে দাঁতন করতে, সেই অমনি ঘাটের সবাই এ ওকে ইশারা করছে, ও ওকে ইশারা করছে।

সকলের মুখেই একটা গভীর উৎকণ্ঠার ছাপ।

কে এ? রোজ যে-লোকটা এইভাবে এসে দাঁতন করে, সেই লোক, না অন্য একজনের ভৌতিক দেহ?

যমজ দু ভাইয়ের চেহারা এমন অবিকল এক যে, এর কপালে আঁচিল তো ওর কপালে আঁচিল, এর গলায় জড়ুলের দাগ তো ওর গলায় জড়ুলের দাগ। এও যেমন লম্বা-চওড়া, ও-ও তেমনি লম্বা-চওড়া, কাজেই লোককে দোষ দেওয়া যায় না।

গণপতি কারণ বুঝতে পারে না, দাঁতন করতে করতে হঠাৎ দেখে ঘাট খালি। কী ব্যাপার, সকলেরই আজ এত কাজের তাড়া? তা, ও নিয়ে আর মাথা ঘামায় না গণপতি, ভাবে, ভালই হল, পুকুর তোলপাড় করে সাঁতার দিয়ে চানটা করে নেওয়া যাবে।

কিন্তু বিপদ হল নিতাই মুদির দোকানে গুড় কেনার ছুতো করে খবরের কাগজ শুনতে গিয়ে। গণপতি দেখল, যারা সবাই নিতাইকে ঘিরে বসে কাগজ শুনছিল, তারা কী-রকম উশখুশ করতে শুরু করছে, আর নিতাই ঝপ্ করে দোকান থেকে উঠে পড়ে দোকানের পিছন দিকের দরজা দিয়ে ভিতরের গুদাম-ঘরটায় ঢুকে পড়ল।

গণপতি ভেবেছিল, গতকালকের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা বিশদ শোনাবে লোককে, তা নয়, সবাই যেন অচেনা-অচেনা মুখ করে সরে পড়ছে।

গণপতি চেঁচিয়ে বলল, "নিতাইকা, গুড় চাই এক কিলো—"

সাড়া নেই নিতাইয়ের।

গণপতি পাশের লোকের দিকে তাকিয়ে বলে, "ব্যাপার কী হে শ্রীধর? লোকটার হল কী?"

শ্রীধর গুজগুজ করে কী যেন বলে গা বাঁচিয়ে সরে বসে।

গণপতি রেগে উঠে বলে, "কী হল তোমাদের? বাড়িতে প্রেতাত্মার আগমন হয়েছিল বলে কি আমাকেও প্রেতাত্মা ভাবছ নাকি?

শ্রীধর থতমত খেয়ে বলে, "না না, মানে ইয়ে আর কী।"

"আশ্চর্য!" বলে রাগ করে চলে যায় গণপতি।

হাটে গিয়ে একজনের হাতে একটা আস্ত কাতলা মাছ দেখে যেই জিজ্ঞেস করেছে মাছটা কত নিল, ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে লোকটা মাছটা আছড়ে ফেলে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

তার মানে গণপতির অবস্থাও গজপতির কাছাকাছি।

বাড়ির লোকও হঠাৎ-হঠাৎ চমকে-চমকে তাকাচ্ছে।

গণপতি যখন খেতে বসে মাছের কাঁটা চিবোচ্ছে, তখন তার নিজেরই বৌ আড়াল থেকে দেখে ভয়ে কাঁটা মুখ করে মন্তর পড়ছে, "ভূত আমার পুত শাঁকচুন্নী আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছেন, ভয়টা আমার কী!"

অথচ ভয়ে সারাই হচ্ছে।

কারণ দু-একদিন পর থেকেই বাড়িতে দারুণ ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে।

রাত্তিরে যেই সবাই শুয়েছে, একটু ঘুম ঘুম এসেছে, হঠাৎ জানলায় ঠকঠক শব্দ।...

গণপতি যদি চেঁচিয়ে ওঠে, "কে? কে?" শব্দ হয়ে যায় জগদ্দলবাসিনীর ঘরে।

জগদ্দলবাসিনী যখন "কে? কে?" করে ওঠে, শব্দ চলে যায় ভবপতির ঘরে।...তারপর এক সঙ্গে সব দরজা জানলায় ঠক ঠক ঠক।

তার সঙ্গে আবার উঠোনে খটাখট ঢিল।

সারারাত সবাই জেগে বসে।

আবার হয়তো পরদিন ভরদুপুরেই, বাড়ির সব লোক নীচের তলায়, হঠাৎ ছাতে দুমদুম শব্দে কারা যেন দৌড়ো-দৌড়ি করে বেড়ায়।

প্রথম দিন জগদ্দলবাসিনী চেঁচামেচি করেছিল, "ছাতে কে রে? কেষ্টা বুঝি? নেবে আয় বলছি। এই রোদে ছাতে?"

কেষ্টা গণপতির ছোট ছেলে, জ্যেঠিকে খুব ভয় করে।... কিন্তু দেখা গেল, ভয়ের চিহ্ন মাত্র নেই, দৌড় আরও বাড়ল বরং।

জগদ্দল তেড়ে ছাতে উঠতে গিয়ে দেখে, কেষ্ট তার মায়ের কোলের কাছে বসে চুষে চুষে আমসত্ত্ব খাচ্ছে। জগদ্দলের আর ছাতে যাওয়া হয় না, ভয়ে মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে। আর কেষ্টার মা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, "কেষ্টা এইটুকু ছেলে, একা ছাতে অমন রসাতল করতে পারে? আমি আর এই ভূতুড়ে বাড়িতে থাকছি না, কালই ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাব।"

কিন্তু বাপের বাড়ি তো পাড়াতেই। সারা পাড়াতেই তো ভৌতিক কাণ্ড-কারখানা চলছে। বেদম ঢিল পড়ছে, যখন তখন জিনিস উধাও হয়ে যাচ্ছে, বাড়ির আনাচে-কানাচে খোনা গলায় কথা চলছে।

ক্রমশই বাড়ছে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে আছে গণপতি, হঠাৎ একখানা বাখারির মত খটখটে লম্বা হাত বাগানের দিকের জানলা দিয়ে ঢুকে এসে গণপতির মশারি নাচাতে শুরু করেছে।

এতে আর গণপতির চেঁচিয়ে ওঠবারও ক্ষমতা থাকে না, গুলিভরা উঁচোনো রিভলভারের সামনে মানুষ যেমন কাঠের পুতুলের মত স্থির হয়ে থাকে, তেমনি স্থির হয়ে পড়ে থাকে গণপতি প্যাঁট প্যাঁট করে তাকিয়ে। চোখটা বুজে ফেলবারও ক্ষমতা নেই।

তা এই লম্বা হাত একা গণপতির মশারিকেই নাচাচ্ছে না, পাড়ায় অনেকের মশারিই নাচাচ্ছে। ভয়ে লোকে জানলা-দরজা 'আটে কাঠে' বন্ধ করে শুচ্ছে, কিন্তু জানলায় যদি দমাদ্দম ঘা পড়ে? কতক্ষণ আর ঠিক থাকবে পাড়াগাঁয়ের পুরনো বাড়ির খিল ছিটকিনিরা?

ভয়ে লোকে ঘরে দপদপিয়ে আলো জেলে রাখছে, কিন্তু রাখলেই বা কী? সরু বাখারির আগায় যখন ইয়া লম্বা লম্বা আঙুলওয়ালা হাতের চেটোখানার ছায়া দেয়ালে কি মশারির চালে পড়ে, তখন কার এত সাধ্য আছে বাবা যে, হাতখানা ধরে ফেলে দেখতে যাবে, এর মুলটা কোথায়।

শুধু পাড়াসুদ্ধু কেন, গ্রামসুদ্ধু লোকই ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। রাতের বেলা বাড়ির বার তো দূরের কথা, ঘরেরই বার হচ্ছে না কেউ। বিকেলবেলাই খেয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা-জানলা এঁটে বসে থাকছে।

কিন্তু তাতেই কি শান্তি আছে?

ছাতে দৌড়োদৌড়ির শব্দ নেই?

হঠাৎ-হঠাৎ জিনিসপত্র উড়ে-যাওয়া নেই? রাস্তায় পথে

খেলা দেখা
আশা দেবী

(আগে)
ওরে ভুতো, আন্ রে জুতো,
আন্ রে ছাতা, আন্ রে লাঠি,
টিফিন-ক্যারি আন্ রে পুঁটি,
আনু শিগগির, হচ্ছে বেলা।
চলছি আমি দেখতে খেলা।

(পরে)
ওরে ভুতো, গেল জুতো,
ভাঙল ছাতা এবং লাঠি,
টিফিন-ক্যারি গেছে চুরি,
পট্‌পটাপট্ ভাঙছে লাঠি,
ভাঙল আমার দাঁতের পাটি।
জিতল কে গো? বলুন মশাই!
আপনারও তো আমার দশাই।
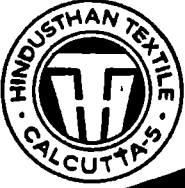
যেখান-সেখান থেকে খোনা-খোনা গলায় দুর্বোধ ভাষায় কথা নেই? উঠোনে, বাগানে, রান্নাঘরের পিছনে অদৃশ্যলোক থেকে হিহি-হাহা হাসি নেই? দিনদুপুরে রাস্তায় হাঁটছে, হঠাৎ কোথা থেকে মড়মড়িয়ে এক গাছের ডাল ভেঙে পড়ল পায়ের সামনে, রাস্তা আটকে পড়া নেই?

কিন্তু বোড়ো গ্রামের লোকেরা এত সব নীরবে সহ্যই বা করছে কেন? তাদের কি পঞ্চু খাঁড়া নেই? সারা গ্রামটাই তো সে হলুদ-পোড়া ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে সর্ষেপড়া ছড়িয়ে 'ভূত বন্ধন' করতে পারে?

তা কে জানে পারত কিনা, তবে পঞ্চু খাঁড়া তো আর নেই। না না, মরেটরে যায়নি, শুধু গ্রামছাড়া হয়ে গেছে। এই বোড়ো গ্রাম ছেড়ে একেবারে নবদ্বীপে মামার বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। বুড়ো বয়সে মামার বাড়ি কেন? সে-কথা বলতে হলে, সেই সেদিনের কথা বলতে হয়।

পঞ্চু খাঁড়া যেদিন সাহাবাড়িতে ভূত ঝাড়িয়ে এল, তার পরের দিন ভরদুপুরে, গ্রামের শেষপারে পঞ্চু খাঁড়ার চালাঘরের সামনে হাঁক পড়ল, "পঞ্চা! পঞ্চা!"

পঞ্চু তখন সবেমাত্র কুচো কাঁকড়ার ঝাল আর গুগলি ভাজা দিয়ে একহাঁড়ি পান্তা ভাত মেরে মাদুরটি বিছিয়ে শুতে যাচ্ছিল, হঠাৎ এই বজ্রকণ্ঠধ্বনি শুনে ধড়মড়িয়ে বেরিয়ে এল।

এল তো এলই।

মানে, এসে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সামনে গজপতি!

হাতে একটা কাঁটাগাছের ডাল।

মুখে কড়া হাসি।

একে কি আর প্রেতাত্মা বলে ভ্রম হয়?

পঞ্চু খাঁড়া তেমনি পাথরের মত দাঁড়িয়েই থাকে। পঞ্চুর চোখ ট্যারা হয়ে যায়, মুখ চুন হয়ে যায়, মাথা ভোম্বল হয়ে যায়।

গজপতি কাঁটা-ডালটাকে শূন্যে আছড়াতে আছড়াতে বলেন, "বেরিয়ে আয়, বাইরে বেরিয়ে আয়। দেখি তোর সর্বাঙ্গে কেমন ভূত-বন্ধন! আয় বলছি।"

পঞ্চু হঠাৎ হাতজোড় করে হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বলে, "দোহাই বাবু, মারবেন না। এই মাত্তর খেয়ে উঠেছি, মার খেয়ে যদি পেটের ভাত কটা উঠে আসে, তাহলে আজ্ঞে দুঃখুর শেষ থাকবেনি।"

গজপতি বলেন, "কেন? তোমার না সর্ব অঙ্গে 'ভূত বন্ধন'! মারে তো কিছু হবার নয়।"

পঞ্চু হঠাৎ মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে প্রণাম করে বলে, "ভূত-বন্ধনে ভূতের মার ঠেকানো যায় বাবু, মানুষের মার ঠেকানো যায় না।"

"হুঁ! তাহলে আমায় মানুষ বলে স্বীকার করছিস?"

পঞ্চু হাতজোড় করে গরুড় পক্ষীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলে "মাপ চাইছি বাবু!"

"শুধু মাপ চাইলে হবে? তুই কাল গন্ধকের ধোঁয়ায় আমার চোখের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিস, আমার গায়ে জল-বিছুটি মেরেছিস, সে-সব ভুলে যাচ্ছিস?"

পঞ্চু কাতর গলায় বলে, "মোক্ষম মারটা কিন্তু বাবু আপনার ভেয়ের গায়েই পড়েছে।"

গজপতি মনে-মনে অবশ্য বলেন, ঠিক হয়েছে, পড়াই উচিত, আমায় বলে কিনা, দাদা এ বাড়িতে দিষ্টি দিও না, রেহাই দাও।

তবে মুখে হারবেন কেন? রেগে রেগে বলেন, "তবে তো আরো চমৎকার। আমার ভাইকে মোক্ষম মার মেরেছ শুনে

আমি তোমায় মণ্ডা খাওয়াব, কেমন? ব্যাটা, তোমার বিদ্যে আমার জানা হয়ে গেছে, তুমি ভূত কি মানুষ চিনতে জানো না, আবার ভূত ঝাড়াতে আসো?"

"আর আসব না বাবু।"

"না, আসবি না। এখন ছ মাসের মত গাঁ ছাড়া হবি, এই আমার সাফ কথা।"

পণ্টু কাতর হয়ে বলে. "ঘর ছেড়ে কোথায় যাব বাবু?"

"শ্বশুরবাড়ি গিয়ে থাকগে যা। নাকি শ্বশুর তাড়িয়ে দেবে?"

এতর মাঝখানে পণ্টু খাঁড়া ফিক করে হেসে ফেলে, "মুলে মা ভাত রাঁধে না, তার তপ্ত আর পান্তো।...বে-ই করিনি, তা শ্বশুরবাড়ি।"

গজপতি একটু থেমে চড়া গলায় বলেন, "তোর বাপ তো বে করেছিল!"

"আ—আজ্ঞে, কী বলতেছেন?"

"বলছি, তোর বাপ তো বিয়ে করেছিল।"

পণ্টু আবার হেসে ঘাড় কাত করে বলে, "তা আজ্ঞে করেছেল বই কি।"

"তবে যা, বাপের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে থাক গে যা।"

বাপের শ্বশুরবাড়ি!

পণ্টু একটু হতভম্ব হয়ে থেকে বলে, "আজ্ঞে সেটা কী?"

"সেটা কী তা জানিস না ব্যাটা বোম্বেটে ভূত? মামার বাড়ি যাসনি কখনো?"

"ওঃ হো হো। ইশ!"

পণ্টু অনেকখানি জিভ বার করে ফেলে।

— গজপতি আবার কাঁটার ডাল নাচিয়ে বলেন. "মনে থাকে যেন, আজই গাঁ ছাড়া হতে হবে। নচেৎ আমার পোষা দুই নন্দী-ভৃঙ্গীকে দিয়ে যা করব দেখবে। তোমার ভূত ছাড়িয়ে ছাড়ব। তখন নাকে খত দিতে দিতে গ্রাম ছাড়তে হবে।"

"না বাবু, না, আজই চলছি। অনেকদিন দিদিমাটারে দেখাও হয় নাই, ভালই হল।"

পণ্টুর ভালই হল।

আর পণ্টুর দেশ ছাড়ায় গজপতির নন্দী-ভৃঙ্গীরও ভাল হল। তারা যত ইচ্ছে উপদ্রব করে বেড়াতে শুরু করল বোড়ো গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে। এটাই এখন চাকরি তাদের।

এখন আর খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে নেই। গজপতি সেটার ভার নিয়েছেন। মাঝে একদিন বর্ধমানে গিয়ে 'বর্ধমান বিনোদ হোটেলে'ও খেয়ে এসেছে আর 'সুখশ্রী' সিনেমা হাউসে সিনেমা দেখে তাজা হয়ে এসেছে। গুপি মোক্তার কলকাতায় চলে গেছেন 'গজপতি উকিলের হত্যা রহস্যে'র কিনারা করতে।

মোক্তার মানুষ, কোর্ট-কাছারি, জজ-ব্যারিস্টার, থানা-পুলিশ, এ সব তো তাঁর চেনা-জানা মুখস্থ। সেদিন বিনা
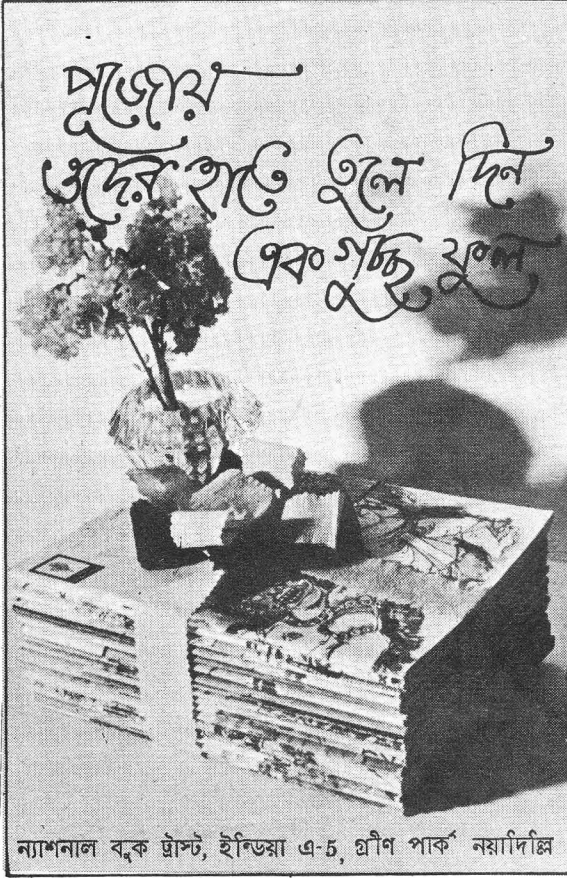
নোটিসে হঠাৎ দাবা খেলার সঙ্গীটা খুন হয়ে যাওয়ায় মন মাথা কেমন গোলমেলে হয়ে গিয়েছিল, তাই না এতদিন এত দুর্ভোগ!

এখন যখন দেখলেন বন্ধু জলজ্যান্ত বিরাজিত, তখন আবার পূর্বশক্তি ফিরে পেয়ে সোজা কলকাতায় চলে গেলেন, রহস্যজাল ছিন্ন করতে।

তবে গজপতি যে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন, আর তিনি কিপটেমি করে টাকা জমাবেন না, এবং জমানো টাকা ফাকা সব বন্ধুবান্ধবদের বিলিয়ে দেবেন, সে-আশ্বাসে মনে মনে হেসেছেন। আর আড়ালে বলেছেন, ওহে গজপতি উকিল, দৈবক্রমে না হয় তুমি মরে বেঁচেছ, তা 'পরমায়ু' থাকলে এমন কেউ-কেউ বাঁচে। জ্বলন্ত চিতা থেকেও ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে বাঁচে। কিন্তু তোমার জমানো টাকাগুলি যে বাঁচেনি, সেটি তো আর দেখনি।...পুলিস দেখেছে, এমন কী, স্বয়ং পিসিও দেখেছে তোমার আলমারি দেরাজ হাট করে খোলা, ঘরের জিনিস লণ্ড ভণ্ড! টাকা পয়সার চিহ্ন মাত্তর নেই!

মনে দুঃখও হয়েছে। আহা রে, কিপটের টাকা, ওই টাকার শোকেই না শেষে সত্যি মরে, হার্ট ফেল করে। এখন সব আছে ভেবে বুক তাজা।

অথচ এদিকে নন্দী-ভৃঙ্গীকেও টাকার লোভ দেখিয়ে রেখেছেন গজপতি।

"চালিয়ে যা, চালিয়ে যা, যত পারিস ভূতের পার্টের প্লে চালিয়ে যা। মজুরি পাবি।"

তা পার্ট ভালই করছে নন্দী-ভৃঙ্গী।

এখন তো আশপাশের গ্রাম থেকে কেউ আর 'বোড়ো' গ্রামের দিকেও আসছে না। পাড়ায় পাড়ায় রটে গেছে, গ্রামটা ভূতাশ্রিত হয়ে পড়ে আছে। এমন কী, ডাকসাইটে ভূতের রোজা পঞ্চু খাঁড়াকেও নাকি গায়েব করে ফেলেছে ভূতেরা।

কিন্তু নন্দী-ভৃঙ্গীর নিজেদের মনের মধ্যে এখনও যেন সন্দ-সন্দ ভাব।

সারারাত হুটোপাটি করে এসে ভোরবেলা সেই পোড়োবাড়ির লুকনো ঘরে লতা-পাতা জেবলে চা বানাতে বসে মদনা ক্লান্ত গলায় বলে, "উকিলবাবুর 'পোরোচনায়' ভুতুড়ে কান্ড তো চালিয়ে চলা হচ্ছে মোক্ষম, টাকা পয়সা পাওয়া যাবে কিনা, সেটাই সন্দ।"

ট্যাঁপা বলে, "কেন? সন্দ কিসের? এখনই তো দিচ্ছে। ওনার পয়সাতেই তো খাচ্ছি-দাচ্ছি। আমাদের তো আর কেউ ভুতুড়ে কান্ডর হীরো বলে সন্দ করছে না! দোকানে পসারে ঢুকছি, খাবার দাবার খাচ্ছি—"

"তা তো খাচ্ছি।" মদনা মনমরা হয়ে বলে, "কিন্তু গজু উকিল সত্যি মানুষ কিনা, সে সন্দ তো ঘুচছে না।"

ট্যাঁপা বলে, "কেন বল তো?"

"কেন বুঝছিস না? হরঘড়ি ওকে দেখতে পাচ্ছিস কিনা?... এই দেখছি এই পোড়ো বাড়ির মধ্যে মাদুরে পড়ে ঘুমোচ্ছে, তক্ষুনি বেরিয়ে দেখি ওই সাহা-বাড়ির দোর-ধারে দাঁড়িয়ে আছে।...এই দেখছি এস্টেশনের দিকে চলে গেল, সেই দেখি ওদের পুকুর-পাড়ে ঘটি নিয়ে আঁচাচ্ছে।...দেখি আর গায়ে কাঁটা দেয়।"

ট্যাঁপা অন্যমনাভাবে বলে, "আমারও সে সন্দ হয় না তা নয়, ঠিক বুঝতে পারি না। অথচ আমাদের সঙ্গে যখন খায়-দায় কথা কয়, মানুষ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।"

"সেই তো!" মদনা বলে, "এই চিন্তায় মনের মধ্যে সুখ নেই রে।...নইলে ভুতুড়ে লীলা চালিয়ে গাঁ সুদ্ধু লোককে নাচ নাচিয়ে বড় আমোদেই থাকার কথা।"

ট্যাঁপা একটু ভেবে বলে, "আমার মনে নিচ্ছে বোধহয় নুকিয়ে-নুকিয়ে বাড়ি গিয়ে খাচ্ছে মাখছে।...গিন্নী বোধহয় মায়ায় পড়ে খাওয়াচ্ছে, যত্ন করছে। ভূতই হোক, পেরেতই হোক, হাজব্যান্ড বলে কথা। নচেৎ অদিশ্যি হয়ে নিজেই নিয়ে টিয়ে খায়!"

"তা দুইই হতে পারে।" বলে মদন একটা নিশ্বাস ফেলে, "কতদিন বাড়িছাড়া, ঠাকমাটার জন্যে মন কেমন করছে।"

ট্যাঁপা বলে, "গুপি মোক্তার তো রহস্য ভেদ করে খবর দেবে বলেছে। নইলে—তার আগে গিয়ে পড়লেই যদি ফেরারি আসামী বলে ধরে।"

"সেই তো! সেদিন পালিয়ে এসে ভুল করেছিলাম। না পালালে তো আর—"

ট্যাঁপা মদনের কথা শেষ না হতেই বলে ওঠে, "পাড়ায় থাকলে, আমাদেরই আগে ধরত মদনা, এই বিধিলিপি করে রেখেছি আমরা।...দাগী আসামী তো? যেখানে যখন দাগ পড়বে, আমাদের ওপরই সন্দেহ এসে পড়বে।"

মদনা বলে, "এই পিতিজ্ঞে করছি, আর মন্দ কাজে না। ক্রেমশ লোকে দাগটা ভুলে যাবে। শুধু এখন চিন্তা, উকিল-বাবু যে পাঁচশো করে টাকা দেবে বলেছে সেটা পাওয়া যাবে কিনা। মানে টাকা ওনার আছে কিনা, আর আসলে লোকটা মানুষই কিনা। টাকা পেলে সৎপথে কিছু করতাম!"

চা বানানো হয়ে গিয়েছিল।

এই পোড়ো বাড়িটায় সর্বত্রই এটা-সেটা ফালতু জিনিস ছড়ানো ছিল, যা ট্যাঁপাদের বেশ কাজে লেগে গেছে। যেমন তুলো-ছেঁড়া বালিশ, কাঠি-ভাঙা মাদুর, শতজীর্ণ শতরঞ্চি, পায়া-ভাঙা চৌকি, চটা-ওঠা এনামেলের বাসন, খালি শিশি-বোতল-টিন, ইত্যাদি। এখন তেমনি পড়ে-পাওয়া দুটো কলাই-করা-গেলাসে চা খেতে খেতে ট্যাঁপা আবার বলে, "আচ্ছা আজই এর একটা হেস্ত নেস্ত হবে।...উকিলবাবু তো 'মেয়ের বাড়ি যাচ্ছি' বলে উই কোন দিকে যেন চলে গেল ... চোখে দেখলাম। এরপর যদি আবার এই গাঁয়ের মধ্যে দেখি তাহলেই বুঝব—"

বেচারা নন্দী-ভৃঙ্গী খটকা নিয়ে বসে থাকে, ওদিকে গজপতি খটখটিয়ে হেঁটে মেয়ের বাড়িতে গিয়ে পেঁছিয়।

৮

গজপতির মেয়ে গন্ধেশ্বরীর শ্বশুরবাড়ি বোড়ো গ্রাম থেকে বেশি দূর না হলেও আরও ছোট্ট গোবিন্দপুর-মার্কা গ্রাম। সেখানকার ত্রিসীমানায় রিকশা তো দূরের কথা, একটা গরুর গাড়িও পাওয়া দুষ্কর। বেচারী গন্ধেশ্বরী সেই কবে বাবা খুন হওয়ার খবর পেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে মায়ের সঙ্গে দেখা করে এসেছিল, সেই অবধি আর আসতে পায়নি...তবে কু খবর বাতাসে রটে, তাই গন্ধেশ্বরীর কানে এসে এসে পেঁছচ্ছে, বাবা নাকি একদিন 'ভূত' হয়ে এসে বাড়ি ঢুকতে যাচ্ছিল, পঞ্চু খাঁড়া অনেক কষ্টে ভাগিয়েছে। কিন্তু পাড়া থেকে ভাগাতে পারেনি, গ্রামে ভৌতিক লীলা চলছে জোর কদমে।...এমন কী, পঞ্চুকে পর্যন্ত ভূতে হাওয়া করে দিয়েছে।

গন্ধেশ্বরীর প্রাণটা আকু-পাকু করলেও বটুক তাকে ওদিকে যেতে দিচ্ছে না।

আজ গন্ধেশ্বরী দাওয়ায় বসে সলতে পাকাতে-পাকাতে দুঃখু করে বলছিল, "বাবাই না হয় গেছে, কাকাও তো একবার 'মেয়েটা কেমন আছে' বলে আসতে পারে। আমার যে প্রাণের মধ্যে কী হচ্ছে!..."

হঠাৎ সেই সময় তার বর বটুক বলে ওঠে, "ওই দেখো নাম করতে করতে তোমার কাকা আসছে। অনেক দিন বাঁচবে খুড়ো।"

যদিও বাপের থেকে তিন মিনিটের ছোট তবু গণপতিকে গন্ধেশ্বরী 'কাকাই' বলে। আর কীই বা বলবে?...

কাকা আসছে শুনে গন্ধেশ্বরী দাওয়া থেকে নেমে ছুটে উঠোন পার হয়ে বেড়ার দরজার কাছে এসেই থমকে দাঁড়ায়।... 'কাকা' বলে পেন্নাম করতেও ভুলে যায়।

বটুক নিজেই তাড়াতাড়ি প্রণাম করে সে-ভুল শুধরে নিয়ে বলে ওঠে, "এই দ্যাখো মান অভিমান। এখুনি বলা হচ্ছিল, কাকাও তো একবার আসতে পারে। সেই কাকা এসে হাজির, অথচ পায়ের ধুলোটাও নিচ্ছ না?"

গন্ধেশ্বরী তবুও 'কাকা' বলে ছুটে না-গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। গজপতি এগিয়ে আসেন। মৃদু হেসে বলেন, "কী রে গন্ধু, তোরও কি আমায় 'কাকা' বলে ভ্রম হচ্ছে?"

আর কোথায় আছে! বলার সঙ্গে-সঙ্গেই গন্ধেশ্বরী তার গায়ের উপর আছড়ে পড়ে ডুকরে বলে ওঠে, "বাবা! বাবাগো! তুমি বেঁচে আছ? উঃ, লোকে কত না মন্দ কথা রটিয়েছে। এখনও রটাচ্ছে!"

গজপতি মেয়ের মাথায় আদরের মৃদু চাপড় মারতে-মারতে বলেন, "কী রটাচ্ছে? বাবা খুন হয়েছে, বাবা ভূত হয়েছে, বাবা ভূতের দৌরাত্ম্য করে গ্রামের লোককে প্রলয় নাচন নাচাচ্ছে, এই সব তো?"

গন্ধেশ্বরী ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে বলে, "বলছে বাবা, এই সব বলছে। এই তোমার জামাইও বলছে।"

গজপতি মুচকি হেসে বলেন, "কী হে বাবাজীবন, এখনও সে সন্দেহ মনে পোষণ করছ না কি? ভূত বলে মনে হচ্ছে?"

বটুক দুই হাতে নিজের দুই কান নিজে মলে বলে, "এখনও আপনাকে যে ভূত ভাববে সে নিজে ভূত। তার চোদ্দ-পুরুষ ভূত।"

"বেশ বেশ!" গজপতি প্রসন্ন গলায় বলেন, "আমার প্রতিজ্ঞা যে আমায় চিনতে পারবে সেই আমার সত্যি আপন। তাই আমার বিষয় সম্পত্তি সব আমার এই মেয়েকে উইল করে লিখে দিয়ে দেব। তোমাকেও কিছু দেব, তুমি আমায় ভূত-টূত ভাবনি, শুধু খুড়শ্বশুর ভেবেছ। তা সেটা এমন কিছু ধর্তব্য নয়। কিন্তু আমার ওই গুণধর পুত্তুর ভবা, আমার প্রাণের যমজ ভাই গনা, আমার চিরকালের গিন্নী, তাদের আমি একটি পয়সা দেব না। ভেবে দেখ গন্ধু, কত দুঃখু-ঝঞ্ঝাট পেরিয়ে বাড়ি গিয়ে পেঁছেছি, হারানো মানুষ ফিরে এল বলে কোথায় আহ্লাদে ভাসবি, তা নয় রোজা ডেকে জল-বিছুটির ব্যবস্থা! আমিও ওদের তেমনি ব্যবস্থা করেছি।"

ইশ! গন্ধেশ্বরী বাবার গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বলে, "আহা! মরে যাই!"

গজপতি বলেন, "এই তো, তুই তো দুঃখুটা বুঝলি। যা বলেছি, ঠিক। আমার সব টাকা তোকেই দেব।"

গন্ধেশ্বরী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "তোমার টাকায় আমার দরকার নেই বাবা, তুমি যে বেঁচে আছ, এই আহ্লাদেই নাচতে ইচ্ছে করছে আমার।"

বটুক আরও তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "আহা হা, বাবা আদর

করে দিতে চাইছেন, দরকার নেই বলতে আছে? ছিঃ। তবে হ্যাঁ, শ্বশুরমশাই, আপনি তো শুনেছি ব্যাঙ্কে-ট্যাঙ্কে টাকা রাখতেন না, বাড়িতেই রেখে দিতেন, তা সেসব তো গুন্ডারা লুঠ করে নিয়ে গেছে।"

গজপতি গোঁফে তা দিয়ে বলেন, "লুঠ অমনি করে নিয়ে গেলেই হল? এ কি ছেলের হাতে মোয়া? নাকি রামের মন্দিরে ভূতের নাচ? গজপতি রইল, আর টাকাগুলো উপে গেল? ও চিন্তা কোরো না, টাকাদের যদি নিজেদের না পাখা গজিয়ে থাকে তো, যেখানে থাকবার সেখানেই আছে। থাক্‌ ওসব কথা, যা দিকি গন্ধু, একটু জম্পেস করে চা বানাগে দিকি। আর তার সঙ্গে তোদের ঘরে ভাজা মুড়ি। বহুদিন তোয়াজ করে চা-মুড়ি খাওয়া হয়নি।"

গন্ধেশ্বরী তিন লাফে চলে যায় চা তৈরি করতে। আর মনে মনে ভাবে, আহা, বাবা বেচারী কী সরল! যারা খুন করতে এসেছিল, তারা যে কী করে গেছে, এখনো জানে না বোধহয়। কী আর করবে—চিরকালই তো কথা আছে—কৃপণস্য ধনং হরে বহ্নি পৃথ্বী তস্করে। তা এ সেই তস্করেই গেল। এর থেকে বাবা যদি অনেক খরচা করে খেত পরত কত ভাল হত।

জম্পেস করে চা খেতে-খেতে মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে অনেক হাসি গল্প করে গজপতি বলে, "চল গন্ধু, তোকে নিয়ে যাই। আসবার সময় একখানা খড়ের গাড়ির সঙ্গে ভাড়া ঠিক করে এসেছি। বটুক, তুমিও চলো হে। মেয়ে-জামাই নিয়ে বাড়িতে গিয়ে ঠেলে উঠলে, দেখি কে ভূত বলে ভাগায়!"

বাবার গল্পে নন্দী-ভৃঙ্গীর রহস্য-ভেদ হয়ে গেছে, কাজেই এখন আর ভয় ভাবনা নেই, গন্ধেশ্বরী আহ্লাদে নাচতে নাচতে বাবার সঙ্গে গরুর গাড়িতে গিয়ে ওঠে।

৯

মরি বাঁচি করে এক নিশ্বাসে ছুটে ছুটে বর্ধমান ইস্টিশান পর্যন্ত এসে বিনাটিকিটের যাত্রী হয়ে একেবারে কলকাতার মাটিতে পা দিয়ে ট্যাঁপা আর মদনা নিশ্বাসটা ফেলে।

তারপর মদনা বলে, "দেখলি? বলেছিলাম কিনা?"

ট্যাঁপা বলে, "তাই দেখলাম। উঃ কী দিশ্য!...একই মানুষ, এদিকে দুটো ছেলে-মেয়েকে নিয়ে আহ্লাদে ভাসতে-ভাসতে পথ দিয়ে আসছে, আবার সেই মানুষই রাস্তার ধারে গাছতলায় দাঁড়িয়ে সেই দিক পানে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।"

তার মানে 'মানুষ' নয়।

"আচ্ছা ট্যাঁপা, আমরা কী বল দিকি?"

"বুদ্ধু ভুতুম! এ ছাড়া আর কী?"

কিন্তু ওরা কি আর বুঝতে পারছিল যে, মান্যগণ্য গুপি মোক্তারকেও তার গেনুপিসি উঠতে বসতে 'বুদ্ধুভুতুম' বলছেন।

না-বলবেনই বা কেন?

যে মানুষ আচমকা নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়ে, দু মাস পরে বাড়ি ফিরেই চেঁচিয়ে পিসিকে জিজ্ঞেস করতে পারে, "পিসি, তোমার মাথায় ও কার গামছা?" তাকে ও ছাড়া আর কী বলা যায়? অন্তত গেনুপিসির অভিধানে ওর থেকে উপযুক্ত বিশেষণ আর নেই।...গুপি বাড়ি-ছাড়া হয়ে অবধি
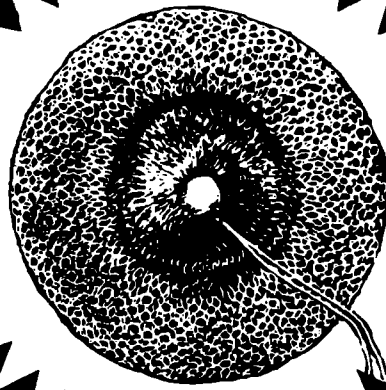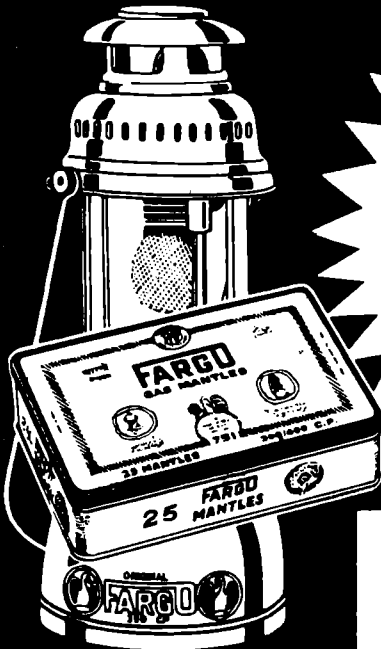
পিসি আর দুপুরবেলা বাড়িতে টিঁকতে পারেন না, মন হুহু করে, তাই ভাতকটা খেয়েই, 'মলা, দোর দে' বলে পাড়া বেড়াতে বেরিয়ে যান। পিসির দিবানিদ্রা গেছে, রোদে পুড়ে পুড়ে বড়ি আচার আমসত্ত্ব বানানো গেছে, ডাঁটিভাঙা চশমাটা চোখে লাগিয়ে মহাভারত পড়া গেছে, সারা দুপুর শুধু এ-বাড়ি ও-বাড়ি বেড়ানো সার হয়েছে।

মলয়কুসুমেরও তাসের আড্ডা ঘুচেছে। গেনু পিসি হুকুম দিয়েছেন, "খবরদার বেরোবি না, বেরোলে নোড়া মেরে পা খোঁড়া করে দেব। বাবু যদি হঠাৎ বাড়ি ফেরে, বাড়িতে তালা ঝোলানো দেখে ফিরে যাবে এই তুই চাস ?"

এছাড়া তিনি মলয়কুসুমকে এ কথাও শুনিয়েছেন যে, তার ওই তাসের আড্ডাটিই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। সেদিন যদি মলয় আড্ডায় না যেত, তাহলে কি তার গুপি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারত ? মলয়কুসুমও সেটা অনুধাবন করে মরমে মরে গিয়ে ঝরাকুসুম হয়ে গেছে। সত্যিই তো মলয় থাকলে বাবুর সাধ্য ছিল আনন্দনাড়ু ফেলে রেখে একবস্ত্রে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া ?

অনুতাপে কাতর মলয় তাই এখন দুপুরে বসে-বসে হারমোনিয়ম শেখে।...কমলা ভবনের অন্য-অন্য ফ্ল্যাটের লোকেরা বলে, আহা ! এই শেখাটি যদি মলয় দু মাস আগে শিখত, তাহলে গজপতি উকিল খুন হত না। গুণ্ডারা ভয়ে কেটে পড়ত।

সে যাই হোক্‌—সেই দিন দুপুরে গেনুপিসি খাওয়া সেরে বেরোতে যাচ্ছেন, দরজাটা খুলতেই গায়ের ওপর এসে পড়ল এক ঝলক রোদ !

গেনুপিসি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নিজ মনে বলে উঠলেন, "উঃ কী তাত ! এই তো পর্শু পর্যন্ত শীত ছিল, আর ফাগুন পড়েছে কি ফাগুনে আগুন ছুটিয়ে দিচ্ছে। মলা, এই মলা, একখানা গামছা ভিজিয়ে পাট করে নিয়ে আয় দিকি।"

মলয় তৎক্ষণাৎ হুকুম পালন করে হাজির।

গেনুপিসি চোখ কুঁচকে বললেন, "এখানা আবার কোথায় পেলি ?"

মলয় বলল, "কেন ঠাকুমা, আপনার ঘরের দেয়ালে পেরেকে। এটা নেবেন না ?"

"এনেছিস থাক !"

বলে গেনুপিসি সেই পাটকরা ভিজে গামছাখানি মাথায় দিয়ে রাস্তায় পা দিয়েছেন, আর অমনি সামনে মূর্তিমান গুপি মোক্তার। এ হেন অভাবিত আশ্চর্য ঘটনায় চমকে উঠে গেনু চেঁচিয়ে ওঠেন, "কে ? গুপি ?"

কিন্তু গুপি সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আরও অবাক করে দিয়ে প্রশ্নই করে বসেন, "গামছাখানা কার পিসি ?"

এতেও যদি গেনু ভাইপোকে বুদ্ধুভুতুম না বলেন তো কিসে বলবেন ? রেগে রেগে জিগ্যেস করবেন না, গুপির গামছাখানা তিনি খেয়ে ফেলছেন কি না ? একবার একটু ভিজিয়ে পাট করে মাথায় চাপা দিলে গামছাটা ক্ষয়ে যায় কি না ? আর এতদিন পরে ফিরে এসে তুচ্ছ একটা গামছার কথা তোলা বুদ্ধুভুতুমের মত কাজ হয়েছে কি না ?

কিন্তু গুপি মোক্তারের এতে কিছু এসে যায় না. গেনু পিসির কাছে বকুনি খাওয়া তাঁর চিরকালের অভ্যাস। শুধু কষ্ট দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা অনেক কিছু হল এই ভেবে, গামছা-খানা যদি সেদিন পিসি তারের থেকে তুলে নিজের ঘরের দেওয়ালের পেরেকে না রাখতে যেত !

গেনুপিসি কড়া মেজাজে বললেন "রেখেছিলাম, মন্দ করেছিলাম ? বাতাসে উড়ে গেলেই বুঝি ভাল হত ?"

আর কী বলবার আছে ?

ভাল হত কি মন্দ হত, সেকথা বসে-বসে গেনুপিসিকে বোঝায় কে ? উনি তো আবার ততক্ষণে ফিরে বাড়ি ঢুকে গুপের জন্যে লুচি ভাজতে বসেছেন। এখন নাকি গুপি মোক্তারের বেশ কিছুদিন ঘি-দুধ খাওয়া দরকার।

গুপির অবশ্য এতে আপত্তি নেই এখন তো তাঁর মাথায় গন্ধমাদন পর্বত ! গজপতি হত্যার রহস্য ভেদ তো এখনো বাকি। তদ্বির তদারক করতে হবে, থানা পুলিস করতে হবে, এবং ওই তেরো নম্বর ফ্ল্যাটের 'দ্বারোদ্ঘাটন' কাজটি করতে হবে সমারোহ সহকারে।

গেনুপিসিকে কিছু বলে ফেলবার সাহস নেই তাহলে সেই 'গোপনীয়' কথাটি তক্ষুনি সারা কলকাতার লোক জেনে ফেলবে। কথার সঙ্গী শুধু মলয়কুসুম। মলয়কুসুমের কাছেই জানা গেল, ইনসপেক্‌টর কেবু ঘোষ গেনুপিসিকে জেরা করতে এসেছিল, পিসি পুলিস ডাকবার ভয় দেখিয়ে তাকে ভাগিয়েছেন। এমন কী, পুলিসে না কুলোলে জজ ডাকতেও হুকুম দিয়েছেন মলয়কুসুমকে।

গুপিকে এখন ছুটতে হচ্ছে কেবু ঘোষের কাছে। ছুটতে হচ্ছে যারা গজপতি উকিলের 'মৃতদেহ' নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে দিয়েছিল তাদের কাছে, আরও কত-কত সকলের কাছে। নাইবার, খাবার সময় নেই গুপির।

এমনি ছুটোছুটি করতে-করতে হঠাৎ একদিন ট্যাঁপা আর মদনার সঙ্গে দেখা।

মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে চিনেবাদাম চিবোচ্ছিল, গুপি থমকে বলেন, "কী হে, তোমরা এখানে ? কবে চলে এলে ?"

দুজনে একসঙ্গে বলে, "নর্শু।"

নর্শু ! সেটা আবার কী ?

"কেন কাল পর্শু জানেন না ? তেমনি নর্শু, খর্শু, হর্শু, ধর্শু, টর্শু, বর্শু—"

"হয়েছে হয়েছে, বুঝেছি। তা চলে এলে যে ? বেশ তো একখানা চাকরি পেয়েছিলে ! যত ইচ্ছে ভূতের নেত্য করবার এমন একটা মারকাটারি চান্স কার ভাগ্যে জোটে ?"

মদনা দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলে "কাজ নেই আমাদের অমন চাকরিতে। ভূতের আণ্ডারে কাজ করার বাসনা নেই আর।"

গুপি মোক্তার বলেন, "অ্যাই দ্যাখো, এখনো সেই পুরনো কথা কেন ? শুনেছ তো ব্যাপার ?"

শুনলে কী হবে ?

ট্যাঁপা মাথা নেড়ে বলে, "শোনা কথায় বিশ্বাস করতে নেই। নিজের চক্ষে যা দেখলাম, তার ওপর কথা আছে ?"

"কী আবার দেখলি ?"

মদনা ট্যাঁপা দু জনেই বলে ওঠে, "কী দেখলাম ? দেখলাম—একই লোক একসঙ্গে এখানে, ওখানে, সেখানে।... গরুর গাড়ি চড়ে মেয়ে-জামাইকে সঙ্গে নিয়ে আসছে, আবার পথে দাঁড়িয়ে সেই আসাটা দেখছে। এর পরেও আবার থাকতে বলেন মোক্তারবাবু

গুপি মোক্তার হোহো করে হেসে উঠে বলেন, "উঃ সে রহস্য বুঝি ভেদ হয়নি এখনো তোদের কাছে ? যাক, হবে হবে, এই সামনের সোমবারেই সব রহস্যের ভেদ হবে। সোমবার বেলা দুটোয় একটি জমজমাট আসর বসবে গজ-পতি উকিলের সেই তেরো নম্বর ঘরে।"

ট্যাঁপা আর মদনা চেঁচিয়ে বলে, "সর্বনাশ ! আমরা সেখানে যাচ্ছি না।"

গুপি মোক্তার আশ্বাস দেন, "আরে, আমি তো আছি।

দেখবি সবাই থাকবে।”

এই সোমবারের খবর বর্ধমান জেলার বোড়ো গ্রামেও গেছে। মানে পাঠানো হয়েছ খবর। সেখানে এখন সাজ সাজ রব।

জগদ্দলবাসিনী বলে রেখেছে, সাতজন্মে কলকাতা দেখেনি সে, এবারে গিয়ে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, চিড়িয়াখানা, থিয়েটার, সিনেমা, সব দেখে তবে ছাড়বে। আর গন্ধেশ্বরী বলেছে, আর কিছু না হোক কলকাতায় যে সার্কাস হচ্ছে সেটা না দেখে ছাড়বে না, এবং কলকাতার দোকানের শাড়ি কিনবে গাদা গাদা। বাবা তো বলেছে আর কিপটেমি করবে না, আর তাকেই উইল করে সব টাকা দিয়ে দেবে।

গণপতির অবশ্য শখ-সাধ কিছু নেই, শুধু কলকাতায় এসে একটা চশমা করাবে। চশমার দরকার। খুব দুখখু করে বলেছে, নির্ঘাত চোখ খারাপ। না হলে দাদাকে সে চিনতে পারে না!

তা যে যে-ইচ্ছে নিয়েই আসুক, আসছে সকলেই।

১০

অবশেষে সেই সোমবার আসে।

কমলাভবনের তেরো নম্বরের ফ্ল্যাটের দরজা খোলা হয়। চাবি ছিল পুলিসের কাছে, কেবু ঘোষ এসে সে চাবি খোলেন। তাঁর সঙ্গে আরো পুলিস।

ফ্ল্যাট-বাড়ির অন্য বাসিন্দারা হাঁ করে দেখে, মৃত গজপতি উকিলের এক জোড়া প্রেতাত্মা গটগট করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে।

এসেছে বাড়িওলা, এসেছে কেয়ার টেকার, এসেছে হাসপাতালের লোক, তাছাড়া উঁকিঝুঁকি মারতে-মারতে ট্যাঁপা-মদনাও ঢুকে পড়েছে।

এদিকে গেনুপিসি বসেছেন জাঁকিয়ে, তাঁর পিছনে জগদ্দলবাসিনী, গণপতির বৌ, আর গন্ধেশ্বরী।

এটা হচ্ছে শোবার ঘরের সামনের টানা লম্বা বারান্দা, অনেক লোক ধরে গেছে।

সবাই বসে, শুধু গজপতি উকিল দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতে একটা পেন্সিল। এটা গজপতির মুদ্রাদোষ, কোর্টেও তিনি একটা পেন্সিল হাতে নিয়ে সেইটাকে উঁচিয়ে উঁচিয়ে ভিন্ন কথা বলতে পারেন না।

এখন তিনি সেই কোর্টের ভঙ্গিতেই পেন্সিল উঁচিয়ে উঁচিয়ে বলে চলেন, “সমবেত ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ, আপনারা সকলেই অবগত আছেন, গত বিশে ডিসেম্বর, আমি, উকিল শ্রীগজপতি সাহা এই ফ্ল্যাটে আমার শোবার ঘরের মধ্যে 'নিহত' হই। জানেন কি না?”

কেবু ঘোষ বলে ওঠেন, “নিহত আর হয়েছেন কই? বরং যুগলরূপ ধারণ করে জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে রয়েছেন।”

গজপতি পেন্সিল জোরে উঁচিয়ে বলেন, “সে-কথা পরের কথা। সেদিন আমি নিহত হয়েছিলাম, এবং আপনারা দরজা ভেঙে আমার মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে চালান দিয়েছিলেন, এটা সত্যি কি না? আর সেখান থেকে—আমায় মর্গে চালান করা হয়েছিল কি না? বলুন? জবাব দিন।”

কেবু ঘোষ এবং তাঁর সহকারী আমতা আমতা করে জবাব দেন, “তা হয়েছিল বটে।”

“তারপর আপনারা আমার এই পরম বন্ধু গুপি মোক্তারের বাড়ি হানা দিয়ে এঁর পিসিমাকে জেরা করে করে উত্যক্ত করেছিলেন।”

একথা শুনে কেবু ঘোষ রেগে গিয়ে জোর গলায় বলেন, "উত্যক্তের কীই বা করা হয়েছিল মশাই? আরো কত করবার ছিল। পাশের ঘরে একটা খুন হয়ে গেল. আর সঙ্গে সঙ্গে ইনি ফেরার হলেন, এতে তো জেরায় জেরবার করবার কথা, কিন্তু এই ডেঞ্জারাস মহিলাটি আমাদের উপযুক্ত তদন্ত করবার সুযোগই দেননি।"

গেনুপিসি নড়ে চড়ে বসেন. তারপর চড়া গলায় বলে ওঠেন, "দেবে বৈ কি সুযোগ! গোকুল-পিঠে খাওয়াবে তোমায়! বাছা আমার মনের দুঃখে বিবাগী হয়ে গেল, আর তুমি বাছা কিনা এলে ওকে ফাঁসি-কাঠে ঝোলাবার তালে।"

গজপতি সমবেতদের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে কেবু ঘোষের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে বলেন, "তা বটে. তদন্ত করা আপনাদের কাজ। কিন্তু মর্গ থেকে একটা মড়া হাওয়া হয়ে গেল, তার তদন্তের কী হল? তাছাড়া আসলে সেটা মড়া কি জ্যান্ত, সে তদন্ত করেছিলেন?"

কেবু ঘোষ রেগে বলেন. "সব কাজ আমাদের নয়। আপনাকে গলায় গামছা দিয়ে মেরে রেখে টাকা পত্তর লুঠ করে নিয়ে গেছে, সেটাই দেখেছি আমরা। তারপর যদি আমাদের জব্দ করতে আপনি আবার বেঁচে ওঠেন. সেটা আমাদের দোষ নয়।"

গজপতি মৃদু হেসে আবার পেন্সিল তুলে বলেন. "তা অবশ্য নয়। তবে কে মেরে গেল. কী ভাবে গেল, সে-হিসেব রেখেছেন?"

কেবু ঘোষ বলেন. "তদবধি তো সে-তদন্ত চলছেই।"

"কিছু আবিষ্কার করেছেন?"

"এত তাড়াতাড়ি কি হয় মশাই?" কেবু ঘোষ বলেন. "একটি কেসের ফয়সালা করতে কত ঝামেলা. আপনিই কি জানেন না?"

গজপতি আবার একটু মৃদুমন্দ হাসি হেসে বলেন, "তা জানি। তবে এটাও জানি, মশা মাছি পিঁপড়ে অথবা অশরীরী আত্মা ছাড়া, সকলেরই, অন্তত মানুষ মাত্রেরই, ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে একটা দরজা-ফরজার দরকার হয়। কিন্তু আপনারা সেটা জানেন না।"

সকলেই নড়ে-চড়ে বসে।

এ-কথার মানে?

কেবু ঘোষ বলেও ওঠেন, "তার মানে?"

"মানে বোঝাচ্ছি। বাড়িওলা মশাই. আপনার বাড়ি, আপনি সবই জানেন, আমার যে-শোবার-ঘরটা তাতে একটা ভিন্ন দুটো দরজা নেই, তা জানেন নিশ্চয়?"

"তা আবার জানি না?" বাড়িওলা বলে. "এ-বাড়ির প্রতিটি ইঁট কাঠের হিসেব আমার মুখস্থ।"

"সে তো থাকবেই।" গজপতি পেন্সিলটি নাচিয়ে নাচিয়ে বলেন, "যাক, দরজা ওই একটাই। আচ্ছা, হত্যাকাণ্ডের দিন ঘরের কোনো জানলা-টানলা ভাঙা পড়ে থাকতে দেখেছেন?"

বাড়িওলা জোরে-জোরে বলে, "ভাঙবার মত জানলা আমার বাড়িতে পাবেন না মশাই। সব লোহার খিল ছিটকিনি। গরাদগুলো দেখবেন।"

"দেখেছি।" গজপতি বলেন. "মৃতদেহ বার করতে অবশ্য দরজা ভাঙতে হয়েছিল, তা সেটা যে খুবই কষ্টসাধ্য হয়েছিল সেটা আমি টের না পেলেও আর সবাই পেয়েছিলেন নিশ্চয়?"

বাড়িওলা নিশ্বাস ফেলে বলে. "তা আবার পাইনি? দরজা ভাঙছিল না যেন আমার বুক ভাঙছিল।"

গজপতি একটু থেমে বলেন. "তা তো হতেই পারে। সে যাক, এখন আপনারা সকলে বিবেচনা করুন—জানলা ভাঙা ছিল না, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ. হত্যাকারী তাহলে বেরুলো কোথা দিয়ে?"

অ্যাঁ!

যতগুলো লোক বসে ছিল, সবাই চমকে ওঠে। তাই তো! এটা তো এতদিন কারুর মাথায় আসেনি!

কেবু ঘোষের মাথার খাড়া চুল নেতিয়ে ঝুলে পড়ে।

গজপতি বলেন, "ইনসপেকটর সাহেব, দরজা ভাঙবার সময় এটা আপনার খেয়াল হয়নি. হত্যাকারী মশা বা মাছি নয়।"

এখন কেবু ঘোষের মুখটাও ঝুলে পড়ে। আর গেনুপিসি দরাজ গলায় বলে ওঠেন, "আমিও তো তাই বলি. খুনেরা বেরুল কোথা দিয়ে?"

ট্যাঁপা আর মদনা আর না বলে উঠে থাকতে পারে না, "তাহলে স্যার আপনিই বলুন কোথা দিয়ে গেল?"

গজপতি একটু রহস্যময় হাসি হেসে বলেন. "কোনো-খান দিয়েই যায়নি। ঘরের মধ্যেই ছিল।"

বললেই হল?

কেবু ঘোষ বলেন, "দরজা খোলবার সময় পাহারা ছিল না আমার? কেউ পালায়নি।"

"পালাবে কেন? পালাবার অবকাশই বা দিলেন কোথায় আপনারা? তাকে তো বেঁধে-ছেঁদে মর্গে চালান দিলেন?"

তার মানে? তার মানে?

সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, "তার মানে আত্মহত্যা?"

আত্মহত্যা!

গজপতি বলে ওঠেন, "কী দুঃখে? কিছুই না। শুধু গলাটা খুশখুশ করছিল বলে, শুকনো গামছাখানা একটু গলায় জড়িয়ে রেখেছিলাম! তারপর—"

"গামছা জড়িয়েছিলে?" গুপি মোক্তার রেগে উঠে বলেন, "গামছা জড়িয়েছিলে মানে? গামছা গলায় জড়াবার জিনিস?"

গজপতি গম্ভীরভাবে বলেন, "তাতে কী? যদি গামছাতেই কাজ হয়, অকারণ পয়সা খরচ করে মাফলার কম্ফর্টার এসব কেন কিনতে যাব আমি? সর্দি কাসি হলে আমি গামছাই গলায় জড়াই। সেদিনও জড়িয়েছি। হঠাৎ গামছার মধ্যে পিঁপড়ে

দু'ছড়া

সুব্রত চক্রবর্তী

একটি লাল ও একটি কালো, দুইটি পোড়া-
মাটির ঘোড়া, পাশাপাশি, রাতবিরেতে
নদীর চড়ায়, তেপান্তরে, ধানের খেতে
ঘুরে বেড়ায়।...রাত পোহালে বাটিক-করা
শান্তিনিকেতনী মোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে—
খুরে বালি, আর কিছু ঘাস ঠোঁটের ফাঁকে।

২

দিনকানা মথ দেয়াল ছেড়ে উড়ে গেলে,
কেশনগরের টিকটিকিটা টিকটিকিয়ে
বললে, "আমি তৈরি পোড়া-মাটি দিয়ে,
তা-ও জানো না?"...রঙচটা দুই পাখনা মেলে
উড়তে-উড়তে মথ বলে, "ঐ মাটির ধড়ে
ন্যাজটা কেন উঠল নড়ে!"

সুড়সুড় করে ওঠায় টানাটানি করতে গিয়ে গেল ফাঁস পড়ে।"

অ্যাঁ!

"হ্যাঁ! গেল। আরও টানাটানি করতে গিয়ে ঘরময় দাপাদাপি করে বেড়িয়ে, ঘর সংসার তচনচ করে শেষ অবধি মাটিতে গড়িয়ে পড়লাম। ব্যস্, এই ঘোষ মশাই তার খবর পেয়ে আমায় মড়ার গাড়িতে তুলে চালান দিলেন।"

ট্যাঁপা গলা বাড়িয়ে বলে, "কিন্তু এখনো তো সামনে ধাঁধার সমুদ্দুর। শেষ অবধি প্রাণটা রক্ষে করল কে?"

গজপতি অমায়িক গলায় বলেন, "রক্ষে করল কে? সেও ওই গামছা।"

"তার মানে? যেই ভক্ষক সেই রক্ষক? কিন্তু ঘটনাটা কী ঘটল স্যার?"

"ঘটনা আর কী! গামছা আমি সহজে ফেলি না, যতক্ষণ না শেষাবস্থায় পৌঁছয়, কাজ চালিয়ে যাই। এটাও ছিল ওই শেষাবস্থায়। তাই যেমনি দম বন্ধ হয়ে গলা ফুলে গিয়ে ফাঁস পড়তে শুরু করেছে তেমনি গামছাখানা ফাঁসতে শুরু করেছে। ...ফাঁসতে ফাঁসতে কোনো এক সময় গলার ফাঁস আলগা। কাজেই—"

কথা শেষ না-হতেই গেনুপিসি ধিক্কার দিয়ে ওঠেন, "গুপে, শুনলি? আর তুই? গামছা পুরনো না হতেই নতুন গামছা। তার মানে—মরার পথ পরিষ্কার করা।"

মদনা বলে ওঠে, "তবুও তো ধাঁধার দিঘি পুকুর। সেই যখন আবার দেহধারণ করলেনই, তখন এই ছায়ামূর্তিটিকে সঙ্গে বয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? ওকে দেখেই তো আমাদের গায়ের কাঁটা ঘুচছে না।"

ছায়ামূর্তি! বলতেই গণপতির দিকে চোখ পড়ে গজপতির। আর সঙ্গে-সঙ্গে হাসতে শুরু করেন, হা হা, হা হা।

সেই জোরালো হাসি। হাসির দাপটে ভিড় করে মজা দেখতে আসা লোকেরা অনেকে ঘাবড়ে গিয়ে পালিয়ে যায়।

এ আবার কেমন হাসি! ভৌতিক ভৌতিক!

আসলে খুন-হয়ে-যাওয়া গজপতির এতদিনের বন্ধ ঘরের দ্বারোদ্ঘাটনের সময় হঠাৎ একজোড়া জলজ্যান্ত গজপতির আবির্ভাব হবে, তা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। গুপি মোক্তার কারুর কাছেই রহস্যভেদ করেননি।

সবাই হকচকিয়ে গেছে!

হাসি থামলে গজপতি বলেন, "ওরে ব্যাটারা, যমজ দেখিসনি কখনো? যমজ ভাই?"

যমজ! ঈ-ঈ-শ!

তার মানে বোড়ো গ্রামে সাহাবাড়ির দোতলার জানলায় গজপতির মুখের ওই 'কার্বন কপি'টি দেখেছিল ট্যাঁপারা!

মদনা নিজের চুল নিজে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে, "সাধে কি আর আমরা নিজেদেরকে বুদ্ধুভুতুম বলি?"

"এবার থেকে 'গজকচ্ছপ' বলব।"

"হুতুমথুমোও বলতে পারি।"

তবু—

তবু ট্যাঁপা বলে ওঠে, "কিন্তু স্যার, দুটো ধাঁধার তো ব্যাখ্যা পাওয়া গেল, কিন্তু তিন নম্বরের ধাঁধাটা?"

গজপতি পেন্সিল উঁচিয়ে বলেন, "সেটা আবার কী?"

"সেটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে নিজে যদি ভুলক্রমে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ফেলেছিলেন তো টাকাগুলো কোথায় গেল? চোর-ডাকাত না এলে, বাক্স-প্যাটরা আলমারি-দেরাজ ফর্সা করল কে?"

আলমারি-দেরাজ, বাক্স-প্যাটরা!

গজপতি আকাশ থেকে পড়েন, "বাক্স-প্যাটরা আলমারি-দেরাজে টাকা রাখতে যাব আমি? আমি কি পাগল, না মাথা-গোল? ওসব কি একটা টাকা রাখবার জায়গা হল?"

"তা তুমি তো ভাই ব্যাঙ্কেও টাকা রাখো না। তবে?"

গজপতি যেন হতাশ হয়ে যাচ্ছেন এদের বোকামিতে। "ব্যাঙ্কেই বা রাখতে যাব কেন? টাকা হচ্ছে মা লক্ষ্মী, একবার ঘরে এলে কি আবার ঘরের বার করতে আছে? টাকা যেখানে থাকবার সেখানেই আছে। গদির মধ্যে।"

গদির মধ্যে?

"না তো কী? গদিটা দিন দিন পুরু হচ্ছে কেন তবে? টাকা খানিক জমলেই গদির ধারের সেলাই কেটে কেটে ঢুকিয়ে ফেলি।"

শুনে কেবু ঘোষের নিজের হাত নিজে কামড়াতে ইচ্ছে করে। ঈশ! সেদিন যদি মৃতদেহটাকে ঘটা করে গদিতে চাপিয়ে নিয়ে যেতাম! রাগে চেঁচিয়ে উঠে বলেন কেবু ঘোষ, "বিশ্বভুবনে এমন কথা কখনো শুনিনি মশাই!"

গজপতি অমায়িক হেসে বলেন, "বেশ, তাহলে একটা নতুন কথা শোনাতে পারলাম আপনাদের। যাক, আপনারা তাহলে এবার আসুন গিয়ে। গুপি, সেদিন তুমি যখন পিসির ডাকে উঠে গেলে, ছকটায় কোন ঘুঁটিটা কোথায় ছিল তোমার মনে আছে? স্মরণে এনে সাজিয়ে ফেলো দিকি। সে-দানটা শেষ হয়ে যাক।"

এরপরও কি ট্যাঁপারা আর চুপ করে বসে থাকতে পারে? ডুকরে উঠে বলে, "আপনি তো স্যার টাকার গদিতে শুতেন, তা-ই শোবেন, ঘুঁটি খেলতেন, তা-ই খেলবেন, আমাদের কী হল? জন্মে জীবনে একটা মহৎ কর্ম করতে গিয়েছিলাম, একটা খুনী আসামী ধরিয়ে দিচ্ছিলাম, বেঁচে উঠে সেটি গুবলেট করে দিলেন। তার ওপর আবার ভূতের নেতা করিয়ে হাড়ে-হাড়ে ব্যথা ধরিয়ে দিলেন, এখন বলছেন, সবাই এসো গিয়ে!"

গজপতি ওদের দিকে তাকিয়ে পেন্সিল ফেলে দুহাত তুলে বলেন, "আরে নন্দী-ভৃঙ্গী! তোরা কোথায় যাবি? তোরা কেন যাবি? তোরা খাবি দাবি থাকবি। ওই গদিটা বড্ড বেশী পুরু হয়ে গেছে, পিঠে ফোটে, ভাবছি খানিক হালকা করে ফেলব। তোদের দিয়েই বউনি হোক। কিন্তু খবরদার, আর কক্ষনো লোকের পকেটে কাঁচি চালাতে যাবি না।"

নন্দী ভৃঙ্গী মুখে কথাটি কয় না।

শুধু চারখানা হাত নিঃশব্দে চারটে কানে উঠে যায়।

বিমল মিত্র

মনসাতলার ঘাটে একদিন এক সাধু এসে হাজির হল। আমাদের দেশে সাধারণত কোনও ঘটনা ঘটে না। আমাদের জীবন নিয়ম করে চলে। আমরা নিয়ম করে ইস্কুলে যাই, নিয়ম করে ইস্কুল থেকে বাড়িতে আসি। নিয়ম করে মাঠে ফুটবল খেলতে যাই। তারপর ঠিক নিয়ম করে রাত্তির বেলা বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। তারপরদিন আবার সেই একই নিয়মে পুব দিকের আকাশে সূর্য ওঠে আর আমরা সেই নিয়মের চাকায় গড়িয়ে-গড়িয়ে আবার আগেকার দিনের মত চলি।

বেড়াপোতা গ্রামের জীবন তাই বড় সহজ, বড় সরল। আমরা আকাশে মেঘ করলে বৃষ্টিতে ভিজে অসুখ হবার ভয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকি। যদি কোনও দিন বেনিয়ম করবার ইচ্ছে হয় তো মনসাতলার ঘাটে গিয়ে আমরা মাঝে-সাঝে বটগাছের ঝুরি ধরে দোল খাই।

মনসাতলার ঘাটে সব চেয়ে যেটা আমাদের মনকে টানত সেটা হল ওই বটগাছটা। মনসাতলার ঘাটে আর-কিছু ছিল না। না একটা খেয়া-পারাপারের নৌকো, না একটা বাড়ি। একটা কুঁড়েঘরও ছিল না আশে-পাশের তিন-চার মাইলের মধ্যে। তিন-চার মাইলের মধ্যে কেবল ছিল ধানের আর পাটের খেত। হু-হু করে যখন জোরে হাওয়া বইত, তখন ওই খেতের ওপর ধান-পাট-সরষে-তিসি-মেস্তার লম্বা লম্বা পাতার ওপর কী-রকম একটা শির্-শির্ শব্দ হত। দূর থেকে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনলে মনে হত যেন বাঁশি বাজছে। বিশেষ করে রাত্তিরে।

তা রাত্তির বেলা আমরা ও-দিকে যেতুম না। আর আমাদের যাবার দরকারও হত না ওদিকে।

বেড়াপোতা গ্রামের লোকরা কিছু কেনাবেচা করতে গেলে উত্তর দিকে যেত। উত্তর দিকে পাঁচ মাইল দূরে ছিল বাজার-হাট-দোকান। সেইখানেই রেলের ইস্টিশান। ওই ইস্টিশানে নেমে বাসে চড়ে আমাদের বেড়াপোতা গ্রামে আসতে হত। এমনি পুবেও ছিল বসতি-অঞ্চল। পশ্চিমে ছিল মালোদের পাড়া। ঝুড়ি-ঝাঁটা-মাদুর কিনতে যেতে হলে আমাদের সেখানে যেতে হত।

কিন্তু মনসাতলার ঘাটের দিকে আমাদের যেতে হত শুধু ওই বটগাছের ঝুরি ধরে ঝোলবার জন্যে। কারণ, নামে যদিও মনসাতলার ঘাট, কিন্তু সে-ঘাট কেউ-ই ব্যবহার করত না। কারো যাবার দরকারও হত না সেদিকে।

অনেক আগে মনসাতলার ঘাটে ফেরি নৌকো চলত। বেড়াপোতা থেকে ওপারে যেতে হলে ওইখানে খেয়া-নৌকোয় চড়তে হত। তখন এপারে-ওপারে যাতায়াতের দরকার হত আমাদের। ওপারের লোক এপারে আসত, এপারের লোকও ওপারে যেত। এপারে বেড়াপোতা আর ওপারে শ্যামকুড়। এপারে বেড়াপোতাতে আসত শ্যামকুড়ের লোকরা হাট করতে, আবার শ্যামকুড়ের হাট করতেও যেত বেড়াপোতার লোকরা।

কিন্তু যেদিন থেকে শ্যামকুড়টা পাকিস্তানের মধ্যে পড়ে গেল, সেদিন থেকে খেয়া-নৌকোও বন্ধ হয়ে গেল, ওদিকে যাতায়াতও বন্ধ হয়ে গেল আমাদের। তখন থেকেই বন্ধ হয়ে গেল মনসাতলার ঘাটের দিকে যাওয়া। একটু বেলা হলেই জায়গাটা কী-রকম থমথমে হয়ে আসত। আশে-পাশের পাটের খেত থেকে লোকজন যে-যার বাড়িতে চলে যেত। তখন আমাদের ভয় করত। আমরাও খেলা ছেড়ে বাড়িতে চলে আসতাম।

সেবার অনেকদিন আর মনসাতলার ঘাটের দিকে আমরা যাইনি।

হঠাৎ বাদল এসে বললে, "ওরে, মনসাতলার ঘাটে যাবি? একটা সাধু এসেছে—"

"সাধু?"

"হ্যাঁ রে, একেবারে খাঁটি হিমালয়ের সাধু।"

আমাদের বেড়াপোতা গ্রামে সাধু অনেক এসেছে। সে-সব সাধু সাধারণ সাধু। গেরুয়া পরে তারা হঠাৎ এসে হাজির হত, আর আমাদের বারোয়ারিতলায় বসে ধুনি জ্বালিয়ে লোকের কাছে ভিক্ষে করত। কখনও-কখনও কারো অসুখ-বিসুখে ধুনির ছাই তুলে আমাদের হাতে দিত। তাতে কেউ ভাল হয়ে যেত, আবার কেউ বা ভাল হতও না।

কিন্তু এবার নাকি অন্য রকম। বাদল যা বললে, তা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এ নাকি একেবারে খাঁটি হিমালয়ের সাধু। খাঁটি হিমালয় আর নকল হিমালয় বলে যে কোনও কথা আছে, তা আমি জানতুম না।

বাদল বললে, "তুই কাউকে সাধুর কথা বলিসনি কিন্তু। নইলে মুশকিল হবে। সাধু কাউকে বলতে বারণ করে দিয়েছে।"

"কেন, বললে কী হবে?"

বাদল বললে, "জানলে ভিড় হবে খুব। তাতে সাধুর সাধনার ব্যাঘাত হবে। সাধু খুব জপতপ করে তো!"

আমি বললাম, "তা খাঁটি হিমালয়ের সাধু এত জায়গা থাকতে এই বেড়াপোতার মনসাতলার ঘাটে হঠাৎ এলই বা কেন?"

বাদল বললে, "আমি সে-কথাও জিজ্ঞেস করেছিলাম সাধু-বাবাকে। তা সাধুবাবা বললেন, এখানে একটা ছেলে আছে, তার বাবার খুব অসুখ, তাকে সারাতে—"

আমি তো শুনে আরো অবাক! বাদলের বাবারই তো খুব অসুখ। বাদলের বাবা তো আজ দশ বছর ধরে হাঁপানি রোগে খুব কষ্ট পাচ্ছে। অনেক ডাক্তার অনেক কবিরাজকে দেখানো হয়েছে, কেউ সারাতে পারেনি। বাদলদের বাড়িতে আর একটা মানুষ নেই যে, রোজগার করে সংসার চালায়। বাদলদের সংসার বলতে গেলে চলেই না। অর্ধেক দিন বাদলদের বাড়িতে ভাতই রান্না হয় না।

বলতে বলতে বাদলের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

বললে, "ভাই, এতদিনে মনে হচ্ছে ভগবান বলে একজন আছে রে। নইলে এত জায়গা থাকতে সাধুবাবা হিমালয় ছেড়ে আমাদের বেড়াপোতায় আসতে যাবেই বা কেন? সাধুরা সাধনা করে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব কিছু চোখে দেখতে পায় যে! হয়ত হিমালয়ে বসে সাধনা করতে করতে আমার বাবার অসুখের কথাটা জানতে পেরে গিয়েছিল।"

বললাম, "কিন্তু তুই কী করে সাধুর খবর জানলি?"

বাদল বললে, "আমি একদিন রাত্তির বেলা স্বপ্ন দেখলুম ভাই। স্বপ্ন দেখলুম আমি বিছানায় শুয়ে আছি, আর আমার সামনে একজন জটাজুটধারী সন্নিসী দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলে, কী রে, আমাকে ভাবছিস কেন? তা আমি বললুম, "আমার বাবার বড় অসুখ, তার অসুখটা তুমি সারিয়ে দাও বাবা। তখন সাধুবাবা বললে, আমি তো তোদের বেড়াপোতাতেই এসেছি। তুই আমার কাছে কাল আসিস, আমি ওষুধ দেব—"

আমি তো শুনে আকাশ থেকে পড়লুম।

জিজ্ঞেস করলুম, "তারপর? তারপর তুই কী করলি?"

বাদল বললে, "তারপর ভাই সাধুর খোঁজে চারিদিকে ঘুরতে লাগলুম। তোদের কাউকে বলিনি। একা-একা সব জায়গায় যেতে লাগলুম। কিন্তু কোথাও পাই না। শেষকালে মনসাতলার ঘাটের দিকে একদিন কী ভেবে গেলুম। ও-দিকটা একেবারে ফাঁকা। তখন সন্ধে হব-হব। কেউ কোথাও নেই। সাধুকে না দেখতে পেয়ে বাড়ির পথে ফিরছি, হঠাৎ দেখি বুড়ো বটগাছটার ভেতর থেকে কী-রকম একটা ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ভাবলাম এখানে বটগাছের ভেতরে আবার ধোঁয়া কোথা থেকে আসছে। কাছে গেলাম। ভেতরে উঁকি মেরে দেখি একমুখ দাড়ি-গোঁফওয়ালা এক সাধু বসে-বসে গাঁজা খাচ্ছে। একেবারে ঠিক স্বপ্নে যে-রকম চেহারা দেখেছিলুম, সেই রকম চেহারার সাধু। একেবারে হুবহু। দেখেই আমি তার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়লুম। বললুম, বাবা, আমি বাদল।

"বাবা কিছু বললে না। যেমন গাঁজা খাচ্ছিল তেমনি গাঁজা খেতে লাগল। বাবাও কথা বলে না, আর আমিও তখন বাবার পা ছাড়ি না। ভাবলাম হয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার। শেষ-কালে বাবার বোধহয় দয়া হল। হঠাৎ আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, লে বেটা, লে।

"দেখি সাধুবাবা আমার দিকে হাতের মুঠো বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি হাত পাততেই সাধুবাবা আমার হাতের মধ্যে কী দিয়ে দিলে।

"সাধুবাবা বললে, ওইটে নিয়ে তোর বাবাকে খাইয়ে দিগে যা।

"আমি আমার হাতের মুঠো খুলে দেখতে যাচ্ছিলুম। সাধুবাবা বারণ করলে। বললে, এখন দেখিস নে, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দেখিস।

"দৌড়ে বাড়ি গেলুম। বাড়িতে তখন বাবার কবিরাজী ওষুধ খাবার সময়। ওষুধের সঙ্গে সাধুর দেওয়া ওষুধটা মিশিয়ে দিলুম। বাবা জানতেও পারলে না ভাই। তারপর থেকে বাবার অসুখটা কমে এল। এখন বাবা রাত্তিরে আরাম করে ঘুমোচ্ছে, আর আগেকার মতন তেমন কষ্ট হয় না বাবার।"

আমি বললাম, "কিন্তু তুই তো আমাকে এ-সব কথা কিছুই বলিসনি! তোর সঙ্গে আমার রোজ দেখা হয় আর এ-সব কথা তুই একেবারে চেপে গেছিস?"

বাদল বললে "আমি কী করব, সাধুবাবা যে কাউকে বলতে বারণ করেছিল।"

"কিন্তু তারপর? তারপর কী হল?"

বাদল বলল, "তারপর ভাই আমি এক কাজ করলুম। বাড়ি থেকে একটা কাঁঠাল নিয়ে সাধুবাবাকে খেতে দিয়ে এলুম। বললাম, বাবা, আমার তো আর কিছু দেবার নেই, এইটে তোমার জন্যে এনেছি, তুমি খাবে বলে। তা সাধুবাবা কী করলে জানিস? শুধু বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা দিয়ে কাঁঠালটা একটু ছুঁয়ে দিয়ে সেটা আমাকে দিয়ে বললে, এই আমি খেলুম। এটা তুই খেগে যা।"

"কেন, সাধুবাবা কিছু খায় না নাকি?"

বাদল বলল, "না।"

"কিছু খায় না তো বেঁচে আছে কী করে? উপোস করে থাকলে মানুষ বাঁচে?"

বাদল বললে, "আরে, তুই কিছু বুঝিস না, সাধুবাবা কি মানুষ যে, উপোস করে থাকলে মরে যাবে? সাধুবাবা তো ভগবান রে! ভগবানই সাধু হয়ে আমাদের বেড়াপোতায় এসেছে। তুই কিছুছু বুঝতে পারছিস না।"

সত্যিই আমি তখনও বুঝতে পারছিলাম না ব্যাপারটা!

জিজ্ঞেস করলাম, "তোর বাবা সত্যিই ভাল হয়ে গেছে?"

"একেবারে ভাল হয়নি, কিন্তু সাধুবাবা বলেছে, আর কয়েকদিন পরে একেবারে পুরোপুরি ভাল হয়ে যাবে। আর কোনও ভয় নেই।"

"তারপর সেই কাঁঠালটার কী হল?"

"আমি কাঁঠালটা আবার লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ি নিয়ে গেলুম। বাবা-মাকে আমি সাধুবাবার কথা কিছুই বলিনি।"

আমি বললুম, "কেন? বলিসনি কেন?"

বাদল বললে, "বললে যে সাধুবাবার ওষুধের ফল ফলবে না।"

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "তাহলে আমার কথা বললি কেন?"

বাদল বললে, "তোর কথা আলাদা। তুই তো আমার বন্ধু। তোর কথা আমি সব বলেছি সাধুবাবাকে।"

"আমার কথা কী বলেছিস?"

"বলেছি যে, আমার এক বন্ধু আছে, তার বড় ইচ্ছে যে সে কবি হবে। বড় হয়ে সে ভাল-ভাল কবিতা লিখবে! সে কি কবি হতে পারবে?"

"সাধুবাবা শুনে কী বললে?"

বাদল বললে, "সাধুবাবা বললে তাকে তুই আমার কাছে নিয়ে আসিস। তার মুখের চেহারা দেখে তবে আমি বলে দেব সে কবি হতে পারবে কি না।"

তা তখন আমার খুব ইচ্ছে ছিল বড় হয়ে আমি মস্ত বড় কবি হব। রবিঠাকুরের মত ভাল ভাল কবিতা লিখব। বাদল আমার ইচ্ছের কথা ভাল করেই জানত। কিন্তু কবিতা যে
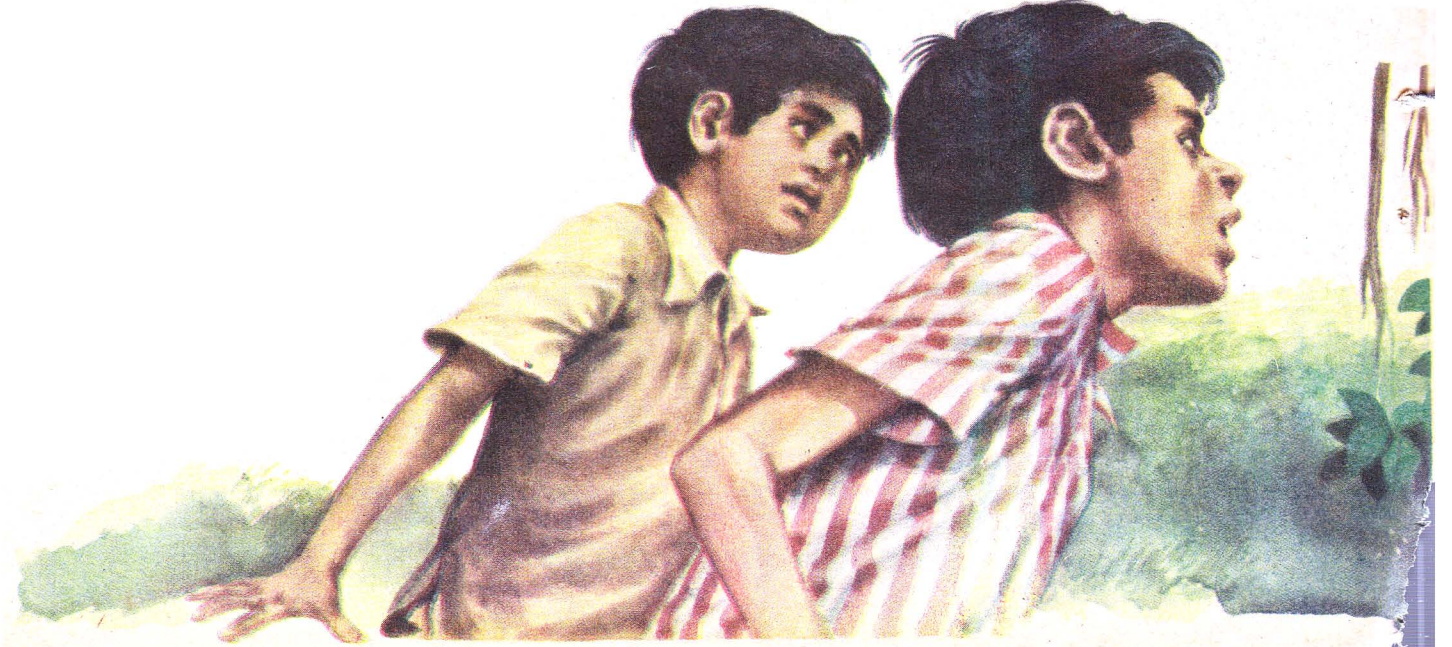
লিখব, তা ছাপাবে কে? আমাদের বেড়াপোতা গ্রামে পত্রিকা কোথায়? বেড়াপোতা গ্রামের সবাই চাষ-বাস আর গল্প-গুজব করেই দিন কাটাত। আর আমরা যারা ছোট তাদের কাজ ছিল লেখা-পড়া করা আর ফুটবল খেলা। যখন ফুটবল খেলা থাকত না, তখন সেই সময়টায় বন্ধুবান্ধব নিয়ে মাঠে বসে গল্প করা। কিন্তু সকলের সঙ্গে মিশেও আমার মন থাকত কবিতা লেখায়। বাড়িতে গিয়ে সকলের চোখের আড়ালে বসে-বসে কবিতা লিখতুম। লিখে লিখে আমার খাতার পর খাতা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে কিছু কিছু লেখা শুধু বাদলকে পড়ে শোনাতুম। বাদল শুনে বলত, চমৎকার হয়েছে। এ-লেখাটা তোর রবি ঠাকুরের চেয়েও ভাল হয়েছে। তুই এ-লেখাটা কলকাতার কাগজের আপিসে পাঠিয়ে দে।

তার কথায় সাহস করে আমি কলকাতার কাগজের অফিসে পাঠিয়ে দিলুম। সেই কবিতা ছাপা হয়েছে কিনা দেখবার জন্যে সাত ক্রোশ দূরে গাঁয়ের বাজারে কাগজের স্টলে গিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখতাম। কিন্তু মাস কেটে গিয়ে বছর চলে যেত, তবু আমার কবিতা ছাপার অক্ষরে উঠত না। অথচ দেখতাম আমার কবিতার চেয়ে অনেক খারাপ কবিতা ঘন-ঘন ছাপা হত। আমার মনে হত কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে আমার জানা-শোনা নেই বলেই আমার কবিতা ছাপা হচ্ছে না। কলকাতার ছেলেদের ওপর আমার খুব হিংসে হত। ভাবতুম তারা কী সুখেই আছে। যখন ইচ্ছে কাগজের আপিসে গিয়ে সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে পারে, তাদের সঙ্গে ভাব করতে পারে। সম্পাদকদের সঙ্গে ভাব করলে কত সুবিধে!

কিন্তু মনের দুঃখ আমার মনেই চেপে রাখতে হত। আমাদের মত মফস্বলের ছেলেদের মনের দুঃখ কেউই বুঝত না।

তাই এতদিন পরে বাদলের কথায় মনে খুব আনন্দ হল। সোজা পথে তো কিছু হল না এখন দৈব উপায়ে যদি কিছু হয়। বাদলের নিজের বাবা বহুদিন ধরে ভুগছিলেন। তাঁরই যদি অতদিনকার পুরনো রোগ সেরে গিয়ে থাকে, তাহলে আমারও কবি হওয়া হবে।

তা সেদিন সকাল বেলাই বাদল আমাকে বলে গেল—আজ বিকেলবেলা তুই মাঠে যাসনি, তোকে নিয়ে আমি বাদামতলার সাধুবাবার কাছে যাব। কাউকে যেন কিছু বলিসনি!

আমি তো তৈরিই ছিলুম। বাদলের কথামত সেদিন আর কোথাও বেরোলাম না। কিন্তু সময় যেন আর কাটতেই চায় না। জানালার ধারে বসে রাস্তার দিকে চেয়ে রইলাম, কতক্ষণে বাদল আসে। দুপুরটা কোনও রকমে কাটল, কিন্তু বিকেলটা যেন আর মোটে কাটতেই চায় না। আমাদের বাড়ির সামনে একটা গাবগাছ, আর তার তলা দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে বেঁকতে বেঁকতে একেবারে মনসাতলার ঘাটের দিকে। পাকিস্তান হবার আগে ওই রাস্তাটাই ছিল ঘাটে যাবার একমাত্র রাস্তা, কিন্তু এখন আর ও-রাস্তা দিয়ে কেউ হাঁটে না। দু'পাশের বাঁশ-ঝাড়ের পাতা পড়ে-পড়ে রাস্তাটাও একেবারে ঢেকে গেছে। দু'পাশে আশশ্যাওড়া আর আগাছা জন্মে রাস্তাটা মানুষের অগম্য হয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত দেখলাম, বাদল হনহন করে আসছে আমাদের বাড়ির দিকে। কাছাকাছি আসতেই আমি বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, "কী রে, এত দেরি তোর?"

বাদল বললে, "একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম ভাই, হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই জামা গায়ে দিয়ে দৌড়তে-দৌড়তে আসছি। চল্, চল্—"

আমরা দু'জনে শুকনো বাঁশপাতা মাড়াতে-মাড়াতে মনসাতলার ঘাটের দিকে চলতে লাগলাম। হিমালয়ের সাধুর কাছে যাচ্ছি। সে যা বলবে সব অব্যর্থ মিলবে। সে কৃপা করলে মানুষ সব কিছু বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে, যে যা চাইবে, ইচ্ছে করলে সাধুবাবা তাকে তাই-ই দেবে।

মনসাতলার ঘাটে পৌঁছবার আগেই সেই বটগাছটা। বিরাট বটগাছ। চারিদিকে গাছটা ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে জটাজুটধারী এক সাধুবাবার মত। এদিকে বহুকাল আসিনি। পাকিস্তান হবার পর মনসাতলার ঘাটেও আর কেউ আসে না। আসে না বলেই জায়গাটা বিকেলবেলাতেও কেমন ছম-ছম করছে।

বাদল বললে, "তুই একটু দাঁড়া এখেনে, আমি আগে একলা গিয়ে দেখে আসি সাধুবাবা কী করছে—"

আমি সেই ঝাপ্সা আলোয়-অন্ধকারে একলা দাঁড়িয়ে রইলাম, আর একটু পরেই বাদল ফিরে এল।

বললে, "চল, সাধুবাবাকে তোর কথা বলেছি। তোকে নিয়ে যেতে বলেছে সাধুবাবা—"

আমি বাদলের সঙ্গে-সঙ্গে সাধুবাবা দর্শনে চললাম। বটগাছটার পেছন দিকে গুঁড়িটা ফাঁক হয়ে বেশ একটা গুহার মতন সৃষ্টি হয়েছে। তার মাথার দিকটা দু'চারটে নারকোল-পাতা দিয়ে ঢেকে সেখানে একটা চালা-ঘরের মতন তৈরি করা হয়েছে। বাদল আমাকে সেইখানে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি দাড়ি-ওয়ালা একটা লোক খালি-গায়ে বাবু হয়ে বসে আছে। আমাদের দু'জনকে দেখে বলে উঠল, "এসো, এসো, বোসো—"

বাদল গিয়েই সাধুবাবার সামনে মাটিতে মাথা ঠেকাল। তারপর দুটো পায়ে হাত দিয়ে ছুঁয়ে সেই হাত মাথায় ঠেকাল। তার দেখাদেখি আমিও তাই করলুম।

সাধুবাবা নিজের একটা হাত আমাদের মাথায় ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করলে। বললে, "জয় রাম, জয় রাম—"

তারপরে আমার দিকে চোখ রেখে বাদলকে জিজ্ঞেস করলে, "এই বুঝি তোমার সেই বন্ধু? এ কবিতা লেখে?"

বাদল গদগদ হয়ে বললে, "হ্যাঁ সাধুবাবা, এই-ই আমার সেই বন্ধু, যার কথা আমি আপনাকে বলেছিলুম। এর বড় কবিতা লেখার শখ। কলকাতার সব কাগজে এ কবিতা লিখে পাঠায়, কিন্তু কেউ ছাপে না। আমরা তো মফস্বলে পড়ে থাকি, তাই আমাদের কথা কেউ ভাবে না। আমাদের তারা মানুষ বলেই মনে করে না। এ জানতে চায় এর আশা পূর্ণ হবে কিনা—"

সাধুবাবা সব শুনলে। শুনে আমার দিকে চাইলে।

জিজ্ঞেস করলে, "কী রে, তুই কবি হতে চাস?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ বাবা, আমার খুব ইচ্ছে আমার কবিতা সব কাগজে খুব ছাপা হোক।"

সাধুবাবা জিজ্ঞেস করলে, "তোর লেখা-পড়া কদ্দুর? কোন ক্লাসে পড়িস তুই?"

বললাম, "আমরা দুজনেই ক্লাস নাইনে পড়ি।"

সাধুবাবা আমার কথা শুনে বললে, "কার কবিতা তোর পড়তে ভাল লাগে?"

আমি বললাম, "রাধাচরণ বটব্যালের।"

সাধুবাবা অবাক হয়ে বললে, "সে কী রে? এত কবি থাকতে তোর ভাল লাগে রাধাচরণ বটব্যালের কবিতা? কেন?"

বললাম "তাঁর কবিতা যে সব পত্রিকায় ছাপা হয়। তাই আমি তাঁর মতন করে কবিতা লেখবার চেষ্টা করি।"

সাধুবাবা বললে, "রাধাচরণ বটব্যাল তোর আদর্শ? কিন্তু তাঁর চেয়েও তো বড় কবি আছে বাংলা দেশে। তাঁদের আদর্শ করিস-নে কেন?

বললাম, "আমরা তো গাঁয়ে থাকি, সকলের কবিতা তো পড়তে পাই না, আমাদের গাঁয়ে সকলের কবিতার বইও পাওয়া যায় না! আপনি আমাকে এমন একটা ওষুধ দিন যাতে আমার হাত দিয়ে খুব ভাল ভাল কবিতা বেরোয়। এমন কবিতা যেন লিখতে পারি যা পড়ে বড় বড় লোক আমাকে সভা-সমিতিতে ডাকবে আর আমার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেবে। আমার খুব নাম হবে, লোকে খুব বাহবা দেবে আমাকে—"

সাধুবাবা আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ চোখ বুজে কী যেন ভাবলে। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, "হবে হবে. তোর হবে!"

আমি তখন আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠেছি।

জিজ্ঞেস করলাম, "কতখানি নাম হবে আমার।"

সাধুবাবা বললে, "অনেক নাম হবে। কিন্তু তার আগে তোকে একটা কাজ করতে হবে। ভাল্লুকের মাথার ঘিলু জোগাড় করতে পারবি?"

ভাল্লুকের মাথার ঘিলু কোথায় পাব আমি? আমাদের গাঁয়ে তো ভাল্লুক নেই কোথাও। বাঙলা দেশে তো ভাল্লুক পাওয়া যায় না।

বললাম, "সে আমি কোথায় পাব? এ-গাঁয়ে ভাল্লুকই পাওয়া যায় না, তার মাথার ঘিলু কী করে জোগাড় করব?"

"আর বাঘের চর্বি। এই দু'টো জিনিস মিলিয়ে মধু দিয়ে মেড়ে অমাবস্যার রাতে খেলে কবি হওয়া যায়।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু যারা বড় বড় কবি হয়েছে তারা কি সবাই ওই সব খেয়েছে?"

সাধুবাবা বললে, "তা কেন খেতে যাবে! তারা যে স্বভাব-কবি! তারা কবিতা না লিখে থাকতে পারে না, তাই তারা কবিতা লিখতে বাধ্য হয়।"

আমি বললাম, "আমিও তো কবিতা না লিখে থাকতে পারি না।"

সাধুবাবা বললে, "তোর বয়েসে সব বাঙালী ছেলেরাই কবিতা না লিখে থাকতে পারে না। সেটা অন্য জিনিস। সেটা এক রকমের রোগ বলতে পারা যায়। তারপর যখন তাদের বয়েস বাড়ে, সংসারের চাপ পড়ে তাদের মাথার ওপর, তখন সকলেরই কবিতা লেখা ঘুচে যায়। এই রোগটা বাঙালীদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়।"

সাধুবাবার কথায় আমার মনে খুব কষ্ট হল। আমার কবিতা লেখার নেশাটাও কি তাহলে রোগ? কিন্তু আমি যে শয়নে-স্বপনে সব সময় মনে-মনে কেবল কবিতা লেখার কথা ভাবি! রাধাচরণ বটব্যালেরও কি ছোটবেলায় এই রোগটা ছিল?"

সাধুবাবা বললে, "তুমি রাধাচরণ বটব্যালের নাম করছ বটে, কিন্তু আমি তো তাঁর নামই শুনিনি! আমি যদি তাঁকে দেখতুম তাহলে বলতে পারতুম তাঁর ওটা নেশা কি অন্য কিছু।"

আমি বললাম, "কিন্তু তাঁর নাম যে সবাই জানে! বাঙলা-দেশের সব কাগজে তাঁর লেখা ছাপা হয়ে বেরোয়।"

সাধুবাবা বললে, "তা কারো কবিতা ভাল হলেই কি সব কাগজে ছাপা হয়? তার অন্য কোনও কারণও থাকতে পারে। হয়ত রাধাচরণ বটব্যাল কলকাতা থাকেন। সব কাগজের লোক-দের সঙ্গে জানা-শোনা আছে। জানা-শোনা থাকলে শুধু কবি কেন, সব কিছুই হওয়া যায় আজকল। নামজাদা গায়ক হওয়া যায়, নামজাদা শিল্পীও হওয়া যায়। জানা-শোনা থাকলে যেমন বড় বড় অফিসে বড় বড় চাকরি পাওয়া যায়, তেমনি বিখ্যাত কবি শিল্পী সাঁতারু খেলোয়াড় অনেক কিছুই হওয়া যায়। অথচ কত গুণী লোক আছে আমাদের দেশে, তা জানিস? তাদের কারো সঙ্গে জানা-শোনা নেই বলে কেউ তাদের নামও জানে না। কেউ তাদের খাতিরও করে না। তারা অজানাই থেকে যায়। তারপর একদিন চুপি-চুপি মারাও যায়। খবরের কাগজে তাদের মরার খবরও ছাপা হয় না।"

আমি বললাম, "আমার যে কারোর সঙ্গেই জানা-শোনা নেই, আমরা গ্রামে থাকি, কার সঙ্গেই বা আমাদের জানা-শোনা থাকা সম্ভব। এই অবস্থায় আমাদের মত গাঁয়ের ছেলেদের কী হবে?"

সাধুবাবা বললে, "আমার কথা যদি শুনিস তো তুই কবি হোসনে—"

জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?"

"ভাল কবিতা লিখলে কবির শুধু নিজেরই লাভ, দেশের লোকের কোনও লাভ নেই। কবি কবিতা লিখে নিজে নাম করে, নিজের নাম হয়, নিজের টাকা হয়, কিন্তু লক্ষ লক্ষ দেশের লোকের তাতে কী লাভ হবে?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু রাধাচরণ বটব্যালের কবিতা পড়ে যে আমার খুব আনন্দ হয়। সেটা কি কিছু না?"

সাধুবাবা বললে, "কাঁচা তেঁতুল নুন লঙ্কা মিশিয়ে খেতেও তো অনেকের ভাল লাগে, সেটা তো হল চাটনি। চাটনিটা তো খাবার নয়, ভাত হল খাবার। ভাত খেলে শরীর ভাল হয়, কিন্তু শুধু চাটনি খেলে কি শরীর ভাল হয় কারো? বরং জ্বর হয়। শুধু চাটনি খেয়ে তো কেউ বাঁচে না। যাতে মানুষ বাঁচে, সেই চেষ্টা কর তোরা। সেই দিকেই তোরা মন দে।"

সাধুবাবার কথাগুলো ভাল লাগল না। আমরা তখন ছোট। লোকের ভাল কথাগুলো তখন আমাদের ভাল লাগবার কথা নয়।

আমরা তখন ফুটবল খেলতে কবিতা লিখতে আর আড্ডা দিতে ভালবাসি।

সাধুবাবা হঠাৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল, "কথাগুলো তোর শুনতে ভাল লাগল না, না? আমি জানতুম তোর ভাল লাগবে না। ছোটবেলায় কারোরই তা ভাল লাগে না রে। আমারও ভাল লাগত না আগে। কিন্তু যখন বড় হলুম তখন বুঝতে পারলুম মানুষের পক্ষে সব চেয়ে বড় কাজ হল মানুষকে ভালবাসা, মানুষের কষ্ট দূর করা, দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করা।"

বাদল জিজ্ঞেস করলে, "তাহলে ফুটবল খেলাটাও তো খারাপ?"

সাধুবাবা বললে, "না রে, কবিতা লেখাও কি খারাপ কাজ আমি বলেছি? কবিতা লেখাকে যদি খারাপ কাজ বলি তাহলে তো রবি ঠাকুরকেও খারাপ লোক বলা হয়। কবিতা লেখা ভাল, কিন্তু সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ রেখে যদি দিনরাত কবিতা লেখা নিয়ে কেউ পড়ে থাকে, সেইটেই খারাপ। আর তা ছাড়া, সবাই তো রাধাচরণ বটব্যাল কি রবি ঠাকুর হতে পারবে না।"

আমি বললাম, "তাহলে ওই যে আপনি বললেন ভাল্লুকের মাথার ঘিলু আর বাঘের চর্বি মধু দিয়ে মেড়ে খেলে কবি হওয়া যাবে?"

সাধুবাবা বললে, "হ্যাঁ, নির্ঘাত কবি হওয়া যাবে। কিন্তু তাতে বড় কবি হওয়া যাবে কিনা তা আগে বলা যাবে না।"

"কেন? আপনি তো ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ। আপনি তো অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব কিছু দেখতে পান এ কথা আমাকে বাদল বলেছে। আমি ভবিষ্যতে বড় কবি হব কি ছোট কবি হব বলতে পারেন না?"

সাধুবাবা কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটল, কোথা থেকে একটা কেউটে সাপ সড় সড় করে আমাদের দিকে আসতে লাগল।

আমরা ভয় পেয়ে যেখানে বসে ছিলুম সেখান থেকে লাফিয়ে উঠেছি। কী সর্বনাশ, আমাদের কামড়ে দেবে নাকি?

সাধুবাবা আমাদের দিকে চেয়ে বললে, "তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন, ও তোমাদের কিছু বলবে না।"

আমরা বললাম, "যদি কামড়ায় আমাদের?"

সাধুবাবা বললে, "কামড়াবে কেন তোমাদের মিছিমিছি? তোমরা ওর কী করেছ?"

বলে সাধুবাবা কেউটে সাপটার দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকতে লাগল, "আয় আয়, বাচ্চু আয়, এদিকে আয়—"

সাধুবাবার কথা শুনে সাপটা করলে কী, আস্তে-আস্তে সাধুবাবার কোলে গিয়ে উঠে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সাধুবাবাকে আদর করতে লাগল।

সাধুবাবা বিরক্ত হল। বললে, "আঃ, আবার এখন বিরক্ত করতে এলে কেন! দেখছ, এখন এদের সঙ্গে কাজের কথা বলছি, এখন কি বিরক্ত করতে হয়? তুমি দিন-দিন বড় দুষ্টু হচ্ছ, এখন চুপ করে বোসো।"

তারপর আমাদের দিকে চেয়ে সাধুবাবা বললে, "এর খিদে পেয়েছে কিনা তাই এই রকম দুষ্টুমি করছে।"

আমরা তো আরো অবাক। বললাম, "এ-সাপটাকে কোথা থেকে পেলেন? হিমালয় থেকে এনেছেন?"

সাধুবাবা হাসল। বললে, "না না, এই বেড়াপোতাতেই পেয়েছি। আমার খবর পেয়েই এখানে আমার কাছে এসে জুটেছে।"

"ও কোথায় থাকে?"

সাধুবাবা বললে, "কেন, আমার কাছেই থাকে।"

"রাত্তিরবেলায় কোথায় থাকে? কোথায় শোয়?"

সাধুবাবা বললে, "আর কোথায় শোবে, আমার কাছেই শোয়।"

আমরা তখনও ওই দৃশ্য দেখে থর-থর করে ভয়ে কাঁপছিলাম। সাপ কোলে নিয়ে আদর করার ঘটনা আমরা আগে কখনও দেখিনি।

সাধুবাবা তখন সাপটার সঙ্গে একমনে এক-তরফা কথা বলে চলেছে, "ছিঃ, অত দুষ্টুমি করে না, এরা সবাই নিন্দে করবে তোমার। চুপটি করে বোসো।"

আমরা তখন অবাক হয়ে সব দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, এ কী কাণ্ড! সাধুবাবার কী অদ্ভুত ক্ষমতা। কেউটে সাপের মত ভয়ঙ্কর জন্তুকেও কেমন আশ্চর্যভাবে বশ করে ফেলেছে!

বাদল আমাকে কানে কানে বললে, "চল, আমরা চলে যাই, সাধুবাবা এখন বোধহয় খাওয়া দাওয়া করবে।"

খানিক পরে আমরা উঠে পড়লাম। সাধুবাবা বললে, "তোমরা আবার এসো।"

আমরা বাইরে চলে এলাম।

সাধুবাবার কথা আমরা বাইরের কাউকেই বললাম না। কারণ একবার জানাজানি হয়ে গেলেই সাধুবাবার কাছে ভিড় হয়ে যাবে। তখন আমাদের নিজেদের কাজ আর হবে না।

কিন্তু, সাধুবাবার কথা আর বেশি দিন চেপে রাখা গেল না। প্রথমে ভেবেছিলাম সাধুবাবার কথা বেড়াপোতার কাউকে না জানালেই চলবে। কারণ সাধুবাবাও তা চায় না। হিমালয়ের সাধু একটু নিরিবিলিতেই থাকতে চায়। শুধু দয়া করে বাদলের বাবার অসুখের জন্যেই বেড়াপোতায় এসেছিল সাধু-বাবা। সে-অসুখ সেরে গেলেই আবার যেখান থেকে এসেছিল সেই হিমালয়েই চলে যাবে।

আমার কবিতা লেখার সেই উৎসাহ তখন চলে গিয়েছিল। সত্যিই তো, কী হবে কবিতা লিখে। আমার সঙ্গে কোনও পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে ভাব নেই, আর তাছাড়াও আমি গ্রামের ছেলে, কে আমার কবিতা ছাপিয়ে আমাকে উৎসাহ দেবে!

সেদিন হঠাৎ খবর পেলাম পদ সামন্তর ছেলেকে তার বাড়িতেই সাপে কামড়েছে। রাত্রে বাড়ির সামনে মাটির দাওয়ার ওপর পদ সামন্তর ছেলে পরমেশ সামন্ত ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে হল কী যেন পায়ের কাছে কামড়াল। পা'টা চুলকোতে গিয়ে যেই হাত বাড়িয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে হাতেও কামড়ানোর যন্ত্রণা হল। পরমেশ যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল।

পরমেশের চিৎকারে বাড়ির সবাই জেগে উঠেছে। পাড়াময় রটে গেল খবরটা। আমরাও দৌড়তে দৌড়তে গেলাম পদ সামন্তর বাড়িতে। দেখি পরমেশ তখন মেঝের ওপর শুয়ে ছটফট্ করছে। ওঝা এসেছে। সেও তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে খুব। কত রকম মন্ত্র পড়ছে। ভিড়ে ভিড়ময় হয়ে গেছে বাড়িটা। সমস্ত বেড়াপোতা গ্রামের লোক এসে জুটেছে পদ সামন্তর উঠোনে।

ওঝা শেষপর্যন্ত অনেক চেষ্টা করলে। অনেক মন্তর পড়লে। আর আমরা সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে লাগলাম। আমাদের খুব কষ্ট হতে লাগল পরমেশের জন্যে। পরমেশ আমাদের বন্ধু। আমরা তার সঙ্গে অনেক ফুটবল খেলেছি। ইস্কুলেও এক ক্লাশে পড়ি। সে মারা যাবে, এ-কথাটা ভাবতেও আমাদের খুব খারাপ লাগল।

সাপে কামড়েছিল মাঝ রাত্তিরে, আর তখন বেলা বারোটা।
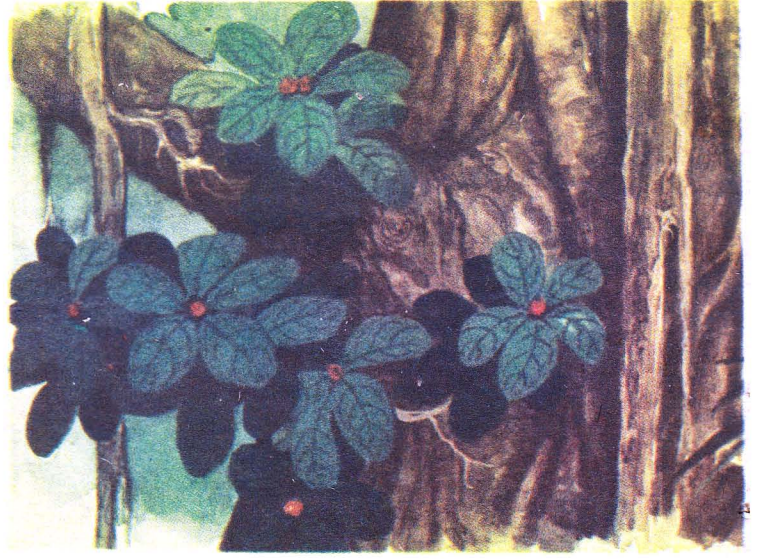
তখনও কিছু উপকার হল না ওঝার মন্তরে। ওঝা মশাই হাল ছেড়ে দিলে।

তখন বাদল বললে, "আমার সাধুবাবাকে ডেকে আনব ভাই? সাধুবাবা হয়ত বাঁচাতে পারে পরমেশকে।"

বললাম, "তাই চল্, সাধুবাবা নিশ্চয়ই পরমেশকে বাঁচিয়ে দেবে।"

দৌড়ে গেলাম দু'জনে সাধুবাবার কাছে। সাধুবাবা তখন চুপচাপ বসে ধ্যান করছিল। আমাদের দেখে তার ধ্যান ভাঙল।

সাধুবাবা বললে, "কী খবর? এমন অসময়ে?"

সমস্ত কথা বুঝিয়ে বললাম। সাধুবাবা সব শুনে বললে, "ঠিক আছে, তোমরা বলছ তাই যাচ্ছি। কিন্তু এ-রকম রোজ-রোজ আমাকে ডেকো না—এতে আমার সাধনার ক্ষতি হয়।"

বলে তৈরি হয়ে নিলে। তারপর সাধুবাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে চললাম পদ সামন্তর বাড়ি। সেখানে তখন পদ সামন্তর আত্মীয়-স্বজনের কান্না-কাটি পড়ে গেছে। পরমেশ যে মারা গেছে সে-সম্বন্ধে তখন আর কারো সন্দেহ নেই।

যেখানে পরমেশ অসাড় হয়ে শুয়ে পড়ে ছিল, সেখানে নিয়ে গেলাম সাধুবাবাকে। সাধুবাবার সেই গোঁফ-দাড়ি ভর্তি মুখের চেহারা, কপালে সিঁদুরের মস্ত বড় টিপ, বড় বড় চোখ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর পায়ে খড়ম আর গেরুয়া কাপড়, খালি গা দেখে সবাই চমকে উঠেছে। চমকে যেমন উঠেছে তেমনি তাদের মনে আশাও জেগেছে। হয়ত এবার পরমেশ বাঁচলেও বাঁচতে পারে।

পদ সামন্ত মশাই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এঁকে তোমরা কোথা থেকে আনলে বাবা?"

আমি বললাম, "ইনি হিমালয়ের সাধুবাবা, মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে বেড়াপোতায় এসেছেন—"

সাধুবাবা বললে, "এক ঘটি কাঁচা দুধ দেখি।"

কাঁচা দুধ এক ঘটি এল।

সাধুবাবা আবার বললে, "একে ধরাধরি করে ঘরের ভেতরে নিয়ে চলো।"

আমরা দু'তিনজন মিলে তাই করলাম। ঘরের ভেতরে একটা মাদুর পেতে তার ওপরে অজ্ঞান-অচৈতন্য পরমেশকে শুইয়ে দিলাম।

সাধুবাবা বললে, "এবার তোমরা সবাই বাইরে যাও আমি দরজায় খিল দিয়ে দেব। আর যতক্ষণ না আমি দরজা খুলে বাইরে আসব ততক্ষণ কেউ আমাকে বিরক্ত করবে না। আর দরজায় ঠেলবে না।"
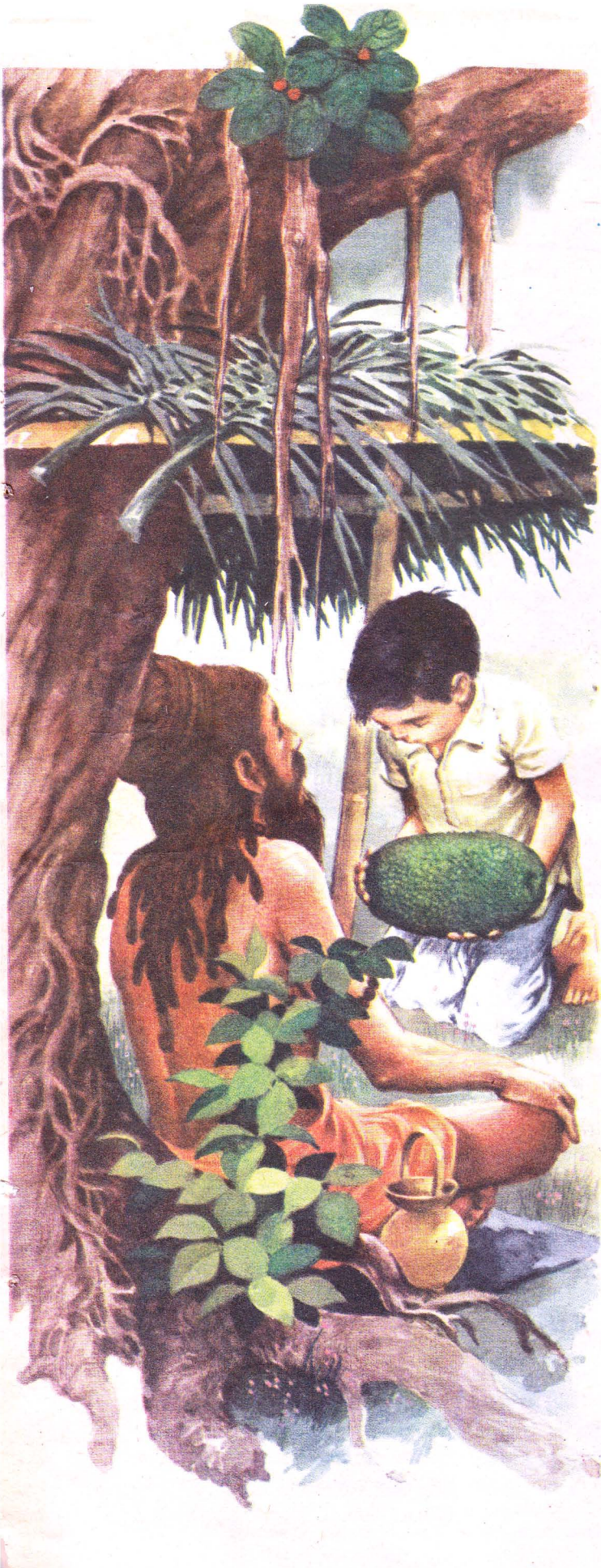
তা সাধুবাবার কথামত তাই-ই হল। সাধুবাবা ভেতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে। আমরা সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আধ ঘণ্টা কেটে গেল, এক ঘণ্টা কেটে গেল। সাধুবাবা তখনও দরজা খোলে না। কিন্তু তখনও লোকে আশা করতে লাগল পরমেশ এবার নিশ্চয় বেঁচে উঠবে।

তারপর যখন ঘণ্টা দুয়েক কাটল তখন সাধুবাবা দরজা খুলে বেরিয়ে এল। বললে, "রোগী বেঁচে গেছে, উঠে বসেছে।"

কথাটা শুনেই হুড়-হুড় করে সব লোক ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কে আগে ভেতরে যেতে পারবে তারই প্রতিযোগিতা লেগে গেল। দেখা গেল সাধুবাবার কথাই সত্যি। পরমেশ তখন উঠে বসেছে মাদুরের ওপর। তাকে দেখে মনে হল যেন সে এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল। সবাইকে দেখে পরমেশ বললে, "এখানে এত লোকজন কেন?"

সাধুবাবা সকলের চোখের আড়ালে কখন বাইরে বেরিয়ে চলে গেছে কেউই টের পায়নি। সকলেই তার খোঁজ করতে লাগল। কোথায় গেল সাধুবাবা? সাধুবাবা কোথায় থাকে? তার বাড়ি কোথায়? এত বড় গুনিন গাঁয়ে আছে, অথচ কেউ তার হদিশ পায়নি এও একটা আজব কাণ্ড! সাধুবাবা তো টাকা-পয়সা-প্রণামী কিছুই নিলে না।

আমরা কাউকেই কিছু বললাম না। কারণ যদি সকলকে সাধুবাবার আস্তানার কথা বলি তাহলে সেখানে গিয়ে সবাই ভিড় করবে। সবাই আমাদেরই জিজ্ঞেস করতে লাগল, "সাধু-বাবাকে তোমরা কোথা থেকে এনেছিলে?"

সাধুবাবা কি সমস্ত রোগই সারাতে পারে? বেড়াপোতার সকলেরই কিছু-না-কিছু পোষা রোগ আছে। কারো গেঁটে বাত, কারো অম্বল। কারো সন্তান হয় না, কারো ছেলে পাগল—সকলেরই দরকার সাধুবাবাকে। সাধুবাবাকে দিয়ে তারা তাদের রোগ সারিয়ে নেবে।

কিন্তু কেউ সাধুবাবার কোনও পাত্তা পেল না।

আমরা দু'জন নিজেরাই সাধুবাবার অলৌকিক কাণ্ড দেখে তখন অবাক হয়ে গিয়েছি। আমরা পরমেশদের বাড়ি থেকে তখন নিজেদের বাড়ি চলে এলাম।

বাদল বললে, "বিকেলবেলা সাধুবাবার আড্ডায় যাব, বুঝলি? তুই রেডি থাকিস।"

বিকেল বেলার দিকে সকলের নজর এড়িয়ে আমরা সাধুবাবার আস্তানায় গেলাম। সাধুবাবা বোধহয় আমাদেরই আসার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

আমরা যেতেই সাধুবাবা বললে, "আমার আস্তানার কথা তোমরা কাউকে বলোনি তো?"

আমরা বললাম, "আপনি বারণ করে দিয়েছিলেন, তাই বলিনি।"

সাধুবাবা বললে, "না, বোলো না। তাতে আমাকে বিরক্ত করবে সবাই। আমার সাধনার ক্ষতি হবে।"

আমরা বললাম, "কিন্তু আপনার খোঁজ পেলে তাদের সকলের খুব উপকার হত সাধুবাবা। অনেকের অনেক রকম অসুখ আছে, আপনি তাদের রোগ সারিয়ে দিলে তারা খুব উপকার পেত।"

সাধুবাবা বললে, "তোমরা এখনও ছোট ছেলে তো, তাই বুঝতে পারো না কেন আমি সকলের সঙ্গে দেখা করি না। মানুষের সুখ যেমন থাকা দরকার, তেমনি দুঃখটাও খুব দরকারী তার পক্ষে। দুঃখের মধ্যেই মানুষ নিজেকে চিনতে পারে, আর মানুষ নিজেকে যদি চিনতে না পারে তো কোনও দিন কাউকেই চিনতে পারবে না।"

আমরা সাধুবাবার কথা কিছুই সেদিন বুঝতে পারিনি। সাধুবাবা আমাদের মুখের চেহারা দেখেই বুঝতে পারলে যে, আমরা তার কথা বুঝতে পারিনি।

আমরা বললাম, "আপনি তো বাঙালী, আমরাও বাঙালী। আপনি আমাদের মত সংসারের মধ্যে না থেকে সাধু হয়ে গেলেন কেন?"

সাধুবাবা বললে, "সে অনেক কথা। দেখ, আমাদের স্কুলের একজন মাস্টার-মশাই ছিলেন। তিনি আমাদের একদিন একটা গল্প বললেন। গল্পটা পৃথিবীর সৃষ্টির সময়কার। ঈশ্বর যখন আমাদের এই পৃথিবী সৃষ্টি করলেন তখন এখানকার জীবজন্তু, মানুষ কিছুরই সৃষ্টি হয়নি। তা প্রথমে তিনি মাত্র চার রকম জীব সৃষ্টি করলেন। মানুষ, গাধা, কুকুর আর শকুন। তিনি ঠিক করলেন যে, সকলেরই পরমায়ু হবে মোটা-মুটি চল্লিশ বছর। চল্লিশ বছরের পর আর কেউ বাঁচবে না। সবাই যখন সেই হুকুম নিয়ে চলে আসছে তখন মানুষের মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি গজাল।

"মানুষ গাধাকে ডেকে বললে, ভাই গাধা, তুমি চল্লিশ বছর পরমায়ু নিয়ে কী করবে মিছিমিছি? তোমাকে তো সারাজীবন মোট বয়েই বেড়াতে হবে। তার চেয়ে বরং তুমি তোমার পরমায়ু থেকে আমাকে কুড়িটা বছর দিয়ে দাও না, তাতে তুমি কুড়ি বছর মোট বওয়া থেকে রেহাই পাবে।

"গাধা ভেবে দেখলে কথাটা সত্যি। কেন মিছিমিছি সে পুরো চল্লিশ বছর খেটে মরবে। তার চেয়ে যত সকাল-সকাল মুক্তি পাওয়া যায় ততই ভাল। সে রাজি হয়ে গেল। সে নিজের কুড়ি বছর পরমায়ু দান করে দিলে মানুষকে। তাতে মানুষ নিজের পরমায়ু চল্লিশ থেকে বাড়িয়ে ষাট করে নিলে।

"তারপর মানুষ কুকুরের কাছে গিয়ে সেই একই প্রস্তাব দিলে। কুকুরটা সব ভেবেচিন্তে তার পরমায়ু থেকে কুড়িটা বছর দিয়ে দিলে মানুষকে। সেও ভেবে দেখলে সত্যিই তো, চল্লিশ বছর ধরে সারা রাত জেগে জেগে মনিবের বাড়ি পাহারা দেওয়া আর তার দেওয়া এঁটো-কাঁটা খাওয়ার চেয়ে সকাল-সকাল মুক্তি পাওয়াই ভাল।

"মানুষ নিজের পরমায়ুর সঙ্গে তখন আরো কুড়ি বছর যোগ করে নিলে। মোট পরমায়ু তখন তার আশি বছর।

"তারপরে সে গেল শকুনির কাছে। সেও সব ভেবেচিন্তে মানুষকে নিজের পরমায়ুর কুড়ি বছর দিয়ে দিলে। তখন সব মিলিয়ে মানুষের পুরো পরমায়ুর মেয়াদ দাঁড়াল একশো বছর।

"অর্থাৎ মানুষের আসল জীবনের মেয়াদ হল চল্লিশ বছর। চল্লিশ বছর পর্যন্ত সে মানুষের মতই বেঁচে থাকে। তারপর চল্লিশ থেকে ষাট বছর বয়েস পর্যন্ত বাঁচে গাধার মত। তার মানে সংসারের ভার বয়ে বয়ে বেড়ানোই তার আসল কাজ হয় তখন। ষাট থেকে আশি বছর বয়েস পর্যন্ত কাটে কুকুরের মত জীবন। তখন ছেলে মেয়ে বড় হয়, তারা বাবাকে সংসার পাহারা দেবার জন্যে বাড়িতে রেখে নিজেরা আরামে এখানে-ওখানে দেশে-বিদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কিম্বা সিনেমা-থিয়েটার দেখে। ষাট থেকে আশি বছর বয়েস পর্যন্ত মানুষ তাই কুকুরের জীবনই যাপন করে। ছেলে-মেয়ে-বউ - নাতিরা তাকে খেতে দিলে তবে সে খেতে পায়।

"আর আশি বছর বয়েসের পর তখন মানুষ হয়ে যায় শকুনের মত। তখন কেউ আর তাকে দেখে না, কেউ তাকে ভাল করে খেতেও দেয় না। সে যে বাড়িতে বেঁচে আছে সে-কথাটিও কারো মনে থাকে না তখন। তাই লুকিয়ে-লুকিয়ে সে নিজের দাবি আদায় করতে চেষ্টা করে সব সময়। বাড়ির অন্য লোকদের কাছ থেকে সে তার পাওনা-গণ্ডা ছোঁ মেরে নিতে চেষ্টা করে। এই হচ্ছে মোটামুটি মানুষের জীবনের ইতিহাস।"

সাধুবাবা গল্প শেষ করলে। বললে, "সেই পৃথিবীর প্রথম মানুষের ভুলের জন্যেই আমরা আজ এত কষ্ট পাচ্ছি।"

আমরা জিজ্ঞেস করলুম, "তারপর?"

সাধুবাবা বলতে লাগল, "এই গল্পটা শুনে আমার মনের ভেতরে কী রকম একটা উৎসাহ জাগল। আমি ভাবলুম আমি আমার জীবনটাকে অন্য লোকের মত এইভাবে হেলায় হারাতে দেব না। অত দিন যদি বাঁচি তো মানুষের মতই আমি বাঁচব। এই ভেবে একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে সোজা হিমালয়ে চলে গেলুম, আর তার পর থেকে আমি সেখানেই আছি। মানুষের কল্যাণের জন্যেই মাঝে-মাঝে শুধু আমি মানুষের সমাজে আসি, তারপর আবার একদিন হিমালয়ে চলে যাই। এই যেমন এবার তোমাদের এই বেড়াপোতায় এসেছি।"

গল্প শুনতে-শুনতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। সাধুবাবার তখন ধ্যানে বসবার সময়। আমরা দু'জনে চলে এলুম। সাধুবাবা বললে, "তোমরা কালকে আবার এসো।"

বেড়াপোতায় তখন সব লোক সাধুবাবাকে দেখবার জন্যে ছটফট করছে। সবাই আমাদের জিজ্ঞেস করছে, "কোথায় গেল সেই সাধুবাবা? একবার সেই সাধুবাবার কাছে আমাদের নিয়ে চলো।"

আমরা জবাবে কিছুই বললুম না। কারণ সাধুবাবার বারণ ছিল। একটু বেলা হবার পর আমি আর বাদল মনসা-তলার ঘাটের দিকে গেলুম। কিন্তু গিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড! সাধুবাবার সেই গুহা খালি। সাধুবাবা সেখানে নেই। আমরা অনেকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করলুম। কিন্তু সাধুবাবা আর এল না। আমরা হতাশ হয়ে বাড়ি চলে এলাম। বুঝলাম সাধুবাবা আবার হিমালয়ে চলে গেছে।

কিন্তু বিকেল বেলার দিকে একদল পুলিস-কনস্টেবল আমাদের বেড়াপোতায় এসে হাজির হল।

আমরা সমস্ত গাঁয়ের লোক তো পুলিস দেখে ভয়ে চমকে উঠলুম। পুলিস তো আমাদের বেড়াপোতায় বড় একটা আসে না! কী হল? বেড়াপোতায় চুরি-ডাকাতি কিছু হয়েছে নাকি?

কিন্তু না, তা নয়। দারোগাবাবু বললে, "আমরা খবর পেয়েছি এখানে একজন স্বদেশী-ডাকাত এই বেড়াপোতায় লুকিয়ে আছে। আমরা তাকেই খুঁজতে এসেছি। এ-গ্রামে আপনারা কেউ তাকে দেখেছেন?"

বাদল বললে, "না, কোন স্বদেশী-ডাকাত আমাদের গ্রামে আসেনি।"

দারোগাবাবু বললে, "কিন্তু কোন নতুন লোক? নতুন লোক কেউ এসেছে এখানে?"

বাদল বললে, "না, একজন সাধুবাবা শুধু এসেছিল হিমালয় থেকে। জটাজুটধারী সাধুবাবা।"

দারোগাবাবু বললে, "তাহলে ওই-ই সেই স্বদেশী-ডাকাত। সাধুবাবা সেজে এখানে লুকিয়ে ছিল আর কী। তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারের ওয়ারেন্ট আছে।"

বাদল বললে, "কিন্তু সাধুবাবা তো আবার হিমালয়ে চলে গেছে।"

দারোগাবাবু বললে, "আসলে ডাকাতটা হিমালয়ে চলে যায়নি, নিশ্চয় বেড়াপোতার কাছাকাছি কোনও জায়গায় লুকিয়ে আছে। ওই স্বদেশী-ডাকাতটাই লাটসাহেবকে গুলি করে পালিয়েছে। তাই তাকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

ছবি বিমল দাশ

সম্পূর্ণ উপন্যাস

ডুংগা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ছবি সমীর সরকার

ডুংগা কোনো দিন এ-রকম করে না। সে চুপ করে শুয়ে থাকে দরজার পাশে। এমনভাবে সে দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে থাকে যে সহজে তার দিকে নজরই পড়ে না। বাইরের দরজার কাছে নতুন কোনো লোক এলে সে উঠে দাঁড়ায়, লোকটির কাছেও যায় না, ভয়ও দেখায় না, শুধু মুখটা উঁচু করে একবার ডাঁউ করে ডাকে। তখন তার পুরো শরীরটা থাকে দরজা জুড়ে। কেউ ঢুকতে পারবে না। বাড়ির ভেতর থেকে কেউ এসে যখন বলবে, “ডুংগা, সরো!” অমনি ডুংগা লক্ষ্মী ছেলের মতন মাথা নিচু করে সরে যাবে।

বাড়ির সামনে একটা ছোট্ট উঠোন, তারপর লোহার গেট। সেই লোহার গেটে একটা টিনের প্লেটে ইংরেজি-বাংলায় নোটিস লেখা ঃ

Beware of Dogs.
সাবধান, কুকুর আছে
নিজ দায়িত্বে ঢুকিবেন

এরকম লেখা দেখলেই অনেকে ভয় পায়। গেটের এ-পাশে

কেউ চট করে পা বাড়ায় না। যদিও ডুংগা কক্ষনো কারুকে কামড়ায়নি। এ-পাড়াতেই আরও পাঁচটা বাড়িতে কুকুর আছে, কিন্তু সবাই বলে, ডুংগার মতন ভদ্র-কুকুর আর কেউ নয়। আর দেখতেও তাকে কী সুন্দর। ঠিক যেন একটা সাদা রঙের ছোট চিতাবাঘ।

কিন্তু সেদিন সন্ধেবেলা একটা অন্যরকম ব্যাপার হয়ে গেল।

সেদিন বিকেল থেকেই খুব বৃষ্টি। সন্ধে পর্যন্তও একটানা বৃষ্টি চলল। রাস্তাঘাট ফাঁকা। আস্তে আস্তে জল জমছে। বৃষ্টির জন্য বিকেলবেলা সুজয়ের সঙ্গে ডুংগার লেকে বেড়াতে যাওয়া হয়নি সেদিন। সেজন্য তার মন খারাপ। প্রত্যেকদিন স্কুল থেকে ফিরেই সুজয় ডুংগাকে নিয়ে লেকে যায়। সেখানে একটা রবারের বল নিয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে ছুটে-ছুটে খেলে। হঠাৎ কোনো-কোনো লোক একদম পায়ের কাছে ডুংগাকে দেখে ভয় পেয়ে থমকে যায়। কিন্তু সুজয় যেই ডাকে 'ডুংগা এসো', অমনি সে মাথা নিচু করে বাতাস কেটে সাঁ করে দৌড়ে চলে যায়। সুজয়ের পায়ে গিয়ে মাথা ঘষে দেয় একবার। তখন লোকেরা সুজয়কে বলে, বাঃ, তোমার কুকুরটা তো খুব কথা শোনে!

ডুংগার যখন চার মাস বয়েস তখন সে এ-বাড়িতে এসেছে। সুজয়ের বাবা কুকুর ভালবাসেন না। বাড়িতে কুকুর, বিড়াল, টিয়াপাখি কিছুই পোষা পছন্দ করেন না তিনি। তিনি ভালবাসেন ফুলগাছ। ওদের বাড়ির ছাদে অন্তত একশোটা টবে নানা রকম ফুলগাছ, উঠোনেও রয়েছে অনেকগুলো জুঁই আর বেলফুলের গাছ। তিনি নিজে সেইসব গাছের যত্ন করেন। কিন্তু একদিন সুজয়ের ছোটমাসী বেড়াতে এসে বললেন, "আমাদের বন্ধু কর্নেল কাপুর একটা ডালমাশিয়ানের বাচ্চা দিতে চাইছেন, তোমাদের চেনাশুনো কেউ নেবে? আমার তো বাড়িতে আর-একটা কুকুর রয়েছে। উনি বিনা পয়সায় দিচ্ছেন, এমনিতে কিন্তু ডালমাশিয়ানের খুব দাম!"

সুজয় তক্ষুনি লাফিয়ে উঠে বলেছিল, "আমি নেব, ছোটমাসী, আমি নেব...।"

সুজয়ের মা বললেন, "কুকুর পুষবি কী? তোর বাবা রাগ করবেন।"

"তুমি একটু বাবাকে বুঝিয়ে বলো, মা। তুমি বললেই হবে।"

"উনি যে কুকুর একদম পছন্দ করেন না।"

"তুমি একটু বলো মা। আমার নিজের কাছে রাখব। বাবার কাছে যাবেই না একদম।"

সুজয়ের বাবা প্রথমে শুনেই স্রেফ 'না' বলে দিলেন।

তারপর দুদিন সুজয় আর বাড়ির কারুর সঙ্গে কথা বলে না। ভাল করে খায় না। শুধু নিজের ঘরে চুপচাপ শুয়ে থাকে।

সুজয়ের মা আবার গিয়ে বাবাকে বললেন, "আহা, ছেলেটা এত করে চাইছে।"

বাবা তখন বললেন, "ওকে বলো, এবার পরীক্ষায় যদি ফার্স্ট থেকে ফোর্থের মধ্যে হতে পারে, তাহলে ভেবে দেখা যাবে।"

দশদিন বাদেই সুজয়ের পরীক্ষা। আগের বার সে এইট্‌থ হয়েছিল, এবার এমন জোর-জবরদস্তি করে পড়াশুনো করল যে সেকেণ্ড হয়ে গেল। আর বাবার আপত্তি করার কোনো কারণ রইল না।

তারপর থেকে ঐ কুকুরই হল সুজয়ের বন্ধু। সুজয় যখন পড়াশুনো করে, তখন ডুংগা চুপ করে শুয়ে থাকে তার পায়ের কাছে। অন্য সময় খেলা করে এক সঙ্গে। স্কুলে গিয়েও মাঝে মাঝে ডুংগার জন্য মন কেমন করে সুজয়ের।

ডুংগা বাড়ির সবারই কথা শোনে। কোনো জিনিসপত্র নষ্ট করে না। একদিন তাদের বাড়ির ছাদে একটা চোর উঠেছিল, ডুংগার জন্যই সে ধরা পড়ে যায়। চোরটা পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাবার চেষ্টা করতেই ডুংগা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে চিত করে ফেলে দেয়। তারপর বুকের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে ডাকতে থাকে। ডুংগা অনেক দূর থেকে ঠিক বাঘের মতন বিদ্যুৎ-গতিতে লাফিয়ে পড়তে পারে। এত শান্ত কুকুর যে হঠাৎ এত জোরে লাফায়, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। চোরটা 'বাবা রে, মা রে, বাঁচান' বলে এমন কাঁদতে শুরু করে দিল যে, হেসে ফেলেছিল সবাই।

ডুংগা সুজয়ের বাবাকে দেখলেই দৌড়ে এসে পা চেটে দেয়। প্রথম প্রথম উনি খুব বিরক্ত হতেন। চেঁচিয়ে বলতেন, "জয়, তোমার কুকুরকে সরিয়ে নিয়ে যাও!" তারপর কিন্তু আস্তে-আস্তে উনি নিজেই ওকে আদর করতে শুরু করলেন। কাছে এলে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। নিজে পার্ক সার্কাস বাজার থেকে মাংস কিনে আনেন ওর জন্য।

সুজয় প্রথমে ওর নাম রেখেছিল টাইগার। প্রথম প্রথম ওকে ডেকে বলত, 'টাইগার, কাম হিয়ার! টাইগার, সীট ডাউন।' তাই শুনে ওর বাবা ওকে বকেছিলেন একদিন। কুকুরের ইংরিজি নাম রাখতে হবে কেন? কুকুরের সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলতেই বা হবে কেন? কুকুর কি সাহেব? কুকুরের মাতৃভাষা কি ইংরিজি? বাঙালী হয়েও কুকুরের সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলা হচ্ছে বোকামি। ওদের যে-ভাষা শেখাবে, সেটাই শিখবে।

তখন সুজয় নিজেই ওর নাম বদলে রেখেছে ডুংগা। কারণ এক-এক সময় ও ঠিক ঐ রকম শব্দ করে ডাকে। সুজয় ওকে বাংলাতেই সব কিছু শিখিয়েছে। সুজয় যদি বলে 'শুয়ে পড়ো', ও অমনি মাটির ওপর ধপাস করে শুয়ে পড়বে। সকালবেলা যদি ওকে বলা যায়, 'ডুংগা, যাও, কাগজটা নিয়ে এসো তো!' ও তক্ষুনি দরজার কাছে ছুটে গিয়ে গোল-করে-বাঁধা খবরের কাগজ মুখে করে নিয়ে আসবে।

কিন্তু সেদিন সন্ধেবেলা সব অন্যরকম হয়ে গেল।

সেদিন বাবার বড়মামা হঠাৎ এসে উপস্থিত। বাবার এই বড়মামা এক সময় আফ্রিকায় থাকতেন। সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজে। এখন ভারতবর্ষেই থাকেন, কিন্তু কোনো এক জায়গায় বেশি দিন থাকেন না। বোম্বাই, দিল্লি, কলকাতা, এলাহাবাদ—যেখানে-যেখানে আত্মীয় স্বজন আছে, তাদের এক-একজনের কাছে গিয়ে কিছুদিন করে থাকেন। উনি গেলে সবাই খুব খুশি হয়। কেননা, উনি সবাইকে রোজ-রোজ সিনেমা-থিয়েটার দেখান। আর হাজার-হাজার গল্প বলেন, কত যে গল্প উনি জানেন, তার ঠিক নেই।

বাবার সেই হারুমামা সুজয়দের এ-বাড়িতে এসেছিলেন আড়াই বছর আগে। তখন তিনি এ-বাড়িতে কুকুর দেখেননি। আর তিনি আসবার আগে কখনো চিঠি লিখেও জানান না, হঠাৎ-হঠাৎ চলে আসেন।

সেদিন ট্রেন থেকে নেমে হাওড়া স্টেশনে কোনো ট্যাক্সি পাননি। বাসে চেপে চলে এসেছিলেন ঢাকুরিয়া। তারপর বাকি রাস্তাটুকু বৃষ্টির মধ্যে পায়ে হেঁটে এসেছিলেন।

এর ঠিক আগেই তিনি গিয়েছিলেন কোচবিহার। সেখানে তাঁর ছোট ভাই থাকেন। বর্ষার সময় কোচবিহারে খুব বৃষ্টি হয় বলে তিনি সেখানে একটা ছাতা কিনে ফেলেছিলেন। সেই ছাতাটাই হল সর্বনাশের মূল।

উনি গেটের বাইরে কুকুর সম্পর্কে সাবধান-বাণীটা দেখলেন না। তাড়াতাড়ি গেট ঠেলে ঢুকে পড়লেন। এক হাতে একটা ছোট সুটকেশ, আর এক হাতে খোলা ছাতা। দৌড়ে উঠোনটা পেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। বাস থেকে নামার পরই উনি খানিকটা কাদার মধ্যে পা দিয়ে ফেলেছিলেন। জুতোয় ধপাস-ধপাস শব্দ করে উনি সেই কাদা ঝাড়তে লাগলেন।

বিকেলে বেড়াতে যাওয়া হয়নি বলে মন খারাপ ছিল ডুংগার। একটু আগে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে সে দেখল যে, ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরা একটা অচেনা লোক পায়ের কাবুলি জুতোয় ধুপধাপ শব্দ করছে।

সে বেশ বিরক্ত হয়ে একবারের বদলে দু'বার ডাকল—ডাঁউ, ডাঁউ!

বাবার হারুমামা এই প্রথম ডুংগাকে দেখলেন। তিনি আফ্রিকায় থাকার সময় অনেক বাঘ-সিংহ দেখেছেন। সুতরাং একটা কুকুর দেখে ভয় পাবেন কেন? তিনি নিজের মনেই বললেন, "আরে, এই কুকুরটা আবার কোথা থেকে এল!"

তিনি আবার জুতোর ধুপধাপ শব্দ করতে লাগলেন।

ডুংগা এবার দরজা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আরও গম্ভীর গলায় ডেকে উঠল তিনবার।

ততক্ষণে তিন তলার ঘরে বসে সুজয় শুনতে পেয়েছে ডুংগার ডাক। সে একটু অবাক হল। নিশ্চয়ই কোনো গণ্ড-গোল হয়েছে, নইলে ডুংগা এত বার ডাকবে কেন? দোতলা থেকে মা-ও বললেন, "দ্যাখ তো, ডুংগা এত চ্যাঁচাচ্ছে কেন?" সুজয় নীচে নেমে আসতে লাগল, কিন্তু তার আগেই হয়ে গেল যা হবার!

বাবার হারুমামা পরপর দুটো ভুল করলেন। তিনি ডুংগাকে বললেন, "এই সর্ সর্!" ডুংগা তার উত্তরে বলল, গর্র্ গর্র্! অর্থাৎ সে বলতে চাইল, কলিং বেল টিপছ না কেন? তোমার মতলব খারাপ নাকি? তুমি অচেনা লোক হয়েও আমাকে সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে চাইছ? বাবার হারুমামা তখন খোলা ছাতাটা ডুংগার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আরে সরে না কেন। কুকুরটা ভারি বেয়াড়া তো!"

বাবার হারুমামা জানেন না যে, ভাল জাতের কুকুরকে কক্ষনো খোলা ছাতা দিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করতে নেই। তাতে তারা ভয় পাবার বদলে আরও বেশি রেগে যায়। ডুংগা এবার গলার আওয়াজটা বদলে ফেলে ডাকল, ডাঁউ, ডুংগা! ডাঁউ, ডুংগা! অর্থাৎ সাবধান, আমি এখানে আছি।

এরপর দ্বিতীয় ভুলটা হল সত্যিই সাঙ্ঘাতিক। বাবার হারুমামা ছাতাটা দিয়ে ডুংগার নাকে জোরে একটা খোঁচা মেরে বললেন, "এই, হ্যাট্ হ্যাট্!"

ডালমাশিয়ানের নাকে কেউ খোঁচা মারে? এই কুকুর আর সব সহ্য করবে, কিন্তু নাকে আঘাত কিছুতেই সহ্য করে না। শুধু রাগ নয়, এতে তাদের অপমান হয়। এবার ডুংগা প্রাণ-কাঁপানো একটা ডাক দিল। তারপর চোখের নিমেষে লাফিয়ে ছাতাটা পার হয়ে এসে বাবার হারুমামার হাত কামড়ে ধরল।

ওঁর সব সাহস উপে গেল সেই মুহূর্তে। উনি চিৎকার করে উঠলেন, "ওরে বাবা রে, পাগলা কুকুর! মেরে ফেললে রে!"

চ্যাঁচামেচি শুনে সুজয়, তার মা আর দিদি সবাই দৌড়ে নেমে এসেছে। হারুমামা তখন ভয় পেয়ে মাটিতে বসে পড়েছেন আর ডুংগা তাঁর হাত কামড়ে ধরে আছে।

সুজয় দূর থেকে দেখেই বলল, "ডুংগা, ছাড় ছাড়!"

এই প্রথম ডুংগা সুজয়ের কথা শুনল না।

হারুমামা তখনো চ্যাঁচাচ্ছেন, "মেরে ফেললে, পাগলা কুকুর, ধরো, শিগগির ধরো।"

সুজয় এসে ডুংগার কান ধরে টেনে সরিয়ে আনবার চেষ্টা করল। ডুংগা তবুও আসবে না। সুজয় তার ঘাড়ের ওপর খুব জোরে দুটো চড় মেরে ধমক দিয়ে বলল, "ডুংগা, কথা শোনো, সরে যাও।"

ডুংগা তার কামড় খুলে এবার একটুখানি পিছিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু তার রাগ কমেনি। সে হিংস্রভাবে দাঁত বার করে গর্র্ গর্র্ করতে লাগল! হারুমামা বললেন, "ওটাকে সরিয়ে নিয়ে যা, পাগলা কুকুর, আবার কামড়াবে—"

এই কথা শুনে ডুংগা যেন সত্যিই আবার ঝাঁপিয়ে কামড়াতে এল।

এবার সুজয়েরও রাগ হয়ে গেল খুব। কুকুরটা হঠাৎ এরকম অবাধ্য হয়ে গেল? বাবার হারুমামা এত ভাল লোক, তাকে কামড়ে দিয়েছে। ডুংগা আবার লাফাতে যেতেই সুজয় তাকে আটকাবার জন্য পা বাড়াল। তবু ডুংগা এগিয়ে আসতেই সুজয়ের পা তার পেটে লাগল খুব জোরে।

মা বললেন, "জয়, দেখিস, সাবধান! ও খেপে গেছে মনে হচ্ছে।"

ডুংগা কিন্তু আর কিচ্ছু করল না। সুজয়ের মুখের দিকে একবার তাকাল মুখ তুলে, তারপর পেছন ফিরে দৌড়ে পালাল।

হারুমামা মাটির ওপর শুয়ে পড়েছেন। ওল্টানো ছাতাটা গড়াচ্ছে পাশে। উনি বললেন, "পাগলা কুকুর কামড়েছে, জলাতঙ্ক হবে, জলাতঙ্ক।"

ঠিক সেই সময় সুজয়ের বাবা এসে পৌঁছলেন। তিনি তো প্রথমেই দারুণ চমকে গিয়ে বললেন, "ওমা, এ কী? হারু-মামা, কী হয়েছে? মাটিতে শুয়ে আছেন কেন?"

হারুমামা বললেন, "জলাতঙ্ক...চোদ্দটা ইঞ্জেকশান...ওরে বাবা রে..."

সব শুনে বাবা আরও অবাক হয়ে বললেন, "ডুংগা কামড়েছে? সে তো কখনো কামড়ায় না! কত নতুন লোক আসে..."

তিনি হারুমামার হাতটা তুলে নিয়ে দেখলেন, সত্যিই ডুংগা দু-তিন জায়গায় কামড়ে রক্ত বার করে দিয়েছে। অবশ্য খুব বেশি দাঁত বসায়নি। বাঘের মতন কুকুর, ইচ্ছে করলে পুরো হাতখানাই খেয়ে নিতে পারত।

বাবা বললেন, "হারুমামা, উঠে পড়ুন। আমি ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছি!"

হারুমামা বললেন, "না, না, এমনি ওষুধে হবে না। ডাক্তার ডাক...জলাতঙ্ক...আমার সামনে এখন জল এনো না..."

যদিও বাড়ির সবাই বুঝল যে, এইটুকু কামড়ানোর জন্য ডাক্তার ডাকার দরকার নেই, কিন্তু হারুমামা বারবার ডাক্তারের কথা বলতে লাগলেন। ডুংগা বাইরের কোনো কুকুরের সঙ্গে মেশে না, তাছাড়া তাকেই ইঞ্জেকশান দেওয়ানো আছে।

বাবা তাঁর হারুমামাকে ধরাধরি করে এনে বৈঠকখানায় সোফার ওপর শুইয়ে দিলেন। তারপর সুজয়কে বললেন, "যা তো, অজয়কে একবার ডেকে নিয়ে আয়।"

ডাক্তার অজয় লাহিড়ীর চেম্বার রাস্তার মোড়েই। সুজয়দের সঙ্গে খুব চেনা। সুজয় তাঁকে কাকাবাবু বলে ডাকে। তিনি একজন রোগী দেখছিলেন, আরও অনেক রোগী অপেক্ষা করে আছে। সুজয় তাঁর চেয়ারের পাশে গিয়ে বলল, "এক্ষুনি একবার আমাদের বাড়িতে চলুন।"

অজয় ডাক্তার মুখ তুলে বললেন, "কেন, কী হয়েছে?"

নিজের পোষা কুকুর ডুংগা যে কারুকে কামড়েছে, সে-কথা বলতে লজ্জা হল সুজয়ের। এত পোষা কুকুর, এত প্রিয় কুকুর! কিন্তু সত্যিই তো কামড়েছে। সুজয় নিজের চোখে দেখেছে। সে ডাকলেও কথা শোনেনি। ডুংগা কি সত্যি পাগল হয়ে গেল?

সুজয় বলল, "চলুন না, তাড়াতাড়ি—"

"কী হয়েছে বলবি তো?"

"আমাদের বাড়িতে একজনকে কুকুরে কামড়েছে!"

"কাকে কামড়াল? কোন্ কুকুর? তোর কুকুর ডুংগা, না বাইরের কুকুর?"

অন্য রোগীদের একটু অপেক্ষা করতে বলে অজয় ডাক্তার হাতে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এলেন। রাস্তায় এসে আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কে কামড়েছে? ডুংগা? সে তো কক্ষনো কারুকে কামড়ায় না!"

নিজের মুখে ডুংগার দোষের কথা বলতে গিয়ে অপমানে সুজয়ের বুক ফেটে গেল। তবু তাকে বলতেই হল, "হ্যাঁ।"

"আশ্চর্য তো। ডুংগা তো কখনো কারুকে তাড়াও করে যায় না, অতি ভদ্র কুকুর!"

"আচ্ছা কাকাবাবু, ডুংগা হঠাৎ পাগল হয়ে যেতে পারে?" কথাটা বলার সময় সুজয়ের গলায় কান্না এসে গেল। অজয় ডাক্তার তার কাঁধ চাপড়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "না, না, বাড়ির কুকুর এমনি-এমনি পাগল হতে যাবে কেন?"

বাড়িতে এসে অজয় ডাক্তার হারুমামাকে ভাল করে পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, "বিশেষ কিছু হয়নি। হঠাৎ বিরক্ত হয়ে কামড়ে দিয়েছে। বেশি রাগলে মাংস ছিঁড়ে নিত।"

হারুমামা বললেন, "বিরক্ত মানে? কুকুর কি মানুষ যে যখন-তখন বিরক্ত হবে? কুকুরটা পাগল হয়ে গেছে নিশ্চয়ই!"

ডাক্তারবাবু বললেন, "পাগল হলে কি আর এত সহজে ছেড়ে দিত? পাগলা কুকুরকে থামানো যায় না!"

হারুমামা বললেন, "কিন্তু আমি দেখেছি, কুকুরটার ল্যাজ ঝুলে গিয়েছিল। পাগলা কুকুরের ল্যাজ ঝোলা থাকে। ওরে বাবা রে, শেষে কি জলাতঙ্ক রোগে মরব? আমায় এখনো ইঞ্জেকশান দিচ্ছ না কেন? বেশি দেরি হয়ে গেলে..."

এক-একজন লোক ওষুধ খেতে কিংবা ইঞ্জেকশান নিতে খুব ভালবাসে। বোঝা গেল, হারুমামাও সেইরকম একজন লোক। ইঞ্জেকশান না নিয়ে তিনি ছাড়বেন না।

অজয় ডাক্তার তখন তাঁকে কী যেন একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে দিলেন। আর দিলেন তিন দিনের খাবার ওষুধ। তারপর বললেন, "তিন দিন পরে আবার আপনাকে পরীক্ষা করে দেখব। যদি জলাতঙ্ক রোগের চিহ্ন দেখা যায়, তা হলে চোদ্দটা ইঞ্জেকশান দিতে হবে!"

চলে যাবার সময় অজয় ডাক্তার ফিসফিস করে বাবার কানে কানে বলে গেলেন, "কিছুই হয়নি, শুধু ওঁকে ভোলাবার জন্য একটা ভিটামিন ইঞ্জেকশান দিয়ে গেলাম, তাতে ক্ষতিও কিছু হবে না।"

ইঞ্জেকশান নেবার পর হারুমামা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। উঠে বসে বললেন, "কী একটা বিচ্ছিরি বাজে কুকুর পুষেছিস তোরা? ছ্যা ছ্যা! ভদ্দরলোক দেখলে চিনতে পারে না? আমি কি শিশি-বোতলওয়ালা না পিওন যে আমাকে দেখে তাড়া করে আসবে? কুকুর দেখেছিলাম বটে আফ্রিকার কঙ্গোতে। এক সাহেবের সতেরোটা কুকুর ছিল। ককার স্প্যানিয়েল, ডাক্শুন্, স্পিৎজ, গ্রে হাউণ্ড...সব কটা কুকুর এক সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। কী ট্রেনিং, সাহেব একবার শিস দিলেই ঝাঁক বেঁধে দৌড়ে আসে, এত সুন্দর দেখায় তখন..."

রাত্রে খেতে বসেও অনেক রকম কুকুরের গল্প হতে লাগল। কোন্ বাড়ির নতুন জামাইকে নাকি সে-বাড়ির পোষা কুকুর কামড়ে একেবারে মেরেই ফেলেছিল। কোথায় একটা অ্যাল-

সেশিয়ান হঠাৎ পাগলা হয়ে গিয়ে পরপর এগারোজন লোককে কামড়ে দিয়েছিল...
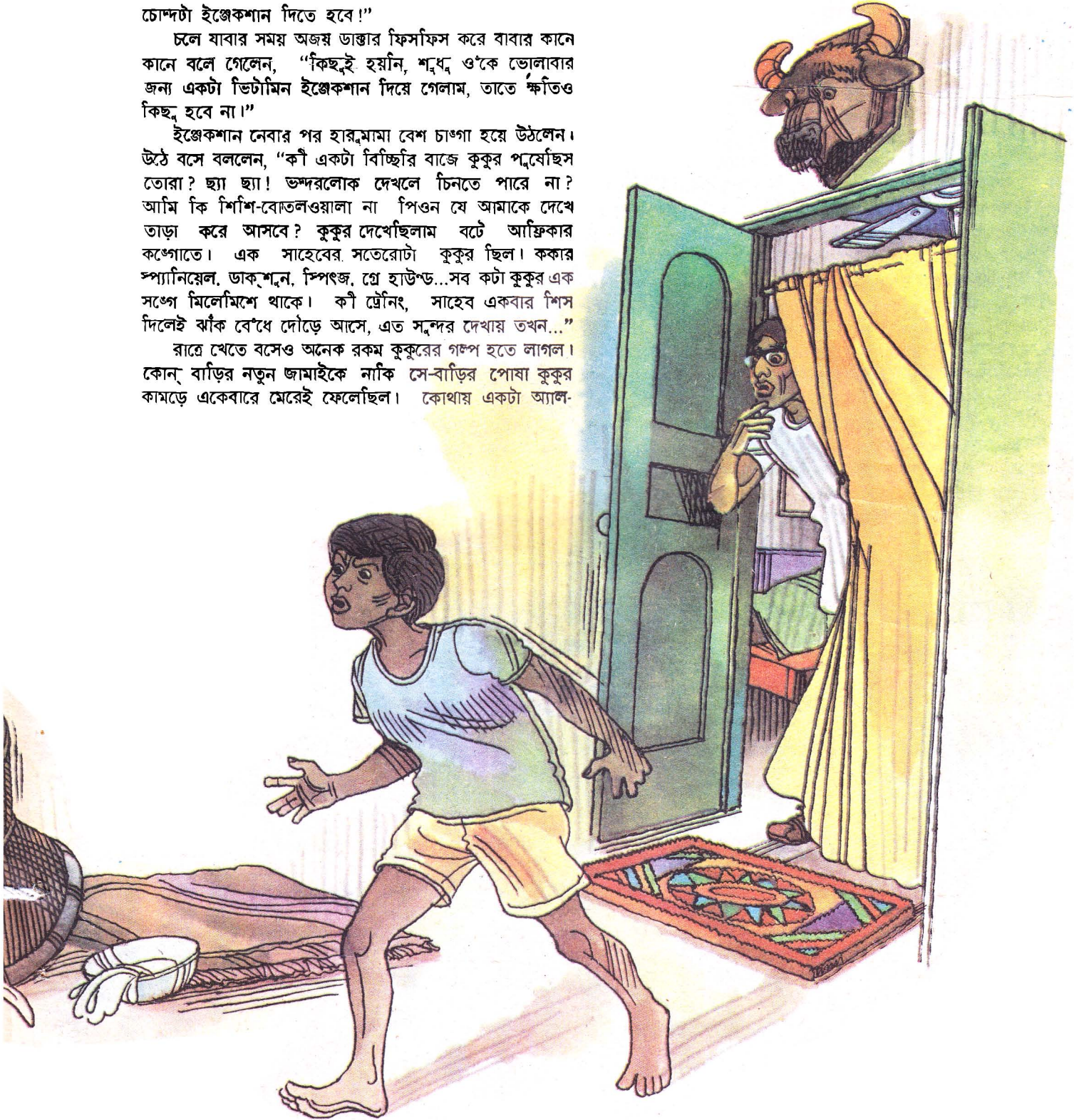
সুজয় মুখ শুকনো করে বসে আছে। সে এসব কিছুই শুনছে না। তার মনের মধ্যে শুধু একটাই কথা ঘুরছে। ডুংগা কোথায় গেল? সেই ঘটনার পর থেকে আর ডুংগাকে দেখা যায়নি। সুজয় এর মধ্যে দুবার সারা বাড়ি খুঁজে দেখে এসেছে। ডুংগার কথাটা এখানে সে বলতেই সাহস পাচ্ছে না। সে-কথা তুললেই সবাই নিশ্চয়ই তাকে বকুনি দেবেন।

হারুমামা সুজয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কুকুর পুষতে জানে সাহেবরা। বাঙালীরা কুকুরকে ঠিক মতন ট্রেনিং দিতেই জানে না।"

সুজয় মাথা নিচু করে হাত ধুতে উঠে চলে গেল।

রাতে শুতে যাবার আগে মা জিজ্ঞেস করলেন, "কুকুরটা গেল কোথায়? তাকে তো আর দেখছি না?"

বাবা বললেন, "বুঝতে পেরেছে তো যে দোষ করেছে। তাই কোথাও লুকিয়ে আছে নিশ্চয়ই।"

সুজয় বলল, "না, ও কোথাও নেই। আমি খুঁজে দেখেছি।"

মা বললেন, "কোথায় আর যাবে? ও তো বাড়ির বাইরে কক্ষনো যায় না! এ-বেলা তো খায়ওনি কিছু। গেটের কাছে ওর খাবার রেখে দে জয়। ও ঠিকই আসবে।"

প্রত্যেক রাত্রে ডুংগা গেটের সামনে বসে পাহারা দেয়। একদিনও তার নড়চড় হয়নি এ পর্যন্ত। ডুংগা একা-একা রাস্তাতেও যায় না কখনো। তাই গেটের কাছে তার জন্য মাংস রেখে দিয়ে সবাই শুতে চলে গেল।

শুয়ে-শুয়ে সারা রাত ছটফট করল সুজয়। তার ভাল করে ঘুম হল না। মাঝে মাঝেই বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখে সে জেগে উঠছিল অনেকবার।

২

ভোর হতেই সুজয় বিছানা ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে নেমে দৌড়ে চলে এল সদর দরজার কাছে। ডুংগা সেখানে নেই।

লোহার গেট খুলে সে এদিক-ওদিক তাকাল। কোনো চিহ্নই নেই ডুংগার। তার খাবার মাংস সেইরকমই পড়ে আছে।

তক্ষুনি আবার দোতলায় উঠে এসে সে মায়ের ঘরে ধাক্কা দিল। দরজা খুলতেই মাকে সুজয় খুব ব্যস্তভাবে বলল, "মা, ডুংগা নেই। সারারাত ফেরেনি। আমি ওকে খুঁজতে যাচ্ছি।"

বাবা বললেন, "কোথায় খুঁজতে যাবি, এত সকালে?"

সুজয় বলল, "কাছাকাছি রাস্তাগুলো ঘুরে দেখে আসি, নিশ্চয়ই কোথাও রাগ করে শুয়ে আছে।"

বাবা বললেন, "অত আর লাই দিতে হবে না। যাকে-তাকে কামড়াতে শুরু করেছে, এমন কুকুরকে আবার আদর দিতে হবে কেন? খিদে পেলে নিজেই আসবে।"

মা বললেন, "ও মা, সে কী! কুকুরটা এতদিন ধরে বাড়িতে রইল, হঠাৎ এমনভাবে চলে যাবে? কাল সারা রাত খেতে আসেনি যখন, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। একবার খুঁজে দেখা হবে না?"

সুজয় বলল, "আমি একটু লেক পর্যন্ত দেখে আসব?"

বাবা বললেন, "একা যাসনি। সুখেনকে সঙ্গে নিয়ে যা!"

সুখেনদা বাবার অফিসে কাজ করে, থাকে সুজয়দেরই বাড়িতে। সুজয় তাকে ঘুম থেকে টেনে উঠিয়ে নিয়ে গেল।

ওরা ফিরল প্রায় আড়াই ঘণ্টা বাদে। কাছাকাছি সবকটা

রাস্তায় ঘুরছে। বালিগঞ্জ লেকের এ-পাশ থেকে ও-পাশ পর্যন্ত খুঁজে দেখল। কোথাও ডুংগা নেই। সুজয়ের চোখে এক্ষুনি-জল-পড়বে-পড়বে ভাব।

বাবা তখন অফিসে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। সব শুনে বললেন, "থানায় একবার খবর দিতে হবে।" নিজেই তিনি ফোন করলেন থানায়।

থানার লোকজন এমনিতেই কত কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সামান্য কুকুর হারাবার মতন ব্যাপার নিয়ে তাঁদের মাথা ঘামাবার সময় নেই। তবু একজন মজা করে বললেন "শহরে ছেলে-ধরার মতন কুকুর-ধরাও বেরিয়েছে, শোনেননি? এরপর বেড়াল-ধরাও বেরুবে। বাড়িতে বেড়াল আছে নাকি? সাবধানে রাখবেন।"

বাবা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের পক্ষে কোনো সাহায্য করা সম্ভব নয় তা হলে?"

থানার লোকটি বললেন, "কুকুরের গলায় মালিকদের নাম-ঠিকানা লেখা চাক্তি বাঁধা আছে তো? কেউ ধরে থানায় জমা দিলে ফেরত পাবেন। আর কুকুর যদি রাস্তায় কারুকে কামড়ায়, সে জন্য দায়ী হবেন আপনারাই।"

বাবা ফোন রেখে দিলেন। কুকুরের গলায় আবার নাম-ঠিকানা লেখা চাক্তি বেঁধে রাখে নাকি কেউ? সে তো বিচ্ছিরি দেখায়! তাছাড়া ডুংগা এত বাধ্য যে, তার গলায় চেনই বাঁধতে হয় না কখনো।

বাবা সুজয়কে বললেন, "ও যদি রাস্তাঘাটে কারুকে কামড়ায় তাহলে কিন্তু ওর মালিক হিসেবে তোমাকে জেলে ধরে নিয়ে যাবে।"

সুজয় বলল, "ও কারুকে কামড়াবে না।"

বাবা বললেন, "হুঁ। তা হলে কাল হারুমামাকে কামড়াল কেন?"

সুজয় বলল, "উনি কেন ছাতা দিয়ে ডুংগার নাকে মেরে-ছিলেন? পোষা কুকুরকে কেউ মারে?"

বাবা বললেন, "ছিঃ, গুরুজনদের সম্পর্কে ওভাবে কথা বলতে নেই।"

এরপর "পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি" আর "কুকুর-প্রেমিক-সমিতি"তেও ফোন করা হল। ওঁরাও কোনো সাহায্য করতে পারলেন না। সবাই বললেন, পোষা কুকুর কক্ষনো বাড়ি ছেড়ে চলে যায় না। ফিরে আসে ঠিক।

বাবা সুজয়কে বললেন, "সারা দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে কোনো সময়ে। আদরের কুকুর, মাংস ছাড়া কিছু খায় না, রাস্তায় মাংস কোথায় পাবে?"

অফিস যাবার সময় বাবা রোজ সুজয়কে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে যান। সেদিন সুজয়ের স্কুলে যাবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না, তবু যেতে হল। কিন্তু স্কুলে একদম মন বসল না। সব সময় মনে পড়ছে ডুংগার কথা। সারা রাত ডুংগা কোথায় রইল? গত দেড় বছরের মধ্যে সে একদিনও বাড়ির বাইরে থাকেনি।

স্কুল ছুটি হতেই এক দৌড়ে বাড়ি ফিরে এল। খুব আশা করেছিল, ফিরে এসেই দেখবে যে, ডুংগা শুয়ে আছে গেটের কাছে। তাকে দেখেই ছুটে এসে পায়ে মাথা ঘষবে!

কিন্তু ডুংগা নেই।

দোতলায় মা-ও মন খারাপ করে বসে আছেন। কুকুরটা সারাদিনও এল না। তবে কি আর কক্ষনো আসবে না?

সুজয়ের ছোড়দি বলল, "আমার কী ভয় হচ্ছে জানো মা? ডুংগা গাড়ি চাপা পড়েনি তো?"

সুজয় সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে বলল, "না!"

দিদি বলল, "পোষা কুকুর রাস্তায় একলা চলতে শেখে না তো! চলন্ত গাড়ির সামনে দিয়ে হঠাৎ হয়তো দৌড়ে যাবে। গোল পার্কের কাছটায় গাড়িগুলো এমনভাবে যায় যে, অন্নরাই দিশেহারা হয়ে যাই। কিংবা ডুংগা হয়তো আত্মহত্যাও করতে পারে। জয় লাথি মেরেছে বলে ডুংগার অপমান হয়েছে।"

সুজয়ের সারা শরীরটা কেঁপে উঠল। ডুংগাকে সে আগে কোনোদিন মারেনি। কিন্তু কাল না-মেরেই বা উপায় ছিল কী? ডুংগা কথা শুনছিল না কারুর। বাবার হারুমামাকে তেড়ে-তেড়ে যাচ্ছিল।

দিদি আবার বলল, "তুই লাথি মারার পর ডুংগা তোর মুখের দিকে কীরকম ভাবে তাকিয়েছিল, তুই লক্ষ করিসনি, জয়? ডুংগা এমন অবাক হয়ে গিয়েছিল!"

সুজয় আর এসব কথা একদম শুনতে চায় না।

কোনোরকমে একটুখানি জলখাবার খেয়েই সে কারুকে কিছু না বলে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। সোজা ছুটে গেল বালিগঞ্জ লেকে।

এখন বিকেল পাঁচটা। ঠিক এই সময়, বৃষ্টির দিন ছাড়া, প্রত্যেকদিন সুজয় ডুংগাকে নিয়ে লেকে এসেছে। সুজয় একটা শিস দিলে ডুংগা অমনি লাফাতে-লাফাতে তার সঙ্গে ছুটত লেকের দিকে। রোজ ঠিক সময় বেড়াতে বেরুলে সেটা কুকুরদের একটা নেশার মতন হয়ে যায়।

সুজয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, ডুংগা যেখানেই থাকুক, বিকেলবেলা লেকে ঠিক একবার আসবেই।

লেকে আরও অনেক লোক এই সময় কুকুর নিয়ে বেড়াতে আসে। নানান জাতের কুকুর। কিন্তু একটাও ডালমাশিয়ান দেখতে পাচ্ছে না সুজয়। এক-একদিন সকালবেলা সুজয় এখানে এসে দেখেছে যে, একজন ভদ্রলোক তাঁর মেয়েকে নিয়ে এখানে বেড়াতে আসেন, তাঁদের সঙ্গে থাকে একটা ডালমাশিয়ান। সেটা ছাড়া এ পাড়ায় আর কারুর ঐ জাতের কুকুর সুজয় দেখেনি।

বড় লেকের ধারে একটা সোনাঝুরি গাছের নীচে বেঞ্চে বসে রইল সুজয়। ডুংগার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ছোটাছুটির পর প্রত্যেকদিন সে এখানেই বসে। আজ কি ডুংগার মনে পড়বে না সে-কথা? একবার সে সুজয়ের পায়ে মাথা ঘষতে আসবে না?

সুজয় একঘণ্টা বসে রইল। কিন্তু কোথায় ডুংগা? তারপর যখন অন্ধকার হয়ে এল, তখন সুজয় দু'হাতে মুখ ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদল। ডুংগার জন্য তার যে কী অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে, তা সে বলে বোঝাতে পারবে না। তার ফোঁপানির শব্দ শুনে দু-একজন চিনেবাদামওয়ালা, দু-একজন অন্য লোক একটু থমকে দাঁড়াল, কিন্তু কেউ কিছু বলল না। কেউ যখন খোলা জায়গায় বসে একা-একা কাঁদে, তখনও কোনো মানুষ তাকে সান্ত্বনা দেয় না।

একটু পরে চোখের জল মুছে সুজয় উঠে পড়ল। আর বেশি দেরি করলে বাড়ির সবাই চিন্তা করবেন। সাতটার সময় মাস্টারমশাই আসবেন আজ। সুজয় বুঝতে পারল, ডুংগাকে সে আর ফিরে পাবে না।

লেক থেকে বেরিয়ে, গড়িয়াহাট ব্রিজ পেরিয়ে যোধপুরের প্রথম মোড়ে এসে সুজয় হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। একটা চেনা কুকুরের ডাক। ঠিক ডুংগার মতন। ডান দিকের রাস্তা থেকে আসছে ডাকটা। কিছু না ভেবেই সুজয় সেদিকে ছুটল।

সে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল অনেক দূরে একটা লোক একটা কুকুরের গলায় চেন বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। কুকুরের রংটা সাদা-সাদা মতন।

কিন্তু সুজয় সেখানে পৌঁছবার আগেই লোকটি বেঁকে গেল অন্য একটা রাস্তায়। যোধপুরের রাস্তাগুলো গোলক-

নোলেদা / অহিভূষণ মালিক

পাড়ার জলসায় নোলেদা ছাত্রী ঝুঁচকীকে নিয়ে গান গাইছে...

ঝুঁচকী ক্লাসিক্যাল গান করে!

না না
তোম্ তানা না না না না
না না

ধিন্
না
না
ত্রিন্
ত্রিন্
না
তা
ধিন
না
ধিন্
তা
না
ত্রিন্
না
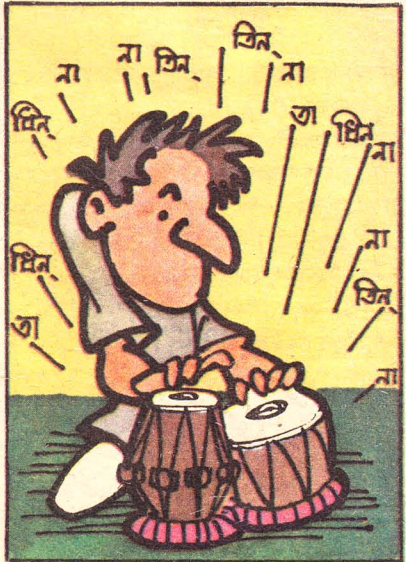
পাশের মাঠে গরু বাঁধা ছিল / গরুটা ঘাবড়েছে!

ঝুঁচকীর গলা যখন সপ্তমে চড়েছে
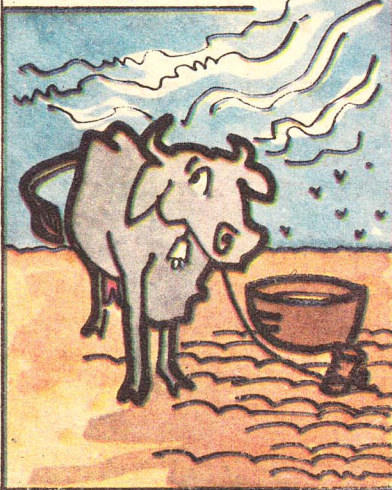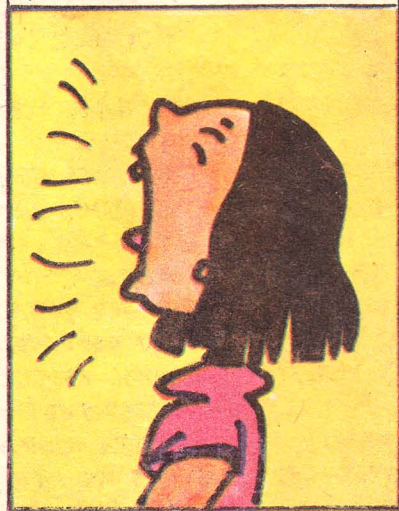
গরুটা খুঁটি উপড়ে মারল ছুট! কয়েকটা গোলা পায়রা পট পট করে শব্দ করে উড়ে গেল!
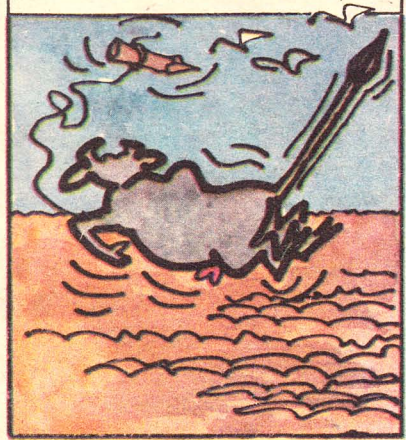
ধাঁধার মতন, এতদিন এ-পাড়ায় থেকেও সুজয় ঠিকমতন চিনতে পারে না। খানিকক্ষণ এ-রাস্তা ও-রাস্তায় ঘোরাঘুরি করেও সুজয় আর দেখতে পেল না লোকটিকে। অদৃশ্য হয়ে গেল নাকি?

তারপর সুজয় এক জায়গায় থেমে গিয়ে ভাবল, সে মিথ্যেই ছোটাছুটি করছে। ঐ কুকুরটা নিশ্চয়ই ডুংগা নয়। ডুংগাকে চেন দিয়ে বাঁধবে, এত সাহস কার? না, ডুংগা সত্যিই হারিয়ে গেছে, সে আর ডুংগাকে পাবে না।

ঠিক তক্ষুনি সে কাছেই একটা বাড়ির তিনতলায় ডাক শুনল, ডাঁউ, ডাঁউ! এ তো ঠিক ডুংগা। এ ডাক চিনতে তো তার ভুল হবে না। সুজয় সেই বাড়িটা লক্ষ করে ছুটল।

বাড়িটার সদর দরজা খোলাই ছিল। সুজয় সোজা উঠে গেল তিনতলায়। দুদিকে দুটো ফ্ল্যাটের দরজা। যে-দিক থেকে আওয়াজ এসেছিল, সেদিকের দরজার কলিং বেল টিপল।

দরজা খুলল একটি সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে। সুজয় কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই মেয়েটি বলল, "বাবলু এখন যাবে না। এখন পড়াশুনো করবে। খালি দিনরাত আড্ডা আর আড্ডা!"

বাবলু কে, সুজয় তাই জানে না। মেয়েটি না-জেনেই তাকে বকুনি দিয়ে উঠল? সুজয়ের বকুনি খাওয়ার অভ্যেস নেই।

সে গম্ভীরভাবে বলল, "আমাদের কুকুর আপনাদের বাড়িতে এসেছে?"

মেয়েটি বলল, "কুকুর? তোমাদের কুকুর এখানে আসবে কেন? না। কোনো কুকুর তো এখানে আসেনি।"

খোলা দরজা দিয়ে একটা ঘর ও একটা বারান্দা দেখা যায়। সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ডুংগা।

সুজয় উত্তেজিতভাবে বলল, "ঐ তো!"

মেয়েটি বলল, "ওটা তোমাদের কুকুর? বা রে! ও কথা বলো না, রবি শুনলে তোমাকে গাঁট্টা মারবে!"

সুজয় মেয়েটিকে পাশ কাটিয়ে ঘরের মধ্য দিয়ে দৌড়ে বারান্দার দিকে গিয়ে ডাকল, "ডুংগা!"

উত্তেজনায় সুজয়ের বুকের মধ্যে দুম-দুম শব্দ হচ্ছে। তা হলে সত্যিই ডুংগাকে খুঁজে পাওয়া গেল! এখন ডুংগাকে আটকে রাখার সাধ্য আর কারুর নেই।

সুজয় দু'বার শিস দিল।

মেয়েটি ভয়-পাওয়া গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "এই, এই, কাছে যেও না!"

ডুংগা গম্ভীর গলায় ডাকল, ডাঁউ! তারপর ল্যাজ নাড়তে লাগল।

বারান্দার রেলিংয়ের সঙ্গে একটা চেন দিয়ে ডুংগাকে বাঁধা। চেনটা খুলে দিতে হবে, সেইজন্যই ডুংগা ছুটে আসতে পারছে না। সুজয় শিস দিতে-দিতে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ কুকুরটা ভয়ংকরভাবে ডেকে উঠে সুজয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে কে একজন সুজয়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে এল পেছনে।

সুজয় দেখল, তার থেকে ছ-সাত বছরের বড় একজন ছেলে। সেই ছেলেটি সুজয়কে বলল, "তুমি করছ কী ভাই, তুমি পাগল? এক্ষুনি যে ও তোমাকে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবে!"

সুজয় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "আমার কুকুর আমাকে কামড়াবে না। আয় ডুংগা, আয়, আয়—"

কুকুরটা হিংস্রভাবে হাঁ করে কামড়াতে এল সুজয়কে।

এবার সে নিজেই পিছিয়ে এল। অভিমানে তার চোখে জল এসে যাবার উপক্রম। ডুংগা তাকে চিনতে পারছে না? কিংবা ডুংগা তার ওপর এত রেগে গেছে যে, তাকে কামড়াতে আসছে? ডুংগা পরের বাড়িতে থাকতে চায়? সুজয়ের বাড়ি কি ডুংগারও বাড়ি নয়?

দরজার কাছ থেকে মেয়েটি বলল, "রবি, এই ছেলেটা জোর করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বলছে, এটা ওর কুকুর!"

রবি কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সুজয়কে জিজ্ঞেস করল, "এটা তোমার কুকুর? এটা কী কুকুর, তার নাম জানো? কুকুর চেনো তুমি? বলো তো এটা অ্যালসেশিয়ান না স্প্যানিয়েল?"

সুজয় বলল, এটা "ডালমাশিয়ান! এর নাম ডুংগা। আপনারা জোর করে ওকে বেঁধে রেখেছেন।"

ছেলেটি আর মেয়েটি দু'জনেই হেসে উঠল এবার। ছেলেটি বলল, "জোর করে বেঁধে রেখেছি? আমি এসে না ধরলে ও তোমার মাংস খুবলে নিত।"

তারপর রবি বারান্দায় গিয়ে বলল, "রেক্স, স্ট্যান্ড আপ! সে 'হ্যালো' টু দিস বয়!"

কুকুরটা অমনি পেছনের দু' পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে দু'বার ডাকল—ডাঁউ ডাঁউ। তারপর রবির পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথা ঘষতে লাগল।

সুজয়ের তবু বিশ্বাস হচ্ছে না। সে বলল, "আমি এ-পাড়া দিয়ে অনেকদিন ঘুরেছি। কোনো বাড়িতে তো ডালমাশিয়ান দেখিনি!"

মেয়েটি বলল, "আমরা আগে এলাহাবাদ ছিলাম। একমাস হল কলকাতায় এসেছি।"

সুজয় খুব ভাল করে কুকুরটাকে দেখল। অবিকল ডুংগারই মতন। তবে ডুংগার চোখ দুটো আরও বেশি চকচকে। এই কুকুরটার বোধহয় বয়েস একটু বেশি।

রবি বলল, "তোমার বুঝি কুকুর হারিয়েছে?"

সুজয় বলল, "হ্যাঁ।"

মেয়েটি বলল, "রবি, কাল আমরা আর একটা ডাল-মাশিয়ান দেখেছিলাম না এই রাস্তায়?"

সুজয় বলল, "কটার সময় বলুন তো?"

মেয়েটি বলল, "এই সাতটা, সাড়ে সাতটা—"

সুজয় বলল, "হ্যাঁ, ঠিক। ঐ সময়েই—"

রবি জিজ্ঞেস করল, "কী করে হারাল?"

সুজয় বলল, "বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে।"

রবি বলল, "পালিয়ে এসেছে? পোষা কুকুর? খাঁটি জাতের ডালমাশিয়ান তো কখনো বাড়ি থেকে পালায় না। কতদিন ধরে পুষছ?"

"দেড় বছর। আচ্ছা, আমি যাই।"

"আরে, একটু বসো। তোমার সঙ্গে কথা বলি দু-চারটে।"

"না, আমাকে এক্ষুনি বাড়ি ফিরতে হবে, নইলে মুশকিল হবে।"

"বাড়ি ফিরে যাবে? কুকুরটা খুঁজবে না?"

"কাল সন্ধেবেলা থেকে পালিয়েছে। এখন আর খুঁজে কী হবে?"

রবি এবার সুজয়ের কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "একটু বসো। তুমি দেড় বছর কুকুর পুষছ, আর আমার কাছে এই কুকুরটাই আছে সাত বছর। এর আগেও আমাদের বাড়িতে অন্য কুকুর ছিল। সুতরাং তোমাকে আমি কুকুর বিষয়ে কিছু উপদেশ দিতে পারি।"

রবি জোর করে সুজয়কে বসিয়ে দিল একটা চেয়ারে। মেয়েটি এর মধ্যে একটা প্লেটে করে দুটি সন্দেশ আর এক গেলাস জল নিয়ে এসে বলল, "এটা খাও।"

সন্তুজয় মিনমিনে গলায় বলল, "আমি কিছু খাব না। আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।"

মেয়েটি বলল, "অন্তত জলটা খেয়ে নাও! তোমার মুখখানা বড্ড শুকিয়ে গেছে। তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে কুকুরটাকে?"

রবি জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছিল বলো তো? কুকুরটা পালাল কেন?"

সঞ্জয় খুব সংক্ষেপে গতকাল সন্ধেবেলার ঘটনাটা জানাল।

রবি শিউরে উঠে বলল, "সে কী! তুমি নিজের পোষা কুকুরকে লাথি মেরেছ?"

"ঠিক লাথি মারিনি। পা দিয়ে আটকাতে গিয়েছিলাম।"

"পা দিয়ে? কেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে পারোনি?"

"ও কথা শুনছিল না। তেড়ে তেড়ে আমাদের একজন আত্মীয়কে কামড়াতে আসছিল।"

"কামড়েছে, বেশ করেছে। পোষা কুকুরের নাকে কেউ খোঁচা মারে? নতুন লোক বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করলে কুকুর তো বাধা দেবেই। সেই লোকদেরই উচিত কুকুরকে সমীহ করা। যাক গে, যা হবার হয়ে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে যে, তোমার কুকুরের খুব অভিমান হয়েছে তোমার ওপর। যে-কুকুরের মার খাবার অভ্যেস নেই, তাকে একটু মারলেই সে ভীষণ দুঃখ পায়।"

"ও আর ফিরে আসবে না?"

"নিশ্চয়ই আসবে। পোষা কুকুর, বিশেষত এই সব ভাল জাতের কুকুর তার মালিককে ছেড়ে কক্ষনো যায় না। এসব হচ্ছে ওয়ান-ম্যান ডগ। এরা নিজেরা খাবার জোগাড় করে খেতেই শেখে না। তবে দুটো বিপদ আছে। হঠাৎ গাড়ি চাপা পড়তে পারে। কিংবা অন্য কুকুর আক্রমণ করতে পারে।"

"আমার কুকুরের সঙ্গে অন্য কোন কুকুর গায়ের জোরে পারবে না।"

"কোনো একটা কুকুর হয়তো পারবে না। কিন্তু একসঙ্গে আট-দশটা কুকুর যদি ঘিরে ধরে? কলকাতার রাস্তার নেড়ি কুত্তাদের তুমি চেনো না। ওদের দারুণ বুদ্ধি। একতাও আছে খুব। এমনি সময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, কিন্তু বাইরের কুকুর দেখলেই সবাই এক হয়ে যায়। দশটা কুকুর ঘিরে ধরলে একটা হাতিও কাবু হয়ে যেতে পারে।"

সঞ্জয় হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। সে চোখ বুজল, অমনি সে দেখতে পেল যে, একটা মাঠের মধ্যে একটা বড় দেবদারু গাছ, তার নীচে দাঁড়িয়ে আছে ডুংগা আর তাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আট-দশটা নেড়ি কুকুর। সেই কুকুরগুলো খুব জোরে জোরে ডাকছে, শুধু ডুংগা ডাকছে না। মাঠের ওপাশে পরপর তিনটে সাদা রঙের একতলা বাড়ি।

সঞ্জয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি যাই!"

রবি বলল, "একটু খুঁজে দেখো, পেয়ে যাবে। যতই অভিমান হোক, পোষা কুকুর তার মালিককে ছেড়ে বেশি দূরে যায় না। তোমার বাড়ির দেড় মাইল রেডিয়াসের মধ্যেই ও থাকবে। এই সব কুকুর যখন পালায়, তখন সোজা ছোটে এক রাস্তা ধরে। হঠাৎ-হঠাৎ এদিক-ওদিক বেঁকে না। কাল সন্ধে-বেলা একটা ডালমাশিয়ান কুকুরকে আমি আনোয়ার শা রোডের দিকে ছুটে যেতে দেখেছি। তুমি ঐ দিকটা খুঁজে দেখো।"

সঞ্জয়কে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এল রবি। তারপর খুব নরম গলায় বলল, "পোষা কুকুর হারালে কত কষ্ট হয় আমি জানি। আমাদের একটা কুকুর একবার অ্যাকসিডেন্টে মরে গিয়েছিল। ওঃ, তিনদিন আমি ভাত খেতে পারিনি। আমিও তোমার সঙ্গে কুকুরটা খুঁজতে যেতাম, কিন্তু আমার বাবা দিল্লি থেকে আজ একটু বাদেই ফিরবেন, সেই সময় আমি বাড়িতে না থাকলে মুশকিল হবে। তোমাদের বাড়ির ঠিকানাটা বলো তো, আমি কাল খবর নিয়ে আসব!"

রবিকে ঠিকানাটা বলে দিয়ে সঞ্জয় এগিয়ে গেল সামনের দিকে। খানিকটা গিয়েই আবার থমকে দাঁড়াল। বাড়িতে কারুকে কিছু বলে আসেনি সঞ্জয়। এতক্ষণে নিশ্চয়ই মাস্টার-মশাই এসে বসে আছেন। জানতে পারলে বাবা বকুনি দেবেন খুব। কিন্তু রবি নামে ঐ লোকটা যে বলল, ডুংগা দেড় মাইল রেডিয়াসের মধ্যেই থাকবে। যদি ডুংগা কাছাকাছি কোথাও চুপ করে বসে থাকে? একদম ডুংগাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরলে মা নিশ্চয় খুশি হবেন। বাবাও বকবেন না। বাবা নিজেই তো সকালে থানায় ফোন করেছিলেন!

আনোয়ার শা রোড কাছেই। সঞ্জয় ঠিক করল, অন্তত সেই পর্যন্ত খুঁজে আসবে। সেখানেও না পেলে, এক ছুটে বাড়ি।

সোজা রাস্তা ধরে আনোয়ার শা রোড পর্যন্ত হেঁটে এল সঞ্জয়। ডুংগার কোনো পাত্তা নেই। এবার কোন্ দিকে? কুকুর সোজা ছোটে, কিন্তু রাস্তা বেঁকে গেলে, সেখানে তো বেঁকতে হবেই। তাহলে ডানদিকে না বাঁ দিকে? সঞ্জয় রাস্তাটার দু' দিকে তাকাল। যদিও বাঁ দিক দিয়ে গেলে তার বাড়ি ফেরা সহজ হয়, তবু তার মনে হল ডান দিকেই যেতে হবে।

খানিকটা গিয়েই সঞ্জয় অবাক হয়ে থমকে দাঁড়াল। পাশে একটা ফাঁকা মাঠ, মাঝখানে একটা দেবদারু গাছ, মাঠের ওপাশে পরপর তিনখানা সাদা একতলা বাড়ি। ঠিক এই জায়গাটার ছবি একটু আগে চোখ বুজে দেখতে পেয়েছিল সঞ্জয়। কেন দেখেছিল? জায়গাটা তার খুব অচেনা নয়। এপাশ দিয়ে সে কয়েকবার গেছে। টালিগঞ্জে তার মাসীর বাড়ি যেতে হলে এই রাস্তা দিয়ে শর্টকাট হয়। কিন্তু চোখ বুজে এই মাঠটার ছবিই সঞ্জয় দেখেছিল কেন? নিশ্চয়ই এখানে ডুংগা এসেছিল। মাঠটা অন্ধকার, তবু তার মধ্যে তাকিয়ে মনে হল, দেবদারু গাছটার নীচে একটা কুকুর শুয়ে আছে।

সঞ্জয় দৌড়ে চলে এল সেখানে। কিন্তু সেটা ডুংগা নয়, একটা নেড়ি কুত্তা। সঞ্জয়কে দেখেই কুকুরটা লেজ গুটিয়ে পালাল। তবু সঞ্জয়ের ধারণা হল, খানিকটা আগে ডুংগা ছিল এখানে। ইশ, কেন সে একটু আগে আসেনি!

গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সঞ্জয় চোখ বুজল আবার। প্রত্যেকদিন হয় না, কিন্তু এক-একদিন এমন হয়, সে চোখ বুজলেই কিছু-না-কিছু দেখতে পায়, ঠিক সিনেমার ছবির মতন। প্রথমে সে দেখল একটা রোড রোলার। নতুন রাস্তা তৈরি করার সময় যে দারুণ ভারী লোহার গাড়ি চালানো হয়, সেই রকম একটা রোড রোলার একটা রাস্তার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। অনেক সময় এই রোড রোলার সারা রাত রাস্তায় পড়ে থাকে। এত ভারী গাড়ি কেউ তো আর ঠেলে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু সঞ্জয় হঠাৎ একটা রোড রোলার দেখছে কেন? মানে বুঝতে পারল না। তারপরই দেখল, একটা রেল স্টেশন, হাওড়া কিংবা শিয়ালদার মতন বড় নয়, ছোট, প্রায় ফাঁকা। একটা ট্রেন ঝমঝম করে চলে গেল। এ-ছবিটারও মানে বুঝল না সঞ্জয়। তারপর সে দেখল, তার পড়ার ঘর, মাস্টারমশাই একা চেয়ারে বসে চা খাচ্ছেন, আর একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছেন। বইটার নাম 'চাঁদের পাহাড়'। মাস্টারমশাই খুব ঠাণ্ডা লোক, একটু দেরি হলেও রাগ করবেন

না। বইটা একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ছাড়তেও পারবেন না মাস্টারমশাই। তারপর সে দেখল, একটা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে দুজন লোক। একজন খুব লম্বা, আর একজন বেঁটে। আরে, এই তো সেই লোক দুটো, সেবার অজন্তা গুহা দেখতে গিয়ে দেখা হয়েছিল ওদের সঙ্গে! লোক দুটো তো পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আবার ফিরে এসেছে?... আবার সে দেখল, রোড রোলারটাকে। সেটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে একজন লোক একটা রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল, ভাই, নর্থ রোড কাঁহা হ্যায়? রিকশাওয়ালা বলল, এ হি তো নর্থ রোড! আবার সে দেখল, অন্য কোনো একটা রাস্তা দিয়ে পরপর অনেকগুলো কুকুর ছুটে যাচ্ছে। সব ভাল ভাল কুকুর, কিন্তু কোনোটাই ডুংগা নয়।

সুজয় চোখ খুলে ফেলল। তার কপালের মধ্যে টিপটিপ করছে। এই সব ছবি যখন সে দেখে, তখন তার শরীরটা খুব দুর্বল লাগে। কিন্তু এবার তো সে ডুংগাকে দেখতে পেল না। তাহলে আর কোথায় খুঁজবে? সে রোড রোলারের কথাটাই ভাবতে লাগল। ওটা দেখল কেন? আর যেগুলো দেখেছে, সেগুলো কোন্‌টা কোন্ জায়গায় তার ঠিক নেই। কিন্তু নর্থ রোড তো যাদবপুরে। এখান থেকে বেশি দূরে নয়। সত্যিই সেখানে একটা রোড রোলার আছে এখনো? ঐ রাস্তায় তো সুজয় এক বছরের মধ্যে যায়নি। তবু ঐ রাস্তায় একটা রোড রোলারের ছবি তার চোখে ভেসে উঠবে কেন?

যদিও অনেক দেরি হয়ে গেছে, তবু সুজয়ের মনে হল, নর্থ রোডে নিশ্চয় একবার দেখে আসতে হবেই। একদিন না হয় বকুনি খাবে। সাদা বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে একটা সোজা রাস্তা বেরিয়ে গেছে, সেটা দিয়ে গেলেই যাদবপুরের কাছে পৌঁছনো যাবে।

নর্থ রোডে ঢুকে সুজয় দেখল, সে রাস্তাটা সারানো হচ্ছে। আর রাস্তার মাঝামাঝি থেমে রয়েছে একটা রোড রোলার। সুজয়ের বুকের মধ্যে ভূমিকম্পের মতন হতে লাগল। আরও দু-একবার এরকম মিলেছে। কিন্তু যতবারই তার চোখ-বুজে-দেখা ছবিটা পরে সত্যি-সত্যি মিলে যায়, তার এইরকম বুক কাঁপে।

রোড রোলারটা ঘিরে রয়েছে চার পাঁচটা নেড়ি কুকুর, তারা অশ্রান্তভাবে ডাকছে। আর রোড রোলারটার ওপরে সাদা সাদা রঙের কী একটা বসে আছে। ঐ তো ডুংগা! সুজয়ের সারা শরীরের ওপর দিয়ে যেন একটা আনন্দের ঝর্না বয়ে গেল। ডুংগা যেন তার নিজের ভাই, কিংবা খুব প্রিয় বন্ধু। ডুংগাকে ছেড়ে সে থাকতে পারছিল না।

রাস্তায় অনেক খোয়া ইঁট পড়ে ছিল। একটা ইঁটের টুকরো তুলে নিয়ে সে নেড়ি কুত্তাগুলোর দিকে ছুঁড়ে মারল। কয়েকটা কুকুর ভয় পেয়ে পালাল, কয়েকটা তেড়ে এল সুজয়ের দিকে। সুজয় এসব কুকুরকে ভয় পায় ন। সে আর একটা ইঁট হাতে তুলে নিয়ে বলল, ভাগ্, ভাগ্। তারপর রোড রোলারটার দিকে এক পা এক পা করে এগোতে লাগল। তারপর সেটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "ডুংগা, আয় আয়!"

ডুংগা মুখ তুলে একবার দেখল সুজয়কে। চোখে চোখ রাখল। তারপর তড়াক করে লাফিয়ে নেমে সামনের দিকে খুব জোরে দৌড় মারল।

সুজয় অবাক। ডুংগা তাকে দেখেও পালাচ্ছে? ডুংগা এখনো অভিমান করে আছে? কিংবা তার হাতে ইঁটটা দেখে কি ডুংগা ভেবেছে যে, তাকে মারতে এসেছে সুজয়? না না, ডুংগা, তোকে কি আমি মারতে পারি? তোকে আর কোনোদিন

আমি মারব না, তুই বুঝিস না, তোকে আমি কতটা ভালবাসি? আয়, আয়, ডুংগা।

ইঁটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে সুজয় ডুংগার পেছনে পেছনে ছুটল।

ডুংগা বড় রাস্তায় পড়ে একবার ফিরে তাকিয়ে সুজয়কে দেখল। সুজয় প্রাণপণে ডাকল, "আয়, ডুংগা, আয়!"

ডুংগা মুখ ঘুরিয়ে দৌড়ল গড়িয়ার দিকে। তারপর চলল এক লুকোচুরি খেলা। এক-এক সময় সুজয় ডুংগাকে দেখতে পায় না। তবু সে দৌড়য়। তারপর খানিকটা বাদে দেখে, ডুংগা থমকে দাঁড়িয়ে মাটিতে গন্ধ শোঁকে। তারপর মুখ ফিরিয়ে সুজয়কে দেখেই আবার দৌড়য়। সুজয়ের দারুণ ভয় হল। রাস্তা দিয়ে বড় বড় ট্রাক, বাস, গাড়ি যাচ্ছে। মিনিবাস ছুটছে দৈত্যের মতন। ডুংগা যে-কোনো সময় চাপা পড়ে যেতে পারে। সুজয় তো এখন ডুংগাকে ছেড়ে চলে যেতেও পারবে না। চোখের সামনে ডুংগাকে দেখেও সে কি ফিরে যেতে পারে? এখন বাড়িতে গেলে মা-বাবাই বলবেন, "কী রে, তুই এত বোকা? ডুংগাকে অতদূরে ছেড়ে রেখে চলে এলি?"

একটা মিনিবাস আর-একটা মিনিবাসকে ওভারটেক করতে গিয়ে সারা রাস্তা জুড়ে ফেলল। আর সেই দুটো বাসের মাঝখানে ডুংগাকে পড়ে যেতে দেখে সুজয় আঁতকে উঠল। সে

চিৎকার করে উঠল, "এই, রোককে, রোককে!" কিন্তু মিনি-বাসের গাঁক গাঁক আওয়াজের মধ্যে সুজয়ের চিৎকার শোনাই গেল না।

ডুংগা চাপাই পড়ত, কিন্তু একটা মিনিবাস ঠিক সময়ে ক্যাঁচ করে ব্রেক কষল। বাস দুটোর মাঝখান দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল ডুংগা। রাস্তার একজন লোক বলল, "বাঃ, বেশ সুন্দর কুকুরটা তো!" সুজয় বলল, "ওটা আমার কুকুর।" লোকটি বলল, "ধরো, ওরকমভাবে কেউ কুকুরকে ছেড়ে দেয়?" সুজয়ের আর উত্তর দেবার সময় নেই। সে এখন ডুংগার খুব কাছে এসে পড়েছে। আর-একটু হলেই ধরে ফেলবে। রাস্তার উল্টোদিক থেকে সুজয়ের ছোট মামার বয়েসী দুটো লোক আসছিল, সুজয় চেঁচিয়ে বলল, "ধরুন, ধরুন, কুকুরটাকে ধরুন!"

একজন লোক 'আঃ আঃ চুঃ চুঃ' বলে হাত বাড়াতেই ডুংগা দু' পায়ে খাড়া হয়ে এমন প্রচন্ড জোরে ডাঁউ ডাঁউ করে ডাকল যে, লোকটা ভয় পেয়ে পিছোতে গিয়ে একেবারে নর্দমায় পড়ে যাচ্ছিল! তারপর ডুংগা আরও জোরে প্রায় ইলেকট্রিক ট্রেনের মতন ছুটে বেরিয়ে গেল।

সুজয় হাঁপাতে হাঁপাতে একবার থমকে দাঁড়াল। দুঃখে তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে। সে এখন কী করবে? বাড়ি ফেলে কতদূরে চলে এসেছে। এতক্ষণ দৌড়ে তার প্রায় দম আটকে আসছে। এখন সে কী করবে? ডুংগাকে ছেড়ে ফিরে যাবে? তা কখনো হয়? তার নিজের কোনো ভাই যদি বাড়ি থেকে রাগ করে পালাত তবে সে কি তাকে একলা ছেড়ে নিজে ফিরে যেতে পারত?

না, তা হয় না। ডুংগাকে ধরতেই হবে। ডুংগাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু রবি বলেছিল, কুকুরেরা সোজা ছোটে। এর মধ্যে ডুংগা ডান দিক বাঁ দিকের কোনো গলির মধ্যে ঢোকেনি। সে রকম কোনো গলিতে লুকোলে সে আর ডুংগাকে খুঁজেই পেত না।

সুজয় আবার ছুটল সামনের দিকে। গড়িয়ার মোড়ের কাছটায় সে একবার ডুংগাকে দেখতে পেল। আবার ডুংগা মিলিয়ে গেল। সুজয় তবু ছুটছে। রাস্তার দু' পাশে আর বাড়ি-ঘর নেই। রাস্তাটা অন্ধকার। মাঝে মাঝে গাড়ির আলো। দূরে কোথায় যেন একসংগে অনেকগুলো কুকুর ডেকে উঠল ঘেউ ঘেউ করে।

৩

মাস্টারমশাই 'চাঁদের পাহাড়' বইটা পড়ে ফেললেন এক ঘণ্টার মধ্যে। তারপর ঘড়ি দেখলেন। সুজয় এখনো এল না। এবার তিনি দু'বার গলা খাঁকারি দিলেন।

তখন দোতলা থেকে সুজয়ের মা ও'দের চাকরকে ডেকে বললেন, "এই রঘু, মাস্টারমশাইকে চা দিসনি?"

রঘু চা নিয়ে আসতেই মাস্টারমশাই বললেন, "একটা দেশলাই নিয়ে আয় তো রঘু!"

রঘু দৌড়ে গিয়ে দেশলাই নিয়ে এল। মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, তোর দাদাবাবু কোথায় গেল?"

রঘু বলল, "জানি না তো! বোধহয় কুকুর খুঁজতে গেছেন।"

মাস্টারমশাই বললেন, "কুকুর? কেন কুকুরের কী হয়েছে?"

"কুকুরটা কাল সন্ধে থেকে পালিয়েছে।"

মাস্টারমশাই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। যাক, বাঁচা গেছে। তিনি একদম কুকুর পছন্দ করেন না। যদিও সুজয়ের কুকুর তাঁকে চিনে গেছে, দেখলে তেড়ে আসে না, তবু ঐ কুকুরের চোখের দিকে তাকালেই গা ছমছম করে। মানুষ যে কেন শখ করে এরকম একটা হিংস্র জানোয়ার বাড়িতে পোষে! আর সুজয়ের কুকুর তো ঠিক একটা চিতা বাঘের মতন।

মাস্টারমশাই বললেন, "কিন্তু কুকুরের জন্য যে আজকের পড়া নষ্ট হল?"

রঘু বলল, "তা তো হলই!"

"দাদাবাবুর মা জানেন যে, ছেলে এখনো ফেরেনি?"

"মা তো ভবানীপুরে গিয়েছিলেন। এই মাত্র এলেন!"

"দেখো বাপু, কোনো ছাত্রের নামে তার বাবা-মা'র কাছে নালিশ করা আমি পছন্দ করি না।"

"মাকে ডেকে আনব?"

"না, না, না, না, না! আমি চলে গেলে তারপর যা বলার তুমি বলবে! আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন আমরাও দু একদিন পড়াশুনোয় ফাঁকি দিয়েছি। এখন মাস্টার হয়েছি বলে তো আর সে সব কথা ভুলে যেতে পারি না!"

"আপনি আর থাকবেন না?"

"না। এর পর তোমার দাদাবাবু ফিরলেও আর পড়াশুনোয় মন থাকবে না। একদিন পড়াশুনো না করলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উল্টেও যাবে না। সুতরাং আমি যাই। কিন্তু আমি তিনতলা থেকে নামবার সময় যদি তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় আমার?"

"মায়ের ঘরের দরজা বন্ধ।"

"দরজা বন্ধ? বাঃ! তাহলে আমি যাই? শোনো, তোমার মা যদি জিজ্ঞেস করেন, মাস্টারমশাই কি রাগ করে চলে গেলেন, তখন তুমি কী বলবে? তুমি বলবে, না, না, মাস্টারমশাই হাসি-হাসি মুখ করে গেছেন। বুঝলে? আর তোমার দাদাবাবু ফিরে এলে বলবে, কাল এসে আমি দু'দিনের পড়া এক সঙ্গে পড়াব।"

এরপর মাস্টারমশাই সত্যিই হাসি-হাসি মুখ করে পা টিপে টিপে নীচে নেমে গেলেন। আজ কুকুরটা নেই বলে তিনি গেটের সামনে হেঁটে গেলেন বেশ সাহসের সঙ্গে।

সুজয়ের মা সন্ধেবেলা এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি কিছুক্ষণ একটা মাসিক পত্রিকা পড়লেন। তারপর ঘড়িতে যখন দেখলেন সাড়ে ন'টা বাজে, তখন রঘুকে ডেকে বললেন, "বাবুর আজ ফিরতে দেরি হবে। খাবার টেবিলে প্লেট সাজিয়ে দে।" তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁরে, মাস্টারমশাই কি আজ এখনো পড়াচ্ছেন নাকি?"

রঘু বলল, "মাস্টারমশাই কাকে পড়াবেন? দাদাবাবুই তো ফেরেনি!"

"দাদাবাবু ফেরেনি? তা হলে অনেকক্ষণ থেকে যে দেখছি, তিনতলার ঘরে আলো জ্বলছে!"

"সে তো মাস্টারবাবু নিজেই পড়াশুনো করছিলেন।"

"জয় ফেরেনি? সে-কথা এতক্ষণ আমায় বলিসনি কেন?"

"মাস্টারবাবু যে বারণ করলেন বলতে!"

"বারণ করলেন? কেন?"

"তা জানি না। মাস্টারবাবু রাগ করেননি, হাসি-হাসি মুখ করে চলে গেছেন!"

"কী আবোল তাবোল বকছিস? জয় এখনো ফেরেনি মানে? এত রাত পর্যন্ত সে কোথায় থাকবে?"

মায়ের ভুরু কুঁচকে গেল।

বাবা ফিরলেন সাড়ে দশটায়। শুনেই তিনি মাকে বললেন, "আজকাল তুমি ছেলেকে বড্ড বেশি আশকারা দাও। দিন দিন কথার অবাধ্য হচ্ছে। এখনো চোদ্দ বছর বয়েস হয়নি, এর মধ্যেই ছেলে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত বাড়ির বাইরে থাকবে?"

মা বললেন, "না না, কুকুর! ডুংগা ফেরেনি তো, নিশ্চয়ই তাকে খুঁজতেই..."

বাবা বললেন, "সেইজন্যই তো বারণ করেছিলাম কুকুর পুষতে। কুকুরের জন্য পড়াশুনোও নষ্ট হবে!"

বাবা তক্ষুণি থানায় ছুটলেন।

থানার দারোগাবাবু প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, "ছেলের বয়েস কত? পরীক্ষায় ফেল করেছে? কিন্তু এই সময় তো পরীক্ষা টরিক্ষা কিছু নেই!"

বাবা গম্ভীর ভাবে বললেন, "ছেলের বয়েস সাড়ে তের। সে পরীক্ষায় সেকেন্ড-থার্ড হয়।"

দারোগাবাবু হেসে বললেন, "আরে মশাই, ছেলে ফেল করলেও যেমন মা-বাবা বকে, তেমনি সেকেন্ড-থার্ড হলেও কেন ফার্স্ট হয়নি সেই জন্য দারুণ বকুনি দেয়। আজকাল এত বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে।"

বাবা বললেন, "না, তাকে কোনো বকুনিও দেওয়া হয়নি।"

"তা হলে দেখুন, নিশ্চয়ই কোনো বাজে বন্ধু-টন্ধুর পাল্লায় পড়েছে।"

"তা-ও নয়। আমাদের বাড়ির কুকুর হারিয়ে গেছে, সেটাকে খুঁজতে বেরিয়েছিল!"

"কুকুর খুঁজতে গেছে? তা হলে আর কী করা যাবে!"

"সে কী, কিছুই করার নেই?"

"দেখুন, খুব ছোট ছেলে তো নয় যে রাস্তা হারিয়ে ফেলবে! খুব ছোট ছেলেমেয়ে রাস্তায় হারিয়ে গেলে লোকে থানায় এসে জমা দিয়ে যায়। এত বড় ছেলের আর কী বিপদ হবে। বাড়িতে গিয়ে দেখুন, এতক্ষণে নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে।"

"যদি না ফেরে?"

"তাহলে কাল কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন, 'খোকা ফিরিয়া এসো। মা শয্যাশায়ী। টাকার দরকার থাকিলে জানাও পাঠাইব।' দেখবেন তাতেই ফিরে আসবে ঠিক।"

বাবা উঠে দাঁড়াতেই দারোগাবাবু বললেন, "বেশি চিন্তা করবেন না। আজকালকার ছেলেরা সহজে হারায় না। খুব চালু হয়। আমাদের দিক থেকে যা-যা ব্যবস্থা করবার করব! বসুন, আপনার সামনেই ব্যবস্থা করছি।"

বাবা বাড়ি ফিরে আসতেই মা বললেন, "কী হল? কিছু খবর পাওয়া গেল?"

বাবা শুকনো মুখে বললেন, "সব কটা থানায় খবর দেওয়া হয়েছে। আর কলকাতার সব হাসপাতালেও খোঁজ নিয়ে দেখা হল।"

মা বললেন, "অ্যাঁ? হাসপাতালে? কেন?"

যদি রাস্তায় কোনো অ্যাকসিডেনট হয়, তাহলে হাসপাতাল থেকেই খবর পাওয়া যাবে।"

অ্যাকসিডেনটের কথা শুনেই মা কেঁদে ফেললেন। বাবা বললেন, "কান্নাকাটি শুরু করলে কেন? তাতে কোনো লাভ হবে? বরং ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা করতে দাও!"

মা বললেন, "তুমি সুখেনকে নিয়ে লেকটা একবার দেখে এসো না।"

"এত রাত্রে সে লেকে কী করবে?"

"যদি ঘুমিয়ে-টুমিয়ে পড়ে!"

"যত্ত সব অদ্ভুত কথা। কোনো বাড়ির ছেলে সন্ধে থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত লেকে ঘুমোয়?"

বাবার হারুমামা ফিরলেন বারোটা বেজে কুড়ি মিনিটে। উনি কলকাতার রাস্তাঘাট ভাল চেনেন না। বরানগরে একজন লোকের সঙ্গে দেখা করবেন বলে সুজয়ের ছোড়দি ঝর্নাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে। ফেরার পথে একটা থিয়েটার দেখে এলেন।

বাড়িতে তখন মা দু' হাতে মুখ ঢেকে নিঝুম হয়ে বসে আছেন। মাঝে-মাঝে শরীরটা কেঁপে উঠছে। আর বাবা ফোন করে যাচ্ছেন অনবরত। খাওয়া-দাওয়া কিছুই হয়নি।

দু' তিনবার জুতো ধপধপিয়ে ধুলো ঝেড়ে তারপর বাবার হারুমামা জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার?"

ঝর্না দৌড়ে মায়ের কাছে গিয়ে বলল, "মা, কী হয়েছে?"

মা কিছু বললেন না, বাবা উত্তর দিলেন, "সুজয় বাড়ি ফেরেনি এখনো।"

"অ্যাঁ?"

হারুমামা বললেন, "এখনো বাড়ি ফেরেনি? রাত বারোটা বেজে গেছে! আজকালকার ছেলেরা বড্ড অবাধ্য হয়েছে! এত রাত হল—"

বাবা এবার একটু বিরক্তভাবে বললেন, "সে কোনোদিন এরকম করে না! নিশ্চয়ই কিছু একটা বিপদ আপদ হয়েছে। কুকুরটা বাড়ি থেকে চলে গেছে, সেটাকে খুঁজতে গিয়েই..."

হারুমামা এবার হাসলেন। বললেন, "ও, কুকুরটাকে খুঁজতে গেছে! সে কথা আগে বলতে হয়! কিন্তু কুকুরটা পালল কেন? পোষা কুকুর তো বাড়ি থেকে কখনো পালায় না! আমি কাল ওকে ছাতা দিয়ে মেরেছিলাম বলে পালিয়েছে?"

মা, বাবা আর ঝর্না তিনজনেই চুপ করে রইল। মৌনং সম্মতি লক্ষণং। মুখ ফুটে না বললেও সবাই হারুমামাকেই কুকুরটা হারাবার জন্য দায়ী করেছে।

হারুমামা বললেন, "আমার খিদে পেয়েছে, খাবার দাও। আমি একটু বাদেই তোমাদের কুকুর খুঁজে দিচ্ছি।"

বাবা বললেন, "আপনি কোথায় কুকুর খুঁজবেন? আপনি তো কলকাতার রাস্তাঘাট ভাল করে চেনেনই না!"

"সে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। আমি বাড়িতে বসেই কুকুর খুঁজে দেব।"

অত রাত্তিরে আর কারুর খাবার ইচ্ছে নেই। তবু হারুমামা সবাইকে খাবার জন্য জোর করলেন। বাবা আর ঝর্না একটু একটু খেল, মা কিছুতেই একটুও খেতে রাজি হলেন না।

খাওয়া-দাওয়ার পর হারুমামা সবাইকে নিয়ে ছাদে উঠে এলেন। যে ছাতাটা দিয়ে তিনি ডুংগাকে মেরেছিলেন, সেটাকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন ছাদের পাঁচিলের এক কোণে। তারপর নিজে একটা আসন পেতে বসলেন। রঘু তাঁর সামনে ঘুঁটে আর কাঠকয়লা দিয়ে আগুন জ্বেলে দিল।

হারুমামা প্রথমে সেখানে খানিকক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলেন। তারপর একটু বাদে চোখ খুলে বললেন, "হ্যাঁ, হবে! আফ্রিকায় থাকবার সময় আমি দেখেছি, জুলুরা তাদের কোনো পোষা জন্তু-জানোয়ার হারিয়ে গেলে কিংবা কেউ চুরি করলে এই যজ্ঞটা করে। যদি কোনো কাজে লাগে এই ভেবে আমি সেটা শিখে নিয়েছিলাম। অনেকদিন প্র্যাকটিস নেই, তবু দেখলাম, মন্ত্রগুলো মনে আছে। কয়েকটা জিনিস লাগবে অবশ্য। খানিকটা কাঁচা মাংস, তাল গাছের কয়েকটা পাতা, একটুখানি কর্পূর, দশটা শুকনো লঙ্কা আর কয়েকটা গুটিপোকা!"

ফ্রিজে কাঁচা মাংস আছে, কর্পূর আর শুকনো লঙ্কাও আছে বাড়িতে। কিন্তু তালগাছের পাতা এখন কোথায় পাওয়া যাবে? আর গুটিপোকা? "গুটিপোকা কী?"

হারুমামা বললেন, "তালগাছের পাতা আনতে পারবে না? গুটিপোকা নেই?"

বাবা বললেন, "গুটিপোকা আবার লোকের বাড়িতে থাকে নাকি? সে কোথায় পাওয়া যায়? কাল সকালে না হয় গ্রাম-ট্রাম থেকে তালগাছের পাতা জোগাড় করা যেতে পারে। কিন্তু হারুমামা, এসব যজ্ঞে-টজ্ঞে আমার বিশ্বাস হয় না।"

হারুমামা বললেন, "বিশ্বাস যদি না করো, তাহলে আর চেষ্টা করে লাভ কী? তাহলে আমি উঠে পড়ি?"

মা বললেন, "না, না। আপনি চেষ্টা করুন। কিন্তু তালপাতা আর গুটিপোকা কোথায় পাব?"

হারুমামা বললেন, "হয়, হয়, সব কিছুরই ব্যবস্থা হয়!"

ঝর্না বলল, "মা, আমাদের একতলার রান্নাঘরে একটা হাতপাখা আছে না? হাতপাখা তো তালগাছের পাতা দিয়েই তৈরি হয়!"

হারুমামা বললেন, "এই তো, মেয়েটার বুদ্ধি আছে। নিয়ে এসো সেই হাতপাখা!"

"কিন্তু গুটিপোকা?"

"বুদ্ধি থাকলে সব কিছুরই ব্যবস্থা হয়। বাড়িতে পুরনো সিল্কের শাড়ি নেই? তার থেকে ছিঁড়ে খানিকটা নিয়ে এসো। গুটিপোকা থেকেই তো সিল্ক হয়।

ঝর্না দৌড়ে চলে গেল হাতপাখা আর সিল্কের কাপড়ের একটা টুকরো আনতে।

সব কিছু পাবার পর হারুমামা বেশ গুছিয়ে বসলেন। প্রথমে আগুনের মধ্যে খানিকটা কাঁচা মাংস আর শুকনো লঙ্কা ফেলে দিতেই দারুণ ধোঁয়া আর বিচ্ছিরি গন্ধ হল। হারুমামা চেঁচিয়ে বললেন, "আকিলা ডিউই ডিউই নোকুমো লেসোথো উবুণ্ডি বুরুণ্ডি ডুংগা ডুংগা..."

হঠাৎ থেমে গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কুকুরটার গোত্র কী?"

বাবা আর মা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। কুকুরের আবার গোত্র হয় নাকি? কুকুরের পেডিগ্রি থাকে অবশ্য, কিন্তু সে-সব কে খোঁজ রেখেছে?

ঝর্না চট করে বলল, "ডুংগার ডালমাশিয়ান গোত্র।"

হারুমামা বললেন, "ঠিক আছে। ওতেই হবে।"

শুকনো লঙ্কার ধোঁয়ায় সবাই কাসছে আর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। হারুমামা বললেন, "শোনো. এই যজ্ঞ কিন্তু চলবে ঠিক সাড়ে তিনঘণ্টা —ততক্ষণ কিন্তু সবাইকে জেগে থাকতে হবে। ঘুমোলে চলবে না।"

এবার তিনি আগুনে খানিকটা কর্পূর ফেলে দিলেন। তাতে শুকনো লঙ্কার ঝাঁঝটা একটু কমল। আবার খানিকক্ষণ সেই রকম অদ্ভুত মন্ত্র পড়ে তিনি হাতপাখাটা গুঁজে দিলেন আগুনে। আবার বিশ্রী ধোঁয়া। এবার তিনি বর্কান দিয়ে বললেন, "কে ঘুমোচ্ছে? যার ঘুম পাবে, সে নীচে চলে যাক।"

ঝর্নার একটু ঝিমুনি এসেছিল। সে তাড়াতাড়ি নড়ে-চড়ে বসে বলল, "না, না, আমি তো ঘুমোইনি!"

ঘুম তাড়াবার জন্য তিনি আরও তিন চারটে শুকনো লঙ্কা ফেলে দিলেন আগুনের মধ্যে। আবার মন্ত্র পড়লেন, "আকিলা কাটাঙ্গা-কিকুইট বাসাঙ্কুস্ লুবুম্বাসি বাসাকো বোটসোয়ানা লুসাকা ডুংগা ডালমাশিয়ান..."

বাবা আস্তে আস্তে বললেন, "এ কেমন মন্ত্র? এ তো মনে হচ্ছে কয়েকটা দেশের নাম..."

হারুমামা ধমক দিয়ে উঠলেন, "চুপ! মাঝখানে কেউ কথা বলবে না..."

হারুমামা বলেছিলেন সাড়ে তিন ঘণ্টা যজ্ঞ চলবে। কিন্তু তখনো এক ঘণ্টাও হয়নি এমন সময় নীচে গেটের কাছে ডাঁউ ডাঁউ করে আওয়াজ হল।

ঝর্না সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "ঐ তো!"

কারুর সন্দেহ রইল না যে, ওটা ডুংগারই ডাক।

সবাই হুড়োহুড়ি করে নেমে এল নীচে। সত্যিই তো বন্ধ গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ডুংগা। সে প্রচণ্ড জোরে ডাকছে। গেট খুলে দিতেই ডুংগা বাবার পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথা ঘষতে লাগল।

কিন্তু সুজয় কোথায়? সবাই রাস্তায় বেরিয়ে এসে দেখতে লাগল। না, সুজয় তো নেই কোথাও!

সুজয় ফেরেনি। ডুংগা একা এসেছে।

৪

অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ছুটতে-ছুটতে সুজয় আবার থমকে দাঁড়াল। সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে. আর পারছে না। আবার এতটা রাস্তা তাকে ফিরে যেতে হবে। তার কাছে পয়সা নেই। ডুংগাকেও সে এভাবে কিছুতেই ধরতে পারবে না। ডুংগা তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। কুকুর যদি ইচ্ছে করে ধরা না দেয়, তা হলে মানুষ কি তাকে দৌড়ে ধরতে পারে? ডুংগা জানে, সুজয় রোজ এ সময় পড়তে বসে। তবু সে তাকে এতখানি দৌড় করাচ্ছে! ডুংগা আর তাকে ভালবাসে না। যাক, ডুংগা যেখানে খুশি যাক।

সুজয়ের দারুণ খিদে পেয়েছে। ডুংগারও খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই, সেও তো কিছু খায়নি। ডুংগা শেখেইনি নিজের খাবার জোগাড় করতে। এইরকমভাবে পালিয়ে গেলে সে বাঁচবে? কোনো না কোনো বাড়িতে আশ্রয় নিতেই হবে তাকে। এরকম একটা ভাল কুকুর পেলে কেউ ছাড়বে না। ডুংগার যেখানে খুশি সেখানেই থাকুক। ভাল থাকলেই হল।

ছেলেবেলায় সুজয় একটা বই পড়েছিল। হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান ডালমাশিয়ান। ওয়াল্ট ডিজনির বই। একদল গুণ্ডা শুধু ডালমাশিয়ান কুকুর চুরি করত। তাদের মধ্যে ছিল একটা ডাইনীর মতন চেহারার মেয়ে। তারা ঐ ডালমাশিয়ান কুকুর-গুলো মেরে তাদের চামড়া দিয়ে কোট বানাত। ডালমাশিয়ানের মতন এত সুন্দর চামড়া তো আর কোনো কুকুরের হয় না! ডুংগা যদি সে রকম কোনো চোরের দলের পাল্লায় পড়ে? যাক, সুজয় আর ভাবতে পারছে না। ডুংগাকে তো সে লাথি মারেনি। পা'টা শুধু লেগে গিয়েছিল জোরে। ডুংগা সেটা বুঝতে পারল না? তার জন্য এত অভিমান?

একটা কালভার্টের ওপর বসে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে সুজয় একটু সুস্থির হল। রাত এখন কটা? আটটা, নটা? ইশ, সাংঘাতিক দেরি হয়ে গেছে। মা দারুণ চিন্তা করছেন নিশ্চয়ই। এখান থেকে ফিরতে আবার কতক্ষণ লাগবে কে জানে! রাস্তা হারাবার ভয় নেই। যে-রাস্তা দিয়ে এসেছে, ঠিক সেটা ধরেই ফিরে যাবে। কিন্তু আর দৌড়তে পারবে না।

কতটা দূরে সে চলে এসেছে? সুজয় অন্তত আড়াই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা ধরে দৌড়েছে। আড়াই ঘণ্টা ধরে ছুটে একজন মানুষ অন্তত পনেরো মাইল দূরে চলে যেতে পারে। তাদের ঢাকুরিয়া থেকে পনেরো মাইল দূরে কোন্ জায়গা? এখানে তো কোনো বাড়ি ঘর নেই!

তীব্র সার্চলাইট জেবলে একটা গাড়ি আসছিল দূর থেকে। গাড়িটা ঠিক সুজয়ের সামনে এসে থামল। গাড়ির ভেতর থেকে একটা হলদে রঙের টর্চের আলো এসে পড়ল তার গায়ে। আলোটা এতই জোরালো যে সুজয়ের চোখ ধাঁধিয়ে গেল, হাত দিয়ে সে চোখ আড়াল করল।

আলোটা নিভে গেল, কিন্তু ইঞ্জিনের ধক্ ধক শব্দ হচ্ছে, গাড়িটা দাঁড়িয়েই আছে।

সুজয়ের হঠাৎ একটা কথা মনে এল। সে তাড়াতাড়ি উঠে চলে এল গাড়িটার সামনে। ভেতরে তিন চারজন লোক বসে আছে, তাদের মুখগুলো দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে।

সুজয় বলল, "আপনারা কি সামনের দিকে যাচ্ছেন?"

কেউ কোনো উত্তর দিল না।

সুজয় বলল, "আমার কুকুরটা ঐ দিকে গেছে। আপনারা আমাকে একটু এগিয়ে দিলে কুকুরটাকে ধরতে পারি।"

কট্ করে শব্দ হয়ে গাড়িটার একটা দরজা খুলে গেল। সুজয় আর চিন্তা না করে উঠে পড়ল গাড়িটার মধ্যে। গাড়িটা চলতে শুরু করল তক্ষুনি। সুজয় ভাবল, এবার ডুংগাকে সে ধরবেই! কুকুর তো আর গাড়ির সঙ্গে ছুটে পারবে না।

গাড়িটাতে ড্রাইভার ছাড়া আরও তিনজন লোক বসে আছে। তিনজনেরই কালো রঙের পোশাক। চোখে কালো চশমা। এরা রাত্তিরবেলাতেও চোখে সানগ্লাস পরে আছে বলে সুজয়ের একটু খটকা লাগল। এদের সকলেরই কি কনজাংক-টিভাইটিস নামে সেই চোখের অসুখটা হয়েছে? গাড়িটা ছুটছে দারুণ জোরে।

সুজয় পাশের লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কি পুলিস?"

লোকটি সুজয়ের চোখে চোখ রেখে হাসল। মুখে কিছু বলল না।

কেউ কথার উত্তর না দিলে বড্ড অস্বস্তি লাগে। কিন্তু এরা সুজয়কে গাড়িতে জায়গা দিয়েছে, সুতরাং এদের ওপর রাগ করা যায় না। সুজয় আবার বলল, "আপনাদের সকলেরই

একরকম পোশাক কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।"

এবারও কোনো উত্তর দিল না কেউ।

বেশি দূরে যেতে হল না। একটু পরেই সুজয় দেখতে পেল ডুংগাকে। তার চামড়ার সাদা রঙের জন্য অন্ধকারের মধ্যেও দেখা যায়।

ডুংগা রাস্তার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটা কাছে আসতেই খুব জোরে ডেকে উঠল। সুজয়ও সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "ঐ তো ডুংগা। গাড়ি থামান!"

গাড়ির গতি একটুও কমল না। সুজয়ের গলার আওয়াজ পেয়ে ডুংগা ঝাঁপিয়ে পড়তে এল গাড়িটার ওপরে। আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ড্রাইভার স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ডুংগাকে চাপা দিতে গেল!

সুজয় বলল, "এ কী করছেন? আমার কুকুর! থামান!"

ড্রাইভার শুনল না তার কথা। সুজয় মুহূর্তের মধ্যে ভাবল, এরা বোধহয় বাংলা বোঝে না। সে আবার চেঁচিয়ে বলল, "স্টপ! দিস ইজ মাই ডগ! রোক্‌কে! হামারা পোষা কুত্তা হ্যায়! স্টপ! স্টপ!"

ড্রাইভার তবু ডুংগাকে চাপা দেবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ডুংগাকে চাপা দেওয়া সহজ নয়। সে এক একটা লাফ দিয়ে রাস্তার এধার থেকে ওধারে চলে যাচ্ছে আর প্রাণপণ শক্তিতে চ্যাঁচাচ্ছে। তার চোখ সুজয়ের দিকে।

একবার গাড়িটা প্রায় ডুংগাকে ছুঁয়ে ফেলল ; ডুংগা তখন পেছন ফিরে নেমে গেল মাঠের মধ্যে। গাড়িটাও তাকে তাড়া করে মাঠের মধ্যে নামতে যাচ্ছিল, এমন সময় পেছনের সীট থেকে একজন ঝুঁকে পড়ে ড্রাইভারের কাঁধের ওপর চাপড় মারল। ড্রাইভার তখন গাড়ির মুখ সোজা করে নিল রাস্তার ওপর। তারপর চালিয়ে দিল সামনের দিকে! দারুণ জোরে।

সুজয় বলল, "আমাকে নামিয়ে দিন। কোথায় যাচ্ছেন? থামুন! লেট মী গেট ডাউন!"

কেউ সুজয়ের কথায় কান দিল না।

সুজয় তখন গাড়ির দরজা খুলে লাফিয়ে পড়বার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে একজন হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল তার ঘাড়। লোহার মতন শক্ত সেই হাত। সুজয়ের আর নড়াচড়ার ক্ষমতা রইল না। তখনও সে শুনতে পাচ্ছে ডুংগার ডাক, ডুংগা তাড়া করে আসছে গাড়িটাকে। কিন্তু গাড়িটা ছুটছে অসম্ভব জোরে, রাস্তাটা ভাঙা, মাঝে-মাঝে বিরাট গর্ত তার ওপর দিয়েও গাড়িটা যেন উড়ে চলেছে।

সুজয় যদিও বেশ ভয় পেয়ে গেছে, তবু গলা না-কাঁপিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমি কী করেছি?"

যে-লোকটি সুজয়ের ঘাড় ধরেছিল, এবার সে জোর করে সুজয়ের মুখটা ফেরাল নিজের দিকে। সুজয় দেখল, লোকটির চোখ দিয়ে ঠিক টর্চের ফোকাসের মতন দু ঝলক সবুজ আলো বেরুলো। সুজয় আর সহ্য করতে পারল না, অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ল লোকটার কোলে।

এদিকে ডুংগা বেশ খানিকক্ষণ তাড়া করে এল গাড়িটাকে। কিন্তু একটু বাদেই সে আর গাড়িটাকে দেখতে পেল না। তখন ডুংগা রাস্তার মাঝখানে থমকে দাঁড়াল এক জায়গায়, আকাশের দিকে মুখ করে দুবার করুণ সুরে ডাকল। তারপর পেছন ফিরে সোজা ছুটল বাড়ির দিকে।

রতনলাল নামে একজন লোক শেয়াল তাড়া করতে বেরিয়েছিল। রোজই তার মুর্গীর ঘরে শেয়াল এসে উৎপাত করে। আজও একটা শেয়াল একটু আগে তার একটা মুর্গী মুখে করে পালিয়েছে। তাই রেগেমেগে রতনলাল একটা লাঠি নিয়ে বেরিয়েছে শেয়াল মারবে বলে। বড় রাস্তার ওপরে একটা জলা-মতন জায়গা আর বাঁশবন আছে, শেয়ালগুলো সেখানে পালায়।

রতনলাল বড় রাস্তার কাছে এসে দেখল, সেখানে একটা গাড়ি থেমে আছে আর কতকগুলো নেড়ি কুকুর সেই গাড়িটা ঘিরে দাঁড়িয়ে চ্যাঁচাচ্ছে। রতনলাল একটু অবাক হয়ে গেল। এত রাত্রে এখানে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কেন? খারাপ হয়ে গেছে গাড়িটা?

সে গাড়িটার কাছে এসে উঁকি মারল। ভেতরে কালো পোশাক পরা চারজন লোক বসে ব্যস্ত হয়ে কী যেন করছে। রতনলাল জিজ্ঞেস করল, "কী দাদা, কী হয়েছে? ঠেলতে হবে?"

কেউ কোনো উত্তর দিল না। গাড়ির ভেতর থেকে একটা শক্ত কালো হাত বেরিয়ে এসে তাকে একটা ধাক্কা দিল খুব জোরে। রতনলাল ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। তার যত না ব্যথা লাগল, তার চেয়ে সে অবাক হল আরও বেশী! এ কী রে বাবা! এরকম শুধু-শুধু কেউ মারে?

রতনলাল বেশ সাহসী লোক, গায়েও জোর আছে। সে মাটি থেকে উঠে লাঠিখানা বাগিয়ে ধরে আবার এগিয়ে এল। কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, "আমায় মারলেন কেন? এ কি মামদোবাজি নাকি? আমাদের গাঁয়ের মধ্যে এসে......"

রতনলালের কথা মাঝ-পথে থেমে গেল। গাড়ির একটা লোক দরজা খুলে বেরিয়ে রতনলালের ঘাড়টা চেপে ধরল, তারপর তাকে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল অনেক দূরে।

রতনলাল এবার ভয় পেয়ে গেল সাংঘাতিক। মাঠের মধ্যে কাদার মধ্যে পড়েছে বলে তার হাত-পা ভাঙেনি। সে কোনো রকমে উঠেই বাবা রে, মা রে, মেরে ফেললে রে বলে চিৎকার করে দৌড়ল বাড়ির দিকে।

গাড়ির লোকগুলো এসব কিছু গ্রাহ্যও করল না। তাদের একজন কোলের ওপর শুইয়ে নিয়েছে সুজয়কে। একজন একটা হলদে আলোর টর্চ জেলে রেখেছে। আর-একজন গাড়ির সামনে থেকে বার করল একটা করাতের মতন ছোট যন্ত্র। সেটা সুজয়ের গলার কাছে এনে ধরতেই ইলেকট্রিক যন্ত্রের মতন সেটা থেকে খররর খররর আওয়াজ বেরুতে লাগল। তারপর মাখনের মধ্যে যেমন খুব সহজেই ছুরি ডুবে যায়, সেইরকমভাবে ঐ করাতটা কেটে ফেলল সুজয়ের গলা। তার কাটা মুণ্ডুটা রাখা হল সীটের ওপর। খুব বেশি রক্তও বেরুলো না, কারণ গলাটা কাটার পরই একজন দু দিকে লাগিয়ে দিল খানিকটা মলম, তাতে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে।

এরপর করাত দিয়ে তারা সুজয়ের দুটো হাত আর দুটো পাও কেটে ফেলল খুব তাড়াতাড়ি। সেগুলোও রেখে দিল সীটের ওপরে। তারপর শুধু সুজয়ের ধড়টা উঁচু করে তুলে ধরল। একজন ছিঁড়ে ফেলতে লাগল সুজয়ের বুকের কাছের জামা। আর যে-লোকটার হাতে করাত ছিল, সে সেটা রেখে দিয়ে আর-একটা লম্বা তুরপুনের মতন যন্ত্র বার করল।

এই সময় একটা হৈ হৈ শব্দ শোনা গেল দূরে। রতনলাল গ্রাম থেকে লোকজন জুটিয়ে নিয়ে তাড়া করে আসছে। প্রায় তিরিশ চল্লিশজন লোক।

গাড়ির লোক চারটে নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করল একবার। তারা খুব বিরক্ত হয়েছে। যেন তারা খুব একটা দরকারি অপারেশান করছিল এমন সময় একটা বাধা পড়েছে। তখন একজন ঝুঁকে ড্রাইভারের গায়ে চাপড় মারতেই ড্রাইভার চালিয়ে

দিল গাড়িটা। সামনে কয়েকটা নেড়ি কুত্তা তখনও চ্যাঁচাচ্ছিল, ড্রাইভার গ্রাহ্যও করল না, তাদের ওপর দিয়েই চালিয়ে দিল গাড়ি। দুটো কুকুর চাপা পড়ে মরল। দু-এক মিনিটের মধ্যে গাড়িটা চলে গেল অনেক দূরে।

যতক্ষণ গাড়িটা চলতে লাগল, ততক্ষণ গাড়ির লোকগুলো সুজয়ের কাটা হাত-পাগুলো তুলে নিয়ে দেখতে লাগল খুব মনোযোগ দিয়ে। সুজয়ের বাঁ হাতের মাঝের আঙুলে একটা পলার আংটি ছিল। একজন টেনে-টেনে খুলে ফেলল সেই আংটিটা। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল সেটাকে। তারপর খুব জোরে চাপ দিতেই মট করে ভেঙে গেল সোনাটা আর পলাটা খসে পড়ল। লোকটা সেই পলাটা টুপ করে মুখে পুরে দিয়ে চুষতে লাগল লজেন্সের মতন।

খানিকটা দূরে একদম ফাঁকা জায়গা দেখে গাড়িটা থামল। আবার একজন টর্চ জেলে রইল, একজন সুজয়ের ধড়টা তুলে ধরল উঁচু করে। অন্য লোকটা তুরপুনের মতন যন্ত্রটা বাগিয়ে নিল সুজয়ের বুকের কাছে।

কিন্তু এবারও বাধা পড়ল। খুব জোর হেডলাইট জেলে উল্টো দিক থেকে একটা গাড়ি আসছে। একটা ট্রাক। এই গাড়ির লোকজনরা চুপ করে বসে রইল একটু। ট্রাকটা পার হয়ে গেলেও আবার হেডলাইটের আলো। আরো ট্রাক আসছে, খানিকটা দূরে দূরে পরপর সাত-আটটা।

বিরক্ত হয়ে আবার ওরা গাড়ি চালিয়ে দিল। ট্রাকগুলোকে পার হয়ে গিয়েও থামল না। ওরা একটা নিরিবিলি জায়গা চায়।

সামনের দিক থেকে হু-হু করে হাওয়া আসছে। মনে হয় কাছাকাছি কোনো বড় নদী আছে। তার আগেই একটা ছোট্ট সরু নদী পড়ল, তার ওপরে একটা ব্রিজ।

সেই ব্রিজের পাশে নদীর ধারে বসে ছিল দুজন লোক। একজন খুব লম্বা, আর একজন বেঁটে। ওদের পোশাক একটু অদ্ভুত। ওরা পরে আছে হাফ প্যান্ট, কিন্তু ঢলঢলে নয়, কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত চেপা। গায়ে কোনো জামা নেই, দুজনে জড়িয়ে আছে দুটো বেশ বড় চাদর।

এর আগে ব্রিজের ওপর দিয়ে অনেক গাড়ি গেছে, ঐ লোক দুটো একটু নড়াচড়া করেনি। কিন্তু এবার ঐ কালো গাড়িটা আসতেই লোক দুটি চট করে উঠে দাঁড়াল, সোজা চলে এল রাস্তার মাঝখানে।

গাড়িটা যে-রকম জোরে ছুটে আসছে, তাতে ওদের ঠিক ধাক্কা মেরে দেবে। কালো গাড়ির ড্রাইভার ওদের দেখেও গাড়ি থামাবার চেষ্টা করল না। সরাসরি ওদের ওপর দিয়ে গাড়িটা চালিয়ে দিল।

তখন একটা অবিশ্বাস্য কাণ্ড হল। অত জোরে ছুটে-আসা গাড়ির ধাক্কা খেয়েও লোক-দুটো একটুও টলল না। বরং গাড়ি-টাই প্রায় উল্টে যাচ্ছিল। কোনোক্রমে গাড়িটা সোজা হতেই এবার যেন ভয় পেয়ে গাড়ির ড্রাইভার লোক দুটোকে পাশ কাটিয়ে চেষ্টা করল পালাবার। কিন্তু পারল না। লম্বা লোকটা

আর একটা যাচ্ছেতাই কান্ড করল। সে গাড়ির বাম্পারটা ধরে ফেলল, তারপর এক হাতে গাড়িটা উঁচু করে তুলে ঘোরাতে লাগল মাথার ওপর। গাড়িটার দরজাগুলো সব খুলে গেল আর তার থেকে টুপ টুপ করে ইঁদুরের মতন খসে পড়ল সেই কালো পোশাক পরা লোকগুলো, তারা এদিক-ওদিক দৌড়ে পালাতে লাগল। বেঁটে লোকটি তাড়া করে গেল তাদের ধরতে।

লম্বা লোকটি গাড়িটা আবার নামিয়ে আনতেই সুজয়ের মুণ্ডুটা গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে ঠিক একটা বলের মতন গড়াতে লাগল রাস্তার ওপর। লম্বা লোকটা সেটা দেখতে পেয়েই শিস দিয়ে উঠল জোরে। তারপর গাড়িটাকে খেলনার মতন ছুঁড়ে দিয়ে সুজয়ের মুণ্ডুটা তুলে নিল রাস্তা থেকে।

বেঁটে লোকটি কালো-পোশাক-পরা লোকগুলোকে তাড়া করে গিয়েছিল, সেই লোকগুলো ঝপাঝপ নেমে পড়ল জলের মধ্যে। ডুব দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। বেঁটে লোকটিও জলে নামতে যাচ্ছিল, থমকে গেল লম্বা লোকটির শিস শুনে। ফিরে এল তার কাছে।

লম্বা লোকটি তখন সুজয়ের হাত-পাগুলো খুঁজছে। বেঁটে লোকটি এসে সুজয়ের মুণ্ডুটা দেখেই অন্যরকম ভাষায় কী যেন বলল। লম্বা লোকটিও উত্তর দিল সেই ভাষায়।

সুজয়ের দুটো পা আর ডান হাতটা পাওয়া গেছে, কিন্তু বাঁ হাতটা আর পাওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই। দুজনেই এদিকে সেদিকে খুঁজতে লাগল। অন্ধকারের মধ্যেও ওদের দেখবার কোনো অসুবিধে হয় না। অনেক খোঁজাখুঁজি করে দেখা গেল ভাঙা গাড়িটার মধ্যে স্টিয়ারিংয়ের নীচে সুজয়ের বাঁ হাতটা আটকে আছে। তার একটা আঙুল চিপটে গেছে একেবারে, মাংস কেটে সাদা হাড় বেরিয়ে পড়েছে।

লম্বা লোকটির কোলে রইল সুজয়ের মুণ্ডু, আর বেঁটে লোকটি হাত-পাগুলো গুছিয়ে নিয়ে হাঁটতে লাগল নদীর ধার দিয়ে। বেশ খানিকটা দূরে এসে নদীর ঢালু পাড়ে নরম মাটির ওপর বসে পড়ল ওরা। তারপর সুজয়ের ধড়টা প্রথমে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে মুণ্ডু ও হাত-পাগুলো ঠিক জায়গায় সাজাতে লাগল। বেঁটে লোকটি প্রথমে ডান হাতের জায়গায় বাঁ হাত আর বাঁ হাতের জায়গায় ডান হাত বসিয়েছিল, লম্বা লোকটি সেটা ঠিক করে দিল তাড়াতাড়ি। পা দুটো সামান্য বেঁকে ছিল, তাও ঠিক করে দেওয়া হল। সুজয়ের চোখ দুটো খোলা। মুণ্ডুটা রাস্তায় গড়াবার সময় মুখময় ধুলো লেগে গেছে, বেঁটে লোকটি যত্ন করে মুছে দিল সব ধুলো।

এবার বেঁটে লোকটি মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে চোখ বুজল। ঠিক ধ্যানের মতন ভঙ্গি। হাত দুটো সামনে বাড়ানো। লম্বা লোকটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে কোমর থেকে ঘড়ির মতন একটা যন্ত্র বার করে দেখতে লাগল এক দৃষ্টে। ঘড়ির মতনই শব্দ হচ্ছে সেই যন্ত্রটা থেকে।

বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। কারুর মুখে একটাও কথা নেই, দুজন লোক ঠিক একভাবে রইল। তারপর সেই ঘড়ির মতন যন্ত্রটার আওয়াজ থেমে যেতেই লম্বা লোকটি একটা শিস দিল। বেঁটে লোকটি তক্ষুনি ঝুঁকে ছুঁয়ে দিল সুজয়ের শরীর। তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। সুজয়ের মুণ্ডু, ধড়, কাটা হাত পা—সব কিছু অদৃশ্য হয়ে গেল তক্ষুনি! ঠিক ম্যাজিকের মতন।

বেঁটে লোকটি কিন্তু উঠল না। ঠিক সেইরকম হাত বাড়িয়ে বসে রইল একই জায়গায়। লম্বা লোকটির ঘড়ির মতন যন্ত্রে শুরু হল আবার আওয়াজ। আবার অনেকক্ষণ সময় কাটার পর আওয়াজটা বন্ধ হতেই লম্বা লোকটি শিস দিয়ে উঠল, আর বেঁটে লোকটি তার হাত দুটো তুলে নিল উঁচুতে।

এবার আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। যেখানে সুজয়ের দেহ ছিল, সেখানে চলে এল একটা ফুলগাছ। মাটির মধ্যে পোঁতা। তাতে একটা মাত্র লাল রঙের ফুল ফুটে আছে। গাছটি বেশি বড় নয়, মাত্র এক হাত উঁচু, তার দুটো ডালে সবুজ পাতা।

বেঁটে লোকটির মুখে এবার ফুটে উঠল একটা খুশির হাসি। সে খুব আদর করে হাত বুলোতে লাগল গাছটার গায়ে। লম্বা লোকটিও মাটিতে বসে পড়ে খুব যত্ন করে দেখতে লাগল গাছটাকে। তারও মুখে বেশ একটা খুশি-খুশি ভাব। দুজনে দুজনের দিকে চোখাচোখি করল একবার। তারপর উঠে দাঁড়াল। এবার দুজনে সেই অন্যরকম ভাষায় কিছু কথা বলে সোজা নেমে গেল নদীতে। ডুব দিল, আর উঠল না।

হাওয়ায় দুলতে লাগল সেই ফুলগাছটা। আকাশে একটু-একটু জ্যোৎস্না। ধারে কাছে মানুষজন কেউ নেই। নির্জন নদী-তীর। শুধু নদীর জল পাড়ে এসে লাগার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই!

বেশ খানিকটা বাদে দুটো ধেড়ে মেঠো ইঁদুর বেরিয়ে এল একটা গর্ত থেকে। সুরুত সুরুত করে এদিক-ওদিক ঘোরা-ঘুরি করতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে তারা চলে এল ফুলগাছটার দিকে। গাছটা থেকে খানিকটা দূরেই তারা থমকে দাঁড়াল। ছুঁচোলো মুখ দুটো উঁচু করে কিসের যেন গন্ধ শুঁকল তারা। তারপর হঠাৎ কিচকিচ শব্দ করে উল্টো দিকে ছুটে পালাল। যেন তারা বুঝতে পেরেছে, ঐ ফুলগাছটা একটু আগেও ওখানে ছিল না, ওটা সাধারণ গাছ নয়।

একটু বাদে একটা হলদে-কালো হেলে সাপও ব্যাঙ খুঁজতে-খুঁজতে এল ঐখানে। সাপটাও ফুলগাছটার দিকে তাকিয়ে থমকে গেল একটু। সেও বুঝল, ঐ গাছটা অন্যরকম। কিলবিল করে বেঁকে সাপটা চলে গেল দূর দিয়ে।

কেউ জানল না, জ্যোৎস্নার মধ্যে একটা নির্জন নদীর ধারে সুজয় একটা ফুলগাছ হয়ে হাওয়ায় দুলছে। সুজয় নিজেও জানে না।

৬

বাবার হারুমামা বললেন, "দেখলে আমার মন্ত্রের জোর! কুকুরটাকে ঠিক ফিরিয়ে আনলাম কিনা?"

মা বললেন, "কিন্তু জয় কোথায়? জয় তো এল না?"

ডুংগা হারুমামাকে দেখে রাগের সঙ্গে গরুর গরুর শব্দ করল।

হারুমামা হাত তুলে ডুংগাকে বললেন, "আর রাগ করিস না বাবা! সন্ধি, সন্ধি! আমিও আর তোকে মারব না, তুইও আর আমাকে কামড়াতে আসিস ন!"

ডুংগা তখন বাবার পায়ের কাছে মুখ নিয়ে ডাকতে লাগল খুব জোরে। বাবা ডুংগার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "ডুংগা! ডুংগা! কী হয়েছিল? কোথায় গিয়েছিলি?"

ডুংগা এবার এসে মায়ের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথা ঘষতে ঘষতে ডাকতে লাগল খুব করুণ সুরে। মা বললেন, "জয় কোথায় গেল? কী সর্বনাশের কথা, ডুংগা ফিরে এল, জয় এল না?"

ডুংগা জয়ের নাম শুনেই ছুটে বেরিয়ে গেল গেট পেরিয়ে রাস্তায়। ডাকতে-ডাকতে খানিকটা দূরে গিয়ে আবার ফিরে এল। সারা পাড়া কাঁপিয়ে সে ডাকছে।

ঝর্না বলল, "বাবা, ডুংগা কিছু বলতে চাইছে। জয়ের বোধহয় কিছু হয়েছে!"

ওরা সবাই মিলে রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই ডুংগা আবার ছুটে এগিয়ে গেল খানিকটা। পেছন ফিরে ওদের দেখতে লাগল।

হারুমামা বললেন, ''কুকুরটা চাইছে ওর সঙ্গে আমরা যাই।''

সবাই ছুটতে লাগল ডুংগার পেছনে-পেছনে। মা খালি পায়েই বেরিয়ে এসেছেন রাস্তায়। বাড়ির গেট খোলা রয়ে গেল।

ডুংগা বড় রাস্তায় এসে খানিকটা ছুটেই আবার ফিরে-ফিরে এসে খুব জোরে জোরে ডাকতে লাগল বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে। সে যেন এখনো খুশি নয়। সে আরও কিছু চায়। ডুংগা সব কিছু বোঝে, শুধু মানুষের মতন কথা বলতে পারে না।

ঝর্না বলল, ''বাবা, আমার মনে হচ্ছে, অনেক দূরে যেতে হবে!''

হারুমামা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, ''ট্যাক্সি! ট্যাক্সি!''

দুটো-তিনটে ট্যাক্সি না থেমেই চলে গেল। কিন্তু একটা নীল রঙের ফিয়াট গাড়ি ঘ্যাচাং করে এসে থামল ওঁদের সামনে। পাড়ার অজয় ডাক্তার জানলা দিয়ে মুখ বার করে বললেন, ''কী ব্যাপার? এত রাত্রে রাস্তায়?''

বাবা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সব ব্যাপারটা খুলে বললেন। অজয় ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে বললেন, ''সে কী! জয় এখনো ফেরেনি? তাহলে নিশ্চয়ই কোনো গণ্ডগোল হয়েছে।''

হারুমামা বললেন, ''কুকুরটা আমাদের কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছে।''

অজয় ডাক্তার বললেন, ''উঠে পড়ুন, গাড়িতে উঠে পড়ুন! দেখা যাক ও কোথায় যেতে চায়।''

সবাই হুড়মুড় করে গাড়িতে উঠে পড়তে গেলেন। ডাক্তার মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''বৌদি আপনি আর যাবেন কী করতে? আপনি বরং বাড়িতে গিয়ে থাকুন!''

মা বললেন, ''আমি পারব না, আমি একা থাকতে পারব না, আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে!''

''কিন্তু এত রাত্রে আপনি শুধু-শুধু...আমার মনে হয় আপনার বাড়িতে থাকাই উচিত...মনে করুন জয় যদি এর মধ্যে ফিরে আসে, তা হলে কারুকে বাড়িতে পাবে না ঝর্নাকে নিয়ে আপনি বাড়িতে গিয়ে থাকুন!''

ঝর্না বলল, ''না, আমি যাব, আমি বাড়িতে থাকব না।''

বাবা তখন তাঁর হারুমামাকে বললেন ''আপনি তা হলে বরং গিয়ে...''

হারুমামা বললেন, ''না, না, আমাকে তো যেতেই হবে।''

মা হঠাৎ বললেন, ''আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি একলাই বাড়িতে থাকছি। তোমরা কিন্তু বেশি দেরি করো না।''

এইসব কথাবার্তা যতক্ষণ চলছে, ততক্ষণ ডুংগা প্রাণপণে ডেকে চলেছে। ডুংগা এমনিতে গম্ভীর ধরনের কুকুর, বেশি ডাকে না। আজ সে আকাশ ফাটিয়ে দিচ্ছে।

মাকে বাড়ির কাছে পৌঁছে দিয়ে এসে বাবা উঠে পড়লেন গাড়িতে। তারপর বললেন, ''ডুংগাকেও তুলে নেব নাকি?''

হারুমামা বললেন, ''তা না হলে রাস্তা চেনাবে কে? ডুংগা রাস্তা দেখালে তবে তো আমরা পেছনে পেছনে যাব!''

তাই হল। গাড়িটা স্টার্ট দিতেই ডুংগা ছুটল সামনের দিকে। এত রাত্রে রাস্তা একদম ফাঁকা, গাড়ি-টাড়ি আর বিশেষ নেই, ডুংগাকে পরিষ্কার দেখা যায়।

হারুমামা একটু বাদে বললেন, ''কুকুরটা যদি কোনো গুণ্ডা-ফুণ্ডার আড্ডায় নিয়ে যায় আমাদের? আমাদের সঙ্গে তো কোনো অস্ত্র নেই। পুলিসকে একটা খবর দিলে হত না!''

বাবা বললেন, ''তার আর সময় নেই। দেখাই যাক না আগে কী হয়!''

ডাক্তার হারুমামার দিকে তাকিয়ে একটুখানি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, ''আপনার তাহলে জলাতঙ্ক রোগ হয়নি শেষ পর্যন্ত! খুব কুকুর ভয় পান, তাই না?''

হারুমামা একগাল হেসে বললেন, ''না, না, আসলে আমি একটুও ভয় পাই না। তবে কুকুররা যে গায়ে উঠে পড়ে কিংবা পা চাটে, ওটা পছন্দ করি না। কুকুরের কামড়ানো তো একদমই পছন্দ করি না। ওরা দূরে দূরে থাকলেই ভাল লাগে।''

গাড়ি পেরিয়ে গেল গড়িয়ার মোড়। ঝর্না বলল, ''বাবা, জয় এতদূর নিজে-নিজে আসবে কেন বলো তো!''

বাবা বললেন, ''কিছুই তো বুঝতে পারছি না।''

হারুমামা বললেন, ''ট্রেনিং পাওয়া কুকুররা ঠিক গন্ধ শুঁকে শুঁকে মানুষ খুঁজে বের করে। এ কুকুরটার তো ট্রেনিং নেই কিছু। আমাদের শুধু শুধু ঘোরাচ্ছে না তো

ঝর্না বলল, ''আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি, ডুংগা আমাদের জয়ের কাছেই নিয়ে যেতে চাইছে!''

হারুমামা বললেন, ''কী জানি বাবা! কুকুর পাগলা হয়ে গেলে অনেক সময় উল্টোপাল্টা কাজ করে!''

ঝর্না বলল, ''ডুংগা মোটেই পাগল না!''

ডুংগা ছুটছে তো ছুটছেই। সে কতদূর যাবে কে জানে!

ডাক্তার বললেন, ''একটা মুশকিল, আমার গাড়িতে বেশি তেল নেই। এত রাত্রে তো কোথাও তেলও পাওয়া যাবে না!''

হারুমামা বললেন, ''এই রে, মাঝরাস্তায় যদি গাড়ি থেমে যায়? রাস্তার মাঝখানে এই ধাদ্ধাড়া গোবিন্দপুরে আমরা তখন কী করব?''

ডাক্তার বললেন, ''যা পেট্রল আছে, তাতে আরও দশ পনেরো মাইল চলে যাবে। দেখা যাক কী হয়।''

এবার দেখা গেল, এক জায়গায় রাস্তার মাঝখানে অনেক লোক দাঁড়িয়ে চ্যাঁচামেচি করছে। গাড়িটাকে দেখে তারা রাস্তা আটকে দাঁড়াল। সকালে এক সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে লাগল যে, কিছুই বোঝা গেল না।

হারুমামা ডাক্তারবাবুর গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে গাড়ির হর্নটা খুব জোরে চেপে ধরলেন, তাতে এত কানে-তালা-লাগানো শব্দ বেরুলো যে, সবাই হঠাৎ চুপ করে গেল। তখন হারুমামা বললেন, ''এক এক করে! এক এক করে কথা বলতে জানো না?''

এবারও ভিড়ের মধ্যে চার-পাঁচজন লোক এক সঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, ''আমি বলছি, আমি বলছি!''

হারুমামা জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে খপ্ করে একজনকে চেপে ধরে বললেন, ''শুধু এর কাছ থেকে শুনব। আর সবাই চুপ!''

তখন সেই লোকটি বলল, ''গাড়িওয়ালা লোকরা খুব পাজি হয়! তারা গ্রামের লোকদের মানুষ বলেই মনে করে না। খানিকক্ষণ আগে একটা গাড়ি এখানে দাঁড়িয়েছিল, সেই গাড়ির লোকরা শুধু-শুধু একজন লোককে মেরেছে।''

বাবা গাড়ি থেকে নেমে পড়ে হাতজোড় করে বললেন, ''দেখুন, আমরা তো কারুকে মারিনি। তা হলে আমাদের আটকাচ্ছেন কেন? আমাদের খুব জরুরি কাজ আছে।''

লোকরা বলল, ''দেখুন, আমাদের একজন লোককে কেমন ভাবে মেরেছে। মুখ দিয়ে রক্ত বমি করছে অনবরত।''

রাস্তার পাশে মুখ নিচু করে বসে আছে রতনলাল। কালো গাড়ির লোকগুলো যখন তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, তখন সে কিছু টের পায়নি। কিন্তু এখন তার বুকে খুব ব্যথা আর ভলকে-ভলকে রক্ত বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে।

গ্রামের লোকরা বলল, "ঐ গাড়ি করে রতনলালকে এক্ষুনি হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে।''

হারুমামা বললেন, "হাসপাতালে যাবার দরকার কী? আমাদের সঙ্গেই তো ডাক্তার রয়েছে!"

"কোথায় ডাক্তার? কে ডাক্তার?"

অজয় ডাক্তারকে স্টেথেস্কোপ তুলে দেখিয়ে প্রমাণ করতে হল যে তিনি সত্যিই ডাক্তার। তিনি ওষুধের ব্যাগ নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এলেন।

এদিকে গাড়িটা থেমে গেছে বলে ডুংগা পাগলের মতন চ্যাঁচাচ্ছে। সে এক মিনিট দেরি সহ্য করতে পারছে না। সে ভিড়ের লোকগুলোকে কামড়াতে যাচ্ছে। লোকেরা লাঠি নিয়ে তাড়া করল ডুংগাকে। ঝর্না তখন দৌড়ে গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে ডুংগাকে আড়াল করে দাঁড়াল।

অজয় ডাক্তার রতনলালকে পরীক্ষা করে বিশেষ কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি বমি বন্ধ হবার ওষুধ দিলেন। বাবা পাশে দাঁড়িয়ে বললেন "ওকে আমরা হাসপাতালে নিশ্চয়ই পৌঁছে দিতাম, কিন্তু আমাদের খুব জরুরি কাজ আছে, আমরা একটা ছেলেকে খুঁজতে বেরিয়েছি—"

রতনলাল জিজ্ঞেস করল, ''কত বড় ছেলে?

"এই তের চোদ্দ বছর!"

"ঐ গাড়িতে ছিল, আমি দেখেছি, একটা ছেলে, খুব সম্ভব অজ্ঞান।"

"অজ্ঞান?"

"হ্যাঁ, কালো রঙের গাড়ি...চারটে কালো পোশাক পরা লোক..."

বাবা ডাক্তারের হাতটা চেপে ধরে বললেন, ''শিগগির চলো!"

আবার সবাই হুড়মুড় করে গাড়িতে উঠে পড়লেন। ডুংগা আবার ছুটল। বাবার মুখটা শুকিয়ে গেছে। এতক্ষণ তিনি সুজয়ের কোনো বিপদের কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কিন্তু এবার তো মনে হচ্ছে, সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা হয়েছে। চারজন গুণ্ডা...

আরও খানিকটা দূর যাবার পর হঠাৎ গাড়ির গতি কমে এল। ডাক্তার বললেন, যাঃ!

হারুমামা জিজ্ঞেস করলেন, "কী, পেট্রোল ফুরিয়ে গেল?"

"এত তাড়াতাড়ি তো ফুরোবার কথা নয়! তবে অনেক সময় তেল কমে গেলে নীচের ময়লা উঠে আসে—"

"এখন কী হবে?"

"একটু ঠেললে আবার চলতে পারে।"

হারুমামা বললেন, "অ্যাঁ? এত রাত্রে গাড়ি ঠেলতে হবে? হা ভগবান!"

গাড়িটা সত্যিই একদম থেমে গেল। নেমে পড়লেন সবাই। ডাক্তার গাড়ির বনেট খুলে খুটখাট করতে লাগলেন!

হঠাৎ ঝর্না বলল, "ঐ তো একটা গাড়ি! ওমা, গাড়িটা উল্টে গেছে—"

সবাই তক্ষুনি ছুটলেন সেই গাড়িটার দিকে। ডুংগা ঝাঁপিয়ে পড়েছে গাড়িটার ওপর। দারুণ রাগে গজরাচ্ছে।

রাস্তার পাশে একদম উল্টে পড়ে আছে গাড়িটা। সামনেই ব্রিজ। গাড়ির ভেতরে উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখা হল। ভেতরে কেউ নেই। ডুংগা লাফিয়ে ঢুকে গেল গাড়িটার মধ্যে, কামড়ে যেন সীটগুলো সব ছিঁড়ে ফেলবে। তারপর আবার এক লাফে বেরিয়ে এসে নদীর ধার দিয়ে ছুটতে লাগল।

ডুংগা যেখানে গিয়ে থামল, সেখানে কিন্তু ফুলগাছটা নেই! মাটিতে খানিকটা গর্ত করা। ডুংগা সেখানে এসে পা দিয়ে মাটি আঁচড়াতে লাগল। সে ভীষণ ছটফট করছে। ডুংগার পেছন-পেছন সবাই এসেছিলেন। কেউ কিছুই বুঝতে পারলেন না।

বাবা বললেন, "ডুংগা এ কোথায় আমাদের নিয়ে এল? এখানে কি মাটির তলায় কিছু পোঁতা আছে নাকি?"

ডাক্তার বলল, "ওই সামান্য একটা গর্ত ছাড়া মাটি তো একদম প্লেন। খোঁড়াখুঁড়ির কিছু চিহ্ন নেই তো!"

ঝর্না বলল, "এখান দিয়ে বোধহয় ওরা জলে নেমে গেছে। জলে নামলে আর কুকুররা গন্ধ পায় না!"

ডাক্তার বললেন, "কাছেই ব্রিজ রয়েছে, শুধু-শুধু জলে নামবে কেন এত রাত্তিরে!"

"যদি জয়কে ওরা জলে ফেলে দেয়?"

"জয় তো সাঁতার জানে!"

"কিন্তু গ্রামের লোকরা যে বলল, জয় তখন অজ্ঞান ছিল?"

হারুমামা বললেন, "ওরা যে জয়কেই দেখেছে, তার কি কোনো ঠিক আছে? অন্য কোনো ছেলেকেও দেখতে পারে। তাছাড়া একটা বাচ্চা ছেলেকে শুধু শুধু লোকেরা জলে ফেলে দেবে কেন? ওর কাছে কি কোনো দামী জিনিস ছিল?''

"না, তা ছিল না অবশ্য।"

''এখন আর খুঁজে লাভ নেই। কাল সকালে পুলিস নিয়ে আসতে হবে!"

"কিন্তু গাড়িটা এখন চলবে কিনা কে জানে!"

হারুমামা বললেন, "জয়কেও পাওয়া গেল না, আমরাও এখন বাড়ি ফিরতে পারব না! বোঝো ঠ্যালা!"

ডুংগা ওপরের দিকে মুখ করে করুণ সুরে ডাকছে।

বাবা হতাশ হয়ে সেই কাদামাটির মধ্যেই ধপ্ করে বসে পড়লেন।

৭

নদীর জল একদম শান্ত হয়ে ছিল। হঠাৎ সেখানে প্রচণ্ড তোলপাড় উঠল। মনে হল যেন বিরাট বিরাট প্রাণীরা জলের নীচে মারামারি করছে। একটু বাদে ভুস্ করে জলের ওপর মাথা তুলল সেই লম্বা লোকটি। খানিকটা সাঁতরে পাড়ের কাছে এসে খুব একটা ভারী কিছু জিনিস টেনে তুলল জল থেকে। তখন দেখা গেল কালো পোশাক পরা চারজন লোকের মধ্যে একজনকে টেনে তুলেছে লম্বা লোকটি।

এর পর সেই বেঁটে লোকটি ভেসে উঠল। সেও চুলের মুঠি ধরে আর-একটা কালো পোশাক পরা লোককে টেনে এনেছে।

জল থেকে উঠেও ওরা একটুও হাঁপাল না। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখল। ব্রিজটা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে ওরা।

কালো পোশাক পরা লোক দু'জন অজ্ঞান। তবু লম্বা লোকটি ঐ দুজনের মাথা ঠুকে দিল খুব জোরে। ঠিক যেন লোহার সঙ্গে লোহা ঠোকার মতন শব্দ হল।

লম্বা লোকটা ওদের দু'জনকে ফেলে দিল মাটিতে। তারপর বেঁটে লোকটির সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলল নিজেদের ভাষায়।

এবার বেঁটে লোকটি কালো পোশাক পরা লোক দু'জনের মাথার কাছে বসল। কোমর থেকে ঘড়ির মতন যন্ত্রটা বার

করল লম্বা লোকটি। বেঁটে লোকটি ধ্যানের ভঙ্গিতে সামনের দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে চোখ বুঁজে রইল। খানিক বাদেই অদৃশ্য হয়ে গেল কালো পোশাক পরা লোক দু'জন। সেই জায়গায় ফিরে এল দুটো ঝোপ-মতন গাছ। গাছগুলোর সব পাতা গোলাপী রঙের। পৃথিবীতে এরকম কোনো গাছ নেই।

লম্বা লোকটি গাছের পাতাগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে কিছু বলতেই বেঁটে লোকটি আবার গাছ দুটোর পাতা কালচে-সবুজ রঙের করে দিল।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল আবার। নদীর ধারে-ধারে কী যেন খুঁজতে লাগল। বেশ খানিকক্ষণ হাঁটার পর ওরা দেখতে পেল সেই ফুলগাছটা। গাছের লাল ফুলটা যেন হঠাৎ হাওয়ায় দুলে উঠল বারবার। বেঁটে লোকটি সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে প্রথমে গাছটার গায়ে হাত বোলাল আদর করে। তারপর খানিকটা মাটি গর্ত করে শেকড়-সমেত গাছটা তুলে নিল।

এবার তারা ব্রিজ পার হয়ে এসে বড় রাস্তা ধরে হাঁটল কিছুক্ষণ। তারপর রাস্তার ধারেই একটা বড় আমগাছের নীচে থামল। ফুলগাছটা শুইয়ে দিল মাটিতে। তার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে বেঁটে লোকটি আবার সেই একই ভাবে চোখ বুজে হাত বাড়িয়ে রইল। লম্বা লোকটার হাতে ঘড়ির মতন যন্ত্র. তাতে শব্দ হচ্ছে টিক টিক টিক টিক। এক সময় শব্দটা থেমে যেতেই লম্বা লোকটি শিস দিয়ে উঠল, বেঁটে লোকটি ঝুঁকে এসে ছুঁয়ে দিল গাছটা।

কিন্তু কিছুই হল না, গাছটা গাছই রয়ে গেল!

লম্বা এবং বেঁটে লোকটি খুব চিন্তিত ভাবে তাকাল পরস্পরের দিকে। খানিকক্ষণ নিজেদের মধ্যে কী সব কথা বলল। তারপর দু'জনেই বসল গাছটার পাশে, দুজনে এক সঙ্গে ধ্যানের ভঙ্গিতে চোখ বুজে রইল। যন্ত্রটা রাখা রইল মাটিতে। সেটার শব্দ থেমে যেতেই দু'জনে একসঙ্গে ছুঁয়ে দিল গাছটা।

অমনি গাছটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

যন্ত্রটায় শব্দ হতে লাগল আবার। ওরা চোখ খুলল না। বসেই রইল একদম চুপচাপ, একটুও নড়ল না। তারপর এক সময় দেখা গেল, আবছা মতন একটা মানুষের মূর্তি। ঠিক যেন ঘষা কাচ দিয়ে বানানো। ক্রমশ সেটা স্পষ্ট হতে লাগল। এক সময় হঠাৎ সেই মূর্তিটা সুজয় হয়ে গেল।

লোক দুটি এবার চোখ খুলল। হাসি ফুটে উঠল ওদের মুখে। ওরা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সুজয়ের দিকে।

সুজয়ের চোখ বোজা। যেন সে অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়ে আছে। বেঁটে লোকটি সুজয়ের সারা গায়ে হাত বুলোতে লাগল। সুজয়ের নাক, মুখ, হাত-পায়ের আঙুল দেখতে লাগল খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। সুজয়ের বাঁ হাতের একটা আঙুল থ্যাতলানো। নখের পাশটা অনেকখানি চেপটে গিয়ে রক্ত জমে আছে। বেঁটে লোকটি সেটা দেখাল লম্বা লোকটিকে। লম্বা লোকটি এমন একটা ভঙ্গি করল, যার মানে হল, থাক্, ওটুকু থাক্।

বেঁটে লোকটি খুব আলতো করে সুজয়ের চোখের পাতায় হাত বোলাতে লাগল। এক সময় সুজয়ের ডান ভুরুটা একটু নড়ে উঠল। তারপর সে স্পষ্ট দুচোখ মেলে তাকাল।

সঙ্গে সঙ্গে লোক দুজন সুজয়ের দু-হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিল রাস্তার ওপর।

বেঁটে লোকটি পরিষ্কার বাংলায় বলল, "আপনার লাগেনি তো?"

লম্বা লোকটি ঝুঁকে পড়ে খুব বিনয়ের সঙ্গে নমস্কার করে জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছেন, জয়বাবু?"

সুজয় একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। প্রথমটায় সে কিছুই বুঝতে পারল না। সে কোথায়? মোটরগাড়ির লোক-গুলো কোথায় গেল? ডুংগা কোথায়? এই লোক দুজন কোথা থেকে এল?

সুজয় কথা বলার চেষ্টা করতে গিয়েও পারল না, মুখ খুলে কিছু বলতে গেল, কিন্তু শব্দ বেরোচ্ছে না।

বেঁটে লোকটি সুজয়ের পেট আর বুকে কয়েকটা চাপড় মারতেই সুজয় আঁক করে একটা শব্দ করল। তারপরই জিজ্ঞেস করল, "আপনারা?"

লম্বা লোকটি বলল, "আমাদের চিনতে পারছেন না?"

সুজয় বলল, "কেন চিনতে পারব না? আপনাদের কি আমি কখনো ভুলতে পারি? সেই যে সেবার অজন্তা-ইলোরায় দেখা হয়েছিল!" *

বেঁটে লোকটি বলল, "আবার কেমন দেখা হয়ে গেল!

সুজয় বলল, "আপনাদের দেখে আমার ভীষণ ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। আমি প্রায়ই আপনাদের স্বপ্নে দেখি। বোধহয় আজও একবার দেখেছি। কিন্তু আমি এখানে কী করে এলাম? আমাকে চারজন লোক জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল!"

বেঁটে লোকটি বলল, "তারপর আপনি গাড়ি থেকে পড়ে গেলেন। সেই জন্যই জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনার লাগেনি তো?"

সুজয় বলল, "না, শুধু একটা আঙুলে খুব ব্যথা, এই যে, আঙুলটা থেতলে গেছে। আমার জামাটাও একদম ছেঁড়া! যাক গে। ডুংগা কোথায়?"

"ডুংগা কে?"

"ডুংগা আমার পোষা কুকুর। সে তো গাড়িটার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটছিল।"

"সেরকম কোনো কুকুর তো আমরা দেখিনি?"

"আমি কি গাড়িটা থেকে এমনি-এমনি পড়ে গেলাম? আমার কিছুই মনে পড়ছে না। একটা লোকের চোখ দিয়ে কী বীভৎস সবুজ রঙের আলো বেরুলো...ওঃ, ওরা সাঙ্ঘাতিক লোক!"

"সত্যিই ওরা সাঙ্ঘাতিক।"

"আপনারাই নিশ্চয়ই ওদের হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়ে-ছেন। সেবারেও আপনারা আমার বাবাকে আর দিদিকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। আপনারা ভীষণ ভাল মানুষ।"

লম্বা লোকটি হেসে বলল, "জয়বাবু, আমরা তো মানুষ নই।"

সুজয় বলল, "জানি! আপনারা অন্য গ্রহের প্রাণী। কিন্তু মানুষের মতনই তো দেখতে। আমরা বইতে পড়ি, অন্য গ্রহের প্রাণীরা খুব ভয়াবহ। তারা যে-কোনো সময় পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে পারে। কিন্তু আপনারা তো সে-রকম নন। আপনারা সত্যিই খুব ভাল।"

লম্বা লোকটি বলল, "আমরা ভালও নই। খারাপও নই। আমরা এই রকমই।"

"কিন্তু আপনারা যে বলেছিলেন আর ফিরে আসবেন না? আপনারা তো অনেক দূরে থাকেন?"

"কত দূরে মনে আছে?"

হ্যাঁ, সুজয়ের মনে আছে। ও'রা সেবার বুঝিয়ে দিয়ে-ছিলেন। উরেঃ বাবা, সে এক দারুণ অঙ্ক। যে-কোনো জিনিসের মধ্যেই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটতে পারে আলো। এক বছরে

---

* এই দুজন লোকের আগেকার কথা আছে এই লেখকের লেখা 'তিন নম্বর চোখ' বইতে।

আলো যতখানি দূরে যায় তাকে বলে আলো-বছর। এক বছরে আলো যায় ১৮৬০০০×৬০×৬০×২৪×৩৬৫ মাইল। এরকম এক কোটি পনেরো লক্ষ আলো-বছর দূরে ও'দের গ্রহ। পৃথিবীর মানুষ কোনোদিন সেখানে যেতে পারবে না। যেতে যেতেই আয়ু ফুরিয়ে যাবে।

অঙ্কটা মনে পড়ে যাওয়ায় সুজয় দারুণ অবাক হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা অতদূরে থেকে আবার ফিরে এলেন?"

বেঁটে লোকটি বলল, "না, আমরা যাইনি! একবার ফিরে গেলে আমরাও আর আসতে পারতাম না।"

"কিন্তু আমি যে সেবার দেখেছিলাম, আপনারা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ, পৃথিবী ছেড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কাছাকাছি একটা গ্রহতে পৌঁছতেই আমাদের কাছে খবর এল আবার পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্যই।"

"কেন?"

"সে অনেক ব্যাপার আছে। আপনাকে পরে বলব।"

সুজয় হঠাৎ এদিক-ওদিক চেয়ে বলল, "এখন কটা বাজে বলতে পারেন?"

লম্বা লোকটি বলল, "তা তো আমরা জানি না। আমরা শুধু দিনরাত্রির হিসেব রাখি।"

সুজয় বলল, "অনেক রাত, আমি বাড়ি ফিরিনি, আমার মা-বাবা দারুণ চিন্তা করছেন। কিন্তু আপনাদের ছেড়ে আমার চলে যেতেও ইচ্ছে করছে না এক্ষুনি! আমার খুব খিদেও পেয়েছে। আপনাদের খিদে পায় না?"

বেঁটে লোকটি হেসে বলল, "পাবে না কেন? সব প্রাণীরই খিদে পায়। তবে, আমাদের কাছে তো কোনো খাবার নেই। এই গাছটায় ফল ফলে আছে, খাবেন?"

সুজয় ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল, "কাঁচা আম! নুন পাব কোথায়? নুন ছাড়া খেলে যে দাঁত টকে যাবে।"

"আমরা পাকিয়ে দিচ্ছি! পাকা আম খেলে দাঁত টকে যায় না তো?"

লম্বা লোকটি লাফিয়ে উঠে গাছের একটা ডাল ধরে ফেলল। তারপর ডালটা ধরে নিচু করাবার চেষ্টা করতেই ডালটা মড়াৎ করে ভেঙে গেল। আর একটু হলে অতবড় ডালটা সুজয়ের মাথার ওপরে পড়ছিল!

লম্বা লোকটি কয়েকটা আম পটাপট করে ছিঁড়ে দিল বেঁটে লোকটির হাতে। বেঁটে লোকটি সেগুলো মুঠো করে ঝাঁকাতেই সেগুলো হলদে-লাল মেশানো রঙের পাকা আম হয়ে গেল।

সুজয় বলল, "আপনি দারুণ ম্যাজিক জানেন! সেবারও দেখেছি!"

বেঁটে লোকটি হাসল।

"এগুলো সত্যি-সত্যি পাকা, না চোখের ভুল? খাওয়া যাবে?"

"খেয়ে দেখুন!"

সুজয় একটা আমের তলার দিকটা ফুটো করে চুষতে লাগল। সত্যিই পাকা আম। তবে খুব মিষ্টি নয় অবশ্য। ভাল জাতের আম তো নয়।

পরপর দুটো আম খেয়ে সুজয়ের খানিকটা খিদে মিটল। তার মনের মধ্যে একটা খুশি-খুশি ভাব টগবগ করছে। সে যেন একটা নতুন মানুষ হয়ে গেছে হঠাৎ। সে কি এই লোক দুটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে বলে? ওদের দেখলে সুজয়ের সত্যি খুব ভাল লাগে। ওরা মিষ্টি করে কথা বলে, সুজয়কে আপনি বলে ডাকে।

সুজয় বলল, "মনে হচ্ছে মাঝরাত্তির পেরিয়ে গেছে। এখন আর বাড়ি ফিরবই বা কী করে! এই রাস্তায় নিশ্চয়ই বাস চলে। কাল সকালে বাসে করে বাড়ি চলে যাব। আসুন না ততক্ষণ আমরা এই গাছতলাটায় বসে একটু গল্প করি।"

লম্বা লোকটি বলল, "বসব? আমাদের অবশ্য অনেক কাজ —আজ রাত, কালকের দিন আর কালকের রাতের মধ্যে অনেক কাজ শেষ করতে হবে। আচ্ছা, একটু বসা যাক্।"

ঐ দুজন লোকের গায়েই লম্বা লম্বা চাদর। বেঁটে লোকটি তার চাদরের একটা পাশ পেতে ফেলল, তার ওপর বসল তিন-জনে। সুজয় প্রথমেই বলল, "আমি কিন্তু আপনাদের নাম জানি না। সেবারেও জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। আপনারা আমার নাম জানেন, অথচ...আপনাদের নাম কী?"

লম্বা লোকটি বলল, "আমাদের নাম?" তারপর সে বেঁটে লোকটির দিকে তাকাল। তারপর দুজনেই হেসে ফেলল।

বেঁটে লোকটি বলল, "আমাদের নাম শুনে আপনি কিছু বুঝতে পারবেন না। আমাদের গ্রহে আপনাদের মতন এরকম নাম হয় না। আমরা তো শুধু সংখ্যা দিয়ে কথা বলি! তারচেয়ে এক কাজ করুন। আপনিই আমাদের দুটি নাম বানিয়ে দিন। আপনাদের ভাষায় আমাদের কী নাম হতে পারে বলুন না!"

সুজয়ের প্রথমেই মনে পড়ল লরেল-হার্ডি। তারপর ভাবল, না এটা ঠিক মেলে না। হার্ডি খুব মোটা। এরা তো কেউ মোটা নয়।

তখন সে মুচকি হেসে বলল, "বাংলায় আপনাদের নাম হওয়া উচিত লম্বু আর বাঁটকুল।"

ওরা দুজনেই বলল, "বাঃ, এ তো বেশ ভাল নাম। তবে তাই হোক, এখন থেকে আমরা লম্বু আর বাঁটকুল হলাম!"

সুজয় বলল, "না, না, না! আমি ঠাট্টা করছিলাম। ও দুটো ভাল নাম নয়। লম্বা আর বেঁটে লোকদের লোকে ঐ নামে রাগায়। আমি আপনাদের ভাল নাম দিচ্ছি। সুদীর্ঘ আর সুক্ষুদ্র।"

বেঁটে লোকটি জিজ্ঞেস করলো, "কে সুদীর্ঘ আর কে সুক্ষুদ্র?"

সুজয় তার দিকেই আঙুল দেখিয়ে বলল, "আপনি সুক্ষুদ্র।"

বেঁটে লোকটি বলল, "না, আমার সুদীর্ঘ নামটা বেশী পছন্দ!"

লম্বা লোকটি বলল, "নিক না, ও-ই সুদীর্ঘ নামটা নিক!"

সুজয় বলল, "না, না, তাতে ঠিক মানাবে না!"

বেঁটে লোকটি বলল, "কেন, মানাবে না? নাম তো একটা যা হোক কিছু হলেই হল।"

সুজয় বলল, "কিন্তু নামের তো একটা করে মানে আছে!"

বেঁটে লোকটা দুঃখ করে তখন বলল, "জয়বাবু, আপনি বুঝি আমাকে খারাপ মানের নামটা দিতে চান? আপনি আমাকে ভালবাসেন না!"

সুজয় বলল, "আহ, তা কেন? আপনার নামের মানেটাও খারাপ নয়। কিন্তু আপনি তো ছোট!"

"কে বলল আমি ছোট? আমাদের রকেটে যে-রকম জায়গা থাকে, সেই অনুযায়ী আমাদের শরীরের মাপ হয়। দেখবেন, আমি কত বড় হতে পারি?"

কিন্তু সেটা আর দেখা হল না। তার আগেই রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি এসে গেল। ওরা চমকে সামনে তাকাল। সুজয় ফিসফিস করে বলল, "সেই কালো গাড়িটা!"

একটা কালো গাড়ি ঠিকই, কিন্তু তাতে রয়েছে শুধু এক-

জন ড্রাইভার, রোগা-মতন খাকি-জামা-পরা একজন লোক। গাড়িটা থেমে গেল ওদের কাছে। ড্রাইভারটি মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "দাদা, সোনারপুরের রাস্তা কি এই দিকে?"

সন্তু উত্তর দিল, "আমরা জানি না।"

"একটু আগে দেখে এলাম একটা সাঙ্ঘাতিক অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে। একটা গাড়ি উল্টে গেছে।"

"কোথায়?"

"এই মাইল দেড়েক দূরে! আপনারা এখানে বসে আছেন কেন? কোথাও যাবেন? আমি পৌঁছে দিতে পারি।"

লম্বা লোকটি ফিসফিস করে বলল, "না আমাদের দরকার নেই। জয়বাবু, একটা কিছু উত্তর দিয়ে দিন।"

সন্তু বলল, "আমাদের কুকুর হারিয়ে গেছে, আমরা কুকুর খুঁজতে বেরিয়েছি।"

লোকটা আবার গাড়ি স্টার্ট করে দিল। গাড়িটা খানিকটা দূরে চলে যাবার পর লম্বা লোকটি বলল, "জয়বাবু, আপনি কালো গাড়ি দেখেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই লোকটা সে দলের নয়।"

"কোন্ দল?"

"যারা আপনাকে ধরে নিয়ে পালাচ্ছিল। তাদের গায়ে একরকম গন্ধ আছে, দূর থেকেই আমরা তা টের পাই।"

"ঠিক বলেছেন। গাড়িতে উঠে আমিও একটা গন্ধ পাচ্ছিলাম। একটু যেন পচা মাছের মতন গন্ধ। ওরা কারা? আপনারা ওদের চিনলেন কী করে?"

"জয়বাবু, আপনাদের পৃথিবীর খুব বড় একটা বিপদ আসছে।"

"কী বিপদ?"

"আপনি জানেন নিশ্চয়ই আপনাদের পৃথিবীতে মানুষ খুব বেড়ে যাচ্ছে?"

"হ্যাঁ জানি। সবাই বলে। খবরের কাগজেও খুব লেখে।"

"কেন এত মানুষ বাড়ছে জানেন? অন্য গ্রহ থেকে প্রচুর প্রাণী এসে মানুষের মতন সেজে থাকছে পৃথিবীতে। আপনারা দেখলে চিনতেই পারবেন না। দিন-দিনই তারা বেশি করে আসছে।"

"কেন, অন্য গ্রহ থেকে তারা পৃথিবীতে আসছে কেন? পৃথিবীটা কি সব গ্রহের চেয়ে ভাল?"

"না, তা নয়। সত্যি কথা বলতে কী, আপনাদের পৃথিবী-টার চেয়ে অনেক অনেক ভাল ভাল গ্রহ আছে। এমন অনেক গ্রহ আছে, যেখানে খাবার-দাবারের কোনো অভাব নেই। সবাই সমানভাবে খেতে পায়। কিন্তু আপনাদের এখানে এমন একটা জিনিস আছে, যা আর বহু জায়গায় নেই।"

"কী সেটা?"

"জল।"

"জল? অন্য জায়গায় জল নেই?"

"অনেক গ্রহতেই নেই! যেসব গ্রহে জল ছিল, সে-সব জায়গাতেও জল ফুরিয়ে আসছে খুব তাড়াতাড়ি। অনেকে অন্য গ্রহ থেকে এসে এখান থেকে জল চুরি করে নিয়ে যায়।

"নিক না, যত ইচ্ছে। আমাদের তো অনেক আছে। জানেন, আমাদের এই পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল!"

"এই জলও খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যেতে পারে। এমন কী, ইচ্ছে করলে একদিনেও ফুরিয়ে দেওয়া যায়। যাই হোক, এত সব নানারকম গ্রহ থেকে প্রাণী আসছে যে সকলকে আমরাও চিনতে পারি না। এই যে দেখুন, একটু আগে যে-লোকটি একা একা গাড়ি চালিয়ে গেল, ও মানুষ নাও হতে পারে।"

"কেন? ঠিক আমাদের মতন কথা বলল।"

"কথা অনেকেই বলতে পারে। কিন্তু এত রাত্তে একটা লোক গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে, অথচ সোনারপুরের রাস্তা চেনে না, এটা কি স্বাভাবিক?"

"ওরে বাবা! শুনেই ভয় করছে। এরা কি সবাই খুব খারাপ প্রাণী?"

"সবাই নয়। তবে অনেকেই খুব হিংস্র। সেই জন্যই দেখবেন, পৃথিবীতে খুন আর মারামারি ক্রমশই খুব বেড়ে যাবে। আপনারা বুঝতে পারবেন না, আপনারা মানুষকেই দোষ দেবেন।"

"আমাকে যারা ধরেছিল, তারাও বাইরের প্রাণী?"

"ওরা খুব খারাপ ধরনের প্রাণী। ওদের জন্যই আমরা এসেছি। আপনি যে চারজনকে দেখেছিলেন, তাদের মধ্যে দুজনকে আমরা ধরেছি, আর দুজন পালাল।"

সন্তু উত্তেজিতভাবে বলল, "তাদের ধরেছেন? তারা কোথায়?"

বেঁটে লোকটি বলল, "তাদের আমরা এখন গাছ বানিয়ে রেখেছি। পরে নিয়ে যাব।"

সন্তু দারুণ সন্দেহের চোখে তাকাল। এরা কি তাকে ছোট ছেলে পেয়ে বোকা বানাবার চেষ্টা করছে নাকি? মানুষকে কখনো গাছ বানানো যায়? যত সব গাঁজাখুরি কথা।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "বলুন না, সেই লোকদুটোকে ধরে কোথায় রেখেছেন!"

"বললুম তো, তাদের গাছ বানিয়ে রেখেছি!"

"যাঃ!"

"বিশ্বাস হল না?"

"মানুষকে আবার গাছ বানানো যায় নাকি? আপনারা আমাকে গাছ করে দিতে পারেন?"

ওরা দুজনে এক সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল। সন্তু সে-হাসির মানে বুঝতে পারল না কিছুই। লম্বা লোকটি বলল, "না, না, জয়বাবু আপনাকে কেন গাছ বানাব? আপনি তো খারাপ লোক নন!"

"আমাকে তা হলে সেই গাছ দুটো দেখান!"

"দেখাব।"

"বাকি লোক দুটো কোথায় গেল?"

"তারা জলে নেমে পড়েছে। ওরা জলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।"

"জলের মধ্যে কতক্ষণ থাকবে? নিশ্বাস নেবে কী করে?"

"ওরা পারে। ওরা জলের মধ্যে সাত দিন আট দিনও লুকিয়ে থাকতে পারে। আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, আপনাদের এখানে কাছেই যে সমুদ্র, সেখানে অন্য গ্রহ থেকে এরকম অনেক প্রাণী এসে লুকিয়ে আছে। মাঝে-মাঝে তারা মানুষের রূপ ধরে ওপরে এসে ঘুরে বেড়ায় আর কিছু গোলমাল দেখলেই জলে নেমে পড়ে। এদের বাড়তে দিলে পৃথিবীর সর্বনাশ হয়ে যাবে!"

"তাহলে কী হবে? জলের মধ্যে এদের ধরাও তো যাবে না!"

"সে-ব্যবস্থাও আছে। দু একটা যন্ত্রপাতি আনাতে হবে শুধু। আমরা ভাবছি, এখানকার সমুদ্রটা শুকিয়ে ফেলে খুঁজে দেখব ওরা কতজন লুকিয়ে আছে।"

"সমুদ্র শুকিয়ে ফেলবেন? তা কখনো সম্ভব?"

"অসম্ভব কিছুই না। এজন্য আমাদের আর একবার ফিরে যেতে হবে। বেশি দূর নয়। কাছাকাছিই একটা ফাঁকা গ্রহে আমাদের গুদাম ঘর, সেখান থেকে কয়েকটা যন্ত্র নিয়ে আসব, তারপর সমুদ্রের জলটা সরিয়ে ফেলে—"

সুজয় আপন মনে বলল, "অগস্ত্য!"

বেঁটে লোকটি জিজ্ঞেস করল, "আশ্চর্য! আপনি জানলেন কী করে জয়বাবু? অগস্ত্য তো আমাদের একটা মেশিনের নাম।"

সুজয় বলল, "না, না, মেশিন নয়। অগস্ত্য একজন ঋষি। এক সময় দেবতাদের সঙ্গে লড়াই করতে-করতে পালিয়ে এসে অসুররা সমুদ্রের তলায় লুকিয়ে ছিল। তখন অগস্ত্য ঋষি এক চুমুকে সমুদ্রের সব জল খেয়ে ফেললেন, সমুদ্র শুকিয়ে গেল আর অসুররা বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হল।"

লম্বা লোকটি বলল, "বাঃ, বেশ চমৎকার গল্প। মনে হচ্ছে, অগস্ত্য আমাদের গ্রহেরই কেউ। বহুদিন আগে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন।"

বেঁটে লোকটি বলল, "এখন যে প্রাণীগুলো এসেছে, এদেরও অসুর বলা যায়।"

"তাহলে কি আপনারা দেবতা?"

"তা তো জানি না! আমাদের কেউ কখনো দেবতা বলেনি। তবে, এই প্রাণীগুলো আমাদের শত্রু!"

"আচ্ছা, আপনারা যখন সমুদ্রটা শুকিয়ে ফেলবেন, তখন আমাকে দেখতে দেবেন?"

"তা দিতে পারি। কিন্তু আপনি তখন কোথায় থাকবেন? আমরা কাল রাত্তিরে চলে যাব, আবার ফিরে আসব এগারো দিন এগারো রাত্তির পর।"

"আমাকে একটা খবর দেবেন, তা হলেই আমি চলে আসব। ঠিক আসব।"

"ভাল কথা। চলুন, এবার উঠে পড়া যাক!"

"আর একটা কথা। ঐ লোকগুলো আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল কেন? আমাকে নিয়ে গিয়ে ওরা কী করত?"

"খুব খারাপ কাজ করত। আপনাকে ওরা মেরে ফেলত।"

"কেন? শুধু শুধু মানুষকে মেরে ওদের কী লাভ?"

"ওদের তো হৃৎপিণ্ড নেই!"

"অ্যাঁ? হৃৎপিণ্ড ছাড়া আবার কেউ বাঁচে নাকি? জন্তু-জানোয়ারেরও তো হৃৎপিণ্ড থাকে।"

"ওদেরও আছে একরকম। তবে আপনারা হৃৎপিণ্ড বলতে যা বোঝেন, সেরকম কিছু নেই! তাই ওদের দয়া নেই, মায়া নেই, স্নেহ নেই। ওরা ভালবাসতে জানে না। কাঁদতে জানে না। সেই জন্য ওরা ভীষণ নিষ্ঠুর! ওরা আপনার হৃৎপিণ্ডটা বুক থেকে তুলে নিত। ওরা মানুষের হৃৎপিণ্ড কেটে-কেটে পরীক্ষা করে দেখছে। খুব সম্ভব ওরা মানুষের হৃৎপিণ্ড খেয়েও নেয়। কাঁচা কাঁচা!"

"ওরা রাক্ষস!"

"সেই রকমই অনকটা। পৃথিবীর মানুষ ওদের সঙ্গে পারবে না, কারণ ওরা নানান রকম রূপ ধরতে পারে। যে-কোনো সময় যে-কোনো রকম সেজে থাকবে। মানুষের পাশে-পাশে একদম সাধারণ মানুষ হয়ে ঘুরবে। কেউ চিনতে পারবে না! মানুষের মুশকিল এই যে, তারা অন্যরকম চেহারা ধরতে পারে না। সেই জন্য অন্য গ্রহের অনেক প্রাণীর সঙ্গেই লড়াই করতে গিয়ে মানুষ হেরে যাবে।"

"কিন্তু মানুষ আগে পারত। বইতে পড়েছি আমি! মহাভারতে আছে, এক ঋষি আর তাঁর বউ হরিণ হয়ে গিয়েছিলেন। রাজা নহুষ এক ঋষির অভিশাপে সাপ হয়ে গেলেন, আবার পরে মানুষ হলেন, অহল্যা বলে এক ঋষির বউ পাথর হয়ে গিয়েছিলেন।"

"হয়তো মানুষ আগে পারত। এখন ভুলে গেছে। কিন্তু এটা খুব সোজা।"

"আমাকে আপনারা শিখিয়ে দেবেন?"

"দিতে পারি। কিন্তু অনেক সময় লাগবে। আপনার মনটাকে তৈরি করতে হবে অন্য ভাবে।"

"আপনারা যা বলবেন, আমি তাই করব। ওঃ, তাহলে দারুণ ব্যাপার হবে। আচ্ছা, তখন আমি ইচ্ছে করলে অদৃশ্য হতে পারব?"

"কেন পারবেন না? এ আর এমন শক্ত কী? জল যদি বাষ্প হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, তা হলে যে-কোনো জিনিসই হতে পারে।"

"ওঃ, তাহলে দারুণ ব্যাপার হবে। অদৃশ্য হলে আমি যেখানে যখন খুশি যেতে পারব! ওঃ! জানেন, আপনাদের ছেড়ে আমার যেতেই ইচ্ছে করছে না। বাড়িতে একটা খবর পাঠিয়ে যদি আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকি?"

"কিন্তু আমাদের যে চলে যেতে হবে, জয়বাবু! কাল রাত্তিরবেলা আমাদের রকেট ছাড়বে। আজ রাত শেষ হবার আগেই আমাদের পৌঁছোতে হবে সেখানে।"

"আপনাদের রকেট কোথায় আছে?"

"সমুদ্রের মধ্যে একটা ছোট দ্বীপে।"

"আমাকে সেটা একটু দেখাবেন?"

"সেখানে আপনি যেতে পারবেন না। তাছাড়া আপনার বাড়িতে তো খবর দেওয়া হয়নি এখনো। চলুন, এগোই। আপনাকে এখানে একা ছেড়ে যেতে আমরা সাহস পাচ্ছি না। আবার কোনো বিপদ হতে পারে! চলুন সামনে এগোই। রাত শেষ হয়ে এলে আপনাকে আমরা কোনো গাড়িতে তুলে দেব। সেবারে যে-কথাটা বলেছিলাম, মনে আছে তো? আমাদের কথা কিন্তু এখন কারুকে বলবেন না! যখন সময় হবে, তখন পৃথিবীর লোককে আমরা নিজেদের পরিচয় দেব। এখনো সে সময় হয়নি।"

"পৃথিবীর সবাই আপনাদের ভালবাসবে। কারণ আপনারা আমাদের বন্ধু!"

গাছতলা থেকে উঠে এসে ওরা আবার সামনের দিকে এগোতে লাগল। এই রাস্তাটা কোথায় কোনদিকে গেছে, সুজয় কিছুই জানে না। কিন্তু এখন আর তার একটুও ভয় করছে না। এরা দুজন সঙ্গে থাকলে আর কোনো ভয় নেই।

খানিকটা রাস্তা এগিয়েই ওরা দেখল, রাস্তার পাশে আর-একটা কালো গাড়ি কাত হয়ে পড়ে আছে। সুজয় চমকে উঠে ভাবল, এটা কি সেই কালো গাড়ি, যেটার মধ্যে তাকে জোর করে আটকে রাখা রাখা হয়েছিল?

লম্বা লোকটি বললেন, "না।"

সুজয় বলল, "কী না?"

"এটা সেই কালো গাড়ি নয়। সেটা পড়ে আছে ব্রিজের ওপাশে।"

সুজয় আবার চমকে উঠল, সে তো মনে মনে ভেবেছিল, মুখে তো কিছু বলেনি! এরা মনের কথাও বুঝতে পারে?

বেঁটে লোকটি হঠাৎ ছুটে গেল উল্টানো গাড়িটার কাছে। তারপর মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করল। সুজয় আর লম্বা লোকটিও সেখানে গিয়ে দেখল, রাস্তার ধারে মাটির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে একটা মানুষ।

মুখ দেখেই সুজয় চিনল তাকে। খানিকটা আগে যে-

লোকটি একা-একা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল, যে জিজ্ঞেস করেছিল সোনারপুরের রাস্তা কোনটা, সে।

লোকটি মরে গেছে অনেকক্ষণ। চোখ দুটো খোলা, তাতে দারুণ একটা ভয়ের ভাব।

সুজয় বলল, "অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে! গাড়ি উল্টে গেছে ওর!"

বেঁটে লোকটি বলল, "না। এইখানে দেখুন। লোকটির বুকে।"

সেদিকে তাকিয়েই শিউরে উঠল সুজয়। তার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। বীভৎস দৃশ্য। লোকটির বুকের বাঁ দিকে একটা বড় চৌকো গর্ত। ঠিক যেন মেশিন দিয়ে কেউ ওর বুকের খানিকটা অংশ কেটে নিয়েছে

সুজয় বলে উঠল, ''সেই লোকগুলো ?"

লম্বা লোকটি মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

বেটে লোকটি মরা লোকটার পাশে বসে পড়ে কী যেন দেখছে। এক সময় সে একটা দুঃখের নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি একে বাঁচাতে পারব না!"

সুজয় জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

সে বলল, ''এর হৃৎপিণ্ড চুরি গেছে !"

তক্ষুনি দুপদাপ করে শব্দ হল হঠাৎ, ওরা পেছন ফিরে তাকাবারও সময় পেল না। চার-পাঁচজন কালো পোশাক পরা লোক ঝাঁপিয়ে গড়ল ওদের ওপর। তাদের হাতে মোটর গাড়ির হ্যাণ্ডেল, জ্যাক, আরও কয়েকটা লোহার জিনিস। লম্বা লোকটার আর বেঁটে লোকটার মাথায় মারতে লাগল সেই লোহা দিয়ে।

ওরা দু জনেই সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল চিত হয়ে। পড়েই ওদের দেহগুলো হয়ে গেল যেন মাটির পুতুলের মতন। লোহার বাড়ি খেয়ে সেগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তারপর সেই টুকরোগুলো ফটফট শব্দ করে আরও ভাঙতে লাগল নিজে নিজে। একেবারে ধুলোর মতন হয়ে বাতাসের এক ঝাপটায় উড়ে গেল সব সুদ্ধ।

সুজয় নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারল না যেন। তার চোখের সামনেই ঐ লোক দুটো এমনভাবে শেষ হয়ে গেল? তার এত উপকারী বন্ধু, এমন ভাল দুজন লোক মরে গেল এমনি এমনি। চোখ ফেটে জল এল সুজয়ের।

কিন্তু তার কাঁদবারও উপায় নেই। ঐ লোকগুলোর একজন তার চুলের মুঠি ধরে আছে শক্ত করে। সুজয় নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করেও পারল না। ওদের গায়ে অসম্ভব জোর। সুজয় দেখল, ওদের মানুষের মতন দেখতে হলেও গায়ের চামড়া খুব চকচকে। মানুষের চামড়া অত চকচকে হয় না। আর ওদের গায়ে কেমন যেন আঁশটে গন্ধ।

এক ধাক্কায় এবার ওরা সুজয়কে ফেলে দিল মাটিতে। একজন তার পেটের ওপর হাঁটু দিয়ে চেপে রইল। সুজয় কোনোরকমে একবার চেঁচিয়ে উঠল, "মেরে ফেললে, বাঁচাও!"

তারপরই লোকটা তার পেট এত জোরে চেপে ধরল যে, সুজয়ের গলা দিয়ে আর আওয়াজ বেরুলো না। তা ছাড়া, এত রাত্রে ফাঁকা মাঠের মধ্যে কেই বা তাকে বাঁচাতে আসবে!

একটা লোক বার করল, লম্বা একটা তুরপুনের মতন যন্ত্র। মুখটা ছুঁচলো নয়, প্যাঁচানো প্যাঁচানো। যন্ত্রটা উঁচু করতেই ইলেকট্রিক মেশিনের মতন ঘরঘর শব্দ হতে লাগল। যন্ত্রটা নিয়ে লোকটা এগিয়ে এল সুজয়ের বুকের কাছে।

সুজয় চোখ বুজল। সে বুঝে গেল, এই তার শেষ। একবার শুধু মায়ের কথা মনে পড়ল। তারপরই সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

সুজয় অজ্ঞান হয়ে ছিল মাত্র কয়েক মুহূর্ত। আবার চোখ খুলল একটা বিকট চিৎকার শুনে। কোথা থেকে বিদ্যুতের মতন একটা প্রাণী ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঐ লোকগুলোর ওপরে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ফাটানো গলায় প্রাণীটা ডাকছে, ডাঁউ! ডাঁউ!

সুজয়ের হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল বুকের মধ্যে। ডুংগা এসেছে, ডুংগা!

ডুংগা নেকড়ে বাঘের মতন, তার সঙ্গে পারবে এই লোকগুলো?

ডুংগা প্রথমে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ায় লোকগুলো ছিটকে পড়েছিল। সেই তুরপুনের মতন যন্ত্রটাও পড়ে গেছে মাটিতে। এবার লোকগুলো আবার লোহার জিনিসগুলো তুলে নিল ডুংগাকে মারবার জন্য। একজন মাটি থেকে তুরপুনটা তুলতে গেল।

ডুংগা ওদের একজনের কাঁধের মাংস ছিঁড়ে নিয়েছে, সে লোকটা উবু হয়ে বসে চ্যাঁচাচ্ছে যন্ত্রণায়। সুজয়কে যে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরেছিল, সে তখনও ছাড়েনি, ডুংগা এসে কামড়ে ধরল তার হাত। একজন লোহার হ্যাণ্ডেলটা ছুঁড়ে মারল ডুংগার দিকে—কিন্তু ডুংগা চোখের নিমেষে অন্যদিকে সরে গেছে। ওরা কেউ ডুংগার কাছে আসছে না, দূর থেকে মারার চেষ্টা করছে। এর মধ্যে একজন ঝট করে তুলে নিল তুরপুনের মতন যন্ত্রটা!

এবার সে-লোকটি যন্ত্রটা দু হাতে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তারপর এক পা এক পা করে এগোতে লাগল ডুংগার দিকে। যন্ত্রটার ঘরর ঘরর আওয়াজ শুনেই মনে হচ্ছে ওটা সাঙ্ঘাতিক কিছু। ডুংগা লাফিয়ে উঠলেও যন্ত্রটা বোধহয় ওর মুখের মধ্যে চালিয়ে দেবে।

ডুংগাও খানিকটা ভয় পেয়ে গেছে এবার। সে ডাকতে-ডাকতে পিছিয়ে যাচ্ছে একটু-একটু। সে বুঝেছে, ঐ যন্ত্রটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাভ নেই। লোকটা এবার যন্ত্রটাকে পিচকিরির মতন সামনে ধরে তেড়ে গেল ডুংগার দিকে।

তার আগেই কে যেন লোকটার চুলের মুঠি ধরে শূন্যে তুলে নিল। মাটি থেকে দশ বারো হাত ওপরে ঝুলে থেকে ছটফট করতে লাগল লোকটা। তাই দেখেই বাকি লোকগুলো ভয়ে ছুট দিল। কিন্তু তাদের মধ্যেই দু-একজনকে ধরে ফেলল অদৃশ্য কেউ। তারপর তাদের মাটির ওপর ফেলে আছাড় মারতে লাগল জোরে-জোরে।

শুধু সুজয় নয়, ডুংগা পর্যন্ত হাঁ করে দেখছে এই দৃশ্য। সুজয় আরও বেশি অবাক হচ্ছে এই জন্য যে, তার ধারণা ছিল গ্রহান্তরের মানুষরা লড়াই করে সাঙ্ঘাতিক সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। কিন্তু এরা যে শুধু হাতে লড়াই করে। এই কালো লোকগুলো নিয়ে এসেছে মোটরগাড়ির জিনিসপত্র। ঐ তুরপুনের মতন যন্ত্রটা ছাড়া ওদের নিজস্ব অস্ত্র তো আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

কালো পোশাক পরা লোকগুলোর মধ্যে তিনজন ছটফট করতে লাগল মাটিতে পড়ে। বাকিরা পালাল। তার একটু পরে ওপর থেকে নেমে এল সেই লম্বা ও বেঁটে লোকটি। প্রথমে তাদের চেহারা ছিল কাচের মতন, আস্তে আস্তে স্পষ্ট হল।

যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে লম্বা লোকটি ঝুঁকে মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করল, "জয়বাবু, আপনার কোনো ক্ষতি হয়নি তো?"

জয় খুব অবাক হয়ে বলল, "আপনারা... ..মানে, আপনারা বেঁচে আছেন?"

বেঁটে লোকটি বলল, "আমরা তো মরি না! ঐ তো

মুশকিল।”

“কিন্তু আমি যে দেখলাম...আপনারা ভেঙে গুঁড়িয়ে...”

লম্বা লোকটি হাসতে লাগল। বেঁটে লোকটি বলল, “ওটা একটা ম্যাজিক দেখালাম!”

ডুংগা সুজয়ের পায়ের কাছে এসে মাথা ঘষছিল, এই লোক দুটিকে দেখে একবার তেড়ে গেল। সুজয় ধমক দিয়ে ডাকল, “ডুংগা!” অমনি সে লক্ষ্মী ছেলের মতন আবার সুড়-সুড় করে চলে এল সুজয়ের কাছে।

বেঁটে লোকটি বলল, “কয়েকজন এবারও পালাল। যাক গে। এই তিনটের আগে ব্যবস্থা করে আসি......

সে হাত ধরে টেনে-টেনে একে-একে তিনজন লোককেই নিয়ে গেল অন্ধকার মাঠের মধ্যে।

লম্বা লোকটি সুজয়কে জিজ্ঞেস করল, “এটা আপনার কুকুর?”

সুজয় বলল, “হ্যাঁ। উনি ঐ তিনজনকে কোথায় নিয়ে গেলেন?”

“ঐ দিকে রেখে আসবে এক জায়গায়। আপনার কুকুরটা কোথা থেকে এল এখানে?”

“তা তো জানি না! এই ডুংগা, তুই কোথা থেকে এলি রে? এত দূরে পথ চিনে আসতে পারলি?”

ডুংগা দুবার ডেকে উঠল। যেন সে ঠিক উত্তর দিয়ে উঠল কথাটার।

লম্বা লোকটি কথা বলার সময় সেই ঘড়ির মতন যন্ত্রটা বার করে রেখেছিলেন। এক সময় শিস্ দিয়ে উঠে যন্ত্রটা আবার কোমরে গুঁজলেন।

সুজয় অবাক হয়ে চেয়ে রইল ওঁর দিকে। একবার জিজ্ঞেস করল, “যন্ত্রটা আপনি কোথায় পেলেন? যখন আপনারা অদৃশ্য হয়ে ছিলেন, তখন কি যন্ত্রটাও অদৃশ্য হয়ে ছিল? আপনাদের শরীর গুঁড়ো হয়ে গেল কেন? মানুষের শরীর তো গুঁড়ো হয় না।”

লম্বা লোকটি বলল, “এগুলো খুবই সাধারণ বিজ্ঞানের কথা। আমাদের ওখানে সবাই জানে। তবে আপনারা এখনো সে পর্যন্ত পৌঁছোননি। এ তো এক্ষুনি বোঝানো যাবে না, পরে যখন আসব, তখন বুঝিয়ে দেব।”

বেঁটে লোকটি এই সময় ফিরে এল মাঠ থেকে।

সুজয় জিজ্ঞেস করল, “আপনি ওদের কোথায় রেখে এলেন?”

“ওদের মাঠের মধ্যে গাছ করে দিয়ে এলাম। আপনাদের পৃথিবীতে আমরা গাছের সংখ্যা বাড়িয়ে যাচ্ছি! কাল সকালে যখন লোকেরা মাঠে আসবে চাষ করতে, তিনটে নতুন গাছ দেখে অবাক হয়ে যাবে!”

সুজয় বলল, “আমি দেখব। মানুষকে সত্যি গাছ করা যায়? আমি নিজের চোখে দেখতে চাই!”

এই সময় দূরে শোনা গেল আর-একটা গাড়ির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ডুংগা ডাকতে লাগল জোরে জোরে। এই ডাক রাগের নয়, আনন্দের।

গাড়িটা একটা জিপ। সেটা খানিকটা কাছে আসতেই তার মধ্য থেকে একজন কেউ চেঁচিয়ে বলল, “জয়! ডুংগা! ডুংগা!”

সুজয় বলল, “বাবা! আমার বাবা এসেছেন!”

লোক দুটি সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল। লম্বা লোকটি বলল, “তাহলে তো আর আপনার বাড়ি ফেরার চিন্তা নেই। এবার আমরা চলি?”

বেঁটে লোকটি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, “চুপ! কারুকে বলবেন না!”

সঙ্গে-সঙ্গে ওরা মাঠের মধ্যে নেমে পড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। অমনি খুব মন খারাপ হয়ে গেল সুজয়ের।

জিপ গাড়িটা পৌঁছে গেল এক মিনিটের মধ্যে। সেটা একটা পুলিসের গাড়ি। তার থেকে লাফিয়ে নামলেন একজন পুলিস অফিসার, সুজয়ের বাবা, অজয় ডাক্তার, ঝর্না আর বাবার হারুমামা। এত লোককে এক সঙ্গে দেখে সুজয় প্রথমে কথাই বলতে পারল না।

ওল্টানো গাড়িটার পাশে মৃত লোকটিকে দেখে পুলিস অফিসার বললেন, “মাই গড্! এরকমভাবে কে মেরেছে লোকটাকে?”

বাবা এসে সুজয়কে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, “জয়, তোর কিছু হয়নি তো? গাড়ি কী করে ওল্টাল? তুই এখানে এলি কী করে? এই লোকটা কে? ওকে কে মেরেছে?”

হারুমামা বাবার কাঁধে চাপড় মেরে বললেন, “আস্তে, আস্তে! ঐটুকু ছেলেকে এক সঙ্গে অত প্রশ্ন করলে ও উত্তর দেবে কী করে! একটু বিশ্রাম নিতে দাও আগে।”

৮

ঝর্না বলল, “জানো মা, ডুংগা যখন সেই নদীটার কাছে থেমে গিয়ে খুব জোরে-জোরে ডাকতে লাগল, আমিও একবার ভেবেছিলাম, সুজয়কে বুঝি কেউ জলেই ফেলে দিয়েছে!”

মা শিউরে উঠে বললেন, “ও কথা বলিস না! উঃ! তোরা ফিরতে দেরি করছিস দেখে আমার এমন চিন্তা হচ্ছিল যে, আর-একটু হলে বোধ হয় হার্ট ফেল করত!”

হারুমামা বললেন, “যখন গাড়িটা খারাপ হয়ে গেল, তখন তো ভাবলাম, মাঠের মধ্যেই সারারাত বসে থাকতে হবে। সুজয়কেও পাওয়া গেল না, কুকুরটাও জলের ধারে থেমে গেল, আমরা মাঠের মধ্যে বোকার মতন দাঁড়িয়ে...কেলেঙ্কারি না কেলেঙ্কারি!”

ঝর্না বলল, “ডুংগাও কী রকম অদ্ভুত ব্যবহার করতে লাগল। নদীর ধারে একটা ছোট গর্তের কাছে গিয়ে গন্ধ শুঁকে বারবার চ্যাঁচাতে লাগল। হ্যাঁ রে, জয়, ঐ গর্তটায় কী ছিল?”

সুজয় দাঁড়িয়ে আছে জানলার কাছে। সুজয় সুস্থভাবে বাড়ি ফিরেছে বলে সবাই খুব খুশি, কিন্তু সুজয়ের কেমন যেন মন-খারাপ মন-খারাপ ভাব! জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। তার বাঁ হাতের একটা আঙুলে ব্যান্ডেজ করা। ছোড়দির কথা শুনে সে বলল, “জানি না তো! নদীর ধারের গর্তের কথা তো কিছু জানি না!”

ঝর্না বলল, “আমরা সে গর্তটা খুঁড়েও দেখলাম খানিকটা। কিছুই নেই! ডুংগা তবু কেন ঐ জায়গাটা আঁচড়াচ্ছিল?”

হারুমামা বললেন, “কুকুররা ঐ রকম অদ্ভুতই হয়। খানিক বাদে ডুংগা আবার কী রকম সাঙ্ঘাতিক জোরে দৌড়ে চলে গেল? আমাদের দিকে আর তাকালই না!”

বাবা বললেন, “ভাগ্যিস তার একটু পরেই পুলিসের গাড়িটা এসে পড়েছিল!”

সুজয়ের কাকা বললেন, “পুলিস গুণ্ডাগুলোকে ধরতে পারল না?”

বাবা বললেন, “চেষ্টা করছে খুব। ধরে ফেলবে ঠিকই। ওখান থেকে আর কোথায় পালাবে? গাড়ি নিয়ে তো যায়নি!”

সুজয় মনে মনে বলল, “পুলিস কোনোদিন ওদের খোঁজ পাবে না।”

একটু আগে ভোর হয়েছে। সুজয়ের বাড়ি ভর্তি

লোকজন। শেষ রাতের দিকে মা অসম্ভব ব্যস্ত হয়ে গিয়ে কলকাতার সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে ফোন করেছেন। সুজয়ের মামা, কাকা, মেসোরা ঘুম থেকে উঠে ছুটে এসেছেন তাড়াতাড়ি।

এখন খুব গল্প চলছে। চায়ের জল চাপিয়েছে রঘু। চা খেয়ে সবাই যাবে।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা হারুমামা, একটা কথা সত্যি করে বলুন তো? আপনি যে কুকুর ফেরাবার যজ্ঞটা করলেন, সেটা কি সত্যি? ওরকম কোনো যজ্ঞ হয়?"

হারুমামা হাসতে-হাসতে বললেন, "পাগল নাকি! আমি ওসব যজ্ঞে-ফজ্ঞে বিশ্বাস করি না! ওটা হচ্ছে একটা কায়দা। ঐ রকম যজ্ঞের নাম করে বেশ খানিকটা সময় তো কাটানো যায়—তার মধ্যেই অনেক সময় হারানো জন্তু-জানোয়াররা ফিরে আসে! সেদিন ফিরে এল তো!"

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

বাবা বললেন, "ডুংগা ঠিক সময় না গিয়ে পড়লে গুন্ডাগুলো জয়কেও মেরে ফেলত! আর একটা লোককে কী বীভৎসভাবে মেরেছে!"

ছোটকাকা বললেন, "অদ্ভুত প্রভুভক্ত কুকুর! সে কোথায় গেল? ডুংগা, ডুংগা!"

ডুংগা বসে আছে সুজয়ের পায়ের কাছে। ডাক শুনে সে শুধু মাথা তুলে তাকাল, ওঁদের কাছে গেল না।

ছোটকাকা জিজ্ঞেস করলেন, "গুন্ডারা ঐ লোকটাকে মারল কেন রে, জয়? লোকটা কী করেছিল? গাড়িটাও তো নেয়নি!"

সুজয় বলল, "জানি না!"

ঝর্না জিজ্ঞেস করল, "তুই ঐ নদীটার কাছে গিয়েছিলি?"

"না তো।"

"তুই জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? এখানে এসে বোস্ না!"

"আসছি!"

সুজয় হঠাৎ শরীরে একটা ঝাঁকুনি খেল। ঘরের সবাই কে কী বলছে তা আর তার কানে গেল না। তার মাথা ঝিমঝিম করছে। সে দেখতে পাচ্ছে অনেক দূরের একটা দৃশ্য। সেই লম্বা ও বেঁটে লোকটি মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের গায়ের চাদর দুটো উড়ছে হাওয়ায়। খুব আস্তে-আস্তে হেঁটে গিয়ে ওরা একটা নদীর পাশে দাঁড়াল। সেখানে শুয়ে আছে সেই কালো পোশাক-পরা একজন লোক। লোকটিকে আহত মনে হয়।

লম্বা ও বেঁটে লোকটি বসল গিয়ে ওর পাশে। বেঁটে লোকটি চোখ বুজে হাত দুটো বাড়িয়ে রইল সামনে। লম্বা লোকটি ঘড়ির মতন যন্ত্রটা বার করে রইল। তারপর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল সেই কালো পোশাক পরা লোকটা। আর সেই জায়গায় দেখা গেল একটা ঝোপমতন গাছ!

সুজয় দারুণ উত্তেজিত ভাবে মুখ ফিরিয়ে বলল, "মা—।" বলেই থেমে গেল।

সবাই চমকে তাকাল সুজয়ের দিকে। কিন্তু সুজয় আর কিছুই বলল না। মা জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে? কী বলছিস?"

সুজয় বলল, "না, কিছু না।"

তার শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। মা কাছে এসে সুজয়র মাথা ছুঁয়ে বললেন, "সারা রাত কত ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। তুই এখন যা, শুয়ে পড় তো গিয়ে!"

সুজয় বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ঐ লোক দুটোর কথা সে আর-একটু হলে বলে ফেলছিল। কিন্তু ওরা বারণ করেছে। অবশ্য বললেও নিশ্চয়ই কেউ বিশ্বাস করবে না।

ওদের কথা সুজয় গোপনই রেখে দেবে। আর মন খারাপ করে থাকারও কোনো মানে হয় না। ওরা তো বলেইছে, সুজয়ের সঙ্গে ওদের দেখা হবে আবার।

ছবি সমীর সরকার

আবৃত্তির কলাকৌশল

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

সেকালে আবৃত্তির প্রতিযোগিতা হত না খুব বেশি, কিন্তু স্কুলে কোন উৎসব হলে, ভাল-ভাল ছেলেদের মেয়েদের সবার সামনে আবৃত্তি করার জন্যে বন্দোবস্ত থাকত। যে-সব ছেলে বা মেয়ে খুব ভাল বলতে পারত, তাদের আবার পুরস্কার দেওয়া হত।

এখন তো অনেক জায়গায় আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা হয়, এবং অনেক ভাল-ভাল ছেলেমেয়ে পুরস্কারও পায়। প্রতিযোগিতায় প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান পায়। বাকি বেশির ভাগ পায় না।

কথা হচ্ছে, কেন পায় না? তোমরা হয়তো বলবে যে, যাঁরা বিচারক থাকেন তাঁরা ঠিক বিচার করেন না। এ-কথাটা বাপু সত্যি নয়। মাঝারি ধরনে যারা আবৃত্তি করে, তাদের মধ্যে কোন বিশেষত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে ওরই মধ্যে দু-এক-জন শ্রোতাদের মনে এমন একটা ছাপ রেখে যায়, যা সবারই ভাল লাগে। তবে একই বিশেষত্ব নিয়ে প্রথম, দ্বিতীয় হয়তো এল, কিন্তু দুজনে একই নম্বর পেলে না। কেউ হয়তো এক নম্বর বা দু নম্বর তফাতে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলে। খুব সূক্ষ্ম বিচার করলেও কিছু তফাত হবেই।

শব্দের উচ্চারণ সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকে ছেলেমেয়েদের সতর্ক না করে দিলে একটু বয়েস বাড়লেই তা শোধরাতে খুব বেগ পেতে হয়। প্রতিটি অক্ষরের উচ্চারণ আগে জানো। আমি দেখেছি 'র' ও 'ড়'য়ের প্রভেদ বা শ স-য়ের উচ্চারণ, অনেক ছেলেমেয়ে ঠিক করতে পারে না। তার কারণ ছেলেবেলা থেকে বদ্ উচ্চারণ সংশোধন করা হয় না। বাবা, মা ও শিক্ষকেরাও যদি ঐ দোষে দোষী থাকেন, তাহলে তো সংশোধন করা আরও শক্ত।

এক জায়গায় গেছি, সেখানে একটি ভদ্রলোক আমায় বললেন, "আমার মেয়ে খুব ভাল আবৃত্তি করে। আপনি এখানে এসেছেন খুব আমাদের সৌভাগ্য।" বলে মেয়েকে ডেকে কবিতা আবৃত্তি করতে বললেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা।

আরম্ভ করতেই পিলে চমকে গেল।

"আজি এ প্রভাতে রবির কড়/কেমনে পশিল প্রাণের পড়।" শুনেই আমার মাথার শিরাগুলোকেও কে যেন পড় পড় করে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। কিন্তু বাবার কী আনন্দ! মেয়ে আমাকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে কি না সেটা বুঝবার জন্যে মাঝে মাঝে আমার মুখের দিকে দেখছেন। আর মেয়ে ফড় ফড় ক'রে বলে চলেছে। আমি কিন্তু ভেতরে-ভেতরে রেগে ঘেমে উঠছি, কিন্তু বাইরে ভদ্রতার খাতিরে হাসিমুখে সবটা শুনে বলতে হল, "হ্যাঁ, বেশ হয়েছে। বেশ হয়েছে।"

মেয়ের বয়েস তখন ষোল-সতেরো বছর। কিন্তু, আশ্চর্য, এই র আর ড়য়ের তফাত তাকে কেউ বুঝিয়ে দেয়নি। অনেকে আবার লেখেও ঐ রকম ভুল। তোমরাও নিশ্চয় দেখেছ, অনেক জায়গায় লেখা থাকে 'ঘড় ভারা দেওয়া হইবে।'

ঘরকে ঘড় আর ভাড়াকে ভারা—এ যে কী করে কাগজে লিখে লোকে টাঙায়, তা বোঝা যায় না। বানানভুলের কথা ছেড়ে দাও, মোটামুটি লেখাপড়া জানা লোকেরাও কথা এত ভুলভাবে বলে ফেলে যে, আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

ধেড়ে ধেড়ে লোকেদের বলতে শুনেছি, "এখানে একটা 'রিস্কাণ্ড' পাওয়া যায় না।" কোথায় 'রিক্শা' আর কোথায় 'রিস্কা'। শুনলে কী রকম মনে হয় বলো তো!

অত কথা কী, যারা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনা করে, তাদেরও বলতে শুনেছি, "এই বার আমাদের এখানে আব্-বৃত্তি প্রতিযোগিতা শুরু হবে। যাঁরা আব্-বৃত্তি করবেন, তাঁরা চলে আসুন।" কিন্তু ঋ-যুক্ত বর্ণের উচ্চারণে দ্বিত্ব হয় না। তোমরা প্রকৃতি শব্দটা কীভাবে উচ্চারণ করো? 'প্রক্-কৃতি' বল কি? প্র-কৃতিই বল নিশ্চয়। 'ক'টাকে দুবারে উচ্চারণ করে 'প্রক্কৃতি' নিশ্চয় বলো না। অতৃপ্তিকে অত্-তৃপ্তি, অকৃপণকে অক্-কৃপণ বলা যে ভুল সেগুলো তো জানা দরকার। অনেক শিক্ষিত লোককেও শুনেছি জাগ্-গৃহি, মাত্-তৃভূমি, পিত্-তৃ-ভূমি বলতে। এগুলো কানে বেখাপ্পা শোনায়, এটা জেনে রাখা দরকার।

কিন্তু র-ফলা থাকলে বর্ণের উচ্চারণে দ্বিত্ব হবেই, কেউ-কেউ সেটা আবার দ্বিত্ব করে না। বজ্র, চক্রকে বজ্রো, চক্রো বলে উচ্চারণ করে। তা বিলকুল ভুল। ব্যাঘ্র, আগ্রহ, আক্রমণ ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করতে গেলেই দেখবে দ্বিত্ব হচ্ছে। ব্যাঘ্-ঘ্র, আগ্-গ্রহ, আক্-ক্রমণ ইত্যাদি।

এইটে সব সময় মনে রাখবে, 'ঋ'-কার থাকলে কিছুতেই দ্বিত্ব করে উচ্চারণ করবে না, কিন্তু র-ফলা থাকলেই দ্বিত্ব হবে।

তারপর দেখবে, চলিত কথায় 'অ' নিয়ে খুব মুশকিলে পড়তে হয়। চলিত কথায় 'অ'কে আমরা অনেক সময় 'ও'-এর মত উচ্চারণ করি। যেমন—অতুলকে ওতুল, অবিনাশকে ওবিনাশ, অক্ষরকে ওক্ষোর আমরা বলি। ও-প্রবণতা পশ্চিমবাংলায় বেশি। আবার অধীর, অটল, অসিত ইত্যাদির উচ্চারণে 'অ'কে অবিকৃতই রাখি।

কিন্তু নামের ক্ষেত্রে এগুলো চলতি শব্দ। আবার দেখ 'বন' বা 'মন'কে আমরা 'বোন' 'মোন' বলে উচ্চারণ করি। বোনের মধ্যে বাঘ আছে। কিন্তু এর সংগে অন্য শব্দ সংযুক্ত হলে অ-উচ্চারণ করতে হয়। যেমন বনভূমি, বনবাস, বনানী, বনমর্মর বলতেই হবে। চলিত কথার ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রম হয়। কিন্তু আবৃত্তি করতে গেলে এ-সব শব্দের ক্ষেত্রে ও-উচ্চারণ করা চলে না। মনের বেলাতেও এক নিয়ম। মনঃসংযোগ, মনসিজ, মনো-মোহন ইত্যাদি। আর একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হয় যে, কতকগুলো শব্দের 'অ'কারান্ত উচ্চারণ ভাল শোনায় না—আবার অনেক জায়গায় অকারান্তকে প্রাধান্য দিতে হবে কবিতার ভাবধারা রক্ষার জন্যে। যেমন ধরো—মনসিজ না ব'লে সেখানে মনসিজ(অ) বললে হয়তো আরও ভাল শোনাতে পারে। 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া' এখানে হসন্তের স্থান নেই, 'অমল্ ধবল্' চলবে না। ধবল্ গিরি চলতে পারে হসন্ত লাগিয়ে।

আর একটা মারাত্মক ভুল 'স' ও 'শ'-এর উচ্চারণে। বাংলা অক্ষরে তিনটে 'শ', 'স', 'ষ' আছে ঠিক—কিন্তু বাংলাভাষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'শ' ও 'স'-এর প্রায় একই উচ্চারণ। 'শ' একটু সামান্য কঠিন। শশা, শশী উচ্চারণ করলেই বুঝতে পারবে সুরেশ, সুবেশ, সরেশ নব্বই ভাগ এক রকমের। কিন্তু র-ফলা প্রয়োগ করলেই দেখবে 'শ' কীভাবে 'স'-য়ে রূপান্তরিত হচ্ছে। (আশ্রয়, অশ্রু ইত্যাদি।) ঋ-কারের ক্ষেত্রেও তাই—গিরিশৃংগ, শৃগাল ইত্যাদি।

অনেকে আবার স্টাইলে কথা বলতে গিয়ে স, শ-এর উচ্চারণ অত্যন্ত কড়াভাবে করে। 'বিশ্বাস কর' উচ্চারণটা যেন বজ্র-কঠোর আওয়াজে বলা হয়। কিন্তু কোমল ভাবে শ ও স-এর উচ্চারণ করা ভাল। তা বলে চ্যাংড়া ছেলেরা যেভাবে 'স'-এর শ্রাদ্ধ করতে করতে বলে, তা অসহ্য।

চ, ছ, ট, ঠ, ড়, ঢ় নিয়েও বিপদ কম হয় না। এগুলোর ক্ষেত্রেও উচ্চারণের সময় একটু আলতো উচ্চারণ করলে ভাল হয়। 'ছ', 'ঠ' বা 'ঢ়' যেন না জোর ক'রে চেয়ে চেয়ে থাকে। 'তুমি কেমন আছ', সাধারণভাবেই বলবে। চ বলতে হবে না। 'আষাঢ়ে' কথাটাও ঠিক উচ্চারণ করবে, কিন্তু 'ঢ়'টাকে জোরালো কোরো না। উচ্চারণ ঠিকই রেখে দিও, তবে কড়া করে সবার নড়া ধরে বোঝাতে যেও না—আমি ঠিক উচ্চারণ করছি। এই উচ্চারণের স্পষ্টতা, শব্দ উচ্চারণের চমৎকারিতা সর্বাগ্রে দরকার। করছি আর কর্চ্ছি'র তফাতটাও মনে রেখো।

তারপর আরও কতকগুলি সাধারণ নিয়ম পালন করা উচিত। খুব তাড়াতাড়ি বলতে গেলে, অর্ধেক কথা অস্পষ্ট হবে, কিম্বা জড়িয়ে যাবে। আবার একেবারে ধীরে বলাও চলবে না—তাতে শ্রোতাদের মাথা ধরে যাবে খুব তাড়াতাড়ি, আর ভাববে যে, আবৃত্তিকার অতি সন্তর্পণে ঠুক্ ঠুক্ করে এগোচ্ছে।

আর একটা কথা মনে রাখতে হবে তোমাদের। কেউ কেউ হয়তো বড্ড সুরেলা করে কবিতা বলে। আবার কেউ-কেউ সুরকে একেবারে বাদ দেয়। কবিতার ক্ষেত্রে সুরকে পুরো বাদ দেওয়া যায় না বলেই আমার ধারণা, কিন্তু তার ওজনটা বা সুরের বিস্তৃতিটা একটু বেশি বা কম হচ্ছে কিনা, সেটা বিচক্ষণতার সঙ্গে ঠিক করবে। যিনি এসব বিষয়ে জানেন বা ভাল আবৃত্তি করেন, তিনি তা শুধরে দিতে পারেন।

আর-একটা বিষয়ে ভেবে দেখো। অনেকে অনেক সময় ঠিক দম রাখতে পারে না। তাই শেষ শব্দটার হয় আধখানা উচ্চারণ, নয় অত্যন্ত অস্পষ্ট। তাই দমটা কোথায় কোথায় নিতে হয়, সেটা জানা দরকার। কবিতা পাঠই করো, আর গদ্য পাঠই করো, দুটো লাইন বা একটা লাইন এক-দমে উচ্চারণ করা যায় না। কেটে কেটে বলতে হয়। কিন্তু কখন কাটছ, তা যেন কেউ বুঝতে না পারে।

তোমরা খুব ভাল ক'রে জানো যে, একটা ছত্রে বা লাইনে অনেক কথা থাকে, কিন্তু একসঙ্গে সমস্তটা উচ্চারণ করা যায় না বলে লেখকরা কমা, দাঁড়ি অনেক কিছু চিহ্ন দিয়ে দেন, থামবার জন্যে। এক নিশ্বাসে একটা বড় লাইন পড়া যায় না।

কেন যায় না?—তুমি প্রত্যেকবার শ্বাস টানছ, আবার সেটা ফুরুলেই অর্থাৎ প্রশ্বাস ফেলে দিলেই, নতুন শ্বাস টানতে হচ্ছে—তাই তোমার পড়বার সময় বা কথা বলার সময় কিছু শ্বাস পেটে থাকতে থাকতেই নতুন শ্বাস নিতে হবে। সাধারণত লক্ষ কোরো যে, তোমরা যখন কথা বলো, তখন অজান্তে কিছু শ্বাস বাকি থাকতে থাকতেই নতুন শ্বাস নিয়ে নাও।

আমি গদ্য পড়ার কায়দার কথা বলছি। ধরো, একটা লাইন আছে—"ভারতবর্ষের এই সুবিশাল ক্ষেত্রে নানা জাতি ও বিদেশাগত পুরুষরা প্রায়ই এসে আমাদের সম্বন্ধে অনেক-কিছু সংবাদ নিয়ে চলে যান।"

এটা একদমে পড়তে গেলে বেশ স্বচ্ছন্দভাবে কি পড়া যায়? যায় না। তোমাকে মানেটা ভাল করে বোঝাবার জন্য মাঝে মাঝে দম্‌টা থাকতে থাকতে নিতে হবে, অথচ তুমি যে দম নিচ্ছ, তা বুঝতে দেবে না। আবার বে-জায়গায় দম নিতে গেলে হাসির ব্যাপার হয়ে যাবে।

এছাড়া স্বরের উত্থান-পতন অতি সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে। ছন্দ ও কোন কথাটায় জোর দিতে হবে এবং তার সঙ্গে স্বরের কতটা সমতা থাকবে, সেটাও বুঝে করা চাই। নইলে ঐ স্বরের তারতম্যের ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ধীরে ধীরে স্বর বাড়াতে হবে, কমাতে হবে। এবং এই স্বরের উত্থান-পতনের ভেতর দিয়েই কবিতার ভাবটি গানের মত ঝঙ্কার তুলবে।

অনেকে ছেলেদের হাত-পা নেড়ে অভিনয়ের মত করে আবৃত্তি করতে শেখান। সেটা খুব ছোট ছেলেদের ক্ষেত্রে দেখতে ও শুনতে ভাল লাগে। কিন্তু কিশোরদের ক্ষেত্রে নয়।

কতকগুলি নাটকীয় কবিতা আবৃত্তিতে একটু-আধটু হাত নাড়লে ক্ষতি নেই, কিন্তু সাধারণ কবিতা আবৃত্তির সময় অঙ্গভঙ্গি করলেই সেটা অতি অশোভন ও অবাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়।

আবৃত্তির সময় শোনার দিকেই মন থাকে শ্রোতাদের—অভিনয়ের দিকে নয়। অভিনেয় বস্তুর আবৃত্তি ও সাধারণ কবিতার আবৃত্তি ঠিক এক নয়।

আসলে কবিতার মধ্যে এমন একটা ভাব লুকোনো থাকে যে স্বরের ঝঙ্কার ঠিক গানের মত লাগে। শেষ হয়ে গেলেও সেটা কানে বাজতে থাকে। আবৃত্তির সার্থকতা সেখানেই।

এসো, আবৃত্তি করি

দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমরা কেউ যদি বলো 'আবৃত্তি করতে জানি না', বিশ্বাসই করব না। হয়তো এমন হতে পারে যে, তুমি কখনও কোন প্রতিযোগিতায় নাম লেখাওনি কিংবা কোনো বড় জলসায় বা আসরে আবৃত্তি করোনি। কিন্তু তাই বলে বাড়িতে একলা ঘরে বসে সুর ক'রে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে আপন মনে একটাও কবিতা পড়োনি—এ হতেই পারে না। নিশ্চয়ই পড়েছ। অন্য কবিতা না হোক, অন্তত নিজের পড়ার বইয়ের কবিতাও তো বারেবারে জোরে-জোরে পড়ে মুখস্থ করেছ। শুধু তোমরা কেন, যখন ছোট ছিলাম আমরা সবাই পড়েছি। স্কুলে মাস্টারমশাই পড়া ধরেছেন, কোনোদিন গড়গড় করে মুখস্থ বলে গেছি, আবার যেদিন আটকে গেছে, বিস্তর বকুনি খেয়েছি। সহজ কথায় বলতে গেলে, মুখস্থ করে বলা—এরই নাম আবৃত্তি। প্রতিযোগিতাতেও এই একই ব্যাপার। সেখানেও বিচারকদের সামনে প্রতিযোগীদের একে-একে ডাক পড়ে। তারা কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনায়।

আসলে, অক্ষর পরিচয়েরও বহু আগে যখন থেকে বাড়ির গুরুজনদের মুখে শুনে-শুনে 'ছড়ার ছবি' জাতীয় বইয়ের ছড়াগুলো আধো-আধো গলায় মুখস্থ বলতে শিখি, তখন থেকেই আবৃত্তিতে আমাদের হাতেখড়ি হয়ে যায়। আমরা টেরও পাই না। সেই বয়সে সব কথার মানে বোঝা যায় না, কিন্তু যখন লজেন্স বা টফির লোভে কেউ একবার বলা মাত্রই ছোট্ট শিশুটি শুনিয়ে দেয় 'নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে/ওপারেতে ছেলেমেয়ে নাইতে নেমেছে' ইত্যাদি,

তখন ধ্বনি-ঝংকার, আর ছন্দের দুলুনিতে সেও দোল খায়। আবৃত্তির সেই তো শুরু—ধ্বনি-ঝংকার, সুর আর ছন্দ দিয়ে। কিন্তু শুধুমাত্র ধ্বনি-ঝংকার, সুর আর ছন্দের দুলুনি সম্বল করে বেশি দূরে এগুনো যায় না—ঐ ছড়া পর্যন্তই। আরও বেশি এগুতে হ'লে এগুলো ছাড়া আরও যে-জিনিসটার দরকার তার নাম বোধ, অর্থাৎ বুদ্ধি—মানে বুঝে সেই মানে অনুযায়ী সঠিক ভাবটি গলায় ফুটিয়ে তুলবার বুদ্ধি। এই বোধ হঠাৎ আপনা থেকে মগজে গজিয়ে ওঠে না, অনুশীলনের মাধ্যমে এই বোধ জাগিয়ে তুলতে হয়, তারপর প্রদীপের সলতের মতো একটু-একটু করে ক্রমাগত উসকে দিতে হয়। বারংবার একই কবিতার বোধসম্পন্ন পাঠই পরিণামে হয়ে ওঠে আবৃত্তি।

ছড়া আবৃত্তির পালা সাঙ্গ ক'রে বর্ণপরিচয়ের ছাড়পত্র নিয়ে কবিতার আপন রাজ্যে ঢুকবার অধিকার যখন পাই, তখন যেসব কবিতা সচরাচর পড়তে দেওয়া হয়, তার মধ্যে থাকে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'প্রভাত', রবীন্দ্রনাথের 'শিশুর প্রার্থনা', 'সুখ-দুঃখ', 'বীরপুরুষ', 'বন্দীবীর', 'লুকোচুরি', কাজী নজরুল ইসলামের 'প্রভাত' নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'কাজের লোক', যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'কাকাতুয়া' ইত্যাদি। মজাদার কবিতাও কিছু থাকে, যেমন সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল'-এর কবিতাগুলো, নজরুল ইসলামের 'খুকী ও কাঠবেড়ালি', 'খাঁদু দাদু', 'লিচু-চোর' ইত্যাদি।

ইত্যবসরে, অক্ষরজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকায়, কবিতাগুলো রীডিং পড়ে যেতে বিশেষ অসুবিধা হয় না বটে, তবে সে-পড়া শুনে, অন্যের তো দূরের কথা, নিজেরই খারাপ লাগে। কোথাও কোনো ঝোঁক না দিয়ে বা শ্বাসাঘাত না করে, গলা ওঠা-নামা না করিয়ে একঘেয়ে স্বরে, দম-ছাড়া দম-নেওয়ার জন্য যেখানে সেখানে বিরাম ঘটিয়ে শব্দগুলোকে পর-পর উচ্চারণ করায় তাদের ভেতরকার যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যায়, অর্থগত সম্পর্ক হারিয়ে যায়, ছন্দ কেটে যায়।

সুন্দর করে পড়া আয়ত্ত করতে হলে এই সব দোষত্রুটি সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকতে হবে এবং কয়েকটি জিনিস শিখে নিতে হবে। প্রথমেই শিখতে হবে কী করে প্রতিটি অক্ষর সমানভাবে অর্থাৎ হুবহু একই রকম ওজন ও আকারে উচ্চারণ করা যায়। উচ্চারিত প্রতিটি অক্ষরের ধ্বনিগত মাত্রায় যাতে অনিয়ম না থাকে তার জন্যে এক-একটি অক্ষরকে এক-এক মাত্রা হিসেবে ধরতে হবে। যাঁরা গান-বাজনা করেন তাঁদের কাছ থেকে মাত্রার ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে নিতে পারো। আমি বলতে চাইছি যে, পড়বার সময় কখ্+আগ্+আঘ্+আ উ+অ+অ+অ—এইরকম বিশৃংখল মাত্রায় উচ্চারণ কোরো না। ক্+আখ্+আগ্+আঘ্+আঙ+অ|— এইরকম সমান ওজনে উচ্চারণ করবে। উচ্চারণের এই ধ্বনিগত শৃঙ্খলাই একজোট হয়ে কবিতার ছন্দের বনিয়াদ গড়ে তোলে। প্রতিটি বর্ণ সমান মাত্রায় উচ্চারণের রীতি আয়ত্তে থাকলে ছন্দ ভাগ করতেও সুবিধা হয়। ছন্দ ভাগ করবার সময়ে মনে রেখো, বাংলায় আমরা হ্রস্ব এবং দীর্ঘস্বরের উচ্চারণের সংস্কৃতরীতি মেনে চলি না, তবে কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দ মেলানোর জন্যে প্রয়োজন হলে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে দীর্ঘস্বর যুক্ত থাকলে সামান্য টেনে উচ্চারণ করতে হয়।

কবিতায় ছন্দ থাকে ঠিকই, কিন্তু সব ছন্দের গতি বা চলন যে অনায়াসে বোঝা যাবে, এমন কোনো কথা নেই। অনেক কবিতাই পাওয়া যাবে যার ছন্দ প্রায় লুপ্ত, আছে কি না-আছে বোঝাই যাবে না। এইসব কবিতার বেলায় অসুবিধা হবার কথা তাদের, যাদের গদ্যপাঠের অনায়াস ভঙ্গিটি ভালভাবে রপ্ত হয়নি। উৎকৃষ্ট গদ্য রচনাতেও ছন্দের চলন থাকে। পাঠককে সেটা খুঁজে নিতে হয়, বাক্যের অর্থ অনুযায়ী গতি, ঝোঁক ইত্যাদির স্থান নির্বাচন করে। তোমরা হয়ত ভাবছ, গদ্যের আবার ছন্দ থাকে নাকি? জেনে রাখো, উঁচুদরের সাহিত্যিকের যে-কোনো রচনাতেই ছন্দ থাকে। তোমাদের পক্ষে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। ভাল আবৃত্তিকার যদি হতে চাও তাহলে গদ্য পদ্য সব রকম লেখাই জোরে-জোরে পড়বে। দেখেছি, তোমাদের অনেকেই একটু বড় হয়ে যেই উঁচু ক্লাসে ওঠো, অমনি জোরে পড়া ছেড়ে দিয়ে মনে-মনে পড়তে আরম্ভ করো। এটা খুব ক্ষতিকর অভ্যাস। খাতায় লেখার বেলায় যেমন হাতের লেখার পরিচ্ছন্নতার একটা মূল্য আছে, তেমনি রীডিং পড়ার বেলায় কণ্ঠস্বরের পরিচ্ছন্নতাও অত্যন্ত মূল্যবান। তাই যখন যা কিছু পড়বে, চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে পড়বে। জোরে পড়লে অনেক উপকার হয়। যেমন জিভের জড়তা কেটে যায়, উচ্চারণ স্পষ্ট হয় আর কোনো বড় বাক্যকে মানে বুঝে-বুঝে ছোট ছোট বাক্যাংশে ভাগ করে, দম ছেড়ে দম নিয়ে থেমে থেমে পড়বার কৌশল আয়ত্ত করা যায়। তাছাড়া, ভুল পড়লে বাড়ির গুরুজনদের কানে গেলে তাঁরা ভুল সংশোধন ক'রে দিতে পারেন।

তোমাদের কারো কারো বদ অভ্যাস আছে—কবিতা আবৃত্তির সময় অতি মাত্রায় অঙ্গভঙ্গি করা। আমার নিজের মতে, কাঁধটা সামান্য ঝাঁকি দিলে বা হাতটা এক-আধবার একটু নাড়লে কিংবা মাথাটা ঈষৎ দোলালে অথবা গলা খেলাতে একটু আধটু পেশী সঞ্চালন করলে ক্ষতি নেই, কিন্তু তাই ব'লে হাত-পা নেড়ে, চোখ নাচিয়ে, সর্বাঙ্গ ঝাঁকিয়ে কবিতা বললে বিশ্রী লাগে। আবার কেউ যদি একেবারে নিশ্চল পাথরের মতো মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবলেশহীন মুখে কবিতা আবৃত্তি করে তাও ভাল লাগে না। যেটুকু স্বাভাবিক সেটুকুই করা উচিত, তার বেশিও না, কমও না। আবৃত্তির এমন ঘটনার কথাও শুনেছি যে, তোমাদেরই কেউ 'বন্দী বীর' কবিতাটি আবৃত্তির সময় হাতের পাঁচটা আঙুল শ্রোতাদের দেখিয়ে 'পঞ্চ' বলে নাচের মতো মুদ্রা করে নদীর আঁকাবাঁকা গতিপথ দেখিয়ে 'নদীর তীরে' বলবার পর মাথার পেছন দিকে দুটি হাত নিয়ে গিয়ে ভিজে-কাপড় নিঙড়োবার ভঙ্গি করে বলেছে 'বেণী পাকাইয়া শিরে' ইত্যাদি। আবৃত্তি প্রতি-যোগিতার আসরে গেলে আজও এই ধরনের অভিনয় ও মুদ্রা-মিশ্রিত আবৃত্তিই বেশি চোখে পড়ে। অনেকে বড় হয়েও এই অভ্যাস ছাড়তে পারে না, তখনও সে 'রঙ্গ' কবিতা আবৃত্তি করতে হলে, হাতের চার আঙুল শ্রোতাদের চোখের সামনে মেলে ধরে বলে 'চার মিঠে দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ' কিংবা শ্রোতাদের সামনে নিজের পাদুকা তুলে ধরে বলে 'লোহা কঠিন, বজ্র কঠিন, নাগরা জুতোর তলা' ইত্যাদি। একজনকে দেখেছি, সে সব সময়ে হাসি-হাসি মুখে কবিতা আবৃত্তি করে। এমনকী 'বিদ্রোহী' কবিতাটিও আদ্যোপান্ত হাসিমুখে তাকে আবৃত্তি করতে দেখেছি। সে যখন বলেছে 'আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস' তখনও হাসিটি তার মুখে লেগে ছিল। ছেলেবেলায় সেই-যে হেসে-হেসে ছড়া বলা অভ্যাস করেছিল, সে-অভ্যাস বড় হয়েও ছাড়তে পারেনি। সব সময় মনে রাখবে, যখন কোনো কবিতা আবৃত্তি করবে, তখন সেই কবিতাটিকে তোমার সুললিত কণ্ঠে, স্পষ্ট বিশুদ্ধ উচ্চারণে এবং সঠিক ছন্দের বৃত্তে শ্রোতাদের কানে পৌঁছে দেবে, যাতে কবিতার যে-রস ছাপার অক্ষরে বন্দী রয়েছে, তা ধ্বনির ব্যঞ্জনায় শ্রোতাদের অনুভূতিকে নাড়া দেয়। আবৃত্তিতে অতিরিক্ত জৌলুস আনবার লোভে চটকদার অতি-নাটকীয় অভিব্যক্তির আশ্রয় নেওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। খেয়াল রাখবে, আবৃত্তি যেন শুধুই শ্রোতব্য হয়, দ্রষ্টব্য না হয়।

সত্যসন্ধ

খুন হলেন বিপ্রদাসবাবু
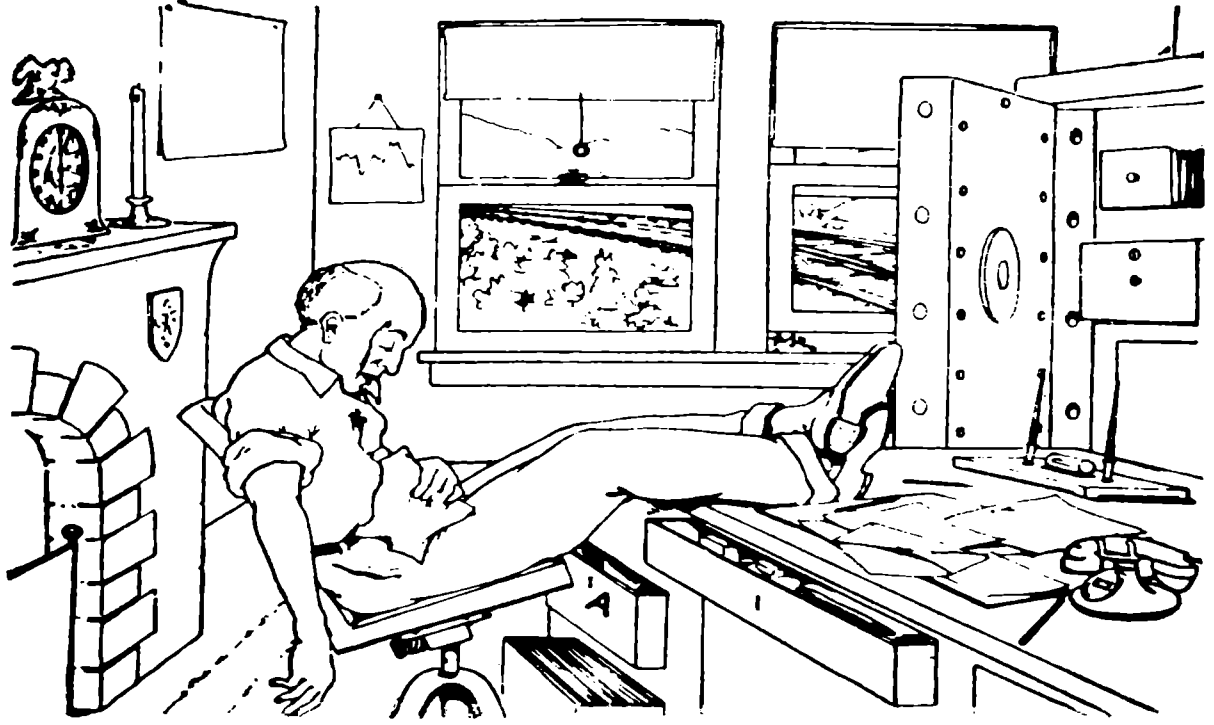
শুধু ছবি দেখে একটা খুনের মামলায় গোয়েন্দাগিরি করা কি সহজ কাজ? সহজ কি কঠিন, মুখে তর্ক চালিয়ে লাভ নেই। একটা পরীক্ষাই নেওয়া যাক বরং।

নীচে একটা বিবৃতি দেওয়া হল। বিবৃতির সবটুকুই সত্যি। খুব মন দিয়ে প্রথমে বিবৃতিটা পড়ে নাও। এরপর ওপরের ছবিটা বেশ ভালভাবে পরীক্ষা করো। সব শেষে, ১ থেকে ১৪ পর্যন্ত সাজানো প্রশ্নমালার উত্তর বসাও। আন্দাজে উত্তর দেওয়া চলবে না, প্রতিটি উত্তরের যুক্তিসম্মত কারণও সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে। সব কটা উত্তর যদি ঠিক-ঠিক মিলে যায়, তবে বুঝব তুমি বাঘা গোয়েন্দা। আর যদি চার ভাগের এক ভাগ উত্তরও না মেলে, তাহলে? তাহলে আর কী, গোয়েন্দা-গল্প পড়াই তোমার ছেড়ে দেওয়া উচিত—এই বুঝতে হবে।

বিবৃতি

বদমেজাজি ব্যবসায়ী বিপ্রদাসবাবুকে বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে গুলি করে খুন করা হয়েছে। ওই দিন সন্ধে-বেলা তাঁকে যে-অবস্থায় আবিষ্কার করা হয়, ছবিতে তা দেখা যাচ্ছে। তাঁর নিজের পিস্তলটি থাকত 'A' চিহ্নিত ড্রয়ারের মধ্যে, পিছনদিকে। সেই পিস্তলটি পাওয়া যায় অফিসের বাইরে—দুটি গুলি খরচ করা অবস্থায়। একটি গুলি তাঁর মাথার খুলি ভেদ করে সোজা দেওয়ালে গিয়ে ঢুকেছে।

খুন সম্পর্কে সন্দেহভাজন দু-জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। একজন বিপ্রদাসবাবুর সেক্রেটারি, অন্যজন তাঁর দূর-সম্পর্কের ভাইপো, সুব্রত। সুব্রতর সঙ্গে ইদানীং বদমেজাজি বিপ্রদাসবাবুর সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না, দেখা হলেই খিটিমিটি লেগে যেত।

সেক্রেটারিটি বিকেল চারটেয় বাড়ি চলে গেছে, আর ফেরেনি, সুব্রত সেদিন শহরে এসে পৌঁছয় বিকেল পাঁচটায়, সন্ধে সাতটার ট্রেনে ফিরে চলে যায়।

ঘড়িটা ঠিক সময়ই দিচ্ছিল। গুলি করে সেটাকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিপ্রদাসবাবু দুপুরে টিফিনের পর অফিসে এসে বসেছেন, আর একবারও ঘর ছেড়ে বেরোননি। তাঁর অফিসটা একটা ব্যস্ত রেলরাস্তার মেইন লাইনের ঠিক পাশে।

এই সব তথ্যের ভিত্তিতে এবং ঘরের সাক্ষ্যপ্রমাণের ছবি দেখে দু-জন সন্দেহভাজনের মধ্যে প্রকৃত খুনী কে বার করতে হবে।

প্রশ্নমালা

১। বিপ্রদাসবাবু কি বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে কাজ করছিলেন ?

২। সিন্দুক কি খুনের আগেই খোলার চেষ্টা হয়েছিল ?

৩। খুনের উদ্দেশ্য কী ? কোনো কিছু অপহরণ ?

৪। বিপ্রদাসবাবু কি অসচ্ছল ছিলেন ?

৫। সুব্রত যে সেদিন সাতটার ট্রেনে ফিরে গিয়েছিল, এটা কি তার অপরাধের নিশ্চিত কোনো প্রমাণ ?

৬। বিপ্রদাসবাবুর বর্তমানে কি ড্রয়ার থেকে তাঁর পিস্তলটি সরানো সম্ভবপর ?

৭। অত বড় অফিসবাড়িটায় বিস্তর লোক কাজ করে অথচ কারো কানেই গুলি করার শব্দ পৌঁছল না. এর সম্ভাব্য কারণ কী হতে পারে ?

৮। গুলিবিদ্ধ হবার পূর্ব মুহূর্তে কী করছিলেন বিপ্রদাসবাবু ?

৯। ঘরে ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন আছে কি ?

১০। গুলিটা কোথায় দাঁড়িয়ে ছোঁড়া হয়েছিল ? জানালার পাশ থেকে ? পেছন থেকে ? মুখোমুখি ? না ডেস্কের ডান পাশের কোণ থেকে ?

১১। ঘড়িটা কোন্ গুলিতে থামানো হয়েছিল—প্রথম না দ্বিতীয় ?

১২। বিপ্রদাসবাবু যে ছটার সময় খুন হয়েছেন, ধরে নেওয়া যায় কি ?

১৩। কে খুন করেছে ? সুব্রত না সেক্রেটারি ?

১৪। খুনী কে তা সাব্যস্ত করার জন্য তিনটি নিশ্চিত প্রমাণ কী কী ?

নীচে উলটো করে উত্তর বসানো আছে

খুন হলেন বিপ্রদাসবাবু

উত্তর

ছবি থেকে কতগুলো জিনিস স্পষ্ট, যার উল্লেখ বিবৃতিতে নেই।

বিরাট সিন্দুক থেকে বোঝা যায়, কিছু মূল্যবান কাগজপত্র বা টাকাকড়ি তার মধ্যে থাকত। খুনের উদ্দেশ্য. সুতরাং. সেই মূল্যবান কাগজপত্র বা টাকাকড়ি অপহরণ। ঘরের কোথাও কোনো কিছু অগোছাল হয়ে নেই। এ থেকে বোঝা যায়, খুনের আগের মুহূর্তে কোনো ধস্তাধস্তি হয়নি বিপ্রদাসবাবু নিবিষ্ট মনেই কাজ করছিলেন।

ব্যস্ত রেলরাস্তার মেইন লাইনের পাশে অফিস বিপ্রদাসবাবুর। সুতরাং রেলের যাতায়াতের শব্দে গুলি ছোঁড়ার শব্দ অনায়াসেই ঢাকা পড়তে পারে। বিপ্রদাসবাবুকে না জানিয়ে তাঁর বর্তমানে 'A'-চিহ্নিত ড্রয়ারের পিছন থেকে পিস্তল বার করে নেওয়া সম্ভবপর নয়। ঘটনার দিন টিফিনের পর থেকেই বিপ্রদাসবাবু ঘরে। পিস্তলটি নিশ্চিত তার আগেই—টিফিনের সময়—সরানো হয়েছে। সুব্রত তখন শহরে এসে পৌঁছয়নি।

খুনী নিশ্চিত ডেস্কের ডান পাশের কোণে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়েছে। প্রথম গুলিতেই বিপ্রদাসবাবু খুন হয়েছেন। ঘড়িটা প্রথম গুলিতে থামালে তিনি টের পেতেন। সুতরাং ঘড়িটি দ্বিতীয় গুলিতে থামানো হয়েছে। এর উদ্দেশ্য খুনের সময়টাকে গুলিয়ে দেওয়া। ছটার সময় কাঁটা যে থেমে আছে, তা নিশ্চিত ইচ্ছাকৃতভাবে করা।

সব দিক দিয়ে দেখলে সেক্রেটারিই এই খুন করতে পারে। বদমেজাজি বিপ্রদাসবাবু সুব্রতকে ঘরে দেখলে নিশ্চিত রেগে উঠতেন। অথচ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি শান্ত মনে একটি চিঠি পড়ছিলেন—দেখা যাচ্ছে।

টিফিনের সময় পিস্তলটি সরিয়ে রেখে সেক্রেটারিই টিফিনের পর খুন করে চারটের সময় বাড়ি চলে গেছে। যাবার আগে দ্বিতীয় গুলিতে ঘড়িটি বন্ধ করে কাঁটা ঘুরিয়ে ছটার ঘরে এনে রেখেছে। যাতে সুব্রতর ঘাড়ে দোষ পড়ে।

এবার তাহলে প্রশ্নগুলোর উত্তরে আসা যাক।

১। হ্যাঁ। ছবি থেকেই বোঝা যায়।

২। না। সিন্দুক খুলতে হলে বিপ্রদাসবাবুকে পার হয়ে যেতে হত। সেক্ষেত্রে ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন থাকত ঘরে।

৩। হ্যাঁ। খোলা সিন্দুক থেকেই তা স্পষ্ট।

৪। না। মূল্যবান কাগজপত্র বা টাকাকড়ি কিছু নিশ্চিত ছিল সিন্দুকে, যার লোভে এই খুন।

৫। না। খুন ঠিক কখন হয়েছে জানা যায় না। সুতরাং সুব্রতর অপরাধের এটা কোনো প্রমাণই হতে পারে না।

৬। না। বিপ্রদাসবাবুকে না জানিয়ে তাঁর বর্তমানে ড্রয়ার থেকে পিস্তল বার করা অসম্ভব ছিল।

৭। কোনো ট্রেনের যাতায়াতের শব্দ গুলি ছোঁড়ার শব্দ ঢেকে দিয়ে থাকবে।

৮। একটি চিঠি পড়ছিলেন।

৯। না। কোনো কিছুই অগোছালো নয়।

১০। ডেস্কের ডান দিকের কোণ থেকে।

১১। প্রথম গুলিতে ঘড়ি থামালে বিপ্রদাসবাবু টের পেতেন। সুতরাং দ্বিতীয় গুলিতেই ঘড়িটা থামানো হয়েছিল। প্রথম গুলি বিপ্রদাসবাবুর মাথার খুলি ভেদ করে দেয়ালে পৌঁছেছে।

১২। না। খুনের সময় গুলিয়ে দেবার জন্যেই ঘড়িতে গুলি ছুঁড়ে ঘড়িটা বন্ধ করা হয়েছে।

১৩। সেক্রেটারি।

১৪। প্রথমত, পিস্তলটা সেক্রেটারির পক্ষেই সরানো সম্ভবপর ছিল। দুই, সুব্রতর উপস্থিতিতে বদমেজাজি বিপ্রদাসবাবুর পক্ষে শান্ত মনে কাজ করা সম্ভবপর ছিল না। তৃতীয়ত, ঘড়িতে ছটা বাজিয়ে রাখার উদ্দেশ্যই হল, সুব্রতর ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা।

সুব্রত খুনী হলে ঘড়িতে নিশ্চিত ছটা বাজিয়ে রাখত না। পাঁচটার আগে কোনো সময়ে সে থামিয়ে রাখত ঘড়ির কাঁটা, কেননা সে পাঁচটার সময় এসে শহরে পৌঁছেছিল সেদিন।

মনের মানুষ

শংকর

এক যে ছিল দেশ। সেই দেশের নাম ইংলণ্ড। সেই দেশ এখনও আছে এবং থাকবে। কিন্তু সেই দেশ থেকে রূপকথার এক চরিত্র এসেছিলেন আমাদের দেশে, আমার সঙ্গে খুব তাঁর ভাব হয়েছিল, আমার জীবনকে তিনিই পরশ পাথরের ছোঁয়ায় সোনায় ভরে দিয়েছিলেন।

তিনি কিন্তু আজ নেই। এখন থেকে বেশ কয়েক বছর আগে আমাদের এই দেশের মাটিতেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আমি যখন কোনো সুযোগ পেয়ে মাদ্রাজে যাই, তখন যত কাজই থাকুক, মনটা ছটফট করে ওখানকার ক্যাথিড্রালে যাবার জন্যে।

ক্যাথিড্রাল জানো তো? খ্রীষ্টধর্মীদের বিরাট চার্চ—সেখানে নিয়মিত উপাসনা, ভজনা হয়; ঘণ্টা বাজে, প্রভু যীশু ও ঈশ্বরের মন্ত্র উচ্চারিত হয়। ভক্তরা নতজানু হয়ে ঈশ্বরের বাণী শোনেন, নিজেদের প্রার্থনা জানান। আমিও মাথা নিচু করে খালি পায়ে ক্যাথিড্রাল ভবনের পিছনে বিরাট সবুজ মাঠে চলে যাই—যেখানে সারে-সারে শুয়ে আছেন এযুগ ও সেযুগের কত অপরিচিত মানুষ। শ্বেতপাথরের বুকে কত-জনের এমন পরিচয় লেখা রয়েছে—বহুযুগের এপারে আমাদের মতো মানুষের কাছে যে-পরিচয়ের কোনো অর্থ হয় না। এই সব স্মৃতিস্তম্ভের পাশ কাটিয়ে আমি চলে আসি এক ফালি সবুজ জমির সামনে। চারপাশে তার শ্বেত ও গ্রানাইট পাথরের কালো স্তম্ভ উঠেছে। কিন্তু এখানে কেবল সবুজ ঘাস। নীল আকাশ ও নরম মাটির মধ্যে সবুজ ঘাসের নরম আচ্ছাদন ছাড়া আর কোনো বাধা নেই।

এইখানেই আমি কয়েকটা ফুল ছড়িয়ে দিই। তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকি। যতদিন শরীরে বল থাকবে, যতবার এই মাদ্রাজে আসবার সুযোগ পাব, ততবার এই মাটির ছোট্ট সীমানায় এসে এইভাবে আমি দাঁড়াব—কারণ আমার জীবনের রূপকথার দেশের সেই একমাত্র মানুষটি এইখানেই চিরদিনের মতো শুয়ে আছেন। আমার মনে হয়,

এতদিন পরেও, এখানে এইভাবে হঠাৎ পা-টিপে টিপে এসে দাঁড়ালেও তিনি আমার উপস্থিতির খবর পেয়ে যান। আমার মনে হয়, মাটির নীচে, বহু দূরে, কোনো এক অদৃশ্যলোক থেকে তিনি আমাকে লক্ষ করছেন, অথচ সব জেনেও তাঁর কাছে ছুটে যাবার কোনো উপায় নেই আমার। না-হলে, শেষ যেবার ওখানে গিয়েছিলাম, তখন আকাশ মেঘলা ছিল, আমি যেই ওখানে গিয়ে দাঁড়ালাম, আমার হাতের ফুলগুলো একটি-একটি করে ছড়িয়ে দিলাম ওই তৃণখণ্ডের ওপর, অমনি আকাশে হঠাৎ রোদ দেখা গেল কেন?

আমি মোটেই অবাক হইনি। আমি জানি, তিনি যখন জীবিত ছিলেন, তখন এইরকমই হত। সেই ছোটবেলা থেকে আমার কত দুঃখ। আমাকে দুঃখের আগুনে পিটিয়ে-পিটিয়ে তৈরি করবার জন্যেই যেন বিধাতাপুরুষ এত কষ্টের, এত শোকের, এত সমস্যার, আয়োজন করেছিলেন। আমার মন মেঘলা দিনের আকাশের মতো গম্ভীর হয়ে থাকত, আমার চোখে বর্ষার সজল মেঘের ছায়া। কিন্তু তিনি এসেই সব পাল্টে দিতেন। তাঁর মুখে ভোরবেলার সূর্যের ঝলমল ভাব। তিনি হাসতেন, গল্প বলতেন, মজা করতেন, অকারণ আনন্দে আমাদের উৎফুল্ল করে তুলতেন। তিনি একটা ইংরিজী কবিতাও বলতেন।

কবিতাটা আমার মনে নেই। তবে প্রায় ওইরকম একটা ভাব পরবর্তী জীবনে বাংলা কবিতায় আবিষ্কার করেছিলাম: 'ওরে মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে, হারা শশীর হারা হাসি অন্ধকারেই ফিরে আসে।' শশী বুঝলে তো? চাঁদ। চাঁদের হাসি কী মিষ্টি জিনিস তা একদিন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকে একলা-একলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে দেখে নিও।

সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের রূপকথার এই পুরুষটির কথাই আজ কেন জানি না বার বার আমার মনে পড়ছে। গল্প, উপন্যাস, রহস্য রোমাঞ্চ, অ্যাডভেঞ্চার, কত-কিছুই তো তোমরা পড়েছ এবং পড়বে এই আনন্দমেলার পাতায়। গল্প থেকে এবারে আমাকে তোমরা ছুটি দাও না? আমি বরং তোমাদের শোনাই সেই আশ্চর্য মানুষটির কথা, যাঁর কাছাকাছি না-এলে আমি কিছুতেই লেখক হতাম না। লেখক হওয়া তো দূরের কথা, জীবন সম্বন্ধে আমার অনেক ভুল ধারণা থেকে যেত। সেইসব বিরক্তি, অভিমান, ঘৃণা ও ভুল-বোঝাবুঝি নিয়ে মানুষের এই সংসারকে মোটামুটি বুঝে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠত। হয় আমি নামতে নামতে অনেক নীচে কোনো এক ভয়ংকর অন্ধকারে তলিয়ে যেতাম, আর না হয় বিরাট এই পৃথিবীর জনারণ্যে হারিয়ে যেতাম, আমার আপনজনরাও আমার খোঁজ পেত না। তোমাদের আনন্দমেলার এই আনন্দ-আয়োজনে আমার হাজির থাকবার প্রশ্নই উঠত না।

॥ ২ ॥

সায়েব। এই সায়েবের সঙ্গে যখন আমার দেখা হবার কথা উঠল তখন আমার বয়স ষোল-সতেরো। ওই বয়সে কেউ চাকরি-বাকরির খোঁজ করে না। কিন্তু আমার উপায় নেই। কারণ আমার বাবা নেই।

একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে মায়ের ভেঙে পড়া কান্নার সুর শুনলাম। আমার বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। সেই কান্নার সুর এই এতদিন পরেও আমি সম্পূর্ণ ভুলতে পারিনি—এক-এক রাতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে যায়, আমি ধড়মড় করে উঠে বসি। তখনও খেয়াল থাকে না যে, এই কান্না অনেক দিন আগের। তারপর অনেক সময় কেটে গিয়েছে। আমাদের দুঃস্বপ্নের রাত্রি শেষ হয়েছে, আমি এখন নাবালক নই। আমার ছোট-ছোট ভাইয়েরাও এখন আমার ওপর নির্ভরশীল নয়, আমার রুজি-রোজগার আছে। আমি পৃথিবীতে পরনির্ভর নই, আমার পাশের ঘরে সংসারের একমাত্র রোজগারী লোকের নিশ্চল মরদেহ এখনও মেঝের বিছানার ওপর শোয়ানো নেই।

কী আশ্চর্য! এক-একটা ঘটনা মানুষকে কত পাল্টে দেয়। বাবার মৃত্যুই আমাকে কেমন লাজুক ও ভাবুক করে তুলল। এর আগে কথায় কথায় বাবা-মার কাছে কত জিনিস দাবি করতাম, চেয়ে না পেলে রাগ দেখাতাম—অথচ এখন আমিই প্রয়োজন হলেও চাইতে পারি না, ইচ্ছে হলেও মুখ খুলতে পারি না। দাবি করার মতো আপনজন মানুষের জীবনে মাত্র ক'জনই বা থাকেন? তাঁরা কোহিনুর মণির মতোই মূল্যবান, হাতের গোড়ায় আছেন বলেই তাঁদের কখনও অবহেলা কোরো না। একদিন যখন তোমরা বড় হবে, আমার এই বয়সে হাজির হবে, তখন যেন আপনজনকে অবহেলার কোনো দুঃখ থাকে না তোমাদের।

বাবার মৃত্যুর পর থেকেই জীবিকার সন্ধানে সংসারের পথে পথে ঘুরছি। কিছু রোজগার আমাকে করতেই হবে। না হলে আমাদের সংসারের সামনে আসন্ন বিপদ। আমাদের নিশ্চিত অধঃপতন রোধ করবার আর কোনো পথ নেই।

এই সময় অর্থ উপার্জনের উৎকন্ঠায় নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা তীর্থ-সলিলের মতো নিজের স্মৃতির ভাণ্ডারে সংগ্রহ করেছি। কখনও ফেরিওয়ালা হয়েছি। কখনও হোটেলের বয়, কখনও বেয়ারা এবং আরও কত কী।

তারপর একদিন বিভূতিদা বললেন, "চল, আমাদের ব্যারিস্টারের কাছে তোর চাকরি করে দিচ্ছি।"

শুনেই আমার মফস্বলী ভয় আরও বেড়ে গেল। সায়েব—সে তো ইংলণ্ডে জন্মায়! তারপর গটমট করে এদেশে চলে আসে। ভীষণ রাগী লোক হয়, সোডা-লেমনেডের বোতল আচমকা খুলে দিলে যেমন শব্দ হয়, সেইরকম ভট-ভট আওয়াজ করে ইংরিজি বলে কিন্তু কিছুই বোঝা যায় না, অথচ পান থেকে চুন খসলেই ভীষণ বিপদ। না বাবা, যতই অভাব হোক, যতই অনটন হোক, তেমন হয় না-খেয়েও নিজের ঘরে শুয়ে থাকব, কিন্তু পৈতৃক প্রাণটা ওই সায়েবের খপ্পরে পড়ে কিছুতেই খোয়াতে পারব না। আমি মায়ের বড়ছেলে, আমার ওপর অনেক দায়িত্ব—জীবনটা ছেলেখেলা নয়!

সায়েবের হিসট্রি শুনিয়ে দিলেন বিভূতিদা। বললেন, "আগে মিলিটারিতে ছিলেন। মহাযুদ্ধের সময় প্রাণ-সংশয় করে, দুঃসাহস দেখিয়ে মস্ত বড় সম্মান পেয়েছিলেন—মিলিটারি ক্রস!"

আমার ভয় আরও বেড়ে গিয়েছিল। মিলিটারি! নৈব নৈব চ। ইস্কুলে পড়বার সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কল্যাণে অনেক গোরা এবং কালা সৈন্য দেখা হয়েছে আমাদের। তালগাছের মতো চেহারা এক-একটা—হাতে থাকে স্টেনগান। এমন ভাব যেন যে-কোনো মুহূর্তে ফায়ারিং শুরু করতে পারে। দৈত্যের মতো ট্রাকে চড়ে দৈত্যরা সাদা-সাদা দাঁত বার করে তীরের বেগে রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যেত। সবাই বলে দিয়েছিল—মিলিটারি থেকে দূরে থাকো। বাঁচতে যদি চাও, তফাত যাও। মিলিটারি দেখতে গিয়েই তো আমাদের ইস্কুলের একটা ছেলে গাড়িচাপা পড়ল। সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, কেউ কিছু করতে পারল না।

সুতরাং একে সায়েব, তায় মিলিটারি! নমস্কার, ওকাজে আমার দরকার নেই।

বিভূতিদা বলেছিলেন, "দূর বোকা। উনি কি আর

ঘাস-বিচালি মার্কা চাষা টমি না সেপাই? উনি মিলিটারি অফিসার!”

“ক্যাপটেন?” মিলিটারি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ঝালিয়ে নেয়ার জন্যে আমি বিভূতিদাকে প্রশ্ন করেছিলাম।

“উঁহু,” বিভূতিদা উত্তর দিয়েছিলেন।

“মেজর?”

“উঁহু!”

“তাহলে কি কর্নেল!” আমার চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছিল।

“লেফটেনান্ট কর্নেল!” বিভূতিদার উত্তর শুনে উত্তেজনায় আমার ফেন্ট হয়ে যাবার অবস্থা। ওই ইংরিজি বানানটা ম্যানেজ করতে না পেরেই দুদিন আমাকে ইস্কুলে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। তারপর একজন বানানের মন্তরটা শিখিয়ে দিয়েছিল—মিথ্যে তুমি দশ পিঁপড়ে। মিথ্যে মানে Lie, তুমি—u, দশ অর্থাৎ ten এবং পিঁপড়ে—ant, কোন ভুল হবার চান্স নেই—Lieutenant! যে বানানেই এমন বিপত্তি, সেই পদের মিলিটারি সায়েব কী বিপজ্জনক হবেন তা কষে ফেলার মতো বুদ্ধি অবশ্যই আমার ঘটে আছে!

বিভূতিদা আমার কোনো কথা শুনলেন না। বললেন, “একবার নিজের চোখে দেখ না। আগে অঙ্ক-টঙ্ক কষে লাভ কী?”

॥ ৩ ॥

ভাগ্যে বিভূতিদা আমাকে জোর করে হাইকোর্টপাড়ায় টেম্পল চেম্বারে সায়েবের আপিসে নিয়ে গিয়েছিলেন! নাহলে রহস্যময় এই বিশ্বজগতের সিংহদ্বার এমনভাবে আমার সামনে খুলে যেত না।

চিচিং ফাঁক—মণিমাণিক্যে ভরা এক রত্নভাণ্ডারের সামনে উপস্থিত হয়েছি আমি, কোনো রকম চেষ্টা না করেই। সেই সম্পদ, যার কণামাত্র উদ্ধারের জন্য কত মানুষ কতদিন কত সাধনা করেন কত ত্যাগকে হাসিমুখে বরণ করে নেন, এবং এত চেষ্টার পরেও অনেক সময় ব্যর্থ হয়ে ক্লান্ত দেহে ফিরে আসেন আপন আশ্রয়ে।

সায়েবকে দেখলাম আমি। মোটেই ওই মিলিটারি দৈত্যদের মতো চেহারা নয়! মোটেই ওই জুটমিলের সায়েবদের মতো ঘোঁতঘোঁত করছেন না। এ যে একেবারে অমায়িক মাটির মানুষ। যেন আমার সঙ্গে কতদিনের পরিচয়।

আমারই জন্যে যেন তিনি অপেক্ষা করছিলেন। মিষ্টিমুখে, হাসির জ্যোৎস্নায় দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করে যেন তিনি জিজ্ঞেস করছেন, “এতদিন কোথায় ছিলে?”

এ তো আজকের দেখা নয়—কবে, কোথায়, অনেক দিন আগে জন্ম-জন্মান্তর পেরিয়ে, কোনো এক অস্পষ্ট অতীতে আমরা যেন পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এসেছিলাম। আমি—অর্থাৎ সতেরো বছরের অপরিণতবুদ্ধি এক মফস্বলী কিশোর, অপুষ্ট শরীরের জন্য কিছুতেই তাকে যুবক বলা যায় না। আর সত্তর-ঊর্ধ্ব, সদা প্রসন্ন, চঞ্চল চাহনির এক বৃদ্ধ—যাঁকে অবশ্যই বৃদ্ধ বলা যায় না, কারণ তাঁর মুখে চোখে শিশুর সরলতা চাঁদের আলোর মতো ছড়িয়ে আছে।

আমাদের সেই প্রথম সাক্ষাতের কথা সবিস্তরে অন্যত্র লিখেছি। এখন পুনরাবৃত্তি করব না। যদিও জীবনের এই একটি মাত্র অভিজ্ঞতা, যা বারবার কীর্তন করতে আমার মোটেই দ্বিধা হয় না, আমার ক্লান্তি আসে না—বিমল আনন্দে আমার মন ভরে ওঠে।

সায়েবের মাথায় বিশাল টা[illegible] আমার লক্ষ্য এড়ায়নি। এই টাক দেখলেই আমি ছোটবেলা থেকে [illegible] পাই। আমার বাবার মাথায় টাক ছিল। আমাদের রসিক মাস্টারমশায় ধীরেনবাবুর মাথায় টাক ছিল। আমাদের দিলদরিয়া গোমস্তামশায় বরদাপ্রসন্ন মণ্ডল, যিনি আমাকে প্রায়ই লুকিয়ে লুকিয়ে রাজেন মিষ্টান্ন ভান্ডার থেকে বোঁদে কিনে দিতেন, তাঁর মাথাতেও টাক ছিল। টাক থাকলেই দেখেছি তারা খুব আপনজন হয় আমার—কার্যকারণ সম্বন্ধ কিছু আছে কিনা জানি না। কিন্তু টাক আমার কাছে বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে।

সায়েবের কথাবার্তা তখন শুনেছিলাম। সোডার বোতল খুলে দেওয়ার মতো ইংরিজি শব্দ নয়—ভুজিওয়ালার দোকানে ভুট্টার খই ভাজবার মতো চড়বড় আওয়াজও নয়। কী আশ্চর্য! বিবেকানন্দ ইস্কুলে পড়া ইংরিজি বিদ্যে নিয়ে আমি সায়েবের প্রায় সব কথাই বুঝতে পারছি—কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

সায়েব কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার। কালো গাউন পরে জাদরেল জজদের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কেস করেন—মি লুড—মি লুড—ইয়েস মাই লর্ড—আই অ্যাম অ্যাফরেড ইট ইজ নট সো মাই লর্ড। অদ্ভুত অজানা শব্দ আমার কানে ভেসে আসত—আমার অর্থাৎ ব্যারিস্টার সায়েবের বাবুর কানে। যদি কখনও পারো একবার কলকাতা দিল্লি বোম্বাই অথবা যে-কোনো বড় শহরের হাইকোর্ট ঘুরে এসো। খুব মজা পাবে। হাইকোর্ট না দেখলে জীবনে কী [illegible] হল

॥ ৪ ॥

সায়েবের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছে। এই ক'দিনেই আমি কাজেকর্মে বেশ রপ্ত হয়ে উঠেছি—যেন কতদিন এই হাইকোর্টে আমি বাবুর কাজ করছি। হাইকোর্ট থেকে টেম্পল চেম্বারে যাচ্ছি, চিঠি টাইপ করছি, খাতা লিখছি, তারপর বিকেলে চলে যাচ্ছি ক্লাবে, সেখানে দুখানা ঘর ভাড়া করে সায়েব একলা-একলা থাকেন—কাজকর্ম করেন। উকিল-ব্যারিস্টারের কাজ [illegible] আদালতেই শেষ হয় না; বাড়ি ফিরে এসে পরীক্ষার ছাত্রদের মতো রাত জেগে পরের দিনের আদালতী পরীক্ষার জন্যে তৈরি হতে হয়।

সায়েব একদিন গম্ভীরভাবে বললেন "আমি তোমার লেফটেনান্ট বানানের গোপন গল্প শুনেছি। ভাবছি অক্সফোর্ড ডিক্সনারির এডিটরকে লিখে দেব।”

আমি একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম। সায়েব হাসলেন।

“দশটা পিঁপড়ের জোর কিন্তু একজন লেফটেনান্ট কর্নেল থেকে বেশি হতে পারে!” এই বলে সায়েব এবার গল্প শুরু করলেন এক সহকর্মী বীরের। প্রবল প্রতাপান্বিত হয়েও তিনি অনেকদিন যুদ্ধক্ষেত্রে ট্রেঞ্চের আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন। অবশেষে একদিন সকালে তিনি মরিয়া হয়ে পরিখা থেকে বেরিয়ে এসে শত্রু-অধিকৃত অঞ্চল আক্রমণ করলেন। শত্রুপক্ষ হঠাৎ এই আক্রমণের জন্যে তৈরি ছিল না—তারা হেরে গেল। মহাসমারোহে এই বিজয়ী অফিসারকে নানা পদকে সম্মানিত করা হল।

মেডেল-টেডেল পাবার পরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, আচমকা ঐ আক্রমণের বুদ্ধি তাঁর মাথায় কেমন করে এল।

বীর সৈনিক মাথা নিচু করে জানালেন, “সত্যি কথা বলতে কী, গোটাকয়েক পিঁপড়ে কীভাবে ড্রেসের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। তাদের অসহ্য কামড়ে ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসা ছাড়া আমার গতি ছিল না। আর এমনি বেরিয়ে এলে তো শত্রুর গুলিতে সাক্ষাৎ মৃত্যু। তাই নিজেই গুলি ছুঁড়তে ছু[illegible] [illegible]।”

১৯১৪-১৮ চার বছর রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছেন সায়েব। যুদ্ধ সম্বন্ধে কোনো ভালোবাসাই তাঁর ছিল না। মানুষ কেন এই পাগলামোয় নেমে নিজেদের সর্বনাশ করে, তাও সায়েব বুঝতে পারতেন না। কিন্তু যুদ্ধের অনেক গল্প তাঁর জানা ছিল। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবন সম্বন্ধে এমন নিঃস্পৃহ সরস গল্প কীভাবে তৈরি করা যায়, তা আজও আমি মাঝে মাঝে ভাবি।

আমার গোমড়া মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে সায়েব মাঝে মাঝে গল্প শুরু করতেন। বানানো গল্প নয়—সত্যিকারের গল্প। যেমন, একদিন আমাদের দেখালেন তাঁর সেই বিখ্যাত এম-সি অথবা মিলিটারি ক্রস—ভিক্টোরিয়া ক্রসের পরেই যার খ্যাতি।

"আপনি খুব বীর নিশ্চয়, না হলে এই সম্মান কেন দেওয়া হল আপনাকে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

চোখ টিপে দুষ্টুমি করলেন সায়েব। বললেন, "ঠিক একই প্রশ্ন করেছিল ইস্কুলে-পড়া কলকাতার এক মেয়ে। সে জানতে চেয়েছিল, কোন্ বীরত্বের জন্যে তোমাকে এই সম্মান দেওয়া হল? আমি বলেছিলাম, বীরত্ব-টিরত্বর কোনো কথাই ওঠে না! নীতিটা খুব সোজা। যুদ্ধের শেষে একটা মৃত সিংহের চেয়ে একটা জীবন্ত গাধার মূল্য অনেক বেশি।"

আমি প্রথমে কথাটা সত্যি ভেবেছিলাম। পরে অন্য লোকের মুখে শুনলাম, গল্পটা মোটেই সত্য নয়। ফরাসী
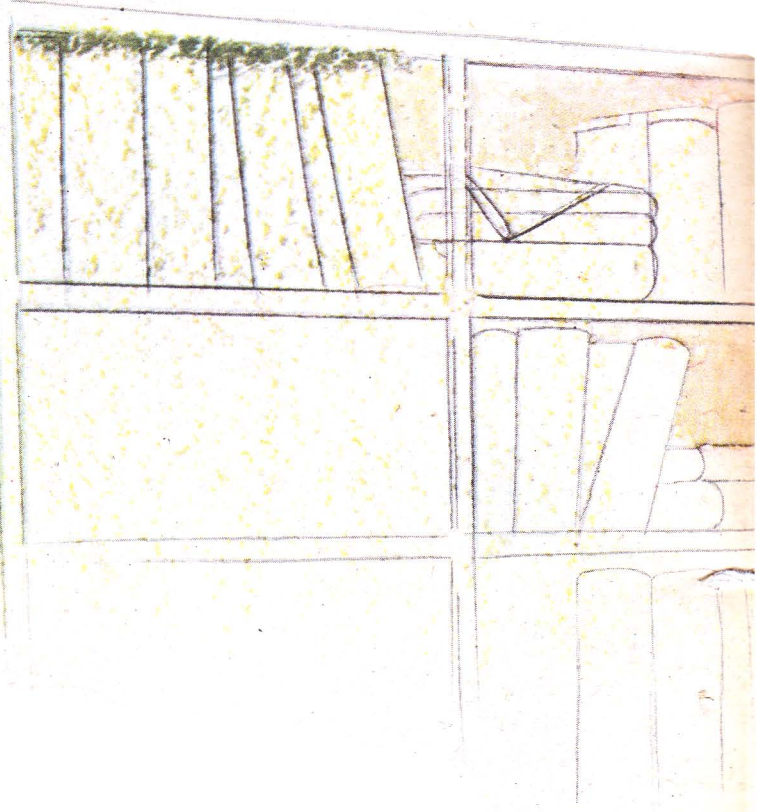
রণাঙ্গনে প্রচণ্ড যুদ্ধে অভূতপূর্ব বীরত্ব দেখাবার জন্যেই সায়েবকে এই সম্মান দেওয়া হয়েছিল। এই যুদ্ধে তাঁর দশজন সংগী নিহত হয়েছিলেন, একমাত্র তিনিই আহত অবস্থায় বেঁচেছিলেন এবং মিলিটারি ক্রস পেয়েছিলেন।

আঘাত, যন্ত্রণা, মৃত্যুতে ভরা যুদ্ধের গল্প শুনতে ইচ্ছে করে না। আমি একদিন সাহস পেয়ে বললাম, "মজার গল্প বলুন। যুদ্ধে মজা হয় না?"

মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে ভাবতে সায়েব বললেন, "একবার হয়েছিল। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর একটা শত্রুশিবির দখল করে নিয়েছি আমরা। কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে এক-জন অর্ধশায়িত শত্রু-সৈন্যকে গুলি করতে যাচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ শুনলাম, সে ইংরিজিতে আমার নাম ধরে কাতরভাবে বলছে, প্লিজ আমাকে মারবেন না, আমি আহত, আমার হাতে কোনো অস্ত্র নেই। বিদেশের এই রণাঙ্গনে শত্রুর মুখে নিজের নাম শুনে চমকে উঠেছি আমি! লোকটাকে না-মেরে অস্ত্র নামিয়ে নিলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কে? আমার নাম জানলে কী করে?" লোকটি তখন উত্তর দিল, "আমাকে চিনতে পারছেন না কর্নেল? আমি ফ্রেডরিক —লণ্ডনে আপনার জার্মান নাপিত ছিলাম। আপনি তখন ব্যারিস্টারি পড়ছেন, প্রতি মাসে আমার কাছে চুল ছাঁটতে আসতেন।"

সায়েব বললেন, "এবার ফ্রেডরিককে চিনতে সত্যিই কষ্ট হল না। যুদ্ধ বাধবার কিছুদিন আগেই সে জার্মানিতে

ফিরে গিয়েছিল। তারপর কে জানত এইভাবে দেখা হবে রণাঙ্গনে?"

একটু থামলেন সায়েব। তারপর রসিকতা করলেন, "আমার খুব ইচ্ছে ছিল যুদ্ধ থেমে যাবার পরে সব কিছু আবার স্বাভাবিক হলে ফ্রেডরিককে দিয়ে আর একবার চুল কাটাব। ছোকরার হাতটি খুব ভাল ছিল। কিন্তু আমার সেই মনস্কামনা সিদ্ধ হল না।"

"কেন? যুদ্ধশেষে ফ্রেডরিককে আর খুঁজে পেলেন না?" আমি জানতে চাই।

"চেষ্টা করলে নিশ্চয় তাকে খুঁজে পাওয়া যেত। জার্মান দেশটা তো তোমাদের এই দেশের মতো বড় নয়। সেখানে ক'জন আর নাপিত থাকতে পারে?"

"তাহলে?" ব্যাপারটা এবার আমার কাছে জটিল হয়ে উঠছে।

"সে অনেক দুঃখের কথা। আমাকে ওসব জিজ্ঞেস করে মনের দুঃখু বাড়িয়ে দিও না, শংকর! প্লিজ!"

সায়েব যে কপট দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছেন তা বুঝতে আমার বাকি রইল না। বললাম, "ব্যাপারটা কিন্তু এখনও আমি বুঝতে পারছি না।"

"আমাকে দেখে এখনও দুঃখের কারণটা বুঝতে পারছ না?" এবার অভিযোগ করলেন সায়েব। তারপর ঐ চাপা দুঃখের কপট ভঙ্গিতে মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "ফ্রেডরিকের সঙ্গে দেখা হয়ে লাভ কী হত? আমার মাথায় চুল কই? কাটবে কী?"

সায়েবের এই মাথাজোড়া টাক নিয়ে এই নিদারুণ রসিকতা আমার আজও হাসির উদ্রেক করে। মাথায় হাত দিয়ে তিনি বললেন, "বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্র টেকোরা খুব দুঃখী। তাদের দুঃখের শেষ নেই এমন কথাও বলা চলে, কারণ একবার টাক পড়লে সে-মাথায় আর চুল গজায় না। টাক মানুষের জীবনে একটা পার্সনাল ট্রাজেডি—অথচ ছোটছেলেরা কিছুতেই তা বুঝতে চায় না!"

আমি সায়েবের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি মিটমিট করে হেসে বললেন, "কলকাতায় যখন এসেছি তখনও আমার মাথায় কিছু চুল ছিল। অনেক চেষ্টা করে সেইসব চুল বিসর্জন দিয়ে এমন পরিপূর্ণ টাকের অধিকারী হয়েছি, শংকর। কারণ একমাত্র এই দেশে টাক একটা প্রিভিলেজ।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?"

বড় বড় চোখ করে সায়েব বললেন, "আমি কিছু জানি না, ভাবছ? বাঙালীদের ধারণা টাকা থাকলে তবে টাক পড়ে, টেকোকে সবাই তাই সম্মান করে—তার ধার পেতেও অসুবিধা হয় না! কারণ সবাই জানে সে-টাকা মার যাবে না! একেই তোমরা বলো—অয়েলিং এ অয়েলি হেড।"

অর্থাৎ তেলা মাথায় তেল দেওয়া!

এই সব কথাবার্তা শুনে কে বলবে তিনি একজন এত বড় ব্যারিস্টার? আইনের কত গভীর চিন্তা তাঁর মাথার মধ্যে সব সময় ঘুরপাক খাচ্ছে।

আজ বহুদিন পরে, তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে বুঝতে পারি, আমার শুকনো মুখে হাসি ফোটাবার জন্যেই তিনি নানা রকম মজার গল্প ফাঁদতেন। আমার অনেক সমস্যা। আমার চোখে অনেক স্বপ্ন, কিন্তু আমার কাঁধে অনেক দায়দায়িত্ব। এইসব দায়িত্ব পালন করে, সেই ছোটবেলায় মানুষের মতো মানুষ হবার যে সব স্বপ্ন দেখেছিলাম, তা বাস্তবে পরিণত হবার কোনো সম্ভাবনাই সেই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে নেই।

কত মানুষের সংসারেই তো এইসব মর্মান্তিক দুঃখ রয়েছে, কত দুর্ভাগার চোখেই তো এমন সব স্বপ্ন রয়েছে যা কোনোদিন সম্ভব হবে না। পৃথিবীতে কে সেইসবের খোঁজ রাখে? বিশেষ করে উঁচুতলার ব্যস্ত মানুষরা? আর আমি তো একজন ব্যস্ত মানুষের অতি সামান্য কয়েক মাসের কর্মচারী। আমার সঙ্গে তাঁর পারিবারিক পরিচয়ও নেই—কাজেও তেমন কিছু দক্ষতা তখনও পর্যন্ত অর্জন করিনি। সুতরাং আমার সম্বন্ধে অতিমাত্রায় চিন্তিত হবার কোনো কারণ সায়েবের ছিল না।

তবু তিনি আমাকে ভালবাসতেন। আমার সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখতেন। আমার অন্তরের উৎসাহ-প্রদীপটি তিনি পরম যত্নে উজ্জীবিত করতেন। দূরভবিষ্যতে সমৃদ্ধির আলোকিত স্বর্ণশিখরে আরোহণের অধিকার ও সম্ভাবনা যে প্রত্যেক মানুষেরই আছে তা তিনি শুধু নতমস্তকে স্বীকার করতেন তা নয়, সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার মতো অভাজনের মঙ্গল কামনা করতেন।

শিক্ষা, পাণ্ডিত্য ও মেধায় আমি তাঁর তুলনায় কী? তবু আমার সাহিত্যপ্রীতি লক্ষ করে, সময় পেলেই আমার সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করতেন। সৎ-সাহিত্যের সঙ্গে মেকি সাহিত্যের কী প্রভেদ, তা বই থেকে পড়ে-পড়ে বুঝিয়ে দিতেন।

সত্যি, সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। জন্ম-জন্মান্তর ধরে সামান্য পরিচিত এই বিদেশীর ঋণ আমাকে শোধ করতে হবে। কারণ আমার অন্তরের উচ্চাশা, যা বাবার মৃত্যুর পরে বৈশাখের এক দমকা হাওয়ায় নিভে গিয়েছিল, তাকে পরম স্নেহে ও যত্নে তিনিই আবার নতুন করে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। আমাকে সেই সঙ্গে বুঝিয়েছিলেন ভালবাসার অমৃত-মন্ত্র। তিনি বলতেন, "ভালবাসাই সব। ভালবাসায়
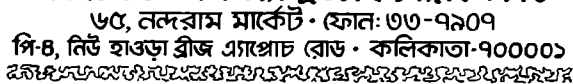
পর্বতকেও নড়ানো যায়। ভালবাসা এমন জিনিস যে, কোনো আনন্দের জিনিস ভালবেসে ভাগ করলে তা দ্বিগুণ হয়ে যায়। আর দুঃখকে ভালবেসে ভাগ করলে অর্ধেকেরও কম হয়ে যায়।"

এ-অঙ্ক তখন বিশ্বাস করিনি। তোমাদেরও এই মুহূর্তে বিশ্বাস করতে বলছি না। কিন্তু একদিন তো তোমরা বড় হবে। সেদিন এই শংকর হয়তো পৃথিবীতে থাকবে না। কিন্তু তখন নির্জনে কিছুক্ষণ ঘরের এক কোণে বসে হিসেব করে দেখো কথাটা সত্যি কিনা—আনন্দ ভাগ করলে ডবল হয় কিনা, দুঃখ ভাগ করলে অনেক কমে যায় কিনা।

॥ ৫ ॥

অঙ্ক এবং ভাগাভাগির প্রশ্নে আমার অন্য একটা কাহিনী মনে পড়ে যাচ্ছে। সংসারে অকালে বাবাকে হারিয়ে, দারুণ অর্থাভাবে নিজের সমস্ত স্বপ্নকে বিসর্জন দিয়ে, পৃথিবী সম্বন্ধে আমার ধারণাই এক সময় পাল্টে যেতে বসেছিল।

বাবা যখন বেঁচে ছিলেন তখন আমাদের অভাব ছিল না। জামা, জুতো, খাবার, খেলনা হাতখরচ যখন যা-চেয়েছি প্রায় তাই-ই পেয়েছি। সংসারে সব জিনিসের গায়ে যে একটা দামের টিকিট ঝুলানো আছে তা খেয়াল করিনি। বাবার মৃত্যুর পরে সব পাল্টে গেল। আমার যে অমন সাধের পড়াশোনা তাও ছাড়তে হল। কোনো রকমে ম্যাট্রিক পাশ করে, পথে পথে ঘুরে, অবশেষে সায়েবের কাছে নাবালক বয়সে এই প্রাণধারণের উপযোগী চাকরি পেয়েছি।

তখন আমার প্রায়ই দুঃখ হত, "হে ঈশ্বর, আমি গ্র্যাজুয়েট হতে পারলাম না, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা আমার হল না, চিরকাল আধা-শিক্ষিত হয়েই আমাকে জীবনযাপনের গ্লানি সহ্য করতে হবে?"

সায়েব এইসব কথা হঠাৎ একদিন বেয়ারা দেওয়ান সিং-এর কাছে শুনেছিলেন। তারপর আমাকে ডেকে এক ছুটির দিনে বলেছিলেন, "শংকর, আমি প্রার্থনা করি তুমি একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান অর্জন করো। কিন্তু এটা জেনে রেখো, ইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও বিরাট এক বিশ্ব পড়ে আছে। প্রকৃত জ্ঞানী লোকেরা এই বিরাট পৃথিবী থেকেই তাঁদের বিদ্যাগ্রহণ করে থাকেন—সেই শিক্ষা পরীক্ষা পাশের সঙ্গেই শেষ হয় না। সেই শিক্ষা চলে অনেক, অনেক দিন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সেই শিক্ষা যিনি নিতে পারেন, তিনিই বিদ্বান।"

বড় শক্ত কথা। হয়তো তোমাদের বুঝতে কষ্ট হবে। কিন্তু আনন্দমেলার পাঠক-পাঠিকা, তোমরা সায়েবের কথা-গুলো শুনে রাখো। হয়তো এর মধ্য থেকে এমন কোনো সত্যকে তোমরা খুঁজে বার করতে পারবে যা সেই অপরিণত বয়সে সামান্য বিদ্যার আলোকে আমি খুঁজে পাইনি।

॥ ৬ ॥

সেই দিনটির কথাও আমার মনে আছে। ছুটির দিনে ক্লাবের একতলা ঘরে তিনি ও আমি নানা বিষয়ে গল্প করছি।

তিনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "মনে করো, গভীর বনের মধ্য দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে গেল। সেই ঈশ্বর, যিনি সবাইকে খুব ভালবাসেন, অথচ যাঁর নাগাল পাওয়া যায় না। ঈশ্বরের কাছে তোমাকে একটি প্রশ্ন করবার সুযোগ দেওয়া হল। তুমি তাঁকে কী প্রশ্ন করবে?"

এর আগে ইস্কুল-জীবনে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিখ্যাত "প্রশ্ন" কবিতাটি আবৃত্তি করে আমি কয়েকটা বই উপহার পেয়েছিলাম। "যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভাল!"

কিন্তু না। সে-প্রশ্ন তখন আমাকে মোটেই বিব্রত করছে না। যে-প্রশ্ন আমি করতে চাই, তা অতি সহজ। সংসারে কত জিনিস পেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পয়সা না থাকলে সেসব আমার নাগালের বাইরে। আমি বললাম, "প্রশ্ন করব, বিশ্ব সংসারের সব জিনিসের এত দাম কেন? তোমার সৃষ্টিতে দাম ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না কেন? কেন তুমি এই দাম সৃষ্টি করেছ ঈশ্বর?"

সায়েব আমার কথা শুনলেন। একটু গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, "তুমি কী চাও?"

আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম, "একদিন স্বপ্ন দেখলাম আমি খুব বড়লোকের ছেলে হয়েছি। আমার আর কোনো চিন্তা নেই। আমার পকেটে বিরাট ব্যাংকের বিরাট চেকবই আছে, আমি যা-খুশি যত খুশি টাকা তুলতে পারি।"

সায়েব এবার কী ভাবলেন। তারপর ছোট ছেলের মতো বললেন, "চলো, আমরা বেড়িয়ে আসি, বলা যায় না এই ভোর-বেলায়, গড়ের মাঠে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের দেখাও হয়ে যেতে পারে। এই ভোরবেলাটা হেভেনলি। স্বর্গীয়।"

এক হাতে বেড়াবার লাঠি এবং আরেক হাতে আমাকে ধরে ক্যালকাটা ক্লাব থেকে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। সামনে সবুজ ঘাসের মখমল আদিগন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। মৃদু হাওয়া বইছে এবং সেই হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো সামান্য কাঁপছে। আমরা মাঠের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে হেঁটে চলেছি।

সায়েব বললেন, "শংকর, আমরা কি বাদামভাজা খাব?"

আমি বললাম, "ইয়েস। হোয়াই নট?"

এই ভোরবেলাতেই একটা বাদামভাজাওয়ালা তার দোকান খুলে বসে আছে। দু'আনার বাদাম কিনে একটা আধুলিই বাদামওয়ালাকে দিয়ে দিলেন সায়েব। সে ভাবল, লোকটা পাগল নাকি?

সায়েব আমাকে বললেন, "এর নাম চৌথ! আগেকার দিনে তোমাদের দেশের রাজারা চাষীর কাছ থেকে ফসলের চার আনা জোর করে আদায় করে নিতেন।"

বাদাম খেতে খেতে আমরা এগোচ্ছি। সায়েব হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি দামের কথা বলছিলে, তাই না?"

"হ্যাঁ, স্যর। জিনিসের বড্ড দাম। দাম ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই পাওয়া যায় না। আর দাম ক্রমশ বেড়েই চলেছে।"

"ঠিক বলেছ।" সায়েব আমাকে প্রথমে উৎসাহ দিলেন। "এই আমার ক্লাবের ভাড়া আগে যা ছিল এখন তার ডবল হয়ে গিয়েছে।"

সায়েব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন, "আমাদের এই পৃথিবীতে সব জিনিসের এখনও কিন্তু দাম ধরা হয়নি। কথাটা তোমাকে খুব চুপি-চুপি কানে-কানে বলে রাখছি। খবরদার, আর কাউকে বোলো না—এখনই তারা দাম ধরবার জন্যে ছুটে আসবে।"

আমি ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। তিনি মজা করে গলা নামিয়ে আমাকে বললেন, "পৃথিবীর সেরা সমস্ত জিনিস এই দুর্মূল্যের বাজারেও বিনামূল্যে পাওয়া যায়।"

আমি যেন ক্রমশ অন্য এক অভিজ্ঞতার স্বপ্নরাজ্যে চলে যাচ্ছি। সায়েব জিজ্ঞেস করলেন, "সব চেয়ে দামী কী দেখেছ?"

"সোনা।" এ উত্তর দিতে আমার এক মুহূর্তও লাগল না।

সায়েব হঠাৎ পূর্ব আকাশের দিকে ছড়িটা বাড়িয়ে দিলেন। "শংকর, ওই দেখো।"

আমি দেখলাম, দুটো গাছের মধ্য দিয়ে সোনালী সূর্যের আলো সবুজ ঘাসের ওপর গ্যালন গ্যালন তরল সোনা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

অবাক হয়ে সায়েব ওই দিকে তাকিয়ে আছেন। বললেন, "এই সোনার এখনও কোনো দাম ধরা হয়নি। আমরা জানি না বলে, এই সোনায় আমরা স্নান করি না। এই সোনা মনের মধ্যেও জমা করে রাখি না।"

সায়েবের কথাতেই সেদিন হঠাৎ আমি আবিষ্কার করেছিলাম, রোদ বৃষ্টি ঝড় হাওয়া, মেঘ, আকাশের চলচ্চিত্র প্রকৃতির রত্নসম্ভারের জন্য আজও আমাদের কোনো খরচ করতে হয় না। অতি দরিদ্র আমিও এইসব দেখে অপার আনন্দ অনুভব করতে পারি।

সায়েব বলেছিলেন. "আরও অনেক মহামূল্যবান জিনিস এখনও বিনামূল্যেই আমরা পেয়ে থাকি শংকর। মায়ের স্নেহ, ভায়ের ভালবাসা, বোনের ভালবাসা, স্ত্রীর ভালবাসা সন্তানের ভালবাসা, মানুষের ভালবাসা—এসবের এখনও কোনো দাম ধরা হয়নি ঈশ্বরের এই রাজত্বে। এবং আশ্চর্য জিনিস এই ভালবাসা—যত দেবে তত বেড়ে যাবে, ঘটি থেকে যতই ঢালো, কিছুতেই ফুরোবে না। তোমাদের মধুসূদন দাদার সেই অক্ষয় ভাঁড়ের গল্প আমি শুনেছি। মোটেই বানানো গল্প নয় ওটা।"

হাঁটা বন্ধ করে, এবার আমরা ট্যাক্সিতে চড়ে বসেছি। কোথায় চলেছি, আমি জানি না। গাড়িটা রেসকোর্সকে উত্তরে রেখে দক্ষিণ দিকে মোড় নিল। এর আগে একবার সায়েবের সঙ্গে চিড়িয়াখানাও ঘুরে এসেছি আমি।

সায়েব বললেন, "তুমি বিরাট ধনীর দুলাল হতে চাইছিলে। রকিফেলার কিংবা ফোর্ড পরিবারের কেউ—যার হাতে থাকবে দুর্লভ রত্নভান্ডার। এখনও তোমার আমার জন্যে এমন রত্নভান্ডার খোলা আছে। তোমারই মতো আমিও একদিন প্রার্থনা করেছিলাম ঈশ্বরের কাছে খুব ছোটবেলায়। আমার বাবাও তো সামান্য লোক ছিলেন, বিশেষ অর্থবল ছিল না তাঁর।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস না-করে থাকতে পারলাম না।

সায়েব বললেন, "ঈশ্বর তাঁর দূতকে আমার সঙ্গে স্বপ্নে দেখা করতে পাঠালেন। বললেন, টাকাকড়ি তো অতি সামান্য কথা। তার থেকেও অনেক মহামূল্যবান সম্পদ তো ঈশ্বর ব্যাংকে রেখে দিয়েছেন—তুমি ইচ্ছে করলেই তো চেক কাটতে পারো। কোনো বাড়তি পয়সা লাগবে না। সেই সম্পদে তোমাদের সকলের সমান অধিকার।" সায়েব বললেন, "হঠাৎ আমি লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরিটা চোখের সামনে দেখতে পেলাম। ঈশ্বরের দূত ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হল, কী আশ্চর্য। সত্যিই তো ব্যাংকের ভল্টে কতটুকু সম্পদ থাকতে পারে? তার থেকে লক্ষ লক্ষ গুণ মূল্যবান জ্ঞানের সম্পদ তো যুগযুগান্ত ধরে মানুষ তিলে-তিলে সঞ্চয় করে লাইব্রেরিতে সাজিয়ে রেখেছেন। এই জ্ঞান আহরণের জন্য কত লোকের কত কষ্ট হয়েছে, কত নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছে—কেউ পান করেছেন হেমলক বিষ, কেউ ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন। কেউ জীবন্ত দগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সঞ্চিত জ্ঞানের সম্পদ তো আমার জন্যেই পড়ে রয়েছে। আমি চাইলেই লাইব্রেরির র‍্যাক থেকে উঠিয়ে আমার সামনে সেই সব রত্নকে হাজির করা হবে।"

দূরে ততক্ষণে বড়লাটের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। সায়েব বললেন, "আমাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরি এখানেই উঠে এসেছে। সময় পেলে এখানে ঘুরে যেও। তোমার ভাল লাগবে।"

কতদিন আগেকার কথা। কিন্তু আজও জাতীয় গ্রন্থাগারের গেট পেরিয়ে একলা হাঁটতে আরম্ভ করলে অনেক দিন আগে ট্যাক্সি-থেকে-দেখা সেই ভোরবেলাটার কথা মনে পড়ে যায়। মনে হয়, সত্যিই আমি কোনো রকিফেলার, ফোর্ড টাটা অথবা বিড়লার ভাগ্যবান বংশধর। আমার পকেটেও লাইব্রেরির চেকবই আছে। যুগ যুগান্তের অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডার আমার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছে, আমি স্লিপে সই করলেই তারা আমার কাছে চলে আসবে।

ট্যাক্সিগাড়ি সেদিন ভোরে আবার মোড় নিয়েছিল। সায়েব ততক্ষণে আবার হাল্কা মেজাজে গুনগুন গান শুরু করেছেন।

অপূর্ব এক অভিজ্ঞতায় আমি তখন অভিভূত। সায়েব কিন্তু আমার গাম্ভীর্য মোটেই বরদাস্ত করলেন না। বললেন, "আমার খুব খিদে লাগছে। ক্লাবে ফিরে গিয়ে দু'জনে স্পেশাল ব্রেকফাস্ট না খাওয়া পর্যন্ত আমি আর একটি কথাও বলব না—খোদ ঈশ্বরের সঙ্গে যদি ভবানীপুর মেট্রোর সামনে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, তা হলেও না।"

ছবি সমীর সরকার

বুনো হাতির বন্ধুত্ব

সমরেশ বসু
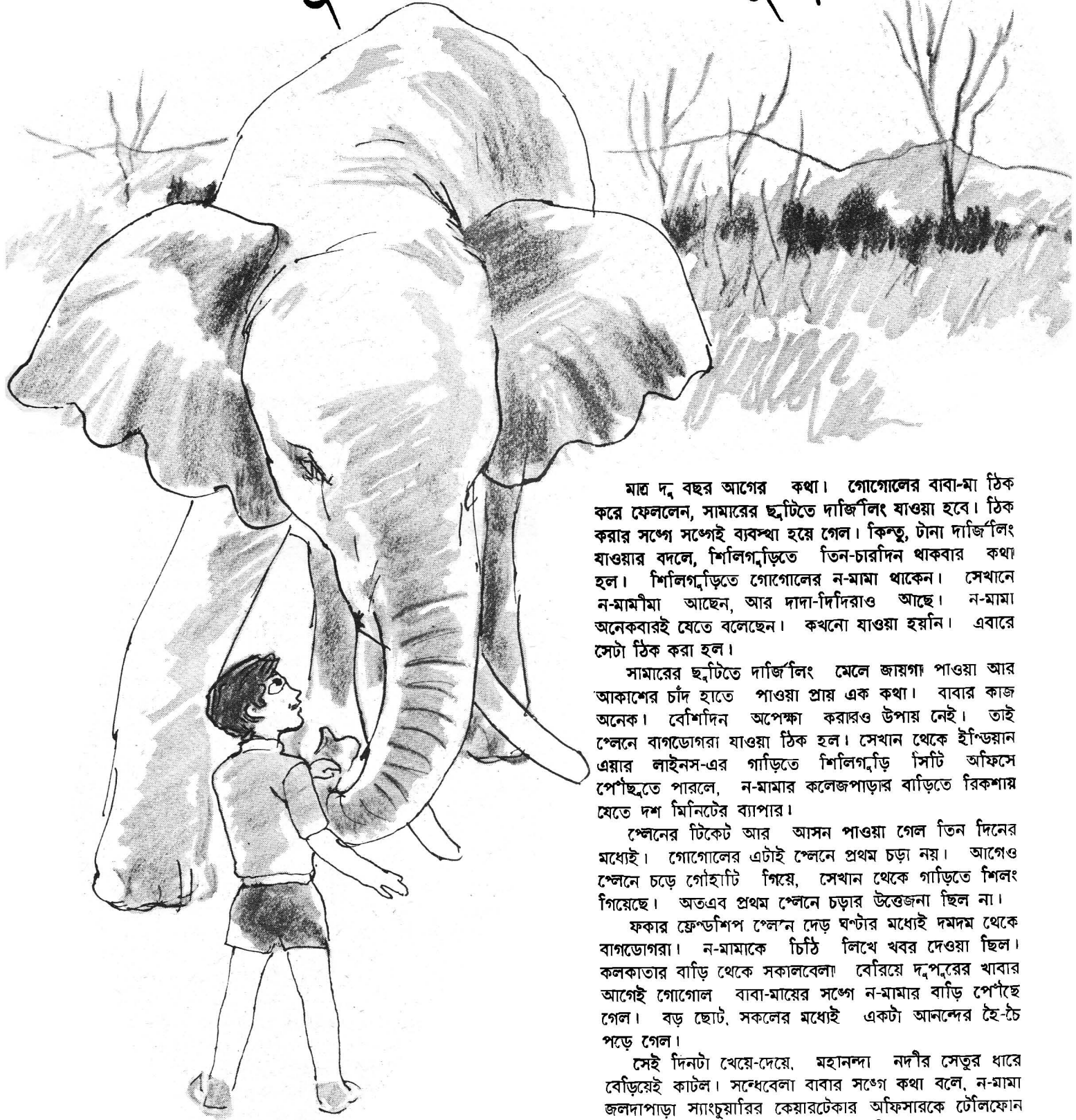
মাত্র দু বছর আগের কথা। গোগোলের বাবা-মা ঠিক করে ফেললেন, সামারের ছুটিতে দার্জিলিং যাওয়া হবে। ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা হয়ে গেল। কিন্তু, টানা দার্জিলিং যাওয়ার বদলে, শিলিগুড়িতে তিন-চারদিন থাকবার কথা হল। শিলিগুড়িতে গোগোলের ন-মামা থাকেন। সেখানে ন-মামীমা আছেন, আর দাদা-দিদিরাও আছে। ন-মামা অনেকবারই যেতে বলেছেন। কখনো যাওয়া হয়নি। এবারে সেটা ঠিক করা হল।

সামারের ছুটিতে দার্জিলিং মেলে জায়গা পাওয়া আর আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া প্রায় এক কথা। বাবার কাজ অনেক। বেশিদিন অপেক্ষা করারও উপায় নেই। তাই প্লেনে বাগডোগরা যাওয়া ঠিক হল। সেখান থেকে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস-এর গাড়িতে শিলিগুড়ি সিটি অফিসে পৌঁছুতে পারলে, ন-মামার কলেজপাড়ার বাড়িতে রিকশায় যেতে দশ মিনিটের ব্যাপার।

প্লেনের টিকেট আর আসন পাওয়া গেল তিন দিনের মধ্যেই। গোগোলের এটাই প্লেনে প্রথম চড়া নয়। আগেও প্লেনে চড়ে গৌহাটি গিয়ে, সেখান থেকে গাড়িতে শিলং গিয়েছে। অতএব প্রথম প্লেনে চড়ার উত্তেজনা ছিল না।

ফকার ফ্রেন্ডশিপ প্লেন দেড় ঘণ্টার মধ্যেই দমদম থেকে বাগডোগরা। ন-মামাকে চিঠি লিখে খবর দেওয়া ছিল। কলকাতার বাড়ি থেকে সকালবেলা বেরিয়ে দুপুরের খাবার আগেই গোগোল বাবা-মায়ের সঙ্গে ন-মামার বাড়ি পৌঁছে গেল। বড় ছোট, সকলের মধ্যেই একটা আনন্দের হৈ-চৈ পড়ে গেল।

সেই দিনটা খেয়ে-দেয়ে, মহানন্দা নদীর সেতুর ধারে বেড়িয়েই কাটল। সন্ধেবেলা বাবার সঙ্গে কথা বলে, ন-মামা জলদাপাড়া স্যাংচুয়ারির কেয়ারটেকার অফিসারকে টেলিফোন করে জানতে চাইলেন, ঘর পাওয়া যাবে কি-না। প্রথমে জানা গেল, এত তাড়াতাড়ির নোটিসে ঘর পাওয়া সম্ভব নয়। তার-

পরে ভদ্রলোকের কী মর্জি হল. তিনি একটি ঘর এক রাত্রির জন্য দিতে পারবেন বলে জানালেন।

জলদাপাড়ায় হাতির পিঠে চেপে, জঙ্গলে ঘুরে, গণ্ডার, হরিণ, এমন কী বাঘের দেখাও নাকি পাওয়া যেতে পারে। গোগোল ব্যাপারটা ভেবে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে, রাত্রে তার চোখে ঘুমই আসতে চাইল না। যদি বা ঘুম এল, সারারাত্রি প্রায় হাতির পিঠে চাপার স্বপ্ন দেখেই কেটে গেল। আর কত গণ্ডার-হরিণ যে দেখল, তার কোনো হিসাবই নেই।

বাবা যে শিলিগুড়িতে ন-মামার বাড়িতে কয়েকটা দিন কাটিয়ে, দার্জিলিং যাবার কথা ভেবেছিলেন, তার আসল কারণ জলদাপাড়ায় যাওয়া। পরের দিন সকালে বাবা-মা'র সঙ্গে গোগোল, বুড়োদা আর মিনুদিও চলল। ন-মামা আর মামীমা গেলেন না। তবে ন-মামা গোগোলদের জলদাপাড়ার বাসে তুলে দিয়ে গেলেন।

যথেষ্ট সকালে বেরোলেও, দুপুর হয়ে গেল জলদাপাড়ায় পৌঁছুতে। কিছু খাবার আর জল সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল। জলদাপাড়ায় পৌঁছুতেই সব সাবাড়। আসবার পথে অনেক চা-বাগান চোখে পড়ল। বাঁদিকে ভূটানের পাহাড় আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু জলদাপাড়ায় পৌঁছে, গোগোলের মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভেবেছিল আশেপাশে ঘন বন-জঙ্গল দেখতে পাবে। তার বদলে চারদিকে মিলিটারি ক্যাম্প। ঘন ঘন ট্রাক আর জীপের যাতায়াত। কয়েক সেকেণ্ড অন্তর-অন্তর কেবলই বন্দুকের গুলির আওয়াজ। আর. মাথার ওপর দিয়ে. প্রায় অনবরতই উড়ে চলেছে হেলিকপটার. নয়তো ছোট ছোট এরোপ্লেন।

বুড়োদা আগেও জলদাপাড়ায় এসেছে। সে বলল, ''গুলির আওয়াজ হচ্ছে চাঁদমারিতে. যেখানে রাইফেলধারী সৈন্যরা তাদের হাতের টিপ করে। আর কাছেই হাঁসিমারা বলে একটা জায়গায় এয়ারফোর্সের এয়ারবেস রয়েছে। হেলিকপটার আর প্লেনগুলো সেখান থেকেই উড়ছে।''

গোগোলরা ফরেস্টের অফিস থেকে যখন বাংলোয় গেল, তখনও মিলিটারি দোতলা কোয়ার্টার্সের সারির পাশ দিয়েই যেতে হল। তার মানে. জলদাপাড়া এখন একটা পুরোপুরি সামরিক আর বিমান ঘাঁটি। তবু যা হোক, অফিসের সামনে গোটা কয়েক হাতি বাঁধা ছিল। তাই দেখেই গোগোলের যা আনন্দ। কিন্তু সে আনন্দও নষ্ট হয়ে যেতে বসল. যখন শোনা গেল, এখন বাংলোতে খাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। অথচ খিদে পেয়েছে প্রচণ্ড। পথ চলার জন্য খাবার কিছু সঙ্গে নেওয়া যায়। তা বলে দুপুরের খাবার কেউ বয়ে বেড়ায় না।

শেষ পর্যন্ত বাবা বাংলোর কেয়ারটেকারকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করালেন। তাঁর হাতে টাকা দিয়ে বললেন, "এ বেলাটা কোনো রকমে ডাল-ভাত করে চালিয়ে দাও। ও-বেলা মাংস মাছ মুরগি যা যোগাড় করতে পারবে, তাই খাওয়া যাবে।"

বাংলোর দোতলায় একটা বড় ঘরই গোগোলদের দেওয়া হল। দুটো খাট ছিল। কেয়ারটেকার জানিয়ে দিলেন, রাত্রে আরো কিছু বিছানা আর একটা মশারি দিতে পারবেন। মাথার ওপরে পাখা আছে। গরমের একটা রাত কোনো রকমে কেটে যাবে।

রাতটা কেটে গেল ঠিকই। ভোরের অন্ধকার থাকতেই কেয়ারটেকার গোগোলদের দরজায় ঠকঠক করে ঘুম ভাঙিয়ে চা আর বিস্কুট দিয়ে গেলেন। জানিয়ে গেলেন, "হাতি তৈরি। যত ভোরের দিকে রওনা হওয়া যাবে, ততই ভাল।"

এ খবর শোনার পরে আর চা-বিস্কুটে কারোরই মনোযোগ থাকতে পারে না। অন্তত গোগোলের তো না-ই। পনের মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে সব বেরিয়ে পড়ল। বাংলোর পিছনেই দুটো হাতি দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের পিঠে মাহুত। তাছাড়াও দু-জন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। মাহুত কী বলল, কী করল, কে জানে, হাতি দুটো বসে পড়ল। আর বাকি লোক দুটো, হাতির গায়ে মই লাগিয়ে দিয়ে গোগোলদের উঠতে সাহায্য করল। চটের গদি মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। মাহুত বলে দিল, সবাই যেন শক্ত হাতে দড়ি ধরে রাখে।

বাবা-মা উঠলেন একটা হাতির পিঠে। বুড়োদা আর মিনুদির সঙ্গে গোগোল আর একটা হাতির পিঠে। হাতি যখন উঠে দাঁড়াল, গোগোলের মনে হল, একটা পাহাড় যেন ওকে পিঠে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। আর সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো দুলে-দুলে চলল। ভীষণ মজায় ওর হাসি পেতে লাগল, আবার ভয়ও করতে লাগল। হাতির পিঠে দোলা খেয়ে ওরা সবাই হাসছিল। বাবা-মাও হাসছিলেন। তার মধ্যেই বাবা চিৎকার করে সাবধান করে দিলেন, "সবাই শক্ত করে হাওদার দড়ি ধরে থেকো।"

গোগোল খুশি হল, এদিকে মিলিটারি ক্যাম্প নেই। গাছপালায় পাখিরা ডাকছে। এখনো সূর্য ওঠেনি। তারপরে হাতি দুটো যখন একটা নদীতে নামল, তখন গোগোলের মনে আনন্দ আর ভয়ে একটা শিহরন খেলে গেল। ও জিজ্ঞেস করল, ''বুড়োদা, এটা কী নদী?''

বুড়োদা বলল, ''এটা জলঢাকা নদী। নদীর ওপারে তাকিয়ে দ্যাখ, ওটাই আসলে জলদাপাড়া ফরেস্ট।"

গোগোল বিশাল চওড়া নদীর ওপারে তাকিয়ে দেখল. নিবিড় সবুজ বন। আর হাতি দুটো কখনো জলের ওপর দিয়ে, কখনো পাথর-ছড়ানো চরের ওপর দিয়ে সাবধানে পা ফেলে-ফেলে চলল। এক সময়ে গভীর জলের মধ্যে, হাতি দুটো সাঁতার কেটে পার হতে লাগল। গোগোলদের পায়ে জল লেগে গেল। ভয় পেয়ে ও জিজ্ঞেস করল, "বুড়োদা, হাতি জলে ডুবে যাবে না তো?"

বুড়োদা বলল, ''দূর বোকা, হাতি আবার জলে ডোবে নাকি। মনে কর, আমরা এখন নৌকোয় করে নদী পার হচ্ছি।"

গভীর জলে হাতির পিঠে, ব্যাপারটা প্রায় সেই রকমই। ঠিক যেন একটা নৌকো দুলে দুলে, জল কেটে চলেছে, আর স্রোতের সঙ্গে লড়ছে, যাতে টানে ভেসে না যায়।

এ পর্যন্ত খুবই ভাল কাটল। কিন্তু গোগোলদের কপাল খারাপ। নদী পার হয়ে, গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে অনেকটা বেলা অবধি ঘুরেও কোনো জন্তু-জানোয়ার দেখা গেল না। গণ্ডার হরিণ আর বাঘ তো দূরের কথা. একটা খরগোশও চোখে পড়ল না। ইতিমধ্যে চাঁদমারির গুলির আওয়াজ ভেসে আসতে আরম্ভ করেছে। আকাশে হেলিকপটার উড়তে দেখা যাচ্ছে।

মাহুত বলল, "জলদাপাড়ায় এখন আর গণ্ডার হরিণ বিশেষ দেখা যায় না। গুলির আওয়াজে আর হাওয়াই জাহাজের ভয়ে ওরা সব হলং-এর জঙ্গলে চলে গেছে। সেখানে এখন অনেক বড় ফরেস্ট বাংলো হয়েছে। আজকাল সবাই ওখানেই যায়।"

গোগোল মন খারাপ করে বাংলোয় ফিরে এসে বাবাকে হলং-এর বাংলোর কথা বলল। বাবা বললেন, "হলং-এর বাংলো পেতে দেরি হয়। তাছাড়া, নিজেদের গাড়ি না থাকলে হলং-এ যাওয়ারও অনেক অসুবিধে।''

বাবার কথা শুনে গোগোলের মনটা আরও হতাশায় ভরে গেল। বাবা কেবল বললেন, "দেখা যাক. কী করা যায়।"

তারপরে করার আর কিছুই ছিল না। সেই দিনই শিলিগুড়িতে ফিরে, রাতটা ন-মামার বাড়িতে কাটল। পরের দিন ভোরবেলা জীপে চেপে দার্জিলিং। এ যাত্রায় বুড়োদা আর মিনুদি ছিল না। দু দিন দার্জিলিং-এ কাটিয়ে, সেখান থেকে কার্শিয়ং-এ। কার্শিয়ং-এ গিয়ে তিব্বতী লামাদের বৌদ্ধ মঠে গোগোল তো এক কাণ্ডই করে বসল। যাই হোক, সে-সব কাণ্ড-কারখানার কথা এখন আর বলে দরকার নেই।

কার্শিয়ং থেকে ফিরে আবার দার্জিলিং। ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়িয়ে, গোগোল জলদাপাড়ার দুঃখটা ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু বাবার মতলব ছিল আলাদা। তিনি দার্জিলিং-এর ট্যুরিস্ট অফিস থেকে, হলং-এর বাংলোর দুটো ঘর দু-দিনের জন্য বুক করে ফেললেন। বাবা খবর নিয়ে জেনেছিলেন, দার্জিলিং থেকে হলং-এর বাংলো বুক করার সুবিধে। বাবা গোগোলের কাঁধে হাত চেপে বললেন, "এবার হল তো?"

গোগোল খুশি হয়ে বাবাকে একটা চুমু দিয়ে দিল। তবু জিজ্ঞেস না করে পারল না, "কিন্তু বাবা, হলং-এ যাবার গাড়ির কী হবে ?"

বাবা বললেন, "কী আর হবে? শিলিগুড়ি থেকে দু-দিনের জন্য একটা গাড়ি ভাড়া করতে হবে।"

তাই করা হল। সেইদিনই গোগোলরা দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি ন-মামার বাড়ি ফিরে এল। ন-মামা সব শুনে, সন্ধেবেলাতেই একটি গাড়ির ব্যবস্থা করে ফেললেন। পরের দিন, ভোরবেলা হলং যাত্রা। গাড়ি ভোরবেলাই এসে গেল। ড্রাইভার লোকটি বাঙালী আর বেশ ভদ্রলোক। এ যাত্রায় আবার বুড়োদা আর মিনুদি সঙ্গে।

গাড়ি প্রথমে চলল জলদাপাড়ার পথেই। তারপরে এক সময়ে আসাম যাবার রাস্তায় ঘুরে গেল। সেই পথেই পড়ল হলং-এর জঙ্গলে ঢোকবার গেট। রীতিমতো তালা-চাবি লাগানো রেলের লেবেল ক্রসিং-এর মতো লোহার ডাণ্ডার গেট। গেটম্যান বাবার কাছ থেকে বুকিং স্লিপ দেখে, তালা খুলে দিল।

দু পাশে ঘন বন। মাঝখান দিয়ে শক্ত লাল মাটি আর কাঁকরের রাস্তা। কিন্তু গাড়ি বনের মধ্য দিয়ে চলেছে তো চলেছেই, থামবার আর নাম নেই। গোগোল বলে উঠল, "বাংলোটা কত দূরে?"

ড্রাইভার হেসে বলল, "গেট থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার।"

বুড়োদা হলং-এ কখনো আসেনি, তাই বলতে পারল না। গোগোল এবার বুঝল, কেন গাড়ি ছাড়া হলং-এ আসা যায় না। গাড়ি না থাকলে এতটা পথ হেঁটে যেতে হত। বাসে এলে, বাসও মাঝপথে বদলাতে হত। অনেক ঝামেলা। কিন্তু গভীর বনের ভিতর দিয়ে গাড়িতে যেতে গোগোলের দারুণ মজা লাগছে। এখানে মিলিটারি ক্যাম্প নেই, চাঁদমারির গুলির আর হেলিকপটারের আওয়াজ নেই। কেবল বন আর বন। তারপরেই হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা কাঠের চওড়া সাঁকো, ওপারে কাঠের সুন্দর দোতলা বাংলো।

বাংলোর চত্বরে গাড়ি দাঁড়াতেই, গোগোল দরজা খুলে নেমে পড়ল। প্রথমে বাংলোটা দেখল। জলদাপাড়ার সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না। বিরাট ডাইনিং রুম, বসবার ঘর আলাদা। সোফা সেট দিয়ে সাজানো। ড্রাইভার বলল, "সাঁকোর নীচে যে নদীটা আছে, সেখানে অনেক মাছ দেখা যায়।"

গোগোল অমনি বুড়োদা আর মিনুদির সঙ্গে সাঁকোর ওপর ছুটে গেল। দেখল নীচে কাঁচের মতো জলে অনেক আর বড়-বড় মাছ খেলা করছে। গোগোল হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল। মাছগুলোর একটুও ভয় নেই।

মাছ দেখে সাঁকো পেরিয়ে ওপারে কিছুটা হেঁটে যেতেই বাঁ দিকে দেখা গেল কয়েকটা হাতি বাঁধা রয়েছে। তার মধ্যে একটা হাতি একটু দূরে, তার চারপাশে গোল করে লোহার বড়-বড় ছুঁচলো গজাল পোঁতা। কেন ? গোগোল বুড়োদাকে জিজ্ঞেস করল। বুড়োদা কিছুই বলতে পারল না। হাতিগুলো লম্বা ঘাস আর গাছের ডালপাতা খাচ্ছে।

কাছেই কতগুলো কাঠের উঁচু ঘর। অন্য পাশে কাঠের একটা বাংলো-বাড়ি। রেলিঙে জামা-কাপড় শুকোচ্ছে। লোকজন বিশেষ দেখা যায় না। বোধহয় মাহুতদের পরিবারের মেয়ে-বউরাই কেউ-কেউ ঘর-কন্নার কাজ করছিল। এই সময়ে মিনুদি বলে উঠল, "ওখানে ওটা কী দ্যাখ।"

গোগোল ঘরগুলো ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে দেখতে পেল, একটা বাচ্চা হাতির গলায় শেকল বাঁধা। সেও লম্বা-লম্বা ঘাস খাচ্ছে। গোগোল তৎক্ষণাৎ সেদিকে ছুটে গেল। বুড়োদা মিনুদিও গেল। বাচ্চা হাতিটা ফোঁস ফোঁস করে ওদের দিকে শুঁড় বাড়িয়ে দিল। বুড়োদা বলল, "দেখিস গোগোল, কাছে যাসনে।"

গোগোল তবু একটা হোগলার মতো লম্বা ঘাস বাচ্চা হাতিটার দিকে বাড়িয়ে দিল। বাচ্চা হাতিটা ঘাসের ডগাটা শুঁড়ে জড়িয়ে টান দিতেই, গোগোল তার পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। বুড়োদা ধরে ফেলল। গোগোল বেশ একটু ভয় পেয়ে গিয়েছে, আর অবাক হয়ে বলল, "আরে বাস্‌রে, বাচ্চাটার গায়ে কী জোর।"

ঠিক এই সময়েই পিছন থেকে মোটা আর গম্ভীর গলা শোনা গেল, "তোমরা কোথা থেকে এসেছ ভাই?"

সবাই পিছন ফিরে দেখল পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের এক ভদ্রলোক। ডাক্তারি পড়ে গোগোলের তিতুদা, অনেকটা তার মতোই দেখতে। বুড়োদাই সকলের বড়, ক্লাস এইটে পড়ে। সে বলল, "আমরা শিলিগুড়ি থেকে এসেছি।"

মিনুদি তাড়াতাড়ি গোগোলকে দেখিয়ে বলল, "ও কলকাতা থেকে এসেছে।" তিতুদার মতো লোকটি, যার তিতুদার মতোই গোঁফ আছে, আর হাওয়াই শার্টের সঙ্গে সাদা ট্রাউজার পরা, পায়ে স্যাণ্ডেল, গোগোলের দিকে একবার দেখলেন। মুখ তুলে চার পাশে একবার দেখে নিয়ে বললেন, "তোমরা ছেলেমানুষ, এভাবে এখানে ঘুরো না। কয়েকদিন হল, একটা দাঁতাল বুনো হাতি খুব উৎপাত করছে।"

গোগোলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "উৎপাত করছে? কেন?"

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, "বুনো হাতিটা একটু রেগে আছে।"

বুড়োদা বলে উঠল, "তার মানে পাগলা হাতি?"

ভদ্রলোক কিছু বলবার আগেই, পিছন থেকে বাবার ব্যস্ত আর উৎকণ্ঠিত ডাক শোনা গেল, "গোগোল, বুড়ো, মিনু, তোমরা শিগ্‌গির বাংলোয় ফিরে এসো।"

সকলেই পিছন ফিরে তাকাল। দেখা গেল, বাবা ড্রাইভারের সঙ্গে প্রায় ছুটে আসছেন।

কাছে এসে বাবা বললেন, "তাড়াতাড়ি বাংলোয় চলো সবাই। এখানে একটা বিরাট বুনো দাঁতাল খ্যাপা হাতি

আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, লোকজনকে তাড়া করছে।" বলে সবাইকে তাড়া করে নিতে গিয়ে বাবা সেই ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি?"

ভদ্রলোক বললেন, "আমি এই ফরেস্টেরই একজন রেঞ্জার। আমিও এদের বুনো হাতির কথাই বলছিলাম। তবে এত তাড়াহুড়ো করে ছোটবার কিছু নেই। বুনো হাতিটা লোকজনকে এমনিতে বিশেষ কিছু করছে না। চলুন, আপনাদের সঙ্গে আমিও যাচ্ছি।"

সকলের চোখে-মুখেই কেমন একটা ভয় নেমে এসেছিল। ভদ্রলোকের কথায় আবার যেন সাহস ফিরে পাওয়া গেল। ভদ্রলোক যেতে যেতে বললেন, "হাতিটা পুরুষ, আর বিরাট দেখতে, দাঁত দুটোও প্রকাণ্ড। মনে হয়, আসাম থেকে, ভূটানের পাহাড় ডিঙিয়ে এসেছে।"

ভদ্রলোককে গোগোলের এতই ভাল লেগে গেল, তাঁর কথাবার্তা বলার ধরনও এত সুন্দর, ও সবাইকে ঠেলেঠুলে, তাঁর গা ঘেঁষে চলছিল। বলে উঠল, "আচ্ছা দাদা—"

এইটুকু বলেই গোগোল থমকে গেল। কোনো ভদ্রলোককে এ রকম "দাদা" বলে ডাকা বাবা মোটেই পছন্দ করেন না। লজ্জা পেয়ে ও বাবার দিকে তাকাল। ভদ্রলোক সেটা বুঝে, হেসে বললেন, "আমার নাম জয়ন্ত। তুমি আমাকে জয়ন্তদা বলতে পারো।"

বাবা গোগোলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। গোগোল মনে-মনে ভরসা পেল। জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা জয়ন্তদা, আপনি কী করে জানলেন, বুনো হাতিটা ভূটানের পাহাড় ডিঙিয়ে এসেছে?"

জয়ন্তদা বললেন, "আমরা তো এইসব নিয়েই থাকি। সাধারণত এসব অঞ্চলে ভূটানের পাহাড় থেকেই হাতিরা জঙ্গলে নেমে আসে। তবে জঙ্গলে নেমে আসার সময় হল বর্ষাকাল।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "বর্ষাকালে কেন?"

জয়ন্তদা বললেন, "বর্ষাকালে পাহাড়ের আর আসামের নদীগুলোতে বন্যা হয়। হাতিরা বন্যাকে বেশ ভয় পায়। তাছাড়া এদিকে তখন খেতে প্রচুর ফসল থাকে, হাতিরা সেই ফসল খেতে আসে। খায়, নষ্ট করে। তখন খবর পেয়ে আমরাই বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে ওদের গিয়ে তাড়াই।"

এই কথা বলতে বলতে সাঁকো পেরিয়ে গোগোলরা সবাই বাংলোর চত্বরে এসে পড়ল। গোগোল দেখল, মা ভয়-ব্যস্ত চোখে ওদেরই দেখছেন। বসবার ঘরের জানালা দিয়ে। সবাইকে দেখে একটু আশ্বস্ত হলেন।

জয়ন্তদা বলে উঠলেন, "ওই দ্যাখো, শ্রীমান নদীর ওপারের মাঠে দাঁড়িয়ে এদিকেই তাকিয়ে দেখছে।"

নদী মানে, সাঁকোর নীচে দিয়ে যে ছোট জলের ধারা বয়ে গিয়েছে, বাংলোর সামনে দিয়েই তার স্রোত চলেছে। সেখানে একটা বাঁধানো ঘাট। ঘাটের ওপারে বেশ খানিকটা খোলা সবুজ মাঠ। সেই মাঠেই বিরাট বুনো হাতিটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গোগোল ওর জীবনে এত বড় হাতি আগে কখনো দেখেনি! এত বড় দাঁতও কোনো-হাতির চোখে পড়েনি। হাতিটার নীলচে কালো গায়ের কোথাও কোথাও কাদা-মাটির দাগ। কান দুটো পিছন দিকে যেন টেনে রেখেছে, আর আস্তে আস্তে শুঁড় দোলাচ্ছে। গোগোল ভয় পাওয়ার থেকে মুগ্ধই হয়ে গেল বেশি। হাতিটাকে ঠিক যেন বনের রাজার মতো দেখাচ্ছে। গম্ভীর আর শান্ত। পাগলামি খ্যাপামির কোনো চিহ্নই নেই। গোগোলের ইচ্ছে হল, ছুটে হাতিটার কাছে চলে যায়। গেলে কী হবে? হাতিটা ওকে মেরে ফেলবে? কথাটা ভেবেও জয়ন্তদাকে জিজ্ঞেস করতে পারল না।

কয়েক মিনিট পরেই হাতিটা আস্তে আস্তে বাংলোর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

জয়ন্তদা বললেন, "সবাই ঘরের মধ্যে চলো। ও হয়তো এখানেই আসবে।"

সবাই হুড়মুড় করে দৌড় দিতেই জয়ন্তদা বললেন, "এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। নদীটা পেরিয়ে ও বড়জোর ঘাটের সামনেই আসবে। বাংলোর চারপাশে এই যে দেখছ পাথরকুচি ছড়ানো, এর ওপরে হাতি কখনো পা দেবে না। পায়ের নখের ফাঁকে নরম জায়গায় বিঁধে যাবার ভয় আছে। আসলে হাতি খুবই বুদ্ধিমান জীব।"

বুড়োদা বাংলোর ভিতরে ঢুকতে-ঢুকতে বলল, "কিন্তু বুনো যে?"

জয়ন্তদা বললেন, "বুনো হাতিরও যথেষ্ট বুদ্ধি আছে। চলো, দেখি গিয়ে বসবার ঘরের জানালা দিয়ে ও এল নাকি।"

সবাই বসবার ঘরের জানালাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ল। আর সকলেই অবাক হয়ে দেখল, সত্যি বুনো হাতিটা এইটুকু সময়ের মধ্যেই নদী পেরিয়ে ঘাটের ওপর বাংলোর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পাথর-কুচি-ছড়ানো চত্বরে পা দিচ্ছে না।

গোগোলের শরীরে রীতিমতো খুশির শিহরন বইতে লাগল। এত কাছ থেকে, এমন বিরাট বুনো দাঁতাল হাতি কোনোদিন দেখবে, ভাবতেই পারেনি। রোদ লেগে ওর দাঁত দুটো ঝকমক করছে। আর বাংলোর দিকে শুঁড় বাড়িয়ে যেন গোগোলদেরই গন্ধ শুঁকছে। গোগোলের মনে হল, কেবল রাজা নয়, ওকে যেন বইয়ে-পড়া স্বর্গের ঐরাবতের মতো মহান দেখাচ্ছে।

মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে, ও বাঁ দিকে ফিরে আস্তে আস্তে চলে গেল। বাবা-মা'ও হাতিটাকে দেখছিলেন। এই সময়ে রসুইখানার পাচক এসে মাকে ডেকে নিয়ে গেল। গোগোল জয়ন্তদাকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আপনি যে বলছিলেন, ও উৎপাত করছে, রেগে আছে? শুধু-শুধু কেন এরকম করছে?"

জয়ন্তদা হেসে, একটা সোফায় বসে বললেন, "তোমরা সবাই বোসো, আমি ব্যাপারটা বলছি।"

গোগোল আগেই জয়ন্তদার গা ঘেঁষে বসে পড়ল। বাবাও মুখ টিপে হেসে একটা সোফায় বসে গেলেন। জয়ন্তদা বললেন, "তোমরা আমাদের পোষা হাতিগুলো দেখেছ?"

সবাই ঘাড় ঝাঁকিয়ে জানাল, দেখেছে। জয়ন্তদা বললেন, "তার মধ্যে একটা হাতিকে লোহার ছুঁচলো গজাল পুঁতে ঘিরে বেঁধে রাখা হয়েছে, দেখেছ?"

"দেখেছি।" সবাই বলল।

জয়ন্তদা হাত তুলে বললেন, "বেশ। ওটি হল মেয়ে হাতি, ওর নাম বনমালা। এখন এই বুনো হাতিটা চায়, বনমালাকে সে বিয়ে করবে। বনমালাও হাবভাবে তাই চাইছে।"

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "হাতির বিয়ে! কী করে করবে?"

জয়ন্তদা বললেন, "ওদের অবিশ্যি পুরুত ডেকে মন্ত্র পড়তে হয় না। দুজনে এক সঙ্গে মিশে, বনে চলে গেলেই ওদের বিয়ে হয়ে যায়।"

গোগোল বলল, "তবে বিয়ে হচ্ছে না কেন?"

জয়ন্তদা বললেন, "কী করে হবে বলো। তা হলে তো আমাদের বনমালাকে ওর সঙ্গে ছেড়ে দিতে হয়। তা তো আর ছেড়ে দেওয়া যায় না।"

"কেন?" গোগোল জিজ্ঞেস করল।

জয়ন্তদা বললেন, "বনমালাকে আমাদের এখানে মালপত্র বইবার কাজ করতে হয়। তারপরে এই যেমন তোমরা বেড়াতে এসেছ। তোমাদের পিঠে তুলে নিয়ে বনের মধ্যে বেড়িয়ে গণ্ডার হরিণ দেখাতে হয়। ছেড়ে দিলে কী করে চলবে? ছেড়ে দিলে তো বনমালা বনেই চলে যাবে। হয় তো ভূটানের পাহাড় ডিঙিয়ে অনেক দূরে আসামের জঙ্গলেই চলে যাবে, আর কখনো ফিরে আসবে না। আমাদের অসুবিধে হয়ে যাবে।"

বুড়োদা খুশি হয়ে বলল, "ও বুঝেছি, সেইজন্যই ছুঁচলো গজাল পুঁতে বনমালাকে শেকলে বেঁধে রাখা হয়েছে. বুনো হাতিটা যাতে ওকে এসে নিয়ে যেতে না পারে।"

জয়ন্তদা বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

গোগোল হাসতে পারল না। জয়ন্তদা জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল গোগোল, তুমি কথা বলছ না যে? তোমার কি মন খারাপ হয়ে গেল?"

গোগোল ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

জয়ন্তদা যেন একটু অবাক হয়ে হেসে বললেন, "কেন? বনমালার সঙ্গে বুনো হাতিটার বিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না বলে?"

গোগোল আবার ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

সবাই হেসে উঠল। গোগোল হাসতে পারল না। ব্যাপারটা ওর কাছে খুবই অন্যায় মনে হল। কারণ বুনো হাতিটা বুনো হতে পারে, কিন্তু সে এত সুন্দর দেখতে, এত বিরাট তার চেহারা, অমন সুন্দর প্রকাণ্ড যার দাঁত, তাকে বিয়ে করতে না দেওয়াটা নিশ্চয়ই অন্যায়। বিশেষ করে বনমালাও যখন তাই চায়। গোগোলের কাছে সকলের হাসি খুব নিষ্ঠুর মনে হল।

জয়ন্তদা বললেন, "গোগোল, তুমি কষ্ট পাচ্ছ বটে, কিন্তু ভেবে দেখ, বুনো হাতিটার ভয়ে, তোমাদের আমরা আমাদের পোষা হাতির পিঠে চাপিয়ে, গণ্ডার হরিণ দেখতে পাঠাতে পারব না। বনমালা ছাড়া যে-কোনো পোষা হাতি দেখলেই বুনোটা তাদের তাড়া করছে। বুনো হাতিটা তোমাদের আনন্দও মাটি করে দিয়েছে।"

গোগোল এদিকটা ভেবে দেখেনি। বুড়োদা মিনুদি, এমন কী বাবাও বললেন, "সত্যি, আমাদের কপালটাই খারাপ। হলং-এ এসেও, হাতির পিঠে চেপে জন্তু-জানোয়ার দেখতে পাব না।"

গোগোলেরও যে মনটা একটু খারাপ হল না তা, তা নয়। বন্য গণ্ডার হরিণ দেখার শখ ওরই বেশি ছিল। কিন্তু বুনো হাতিটার সেই আশ্চর্য সুন্দর আর বিরাট চেহারাটার কথা ভেবে, তার জন্যই ওর মনটা বেশি খারাপ হয়ে গেল।

পরের দিন ভোরবেলা গোগোলের ঘুম ভেঙে গেল। বুড়োদা মিনুদি এখনও ঘুমোচ্ছে। পাশের ঘরে বাবা-মায়েরও কোনো সাড়া শব্দ নেই। গোগোল খাটের মশারির ভিতর থেকে বেরিয়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। ছোট হাঁটুজল নদীটির বাঁ দিকে ঝাড়ালো গাছটায় অসংখ্য পাখি ডাকছে। গোগোল জানালা থেকে সরে, আস্তে-আস্তে দরজার কাছে গিয়ে ছিট-কিনি খুলে ফেলল। বাইরে বেরিয়ে নীচে নেমে, একেবারে ঘাটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রসুইখানার পাচক বা চৌকিদার নিজেদের কাজে ব্যস্ত। কেউ গোগোলকে লক্ষ করল না।

গোগোল ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নেমে, স্রোতের জলে চোখ-মুখ ধুয়ে নিল। অবাক হয়ে দেখল, ওর হাতের সামনেই মাছ-

যদি বাসস্থানের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন ঃ
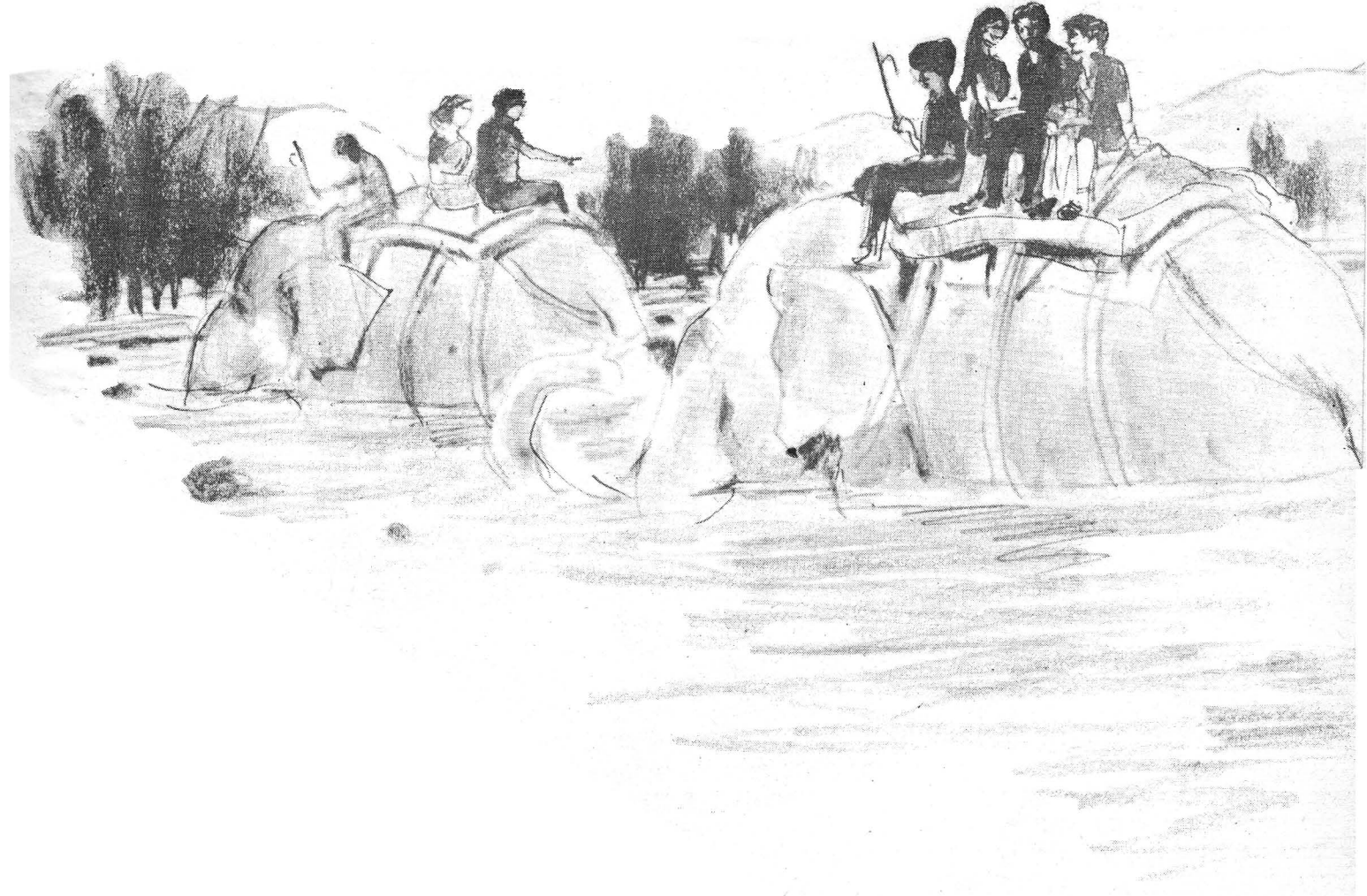
খুবই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আগামী বেশ কিছুদিন এ রাজ্যে বিদ্যুৎ সংকট থাকবে। অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্যে সব রকম প্রচেষ্টা চালানোর সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিকে কী ভাবে মোকাবিলা করা যায়—সেদিকে নজর দেওয়াটাই ভালো।

কী ভাবে মোকাবিলা করবেন ঃ

প্রথমত বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন। আলোর বাহার এবং আলোর প্রদর্শনী বন্ধ করুন। যতটা সম্ভব আলো বা পাখা বন্ধ করে দিন। বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ করুন এবং নিজের খরচ কমান। এই মূল নীতির ভিত্তিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেই বর্তমান পরিস্থিতিকে কিছুটা সামাল দেওয়া যাবে।

অনুগ্রহ করে বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত জলের পাম্প, ইলেক্‌ট্রিক ইস্ত্রি, ওয়াটার হীটার ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না, কারণ এই সময়ে শিল্প কারখানার জন্যে বিদ্যুৎ সবচেয়ে বেশি দরকার।

আইন মেনে চলুন ঃ

রাজ্য সরকারের বিধিনিষেধগুলি দয়া করে মনে রাখবেন। সকাল ৯–৩০ থেকে বেলা ১১টা এবং বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এয়ারকণ্ডিশনার চালানো নিষেধ, অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ছাড় দিয়েছেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। এছাড়া বিয়ে বা অন্যান্য উৎসব উপলক্ষ্যে নিয়ন, মার্কারী ল্যাম্প বা অন্যান্য উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বাতি জ্বালানোও নিষেধ।

'বিদ্যুৎ' ঘাটতি কমিয়ে আনতে আমাদের সাহায্য করুন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

SEB 459/77

গুলো ঘোরাফেরা করছে। ওর খুব ইচ্ছে হল, একটা মাছকে হাত দিয়ে ধরে। ওর পা খালিই ছিল। জলে নেমে পড়ল। আর, একটা মাছ যেন ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওপারে নিয়ে গেল, আর চট করে হারিয়ে গেল।

গোগোল হতাশ হয়ে, ওপর দিকে তাকাল। সেই ঝাড়ালো গাছটা। ও এখন নদীর অন্য পারে। পাখি দেখবার জন্য ও উঁচু পাড়ে উঠে দাঁড়াল। মাথা তুলে গাছের দিকে দেখল। প্রথমেই ওর চোখে পড়ল একটা কালো পাখি, মাথায় হলুদ রঙের ঝুঁটি। পাখিটা একবার শিস্ দিয়ে ডেকেই, হঠাৎ উড়ে গেল। তারপর আরো কয়েকটা পাখি ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল। কেন? গোগোলকে দেখে ভয় পেয়েছে?

ঠিক এই সময়েই গোগোলের মনে হল, ওর মাথায় হাল্কা গরম দমকা বাতাস লাগল, আর মাথার চুল উড়ে কপালে পড়ল। কিসের বাতাস? ও পিছন ফিরে তাকাল। ও প্রথমে দেখতে পেল, হাতির একটা শুঁড়, ওর মাথার ওপরে। ওর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। ও ভাল করে তাকিয়ে দেখল, সেই বিশাল কালোয়-নীলে মেশানো বুনো হাতিটা ওর পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে। তার প্রকাণ্ড বাঁ-দিকের দাঁতটা প্রায় ওর কাঁধের কাছে নেমে এসেছে।

গোগোল প্রথমটা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল, আর হতচকিত হয়ে ভাবল, দৌড় দেবে কি না। কিন্তু আশ্চর্য, ও দৌড় দেবার কথা ভাবতেই, হাতিটা তার শুঁড় দিয়ে, আল্তো করে ওর মাথায় ছোঁয়াল। আবার সেইরকম দমকা বাতাসের মতো নিশ্বাস ফেলল। ওর চুলগুলো আবার উড়ে এলোমেলো হয়ে গেল। তারপরেই হাতিটা শুঁড় দিয়ে গোগোলের কাঁধে, পিঠে, কোমরে, এমন কী পায়েও আলতো করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেন গন্ধ শুঁকল।

গোগোলের ভয়-ছমছমানি ভাবটা কেমন কেটে গেল। ও কি এই বুনো হাতিটার শুঁড়ে একটু হাত বুলিয়ে দেবে? যেমন কলকাতার চিড়িয়াখানায় দিয়েছিল? ও মুখ তুলে হাতিটার চোখের দিকে তাকাল। চাউনিটা মোটেই রাগী দেখাচ্ছে না। কুলোর মতো কান দুটো নাড়ছে। গোগোল খুব আস্তে ওর শুঁড়ে একটু হাত বুলিয়ে দিল। অমনি বুনোটা তার শুঁড় গুটিয়ে এনে, গোগোলের ছোট নরম আঙুলগুলো শুঁকল। আঙুলের ডগাগুলো যেন লালায় ভিজে গেল। গোগোলের হাসি পেয়ে গেল।

বুনো হাতিটা হাঁ করল, তার জিভটা দেখা গেল। গোগোলের মনে হল, ও ওর প্রকাণ্ড দাঁতে হাঁ করে হাসছে। গোগোল বলেই উঠল, "তুমি হাসছ, না?"

বুনো শুঁড় তুলে গোগোলের কানের কাছে হালকা নিশ্বাস ফেলল। গোগোলের মনে হল, ও যেন বলল, "হ্যাঁ।" গোগোল আবার জিজ্ঞেস করল, "বনমালার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেয়নি বলে তোমার মন খুব খারাপ, না?"

বুনো গোগোলের নরম গালে শুঁড় ছুঁইয়ে দিল। এই সময়ে বাংলোর দিক থেকে অনেকের গলা শুনে, গোগোল সেদিকে তাকিয়ে দেখতে গেল। বুনো হাতিটা এবার গোগোলের পিঠে শুঁড় দিয়ে আস্তে ঠেলে দিল। গোগোল বাংলোর উল্টো দিকে দু পা এগিয়ে গেল। বুনো শুঁড় তুলে যেন হাতের মতো দেখাল, আবার গোগোলের পিঠে আস্তে ঠেলে দিল। আর মাথায় আলতো করে শুঁড় দিয়ে নিশ্বাস ফেলল। তারপরে খুব ঘন-ঘন শুঁড় আর কান নাড়তে লাগল।

বাংলোর দিকে তখন রীতিমতো হাঁকডাক পড়ে গিয়েছে। গোগোলের মনে হল, মা যেন চিৎকার করে ওকে ডাকছেন। কিন্তু গোগোল বুনোর সঙ্গে বনের দিকেই এগিয়ে চলল। বুনো মাঝে মাঝেই ওর পিঠে আস্তে করে ঠেলে দিতে লাগল, আর গালে গলায় মাথায় আল্তো করে ছুঁয়ে দিল।

গোগোল নির্ভয়ে বুনো হাতির আগে-আগে চলতে লাগল। দু-একবার ওর শুঁড়ে হাত বুলিয়ে দিল। একবার জিজ্ঞেস করল, "তুমি আমাকে ভালবাসো, না?"

বুনো বেশ জোরে একটা নিশ্বাস ফেলল। বাংলোর দিকে গোলমাল তখন চরমে। কিন্তু গোগোলের কিছুই মনে হল না। একটা অন্ধ লোককে তার লাঠি ধরে যেমন কেউ রাস্তা পার করে দেয়, ও সে-ভাবেই বুনোর শুঁড় ধরে ক্রমেই গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। তারপরেই হঠাৎ ভয় পেয়ে থেমে চিৎকার করে উঠল, "ওটা কী?"

বুনো বিশাল হাতি তৎক্ষণাৎ গোগোলকে আড়াল করে দাঁড়াল। আর গোগোল দেখল, একটা মস্ত গণ্ডার তার বাচ্চা নিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। গোগোল হাততালি দিয়ে বলে উঠল, "গণ্ডার গণ্ডার! মা আর বাচ্চা!"

বুনো হাতি ওর কাঁধে শুঁড় দিয়ে যেন কিছু ইশারা করল, আর আবার হাঁ করল। ঠিক যেন হাসছে। সে আবার গোগোলের পিঠে আলতো করে ঠেলে দিল। গোগোলও আবার তার শুঁড় ধরে এগিয়ে চলল। চলতে-চলতে গোগোলের মাথা-সমান ঘাসবনে চলে এল। আর হঠাৎ একটা ময়ূর ডানা ঝাপটিয়ে আকাশের ওপর দিয়ে উড়ে দূরে গিয়ে নামল।

গোগোল প্রথমটায় চমকিয়ে উঠলেও, তারপরেই খুশি হয়ে চিৎকার করে উঠল, "ময়ূর ময়ূর।"

ওর কথা শেষ হতে না হতেই, হাত দশেক দূরেই এক দল হরিণ, ঠিক যেন ঢেউয়ের মতো ছুটে পালিয়ে গেল। গোগোল হাততালি দিয়ে আবার চিৎকার করে উঠল, "হরিণ, হরিণ!"

বুনো ওর হাতের ওপর শুঁড় ছুঁইয়ে আবার আল্তো করে পিছন থেকে ঠেলে দিল। গোগোল আর তখন এগোবে কি! ওর আশে-পাশে থেকে এক-একটা হরিণ ছিটকে দিগ্-বিদিকে ছুটতে লাগল। ময়ূর আর বুনো মুরগি থেকে থেকেই উড়ন্ত লাগল।

গোগোল যেন আনন্দে পাগল হয়ে গেল, আর হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল। বুনো হাতিটা তার বিশাল শরীর দুলিয়ে, শুঁড় আর কান দুটো খুব নাড়তে লাগল। যেন সেও বেশ খুশি!

আরো খানিকটা এগিয়ে, একটা মোটা গাছের গুঁড়ির কাছে একটা ছোট বাঘের মতো জানোয়ার দেখে গোগোল ভয় পেয়ে থমকে গেল। হাত বাড়িয়ে বুনোর শুঁড় ধরে বলল, "বাঘ বাঘ!"

গোগোল জানে না, আসলে ওটা বাঘ নয়, একটা চিতা বিড়াল। এই অঞ্চলের বনে প্রায়ই এদের দেখা যায়। চিতা বিড়ালটা বিশাল হাতি দেখেই, ভয়ে গুটিয়ে গিয়ে গর্‌গর্ করে উঠল। বুনো গোগোলের হাত থেকে শুঁড়টা ছাড়িয়ে নিয়ে, দু পা এগিয়ে যেতেই চিতা বিড়ালটা এক লাফ দিয়ে চোঁ চাঁ দৌড় দিল।

গোগোল হাততালি দিয়ে নেচে উঠল। বুনো শুঁড় তুলে হাঁ করল। ঠিক যেন হাসছে! ঠিক এ সময়েই কাছাকাছি থেকে লোকজনের গলার স্বর শোনা গেল। গোগোল স্পষ্ট বাবার ডাক শুনতে পেল, "গোগোল! গোগোল! তুমি কোথায়?"

গোগোল চিৎকার করে জবাব দিল, "আমি এখানে।"

তারপরেই প্রায় এক'শো হাত দূরে, একদল লোককে দেখা গেল। তাদের মধ্যে বাবা আর জয়ন্তদা বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। বুনো হাতি এই প্রথম অদ্ভুত স্বরে ডেকে উঠল, আর তার কান দুটো মাথার পিছন দিকে লেপটে গেল। গোগোল স্পষ্ট দেখল, তার চোখের চাউনিতে রাগ ফুটে

উঠেছে। সে শুঁড় দিয়ে গোগোলের কাঁধে আলতো করে ছোঁয়াল।

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "তোমার রাগ হচ্ছে?"

বুনো গোগোলকে আড়াল করে, একশো হাত দূরে দলটার মুখোমুখি দাঁড়াল। বাবা চিৎকার করে বললেন, "গোগোল, ও পাগলা হাতি, তোমাকে মেরে ফেলবে।"

গোগোল বলল, "না, ও আমার বন্ধু হয়ে গেছে।"

বুনো কী বুঝল, কে জানে। সে হঠাৎ দলটার দিকে দৌড়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলটার সঙ্গে বাবা আর জয়ন্তদাও পিছন ফিরে দৌড় দিলেন। কিন্তু চলে গেলেন না। জয়ন্তদা চিৎকার করে বললেন, "গোগোল, তুমি ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাংলোয় ফিরে এসো।"

গোগোল বলল, "আপনারা চলে যান।"

গোগোলের কথা শুনে, বাবা, জয়ন্তদা সবাইকে নিয়ে আড়ালে চলে গেলেন। গোগোল বুনোর কাছে এগিয়ে এল। বুনো ওর গায়ে মুখে শুঁড় ছুঁইয়ে শুঁকল, কিন্তু তার রাগ-ভাবটা এখনো আছে। গোগোল বলল, "এবার ফিরে চলো, আমার মা কাঁদছে।"

বুনো শুঁড় দিয়ে, গোগোলের কানে একটু হাওয়া লাগিয়ে দিল। গোগোলের মনে হল, ও যেন বলছে, "খুব সাবধান। ওদের বিশ্বাস নেই।"

গোগোল বলল, "আমি আছি, তোমার কোন ভয় নেই।" বলে বুনোর শুঁড় ধরে এগিয়ে চলল।

বুনো হাতি প্রথমে যেন একটু আপত্তি করল, তারপরে গোগোলের পিছনে-পিছনে এগিয়ে গেল। গোগোল বাংলোর পথ চেনে না। বুনোই তাকে টেনে, আস্তে করে ঠেলে, বাংলোর হাতায় এনে ফেলল। কিন্তু সে আর এগোলো না। দূরে বিরাট ভিড় দাঁড়িয়ে ছিল।

গোগোল বুনোর দিকে তাকাল। তার চোখে এখন রাগ নেই, বরং গোগোলের মনে হল, তার চাউনিতে কষ্ট। গোগোল তার শুঁড়ে হাত বুলিয়ে দিল। সে শুঁড় তুলে গোগোলের মাথায় তেমনি দমকা নিশ্বাস ছাড়ল। গোগোলের চুল এলো-মেলো হয়ে গেল। বুনো গোগোলের কাঁধে গলায় গালে শুঁড় ঠেকাল, ঠিক যেন আলতো করে আদর করার মতো। তারপরে আস্তে-আস্তে পিছন ফিরে চলে গেল।

গোগোলের মনটা কেমন টনটন করে উঠল। ও সেই বিশাল সুন্দর হাতিটিকে যতক্ষণ দেখা গেল, দেখল। তারপরে সে বনের মধ্যে হারিয়ে গেল।

এ সময়েই ভিড়টা দৌড়ে এল। প্রথমেই মা গোগোলকে বুকে চেপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, বললেন, "ওরে গোগোল, তোর জন্য ভয়েই আমি একদিন মরে যাব।"

কিন্তু মায়ের কান্নার মধ্যেও সকলেই আনন্দে হাসতে লাগল। গোগোল মায়ের সঙ্গে বাংলোর বসবার ঘরে এল।

জয়ন্তদা বন্দুকটা দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে বললেন, "এবার বলো তো গোগোল, ওই ভয়ংকর বুনো দাঁতাল হাতিটা তোমাকে কী বলল?"

গোগোল বলল, "কী আবার? ও নিজে এসে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করল, আর বেড়াতে নিয়ে গেল।"

জয়ন্তদা অবাক চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এখন থেকে বুনো হাতিদের সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হবে।"

বাবা কিছুই বললেন না। তিনি এমনভাবে গোগোলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না, গোগোল ফিরে এসেছে।

ছবি সুধীর মৈত্র

মনোজ বসু

চণ্ডডিণ্ডিমের লালমহারাজ

মাখন গাঙ্গুলির হোটেল। পৈতৃক বাড়ির সামনেটায় সাইনবোর্ড সেঁটে হোটেল করেছে। ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলে। রান্নার লোক ছিল সন্তু হালদার। এবং তার বউ আন্নাকালি ঝিয়ের কাজ করত। মাইনে না পেয়ে তারা কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে গেছে।

আজকে মেলা খদ্দের। সাঙ্গোপাঙ্গ সহ লালমহারাজ এসে উঠেছেন। সিদ্ধপুরুষ, পাহাড়ের ওপরে চণ্ডডিণ্ডিমে তাঁর সাধনপীঠ। দুর্গম জায়গা। শীতকালে কালেভদ্রে এপারে আসেন। পথের মাঝে মাখনের এখানে এই রাত্রিবাস করে যাচ্ছেন।

কাজকর্ম মিটিয়ে রাত দুপুরে শুয়ে পড়েছে সব, আবার দরজায় ঘা। গিরিবালা গর্জাচ্ছে : উঠছিনে আমি—কিছুতেই না। মাখনও বলে দেয়, জায়গা নেই, হাউস ফুল। বাইরে থেকে গিরিবালার কাছেই কাকুতি মিনতি : উঠুন একবার ও গিন্নিমা। খদ্দের নই, আমি আন্নাবউ।

ঈশ্বর-প্রেরিত নিশ্চয়—সন্ধ্যা থেকে গিরিবালা এদেরই কথা ভাবছে—যে সিদ্ধপুরুষ আজ ঘরবাড়ি পবিত্র করেছেন, তাঁর করুণা। ঝাঁটিতি গিয়ে গিরিবালা দরজা খুলছে—মাখন পিঠ চেপে দাঁড়াল : কখনো না। বড্ড যে দেমাক দেখিয়ে চলে গিয়েছিল—

কর্তাকে ঠেলে সরিয়ে আন্নাকে গিন্নি ঘরে ডাকল : আয় রে বউ। হালদারঠাকুর কই ?

"নেই।" ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল আন্নাবউ, "বুকে সেই যে ব্যথা-ব্যথা করত—সপ্তমী পুজোর দিন সেই রকম একটু করেই অজ্ঞান। আমায় অকূলে ভাসিয়ে চলে গেল।"

গিরিবালা প্রবোধ দিয়ে বলে, "ভাসবি কেন রে? আমার সংসারের একজন হয়ে থাকবি, আগে যেমন ছিলি।"

এখন তো তিলধারণের জায়গা নেই। রান্নাঘরের দাওয়ায় মাদুর ও গোটা দুই কম্বল ফেলে গিরিবালা বলল, "রাতটুকু কষ্টে সৃষ্টে কাটিয়ে নে বউ, দিনমানে কাল ব্যবস্থা করব।"

ভোরবেলা মাখন কুরুক্ষেত্র লাগিয়েছে—খড়ম খুলে আন্নাবউকে এই মারে তো এই মারে। গিরিবালা ছুটে এসে পড়ল। রাতের মধ্যে আন্নাবউ কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে—ছেলে হয়েছে তার। হাপুসনয়নে কাঁদছে বউ। মাখন বলে, "মায়াকান্নায় ভুলিনে—এখুনি এই অবস্থায় বেরিয়ে যাবি। রান্নাঘরের দরজায় আঁতুড় করে থাকতে দেব না।"

স্বয়ং লালমহারাজ বেরিয়ে এলেন। বেঁটেখাটো চেহারা, বয়স বেশি নয়, লাল-টুকটুকে রং। মাকে বলছেন, "দেখ মা দেখ, বাচ্চা তো নয়—স্বর্গের পারিজাত। বড় হয়ে দেখো খুব কোমলপ্রাণ সদাচারী হবে।"

হাসছেন সকৌতুকে। "আর দেখ মা, মাখন নিজের জামাই চেনে না—জামাই-বেয়ানকে দূর-দূর করে তাড়াচ্ছে।"

লালমহারাজের মা, মাথা-ভরা পাকাচুল, এগিয়ে এলেন। নোটের গোছা মাখনের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, "শুনলে তো সব। তাড়িয়ে দিও না—মা-ছেলেকে ভাল ঘরে নিয়ে রাখো।" দলবল নিয়ে তাঁরা চলে গেলেন। তারপরে কর্তা-গিন্নিতে ঝগড়া। গিন্নি বলে, "আন্নাবউকে আমি রাখবই। অমন খাটুনির মেয়ে দুটো পাব না।
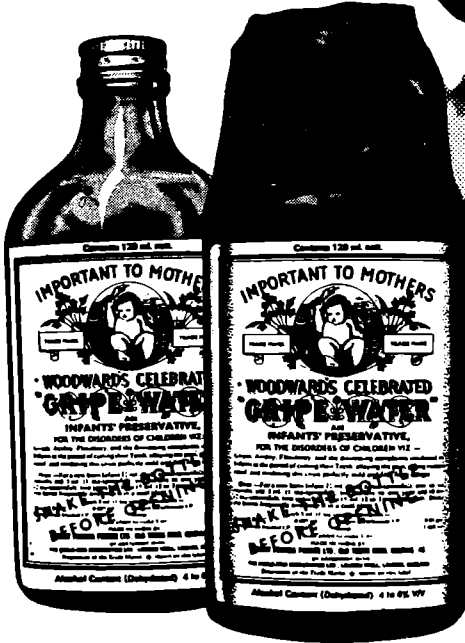
পেট ব্যথা, পেট ফাঁপা, বদহজম, উদরাময় এবং দাঁত ওঠবার সময়ে অস্বস্তি হলে উডওয়ার্ডস্ খাওয়ালে বাচ্চারা এ সব থেকে আরাম পায়।

CAS OPPL.1.77 BN

মাখন বলে, "মহারাজ কী বলে গেলেন কানে শুনলে তো? ও'র কথা নাকি মিথ্যে হয় না।"

"হোক তাই, মুখে ও'র ফুলচন্দন পড়ুক। মেয়ে হোক আর ছেলে হোক, একটি এসে আমার বাঁজা নাম ঘুচিয়ে দিক।"

মাখন বলে, "সে মেয়ের বিয়ে ওই ঝিয়ের বাচ্চার সঙ্গে?"

গিরিবালা ভ্রূভঙ্গিতে উড়িয়ে দেয়। "মাথা নেই তার মাথা-ব্যথা! মেয়ে কোথায় তার ঠিক নেই, এখনই তার বিয়ের ভাবনা!"

মাখনের মনের মেঘ যায় না। দিন পনের পরে বিষম অঘটন। সকালে ঘুম ভেঙে আন্নাবউ দেখল, বাচ্চা নেই। "কোলের মধ্যে নিয়ে ঘুমুচ্ছিলাম—কোথায় গেল আমার সোনার পারিজাত?"

বিকেলে খবর মিলল, বাচ্চা চা-বাগিচার হাসপাতালে। আন্নাবউ পাগল হয়ে ছুটল। একটা রিকশা জুটিয়ে নিয়ে গিরিবালাও পিছন ধরেছে। হাসপাতালে যাবতীয় বৃত্তান্ত পাওয়া গেল। সারারাত যাত্রা শুনে কয়েকটা লোক বাড়ি ফিরছিল—খালের ধারে ঝোপের ভিতর শিয়ালের খ্যাক-খ্যাক আর কচিগলার কান্না। গিয়ে দেখে রক্তে ভাসছে বাচ্চা—কাকে চোখ ঠোকরাচ্ছে, শিয়ালে খুবলে খুবলে খাচ্ছে। বুদ্ধি করে লোকগুলো হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে গেছে। নিশ্চয় মা বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছিল—শিয়ালে চুপিসারে তখন টেনে নিয়েছে।

শিশু প্রাণে বেঁচে গেল, মাসতিনেক পরে ঘরে এল। বাঁ-হাত নড়বড়ে নুলো, বাঁ-চোখটা নেই। ডানদিকে চেপে পড়েছিল—কাক-শিয়ালে সেদিককার তাই নাগাল পায়নি।

কর্তাকে ডেকে নিয়ে গিরিবালা চুপি-চুপি খুব ধাতানি দিল। "শিয়ালে নিয়েছিল না কিসে নিয়েছিল, আমি জানি। সর্বনেশে মানুষ তুমি—ওই নুলো-কানা ছেলেকে সারাজন্ম তোমায় পুষতে হবে। বেয়াড়াপনা করেছ কি, থানায় গিয়ে সমস্ত ফাঁস করব।" মাখন সেই থেকে একেবারে চুপ।

ধন্য লালমহারাজ! যা তিনি বলেন, অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়। এতখানি বয়সে এসে বাঁজাবউ গিরিবালা সত্যি সত্যি মেয়ের মা। মণিমালা নাম দিয়েছে—মায়ের বাপের নয়নের মণি।

মেয়ে বড় হচ্ছে, পারিজাত তার সর্বক্ষণের খেলুড়ে। দেখে মাখনের চোখ জ্বালা করে—ঝিয়ের ছেলে সত্যি সত্যি জামাই হবে নাকি?

ভরদ্বাজ কবিরাজের অষুধে নাকি ডেকে কথা কয়, কাটা অঙ্গ জোড়া লাগে। অনেক দূর ভিন্ন জেলায় কবিরাজের বাস, মাখন গেল চলে সেখানে। ব্যবস্থাও করে এল। পারিজাত কবিরাজ-বাড়ি থাকবে। অষুধ তৈরির কাজে জঙ্গল থেকে খুঁজে খুঁজে পাতা-লতা শিকড়-বাকড় আনবে, শিলে বাটবে, হামান-দিস্তায় কুটবে। তাছাড়া সংসারের কাঠকুটো দেওয়া গরুবাছুর দেখাও আছে। পরিবর্তে কবিরাজ নুলোহাতের জন্য বাঘের চর্বিতে বানানো শার্দুলঅবলেহ, কানা-চোখের জন্য চন্দ্রামৃত-বিন্দু ইত্যাদি দুর্লভ অষুধ জোগান দিয়ে যাবেন। তদুপরি নগদ বেতন—তিন টাকা। সকল অঙ্গ সম্পূর্ণ নিখুঁত করে দেবেন, কবিরাজ গ্যারান্টি দিলেন। তবে ছুটির ব্যাপারে কিছু কড়াকড়ি—বছর অন্তর তিনটে দিন মাত্র।

ছুটি! বছর কাটিয়ে পারিজাত মায়ের কাছে যাচ্ছে। হাঁটছে না বুঝি—নেচে নেচে যাচ্ছে। নাচে আর ধুন্দুমার চেঁচায়। পথের ধারের গরুটা মোক্ষম দাঁড় টানাটানি করছে—দড়ি ছিঁড়ে পালাবে। হাসতে হাসতে পারি গরুর কাছে গিয়ে শিঙে হাত বুলায়। "ভয় পেয়ে গেলি নাকি—আরে ছি-ছি! হাঙ্গামাহুজ্জুত কিছু নয়—এ আমার গান। মায়ের কাছে যাচ্ছি, পকেটে পুরো-বছরের মাইনে—বেশি আহ্লাদ হয়েছে কিনা, গান তাই বেশি জোরদার।"

পথের ওপাশে ঠিক এই সময় 'গেলাম, গেলাম' আর্তনাদ। পারি সেদিকে ছুটল। থুনথুনে বুড়ি মানুষ এঁদোপুকুরের কাদায় পড়ে গেছেন। অনেক কষ্টে উপরে তুলে এনে গাছের গুঁড়ি ঠেসান দিয়ে তাঁকে বসাল। বুড়ি হাঁপাচ্ছেন। পারি বলে, "ওখানে কেন মরতে গিয়েছিলে বুড়িমা?"

"তেষ্টা পেয়েছে—"

পারি বলে, "ভাগ্যিস পড়ে গেলে! ঐ নোংরা জল পেটে গেলে তো নির্ঘাত কলেরা—" দূরের পানে তাকিয়ে বলে, "রোসো, জলের ব্যবস্থা করছি। গ্রাম দেখা যাচ্ছে, ভাল পুকুর নিশ্চয় পাব।"

"আনবি জল কিসে করে? পাত্তোর তো নেই।"

পারি বলল, "না জোটাতে পারি, কিনে নেব মাটির একটা-কিছু। মাইনে নিয়ে মাকে দিতে যাচ্ছি—কিছু না-হয় খরচাই হয়ে গেল।"

গাঁয়ের পানে ছুটল। বুড়ি ডেকে বলেন, "নির্জলা একাদশী ছিল কাল। খিদেও পেয়েছে—"

"এনে দেব মিষ্টিমিঠাই। ভাবনা নেই—বছরের পুরো মাইনে এই পকেটে।"

চু-উ-উ করে দম ধরে পারি দৌড় দিল। নতুন ভাঁড়ে করে জল নিয়ে এসেছে—বুড়ি রেগেমেগে বলে, "শুধু জল"

"দোকান দেখে এসেছি বুড়িমা, সব রকম খাবার পাওয়া যায়। কী খাবে বলো।"

বুড়ি বললেন, "বেশি খাওয়ার কি বয়স আছে বাছা? পাকা পেঁপে আনিস, মর্তমান কলা, আম, কাঁঠাল, দই, রাজভোগ, সন্দেশ পানতুয়া। আর কিছু ছানা আনবি অতি অবশ্য। কিন্তু কী হাবা ছেলে তুই রে! কড়া রোদের মধ্যে বারবার যাচ্ছিস—একবারে আনলেই তো হত!"

"হাত আমার একটা, এতক্ষণে তা-ও ঠাহর পাওনি?" হাসতে লাগল পারিজাত। বলে, "সেই হাতে ছিল জলের ভাঁড়, খাবার আনি কেমন করে?"

আবার গেল। ফিরতে দেরি হল না—ছুটে গেছে, ছুটে এসেছে। উঁকি দিয়ে দেখে বুড়ি বলেন, "রাজভোগ দেখছি না তো? দই কতটুকু এনেছিস?"

মুখ কাচুমাচু করে পারি বলে, "টাকা ফুরিয়ে গেল যে। দুটো পয়সা মাত্তোর আছে, এই দেখ।"

"বললি যে পুরো বছরের মাইনে?"

"তিন টাকা—।" কৈফিয়তের সুরে পারি বলছে, "অঙ্গ সবগুলো আমার যে নেই। হাত একখানা, চোখ একটা। এ-পাশে গরু বোঝাচ্ছি—ও-পাশে তুমি সেই-সময় কাদায় পড়লে। চোখ দুখানা থাকলে এ-পাশ ও-পাশ দু-দিকে নজর চলত—তোমায় তাহলে পড়তে দিই?"

বুড়ি বললেন, "মাইনে সবই তো খরচা করে ফেললি, মায়ের কাছে কী নিয়ে যাবি?"

"যাব না। চাকরি তো আছেই—আবার মাইনে পেয়ে তখন যাওয়া যাবে। বছর একটা বই তো নয়! খেয়ে দেয়ে নাও বুড়িমা, আমি ফিরি।"

পানতুয়া একটা হাতে তুলে নিয়ে বুড়ি রেগে গেলেন। "মার্বেলের সাইজের কী এনেছিস রে?" রেগেমেগে ছুঁড়ে মারলেন পারিজাতের মুখে, বোঁ-ও-করে চোখে গিয়ে লাগল। ভাল চোখটায় নয় রক্ষে। বাঁ-চোখে—যেখানে মণি নেই, কেবল কোটর! পানতুয়া সেঁধিয়ে গেল ভিতরে। ছানাও একবার দু-বার মুখে দিয়ে থুঃ-থুঃ—বুড়ি ছুঁড়ে দিলেন। হাড্ডিসার বাঁ-হাতের উপর পড়ে ছানার তাল লেপটে রইল।

পারিও রেগেছিল। আরে আরে, চোখ-হাত তার একেবারে ভাল হয়ে গেছে! বুড়ির দু-পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল সে। "কে আপনি, পরিচয় দিন। নয় তো পা ছাড়ব না।"

লালমহারাজের মা তিনি, পারিজাতের জন্মরাত্রে যাঁরা মাখন গাঙ্গুলির ওখানে ছিলেন। ছেলে কোমলপ্রাণ সদাচারী হবে, মহারাজ বলেছিলেন—কদ্দুর কী হয়েছে, সেইটের আজ পরখ হয়ে গেল। চোখ-হাতের চিকিচ্ছেও মহারাজের ব্যবস্থায়।

বুড়িমা বললেন "সেরে সুরে ভাল হয়ে গেলি, মায়ের কাছে যা এবারে। মাইনে খরচ করে ফেলেছিস, আমি সব দিয়ে দিচ্ছি।"

পারি আবদার ধরে। "মহারাজের এত দয়া—তাঁর চরণবন্দনা করে আমি—"

বুড়িমা বলেন, "করিস। পথ বলে দিয়ে যাচ্ছি, যখন খুশি চলে যাস। আন্নাবউ তোর পথ তাকাচ্ছে—সকলের আগে সেইখানে।"

চণ্ডীডিণ্ডিম ভারি দুর্গম জায়গা। সামনের ঐ মস্তবড় পাহাড়টা সম্পূর্ণ পার হয়ে যেতে হবে। তার পরে পায়ে হাঁটা—হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে—করালী গাঙ। গাঙের পারানি পয়সায় নয়—মন্তোরে ডাকতে ডাকতে তবে মাঝি দেখা দেবে। সবিস্তারে পথ বলে দিচ্ছেন বুড়িমা—বলছেন, বলছেন—হঠাৎ দেখা যায়, তিনি নেই। পকেটে কখন টাকা ঢুকে গেছে—পারি গুনে দেখল, তিনটেই বটে। কিন্তু সোনার টাকা।

"এসেছি মা। এই দেখ আমার একেবারে ভাল চোখ, ভাল হাত—"

আন্নাবউ ছিল। গলা শুনে গিরিবালা ছুটে এল। মায়ের পিছু-পিছু মণিমালাও। আশ্চর্য কান্ডটা কেমন করে ঘটল, পারি হাত-মুখ নেড়ে বলছে। চুপচাপ সবাই—কী আশ্চর্য, হাসি-খুশির ভাব নেই মুখে। কথার সাগর এমন যে মণিমালা, সে অবধি চুপ। সজল কণ্ঠে হঠাৎ গিরিবালা বলল, "মণিকেও যদি দয়া করেন লালমহারাজ—"

হঠাৎ মণিমালা বোবা হয়ে গেছে। কিসে কী হল—ডাক্তার-বদ্যি থই পাচ্ছে না। গলার নীচে মাঝে মাঝে যন্ত্রণা ওঠে—মেয়ে তখন কাটা-মুরগির মতো ছটফট করে। সে কষ্ট চোখ মেলে দেখা যায় না। "মহারাজকে গিয়ে ভাল করে বলিস পারিজাত, মণি তো তাঁর আশীর্বাদেই এসেছে।"

চণ্ডীডিণ্ডিমে যাবে, তক্ষুনি পারি ঠিক করে ফেলল। দুর্গম পথে ছেলেকে মা ছাড়ে কি না-ছাড়ে—রাত্রিবেলা কাউকে না জানিয়ে চুপিচুপি রওনা দেবে।

যাচ্ছে—যাচ্ছে—। পাহাড়ের চড়াই-ওতরাই ভেঙে ওপার গিয়ে পড়ল। দিনের শেষে রাত হচ্ছে, রাত পুইয়ে আবার দিন—পথের আর শেষ নেই! খরার দেশে গিয়ে পড়ল। চাষবাস নেই—মাঠের পর মাঠ খা-খা করছে। খাল-বিল ডোবা-পুকুর কোথাও জল পায় না। মস্তবড় দিঘি—রাজার দিঘি নাম, কোন রাজা নাকি কাটিয়েছিলেন—সে দিঘিরও তলা পর্যন্ত রোদের তাপে ফেটে চৌচির।

দিঘির সামনে বিশাল অট্টালিকা। ঢুকে গিয়ে পারিজাত বলল, "তেষ্টায় মারা পড়ি রাজাবাবু, একটুখানি জল—"

ভদ্রলোকটি বিরস মুখে বসে ছিলেন। বললেন, "কে হে ছোকরা, জল চাইতে এসেছ? সোনা-রুপো চাইলে বরঞ্চ চেষ্টা করতে পারি। কাঁড়ি কাঁড়ি খরচা করে পনের-বিশ ক্রোশ দূর থেকে জল আনিয়ে এক ঢোক দু-ঢোক করে খাই—সে জিনিস খয়রাত করতে পারব না।"

নিরুপায় পারিজাত বলল, "খয়রাত নয়—ধরে নিন, ধার নিচ্ছি। কড়ার করছি, একটি গ্লাস জলের বদলে মাসের মধ্যে খরা রাজ্য জলে ভাসাব।"

"কী রকম ? কী রকম ?"

"চন্ডাডিন্ডিমে যাচ্ছি, লালমহারাজের কাছে।"

ছেলেমানুষ বলেই এমনি আজগুবি কথা বলে। ভদ্রলোক বললেন, "সে হল করালী গাঙের ওপার। কুমির-কামট গিজগিজ করছে—জলে পা ঠেকাতে পারবি নে।"

পারিজাত বলে, "আমি পার হয়ে যাব। মহারাজের মা নিজে নেমন্তন্ন দিয়েছেন, পারাপারের কায়দা শিখিয়েছেন—"

ভদ্রলোক পারির দিকে একনজরে একটুখানি তাকিয়ে রইলেন। "সত্যি বলছিস ? আধ গেলাস জল তবে দিয়ে দিচ্ছি। ফিরতে হবে এই পথে—খেয়াল রাখিস সেটা—অন্য কোন রাস্তা নেই। ধাপ্পা দিয়ে জল খেয়ে যাস যদি—" দেয়ালের চতুর্দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে বললেন, "রাজ্যপাট গেছে—কিন্তু তলোয়ারগুলো রয়েছে। তোর মতন একটা ছেলে কুচি-কুচি করতে মিনিট খানেকের বেশি লাগবে না।"

খরা রাজ্য ছেড়ে পারি এগিয়ে চলে। করালীর কাছাকাছি এসেছে, লোকমুখে শুনতে পায়। চাল-চিঁড়ে ফুরিয়েছে দুটো দিন উপোস গেল। পা আর চলতে চায় না। পিঠেবাগানে নাকি অতিথ গেলে ফেরায় না, থালা ভরে পিঠে এনে দেয়। ধুঁকতে ধুঁকতে পারি সেখানে গিয়ে উঠল।

বাগানের মালি সত্যি সত্যি ভাল—পিঠে নয়, মুড়ি-বাতাসা এনে দিল তাড়াতাড়ি। দুঃখ করে বলে, "মুড়ি আমি কাউকে দিইনে খোকা। অশ্বত্থের মতো এই মস্তবড় গাছটা—আমার পিঠেগাছ। ডালে ডালে বারোমাস পিঠে ধরে থাকে—ভাপাপিঠে, পুলিপিঠে, চষিপিঠে, মুগসামালি, প্যাটিসাপটা, দুধফেনি,কত রকমের পিঠে। কেউ এলে গাছ থেকে টাটকা পিঠে পেড়ে এনে দিই। ইদানীং কী হয়েছে—গুটি ধরে না গাছে, বউল হয়েই ঝরে যায়। গাছও শুকিয়ে আসছে দিনকে-দিন। জঙ্গল থেকে চারা এনে কত যত্নে এত বড়টা করেছি—মরে গেলে পুত্রশোকের মতন বাজবে।"

বলতে বলতে কেঁদে ফেলার গতিক। পারিজাত প্রবোধ দিয়ে বলে, "চিন্তা নেই মালিমশায়। আমি তো চন্ডাডিন্ডিমে যাচ্ছি—"

মালি অবাক হয়ে যায়। "এইটুকু ছেলে—করালী পার হবে তুমি ?"

পারি বলল, "তোমার পিঠেগাছে আবার পিঠে ফলবে—আমি তাই করে আসব।"

মালি গদগদ হয়ে বলল "তাই যদি হয়, আমার বাগানে তোমার পাকাপাকি নেমন্তন্ন—যখন খুশি এসো, দলবলসুদ্ধ চলে আসবে।"

করালী গাঙ। করাল স্রোত তোলপাড় করে ছুটেছে। কুমির এখানে সেখানে পড়ে পড়ে রোদ পোহাচ্ছে। ওপারের ঝোপঝাপ অস্পষ্ট নজরে আসে। বুড়িমা যেমনধারা শিখিয়ে দিয়েছেন—কাঁটাশিমুলের মাথায় চড়ে, ওপার পানে চেয়ে, গলা ফাটিয়ে পারিজাত শোলোক পড়ছে ঃ

আজব পিরথিম—চন্ডাডিন্ডিম—
জলে জ্বলে আগুন, আর ডাঙায় বেজায় হিম,
আর মাছেরা সব গাছে পিড়িং পিড়িং নাচে,
গাধায় মাথায় হাঁটে, আর ঘোড়ায় পাড়ে ডিম।

একবার পড়ল, দু-বার পড়ল, তিনবার পড়ল। হ্যাঁ, ঝোপ ফুঁড়ে দেখা দিচ্ছে বটে কালো একটা রেখার মতন সরু নৌকো। তীরের বেগে আসছে। স্ফূর্তিতে পারির আরও চিৎকার ঃ

মারো বোঠে হেঁইও-হো—
চন্ডাডিন্ডিমে যাইও গো—

শিমুলগাছের নীচে নৌকো ধরেছে তিড়িং করে পারিজাত লাফ দিয়ে পড়ল। মাঝি পিটপিট করে তাকায়— মাঝগাঙে এসে আচমকা সে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল। পারি রীতিমত চমকে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে সে বলে, "আমার কথা মহারাজকে একটু

বোলো খোকাবাবু, আমায় বাঁচাও। বায়ান্ন বছর এই কাজে আছি। বোঠে হাতের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে।"

বলছে, "আগে যে লোকটা পারাপার করত, আচমকা সে গায়ের উপর পড়ে বিড়বিড় করে কী মন্তোর পড়ল—বোঠে সড়াক করে তার হাত থেকে পিছলে আমার হাতে এ'টে গেল। বায়ান্ন বছর কাটল—কিসে আমার মুক্তি, কায়দাটা জেনে এসো খোকনভাই।"

সুবাসে ভরা চন্ডীডিন্ডিম—যেদিকে তাকাও রঙবেরঙের ফুল। দু-পা এগোতেই বুড়িমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বড় খুশি তিনি। "এর মধ্যে এসে গেলি? কিন্তু মহারাজকে পাবিনে তো। ধ্যানে রয়েছে।"

পারিজাত শুধায়, "ধ্যান কখন ভাঙবে?"

"বৈশাখী পূর্ণিমায়। দেড়মাস এখনো।"

"তা হলে উপায়?" হাহাকার করে ওঠে পারি, "গাঙ্গুলি-বাবুর মেয়ে, আপনাদের আশীর্বাদেই যার জন্ম, হঠাৎ সে বোবা হয়ে গেছে। বুকে দারুণ যন্ত্রণা ওঠে—কখন যে দম আটকাবে ঠিকঠিকানা নেই।"

বুড়িমার অনন্ত দয়া। বললেন, "আচ্ছা, ডেকে আমি জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি।"

যাচ্ছেন, পারি তাড়াতাড়ি জুড়ে দিল, "খরারাজ্যে কিসে জল আসবে, সেটাও জিজ্ঞাসা করবেন। নয়তো আমায় ফিরে যেতে দেবে-না, কেটে কুচিকুচি করবে—বলেছে।"

সাধনপীঠের সামনে গিয়ে মা ডেকে বলছেন, "পারিজাত এসে পড়েছে বাবা। মাখনের মেয়ের অসুখ কিসে সারে?"

লালমহারাজের কণ্ঠ ভেসে আসে, "হাঁ করে ঘুমুচ্ছিল হাঁদা মেয়ে। গিরগিটিতে ফড়িং তাড়া করেছিল—ফড়িং মুখে ঢুকে গেল তো গিরগিটিও ঢুকল। আর বেরুতে পারেনি, বেরুতে চায়ও না তেমন। আদরের মেয়েকে ওরা দেদার দুধ-ক্ষীর মিষ্টিমিঠাই খাওয়ায়—গিরগিটি মজা করে খেয়ে যাচ্ছে।"

"বের করা যায় কেমন করে?"

"ফড়িঙের লোভে ঢুকেছে, ফড়িং দিয়েই বের হয়ে আসবে।"

মা বললেন, "আরও একটা জিজ্ঞাসা বাবা। খরারাজ্যে জল আনা যায় কেমন করে, উপায়টা বলো।"

"রাজার দিঘির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে পাড় ঘেঁষে কুয়ো খুঁড়ে ফেলুক। আট হাত নীচে প্রকান্ড পাথরের চাঁই। পাথর সরিয়ে দিলেই জল—অফুরন্ত জল।"

পারিজাত শুনে নিল সমস্ত। ফিরে গিয়ে তড়িঘড়ি তো ব্যবস্থা করবে—কয়েক পা এগিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইতস্তত ভাব। বুড়িমা বলেন, "জিজ্ঞাসার কিছু বাকি বুঝি? বল্ না রে যদি কিছু থাকে। কত কষ্টে এসে গেছিস—মনে কিছু চেপে রাখিসনে।"

পারি বলল, "মহারাজের কাছে আসছি দেখে পিঠেবাগানের মালি আর করালীর মাঝি কান্নাকাটি করে তাদের কথা বলতে বলল।"

মা শুনে নিলেন। আবার গিয়ে মহারাজকে ডাকলেন, "তোমার ধ্যানে আর একবার বাধা ঘটাচ্ছি বাবা। পিঠেবাগানে পিঠের ফলন নেই কেন?"

"গাছের তেডালায় মস্ত ফোকর—তার ভিতরে নাগভৈরব আস্তানা গেড়েছে। বড় সাংঘাতিক—দাঁতে বিষ, নিশ্বাসেও বিষ। বিষের তাপে বউল ঝরে যায়, গাছও শুকিয়ে আসছে। মেরে ফেলুক কিম্বা গাছ থেকে তাড়াক, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"আর একটা জিজ্ঞাসা। এই শেষ।" মা তাড়াতাড়ি বলেন, "করালীর মাঝি বাহান্ন বছর ধরে বোঠে বাইছে, বোঠে হাতে এ'টে রয়েছে। মুক্তি পাবে সে কেমন করে?"

"বোঠে যেভাবে তার হাতে এসেছিল অবিকল তেমনিভাবে

অন্যের হাতে লাগিয়ে কথা কয়টি ঠিক ঠিক বলে যাবে—”

আর কী চন্ডীডিন্ডিমে আসা সার্থক। পুলকিত পারিজাত বাড়ি মুখো ছুটল। করালী পার হচ্ছে—সেই নৌকো, সেই মাঝি। মাঝি শুধায়, “আমার দরবারটা বলেছিলে খোকাবাবু?”

পারি বলে, “বোঠে অন্য হাতে চালান করো, ঠিক যে কায়দায় বাহান্ন-বছর আগে তোমার হাতে এসেছিল।”

“হাতের উপর বোঠে চাপিয়ে কী সব বলতে লাগল। আসলই তো তাই—সে জিনিস আমি কোথায় পাব?”

“মোটে তো গোটা আষ্টেক কথা—মনে রাখতে পারনি?”

“তড়তড় করে বলে গেল—শুনতে দিয়েছে নাকি?” কাতর হয়ে মাঝি বলে, “খোকাবাবু, তুমি ঠিক জেনে এসেছ। বলো—বলে দাও—”

“বলছি—ভেবে নিই। বোঠে বাওয়ায় ঢিলে দিও না তুমি। প্যারে লাগাও—তার পরে বলব।”

ডাঙায় ধরতে-না-ধরতেই পারিজাত লাফিয়ে পড়ল।

“কই, বললে না তো—”

ততক্ষণে পারি একদৌড়ে শিমুলগাছের তলে চেঁচিয়ে বলে, “শোন, মুখস্থ করে নাও ঃ

ফুরোল কথা, মুড়োল নটে,
হাত বদলাও এবারে বোঠে—”

বলেই সে দৌড় দিল। বেলা ডুবু-ডুবু। এতক্ষণে পিঠে-বাগানে। মালিকে বলে, “একটা বড় মই আনো, আর কার্বলিক-এসিড যত বেশি জোটাতে পারো। তেডালা থেকে গর্ত নেমে গেছে, দেখ। মই বেয়ে বেশি উঁচুতে উঠে এসিড ঢালো গর্তের মুখ দিয়ে। যা বলি করে যাও না—কেন বলছি এক্ষুনি বুঝবে।”

পিঠেগাছ ফোঁস করে ওঠে। ক্রমশ গর্জন। জোর বাড়ছে—কী প্রলয়ঙ্কর গর্জন রে বাবা! তেডালার কোটর থেকে আসে—দুনিয়া লন্ডভন্ড করবে, এমনি মনে হয়।

“ভয় নেই—” পারিজাত সাহস দিচ্ছে। পথের কষ্টে দু-চোখ ভেঙে ঘুম এসে যায়। ভোর হল, চারিদিক নিঃশব্দ এখন। চোখ মেলেই পারি বলে, “আর ভয় নেই। নাগভৈরব পালিয়েছে, কিম্বা মরেছে। গাছে কত পিঠে ফলবে এবার দেখো।”

বলেই দে-ছুট। কয়েকটা দিন পথে পথে। খরারাজ্যে এসে অট্টালিকার ভদ্রলোককে ডেকে বলল, “ঝুড়ি-কোদাল আর পনের-বিশটা লোক আনুন শিগগির—কুয়ো খুঁড়বে।”

দিঘির পুব-দক্ষিণ কোণের জায়গাটা দেখেশুনে নিরিখ করে দিল সে। না-জানি কোন্ গুপ্তধন বেরুবে—দেখতে দেখতে ভিড় জমে যায়। প্রকান্ড এক পাথর—মাটি নেই, কোদাল আর চলবে না।

পারি হাসতে হাসতে বলে, “জলের বদলে পাথর—যা-চ্চলে! আর কী হবে—বন্দুক-তলোয়ার বের করুন রাজাবাবু, এবারে আমায় তো কুচিকুচি করবেন।”

পাথর খানিকটা ধাক্কাধাক্কি করতেই পারি সামাল-সামাল করে ওঠে। পাতাল ফুঁড়ে ফোয়ারার মতন শতেক ধারে জল আসছে। অত বড় দিঘি ভরে গেল দেখতে দেখতে। ছাপিয়ে পড়ছে জল। নালা কাটছে লোকে নানান দিকে—জল খাল-বিল-মাঠে চলে যাক।

বাড়ি এইবারে। “ফড়িং ধরো—ফড়িং ধরো—” বলে পারি রাস্তা থেকে চেঁচাচ্ছে। ছেলে পাগল হয়ে ফিরল নাকি? বলছে, “মণিমালাকে ধরে থাকবে তোমরা—বড়শিতে ফড়িং গেঁথে ওর গলায় ঢুকিয়ে দেব। এক্ষুনি সে ভাল হয়ে যাবে চন্ডীডিন্ডিমের লালমহারাজের দয়ায়।”

করল তাই—গলার নলির ভিতর সন্তর্পণে বড়শি ঢোকাল। যা ভেবেছে—ফড়িঙের লোভ বিষম লোভ—টপ করে গিরগিটি টোপ গিলল। আস্তে আস্তে পারি সুতো টানছে। ছটফট করে মণিমালা—পারি হুমকি দিয়ে ওঠে ঃ “ছেড়ো না তোমরা, খবরদার! কড়া হাতে ধরো।” টানে টানে হড়াস করে গিরগিটি বেরিয়ে পড়ল। বড়শি-

পুতুল নাচ

আলোক সরকার

আলো হল, ঠিক তার পাশে
কালো হল।
কালোটা কি ভাল হল?
আমি বলি ক'ষে জল ঢালো—
কালোগুলো দৌড়ে পালাল!

ভাল হল খুব ভাল হল।
আলো দেখো জিবটা ভেঙাল
বনবন নাচও লাগাল
সাথে তার তবলার বোলও
এইবার হাঁক দাও—কালো
আলোর টিকিটা ধ'রে তোলো!

আলোগুলো কোথায় পালাল।

ভাল হল খুব ভাল হল।
কালো দেখো চোখটা রাঙাল
ঠ্যাং দুটো সজোরে বাড়াল
বলল, এখনি দোর খোলো—
এইবার হাঁক দাও—আলো
কালোর কানটা ধ'রে তোলো।

কালোগুলো দৌড়ে পালাল।

ছবি অহিভূষণ মালিক

গাঁথা মাছ জল থেকে যেমন ডাঙায় উঠে আসে। আর কী আশ্চর্য মণিমালা দেখ টরটর করে কথা কইছে।

পারিজাতের কাছ থেকে মাখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চণ্ডডিণ্ডিমের পথ বুঝে নিল। শুনতে পেয়ে গিরিবালা শুধায়, "মহারাজের কাছে যাচ্ছ বুঝি?"

মাখন বলে, "মেয়েটাকে ভাল করে দিলেন—পদধুলি মাথায় না নিয়ে সোয়াস্তি পাচ্ছিনে—"

গিন্নি বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, "অতিভক্তি ভাল ঠেকছে না। আসল কথা বলো দিকি—"

মাখন তখন ফিসফিসিয়ে বলল, "পারি ছোঁড়াটা দারুণ জমিয়েছে—যেটা চাইছে, পেয়ে যাচ্ছে। অথচ গোড়ায় তো আমিই ও'দের পেয়েছিলাম—আমার বাড়ি উঠেছিলেন, সেইসময় ছোঁড়ার জন্ম। দয়ার দাবি আমারই বেশি।"

"কী দয়া চাই তোমার, শুনি।"

"সবে-ধন মেয়ে আমাদের—কথা বন্ধ হয়েছিল, তা-ও সেরে গেছে। পারি হেন ছেলে—ইটে নেই ভিটে নেই, মা ছিল হোটেলের ঝি, বাপ রাঁধুনি—অমন পাত্রের হাতে সোনার মেয়ে কোন প্রাণে সমর্পণ করব। দেখি, লালমহারাজের পা ধরে পড়ে—ভবিতব্য খণ্ডন হয় কিনা। নিতান্ত না-ই যদি হয়, সোনার টাকা গোনাগুনতি তিনটি মাত্র নয়—বস্তাখানেক দিয়ে জামাইকে বড়লোক করে দেবেন।"

দু'মাস গেল, ছ'মাস গেল, বছরও শেষ হতে যায়—মাখনের খোঁজ-খবর নেই। আন্নাবউ তখন পারিকে বলে, "তোর জানা-শুনো পথ—দেখে আয় তো বাবা, কর্তামশায়ের কী হল। যতই হোক, আমাদের আশ্রয়দাতা তিনি।"

চণ্ডডিণ্ডিমের নামে পারি এক-পায়ে খাড়া। পথে পথে কত বন্ধু এবার, কত সমাদর। খরারাজ্য আর নেই—মাঠ-ভরা সবুজ ধান, দিঘির কানায়-কানায় জল। অট্টালিকায় গিয়ে পারি রাজা-বাবুকে শুধায়, "আমার কথা বলে কেউ এসেছিলেন এখানে?" ভদ্রলোক সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, বছরখানেক আগে। তোমার আত্মীয় শুনে খাতিরযত্ন করলাম খুব। ফেরার সময় একদিন দুদিন কাটিয়ে যাবেন বলেছিলেন, আজও ফিরলেন না।"

পিঠেবাগানে পারি মালির কাছে খোঁজ নিচ্ছে, "আমার লোক এসেছিলেন কেউ?" মালি বলল, "থালা ভরে তাঁকে পিঠে সাজিয়ে দিয়েছিলাম। ফেরার সময় এক ঝুড়ি তোমার জন্য দিয়ে দেব—তা ফেরেননি এখনো।"

পারি করালীর কূলে এসেছে। শোলোক পড়ে মাঝি ডাকল। আসছে মাঝি বোঠে বেয়ে—কাছে এসে গেল—আরে, কী কাণ্ড, মাখন গাঙ্গুলি যে! পারিজাতকে দেখে মাখন হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। "হাতে বোঠে এঁটে দিয়ে শয়তান মাঝিটা আমায় নৌকোয় আটকে পালিয়েছে। বাবা পারি, তুই আমায় বাঁচা। লালমহারাজের কাছে যেতে হয়, পার করে দিচ্ছি, তুই ছাড়া অন্য কেউ পারবে না।"

পারিজাত বলল, "মাঝিটা যা করেছিল আপনিও ঠিক সেই কায়দায় বোঠে অন্যের হাতে চালান করে দিন। শোলোক বলছি, শুনে নিন—"

পিছিয়ে শিমুলগাছের গোড়ায় গিয়ে শোলোক শোনাল। মাখন বলে "কাছে এসে বল্ বাপধন—শুনতে পাচ্ছিনে। নৌকোর উপর উঠে আয় না।"

"সেটি হচ্ছে না কর্তামশায়।"—প্রচণ্ড চিৎকারে আরও একবার সে শুনিয়ে দিল। বলে, "অন্য যে আসবে তার উপরে খাটাবেন—আমি ততক্ষণ পিঠেবাগানে বসে বসে পিঠে খাইগে।"

ছবি পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

ক্যালিফোর্নিয়ার পোড়ো খনি-শহরের মধ্যে নিঃসঙ্গ ঘোড়সওয়ার...

স্বাগতম
কোয়েক সিটি
(ক্যালিঃ)
জনবসতি ১১২৩, ৯৮২, ৮৪০ ৬৭১, ৪২৮

যা চললে! তাসের জুয়ো খেলার লোক দু একটা আছে তো!

ভবঘুরে জুয়াড়ী রাসেল ডোনাভান প্রথম দিনেই ঠগের পাল্লায় পড়ল, একজন তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে পুবের ডাকগাড়ি থেকে সোনাদানার বাক্স খালাসের কাজ গছিয়ে দিল...
আমারই বাক্স... 'জন্ উইনটল' নামে আসছে। এই ধরো পাঁচ ডলার। ব্যস, কথা পাক্কা!
আমি... ঠিক...

আমি না-ফেরা পর্যন্ত দেখাশুনো কোরো দাদা!
কিন্তু...যদি...?

কোন্ ফাঁদে পা দিলুম দেখাই যাক না! দুপুরের ডাকগাড়িতে আসছে।

!

এই যে মিস্, জন উইন্‌টলের নামে সোনাদানার বাক্স এসেছে?
আপনার পাশেই নেমেছে!

'প্রজাপতি' ডাকগাড়িটি এক অভিনব 'চালান' নিয়ে পৌঁছল কোয়েক সিটিতে...
ক-কী, বলছেন কী ?
নিজের চোখে দেখে নিন !

কোয়েক সিটি, ক্যালি-র জন উইনটলের জিনিস

ভবঘুরে জুয়াড়ী রাসেল ডোনাভানের তিনটে 'এক রঙের তাস'
এর নাম সোনাদানার বাক্স ! ?
আজ্ঞে !

তাজ্জব কাণ্ড ! না আছে বউ, না আছে চালচুলো...রাখব কোথায় এদের ! ?
সই করুন !

শহরের ওধারে আমার একটা খালি কেবিন পড়ে আছে, নিতে পারেন। আগে এদের মুখে কিছু দেওয়া দরকার।

আমি সিলিয়া ব্র্যাডলি।
আমি ক্লোভিস ব্র্যাডলি।
আমি ববি ব্র্যাডলি। আমরা সব্বাই আপেলের মোরব্বা খাব !
উ...ফ্ !
HARD TIMES CAFE
5-11

সোনার খনির কথাটা শুনলে এ'র মনটা আরেকটু নরম হবে !
অ্যাঁ ?

বাবা বেঁচে থাকতে একটা সোনার খনির আধা-মালিক ছিলেন। এখন আমরাই মালিক, আমরা ওটায় কাজ শুরু করব !
তাই নাকি !

ঘাড়ে-এসে-পড়া পোষ্যের দল প্রথম রাত্রির জন্যে নিশ্চিন্ত...
গুড নাইট!
নাইট!
গুন্নাইত্, মিথ্থার দোনাভান!

গুডনাইট!

হায় বিয়ে না-করতেই তিন-তিনটি!

সকালে রাসেল ডোনাভান তার 'পরিবারে'র জন্যে আস্তানা খুঁজছে, ওদিকে ব্র্যাডলি-শিশুরা বাবার সোনার খনি দেখতে বেরিয়েছে...
কমোডোর খনিটা কোন্ দিকে?
চড়াই ধরে সিধে এগোও — ঠিক নিশানা পেয়ে যাবে!

গা ছমছম করে!
কমোডোর খনি

দূর! সোনার ছিটে ফোঁটাও নেই...
বাবা বলত আছে...

হঠাৎ
গুর গুর গুর ধড়াস দুমদাম্
ভূমিকম্প!

দড়াম,
দুম্দাম্
দড়াম,

শব্দ থামল একসময়, বাতাস পরিষ্কার হল...
দ্যাখ!

সোনা!

ঘুমন্ত খনি-শহর লাফিয়ে জেগে উঠল...
বিরাট এক সোনার চাই!
বিরাটের তিন ডবল!

খুদে বাচ্চারা পারল, আমি পারব না?
ব্যাঙ্ক

কোয়েক শহরে নতুন ভূমিকম্প...
ব্যাঙ্ক
ঠেলছ কেন গা?
মাপ করবেন ম্যাডাম, আমি আগে

সকলের নজর আটকে যাচ্ছে...
স্বর্ণখন্ড মূল্য ৮৭,৪২৪ ডলার রবার্ট ক্লোভিস ও সিলিয়া ব্র্যাডলির আবিষ্কার কোয়েক সিটি, ক্যালি. ২৫-৯-১৮৭৯

ব্যাংক ম্যানেজারের ঘরে...
চাইটা কড়া পাহারায় সানফ্রান্সিস্কো নিয়ে চললুম, এখানে বাচ্চাদের নামে টাকা জমা থাকবে।
বেশ, দেখবেন, ওরা যেন না ঠকে।

সন্ধেয় ডোনাভান, তিন পোষ্য আর ডাক-গাড়ির চালিকা ডাস্টি ক্লাইসডেল ফুর্তি করে ভোজ খাচ্ছে...
মিথ্যার দোনাভান, দাস্টিকে বিয়ে কলবেন?
অ্যাঁ...খক খক...জেন, সক্কলকে আরো আপেলের মোরব্বা!
5-25

এদিকে কুখ্যাত স্টিলওয়েল দল সোনার চাইয়ের খবর পেল...
ওটা বাগাতেই হবে। দুশো মাইল ঠেঙিয়ে এলুম কি শোভা দেখতে?
মতলব ঠাওরালে কিছু, ফ্রাংক?

সানফ্রান্সিস্কোর গাড়িতে তোলার আগেই ওটাকে বাগাব।

ভরদুপুর স্তব্ধ কোয়েক সিটি শুধু তিন অচেনা শয়তানের পায়ের শব্দ...
কেউ আটকালে, সোজা গুলি!

ম্যানেজার ঘরে একা!

আমি ওকে সামলাচ্ছি, তোরা পেছনে আয়!
যো হুকুম!

মি. শার্প চমকে উঠে দেখলেন, নাছোড়বান্দা এক খদ্দের...
ভল্ট খোলো!
কী খুলব!?

সোনার চাঙরটা চাই জলদি!

বাইরে ব্র্যাডলি বাচ্চারা সোনার চাঁইটাকে বিদায় জানাতে এসেছে— সানফ্রানসিস্কোর টাঁকশালে যাচ্ছে সেটা...
ব্যাঙ্ক
ব্যাংকে ডাকাত পড়েছে!

শ্ শ্ শ্! শিগগির!

ব্যাংকের ভেতরে ডাকাত!
আমাদের সোনার চাঙর নিয়ে যাবে!
DYNAMITE

জলদি! জলদি!
ঘাবড়াও মৎ! ঐ হতচ্ছাড়ারা আমাকে আর আমার এ দোস্তকে চেনে না!
DYNAMITE

স্টিলওয়েল দলের হাত চলছে......
বাঃ বাঃ !

ব্যাংকের বাইরে...
ছটফট কোরো না মা-মণি, ভেতরে ডাকাত থাক যাই থাক— সব ভস্ম করে দেব !

সহৃদয় খনিমজুর দুটি ঢুকেই ডাকাতদের মুখোমুখি...
স্-স্-স্টিলওয়েল দ-দল !

ঐ কোণে গিয়ে দাঁড়াও ! সবাই !
সামলে ! ডিনামাইট !
DYNAMITE

বাক্সটা তোল্ ! চল্ সটকে পড়ি !

বাইরে, সোনার চাঙর নিয়ে যাবার জন্যে ডাস্টি মার্শালদের নিয়ে এসে থামল.....
ক্-কী !?
6-8

পুলিস !

গুড়ুম
গুড়ুম !

আড়াল নিয়ে মার্শালরা পাল্টা গুলি চালায়
সোনার চাঙরটা নিতে এসেছে !
BANK

ডিনামাইটগুলোয় একটা গুলি লাগলেই
MITE

গুলির শব্দে সাড়া পেয়ে শহরের লোকও চাঙর বাঁচাতে লড়াইয়ে নামে...
গুড়ুম
গুড়ুম !

বাচ্চাটাকে পাকড়া !

সোনা !?
গোল্লায় যাক ! আপনি বাঁচলে বাপের নাম !

তুমিই আমাদের 'গেট-পাস' গো মা-মণি !
6-15

দস্যুরা বেরিয়ে যেতেই মি. শার্প দরজা খুলে বাইরে আসেন...
স্টিলওয়েল দল ! ও দরজায় সিলিয়াকে নিয়ে ভাগছে !

হঠাৎ ঘোড়ার ক্ষুর আর ঘণ্টার তীব্র আওয়াজ...
কোয়েক সিটি দমকল

শহরের লোক এই বেপরোয়া চম্পট দেওয়া দেখে হতভম্ব...

সিলিয়া ওদের হাতে !

প্রথমে ছ্যটল ডোনাভান আর ডাস্টি... দস্যরা পালালে চলবে না...

জোরসে ! জলদি !

হঠাৎ একটা খাড়া বাঁক ফিরতে গিয়ে ঘোড়া দ্যটো লাগাম ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়...

গাড়িটা গড়িয়ে চলেছে, তার পাশে পেঁছে যায় ডোনাভান...
6-22

দৈবী ঘটনার মতো দমকলের গাড়ি পাথরে ঠোক্কর খেতেই সিলিয়া ছিটকে যায়, ডাস্টি তাকে লফে নেয়। গাড়ি নদীর দিকে...

ডাস্টি আর সিলিয়া রুদ্ধশ্বাসে দ্যাখে... গাড়ি নদীতে গিয়ে পড়ছে...

ডোনাভান আগে সামলে নেয়...

ভিজে-কাক স্টিলওয়েলকে জল থেকে হিঁচড়ে তুলতে-না-তুলতেই দলবল-সহ শেরিফ ম্যাককয়ের আবির্ভাব...
সাব্বাস ডোনাভান ! একে পাকড়ানোর পুরস্কার ৫০০০ ডলার !

শহরে ফিরে দেখে, ডিনামাইটের বাক্সে আগুনের ফুলকি পড়ে পুরো ব্যাঙ্কটাই উড়িয়ে দিয়েছে...
সোনার চাঙর ধুলোর সঙ্গে মিশে গেছে...

গেছে, গেছে ! সোনার বদলে একটা বাবা পেলে, মন্দ কী ? আর ডাস্টি রাজী থাকলে চাই কি একটা মা-ও...

ডাস্টি রাজী হল...
হ্যাঁ !

পুরস্কারের টাকায় খামার কিনল ডোনাভান সপরিবারে থাকবে বলে...
শহরে দু-একটা সন্ধে আসতে হবে... একটু আড্ডা...
দেখা যাক !

একটু খেলাধুলো... একটু আড্ডা... জীবনে এই চেয়েছিলুম। আর কী জুটল দ্যাখো ! একেই বলে কপাল !
সমাপ্ত

সম্পূর্ণ উপন্যাস

গোসাঁইবাগানের

ভূত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ছবি সুধীর মৈত্র
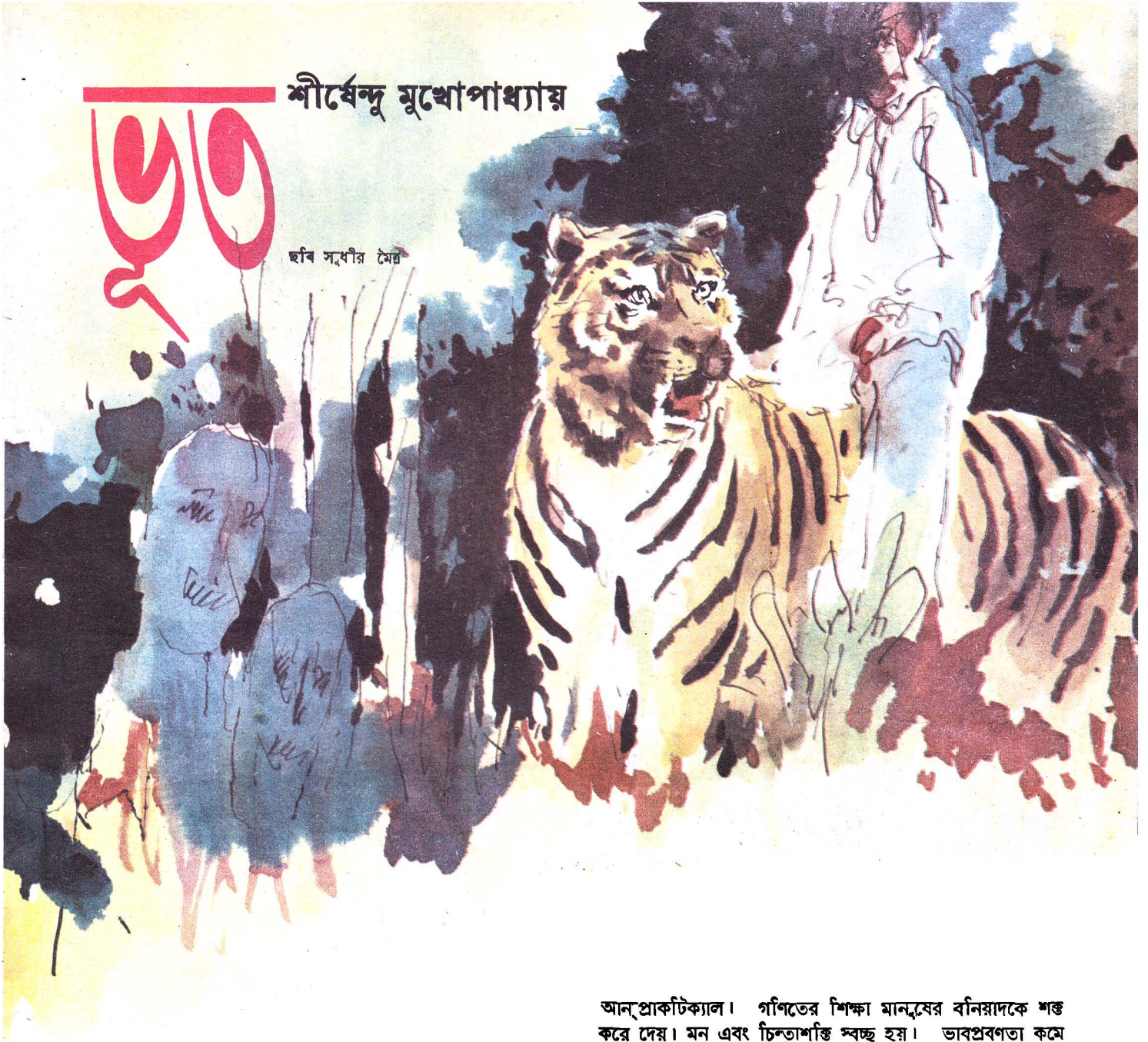
বার্ষিক পরীক্ষায় অঙ্কে তেরো পেয়ে বরুন একেবারে বোকা বনে গেল। সে ইতিহাসে আশি, বাংলায় পঁয়ষট্টি, ইংরিজিতে ষাট এরকম সব নম্বর পেয়েছে, কিন্তু অঙ্কে তেরো।

হেড মাস্টারমশাই শচীন সরকার বরিশালের লোক। যেমন তেজী তেমনি রাগী। তা বলে ছেলেদের মারধর করেন না। কিন্তু তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালে সমস্ত স্কুলটায় ছুঁচ পড়লে শব্দ শুনতে পাবার মতো অবস্থা। তিনি প্রত্যেকটি ছাত্রকে ভাল করে চেনেন, প্রত্যেকের নাম-ধাম স্বভাব-স্বাস্থ্য-অভ্যাস সব তাঁর নখদর্পণে। রেজাল্ট বেরোলে বরুনকে ডেকে তিনি বললেন, "যে ছেলে গণিত জানে না, সে বড় হয়ে কী হয় জানো? বেহিসাবী, অমিতব্যয়ী আর আন্‌প্রাকটিক্যাল। গণিতের শিক্ষা মানুষের বনিয়াদকে শক্ত করে দেয়। মন এবং চিন্তাশক্তি স্বচ্ছ হয়। ভাবপ্রবণতা কমে যায়। যে গণিতের শিক্ষা ঠিকমতো করেনি আমার মতে সে ভাল ছেলে নয়।"

বাড়িতে ফিরতে বাবা বরুনকে ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে। বাবা অসম্ভব রাশভারী লোক। ভাল ডাক্তার বলে তাঁর খুব নামডাক। খুব ব্যস্ত মানুষ, নিজের ছেলেমেয়েদের খোঁজ খবর করবার তাঁর বড় একটা সময় হয় না। বলতে কী, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তিনি খুবই কম কথা বলেন। প্রয়োজন না হলে একনাগাড়ে সাত-আটদিন পর্যন্ত কথাই বলেন না। তাই বরুন এবং তার ভাই-বোনরা বাবাকে এক রহস্যময় মানুষ বলে জানে। সামনে যেতে ভয় পায়।

বরুন যখন বাবার ঘরে গেল, বাবা তখন জানালার ধারে ইজিচেয়ারে বিশ্রাম নিচ্ছেন। গলার স্টেথোসকোপ এবং গায়ের পোশাক ঠিকঠাক আছে। অর্থাৎ এক্ষুনি রোগী দেখতে বেরোবেন। বরুন ঘরে ঢুকতেই বাবা হাত বাড়িয়ে বললেন, "প্রোগ্রেস রিপোর্টটা দেখি।"

বরুন ভয়ে-ভয়ে ভাঁজকরা কাগজটা হাতে দিতে বাবা ভ্রূ

কুঁচকে খুব বিরক্তির সঙ্গে চেয়ে দেখলেন নম্বরগুলো। তারপর কাগজটা ফেরত দিয়ে বললেন, "আমিও ছাত্রজীবনে অঙ্কে খুব ভাল ছিলাম না। কিন্তু আশি-নব্বই না পেলেও চল্লিশ-পঞ্চাশ পেতে অসুবিধে হত না।"

বরুন মেঝের দিকে চেয়ে রইল।

বাবা উঠতে উঠতে বললেন, "কাল থেকে করালী মাস্টার-মশাইয়ের বাড়িতে রোজ পড়তে যাবে। হেঁটে যাবে। হেঁটে আসবে।"

করালী মাস্টারমশাই থাকেন আড়াই মাইল দূরে কামরা-ডাঙায়। রোজ সেখান থেকে সাইকেলে ইস্কুলে আসেন। অঙ্কের শিক্ষক হিসেবে তাঁর প্রচণ্ড নাম-ডাক। তিনি নাকি খাওয়ার শেষে ভাতের থালায় আঙুল দিয়ে অঙ্ক করেন, বড় বড় সব অঙ্কের স্বপ্ন দেখেন, লোকে যেমন গল্প-উপন্যাস পড়ে, করালী স্যার ঠিক তেমনিভাবে অঙ্কের বই পড়েন। লোকে যেমন দুঃখের গল্প পড়ে কাঁদে, হাসির গল্প পড়ে হাসে বা ভূতের গল্প পড়ে ভয় পায়, করালী স্যারও নাকি তেমনি অঙ্কের মোটা মোটা বই পড়তে পড়তে কখনো হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠেন, কখনো বা খুচ-খুচ করে কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল মোছেন, আর কখনো কোনো ভুল অঙ্ক দেখলে ভয়ে শিউরে উঠে "রাম রাম রাম রাম" করতে থাকেন। ভারী আপনভোলা মানুষ। ছাত্রদের কারো নাম তাঁর মনে থাকে না। কারো বাড়িতে নেমন্তন্ন খাওয়ার পর যদি কেউ জানতে চায় "করালীবাবু, রুই মাছটা কেমন খেলেন," করালী-বাবু ভারী অবাক হয়ে বলেন, "রুইমাছ! রুইমাছ ছিল নাকি?" একবার পায়েস খাওয়ার পর ঢেঁকুর তুলে বলে-ছিলেন, "দইটা অতি চমৎকার। এত মিষ্টি দই খাইনি।" অঙ্কের ওরকম দিকপাল শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও করালীবাবু কিন্তু পয়সাকড়ির হিসেবে ভারী কাঁচা। এক টাকা চার আনা কেজির উচ্ছের আড়াইশো গ্রামের দাম কত হয়, তা বাজারে গিয়ে কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারেন না। অসহায়ভাবে দোকানদারকেই বলেন, "বাবা, তুমিই হিসেব-টিসেব করে পয়সা গুনে রাখো। আমি অঙ্কে ভারী কাঁচা।"

আড়াই মাইল দূরে করালীবাবুর বাড়িতে রোজ অঙ্ক শেখার জন্য হেঁটে যাতায়াত করতে হবে জেনে বরুনের ভারী রাগ হচ্ছিল।

সেটা বুঝতে পেরেই বোধহয় বাবা বললেন, "কষ্ট না করলে মানুষ হওয়া যায় না। তোমরা বড় বেশী আদরে মানুষ হচ্ছ, তাই কোনো ব্যাপারেই তেমন গা নেই। রবীন্দ্রনাথ কত বড়লোকের ছেলে হয়েও চাকরদের মহলে মানুষ হয়েছেন। আমিও ঠিক করেছি, এবার থেকে তোমাদের আরাম আয়েস বিলাসিতা সব বন্ধ করে দেব। এখন থেকে অনেক কষ্ট করতে হবে তোমাদের। অঙ্ক শেখবার জন্য রোজ পাঁচ মাইল হাঁটা হল এক নম্বর কষ্ট। এর পর দু-নম্বর তিন-নম্বর আরো বহু কষ্ট আছে। তৈরি থেকো!"

বলে বাবা বেরিয়ে গেলেন।

বরুন অঙ্কে তেরো পাওয়ায় বাড়ির সবাই চুপচাপ, কেউ তার সঙ্গে বিশেষ কথা বলছে না। মা না, ছোট ভাই-বোন গুরুন আর বেলীও না। বেলীকে একবার পিঠ চুলকে দিতে বলেছিল বরুন। বেলী জবাব দেয়, "তোমার সঙ্গে বেশি মিশতে বাবা বারণ করেছে। তুমি দেয়ালে পিঠ ঘষে নাও, তাতেই চুলকোনো হবে।"

বরুন বুঝতে পারল বাড়ির লোক তাকে একঘরে করেছে।

পরীক্ষার পর ইস্কুল এখনো বসেনি। সারা দিনটা খুব ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে খুব বেশি মেলা-মেশা বারণ হয়ে গেছে। শুধু বিকেলে খেলাধুলো করার হুকুম আছে ঘণ্টা দেড়েকের জন্য। বরুনের তাই মেজাজ অসম্ভব খারাপ। বাড়িতে একমাত্র দাদুই তার সঙ্গে আগের মতো কথাবার্তা বলেন, ভালও বাসেন। কিন্তু দাদুর সঙ্গে বেশিক্ষণ সময় কাটানোর উপায় নেই। তিনি দিনরাত কবিরাজি ওষুধ তৈরি করতে ব্যস্ত। দাদু কবিরাজির ধাতব আর ভেষজ দুরকম চিকিৎসাই করেন। দিনরাত তিনি হীরেভস্ম, মুক্তা-ভস্ম, স্বর্ণসিন্দুর বানাচ্ছেন, মাঠে ঘাটে ঘুরে বেলগাছের মূল, কণ্টিকারি, থানকুনি, আরো কত কী পাতা তুলছেন। তারপর সেগুলো থেকে ওষুধ তৈরি করছেন। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার ওপর তাঁর ভারি রাগ। নিজের ছেলে ডাক্তার বলে তিনি পাত্তাও দেন না। সন্ধেবেলা তাঁর বাজারের দোকানঘরে যখন বুড়োদের আড্ডা বসে, তখন সকলের সামনেই তিনি বলেন, "ভেল্টু আবার ডাক্তার নাকি! এখনো নাড়ী দেখতেই শিখল না!"

বাড়িতে বরুন আজকাল বড় একা, অঙ্কে তেরো পেলে কী হয়, তা সে হাড়ে-হাড়ে বুঝছে আজকাল।

দুপুরবেলা বাড়িটা নিঝুম হয়ে গেছে। বাবা কল পেয়ে শহরের বাইরে গেছেন। মা গুরুন আর বেলী ঘুমোচ্ছে। দাদু আর শিবু চাকর উঠোনে হামানদিস্তায় শুকনো ভাঙপাতা গুঁড়ো করছে। তাদের বেজিটা ঘুর ঘুর করছে সেখানে।

বরুন তাদের পোষমানা পাখির খাঁচার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ময়নাটা বলে উঠল, "বরুন অঙ্কে তেরো পেয়েছে। বরুন অঙ্কে তেরো পেয়েছে। বরুন অঙ্কে—"

বরুন ভারী অবাক হয়ে যায়। পাখিটাকে এ-কথা কবে কে শেখাল? পাখিটা খুবই চালাক, দু-পাঁচবার শুনেই যে-কোনো কথা টপ করে শিখে নেয়। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কেউ ওকে এটা শিখিয়েছে বরুনকে জব্দ করার জন্য।

পুরোপুরি জব্দ হওয়ার অবশ্য বাকিও খুব একটা নেই। বরুনকে আজকাল তার নিজের ময়লা জামা প্যান্ট নিজেকেই কাচতে হয়। নিজের এঁটো থালা বাটি গেলাস নিজেকেই মাজতে হচ্ছে। তাছাড়া আছে নিজের জুতো বুরুশ করা, নিজের বিছানা পাতা এবং মশারি টাঙানো, পড়ার ঘর সকাল-বিকেল ঝাঁট দেওয়া। বাড়িতে ভাই বোন বা চাকর বাকর কাউকে কোনো কাজের ফরমাস করা তার বারণ। এসব অপমান তবু গায়ে লাগে না, কিন্তু পোষা পাখির মুখে তার অঙ্কে তেরো পাওয়ার স্লোগান শুনে সে সত্যিকারের রেগে গেল। কটমট করে চেয়ে রইল পাখিটার দিকে। তারপর কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে চুপচাপ বেরিয়ে পড়ল।

শীতের দুপুর। ভারী উষ্ণ কোমল রোদ। পাড়ার মাঠে ছেলেরা ব্যাটবল খেলছে।

বরুন আনমনে হাঁটতে হাঁটতে ছোট গঞ্জমতো শহর ছাড়িয়ে একেবারে গোসাঁই ডাকাতের বাগানে এসে পড়ল।

২

গোসাঁই ডাকাতের বাগান বা গোসাঁই-বাগান একটা বিশাল জঙ্গুলে জায়গা। জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা বাড়ি আছে, পুকুর আছে। আর আছে বুনো কুল আর বন-করমচার অজস্র গাছ। এরকম কুল আর কোথাও হয় না। দেখতে মটরদানার মতো ছোট, পাকলে ভারী মিষ্টি। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে এত সাপখোপ, বিছুটির গাছ আর কাঁটাঝোপ যে বুনো কুল খাওয়ার লোক জোটে না। পাখি-পক্ষীতেই খেয়ে যায়। যে গাছগুলো একটু নাগালের মধ্যে, সে গাছের ফল ধরতে না ধরতেই ছেলেরা দল বেঁধে এসে খেয়ে যায়। ঝোপজঙ্গলের মধ্যে বেশি কেউ যেতে পারে না বলে পুকুরের দক্ষিণ দিকটায় অবশ্য কুলগাছের কুল যেমন-কে-তেমন থাকে। মরশুম ফুরোলে ফল পড়ে মাটিতে আরো গাছ জন্মায়। জঙ্গল বাড়ে।

বরুনের মন খারাপ। আর মন খারাপ থাকলে কত কী কাণ্ড বাধাতে ইচ্ছে হয়। যেমন এখন তার ইচ্ছে হল যেমন করেই হোক ঐ দুর্গম জায়গায় গিয়ে খুব নিরিবিলিতে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকবে আর বুনো কুল খাবে। যদি সাপে কামড়ায় তাহলে না হয় মরবে। মরাই ভাল। যদি বিছুটি লাগে তো লাগুক। তার মনের মধ্যে যে অপমানের জ্বালা, তার চেয়ে বিছুটির জ্বালা আর এমন কী বেশি হবে।

বরুন মনের দুঃখে বনে ঢুকল। ঢুকেই বুঝতে পারল এই দুর্ভেদ্য জঙ্গল পার হয়ে বুনো কুলের কুঞ্জবনে পৌঁছনো অসম্ভব। কাঁটা বা বিছুটি গ্রাহ্য না হয় না-ই করল, কিন্তু এগোবার পথ চাই তো। যেদিক দিয়েই যেতে চেষ্টা করে, সেদিকেই ডালপালার রোগা-রোগা হাত বাড়িয়ে গাছ-গাছালি তার পথ আটকে ধরে।

একমাত্র উপায় হচ্ছে টারজানের মতো বড় গাছে উঠে এক গাছ থেকে ডাল ধরে ঝুলে খেয়ে অন্য গাছের ডাল ধরে এগিয়ে যাওয়া। যদি গাছ থেকে পড়ে যায় তো যাবে। সেটা এমন কিছু দুঃখের হবে না তার কাছে। বরং বাড়ির লোক ভাববে. আহা, বরুনকে আমরা কত কষ্ট দিয়েছি।

গাছ বাইতে বরুন ওস্তাদ। একটা শিরীষ গাছে সে বানরের মতো উঠে গেল। মাটির সঙ্গে সমান্তরাল একটা মোটা ডালের ওপর দিয়ে সে খানিক হেঁটে খানিক হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে পরের কদম গাছটার একটা ডাল ধরে ফেলল। মাটি থেকে প্রায় ত্রিশ হাত উঁচুতে। এগিয়ে যেতে তেমন কোনো বাধা হচ্ছিল না বরুনের। কেউ কোথাও নেই। শুধু শীতের কনকনে বাতাস বইছে। রোদের রঙে লালচে আভা। গাছ-গাছালিতে অজস্র পাখি আর পতঙ্গের ওড়াউড়ির শব্দ।

গাছের ডালের ঘষায় হাত-পায়ের নুনছাল উঠে গিয়ে জ্বালা করছে। একটা নিমগাছে বসে বরুন একটু জিরোলো। তারপর আবার ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। পরিশ্রমে এই শীতেও ঘাম হচ্ছে। যত এগোচ্ছে, তত গাছপালা ঘন হচ্ছে। একেবারে গায়ে গায়ে সব গাছ। একটার ডালপালা অন্যটার ডালপালায় ঢুকে গেছে। এখন আর এক গাছ থেকে অন্য গাছে যেতে কষ্ট নেই। এক-একটা গাছে হেঁটমুণ্ডু হয়ে বাদুড়েরা ঝুলে আছে। কাঠবেড়ালী ডুমুর খাচ্ছে বসে। নীচের জঙ্গলে খড়মড় শব্দ করে একটা শজারু চলে গেল। বহু পাখির বাসা পার হল বরুন। তার কোনোটাতে পাখির ডিম রয়েছে, কোনোটায় কুষি কুষি পাখির ছানা তাকে দেখে আতঙ্কে কিচমিচ করে ওঠে।

কুলগাছের কুঞ্জবনে পৌঁছতে বরুনের কষ্ট হল বটে, কিন্তু এ-কাজ যে সে ছাড়া আর কেউ কখনো করতে পারেনি. তা ভেবে খুব একটা বাহাদুরির ভাবও এল মনে। একটা সিসু গাছের গা বেয়ে সে নীচের নিস্তব্ধ, নির্জন অন্ধকার জায়গাটায় আস্তে-আস্তে নামতে থাকে। নামবার মুখে ধরবার মতো নিচু ডাল ছিল না বলে তাকে প্রায় দশ হাত উঁচু থেকে লাফ দিয়ে নামতে হল। তবে নীচে পচা পাতার স্তূপ জমে গদির মতো হয়ে আছে, তাই বরুনের ব্যথা লাগল না। ভুস করে পা দুটো ডেবে গেল শুধু, আর তলায় একটা কাঁটা বা কাচ যাই হোক তার পায়ে প্যাট করে বিঁধে গেল।

একটু ফাঁকায় এসে বরুন মাটিতে বসে পায়ের তলাটা দেখছিল। তেমন কিছু নয়, একটা শামুকের ভাঙা খোল বিঁধেছে। তবে এসবে অভ্যাস আছে তার। শামুকের টুকরোটা বের করে একমুঠো দুব্বো তুলে ঘষে রসটা লাগিয়ে দিল। এ ওষুধ তার দাদুর শেখানো। দুব্বোর রসে অনেক অসুখ সারে, অনেক বিষ নষ্ট হয়।

দাদু তাকে অনেক কিছু শেখায়। মানুষের শরীরে রোজ একরকমের বিষ তৈরী হচ্ছে, তাকে বলে টক্সিন। এই বিষ জমে-জমে শরীরে নানা রোগের সূচনা করে। মাছ-মাংস খেলে টক্সিনের পরিমাণ আরো বাড়ে। সেজন্য দাদু রোজ সকালে তাকে থানকুনি পাতার রস একটু আখের গুড় আর দুধ দিয়ে খাইয়ে অনেকখানি জল গিলিয়ে দেয়। তাতে টক্সিন জমতে পারে না শরীরে। দাদু মাছ-মাংস খাওয়ার ঘোর বিরোধী। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে দাদুর প্রায়ই তর্কবিতর্ক লেগে যায়। বাবা বলেন, প্রোটিনের জন্য মাছ-মাংস অতি প্রয়োজন। দাদু বলেন, পশুপাখির শরীরের কোষ আর মানুষের শরীরের কোষে অনেক গরমিল বাবা। ও খেলে খটামটি লাগবেই।

বরুন পায়ে ঘাসের রস লাগিয়ে উঠে দাঁড়াল। চারদিকে অসংখ্য গাছে মেঘের মতো ঘনিয়ে আছে থোকা-থোকা বুনো কুল, বন-করমচা। কয়েকটা চালতা গাছ থেকে পাকা চালতার গন্ধ আসছে। চারদিকে ডানার শব্দ তুলে পাখি উড়ছে, রঙিন পাখনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রজাপতি। ভেজা মাটি, ঠাণ্ডা ছায়া আর নিস্তব্ধতায় জায়গাটা ঘোর হয়ে আছে।

এক থোকা বুনো কুল তুলে একটা কুল মুখে পুরেছে মাত্র, অমনি বরুন দেখতে পেল, পুকুরের ওধারে লুঙ্গিপরা খালি-গায়ে একটা লোক তার দিকে স্থির চোখে চেয়ে আছে।

অবাক হওয়ার কথা। পুকুরের চার ধারেই গহিন জঙ্গল। এ-পুকুরের ধারেকাছেও কেউ আসতে পারে না। জল অব্যবহারে পচে সবুজ হয়ে আছে। কচুরিপানা হয়নি বটে, কিন্তু খুদে শ্যাওলায় জল ছেয়ে গেছে। ঘাট ভাঙা, পাড়ে জঙ্গল, চারদিকে কাঁটা আর বিছুটির ঘন বন। এ-জঙ্গলে কাঠ কুড়োতেও কেউ আসে না। তবে এ-লোকটা এল কোত্থেকে?

বরুনও তাকিয়ে ছিল। তার মনটা খারাপ। নইলে সে লোকটাকে দেখে চমকে যেত কিংবা ভয় পেত। কিন্তু মন এতই খারাপ যে, বরুন আর কোনো কিছুকে ভয় পাচ্ছে না। কিছুতেই তার কিছু যায় আসে না আর।

বরুন দেখল, লোকটা হঠাৎ পুকুরের ধার দিয়ে নেমে জলের ওপর পা রাখল। তারপর অনায়াসে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে জোর কদমে চলে আসতে লাগল এদিকে। জলের ওপর কেউ হাঁটতে পারে, এ বরুনের জানা ছিল না। দেখে সে অবাক। সায়েন্স তো এ-কথা মানে না। গ্র্যাভিটেশনের নিয়ম আছে, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আছে। তবে?

যাই হোক, লোকটা কিন্তু হেঁটে চলে এল এপাড়ে। পায়ের পাতাটাও ভেজেনি।

উঠে এসে লোকটা বড় বড় দাঁত বের করে হেসে বলল, "কী খোকা, ভয় পেয়েছ?"

বরুন একটু অবাক হয়ে বলে, "ভয়? না, ভয় পাব কেন?"

"পাওনি?" এবার লোকটাই অবাক।

"না, ভয় পাওয়ার কী আছে? আমি শুধু সায়েন্সের কথা ভাবছিলাম. মনে হল, সায়েন্স এখনো অনেক কথা জানে না।"

"তা বটে।" বলে লোকটা একটু হেসে লোকে যেমন টুপি খোলে ঠিক সেভাবে নিজের মাথাটা ঘাড় থেকে তুলে এনে হাতে নিয়ে একটু ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করল চাঁদির জায়গাটা. তারপর মুণ্ডুটা আবার যথাস্থানে লাগিয়ে বলল. "মাথায় খুব উকুন হয়েছে কিনা, তাই চুলকোচ্ছে।"

"ও।" বরুন বলে।

লোকটা বিরক্ত হয়ে বলে. "কী ব্যাপার তোমার বল তো! এবারও যে বড় ভয় পেলে না?"

বরুন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "আপনার মাথায় উকুন হয়েছে

আর চুলকোচ্ছে বলে আমার ভয় পাওয়ার কী?"

লোকটা রেগে গিয়ে বলে, "তুমি ভাবছ আমি তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছি?"

"তা ভাবব কেন?"

লোকটা কটমট করে খানিক বুরুনকে দেখে নিয়ে বলে, "ভাবছ ম্যাজিক করছি?"

"হতে পারে।"

লোকটা হঠাৎ ডান হাতটা ওপর দিকে তুলল। বুরুন দেখল, হাতটা লম্বা হয়ে একটা চালতা গাছের মগডালে চলে গেছে। পরমুহূর্তে একটা পাকা চালতা পেড়ে এনে লোকটা সেটা বুরুনের সামনে ফেলে দিয়ে বলল, "দেখলে?"

বুরুন বিরক্ত হয়ে বলে, "না দেখার কী? চোখের সামনেই তো পাড়লেন।"

লোকটা ধমকে উঠে বলে, "তবে ভয় পাচ্ছ না যে!"

"ভয় না পেলে কী করব?" এই বলে বুরুন থোকা থেকে কয়েকটা কুল ছিঁড়ে মুখে ফেলল।

লোকটা ভারী আঁশটে মুখ করে বলে, "লজ্জা করছে না কুল খেতে? চোখের সামনে জলজ্যান্ত আমাকে দেখতে পেয়েও নিশ্চিন্তমনে কুল খাওয়া হচ্ছে? আরো দেখবে? অ্যাঁ!"

বলে লোকটা হঠাৎ ডান হাত দিয়ে নিজের বাঁ হাতটা খুলে নিয়ে চারদিকে তলোয়ারের মতো ঘোরাতে লাগল। তারপর বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত খুলে নিল। দুটো পা দু হাতে খুলে নিয়ে দেখাল। তারপর একবার অদৃশ্য হয়ে ফের হাজির হল। তেরো-চৌদ্দ ফুট লম্বা হয়ে গেল, আবার হোমিওপ্যাথির **শিশির মতো ছোট্ট হয়ে গেল। এ-সব করে হাঁফাতে-হাঁফাতে** আবার আগের মতো হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "দেখলে?"

"হুঁ!"

"হুঁ মানে? **এ-সব দেখার পরও মূর্ছা যাচ্ছ না যে!** দৌড়ে পালাচ্ছ না যে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুল খেয়ে যাচ্ছ যে বড়! আমি কে জানো?"

"কে?"

"আমি **গোসাঁই ডাকাতের বড় স্যাঙাৎ নিধিরাম।** দুশো বছর ধরে এখানে আছি, বুঝলে দুশো বছর।"

"বুঝলাম।"

"**কী বুঝলে?**

বুরুন বিরক্ত হয়ে বলে, "এসব তো সোজা কথা। বোঝা-বুঝির কী আছে! আপনি দুশো বছর ধরে এখানে আছেন।"

লোকটা একটু গম্ভীর হয়ে বলে, "তুমি বাপু তলিয়ে বুঝছ না। দুশো বছর কি কোনো মানুষ বেঁচে থাকে বলো!"

"তা থাকে না।"

"তবে আমি আছি কী করে?"

"থাকলে আমি কী করব?"

লোকটা রেগে উঠে বলে, "তবু তুমি তলিয়ে বুঝছ না কিন্তু। আমি আসলে বেঁচে নেই।"

বরুন আর একটা কুল মুখে দিয়ে বলে, "তাতে আমার কী?"

"ওঃ, খুব চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলছ যে! ভূতকে ভয় পাও না, কেমনতরো বেয়াদব ছেলে হে তুমি!"

বরুন বলল, "ভয় লাগছে না যে।"

এই কথা শুনে লোকটার চোয়াড়ে মুখটা ভারী করুণ হয়ে গেল। অসহায়ভাবে ছলছলে চোখে চেয়ে রইল বরুনের দিকে। ফোঁত করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "একটুও ভয় লাগছে না?"

"না।"

নিধিরাম হাতের পিঠে চোখের জল মুছল বোধহয়। মনের দুঃখে তার নাকের ডগা কাঁপছিল। চোখ মুছে ধরা গলায় বলল, "তুমি আমাকে বড় মুশকিলে ফেললে দেখছি। এখন নিজেদের সমাজে আমি মুখ দেখাব কেমন করে বলো তো! গোসাঁই সর্দার শুনলে আমার গর্দান যাবে।"

বরুন একটা ফুঃ শব্দ করে বলে, "আপনার আবার গর্দান যাওয়ার ভয়! মুণ্ডুটা তো একটু আগে ফুটবলের মতো হাতে ধরে রেখেছিলেন।"

লোকটা দুঃখের সঙ্গে বলে, "আমাদের নিয়ম অন্যরকম। কেউ যদি কোনো দোষ করে, তাহলে গোসাঁইবাবা তার মুণ্ডু কেড়ে রেখে দেন। তোমরা বলো 'লজ্জায় মাথা কাটা গেল'; সে হল কথার কথা। আসলে তো আর মাথা কটা যায় না। কিন্তু আমাদের সত্যি-সত্যিই মাথা কাটা যায়। আমাদের সমাজে সে বড় লজ্জার ব্যাপার। তুমি কি একটু চেষ্টা করে দেখবে নাকি খোকা যদি একটু ভয়-টয় করতে পারো!"

বরুন বলল, "না, সে হওয়ার নয়। আজ আমার মনটা ভাল নেই। মেজাজ খারাপ থাকলে আমার ভয়ডর থাকে না।"

লোকটা খুব আশান্বিত হয়ে বলে, "কেন, কেন, তোমার মন খারাপ কেন বলো তো! আমি তোমার মন-মেজাজ ভাল করবার জন্য যা করতে বলবে তা-ই করব। কিন্তু কথা দিতে হবে যে, আমাকে একটু ভয় করবে।"

বরুন নিশ্বাস ছেড়ে বলল, "সে হওয়ার নয়। আমি অঙ্কে তেরো পেয়েছি।"

লোকটা এক গাল হেসে বলে, "এই কথা! তা আমি তোমাকে সব অঙ্ক শিখিয়ে দেব। নয়তো পরীক্ষার সময় অদৃশ্য হয়ে গিয়ে তোমার অঙ্ক কষে দিয়ে আসব। তাহলে এবার একটু ভয় খাও, অ্যাঁ! লক্ষ্মী সোনা ছেলে।"

বরুন আবার গুটি চারেক কুল মুখে দিয়ে বলে, "ভূতের

কাছে কেউ অঙ্ক শেখে? আমি আঁক শিখব করালী স্যারের কাছে।"

লোকটা খুব ভাবিত হয়ে বলে, "তাই তো! বড় বিপদ দেখছি। তোমার মন-মেজাজ ভাল করতে না-পারলে তো তুমি কিছুতেই ভয় পাবে না তাহলে। শোনো খোকা, আমি কিন্তু আরো কান্ড জানি। এক্ষুনি এমন মন্ত্র বলব যে শোঁ শোঁ করে ঝড় এসে যাবে, বিড়াবিড়িয়ে শিলাবৃষ্টি পড়বে, কিংবা চাও তো দিনের আলোয় ঘোর অমাবস্যার অন্ধকার নামিয়ে আনতে পারি। সেই অন্ধকারে কঙ্কাল আর কবন্ধরা চারিদিকে ধেই-ধেই করে নাচবে।"

বরুন অবহেলাভরে বলে, "যা খুশি করুন না, বারণ করছে কে?"

"তবু ভয় পাবে না?"

"না।"

লোকটা মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে চোখের জল মুছতে-মুছতে আপন মনে বলতে থাকে, "গোসাঁই-বাবা আমাকে নীচের পোস্টে নামিয়ে দেবে, মাথা কেড়ে রেখে দেবে, কেউ আমাকে আর ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে না।"

চারদিকে গাছ-গাছালি থেকে অশরীরীরা এতক্ষণ চুপ-চাপ কান্ডকারখানা দেখছিল। এবার সবাই সুর করে বলে উঠল, "নিধিরাম দুয়ো! নিধিরাম দুয়ো! নিধিরাম দুয়ো!"

বরুন ভারী বিরক্তি বোধ করে। এ জায়গাটাকে সে নিরিবিলি আর নির্জন বলে ভেবেছিল। এখন দেখল মোটেই তা নয়! চারদিকে খুব হতাশভাবে তাকিয়ে সে আবার একটা সিসুগাছে উঠে ডাল বেয়ে-বেয়ে ফিরে যেতে লাগল।

মেজাজটা আজ তার সত্যিই খারাপ।

৩

সন্ধের পর বরুনের দাদু রাম কবিরাজ তাঁর দোকান-ঘরে বসে আছেন। হাড়-কাঁপানো শীত পড়েছে এবার। সূর্য ডোবার পর আর রাস্তায় বড় একটা লোক-চলাচল নেই। বাজারও অর্ধেক বন্ধ। খদ্দেরের আনাগোনা খুবই কম। শুধু কবিরাজ মশাইয়ের দোকানে নিত্যকার আড্ডাধারীরা এসেছে।

আড্ডাধারীরা সবাই বুড়ো-সুড়ো মানুষ। গায়ে আলো-য়ান, মাথায় বাঁদুরে টুপি, গলায় কমফর্টার, পায়ে মোজা চাপিয়ে সব ঝুব্বুস হয়ে বসে আছেন। টেবিলের ওপর একটা লম্ফ জ্বলছে।

রাম কবিরাজ বললেন, "আমার নাতি বরুন এবার অঙ্কে তেরো পেয়েছে, জানো তো সবাই?"

সবাই একবাক্যে বলে ওঠে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব জানি।"

রামবাবু দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, "তা আর জানবে না! ছেলের বাপ যে সারা শহরে ঢোল সহরত করে সে-কথা লোককে জানিয়েছে। কিন্তু আমি বলি বাপু, অঙ্কে তেরো পেলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়। যারা বিদ্বান বুদ্ধি-মান, তাদের অবস্থা তো দেখছি। এই ধরো না কেন, আমার ছেলে ভেলু তো সোনার মেডেল পেয়ে পাশ করা ডাক্তার, নাম-ডাকও খুব। কিন্তু এখনো রুগির নাড়ী ধরে বলে দিতে পারবে না, রুগির পেটের ব্যামো না বুকের ব্যথা, রুগি রাগী না বেকুব।' সেসব বোঝা কি সোজা কথা! তবু গলায় নল ঝুলিয়ে হাতে ছুঁচ বাগিয়ে মানুষ মেরে বেড়াচ্ছে। আমি বলে দিচ্ছি, নাতিকে কবিরাজি শেখাব। অঙ্কে তেরো পেয়েছে তো কুছ পরোয়া নেই, অবিদ্যা শেখার চেয়ে মুখ্যু থাকা ভাল।"

সবাই সায় দিয়ে ওঠেন, "তা বটে! তা বটে!"

সায় না দিয়ে উপায়ও নেই। রাম কবিরাজকে সবাই ভয় পায়। ভারী সৎ, তেজী আর আদর্শবাদী লোক।

রাম কবিরাজ নাতির পক্ষ হয়ে আরো কী বলতে যাচ্ছি-লেন, ঠিক এই সময়ে রিটায়ার্ড সাবজজ ধীরেন চাটুজ্যে হাতে ছাতা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

ছাতা দেখে সবাই অবাক।

মহিমবাবু বলে উঠলেন, "ধীরেন যে আজ বড় ছত্রপতি সেজে এসেছ। বাইরে বৃষ্টি-বাদলা হচ্ছে নাকি?"

ধীরেনবাবু হাঁফ ছেড়ে বললেন, "আরে না। ছাতাটা একটা অস্ত্রবল।"

"অস্ত্রবল? কিসের অস্ত্রবল হে? অস্ত্রের কথা ওঠে কেন?"

"ওঠে, ওঠে।" বলে ধীরেনবাবু একটা ফাঁকা চেয়ারে বসে গলাবন্ধ কোটের ওপরের কয়েকটা বোতাম খুলতে-খুলতে বললেন, "দিনকাল ভাল নয় হে। এই গঞ্জে যে বাঘ বেরিয়েছে. সে-খবর রাখো?"

"বাঘ!"

"বাঘ!"

"বাঘ!"

সকলের একবাক্যে প্রশ্ন।

ধীরেনবাবু বললেন, "গল্প শুনেছিলাম, এক সাহেব ছাতা হাতে জঙ্গলের ধারে বেড়াতে গিয়ে বাঘের মুখোমুখি পড়ে যায়। বুদ্ধি করে তখন সাহেবটা বাঘের মুখের সামনে পটাং করে ছাতাটা খুলে ধরতেই বাঘ ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। তাই ছাতাটা নিয়ে বেরিয়েছি আজ।"

রাম কবিরাজ ধমক দিয়ে বললেন, "ধানাই-পানাই ছেড়ে আসল কথাটা বলবে তো! বলি বাঘ কোথায়?"

"আর বলো কেন! বিকেলের দিকে একটু হায়পাথার চা-বাগানের দিকে নিরালা মাঠের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম আজ। সঙ্গে নাতি। তা হঠাৎ নাতি বায়না ধরল, কুকুরের বাচ্চা নেবে। চেয়ে দেখি মাঠের মধ্যে চার-পাঁচটা কুকুরছানা খেলা করছে। নাতির বায়নায় অবশেষে কুকুরছানা ধরতে মাঠে নামতে হল। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি, ও বাবা! কুকুরছানা কোথায়! চার-পাঁচটা বাঘের বাচ্চা এ ওর গায়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে দিব্যি খেলছে!"

"ঠিক দেখেছ যে সেগুলো বাঘের বাচ্চা?"

ধীরেনবাবু দৃঢ় স্বরে বলেন, "একেবারে রায়বাঘা। চিতা বা গেছো বাঘ নয়, গায়ে-ডোরা-কাটা দক্ষিণ রায়। সেই দেখে তো আমি নাতিকে পাঁজাকোলে নিয়ে দে ছুট, দে ছুট। বাঘের বাচ্চা যখন দেখা গেছে, তখন মা-বাঘ বা বাবা-বাঘও কাছে-পিঠেই আছে। সবাই খুব সাবধানে থেকো হে!"

হেমবাবু উঠে জুতো পরতে পরতে বললেন, "আমি বরং রওনা দিই। দিগিন আমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসুক।"

বাকি সবাইও উশখুশ করতে থাকেন। উপেনবাবু আপন মনে 'রাম রাম' করছিলেন শুনে শশধরবাবু তাঁর ভুল ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "ও তো ভূতের মন্ত্র! বাঘ কি আর রাম-নাম শুনে পালায়?"

"তবে?" উপেনবাবু জিজ্ঞেস করেন।

রামবাবুর ভয়ডর নেই। নিশ্চিন্ত মনে বললেন. "তা বাঘের নামে ভয় পেলে চলবে কেন। উত্তরবাংলার এসব অঞ্চলে তো বাঘ বেরোবেই। গত বছরও বেরিয়েছিল। তবে শহরের মাঝখানে আসে না।"

সবাই বলে ওঠে, "তা বটে! তবে কিনা—"

আড্ডাধারীরা আজ আর বেশিক্ষণ বসলেন না। চক্ষু-লজ্জায় খানিকক্ষণ বসে থেকে সব দল বেঁধে উঠে পড়লেন। গেলেন না শুধু মন্মথবাবু।

রামবাবুর ভয়ডর নেই। সবাই চলে যাওয়ার পরেও নিশ্চিন্ত মনে বসে রইলেন। রুগি-টুগি বড়-একটা কবিরাজের কাছে আসতে চায় না। তারা মরতে-মরতে গিয়ে ভিড় করে তাঁর ছেলে ভেলুর চেম্বারে। তবু রাম কবিরাজ ধৈর্য ধরে বসে থাকেন। সত্তরের ওপর বয়স হল, তবু এখনো তিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভয়ংকর আশাবাদী।

মন্মথবাবুকে বসে থাকতে দেখে রাম কবিরাজ জিজ্ঞেস করেন, "তুমি গেলে না যে বড়!"

মন্মথবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, "আর যাওয়া! বাঘের ভয় করি না হে! এখন তার চেয়ে অনেক বড় বিপদ ঘনিয়ে আসছে।"

"কীরকম?"

"হাবু গুন্ডার কথা তোমার কি মনে আছে?"

কবিরাজ মশাই বললেন, "খুব আছে, খুব আছে। হাবুর মামলায় তুমি হাকিম ছিলে, আমি সাক্ষী দিয়েছিলাম। বারো-চোদ্দ বছর আগেকার কথা, মনে থাকবে না কেন?"

মন্মথবাবু আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আমি হাবুকে যাবজ্জীবন কয়েদের রায় দিয়েছিলাম।"

"তাও জানি। খুব ভাল কাজ করেছিলে। হাবুর মতো বদমাশ দুটো হয় না। কত যে খুন করেছে এ মহকুমায়, তার ঠিক নেই।"

মন্মথবাবু চিন্তিত সুরে বলেন, "সে ঠিক। কিন্তু জেল হওয়ার পর নাকি হাবু রোজ সকালে গীতা পাঠ করত, সন্ধ্যা আহ্নিক করত, একাদশী পূর্ণিমায় উপোস দিত। জেলখানায় তার চরিত্রের খুব সুনাম হয়, সবাই তাকে সাধুবাবা বলে ডাকত। এমন কী, পুলিস জেলার সবাই তাকে সম্মানও করতে শুরু করে।"

"সেও কানাঘুষোয় শুনেছি।"

মন্মথবাবু আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "কিন্তু সব ভাল যার শেষ ভাল।"

"তার মানে?"

"এই দেখ না!"

বলে মন্মথবাবু তাঁর চাদরের তলায় হাত দিয়ে পাঞ্জাবির বুক পকেট থেকে একটা খাম বের করে কবিরাজ-মশাইয়ের হাতে দিলেন।

রামবাবু ভ্রু কুঁচকে চিঠিটা পড়তে লাগলেন। "শ্রীশ্রী কালীমাতা সহায়। মাননীয় মহাশয়, পত্রে আমাদের নমস্কার জানিবেন। বিধিমতো আপনার বরাবর নিবেদন করিতেছি যে, আমাদের পরম মাননীয় হাবু ওস্তাদ আগামী দোলের আগের দিন খালাস পাইতেছেন। হাবু ওস্তাদের প্রতি আপনি যে নিষ্ঠুর সাজার বিধান দিয়াছিলেন তাহা আমরা ভুলি নাই। শ্রীশ্রী কালীমাতার নামে শপথ করিতেছি হাবু ওস্তাদ খালাস হইবার সাত দিনের মধ্যে আমরা চরম প্রতিশোধ লইব। প্রস্তুত থাকিবেন। ইতি হাবু ওস্তাদের ভক্তবৃন্দ।"

চিঠি পড়া শেষ করে কবিরাজ মশাই বলেন, "কবে পেলে চিঠিটা?"

"আজকের ডাকেই এল।"

রাম কবিরাজ একটু নিশ্চিন্তের হাসি হেসে বললেন, "ভয় পেয়েছ নাকি?"

মন্মথবাবু উদাস স্বরে বলেন, "ভয়ের আর কী! বুড়ো হয়েছি, এখন মরার ভয় বড় একটা নেই। তবে কিনা এ-লোক-গুলো তো ভাল নয়। এদের হাতে যদি অপঘাতে প্রাণ দিতে হয় তবে আর পরকালে গতি হবে না।"

রাম কবিরাজ হাঃ হাঃ করে ভরাট গলায় হেসে বললেন, "গতি হবে না তো হবে না, দুইজনে অপঘাতে মরে না হয় গিয়ে গোসাঁই বাগানে ভূত হয়ে থাকব আর দেদার আড্ডা মারব। গোসাঁইবাগান জায়গাও ভাল, ভারী নিরিবিলি, লোক চলাচল নেই, সেখানে গাছগাছড়াও প্রচুর। ভূতদের রোগ ভোগ সারাতে গাছ-গাছড়া তুলে ওষুধ বানাব মনের আনন্দে। প্র্যাকটিস ভালই জমবে। তুমিও গিয়ে হাকিমি করতে পারবে।"

যেই রাম কবিরাজ এ কথা বলেছেন, অমনি দোকানঘরের মধ্যে যেন ছোট্ট একটা ঘূর্ণি ঝড় খেলে গেল। শিশি-বোতল-গুলো নড়ে উঠল খটাখট করে।

রাম কবিরাজ একটু অবাক হয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলেন। মন্মথবাবুও সচকিত হয়ে বললেন, "ঝড় ছাড়ল নাকি?"

রামবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "আরে না। শীতকালে ঝড় আসবে কোত্থেকে? বোধ হয় উত্তুরে বাতাসের একটা ঝাপটা এল।"

মন্মথবাবু আরো খানিকক্ষণ বসে থেকে বলেন, "রাত হল হে! এবার উঠি।"

"বোসো। তামাক সাজি।"

মন্মথবাবু বসেন। রাম কবিরাজ উঠে দোকানঘরের পিছনে ছোট্ট কুঠুরিতে তামাক সাজতে বসেন। কলকে সাজিয়ে ফুঁ দিতে দিতে সামনের দোকানঘরে এসে গড়গড়ার মাথায় বসিয়ে নলটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "নাও হে!"

তারপর অবাক হয়ে দেখেন গড়গড়ার নল যার দিকে বাড়িয়ে ধরেছেন, সেই লোকটাই নেই!

"গেল কোথায় মন্মথ?" আপনমনে এই কথা বলে রাম কবিরাজ চেয়ারে বসে অন্যমনে তামাক খেতে লাগলেন। চারদিকটা খুব নিঃঝুম হয়ে এসেছে। বাজারের দোকানপাট সবই প্রায় ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে। ছোট গঞ্জ-শহরে এমনিতেই লোক কম, তার ওপর বেজায় শীতের রাত্রি। খামোখা-লোকে ঘরের বাইরে থাকতে চায় না।

রাম কবিরাজের অবশ্য শীত, বাঘ, ভূত—কাউকেই ভয় নেই। বুড়ো হলেও ভারী ডাকাবুকো লোক। বসে বসে রাম-বাবু হাবু গুন্ডার কথা ভাবছিলেন।

৪

রাম কবিরাজ হাবুর সবকিছুই জানেন। এই গঞ্জে তাকে শিশুবেলা থেকে বড় হতে দেখেছেন। দাসু রায়ের বড় আদরের একমাত্র ছেলে ছিল হাবু। বাবা-মার অত্যধিক আদর আর প্রশ্রয় পেয়ে অল্প বয়স থেকে বিগড়ে যায়। ইস্কুল পালিয়ে গোসাঁইবাগানে গিয়ে বখা ছেলেদের সঙ্গে বিড়ি ফুঁকত। তাই দেখে একদিন রামবাবু গিয়ে দাসু রায়কে বলেছিলেন, "ছেলেটার দিকে নজর দাও হে দাসু। বিড়ি ফুঁকতে শিখেছে যে!" দাসু কিন্তু পুত্রস্নেহে অন্ধ। খেঁকিয়ে উঠে বলল, "যাও, যাও, নিজের কাজ করো গে যাও। আমার ছেলে তেমন নয় মোটেই। লোকে হিংসে করে যা-তা রটিয়ে বেড়াচ্ছে।"

একমাত্র ছেলে বলে হাবুর কোনো অভাব রাখত না দাসু। মাসে মাসে ঐটুকু ছেলেকে দশ-পনেরো টাকা করে হাতখরচ পর্যন্ত দিত। সেই টাকা পেয়ে হাবু আরো বিগড়োতে থাকে। ঘুড়ি, লাটাই, লাট্টু, লজেঞ্চস দেদার কিনেও টাকা ফুরোত না। প্রায়ই বখাটে বন্ধুদের সঙ্গে ফিস্টি করত, যাত্রা-সিনেমা দেখে বেড়াত। খুব ফুর্তিবাজ হয়ে গেল অল্প বয়সেই, ক্লাসের পরীক্ষায় গোল্লা পেয়ে বাসায় ফিরে কাঁদতে বসত। সেটা অবশ্য

মায়াকান্না। ছেলের চোখে জল দেখে তার বাবা-মা এসে হাবুকে পারলে কোলে তুলে সান্ত্বনা দেয়। দাসু বলে বেড়াত, "আমার ছেলের মতো বুদ্ধিমান ছেলে দুটো নেই। কিন্তু পড়তে বসলেই তার চোখ ব্যথা করে। ভাবছি চোখের ডাক্তার দেখাব। সামনের বছর হাবু ক্লাসে ফার্স্ট হবে।"

দাসু যে খুব বাড়িয়ে বলত তা নয়, বাস্তবিক হাবু খুবই বুদ্ধিমান ছেলে ছিল। বখাটে হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সে স্কুলে ফার্স্টও হয়েছে।

যাই হোক, হাবুর যখন মোটে চোদ্দ বছর বয়স তখন সে বাপের সিন্দুক থেকে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা আর মায়ের গয়না চুরি করে উধাও হয়ে যায়। সেই শোকে দাসু আর বেশি দিন বাঁচল না, হাবুর মাও বছর দুই বাদে চোখ ওল্টায়। তার বেশ কয়েক বছর পর একদল ষণ্ডা-গুণ্ডা চেহারার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে হাবু এসে গোসাঁই-বাগানে থানা গাড়ল। তার তখন পেল্লায় চেহারা হয়েছে, চোখদুটি সব সময় রক্তবর্ণ, কাউকে গ্রাহ্য করে না। একে মারে, তাকে ধরে, তারটা কেড়ে নেয়। তারপর গঞ্জে এবং আশপাশের এলাকায় খুব চুরি-ডাকাতি আর খুন-খারাবি শুরু হয়ে গেল। সে এক দুঃস্বপ্ন। কোনো লোক নিশ্চিন্তে রাস্তায় বেরোতে পারে না। সন্ধের পর রাস্তাঘাট নিঃঝুম হয়ে যায়। বাড়িতে থেকেও লোকের প্রাণ ধুকপুক করত।

হাবু নাকি মেলা মন্ত্রতন্ত্র শিখে এসেছে। গোসাঁই-বাগানের কুঠিবাড়িতে সে নানারকম সাধনা করে বলে গুজব রটে গেল। অনেকের মুখে রাম কবিরাজ শুনেছেন যে, সন্ধেবেলা হাবুকে নাকি কখনো একটা প্রকাণ্ড বাঘের পিঠে চড়ে বেড়াতে দেখা গেছে। একজন বলল, সে স্বচক্ষে হাবুকে উড়ে বেড়াতে দেখেছে।

তখন গঞ্জের দারোগা ছিলেন নিশিকান্ত। নিশি দারোগা এক সময়ে খুব দাপটের লোক ছিলেন। কিন্তু তখন তাঁর বয়স হয়েছে, রিটায়ার করতে যাচ্ছেন, তাই তিনি আর বেশি ঝুট ঝামেলায় যেতেন না। হাবুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েও লোকে ভয়ে থানায় গিয়ে নালিশও করত না। সে সময়ে রাম কবিরাজই উদ্যোগী হয়ে গিয়ে নিশি দারোগাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হাবুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে রাজি করিয়েছিলেন।

দিন দুইতিন পরে নিশি দারোগা একদিন রামবাবুর দোকানে এসে হ্যাট খুলে হাঁফ ছেড়ে বললেন, "ওঃ মশাই, কী লোককেই ধরতে পাঠিয়েছিলেন! নাজেহাল করে ছেড়েছে।"

"কী রকম?" বলে রাম কবিরাজ নড়ে বসলেন।

"আর বলবেন না। গোসাঁই-বাগানে গিয়ে পুরো বাড়িটা ঘেরাও করে রেইড করেছিলাম। তখন হাবু আর দলবল বাড়ির ভিতরেই ছিল। কিন্তু বাড়িতে ঢুকে দেখলাম সব ভোঁ ভাঁ, কেউ কোথাও নেই।"

"সে কী?"

"তবে আর বলছি কী? চোখের সামনে অতগুলো লোক একেবারে গায়েব হয়ে গেল মশাই! বাইরে থেকে জানালা দিয়ে স্বচক্ষে দেখেছি, হাবুকে ঘিরে দশ-বারোটা লোক বসে গাঁজা টানছে। ভাল করে বাড়িটা ঘিরে বাঁশি ফুঁকে রিভলবার-বন্দুক বাগিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে চেঁচিয়ে বললাম, হাবু, সারেন্ডার কর শিগগির! কিন্তু কাকে বলা? ঘরে হাবু আর তার স্যাঙাতদের চিহ্নও নেই। গুপ্ত কুঠুরি বা সুড়ঙ্গ আছে কিনা অনেক খুঁজে দেখলাম, কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। একেবারে তাজ্জব ব্যাপার।"

শুনে রাম কবিরাজ ঘন-ঘন তামাকের নলে টান দিয়েছিলেন সেদিন। কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল।

সেই থেকে হাবু গুণ্ডার নামে সম্ভব-অসম্ভব আরো সব গুজব রটতে লাগল। হাবু নাকি ভূত পোষে, মন্ত্রের জোরে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, যে-কোনো মানুষকে চোখের দৃষ্টি দিয়ে হাওয়া করে দিতে পারে। হাবুর ভয়ে তখন সবাই থর-হরি কম্প।

রাম কবিরাজ মন্ত্র-তন্ত্র বা ভূতপ্রেত মানেন। কিন্তু এসব বুজরুকিতে তাঁর বিশ্বাস নেই। তিনি জানেন, খারাপ লোক যতই মন্ত্রতন্ত্র জানুক আর যতই ক্ষমতাবান হোক, শুভ-বোধ এবং মংগলের দ্বারা তাদের পতন ঘটবেই।

সেই থেকে রাম কবিরাজ নানা মতলব ভেঁজেছেন। হাবু অবশ্য রাম কবিরাজের এসব মতলব টের পায়নি। পেলে এসে হামলা করত।

নিশি দারোগা রিটায়ার করে চলে গেলে সে জায়গায় এক অল্পবয়সী এবং খুব তেজী দারোগা এল। তার নাম অয়স্কান্ত। মহা কাজের মানুষ।

সে গঞ্জে পা দিয়েই হাবু গুণ্ডার কথা শুনেছে। হাবু তখন সদ্য হরিহরপুরের জমিদারবাড়ি লুট, একটা ব্যাংক ডাকাতি আর দুটো বড় ধরনের চুরি করেছে। তাছাড়া খুন-জখম তো ছিলই! কিন্তু কেউ তার নামে নালিশ করতে যায় না ভয়ে। তার ওপর হাবুর বদনাম হওয়ার বদলে তার বেশ সুনামই হচ্ছিল। তার অলৌকিক ক্ষমতা, তার সাহস আর তার নামে প্রচলিত নানা গালগল্প শুনে অনেকেই হাবুকে মনে-মনে পুজো করত। বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেরা তখন নিজেদের মধ্যে 'হাবু-হাবু' খেলে। একটু বড় বয়সের ছেলে-ছোকরারা অনেকেই তখন হাবুর দলে ভিড়বার জন্য গোসাঁই-বাগানের কাছে গিয়ে ঘুরঘুর করে।

রাম কবিরাজ এবং তাঁর মতো আর যাঁরা সৎ আর স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন, তাঁরা দেখলেন, সমূহ সর্বনাশ, এরপর হাবুর খ্যাতি এত বেড়ে যাবে যে, পুলিসও তাকে ধরতে সাহস করবে না। অধর্মেরই জয় হয়ে যাবে। হাবুরও অহংকার আর বেয়াদপি খুব বেড়ে গেছে। সে রাজা-বাদশার মতো চলাফেরা করে। রাস্তার লোক তাকে দেখলে পথ ছেড়ে দাঁড়ায়, বাজার হাটে লোকে তাকে নমস্কার করে, একটু কথা বলতে পারলে বর্তে যায়।

অয়স্কান্তও কিন্তু খুব অহংকারী লোক। সে জানত মফস্বল শহরে দারোগার ওপর আর কেউ নেই। সবাই বরাবর দারোগাকেই খাতির করে এসেছে। তাই হাবুর এত খাতির অয়স্কান্ত সহ্য করবে কেন? ব্যাপারটা তার খুব সম্মানে ঘা দিল।

তা অয়স্কান্ত যখন হাবুকে জব্দ করার নানারকম ফন্দি-ফিকির আঁটছে, তখন একদিন এক অবাক কাণ্ড।

অয়স্কান্ত সন্ধেবেলায় তার কোয়ার্টারের বারান্দায় একা বসে-বসে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না দেখছে। এমন সময় রাস্তা থেকে ডোরাকাটা এক প্রকাণ্ড বাঘ হেলতে-দুলতে ফটক পেরিয়ে সোজা উঠে এল। বাঘের পিঠে হাবু।

অয়স্কান্ত যদিও সাহসী লোক কিন্তু সেই দৃশ্য দেখে তারও প্রাণ উড়ু-উড়ু।

হাবুর বাঘ দুর্গন্ধ ছাড়তে ছাড়তে এসে নোংরা মুখে অয়স্কান্তর গা শুঁকল, গাল চেটে দিল। গর-গর করে আদর জানাল।

হাবু অয়স্কান্তকে বলল, "দ্যাখো দারোগাবাবু, আমার সঙ্গে টক্কর দিতে চাইলে কিন্তু জান কবুল করে কাজে নামতে হবে। এ তো কেবল বাঘ দেখছ, আমার হাতিকে তো এখনো দেখনি! তাছাড়া আর যারা আছে তারা আরো ভয়ের সামগ্রী। কাঁচাখেগো অপদেবতা সব। চাকরি করতে এসেছ, চোখ বুজে

চাকরি করে যাবে। মাস-মাইনে পেয়ে খাবে-দাবে ফর্তি করবে, কেউ কিছু বলবে না। যদি কাজ দেখাতে চাও তবে কিন্তু বিপদের জন্য তৈরি থেকো।"

ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট বাঘটার গায়ের ডোরা দেখা যাচ্ছে। বিটকেল গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। শ্বাস গায়ে পড়ছে। অয়স্কান্তর নিজের চোখে দেখা, হাত দিয়ে ছোঁয়া ব্যাপার। কোনো ভুল নেই।

অয়স্কান্ত কথা বলতে গেল, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। নড়তে গিয়ে দেখে হাত পা আড়ষ্ট।

হাবু মুচকি হেসে বাঘটাকে সরিয়ে নিয়ে বলল, "আমি হলাম এ-তল্লাটের রাজা বলো রাজা, সর্দার বলো সর্দার, ভগবান বলো ভগবান। সবাই আমাকে একবাক্যে মানে। এরপর থেকে তুমিও মেনো।"

সেই রাতেই অয়স্কান্ত উদভ্রান্তের মতো এসে রাম কবিরাজের কাছে হাজির। বলে, "কবিরাজ মশাই, হাবু মানুষ নয়!"

সব শুনে রাম কবিরাজ ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলেন. তারপর একটা খুব বলকারক পাঁচন অয়স্কান্তকে খাইয়ে দিয়ে বললেন, "তুমি আগে একটু ধাতস্থ হও, তারপর অন্য কথা হবে।"

রাম কবিরাজ এমন সব আশ্চর্য পাঁচন তৈরি করতে পারেন যা খেলে মানুষকে মানুষ পর্যন্ত পাল্টে যায়। রাম কবিরাজের সেই পাঁচন খেয়ে অয়স্কান্তর ভোম্বল-ভোম্বল ভাবটা ঘণ্টা-খানেক পর কেটে গেল। তবু সে বলতে লাগল, "না কবিরাজ-মশাই, মিরাকলের সঙ্গে লাগতে যাওয়া ঠিক নয়। মানুষ যত পাজি বদমাশ হোক, তাকে ঢিট করতে ভয় পাই না। কিন্তু হাবু তো ঠিক মানুষ নয়।"

তা তা-ই হল। অয়স্কান্ত বদলি নিয়ে চলে গেল। এল আর-এক তেজী দারোগা গদাধর।

গদাধর খুবই মজবুত চেহারার মানুষ। এক সময়ে নাম-করা কুস্তিগীর ছিল। বয়সও বেশি নয়। তার আবার একটা বিশাল জার্মান শেফার্ড কুকুর ছিল।

গদাধর আসবার পরই গঞ্জের লোক বলাবলি করতে লাগল, হাবুর বাঘের জন্য নতুন পাঁঠার আমদানি হয়েছে। ছেলেরা ছড়া কাটতে লাগল, "গদাই দারোগা, হয়ে যাবে রোগা।"

গদাধরের কানে সবই গেল। হাবুর গুণকীর্তির কথাও সে এখানে আসবার আগেই শুনে এসেছে। গঞ্জে পা দিয়ে সে খুব বেশি কেরদানি দেখানোর চেষ্টা করল না।

রাম কবিরাজের কাছে একদিন গভীর রাতে চুপি-চুপি এসে গদাই দারোগা বলল, "আমি আপনার কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা জানতে চাই।"

রামবাবু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "জেনে লাভ কী? কেউ কিছু করতে পারবে না। অনেকেই গঞ্জের বাস উঠিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে।"

তখন গঞ্জে আবার নতুন নিয়ম চালু করেছে হাবু। তার বাঘের খোরাকি বাবদ প্রতিদিন একজন করে গৃহস্থকে পাঁঠা, ছাগল বা কুকুর দিতে হয়। বাঘেরা নাকি কুকুরের মাংস খেতে খুব ভালবাসে। সেজন্য গঞ্জে যত রাস্তার কুকুর ছিল সব লোপাট হয়ে গেছে প্রায়। ওদিকে গোসাঁই-বাগানে মিস্তিরি লাগিয়ে হাবুর জন্য প্রাসাদ তৈরি হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ হাবুর তখন ভরভরন্ত অবস্থা।

গদাই দারোগা বলে, "আমি যে খুব কাজের লোক তা বলছি না। তবে সাবধানী লোক। সব শুনে টুনে তারপর যদি কিছু করা যায় তো দেখব। আমাকে স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে পাঠানো হয়েছে এখানে।"

রাম কবিরাজ খুব আশ্বস্ত হলেন না। তবু সবই খোলসা করে বললেন। আর সাবধান করে দিলেন এই বলে, "দেখুন, এখানকার লোকজন কিন্তু সবাই হাবুর পক্ষে, কাজেই বিপদে পড়লে তারা আপনাকে সাহায্য করবে না।"

গদাই হেসে বলল, "বেশি লোকের সাহায্য চাই না। আপনার মতো দু-একটা পাকা মাথার লোক সাহায্য করলেই আমার হবে।"

রাম কবিরাজ বুঝলেন, গদাই দারোগা কুস্তিগির ছিল বটে, কিন্তু তাতে বুদ্ধিটা নষ্ট হয়নি।

যাই হোক, দু একদিনের মধ্যেই হাবু গদাই দারোগার পিছনে লাগল। একদিন সকালে দেখা গেল, গদাইয়ের অতি আদরের কুকুরটা লোপাট। খোঁজ খোঁজ! অবশেষে কুকুরটার মখমলের মতো গায়ের চামড়াটা পাওয়া গেল গোসাঁই-বাগানের কাছে একটা জামগাছের তলায়।

গদাই দিন তিনেক ভাত করে খেল না, ঘুমোল না।

রাম কবিরাজ তাঁকেও একটা ভাল পাঁচন তৈরি করে পাঠিয়ে দিলেন।

গদাই দারোগার কুকুরটাকে মেরে হাবু চালে ভুল করেছিল। কুকুরটা ছিল গদাইয়ের প্রাণ। সেই কুকুরের মৃত্যুতে গদাই দারোগা হয়ে উঠল গদাই বিভীষিকা।

অবশ্য কয়েকজন জানে, গদাই দারোগার সেই মারমুখো মেজাজের পিছনে কবিরাজ মশাইয়ের আশ্চর্য পাঁচনের কাজও আছে। রাম কবিরাজ এমন এক দুর্লভ গাছ-গাছড়ার পাঁচন তৈরি করে গদাধরকে খাইয়েছিলেন যে, তাতে মানুষের শরীরে যেমন দুনো বল হয় তেমনি তার মেজাজও হয়ে ওঠে টংকার।
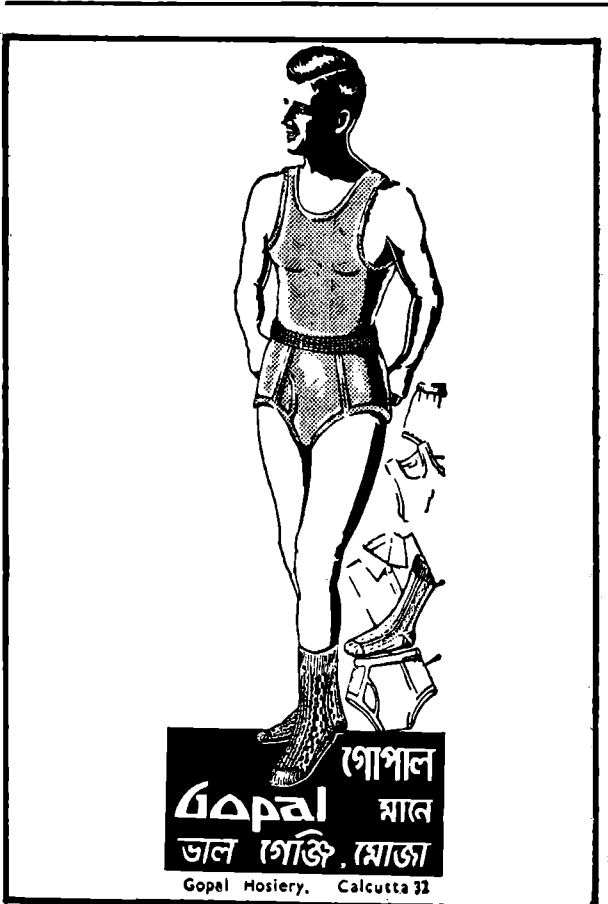
আবার গায়ের জোর আর বদমেজাজ হলেই হয় না, ঠাণ্ডা মাথায় কূটবুদ্ধিও খেলাতে হয়, নইলে হাবুর মতো ধুরন্ধরকে জব্দ করা সোজা নয়। তাই কবিরাজ মশাই আবার পাঁচনে এমন জিনিসও দিয়েছিলেন যে তাতে মাথা ঠাণ্ডা থাকে, বুদ্ধির হাওয়া-বাতাস মাথায় খেলে।

কাণ্ডটা কী হয়েছিল কেউ ভাল জানে না, তবে হঠাৎ একদিন শোনা গেল যে, হাবুর পোষা বাঘটাকে পাওয়া যাচ্ছে না, চারদিকে খোঁজ খোঁজ। অবশেষে একদিন দেখা গেল থানার হাতায় গদাই দারোগার কোয়ার্টারের বাগানের বেড়ায় বাঘের চামড়াটা রোদে শুকোচ্ছে।

এই ঘটনায় গঞ্জে হৈ-রৈ পড়ে গেল। সবাই ভেবে নিল, হাবুর বাঘ যখন মরেছে, তখন গদাইয়ের আর রক্ষে নেই। তার মুণ্ডু কেটে নিয়ে শিগগিরই হাবু গেণ্ডুয়া খেলবে।

বাঘ গুম হওয়ার সময়ে হাবু গঞ্জে ছিল না। বাইরে কোথাও ডাকাতি বা লুটপাট করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে সব শুনে দুদিন গুম হয়ে রইল।

তারপর একদিন সোজা গিয়ে গদাইয়ের বাসায় হানা দিয়ে গদাইকে বলল, "তুমি মরলে কে কে কাঁদবে বলো তো?"

গদাই বিনীতভাবে বলে, "কেউ কাঁদবে না। কারণ, আমি মরব না।"

"বটে!" বলে হাবু খানিক অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বলল, "মরবে না কেন বল তো! তোমার কি কর্ণের মতো কবচ-কুণ্ডল আছে নাকি?"

"আমার নেই। তবে শুনেছি নাকি আপনার আছে। লোকে বলে আপনি নাকি মেলা ম্যাজিক জানেন।"

হাবু একটা শ্বাস ফেলে বলল, "বাপু তোমার ভালর জন্যই বলছিলাম, যদি আত্মীয়স্বজন থেকে থাকে তবে বরং ছুটি নিয়ে গিয়ে তাদের দেখে এসো গে। শেষ দেখা।"

"তার দরকার নেই।"

হাবু হেসে বলল, "দারোগা, তোমার বড্ড বাড় হয়েছে হে। সে যাকগে, বাঘটা মারলে কী করে বল তো?"

গদাই হাই তুলে বলল, "বাঘ আমি অনেক মেরেছি। তবে আপনার বাঘকে আমি মেরেছি একথা কে বলল?"

"মারোনি?"

"তা বলছি না। বলছি, আমিই যে মেরেছি তার প্রমাণ কী?"

"তবে কি বলতে চাও আমার বাঘটা জঙ্গলে পালিয়ে গেছে? আর যাওয়ার সময় তোমাকে ভালবেসে নিজের গায়ের চামড়াটা খুলে দিয়ে গেছে?"

গদাই উদাসভাবে বলল, "তাও হতে পারে।"

হাবু তখন গম্ভীর হয়ে বলে, "তাহলে খুব ভাল কথা। আমি আমার সেই চামড়া ছাড়ানো বাঘকে আবার জঙ্গল থেকে ধরে আনব। আর এলে তার গায়ে তোমার শরীরের চামড়াটা খুলে নিয়ে পরিয়ে দেব। তৈরি থেকো।"

গঞ্জের সকলেরই বিশ্বাস হাবু যা বলে তাই করে। সুতরাং শিগগিরই গদাই দারোগার চামড়া পরানো বাঘকে এই অঞ্চলে দেখা যাবে এই আশায় সবাই চোখ-কান খোলা রেখে অপেক্ষা করতে লাগল।

এক রাতে বিকট শব্দ শোনা গেল—ঘ্যা-ড়-ড়-ড়াম্। সেই শব্দে মাটি কেঁপে ওঠে, বাড়ি-ঘরের দরজা জানালা নড়ে যায়

আর-মানুষের প্রাণপাখি ধুকপুক করতে থাকে। এরকম বিকট বাঘের ডাক কেউ কখনো শোনেনি। তবে কি সত্যিই হাবুর চামড়া-ছাড়ানো বাঘটা ফিরে এল নাকি?

ওদিকে গোসাঁই-বাগানের পোড়ো বাড়িতে হাবু আর তার স্যাঙাতরাও চমকে উঠে বসেছে। কান পেতে শুনছে সবাই। বাঘটা খুব কাছ থেকে ডাকল যেন!

প্রথম রাতে বাঘটা সেই একবারই ডেকেছিল।

তারপর ডাকল আর এক রাতে। হাবু সেদিন ময়নাগুড়ির তামাকের কারবারী ঘনশ্যাম বাজোরিয়ার গদিতে চিঠি দিয়ে এসেছিল, একশটি গিনি আর নগদ বিশ হাজার টাকা গোসাঁই-বাগানের তেঁতুলতলায় রাত বারোটার পর পেঁৗছে দিতে হবে। এ-ব্যাপারে কেউ কোনো আপত্তি করে না। অনেকে তো খুশি হয়েই হাবু যা চায় তা দিয়ে দেয়। কারো কারো ধারণা হাবুকে দিলে পুণ্য হয়। ঘনশ্যামজী অবশ্য সেই দলের লোক নন। একশ গিনি আর বিশ হাজার টাকা তো কম কথা নয়! তবু উপায়ান্তর নেই বলে তিনি রাত বারোটা নাগাদ একটা পুরনো গাড়িতে চড়ে ড্রাইভার আর একটা চাকরসহ তেঁতুলতলায় এসে অন্ধকারে অপেক্ষা করছেন। প্রচণ্ড শীত, মশা আর ভয়।

রাত বারোটা বেজে পাঁচ মিনিটের সময় গহিন অন্ধকার থেকে একটা কালো মূর্তি এগিয়ে এল। ঘনশ্যামজী কাঁপতে কাঁপতে মূর্তির হাতে গিনি আর টাকার বাক্স তুলে দিলেন। ঠিক সেই সময়ে খুব কাছ থেকে সেই বিকট বাঘের ডাক শোনা গেল—ঘ্যা-ড়-ড়-ড়-ড়াম্।

ঘনশ্যামজী মূর্ছা গেলেন। চাকর আর ড্রাইভার পালাল। আর অন্ধকারের মধ্যে হাবু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে ভিতু মানুষ নয়, তার ওপর অনেক ক্ষমতাও সে রাখে। তবু একেবারে কানের কাছে ঐ বুক-কাঁপানো ডাক শুনে কয়েক মুহূর্ত বুঝি তার ধন্দ লেগেছিল।

তারপরই টর্চ জ্বেলে সে অবাক হয়ে দেখে, একটা কাঁটা-ঝোপের আড়ালে প্রকাণ্ড একটা বাঘের গায়ের ডোরা দেখা যাচ্ছে। আর সেই বাঘের পিঠে একটা মানুষ না? কী আশ্চর্য! বাঘের পিঠে বসে আছে স্বয়ং গদাধর দারোগা!

বাঘটা আর একবার ডেকে উঠল সেই সময়ে। অবাক ও বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হাবুর হাত থেকে টর্চবাতি পড়ে গেল। সেই অন্ধকারে বাঘের পিঠে চেপে গদাধর যে কোন্‌-দিকে চলে গেল তা আর ঠাহর পেল না হাবু।

সেই থেকে হাবুর হাঁকডাক যেন একটু কমল। আর আগের মতো বুক চিতিয়ে চলল না কয়েকদিন। সেই রাতের ঘটনার দুই দিন পর এক সকালে গদাইয়ের আস্তানায় গিয়ে হাজির হয়ে বলল, "কায়দা-টায়দা সবই শিখে গেছ দেখছি!"

গদাই গম্ভীর স্বরে বলল, "আপনিই শিখিয়েছেন।"

হাবু তেমন কিছু বলল না। কেবল 'আচ্ছা দেখা যাবে' গোছের কী একটু অস্পষ্ট স্বরে বলে কেটে পড়ল। সে আর গদাই দারোগার চামড়া ছাড়ানোর কথা বলত না।

এদিকে গদাই রোজ রাম কবিরাজের কাছে যায়। কবিরাজ মশাই তাকে নিয়ম করে নানা অনুপান দিয়ে হরেকরকম পাঁচন খাওয়ান। তাতে গদাইয়ের জোর বাড়ে, বুদ্ধি বাড়ে, মাথা ঠাণ্ডা হয়, সাহস আসে। একদিন রাম কবিরাজ বলেই ফেল-লেন, "বুঝলে বাবা গদাই, হাবু মনে হয় এবার এ-জায়গা ছেড়ে শটকাবার তালে আছে। যদি শটকে পড়ে তাহলে কিন্তু ওকে আর শিক্ষা দিতে পারবে না। এইবার মোক্ষম ঘা দাও।"

কথাটা মিথ্যে নয়। কদিন হল হাবুর মনে হচ্ছে, এ জায়গায় যথেষ্ট রোজগার করা হয়েছে। তাছাড়া গদাই দারোগা লোকটাও তেমন সুবিধের ঠেকছে না। অন্য পাঁচটা

দারোগা যেমন ভয় পেত এ তেমন পায় না। নতুন জায়গায় গেলে রোজগারেরও সুবিধে আর ভাবনাচিন্তাও কম করতে হবে। এই ভেবে সে স্যাঙাতদের তৈরি থাকতে হুকুম দিল। বলল, "এ জায়গাটা বড় গরম আর শুকনো হয়ে গেছে রে! তৈরি থাকিস সব, হুট করে একদিন গাঁটরি বাঁধতে হবে।"

চলে যাওয়ার আগে হাবু সবচেয়ে মোটা দাঁও মেরে যাওয়ার লোভে সতেরোটা চা বাগানের মালিক টমসন সাহেবের বাচ্চা ছেলেকে চুরি করে লুকিয়ে রাখল। সাহেবকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিল, "এক লক্ষ টাকা আগামী অমাবস্যার রাতে আপনার বাড়ির পিছন দিকের বাগানে ঝুমকো জবাগাছের নীচে একটা পাথর চাপা দিয়ে রেখে দেবেন। নয়তো রাত ভোর হওয়ার আগেই মা কালীর সামনে বলি হিসেবে আপনার ছেলেকে উৎসর্গ করা হবে।"

সাহেবরা সহজে ভয় খায় না বটে কিন্তু টমসন সাহেবের ব্যাপারটা অন্যরকম। মাত্র একবছর আগে তাঁর বউ মারা গেছে। মা-হারা তিনটি সন্তানের জন্য তাঁর গভীর মায়া ছিল। তাই ছেলে চুরি যাওয়ার পর রেগে আগুন হয়েও তিনি খুব শক্ত হতে পারলেন না।

কী হয়েছিল তা সবাই সঠিক জানে না। তবে টমসন সাহেবের বাগানে জবাগাছের নীচে এক লক্ষ টাকা রাখা ছিল এবং যথাসময়ে হাবুর কোনো চেলা এসে সেটা নিয়েও যায়।

লোকে আবার অন্য কথাও বলে। বলে যে, হাবুর চেলা এসেছিল ঠিকই, তবে সে আর ফিরে যায়নি, গদাই তাকে হাত পা বেঁধে চালান করে দিয়ে নিজেই সেই চেলা সেজে হাবুর আস্তানায় গিয়ে ঢুকেছিল।

তারপর এক তুলকালাম কাণ্ড। মুহুর্মুহু বাঘের ডাক, বন্দুকের আওয়াজ, চিৎকার। সব লোক জেগে শুনছে।

পরদিন চাউর হয়ে গেল, হাবু বমাল ধরা পড়েছে। ধরা পড়ার আগে সে নাকি খুব এক হাত লড়েছিল গদাইয়ের সঙ্গে। হয়তো বা অন্য সময় হলে সে গদাইকে গদার মতো ঘুরিয়ে আছাড় দিত। কিন্তু রাম কবিরাজের পাঁচন খেয়ে-খেয়ে তখন গদাইয়ের তেজই আলাদা।

৫

করালী স্যারের অংকের ক্লাস। ছাত্ররা এখন আর অঙ্ককে অংক বলে না, বলে ভয়াংক। ভয় আর অংক সন্ধি করে এই নতুন শব্দটা তারা বানিয়ে নিয়েছে।

তা ভয়াংকই বটে। ক্লাসে যেসব অংক করানোর কথা, সেসব তো আছেই, তাছাড়াও করালীবাবু ছাত্রদের অংকে পোক্ত করে তুলবার জন্য বাইরের বই থেকে যত রকম ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম নিয়ে এসে ছাত্রদের দেন।

আজ করালীবাবু ক্লাসে এসে হাসি-হাসি মুখে বললেন, "মাই লিটল ফ্রেন্ডস, কাল ভোর রাতে আমি স্বপ্নে একটা অংক পেয়েছি, খুব ইন্টারেস্টিং।"

ছেলেরা নড়ে-চড়ে বসল, করালীবাবু স্বপ্নে অংক পান, এটা খুব বেশী কথা নয়। এর আগেও বহুবার তিনি স্বপ্নে অংক পেয়েছেন। তবে কিনা করালীবাবুর কাছে যেটা সুখ-স্বপ্ন, সেটাই তাঁর ছাত্রদের কাছে দারুণ দুঃস্বপ্ন।

করালীবাবু বললেন, "বুঝলে, ভোররাতে দেখি আমি একটা জুতোর দোকানের কর্মচারী হয়ে কাজ করছি।"

বুরুন লাস্ট বেঞ্চে বসে ছিল। আজকাল সে এখানেই বসে। অঙ্কে ফেল করার পর থেকে সে ভাল ছেলেদের সঙ্গে ফার্স্ট বেঞ্চে বসতে লজ্জা পায়। পিছনের বেঞ্চে ছাত্র কম, বুরুনের পাশে আর-একজন মাত্র বসে আছে, সে হল ফটিক, করালীবাবুর কথা শুনে ফটিক বিড়বিড় করে বলল, "খুব ভাল হত তাহলে। বাঁচতুম।"

বুরুন জবাব দিল না, আজকাল সব সময়ে তার মন খারাপ থাকে।

করালী স্যার হেসে বললেন, "বুঝলে সবাই! জুতোর দোকানের কর্মচারী। তা আমার বেশ ভালই লাগছিল। দোকানের মালিকটি ভালমানুষ গোছের, হিসেব-টিসেব বোঝে না। লাভ ক্ষতি বা লেনদেনে হিসেবের গোলমাল বুঝলেই আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা করালীবাবু, হিসেবটা কী হবে বলে দিন তো! যাই হোক, কাজটা আমার বেশ ভালই লাগছিল। খদ্দের এলে জুতো বের করছি, পরাচ্ছি, পছন্দ হল বা ফিট করল কিনা দেখছি, মাঝে-মাঝে মুখে-মুখে অংক কষে মালিককে হিসেব বুঝিয়ে দিচ্ছি। বেশ লাগছে। এমন সময়ে এক খদ্দের এলেন। একজোড়া জুতো তাঁর পছন্দ হয়ে গেল। দর-দস্তুর করে কুড়ি টাকায় রফা হল। তিনি মালিককে একশো টাকার একটা নোট দিলেন। মালিকের ক্যাশ বাক্সে তখন অত টাকা ছিল না, আমাকে নোটটা দিয়ে বললেন, 'করালীবাবু, পাশের দোকান থেকে টাকাটা ভাঙিয়ে আনুন তো।......লিটল ফ্রেন্ডস, তোমরা খুব মন দিয়ে ট্রানজ্যাকশানগুলো লক্ষ করো।......হ্যাঁ, তারপর আমি তো পাশের দোকানে গিয়ে একশো টাকার নোট ভাঙিয়ে এনে মালিককে দিলাম। মালিক কুড়ি টাকা রেখে খদ্দেরকে আশি টাকা ফেরত দিলেন। খদ্দের জুতোর বাক্স বগলে নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু একটু বাদেই পাশের দোকানের মালিক এসে সেই একশো টাকার নোটটা আমার মালিককে ফেরত দিয়ে বললেন, মশাই, এ নোটটা জাল, এটা বদলে দিন। মালিক নোটটা ভাল করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বললেন, তাই তো, বড্ড ঠকিয়ে গেছে দেখছি! এই বলে মালিক ক্যাশ বাক্স থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে একশো টাকা নিয়ে দিয়ে দিলেন। পাশের দোকানের লোকটা চলে গেল। তারপর মালিক অনেকক্ষণ অংক কষে বের করবার চেষ্টা করলেন তাঁর কত ক্ষতি হল। কিন্তু লোকটা ভারী বোকাসোকা ভালমানুষ গোছের, তাই কিছুতেই হিসেব মেলে না। একবার উঁ-হু-হু করে উঠে বলেন, ও বাবা, আমার দুশো টাকা লস হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী করে? তিনি বললেন, খদ্দেরকে আশি টাকা দিলাম, দোকানদারকে একশ টাকা, আর এক জোড়া জুতো—দুশো দাঁড়াচ্ছে। আবার বলেন, না, না, মোট আশি টাকা গচ্চা গেছে দেখছি......ঐ যাঃ, হিসেবের ভুল, একশো টাকা আর কুড়ি টাকার জুতো, মোট একশো কুড়ি টাকা গেল। আবার বলেন, না, না, এক জোড়া জুতো ছাড়া আর তো আমার কিছুই যায়নি......না না, আবার সেই ভুল! দোকানদারকে যে একশো টাকা দিলুম।......যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তিনি আমার দিকে করুণ চোখে চেয়ে বললেন, করালীবাবু, আমার কত দণ্ড গেল তা একটু হিসেব করে বলে দেবেন?...মাই ফ্রেন্ডস, আজকের প্রথম অংক এটাই। ভেরি সিম্পল অ্যারিথমেটিক। বলতে গেলে ক্লাস টুর অংক। জলবৎ তরল। তিন মিনিট সময় দিচ্ছি, কষে ফেল।"

সবাই খাতা খুলে খস খস করে কষে ফেলছে।

বুরুনও কষে ফেলল। বেশি সময় লাগেনি তার। মিনিট দেড়েক বড়জোর। খাতা নিয়ে করালীবাবুর কাছে জমা দেবে বলে যখন উঠতে যাচ্ছে, তখন কানের কাছে ফিসফিস কে যেন বলল, "অ্যাঃ, যাচ্ছেতাই ভুল করলে যে! করালীবাবুর ডাস্টারের বাড়ি খেতে যাচ্ছ নাকি?"

বুরুন প্রথমে ভেবেছিল, ফটিক কথা বলছে। কিন্তু চেয়ে

দেখল, ফটিক বেঞ্চের একেবারে ঐ প্রান্তে বসে গোয়েন্দা-গল্পের বই পড়ছে চুরি করে।

তবে কে বলল কথাটা?

কানের কাছে কে যেন ফিক করে একটু হেসে বলে ওঠে, "ভয় পেলে নাকি?"

বরুন তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হয়ে নিচু স্বরে বলে, "আমি কাউকে ভয় খাই না।"

গলার স্বরটা খুব দুঃখের করে বলল, "তুমি দেখছি খুব উদ্ভুট ছেলে। যাকগে, কী আর করা। বরং তোমার একটু উপকার করে দিয়ে যাই। দাও খাতাটা, অঙ্কটা কষে দিই।"

বরুন একটু ইতস্তত করে বলল, "খাতাটা দিলে করালীবাবু দেখতে পাবেন যে!"

"তাহলে তুমি খাতা খুলে পেনসিল ধরে বসে থাকো, আমি তোমার হাত ধরে ধরে লিখিয়ে দিই।"

তাই হল। দশ সেকেন্ডের মধ্যে অঙ্কটা ঠিকঠাক কষে দিয়ে অদৃশ্য নিধিরাম তাকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে, "যাও, সবার আগে গিয়ে দেখিয়ে আনো।"

(অঙ্কের উত্তর এখানে দেওয়া হল না। আনন্দমেলার পাঠক-পাঠিকারা সেটা বের করবে।)

বরুন গিয়ে করালী স্যারকে খাতা দেখাতেই তিনি তার পিঠ চাপড়ে বললেন, "দারুণ!"

আরো কয়েকজন অঙ্কটা তিন মিনিটের মধ্যে ঠিকঠাক কষেছিল, করালী স্যার সকলের পিঠ চাপড়ে দিলেন। করালীবাবু ঐরকমই, খুব সোজা অঙ্কও কেউ করে দিতে পারলে ভীষণ খুশি হয়ে উঠেন।

পরের অঙ্কটা একটু কঠিন, একটা কিম্ভূত গাড়ির চারটে চাকা চাররকম, একটার ব্যাস তিন ফুট তিন ইঞ্চি, আর একটার তিন ফুট আট ইঞ্চি, তৃতীয়টার চার ফুট দুই ইঞ্চি, চতুর্থটির ব্যাস দুই ফুট এগারো ইঞ্চি, এই কিম্ভূত গাড়িটা যদি পাঁচ মাইল যায় তবে চারটে চাকার কোনটা কতবার সম্পূর্ণ এবং কতখানি আংশিক আবর্তিত হবে? করালীবাবু এটার জন্য দশ মিনিট সময় বরাদ্দ করলেন।

সবাই অঙ্ক কষতে ব্যস্ত। কিন্তু বরুনের সে ভাবনা নেই। সে অঙ্কটা খাতায় টোকামাত্র নিধিরাম তার হাত ধরে বিশ সেকেন্ডের মধ্যে অঙ্কটা কষে একটা ঠেলা দিয়ে বলল "যাও।"

বরুনকে খাতা হাতে টেবিলের কাছে আসতে দেখে করালী স্যার হাঁ হয়ে গেলেন। খাতা দেখে আরো তাজ্জব। বললেন, "এটা তোমার আগে থেকে কষা ছিল।"

"আজ্ঞে না স্যার, এই মাত্র করলাম।"

"বটে! তাহলে বলতে হয় তোমার ভাগ্যে স্বর্ণপদক রয়েছে।"

এর পরের অঙ্ক চৌবাচ্চায় জল ঢোকা আর জল বেরোনো নিয়ে, এটা কষতে বরুনের লাগল তেরো সেকেন্ডের মতো। করালীবাবু অঙ্ক রাইট দিয়ে বললেন, "তুমি অ্যানুয়েলে অঙ্কে যেন কত পেয়েছিল! বারো না তেরো কী একটা বোধ-হয়! না হে, তোমার সেই খাতাটা আবার আমাকে দেখতে হবে।"

করালী স্যারের পর অবনীবাবুর ট্রানস্লেশন ক্লাস। তিনি ইংরিজি করতে দিলেন, কুল খাইয়া রমেনের দাঁত টকিয়া গিয়াছে। ভবানী পাঠক তো সোজা পাত্র নয়, সে ভালর ভাল মন্দের যম। এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ, গিরি, ইহার শিখরদেশ সতত সঞ্চরমাণ জলধরপটল সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় সমাচ্ছন্ন...ইত্যাদি।

সবাই কলম কামড়াচ্ছে।

ঠিক চল্লিশ সেকেন্ড বাদে নিধিরাম বরুনকে ঠেলে দিয়ে বলল, "যাও, হয়ে গেছে।"

বরুন গেল। অবনীবাবু খাতা দেখে মাথা চুলকে বললেন, "ইংরিজিতে তুই কাঁচা নোস ঠিকই, কিন্তু এত ভাল ইংরিজি বহুকাল কোনো ছাত্রকে লিখতে দেখিনি। বাঃ বাঃ। এরকম চালিয়ে গেলে তুই স্কলারশিপ পাবি যে রে!"

বরুন খুব লজ্জার ভঙ্গিতে মাথা নত করে থাকে।

বছরের শুরু, ক্লাস এখনো পুরোপুরি হয় না, পঞ্চম ঘণ্টার পর ছুটি হয়ে গেল। গেম স্যার দুই সেট ক্রিকেটের সরঞ্জাম বের করে দিলেন।

ইস্কুলের পাশে পেল্লায় মাঠে হৈ-হৈ করে ক্রিকেট নামল। একদিকে নিচু ক্লাসের ছেলেরা পার্টি করে খেলছে। অন্য ধারের টিমটা কিছু অদ্ভুত। এতে ফেল করা ছাত্রদের সঙ্গে পাশ করা ছাত্রদের ম্যাচ, গেম স্যার টিম ঠিক করে দিয়েছেন।

বরুন অঙ্কে ফেল করলেও ক্লাসে উঠেছে। তাই সে পাশ-করাদের দলে। কিন্তু পাশ-করা ভাল ছেলেরা খেলাধুলোয় তেমন মজবুত নয়। অন্যদিকে ফেলকরা ছেলেরা সব সাঙ্ঘাতিক সাঙ্ঘাতিক প্লেয়ার। তারা যেমন দুর্দান্ত ব্যাট করে, তেমনি দুর্ধর্ষ বল। তারা ছোটে, লাফায়, গড়াগড়ি খায় অনায়াসে। তাই আজ খেলার মাঠে পাশ-করাদের বড় দুর্দিন।

পাশ-করারা ব্যাট করতে নামল টসে জিতে। প্রথম ওভারেই দুজন জখম হয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে বসে পড়ল। দুজন বোল্ড আউট হয়ে গেল। দ্বিতীয় ওভারে আরো একজন আউট, তবে তিনটে রান হল। তৃতীয় ওভারে পর-পর দুজন ক্যাচ দিয়ে ফিরে গেল, একজন ভয়ে দান ছাড়ল।

বরুন ব্যাট ভাল করে না, তবে বল সে ভালই করে। কিন্তু আটজন বসে পড়ায় তাকে ব্যাট করতে নামতেই হয়।

যখন মাঠে নামছে বরুন, তখন কানের কাছে ফের সেই ফিসফিসানি, "কোনো ভয় নেই, আমি আছি।"

বরুন গম্ভীর হয়ে বলল, "হুঁ।"

"সেঞ্চুরি করিয়ে দেবো। কিন্তু খোকা, মনে রেখো আমার প্রেস্টিজটা তোমাকে রাখতে হবে।"

"দেখা যাবে।"

বরুন নেমে ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখছিল, ফেল-করা হুমদো-হুমদো ছেলেরা হাসাহাসি করছে। ফাস্ট বোলার ভুতু তাকে উদ্দেশ করে বলে, "নে, আর দেখতে হবে না, যে পথে এসেছিস সে পথটাই ভাল করে দেখে রাখ। এক্ষুনি ফিরতে হবে তো।"

ভুতুর দুর্দান্ত বলটা এল। বরুনকে কিছুই করতে হল না। ব্যাটটা কে যেন তার হয়ে চালিয়ে দিল। আর বলটা জেট প্লেনের মত ছুটে গিয়ে ইস্কুলবাড়ির দোতলার ছাদে পড়ল। ছক্কা।

আনতাবড়ি মার হয়ে গেছে ভেবে কেউ খুব একটা হাততালি দিল না।

কিন্তু পরের বলটা আবার উড়ে গিয়ে মস্ত শিরীষ গাছে একটা পাখির বাসা ভেঙে নিয়ে পড়ল। ছক্কা।

এবার কিছু ক্ষীণ হাততালি, বরুনদের ক্যাপটেন অনিরুদ্ধ নিজের ঠ্যাঙের ব্যথার জায়গায় হাত বোলাতে-বোলাতে মাঠের বাইরে থেকে চেঁচাল, "বরুন, চালিয়ে যা।"

তা চালাল বরুন, তৃতীয় বলটা এমন হাঁকড়াল যে, সেটা গিয়ে ইস্কুলের পাশে পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ির নারকোল গাছের ডগায় গিয়ে একটা ঝুনো নারকোল সমেত নেমে এল, পণ্ডিতমশাইয়ের বুড়ি পিসি বেরিয়ে এসে চেঁচাতে লাগলেন,

"কে রে ডানপিটে বদমাশ, গাছে ঢিল মেরে নারকোল পাড়িস দুক্কুরবেলা? দাঁড়া, হরকে বলে তিনঘণ্টা নিলডাউন করিয়ে রাখব।"

পণ্ডিতমশাইয়ের নাম হরপ্রসাদ। পান থেকে চুন খসলেই ছাত্রদের নিলডাউন করিয়ে রাখেন।

পণ্ডিতমশাইয়ের পিসিমা একহাতে নারকোল অন্য হাতে বলটা কুড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "ঐ দেখ, নারকোলের সঙ্গে একটা বেলও পড়েছে দেখছি, তা এ-বাড়িতে তো বেলগাছ নেই, তবে বেল এল কোত্থেকে?"

হর-স্যারের পিসির হাত থেকে বলটা উদ্ধার করা খুব শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিলডাউন হওয়ার ভয়ে কেউ এগোতে সাহস পাচ্ছে না। খেলা পণ্ড হওয়ার জোগাড়।

বুরুন ফিসফিস করে বলল, "ও নিধিরাম, যাও না বলটা নিয়ে এসো।"

নিধিরাম বুরুনের কানেকানে বেশ রাগ করে বলে উঠল, "বড় যে নাম ধরে ডাকছ! তোমার চেয়ে বয়সে আমি কত বড় জানো? দুশো বছরের বড়। সেটা খেয়াল রেখো।"

বুরুন ফিক করে হেসে বলল, "আচ্ছা আচ্ছা। নিধিদা বলে ডাকব তাহলে।"

মুহূর্তের মধ্যে একটা ঘূর্ণি হাওয়া উঠে মাঠ পেরিয়ে হর-পণ্ডিতের বাড়ির দিকে ধেয়ে গেল। স্যারের পিসি কিছু বোঝবার আগেই ঝটকা বাতাসে হাতের বলটা ছিটকে আবার মাঠের মধ্যে চলে এল। স্যারের পিসি চেঁচাতে লাগলেন, "ঐ যাঃ, গেল এমন পাকা বেলটা। কী সুন্দর গন্ধওলা বেলটা ছিল, ভাবলুম আজ পানা করে হরকে খাওয়াব। বাছার পেটটা ভাল যাচ্ছে না..."

পরের ওভার করতে এল কেষ্ট। তার চেহারা দানবের মতো। বল করে না কামান দাগে তা বোঝা শক্ত। তবে ইস্কুলেরই শুধু নয়, এই জেলার সে-ই সবচেয়ে বিপজ্জনক বোলার। তার বলে হয় স্টাম্প ভাঙে, নয় তো ব্যাটসম্যানের পা, আর এ দুটোতে না লাগলে নির্ঘাত উইকেটকীপারের পাঁজর ফাটবে। তাই কেষ্ট বল করার সময় সবাই ভারী গম্ভীর হয়ে যায়।

তবে কিনা ইস্কুলের এলেবেলে খেলায় সে ইচ্ছে করেই বেশি জোরে বল করে না। আজও সে প্রথম বলটা বেশ আস্তেই দিল। সেই বলে বুরুনের পার্টনার ব্যাট ছুঁইয়ে একটা রান করল। কেষ্টর দ্বিতীয় বলটাও বেশ আস্তের ওপর ছিল। তবে কি না তার কাছে আস্তে হলেও বলটা তেমন আস্তে বলে আর কারো মনে হল না। একটা লাল সাপের মতো সেটা ধেয়ে এসেই ছোবল তুলল বুরুনের বুকে।

বুরুনের ব্যাট হেলাভরে ওপরে উঠে এমন লাথি লাগাল সাপটাকে যে, সেটা লেজ গুটিয়ে পাখি হয়ে উড়ে গেল মেঘের দেশে। তারপর চিৎপাত হয়ে পড়ল পাশের মাঠে, যেখানে বাচ্চা ছেলেরা খেলছে। সে-মাঠেও একটা ছেলে ব্যাট হাঁকড়েছে। তাই বলটা কোন্ দলের তাই নিয়ে একটু গোল-যোগ বেধে উঠল।

মার খেয়ে কেষ্ট রেগে যাচ্ছে। তিন নম্বর বলটা সে খুব জোরে না হলেও বেশ জোরে দিল। পিচের ওপর বিদ্যুৎ খেলিয়ে সেটা ছুঁতে এল বুরুনকে। কিন্তু বুরুনের ব্যাট আজ বজ্রাদপি কঠোর। বলটাকে এমন ঘাড়ধাক্কা দিল যে, সেটা কাঁচুমাচু হয়ে ফের বাতাসে সাঁতরে মাঠ পার হয়ে ইস্কুলের দেয়ালের চুনবালি খসাল খানিক। দেয়ালের ভাঙা জায়গাটা আফ্রিকার ম্যাপ হয়ে গেল।

পাঁচ মিনিটে বুরুনের ত্রিশ রান। চারদিকে ফটাফট হাততালি পড়ছে।
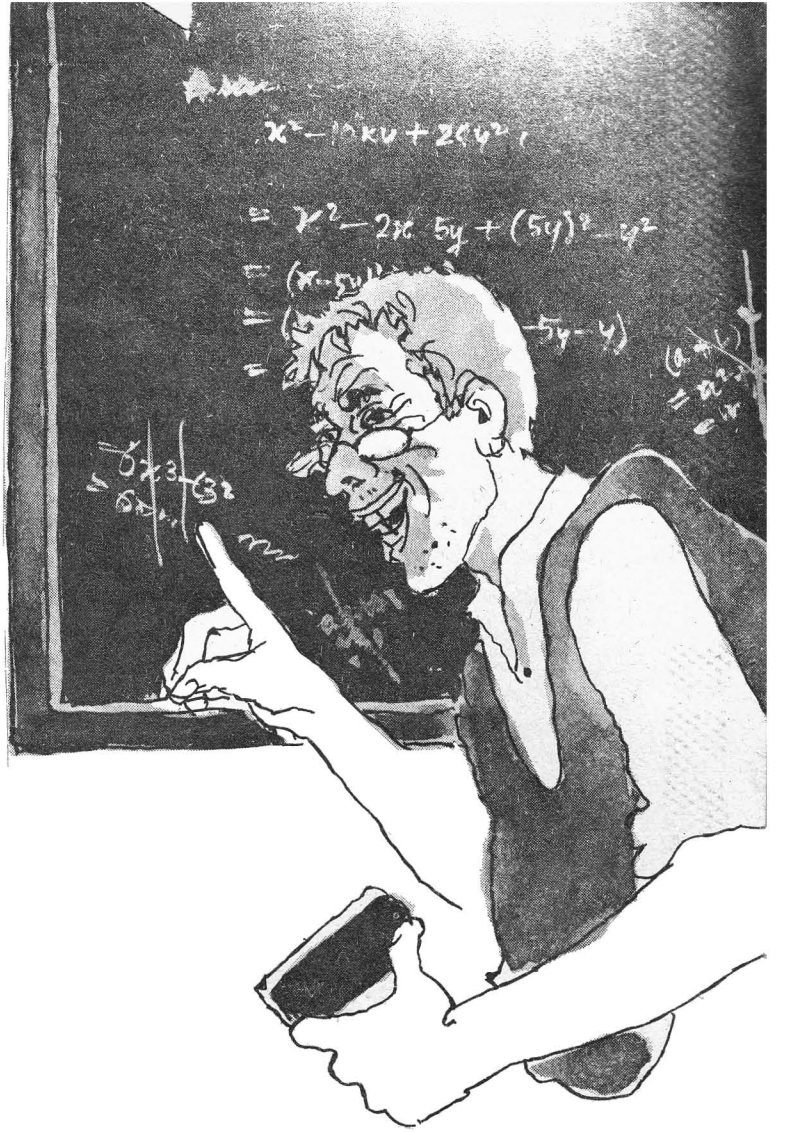
কেষ্ট আস্তিন গুটোয়, বুক ভরে দম নেয়। তারপর মাঠের শেষপ্রান্তে গিয়ে তার বল করার দৌড় শুরু করে। তার মানে এবার কেষ্ট তার সবচেয়ে জোরালো বল দেবে।

বুরুন নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে থাকে। কেষ্টর বলটা সে অবশ্য ভাল করে দেখতেও পায় না। কিন্তু ব্যাট যখন বলটার গায়ে লাগল, তখন তার মনে হল, ব্যাটটা বুঝি ভেঙেই যাবে।

সারদাচরণবাবু জমিদার। তাঁর বাড়ির মাথায় একটা পাথরের পরী দিব্যি ডানা মেলে একশো বছর কাটিয়ে দিয়েছে। বজ্জাত বলটা গিয়ে পরীর একটা ডানা ভেঙে তবে থামল।

আবার ছক্কা।

কেষ্টর পাঁচ নম্বর বলটা আগেরটার চেয়েও জোর। সেই তেজে বলটা প্রায় অদৃশ্য অবস্থায় কখন যে এসেছে, আর কখন যে ব্যাটটা তাকে বেঁতিয়েছে তা বুরুন জানে না। তবে এবার সেটা গিয়ে একটা খড়-বোঝাই গরুর গাড়ির খড়ের গাদায় সেঁধিয়ে গেল। বলটা এত মারধর পছন্দ করছিল না বোধ হয়, গা ঢাকা দেওয়ার তালে ছিল।

বহু কষ্টে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে গাড়ি থামিয়ে বলটা উদ্ধার করতে হল। সেই ফাঁকে পাশ-করা ছেলেরা এসে বুরুনকে কাঁধে নিয়ে খানিক ধেই-ধেই করে নেচে নেয়। মাঠের বাইরে গিয়ে তারাই আবার ফেল করা ছাত্রদের বক দেখায়।

বিয়াল্লিশ থেকে একশো দুইয়ে পৌঁছতে বুরুনের লাগল মোট বারো মিনিট। সর্বসাকুল্যে সাতাশ মিনিটে সে সেঞ্চুরি করেছে এবং এখনো আউট হয়নি।

ইতিমধ্যেই তার ব্যাট করার খবর পেয়ে প্রথমে গেম স্যার

খুকু যাবে শ্বশুরবাড়ী
সঙ্গে যাবে কে?
বাড়ীতে আছে হুলো বেড়াল
কোমর বেঁধেছে।

আম-কাঁঠালের বাগান দেবো
ছায়ায় যেতে যেতে,
শান-বাঁধানো ঘাট দেবো
পথে জল খেতে।
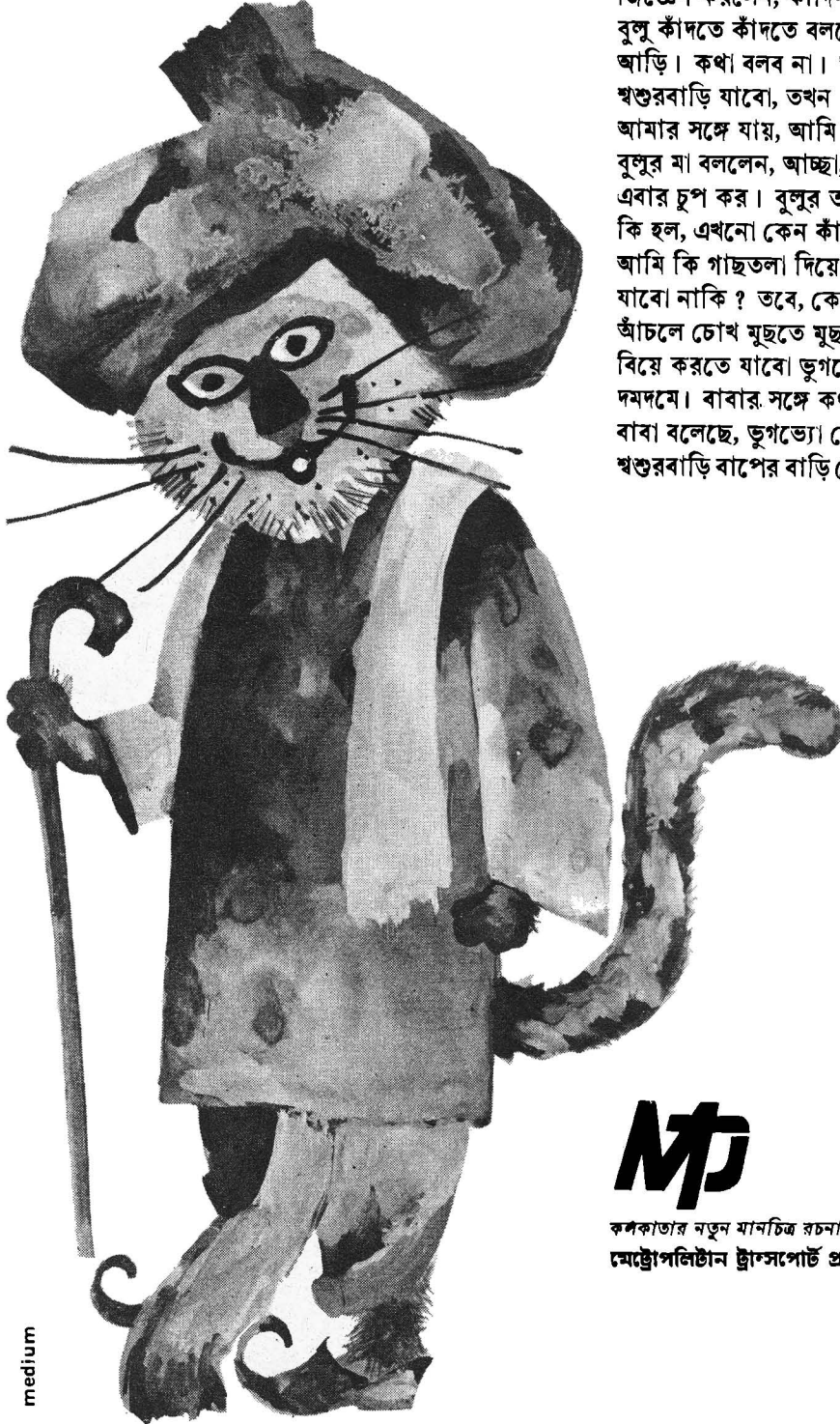
এবং তারপর হেড স্যার সমেত সব মাস্টারমশাই মাঠের ধারে চলে এসেছেন। শহরের লোকজনও খবর পেয়ে চলে আসছে। মাঠের চারধারে তুমুল ভিড় হয়ে গেল দেখতে না দেখতে।

বরুনের একটু লজ্জা-লজ্জা করছে বটে। কিন্তু সে করবে কী?

সতেরোটা ওভার বাউন্ডারি মেরে একশো দুইয়ের পরও বরুনকে আবার ধুন্ধুমার ব্যাটের চমক দেখাতে হল। দ্বিতীয় সেঞ্চুরি করতে বরুন সময় নিল পঁচিশ মিনিট। আবার সতেরোটা ছক্কা মেরে। আউট হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

খুঁতখুঁতে গেম-স্যার পর্যন্ত বললেন, "ব্র্যাডম্যানেরও এরকম রেকর্ড নেই। এ তো ক্রিকেট ইতিহাস পাল্টে দেবে।"

ভাল ছেলেরা আড়াইশোতে দান ছাড়ার পর ফেল-করারা ব্যাট করতে এল। বরুনের হাতে বল। তার কানে-কানে নিধিরাম বলল, "চিন্তা নেই।"

তা চিন্তা ছিল না ঠিকই। ফেল-করা ছেলেরা ছয় রানে অল ডাউন। বরুন দুই ওভারে মোট দশটা বল করেছিল, দ্বিতীয় ওভারে চারটের বেশি বল করার দরকারই হয়নি তার। প্রতি বলে একটা করে উইকেট পড়েছে। ট্রিপল হ্যাট্রিক সমেত তার বোলিংয়ের হিসেব ১·৪ ওভার, ২ মেডেন, ০ রান, ১০ উইকেট। তার দু ওভারের মাঝখানে একজন আনাড়ি ছেলে এক ওভার বল করেছিল, তাইতে ফেল-করারা ছয় রান নেয়।

গেম স্যার বললেন, "ওয়ার্ল্ড রেকর্ড।"

কিন্তু তাঁর বিস্ময়ের এই সবে শুরু। এ তো গেল ক্রিকেটের বৃত্তান্ত।

ঠিক পনেরো দিন পরে স্কুলের বার্ষিক স্পোর্টস। খুব তোড়জোড় করে স্পোর্টস হয় স্কুলে। কারণ স্কুল স্পোর্টসের পরই জেলা স্পোর্টসে স্কুল থেকে ছাত্রদের বাছাই করে পাঠানো হয়। এ-স্কুলের পড়াশুনোয় যেমন খেলাধুলোতেও তেমনই সুনাম।

বরুন প্রতি বছরই স্পোর্টসে একটি-দুটি প্রাইজ পায়। বলার মতো তেমন কিছু নয় অবশ্য। তার গ্রুপে সে হাইজাম্পে গতবারও থার্ড প্রাইজ পেয়েছিল, আর দুশো গজ দৌড়ে সেকেন্ডও হয়েছিল। কিন্তু স্কুলের নামকরা ভাল অ্যাথলেটদের তুলনায় সেগুলো কিছুই নয়।

স্পোর্টসের দিন দশেক আগে হিট হচ্ছে।

কতকগুলো বিষয় গ্রুপের মধ্যে সীমাবদ্ধ আর গোটা দুই তিন বিষয় আছে যা সকলের জন্য। বরুন তার গ্রুপের সব রকম দৌড় আর লাফে নাম দিল। তাছাড়া দশ হাজার মিটার দৌড়, সাইকেল রেস আর লোহার ভারী গোলা ছোঁড়ার যে বিষয়গুলি সকলের জন্য তাতেও নাম লেখাল। ক্রিকেটে তার এলেম দেখার পর স্পোর্টসে এতগুলো বিষয়ে নাম লেখানোতে কেউ ভ্রূ কোঁচকাল না, বরুনের ভিতর কী আছে তা তো কেউ জানে না।

হিট শুরু হওয়ার দিনই নিধিরাম উৎসাহের চোটে এমন কেলেঙ্কারি করে বসল যে, বরুন লজ্জায় মরে যায় আর কী।

প্রথম বিষয় ছিল একশো মিটার দৌড়। গেম স্যার স্টপ ওয়াচ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট গেম স্যার হুইসিল বাজিয়ে দৌড় শুরুর সংকেত দেওয়ামাত্র বরুনের মনে হল একটা ঝড়ের বাতাস তাকে প্রবল বিক্রমে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এমন হল যে বরুনের পা প্রায় মাটিতেই ঠেকল না।

দৌড়ের শেষে গেম স্যার মাঠে বসে পড়ে নিজের মাথা চেপে ধরে বললেন, "একশো মিটার মাত্র আট সেকেন্ডে! উঃ, আমি অজ্ঞান হয়ে যাব।"

সত্যিই অজ্ঞান হয়ে যেতেন, বরুন গিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে বলল, "না স্যার, আট সেকেন্ড নিশ্চয়ই নয়। স্টপ ওয়াচটা বোধহয় খারাপ।"

গেম স্যার ভ্যাবলা দুটো চোখে চেয়ে বললেন, "বলছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।"

"ঠিক তো?"

"ঠিকই। অত জোরে আমি দৌড়োইনি।"

গেম স্যার উঠে বললেন, "দৌড়োলে মুশকিল হত। কারণ, ওয়ার্ল্ড রেকর্ডও ওর চেয়ে অনেক বেশি কিনা।"

হাই জাম্পের আগে বরুন আড়ালে গিয়ে ধমক দিয়ে বলল, "নিধিদা, এসব কী হচ্ছে বলো তো! বাড়াবাড়ি করলে কিন্তু গোসাঁই-সর্দারকে গিয়ে বলে দেব।"

নিধিরাম ভয় খেয়ে বলে, "তা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড-টেকর্ড কি আর আমার জানা আছে! আগে থেকে বলবে তো!"

"আচ্ছা, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এবার সাবধান।"

হাই জাম্পে বরুন চটপট কাঠি পার হতে লাগল বটে, তবে খুব একটা বাড়াবাড়ি করল না। তাতেও অবশ্য কম কিছু হল না, গেম স্যার মেপে দেখলেন, বরুন শেষ লাফে ছ ফুট ডিঙিয়েছে এক চান্সে। গেম স্যারকে খুবই গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

লং জাম্পে বরুন আরো সাবধান হল। মাত্র বাইশ ফুট লাফিয়ে আর লাফাল না।

গেম স্যার তাকে আড়ালে ডেকে খুব উত্তেজিতভাবে বললেন, "শোনো বরুন, তোমার ভিতরে যে কী সাঙ্ঘাতিক ক্ষমতা ভগবান দিয়েছেন, তা তুমি হয়তো টের পাচ্ছ না। আমি বলে দিচ্ছি, তুমি অলিম্পিক থেকে একাই অন্তত এক ডজন সোনার মেডেল নিয়ে আসবে। এখন থেকে তৈরি হও।"

বরুন খুব লজ্জার হাসি হাসল। সারা মাঠে তাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তাকে দেখবার জন্য ছেলেরা ভিড় করছে। শহরের লোকেও চলে আসছে কাণ্ড কারখানা দেখতে।

স্পোর্টসের দিন দুপুরে মাঠ ভেঙে পড়েছে ভিড়ে। শুধু এ গঞ্জই নয় আশপাশের এলাকা থেকে, এমন কী, জেলা-শহর থেকেও গাড়ি করে লোক এসেছে। সবাই কানাঘুষো শুনেছে যে, গঞ্জে নাকি এক সাঙ্ঘাতিক স্পোর্টসম্যানের আবির্ভাব হয়েছে।

বরুনের কাণ্ড শুনে দাদুও অবাক। নাতির এত এলেম তাঁরও জানা ছিল না। তিনি নাতির শক্তিবৃদ্ধির জন্য একটা ভাল পাঁচন তৈরি করে খাইয়ে দিয়েছেন। তাতে বরুনের গায়ে যথেষ্ট জোর এসে গেছে।

একদিকে দাদুর বলকারক পাঁচন, অন্যদিকে নিধিরাম। দুইয়ে মিলে সে এক যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে গেল স্পোর্টসে।

পোলভল্টে বাঁশে ভর করে আকাশের দিকে উঠে গেল বরুন, আড় হয়ে থাকা বার-এর অন্তত দশ ফুট উঁচু দিয়ে। মাপজোক করলে বাইশ তেইশ ফুট দাঁড়াবে। মাঠ ফেটে পড়ছে চিৎকারে আর উত্তেজনায়।

একশ মিটার, দুশো মিটার, আটশো মিটার দৌড়, হার্ডল রেস, হাই জাম্প, লং জাম্প, লোহার [illegible] ছোঁড়া—কোন্‌টায় বরুন সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড না করল? শেষে অন্য সব কম্পিটিটাররা মাঠ থেকে পালাতে লাগল চুপিসাড়ে। লোকে বলাবলি করতে লাগল—এ তো দেখছি সেই হাবু ওস্তাদের ভুতুড়ে কাণ্ড সব। নইলে ঐটুকু পুঁচকে ছেলে অত জোরে দৌড়তে বা অত উঁচুতে বা দূরে লাফাতে পারে নাকি?

স্পোর্টসের পর বরুন বাড়ি ফিরল ছেলেদের কাঁধে চড়ে, সঙ্গে প্রাইজের বোঝা। দাদু সব দেখে শুনে বললেন—হবে না! এ পাঁচন যে আমার নিজের আবিষ্কার। ভেলুদের ডাক্তারী শাস্ত্র ঘেঁটে মরলেও এসব নিদান পাবে না।

৬

বরুনের আজকাল কাজকর্ম বড্ড বেড়েছে। সকালে উঠে ঘর ঝাঁটাতে হয়, ন্যাতা দিয়ে মেঝে মুছতে হয়, নিজের পড়ার টেবিল নিজেকে গোছাতে হয়, কুয়ো থেকে স্নানের জল তুলে নিতে হয়, খাওয়ার পর নিজের বাসন মেজে নিতে হয়, সপ্তাহে দুদিন নিজের জামাকাপড়, বিছানার চাদর আর বালিশের ওয়ার কাচতে হয়, নিজের জুতো পালিশ করে নিতে হয়, মশারি টাঙাতে হয়। হাজারো কাজ। ভেলু ডাক্তারের হুকুমে তার কাজে সাহায্য করা সবাই বন্ধ করে দিয়েছে। অপমান আরো আছে। অঙ্কে ফেল করায় তার বিছানায় আর তোশক পাতা হয় না। চৌকির ওপর শতরঞ্চি আর চাদর পেতে শোওয়া। পায়ে জুতো পরে বটে, কিন্তু মোজা বারণ, রঙচঙে জামাকাপড় পরা বারণ।

প্রথম প্রথম বরুনের এতে খুব কষ্ট হত। অভিমানে চোখে জলও এসে যেত। রাতে একা শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত।

কিন্তু আজকাল তার কষ্ট আর নেই। ঘুম থেকে খুব ভোর রাতেই উঠে পড়ে সে। নিধিরামই ডেকে দেয়। উঠে দেখতে পায়, নিধিরাম ঘরদোর সাফ করে পড়ার টেবিল গুছিয়ে রেখেছে। স্নানের সময় যখন বরুন জল তোলে তখন আসলে তাকে ভারী বালতি টেনে তুলতে হয় না, দড়িটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, বালতি আপনা থেকে উঠে আসে ওপরে। বাসন মাজতেও তার কোনো কষ্ট নেই, কুয়োপাড়ে গিয়ে এঁটো বাসন রাখতে না রাখতেই মাজা-ধোয়া হয়ে যায়। মশারি আপনা থেকেই টাঙানো আর গোঁজা হয়ে যায়। রাতে শক্ত চৌকিতে শুতে কষ্ট হয় বলে তারও ব্যবস্থা হয়েছে। খুব নরম একটা তোশক কোত্থেকে বিছানায় চালান হয়ে যায় রাতে, আবার সকাল হতেই সেটা লোপাট।

পড়াশুনোর কষ্টও খুব বেশি নেই আজকাল। পড়ে হবে কী? ক্লাসে যত শক্ত প্রশ্নই তাকে করা হোক না কেন, নিধিরাম ঠিক কানে কানে উত্তর বলে দেয়।

বরুন আজকাল ভারী আয়েসের জীবন কাটাচ্ছে।

তবে কিনা নিধিরাম যে এত খাতির করছে তারও কারণ আছে।

প্রায় দিনই রাত্রিবেলা নিধিরাম এসে বিছানার ধার ঘেঁষে মেঝেয় বসে ঘ্যানঘ্যান করে বলে, "বুঝলে বরুন, তুমি দেখছি মহা চালিয়াত ছেলে, কথা দিয়ে কথা রাখো না।"

বরুন ঘুম-চোখে হাই তুলে বলে, "এখন ঘুমোব, তুমি কেটে পড়ো তো!"

"আহা, ঘুমোবে তো ঠিকই। কিন্তু আমার যে ঘুম কেড়ে নিয়েছ। জানো তো, সেই যে গোসাঁইবাগানে আমাকে হেনস্থা করেছিলে, তারপর থেকে আর ভূতের সমাজে আমার মুখ দেখানোর জো নেই। স্বয়ং গোসাঁইবাবা আমাকে সাফ বলে দিয়েছে, যদি বরুন কোনোদিন তোকে একটু ভয় খায় তবেই আবার সমাজে তোর জল চলবে। নইলে খড়ম পেটা করে মামদোদের রাজ্যে তাড়িয়ে দিয়ে আসব।"

"তা আমি করব কী?"

নিধিরাম অভিমানভরে বলে, "তোমার জন্য কত কী করছি, আর তুমি একটু আমার জন্য করতে পারবে না?"

"আমার যে তোমাকে ভয় লাগে না, নিধিদা!"

"চেষ্টা তো করতে পারো।"

"দূর! তোমাকে ভয় খাওয়ার কথা ভাবলেই হাসি পায় যে!"

নিধিরাম আঁশটে মুখ করে চলে যায়। তবে দিনরাত ঘ্যানঘ্যান করতেও সে ছাড়ে না।

দাদু আজকাল কথাবার্তা খুব বলেন না, দিনরাত তাঁর গাছগাছড়া নিয়ে নানা ভাবনা-চিন্তা। নানারকম নতুন নতুন অরিষ্ট, পাঁচন, চূর্ণ তৈরি করছেন। দিনরাত বনে জঙ্গলে ঘুরে মূল, ছাল, পাতা সংগ্রহ করছেন। হীরে, মুক্তো, সোনা পুড়িয়ে ভস্ম তৈরি করছেন। মৃগনাভির সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরছেন, এসব বাতিক তাঁর বরাবরই ছিল। কিন্তু ইদানীং যেন বড় বেশি চিন্তিত দেখাচ্ছে তাঁকে।

রবিবার দাদু বরুনকে ডেকে বললেন, "তোমার তো সব দিক দিয়েই প্রবল উন্নতি হচ্ছে দাদা! লক্ষ করছি, আমি না ডাকতেই তুমি ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে পড়ো, নিখুঁতভাবে সব কাজ করছ ঘড়ির কাঁটা ধরে।"

বরুন লাজুক ভাব করে মাথা নুইয়ে রইল।

দাদু কাছে টেনে একহাতে বুকে চেপে ধরে অন্য হাতে মাথায় বিলি কেটে বললেন, "খুব ভাল, খুব ভাল।"

দাদু অনেকক্ষণ তাকে এইভাবে বুকের কাছে ধরে থেকে খুব আস্তে করে বললেন, "দেখ দাদু বুড়ো হয়েছি, কবে মরে টরে যাই। তাই ভাবছি, আমার যা-কিছু বিদ্যে সব এখন থেকেই তোমাকে কিছু-কিছু শেখাই।"

এমনিতে দাদুর সঙ্গে বরুনের সম্পর্ক খুবই ভাল, কিন্তু তা বলে দাদু কখনো এরকমভাবে বরুনকে আদর করেন না। তাই দাদুর মধ্যে একটা কেমন অসহায় ভাব টের পেয়ে বরুন অবাক। তার দাদু রাম কবিরাজ কখনো কাউকে ভয় খান না, কারো পরোয়াও করেন না। কিন্তু এখন যেন বরুন টের পাচ্ছিল যে, দাদু ঠিক আগেকার দাদু আর নেই।

বরুন নিজে ভারী দুষ্টু ছেলে ছিল বরাবর। অঙ্কে ফেল করার পর থেকেই সে কেমন একটু মুষড়ে পড়েছে। তাই কারো মন খারাপ থাকলে সে টপ করে সেটা টের পেয়ে যায়। তার নিজের যেমন পরিবর্তন হয়েছে, তার দাদুরও তেমনি একটা কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

বরুন বলল, "দাদু, তোমার কি মনটা খারাপ? আমাকে বলো, আমি সব ঠিক করে দেব।"

রাম কবিরাজ খুব চিন্তিত মুখ করে বরুনের দিকে চেয়ে থাকেন একটু। তারপর মাথা নেড়ে বলেন, "বিপদ বলে বিপদ! কিন্তু আমার নিজের জন্য তো ভাবি না দাদা। বুড়ো হয়েছি, কাজেই মরতে ভয় পাই না। তবে কিনা একটা দুষ্টু লোক এসে সারা শহরটাকেই নষ্ট করে দেবে।"

"দুষ্টু লোক! সে কে?" বরুন অবাক হয়ে বলে।

"আছে একজন।"

"সে এসে কী করবে?"

"কী করবে তার কি কিছু ঠিক আছে দাদা! তাই আমি ভাবছি সময় থাকতেই তোমাকে খানিকটা বিদ্যা শিখিয়ে যাই। আর এ বিদ্যা শুধু শিখলেই হবে না, আবিষ্কারকও হতে হয়, উদ্ভাবকও হতে হয়। আয়ুর্বেদে যা আছে তার বাইরেও আমি অনেক ওষুধ তৈরি করেছি। এ তো গেল একটা দিক। আবার ভাল চিকিৎসক হতে গেলে শুধু রোগ আর ওষুধ চিনলেই হবে না, পয়সার ধান্দা থাকলেও হবে না। রুগি তোমার কথামতো ওষুধ খায় কিনা দেখতে হবে, পথ্য দেখতে হবে, রুগিকে আপনার জনের মতো ভালবাসতে হবে। ভালবাসাই চিকিৎসার মূল কথা। স্নেহ, মমতা, দরদ না থাকলে ভাল চিকিৎসক হয় না। আরো আছে, কোন্ লক্ষণ দেখে কোন্ রুগিকে কী ওষুধ দিলে, আর তার ফলাফল কী হল, এসব লিখে রাখতে হয় আলাদা খাতায়। মাঝে-মাঝে খাতা-খানা খুলে দেখতে হয়। তাতে কিছু ভুল হয় না। অতীতে

যদি কোনো ভুল চিকিৎসা করে থাকো তবে তা শুধরে নিতে পারবে, আর ভুল করবে না। আমার এরকম কুড়ি-একুশখানা খাতা আছে, সেগুলো ছেপে বই বার করলে মানুষের উপকার হবে। কিন্তু আমার আয়ুতে বোধহয় আর অত কাজ কুলোবে না। সেই খাতাগুলো তোমাকে সব দিয়ে যাব।"

বুরুনের মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। দাদু এমনভাবে কথা বলছেন যেন তাঁর আয়ু আর বেশিদিন নয়।

একটু বেলায় দাদু চাকর সঙ্গে নিয়ে গোসাঁইবাগানের দিকে গাছপালার সন্ধানে গেলেন। বুরুন সেই ফাঁকে দাদুর ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বুরুনের মন খারাপ থাকলেই সে গিয়ে দাদুর ঘর থেকে চুরি করে চ্যবনপ্রাশ খায়। দাদুর চ্যবনপ্রাশ একদম আচারের মতো খেতে।

ঘরের মধ্যে কবিরাজী ওষুধের একটা সুন্দর মিষ্টি গন্ধ। এই ঝাঁঝালো সুন্দর গন্ধটা বুরুনের দারুণ ভাল লাগে। আর এই জন্যই তার মাঝে-মাঝে কবিরাজ হতে ইচ্ছে করে।

চ্যবনপ্রাশের বয়ম থেকে এক কোশ তুলে চাটতে চাটতে বুরুন গিয়ে দাদুর আরাম-কেদারায় বসে। আরাম-কেদারায় দাদুর মাথার তিল তেলের গন্ধ লেগে আছে। বেশ লাগে।

হঠাৎ একটু হাওয়া ছাড়ল। ঘরের মধ্যে দাদুর টেবিলের কিছু কাগজপত্র এদিক-ওদিক উড়ে গেল। আর একটা ছোট্ট কাগজ উড়ে এসে পড়ল বুরুনের কোলে।

অন্যমনস্ক বুরুন কাগজটা খুলে দেখে লাল কালিতে লেখা একটা চিঠি। চিঠির ভাষা এরকম ঃ প্রণামান্তে নিবেদন-মেতৎ যে মহাশয়, আমাদের পরম পূজনীয় সর্দার হাবু মহারাজকে জব্দ করিবার নিমিত্ত আপনি যে সব দুষ্কার্য ও ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন তাহা আমরা বিস্মৃত হই নাই। হাবু মহারাজ শীঘ্রই সরকারের হেফাজত হইতে খালাস পাইবেন। আমরা মা কালীর নামে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, হাবু মহারাজের অপমানের প্রতিশোধ লইব। আপনার অন্তিম সময় আগত জানিবেন। শীঘ্রই সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া দিন গুনিতেছি। নিবেদন ইতি—আপনার দাসানুদাস হাবু মহারাজের অনুচরবৃন্দ।

চিঠিটা পড়ে বুরুন অবাক। এত বিনয় আর নম্রতার সঙ্গে কেউ কাউকে শাসায় নাকি? তার ভারী হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ দাদুর সব হাবভাব আর কথাবার্তা মনে পড়ে যাওয়ায় সে বুঝতে পারল চিঠিটা মজার নয়। এলেবেলে চিঠি হলে দাদু অত অন্যরকম হয়ে যেতেন না।

চ্যবনপ্রাশটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে বুরুন নিজের ঘরে আসে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে গম্ভীর গলায় ডাকে, "নিধিরাম! ও নিধিদা!"

নিধিরাম কাছে-পিঠে না থাকলেও ক্ষতি নেই। চারদিকে বাতাসে, আনাচে-কানাচে নিধিরামের অসংখ্য চর ঘুরে বেড়ায়। তাদের মধ্যে অনেক নতুন ভূত, আনাড়ি ভূত, ভিতু ভূত, গাড়ল ভূত, পাগল ভূত, সাধু আর চোর ভূত আছে। কিন্তু সকলকেই নিধিরামের বলা আছে যে, বুরুন তাকে ডাকলে তক্ষুনি যেন খবর দেওয়া হয়।

আজও একটা লিকলিকে রোগা ভূত মোটা ডিকশনারির পাতার মধ্যে ঢুকে চ্যাপটা হয়ে ঘুমোচ্ছিল। বুরুনের ডাক শুনে তড়াক করে বেরিয়ে যখন এল, তখনো তার শরীরটা কাগজের মতো চ্যাপটা হয়ে আছে। ঘুম-চোখে তাড়াতাড়ি একটা নমস্কার করে বলল, "আজ্ঞে উনি একটু মড়া আহার করতে মনসাগুড়ি গেছেন। সেখানে মড়ক লেগেছে কিনা।"

"মড়া আহার করতে? এঃ—" ঘেন্নায় বুরুন ঠোঁট বেঁকায়।

রোগা ভূত একগাল হেসে বলে, "যখন ভূত হবেন তখন আর আপনি অমন কথা বলবেন না। সে এমন ভাল খেতে যে পোলাও কালিয়া কোথায় লাগে!"

বুরুন বিরক্ত হয়ে বলে, "তাকে এক্ষুনি ডাকো। বলো, বিশেষ দরকার।"

লিকলিকে ভূতটা যাচ্ছি বলে এক লম্ফে আকাশ পার হয়ে গেল।

একটু বাদেই নিধিরাম খড়কে দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে হাজির।

"ডাকলে কেন?"

বুরুন বলল, "আঁচিয়ে এসেছ?"

"ভূতের আবার আঁচানো!"

"যাও, আঁচিয়ে এসো। স্বাস্থ্যবিধি মানো না, সদাচার নেই—তোমরা কেমন মানুষ বলো তো নিধিদা?"

লজ্জা পেয়ে নিধিরাম আঁচিয়ে আসে।

বুরুন জিজ্ঞেস করে, "হাবু মহারাজ বলে কাউকে চেনো?"

নিধিরাম চমকে উঠে বলে, "ও বাবা! চিনব না? সে আমাদের কম জ্বালিয়েছে নাকি?"

কী রকম?"

"ওঃ সে আর বোলো না। হাবু গুন্ডা ভূতের মন্ত্র জানত। তাই দিয়ে আমাদের বশ করে করে খুব খাটাত। সর্ষে আর ঝাঁটা দিয়ে পেটাতও খুব। কেন বলো তো, তার কথা জিজ্ঞেস করছ?"

"সে যদি আবার এখানে আসে তবে কী হবে?"

"আসবে? ও বাবা, তবে গেছি।"

"তোমরা ওকে খুব ভয় খাও নাকি?"

"তাকে সবাই ভয় খায়। আমাদের যে কী নাকাল করত একসময়ে।"

বুরুন গম্ভীর হয়ে বলে, "আমি একটা কথা স্পষ্ট জানতে চাই। হাবু এখানে এলে তুমি তাকে বেশি খাতির করবে, না আমাকে?"

নিধিরামও গম্ভীর হয়ে বলে, "দেখ বুরুন, তুমি বাচ্চা ছেলে বলে নিতান্ত মায়ায় পড়ে তোমার কাজকর্ম করে দিই। খাতিরও দেখাই। কিন্তু হাবুর হল অন্য কথা। তাকে আমরা কেউ ভালবাসি না বটে, দুচক্ষে দেখতেও পারি না, কিন্তু তার হল মন্ত্রের জোর। মন্ত্রের কাছে তো আর চালাকি চলে না। সে ঘাড় ধরে আমাদের দিয়ে চাকর-বাকরের কাজ করিয়ে নেবে। তাই সে যদি আসে, তবে সাফ বলে দিচ্ছি যে, আমাদের আর তোমার পক্ষ নেওয়া সম্ভব হবে না।"

"বটে?"

"হ্যাঁ। কী করব বলো, আমরা মন্ত্রের বশ।"

বুরুন খুব চিন্তিত হয়ে চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "তখন ডাকলেও আসবে না?"

নিধিরাম মাথা নেড়ে বলে, "আসব না বলছি না। তবে সে সময়ে যদি হাবু কোনো কাজে লাগিয়ে দেয়, তবে আসা সম্ভব নয়। আগে হাবুর কাজ, তারপর অন্য কথা।"

"হাবু যদি তোমাকে হুকুম করে—যাও গিয়ে বুরুনের মাথাটা ছিঁড়ে আনো, তাহলে আমার মাথা সত্যিই ছিঁড়ে নেবে?"

নিধিরাম যদিও ভূত, তবু এখন তারও কপালে ঘাম দেখা দিল। অস্বস্তির সঙ্গে বলল, "ওসব অলক্ষুনে কথা থাক। বলতে নেই।"

"যদি হাবু অমন কথা বলেই তবে কী করবে?"

নিধিরাম একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "তোমাকে

ভালবেসে ফেলেছি বুরুন, কী আর বলব! তবে হাবুর যদি হুকুম হয় তবে নিজের মাথা ছিঁড়তেও আমরা বাধ্য।"

৭

দোলের দিনটা এগিয়ে এল যেন ঘোড়ায় চেপে।

হাবু গুণ্ডা যে ছাড়া পাবে, সে-খবর পাঁচকান হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কারো আর জানতে বাকি নেই।

হাবু যত পাজিই হোক, এ শহরে কিছু লোক আছে যারা হাবুর পরম ভক্ত। তারা মনে করে হাবুর যে সব-অলৌকিক শক্তি দেখা গেছে সেরকমটা শুধু বড়-বড় মহাপুরুষদের থাকে। কাজেই হাবু চুরি-ডাকাতি যাই করুক, এসব লোকদের কাছে সে সাক্ষাৎ ভগবানের ছোট ভাই।

এরকমই একজন হল পাঁচকড়ি আঢ্য। একসময়ে সে হাবু ওস্তাদের পাঁচালি, নামে একখানা চটি-বইও বের করেছিল। তাতে ছিল, "প্রথমে বন্দনা করি দেব মহেশ্বর। তারপরেতে বন্দি আমি সর্ব চরাচর॥ বড় সুখে পূজি আমি বাগ্দেবীর চরণ। মাতাপিতার চরণে দেই সর্ব প্রাণমন॥ উত্তরেতে হিমালয় দক্ষিণেতে বন। তার মধ্যে কত গ্রাম গঞ্জ অগণন॥ গঞ্জের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল ভ্যাটাগুড়ি ধাম। যথায় বসতি করেন হাবু পুণ্যবান॥"

এরপর পাঁচালিতে পাঁচকড়ি আরও লিখেছিল, "গুণাকর হাবুর গুণের নাই শেষ। পলকে মনুষ্যে ধরি করি দেয় মেষ॥ ব্যাঘ্র বাহন আর ভূতপ্রেত সঙ্গ। নিশি দারোগা ভাগে রণে দিয়া ভঙ্গ॥ অয়স্কান্ত বীরত্ব দেখাতে এসেছিল। হাবু ওস্তাদ কৌশলে তারেও তাড়াইল॥ অবশেষে হেলেদুলে আসিল গদাই। গুণাকরের কোপে শেষে তারও রক্ষা নাই॥"

একসময়ে এই পাঁচালি হাটে-বাজারে বয়ে ফিরত পাঁচকড়ি। গদাই দারোগার হাতে হাবু জব্দ হওয়ার পর সে কিছু মিইয়ে যায়।

বহুদিন বাদে আবার হাবু ফিরে আসছে শুনে তার একগাল হাসি দেখা গেল। রাম কবিরাজের সঙ্গে একদিন দেখা করে বলল, "কবরেজমশাই, শুনেছেন নাকি! হাবু দেবতা আবার ফিরে আসছেন। যারা তাঁকে হাজতে পাঠিয়েছিল, এবার তারা ঠ্যালা বুঝবে, কী বলেন ঠাকুর?"

রাম কবিরাজের সঙ্গে হাবু কী জানি কেন কোনোদিন তেমন ঝামেলা করেনি। কিন্তু কবিরাজমশাই নিজে গিয়ে যখন হাবুর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন, তখন হাবু আদালতেই বলে উঠেছিল, "কাজটা ভাল করলেন না রামদা।"

কথাটা কবিরাজমশাইয়ের মনে আছে। তিনি তেতো মুখ করে পাঁচকড়িকে বললেন, "মানুষকে খামোখা দেবতা বানাচ্ছ কেন? হাবু আর যাই হোক, মানুষই বটে।"

পাঁচকড়ি জিব কেটে বলে, "ছি ছি, ওকথা বললে পাপ হয়। তাঁর ক্ষমতা স্বয়ং ভগবানের মতো।"

"তাই যদি হবে তো জেল থেকে বেরোতে পারল না কেন মন্ত্রের গুণে?"

"সে তাঁর লীলা। আমি একবার হাজতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। গিয়ে কী দেখলাম জানেন? তাঁর কপালে সিঁদুরের ত্রিশূল, অ্যাই বড় জটা হয়েছে চুলে, চোখ রক্তবর্ণ। আর সেপাই থেকে শুরু করে জেলার সাহেব পর্যন্ত দিনরাত তাঁর সামনে হাতজোড় করে আছেন। শয়ে-শয়ে লোক এসে তাঁর ভোগের জন্য মণ্ডা মেঠাই, তরিতরকারি, মাছ-মাংস দিয়ে যায়। জেলের সবাই তাঁর প্রসাদ পায়। আমাকে বললেন, ওরে পাঁচকড়ি, হাজতে কদিন থেকে একটু চিত্তশুদ্ধি করছি।"

"ভগবানেরও তাহলে চিত্তশুদ্ধির দরকার হয় বলছ?"

পাঁচকড়ি রেগে গিয়ে বলে, "অবিশ্বাস করছেন? এই বলে রাখছি কবিরাজমশাই, আপনারা কেউ নিস্তার পাবেন না।"

পাঁচকড়ি বিদায় হলে রাম কবিরাজ নিজের মনে খানিক চিন্তা করলেন। তারপর বোধহয় থানামুখো রওনা দিলেন।

থানায় নতুন দারোগা এসেছে। অল্পবয়সী ছোকরা, কথায়-কথায় ফটাফট ইংরিজি বলে ফেলে। ছোকরা খুব একটা খারাপ মানুষ নয়, তবে কিনা কাজেকর্মে এখনো তেমন পোক্ত হয়ে ওঠেনি।

কবিরাজমশাই হাবুর কথা তুলতেই ছোকরা দারোগা শম্ভুচরণ বলে ওঠে, "ওঃ, দ্যাট ফেমাস রোগ? না, এবার আর তার কোনো জারিজুরি খাটবে না।"

রাম কবিরাজ হেসে বললেন, "তেড়েমেড়ে ডাণ্ডা করে দেবে ঠাণ্ডা? না হে বাপু, কাজটা অত সহজ নয়।"

বাবুরাম সাপুড়ের সেই কবিতা বোধহয় শম্ভুচরণ পড়েনি। যাই হোক, সে একটু ডাঁটের সঙ্গে বলল, "নাকে তেল দিয়ে ঘুমোন গে কবিরাজমশাই, হাবুকে কাবু করতে আমার দুদিনও লাগবে না। অবশ্য সে যদি গোলমাল করে।"

দোলের কয়েকদিন আগে গঞ্জে কিছু কিছু সন্দেহজনক চেহারার লোকের আনাগোনা হতে লাগল। তারা আড়ে আড়ে চায়, গোমড়ামুখ করে ঘোরে ফেরে, কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলে না।

হরিহরবাবু সাইকেলে চেপে তিস্তাঘাটে গিয়েছিলেন। সন্ধের মুখে ফিরবার সময় গঞ্জের উত্তরদিকের শালজঙ্গলের মধ্যে বাতাস শুঁকে বাঘের গন্ধ পেলেন। এত জোরে সাইকেল চালিয়েছিলেন যে, দুচাকার গাড়িখানা শেষমেশ চাকায়

ভর দেওয়া ছেড়ে যেন পাখনায় ভর করল। বাজারের কাছে এসে "বাঃ...বাঃ" বলে চেঁচাতে-চেঁচাতে অজ্ঞান হয়ে গেলেন সাইকেলশুদ্ধ।

লোকজন ভিড় করে এল। একজন বলতে লাগল, "উনি বাঃ বাঃ বলে কাকে যেন বাহবা দিচ্ছিলেন এইমাত্র। তবে পড়লেন কেন?"

অন্যজন বলল, "উনি এত জোরে সাইকেল চালিয়েছিলেন যে নিজের এলেম দেখে নিজেকে নিজেই বাহবা দিচ্ছিলেন।"

একটা বাচ্চা ছেলে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল, "সাইকেলটাও কি অজ্ঞান হয়ে গেছে বাবা?"

সনাতনবাবুর বড় দাবার নেশা, সারাদিন দাবাড়ু খুঁজে বেড়ান। তা গঞ্জে ভাল দাবাড়ু আর কজনই বা আছে? যারা আছে, তাদেরও তো সবসময়ে পাওয়া যায় না। সনাতনবাবু আবার মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে উঠে হ্যারিকেন উসকে দাবার ছক পেতে বসেন। তখন সঙ্গীসাথী আর পাবেন কোথায়, তাই একা একাই ঘুঁটি সাজিয়ে দুদিকেই চাল দেন। এরকম এক রাতে খেলতে বসেছেন। হঠাৎ দেখেন তাঁর উল্টোদিকের ঘুঁটি আপনা থেকেই চলছে। আর কী অসাধারণ সব চাল! খেলা শুরু হতে না হতেই বারো চালের মাথায় ঘোড়া আর গজের মুখে মাত হয়ে গেলেন। খেলা যখন চলছিল তখন দাবার নেশায় অত খেয়াল করেননি। খেলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ "বাপ্‌রে" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। ভয়ে তাঁর দাঁত-কপাটি লাগল।

তবে একথা ঠিক যে, গঞ্জে বাঘের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল এবং অলৌকিক সব কাণ্ডও ঘটতে শুরু করেছিল।

রাম কবিরাজের দোকানে সবাই খুব গম্ভীর হয়ে বসে আছেন সন্ধেবেলায়।

কমলাক্ষবাবু কম্ফর্টার জড়িয়ে শীতে কাঁপতে-কাঁপতে হাজির হয়ে বললেন, "আর বোলো না। দামী শালটা—"

"শালটা কী হল?" রামবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করেন।

"নিয়ে গেল।"

"কে?"

"আর কে!"

সবাই মুখের দিকে চেয়ে আছেন, কিন্তু কমলাক্ষবাবু এর বেশি বলতে রাজি হলেন না।

রাম কবিরাজ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "নিয়তি কেন বাধ্যতে।"

মন্মথবাবুও সেই কথায় সায় দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, "সে-কথা ঠিক। আমরা যতই না কেন সাবধান হই, নিয়তি মারলে কিছু করার নেই।"

রামবাবু কটমট করে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, "আমি আমাদের কথা বলিনি। আমাদের নিয়তি ঠিক আছে। আমি হাবু গুন্ডার নিয়তিটাই দেখছি।"

মন্মথবাবু চারপাশে চোরচোখে চেয়ে দেখে নিয়ে বললেন, "ও নাম মুখে এনো না। কে কোথায় শুনতে পাবে।"

কমলাক্ষবাবুও বললেন, "কবরেজ, তোমার সাহসটা একটু কমাও। সাহস ভাল, কিন্তু অতি সাহস ভাল নয়।"

সারা-রা-রা ঢেক চলি যা ঢেক চলি যা ঢেক চলি যা...। সারারাত দেহাতীদের বস্তিতে দোলের সঙ্গে এই গান হয়েছে। ভোর হলেই দোল।

ছেলেমেয়েরা পিচকারি, রঙ, আবির সব দু-তিন দিন আগে থেকে জোগাড় করে রেখেছে। রং খেলার জন্য যার যা ছেঁড়া পুরনো জামা-কাপড় আছে তা বের করা হয়েছে বাক্স প্যাঁটরা ঘেঁটে। পচা ডিম জোগাড় করা, বেলুন বোম তৈরি করা শেষ। আলু আধখানা করে কেটে তাতে ব্লেড দিয়ে ফুড়ে ফুঁড়ে উল্টো করে "গাধা" লেখা হয়ে গেছে অনেকেরই। দুচারজন বড়লোকের বাড়িতে আবার দোলের দিন রং দিতে গেলে খাওয়ায়। এবার কে কী খাওয়াবে তাই নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে।

মন্মথবাবুর নাতি ভুতুম মহা ডানপিটে দুষ্টু ছেলে। সে তার আবিরের মধ্যে চুপি চুপি লংকার গুঁড়ো মিশিয়ে রেখেছে। ডিমের খোলা জোগাড় করে তার মধ্যে ডেঁও আর লাল পেটওলা কাঠ-পিঁপড়ে ধরে এনে ভরেছে। তারপর আটা গুলে ডিমের খোলা জুড়ে নিয়েছে। যার গায়ে ছুঁড়বে তার গায়ে রং লাগবে না বটে, কিন্তু পিঁপড়ের কামড়ে তিড়িং তিড়িং লাফাবে। তাছাড়া তার রঙের বালতিতে কাঁচা গোবর মেশানো আছে, আর আছে আলকাতরার কৌটো।

ভুতুমের সঙ্গে রং খেলা দূরে থাকুক, এমনিতেই কেউ খেলতে চায় না। তার মতো দুষ্টু ছেলে গঞ্জে নেই। শুধু পরান নামে একটি ছেলে আছে যে ভুতুমের মতো অতটা না হলেও বেশ দুষ্টু। সেই পরান হল ভুতুমের প্রাণের বন্ধু। ভুতুম কিন্তু পরানকেও ছাড়ে না। একবার তার জামার পকেটে শুঁয়োপোকা ছেড়ে দিয়েছিল।

বুরুনের এবার রং খেলা বারণ ছিল। তার বাবা বলে দিয়েছেন, "সামনের বছর অল সাবজেক্টে ভালভাবে পাশ করলে আর অংকে লেটার পেলে আবার নরম্যাল লাইফ ফিরে পাবে।"

বুরুনের বাবা ইস্কুলে প্রায়ই খোঁজখবর করে বুরুনের কতটা উন্নতি বা অবনতি হচ্ছে তা জেনে নেন। মাস্টার-মশাইরা একবাক্যে বলেন, বুরুনের উন্নতি অসাধারণ। সে শুধু ফাইনালে ফার্স্টই হবে না, আরো অনেককিছু করবে। যেমন, অলিম্পিক থেকে অন্তত বারোটা সোনার মেডেল আনবে, ক্রিকেটে ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড ভাঙবে, ফুটবলে গোষ্ঠ পালকে ছাড়াবে।

বুরুনের বাবা এসব কথায় তেমন গুরুত্ব দেন না। তবে শুনে একটু-আধটু খুশি যে না হন, তা নয়। কিন্তু খুশি হয়ে রাশ আলগা করেন না। ছেলেকে কড়া শৃংখলায় রাখেন।

দোলের দিন সকাল হতে-না-হতেই রাস্তা থেকে ছেলে-দের হল্লা ভেসে আসছিল। ছেলেরা রং নিয়ে একে-ওকে তাড়া করছে। খুব হাসছে। চেঁচাচ্ছে।

বুরুন তখন নিজের পড়ার ঘরটিতে বসে দাঁতে দাঁত চেপে অঙ্ক কষে যাচ্ছে। আজকাল দিনে গড়পড়তায় কুড়িটা করে অঙ্ক কষতে হয়। করালীবাবুর দেওয়া বোমার মতো অংক সব। দাঁত বসানোই শক্ত। পরশু পর্যন্ত এসব অঙ্ক জলের মতো সহজে করে ফেলেছে বুরুন। না, ঠিক বুরুন করেনি, বুরুনের হাত দিয়ে সেগুলো কষে দিয়েছে আসলে নিধিরাম। কিন্তু কাল থেকে নিধিরামের পাত্তা নেই। এমন কী, যে সব নতুন শিক্ষার্থী ভূত নিধিরামের দূত হয়ে আশেপাশে থাকত, তাদেরও কারো টিকি দেখা যাচ্ছে না। অনেক ডাকাডাকিতে কাল দুপুরবেলা কয়েক মুহূর্তের জন্য নিধিরাম এসেছিল। তার সারা গায়ে মাটি মাখা, চোখ দুটো করুণ, ঘাম হচ্ছে খুব। বলল, "আর বোলো না, গোসাঁই-বাগানের জঙ্গল সাফ করছি, হাবু ওস্তাদ এসে গেছেন কিনা। এসেই হুকুমের পর হুকুম চালাচ্ছেন। কাজ কি সোজা! বিছুটি-বন কাটতে হলে বুঝতে পারতে।"

বুরুন কান্না-কান্না মুখ করে বলে, "তুমি না থাকলে

আমার অঙ্ক ট্র্যানস্লেশন কে করে দেবে বলো তো নিধিদা?"

নিধিরাম গম্ভীর হয়ে বলে, "দ্যাখো বরুন, যা করেছি তা করেছি। এখন ওসব ভুলে যাও। আমাকে আর বড় একটা পাবে না। নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখো এবার।"

বরুন তখন লোভ দেখিয়ে বলে, "আমি ঠিক তোমাকে ভয় খাব এবার থেকে, দেখো।"

নিধি হেসে বলে, "এখন আর ভয় দেখানোর সময় নেই যে। স্বয়ং গোসাঁই-বাবা পর্যন্ত হাবুর ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন। দম ফেলার ফুরসত নেই। তুমি আর কতটুকুই বা ভয় খাবে, আমরা হাবুকে যা ভয় খাচ্ছি, সে আর বলার নয়।"

বরুন বলল, "হাবু হুকুম দিলে সব কিছু করতে পারো নিধিদা?"

নিধিরাম হেসে বলে, "সব কি পারি রে ভাই? আমাদের হল গিয়ে হাওয়া-বাতাসের শরীর। তা সেই হাওয়া-বাতাসের জোর দিয়ে যা করা যায় সেসব পারি।"

বরুন বলে, "আমার দাদু রাম কবিরাজের ঘাড় যদি মটকাতে বলে হাবু মটকাবে?"

নিধি কবিরাজমশাইয়ের নাম শুনেই সাঁত করে মিলিয়ে গেল বাতাসে। বরুন অবাক। পরে ভেবেচিন্তে দেখল, নিধিরামের সামনে দাদুর নামটা উচ্চারণ করা ঠিক হয়নি। রাম নামকে কোন ভূত সহ্য করতে পারে?

সেই যে গেছে নিধিরাম, অনেক ডাকাডাকিতেও আর আসেনি। তাই কাল থেকে বরুনকে তার অঙ্ক ট্র্যানস্লেশন সব নিজেকেই করতে হচ্ছে। কাল করালীবাবুর বাড়িতে পড়তে গিয়ে বরুন খুব বিপদে পড়েছিল। করালীবাবু যা-ই জিজ্ঞেস করেন, তা-ই বলতে না পেরে বরুন হাঁ করে থাকে। করালীবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, "সে কী বরুন? আমি যে ভেবেছিলাম তুমি আইনস্টাইনের মতো একজন কেওকেটা হবে! কালও তো তুমি সাঙ্ঘাতিক সাঙ্ঘাতিক সব অঙ্ককে ঘায়েল করে গেছ!"

কাল ইস্কুলে ট্র্যানস্লেশনও পারেনি বরুন, ভূগোল ক্লাসে ভুল করেছে। ছুটির পর খেলতে গিয়ে শূন্য রানে আউট হয়েছে, বলও করেছে যাচ্ছেতাই। তার অবনতি দেখে গেম-স্যার পর্যন্ত অবাক।

আজ তাই বরুনের বড় মন খারাপ। পড়ার টেবিলের সামনেই জানালা। সেটা দিয়ে রাস্তার দৃশ্য দেখা যায়। একটাও অঙ্ক না মেলাতে পেরে বরুন খুব অন্যমনস্কভাবে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল। আজ দোল। সবাই রং খেলছে। সে খেলবে না। তার ওপর নিধিরাম ছেড়ে গেছে তাকে। হাবু গুণ্ডা এসেছে দাদুকে জব্দ করতে।

কত কী ভাবছিল বরুন। ঠিক এসময়ে জানালা দিয়ে একটা রংমাখা মুখ উঁকি দিল। বরুন সাবধান হওয়ার আগেই একমুঠো ঝাল আবির উড়ে এল তার চোখেমুখে। অঙ্কের বই-খাতা ভাসিয়ে গোবরগোলা ম্যাজেন্টা রঙ ছড়িয়ে পড়ল। আর ডে'ও আর কাঠ-পিঁপড়ে বোঝাই একটা ফাঁপা ডিমের খোলা তার কপালে লেগে ভেঙে গিয়ে পিঁপড়ে বাইতে লাগল সর্বাঙ্গে।

লঙ্কার জ্বলুনি আর পিঁপড়ের কামড়ে মুহূর্তের মধ্যে বরুন তিড়িং তিড়িং লাফাতে থাকে। রাগে তার পিত্তি জ্বলে যায়। "নিধিদা, নিধিদা," বলে বারকয়েক ডেকে খেয়াল করে যে, নিধিরাম হাবুর বেগার খাটছে, আসবে না। তখন ভুতুমকে ধরার জন্য বরুন দুই লাফে ঘর থেকে রাস্তায় পড়ল।

ভুতুম দৌড়ে পালাচ্ছে। বরুন তাকে ধাওয়া করতে-করতে ভাবে, কতক্ষণ দৌড়বে। এই ধরলাম বলে!

কিন্তু স্পোর্টসে সে যেরকম বিশ্ব-রেকর্ড-ভাঙা দৌড় দৌড়েছিল এখন তার দৌড়ের বহর সেরকম তো নয়ই, উপরন্তু ভুতুমকে ধরতে খানিক দৌড়ে সে হাঁফিয়েও উঠল। রাস্তার ছেলেমেয়েরা খুব চেঁচিয়ে বরুনকে সাবাশ দিচ্ছিল। তারা ভাবছিল গঞ্জের চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টসম্যান, যে কিনা একদিন অলিম্পিক থেকে একাই এক ডজন সোনার মেডেল আনবে বলে সবাই জানে, এক্ষুনি ভুতুমকে ধরে ফেলবে।

কিন্তু আজ মোটেই তা হল না। ভুতুম অনায়াসে দৌড়ে অনেক দূরে চলে গিয়ে পিছু ফিরে দু হাতে কাঁচকলা দেখাতে লাগল বরুনকে। মুখে হি-হি হাসি।

গোমড়ামুখে বরুন ফেরত আসছিল, কিন্তু মাঝপথে এক পাল ছেলে তাকে ধরে আচ্ছাসে রং মাখায়। বরুন গায়ের জোর খাটিয়ে সব কটাকে হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে দেখল যে, সে একটাকেই কায়দা করতে পারছে না। অথচ পরশুদিন পর্যন্ত তার গায়ে সাতটা হাতির জোর ছিল. কোনো ছেলে লাগতে সাহস পেত না।

রংমাখা বরুন অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। আর এক পাল ছেলে এসে পিচকারিতে তাকে ভিজিয়ে দেয়। পচা ডিম ছুঁড়ে দেয় কে যেন। তাই বরুন আর বাড়ি ফিরল না। ছেলের দলের সঙ্গে মিশে পাড়ায়-পাড়ায় রঙ খেলতে বেরিয়ে পড়ল।

আবির দিয়ে দোলখেলা শুরু হয়েছিল। সেইসঙ্গে গোলা রঙ। শেষে আলকাতরা, কাদা আর গোবর। রঙে-রঙে ভূত হয়ে যেতে লাগল সবাই। শেষে এমন অবস্থা হল যে, কে কোন্ লোক তা আর চিনবার জো রইল না। রাস্তাঘাটে সবাই সং সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কাউকেই চেনা যাচ্ছে না।

বরুন রঙমাখা ছেলেদের মধ্যে ভুতুমকে খুঁজছিল। আর কিছুর জন্য নয়, ভুতুমকে পেলে তার কান দুটো আচ্ছাসে মলে দিয়ে মাথায় দুটো চাঁটি দেবে। বড্ড বেয়াড়া হয়েছে ছেলেটা।

অনেক খুঁজে বকুলতলার কাছে ভুতুমকে দেখতে পেল বরুন। নর্দমার পাঁক তুলে রাস্তার লোকের গায়ে ছুঁড়ছে। বরুন গিয়ে তার একটা কান পাকড়ে মাথায় একটা রাম চাঁটি দিয়ে বলে, "খুব যে সকালে লঙ্কার গুঁড়ো দেওয়া আবির দিয়েছিলি! এখন?"

ভুতুম ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠে বলে, "দাঁড়াও, দাদাকে ডেকে আনছি। কালও তুমি চাঁটি দিয়েছিলে বিশুদা, আর মার্বেল কেড়ে নিয়েছিলে......"

বরুন ভুল বুঝতে পেরে জিভ কাটে। ভুতুম নয়, ক্লাস ফোরের ছিঁচকাঁদুনে ফচু। অবশ্য ফচুও তাকে চিনতে পারেনি, বিশু বলে ভুল করেছে। বরুন তাড়াতাড়ি সরে পড়ল।

কুমোরপাড়ায় অবশেষে বরুন ভুতুমকে পেয়ে যায়। রঙের বালতিতে কেরোসিন মেশাচ্ছে। বরুন গিয়ে তার হাত চেপে ধরে বলে, "ভুতুম! এবার কোথায় পালাবি? সকালে যে বড়—"

ভুতুম অবাক হয়ে চেয়ে বলে, "দ্যাখ মোনা, ফের ইয়ার্কি করবি তো সেদিনের মতো গুলতি মারব। আমাদের পাড়ার ছেলেকে ল্যাং মেরে মার খেয়েছিলি সেদিন, তবু লজ্জা নেই?"

বলে ভুল-ভুতুম টক করে প্যান্টের পকেট থেকে গুলতি বের করতেই বরুন ভোঁ-দৌড়। পিছন থেকে একটা ছুটন্ত গুড়ুল তার পিঠের হাড়ে ঠং করে এসে লাগল। আগে হলে নিধিদা ঠিক গুড়ুলটা অন্য দিকে উড়িয়ে দিত। কিন্তু নিধিরাম তো এখন আর নেই।

ভুতুমকে খুঁজতে গিয়ে বারকয়েক এরকমভাবে ভুল-ভুতুমের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বরুনের। অবশ্য তারাও কেউ বরুনকে চিনতে পারেনি।

খুঁজতে-খুঁজতে হয়রান হয়ে বরুন রথতলায় একটা জামগাছের নীচে শান্তশিষ্ট একটি ছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। ভারী শান্তভাবে রঙিন ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে, হাতে কোনো পিচকিরি বা খারাপ রঙ নেই। শুধু একটু আবির। বরুন তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ খোকা, নোয়াপাড়ার ভুতুমকে এদিকে কোথাও দেখেছ?"

ছেলেটা হাসি-হাসি মুখ করতেই তার দাঁতে লাল নীল রঙ দেখা গেল। ছেলেটা খুব ভাল গলায় বলে, "হ্যাঁ দেখেছি। কিন্তু তুমি কে বলো তো?"

"আমি বরুন।"

"ও, চ্যাম্পিয়ন? তুমি হলে শহরের গৌরব। আমাদের বাসায় তোমাকে নিয়ে খুব আলোচনা হয়। এসো, তোমাকে একটু আবির দিই! দেব তো? মনে কিছু করবে না তো?"

ছেলেটার এরকম ভদ্র আর সুন্দর ব্যবহারে বরুন মুগ্ধ হয়ে গিয়ে বললে, "কেন আবির নষ্ট করবে ভাই? আমার গায়ে আর রঙ দেওয়ার জায়গাই নেই যে।"

ছেলেটা করুণ স্বরে বলে, "কিন্তু ছুটে কারো সঙ্গে পারি না বলে আজ যে আমি কারো গায়ে রঙ দিতে পারিনি!"

বড় মায়া হল শুনে, তাই বরুন মুখটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "তাহলে দাও।"

ছেলেটা হুশ করে হাতের আবির বরুনের মুখে ছুঁড়ে দিয়েই দৌড়। আর লঙ্কার গুঁড়ো মেশানো ঝাল আবিরে বরুনের চোখ-মুখ-জিভ জ্বলে যেতে লাগল। ছেলেটা দৌড়তে দৌড়তেই চেঁচিয়ে বলল, "দুয়ো! দুয়ো! আমিই ভুতুম। ধরতে পারল না!"

রাগে বরুনের মাথার ঠিক রইল না। সে চোখ মুছতে মুছতেই শব্দ লক্ষ করে ভুতুমকে ধাওয়া করে যেতে লাগল। পায়ের শব্দে আর গলার স্বরে বুঝতে পারল যে, ভুতুম যাচ্ছে গোসাঁইবাগানের দিকে। শহরের সবচেয়ে ভাল পুকুরটা ঐ-দিকেই। গোসাঁইবাগানের কাছে বিশাল পুকুরটাকে লোকে বলে সমুদ্রদিঘি। সারা বছর টলটলে জলে ভরা থাকে। ওরকম ভাল জল আর কোথাও নেই। কিন্তু অনেকটা দূরে বলে আর ভয়ের জায়গা বলে লোকে সেখানে বড় একটা স্নান করতে যায় না।

বরুন পরিষ্কার শুনতে পেল ভুতুম দৌড়ে গিয়ে সমুদ্র-দিঘিতে ঝাঁপ দিয়ে চেঁচাল, "দুয়ো! ধরতে পারল না!"

বরুনও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়ে দিঘিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জলে কিছুক্ষণ নাকানি-চোবানি খাওয়ার পর তার চোখ পরিষ্কার হয়ে আসে। তখন চারদিকে চেয়ে সে ভুতুমকে খোঁজে।

কিন্তু পুকুরে জনপ্রাণী নেই। চারদিকে ঠান্ডা নিস্তরঙ্গ জল। কোথাও একটু ভুরভুরিও দেখা যায় না। কিন্তু দিঘিটা এত বিশাল যে সবটা নজর করা মুশকিল। বদমাশ ভুতুম নিশ্চয়ই ডুব-সাঁতার দিয়ে কোথাও ভেসে উঠবে ভেবে বরুন অনেকক্ষণ জলে সাঁতরে বেড়াল। কিন্তু ভুতুম কোথাও ভেসে উঠল না। ডুবে গেল নাকি ছেলেটা? কিন্তু ডোববার ছেলে তো ভুতুম নয়! চৌপর দিন সে তার বাড়ির পাশের পুকুরটায় পড়ে থাকে। চিত, ডুব, কাত কোনো সাঁতারই তার অজানা নয়। দমও আছে অনেক। তবে ভুতুমের হল কী?

খোঁজাখুঁজি করতে-করতে বরুন দক্ষিণের ভাঙা ঘাটের কাছে চলে এল। ডুবে-ডুবে পা দিয়ে-দিয়ে দিঘির তলায়

খুঁজতে লাগল। যদি ভুতুম ডুবে গিয়ে থাকে, তবে ওর শরীরটা তো থাকবে নীচে।

হঠাৎ ঘাটের ওপর থেকে একটা গম্ভীর গলায় প্রশ্ন এল, "তুমি ওখানে কী করছ?"

বুরুন অবাক হয়ে চেয়ে দেখে জটাওয়ালা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল চেহারা, গায়ে টকটকে লাল রঙের চাদর আর কাপড়। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। মুখে রাজ্যের দাড়িগোঁফ।

বুরুন ঘাটের একটা ডুবো সিঁড়িতে গলা-জলে দাঁড়িয়ে আমতা-আমতা করে বলে, "একটা ছেলে বোধহয় জলে ডুবে গেছে, তাই খুঁজছি।"

লোকটা কোনো সাধুটাধু হবে, গম্ভীর গলায় বলল, "এ দিঘির জলে মায়ের পুজো হয়, তাই কারো নামা বারণ, তুমি উঠে এসো।"

বুরুন একটু ভয় খেয়েছিল। আস্তে-আস্তে জল থেকে উঠে ঘাটে দাঁড়াতেই লোকটা ফের জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে?"

বুরুন ভেজা গায়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "আমি বুরুন। ভেলু ডাক্তারের ছেলে, রাম কবিরাজ আমার দাদু।"

শুনে লোকটার মুখ একেবারে পাকা আমের মতো মিষ্টি হয়ে গেল। হেসে বলল, "তাই বলো! এসো এসো, আজ দোলের দিন তোমাকে মিষ্টিমুখ করাব। তোমার বাবা আর দাদুর সঙ্গে আমার খুব খাতির কিনা। এসো এসো।"

এই বলে লোকটা নিজেই এগিয়ে এসে বুরুনকে নড়া ধরে তুলে নিল। বুরুন টের পেল লোকটার গায়ে অসুরের মতো জোর।

গোসাঁইবাগানের ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়ে সরু রাস্তা। দিনের বেলাতেও আলো নেই। কেমন আবছা ভুতুড়ে ছায়া চারদিকে। সেই রাস্তা দিয়ে লোকটা বুরুনের হাত শক্ত করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা বুরুনের ভাল লাগছে না। সে বলল, "আপনি কে?"

"আমি!" হা হা করে হেসে লোকটা বলে, "আমি একজন সাধু মানুষ। ভয় পেও না। একসময়ে এই গঞ্জে সবাই আমাকে হাবু ওস্তাদ নামে চিনত। এখনো কেউ কেউ চেনে। তোমার দাদু আর বাবা তো খুব চিনবে।"

বুরুন যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে কেঁপে উঠল। এই তবে হাবু ওস্তাদ!

গোসাঁইবাগানের পোড়ো বাড়ির চারপাশের জঙ্গল সাফ করা হয়েছে। ঘরদোর সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যদিও ভাঙা-চোরাগুলো এখনো সারানো হয়নি। বিভিন্ন ঘরে পাঁচ-সাতজন ষণ্ডা চেহারার লোক শুয়ে বসে আছে। তাদের চোখ রক্তবর্ণ, আর মাঝে-মাঝে "শিব স্বয়ম্ভূ" বলে বিকট গলায় তারা হাঁক পাড়ছে। হঠাৎ মাটি কাঁপিয়ে "ঘ-ড়-ড়-ড়-ড়া-ম" করে কাছেই একটা বাঘ ডেকে উঠল। এত বিকট ডাক বুরুন জীবনে শোনেনি।

সে কেঁপে উঠতেই হাবু ওস্তাদ বলে, "ভয় নেই। ও আমার পোষা বাঘ। এত দিন জঙ্গলে ছিল, আমি ফিরে এসেছি খবর পেয়ে বাঘটাও ফিরে এসেছে।"

এত ভয় বুরুন জীবনে পায়নি। কাঁপা গলায় সে বলে, "আমাকে ছেড়ে দিন। আমি বাড়ি যাব।"

হাবু হেসে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, "যাবে যাবে। তোমাকে একটু মিষ্টিমুখ করাই, জায়গাটা একটু ঘুরে-টুরে দেখ। হয়তো এ জায়গা তোমার এত ভাল লেগে যাবে যে, আর নিজের বাড়িতে ফিরতেই ইচ্ছে করবে না।"

বুরুন হাবুর হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, "না না। আমি বাড়ি যাব।"

হঠাৎ হাবু তার চোখে হাত বুলিয়ে দিয়ে খুব আলতো গলায় বলল, "এমন সুন্দর জায়গা ছেড়ে কোথায় যাবে?"

বুরুন চোখে হাত বোলাবার সময় চোখ বন্ধ করে ছিল। চোখ চাইতেই সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

কোথায় সেই পোড়ো বাড়ি? কোথায়ই বা সেই জঙ্গল? সে দেখতে পেল, কী সুন্দর একটা বাগান। অজস্র, অসংখ্য ফুল ফুটে আছে, সুগন্ধে ম ম করছে চারধার। গাছে-গাছে দোয়েল শ্যামা কোকিল ডাকছে। ফুলে-ফুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট্ট প্রজাপতির মতো পরী। একটা ছোট্ট নদী বয়ে যাচ্ছে তরতর করে। বাঁধানো ঘাটে একটা রঙিন নৌকো বাঁধা। সবকিছুই খুব ছোট-ছোট, খেলাঘরের মতো। কিন্তু ভারী সুন্দর। এখানে আকাশের রং সবুজ। রঙের বাক্সে যত রকম রং দেখা যায় তত রকম রঙের ছোট বড় গোল চৌকো আর নানান আকৃতির মেঘ আকাশে ভাসছে। কোনো কোনো মেঘ খুব নিচু হয়ে প্রায় মাথা ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে। মেঘগুলোর ওপরে চমৎকার ছোট ছোট বসবার গদি রয়েছে। একটা মেঘ তার কাছে এসে বলে উঠল, "চড়বে নাকি বুরুন? চলো তোমাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো বুরুন উঠে পড়ল মেঘের কোলে। সাবানের ফেনার মতো নরম গদিতে বসে আস্তে আস্তে ওপরে উঠল। খুব ওপরে নয়, খুব বেশি হলে তিন তলার ছাদের সমান উঁচু হয়ে আস্তে আস্তে মেঘটা তাকে নিয়ে চলে।

অল্প দূরেই একটা ছোট পাহাড়, তার চূড়ায় বরফ জমে আছে। পাহাড়ের পিছনে সূর্য ডুবছে। কী আশ্চর্য! এই সূর্যের চেহারা অবিকল আহ্লাদী মানুষের মুখের মতো। তার ঠোঁট, নাক, কান, চোখ সব আছে। বুরুনকে দেখে সূর্য বলে উঠল, "তোমার হুকুম পেলেই আমি উঠব বা ডুবব।"

বুরুন অবাক হয়ে দেখল। তারপর বলল, "তুমি একটু থাকো, আমি সব দেখে নিই ভাল করে। তারপর ডুবো।"

মেঘটা বলে উঠল, "সূর্য ডুবলেও এখানে কখনো অন্ধকার হয় না। চাঁদমামা আছে, তারা আছে, স্বপ্নের আলো আছে।"

একটা ছোট্ট রেল স্টেশনের ধারে তাকে নামিয়ে দিল মেঘ। স্টেশনের ঘরটা নানা রঙে রঙিন, প্ল্যাটফর্মে হলুদ মোরম। ছোট বাতিদানে সবুজ-লাল-নীল আলো জ্বলছে। ক্ষুদে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে শ্বাস টানছে। কামরার জানালায় অদ্ভুত মজার মজার সব মুখ দেখে বুরুন। একটা জানালায় ডোনাল্ড ডাককে দেখতে পায়, অন্য জানালায় টিনটিন আর ক্যাপটেন মুখোমুখি বসে একটা গুপ্তধনের প্ল্যান দেখছে, টিনটিনের কুকুর কুটুস একটা ডাইনী বুড়িকে তাড়া করে অন্য কামরায় উঠিয়ে দিয়ে এল। একটা কামরার জানালায় দেখল ভুতুম বসে আছে। কিন্তু ভুতুমের সঙ্গে ঝগড়া বলে তার দিকে ভাল করে তাকাল না বুরুন।

টিং টিং করে মিষ্টি ঘণ্টা বাজতেই গার্ডসাহেব হুইসল্ দিয়ে গাড়ি ছাড়ার সঙ্কেত দিলেন আর বুরুনের দিকে চেয়ে বললেন, "উঠে পড়ো তাড়াতাড়ি।" গার্ডের মুখ দেখে বুরুন তো অবাক। এ যে অরণ্যদেবের সেই বেঁটে সঙ্গী গুরন!

একটা কামরায় উঠে পড়ে বুরুন। জানালায় বসে দেখে, রূপকথার দেশের মতো অলৌকিক সুন্দর এক দেশের ভিতর দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। সব কিছুই ছোট-ছোট সব কিছুই খুব সুন্দর রঙের।

যে কামরায় বুরুন উঠেছে, তাতে অজস্র পুতুল বসে-বসে বিস্কুট খাচ্ছে আর চিকন সুরে একে অন্যের সঙ্গে কথা বলছে। পুতুল-কুকুর ঘুরে ঘুরে পুফ পুফ করে ডাকছে, বাঘ-পুতুল বলছে হালুম হুলুম, হাতি-পুতুল একটা বানর-পুতুলকে শুঁড়ে নিয়ে দোল দিচ্ছে।

একটা জঙ্গলের ধারে গাড়ি এসে ছোট্ট একটা স্টেশনে থামল। স্টেশনের নাম "চড়ুইভাতি"। গুরন এসে সবাইকে বলল, নেমে পড়ো, নেমে পড়ো। এখানে আজ চড়ুইভাতি হবে।

নেমে বুরুন সকলের সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে হাঁটিতে থাকে। ভারী সভ্য ভব্য জঙ্গল। কোথাও কাঁটাগাছ নেই, বিছুটি পাতা নেই। সুন্দর সুন্দর সব গাছ, ফুল, পাখি। ছোট ছোট বাঘ, সিংহ, হাতি, গণ্ডার ঘুরে বেড়াচ্ছে। নানা রঙের সাপ চলেছে নিজের কাজে। তাদের দেখে একদম ভয় করে না। একটা বাঘের গায়ে হাত বুলিয়ে দিল বুরুন। একটা সাপকে তুলে একটু আদর করে ছেড়ে দিল।

দিনের আলো ফুরোচ্ছে না। সূর্য আটকে আছে পাহাড়ের পিছনে। আর সেই সুন্দর নরম আলোয় জঙ্গলের মধ্যে লুকোচুরি আলোছায়ায় ডোনাল্ড ডাক, টিনটিন, গুরন, ডাইনী বুড়ি, পুতুল আর জীবজন্তু মিলে কী যে হৈ-হুল্লোড় করে চড়ুইভাতি হতে লাগল, তা বলে ফুরোয় না। ভুতুম এসে কাকুতি-মিনতি করে বলল, "বুরুনদা, কাল আবির দিয়ে খুব অন্যায় কাজ করেছি। আর হবে না, কান ধরছি।"

বুরুন গম্ভীর হয়ে বলে, "আর পিঁপড়ে?"

"সেও অন্যায়। এই দেখ, দশবার ওঠবোস করছি। এবার ভাব করবে তো?"

ভুতুমের এত ভাল স্বভাব হয়েছে দেখে খুশি হল বুরুন। ভাব করে ফেলল।

এত সুন্দর দেশ ছেড়ে আর কোথাও কখনো যাবে না বুরুন। মনে-মনে এ কথা সে ঠিক করে ফেলল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল। বুরুন আর ভুতুমকে খুঁজতে যে সব লোককে চারদিকে পাঠানো হয়েছিল, তারা ফিরে এসে খবর দিল—নাঃ, কোথাও তাদের পাওয়া গেল না।

এ খবর শুনে মন্মথবাবু শয্যা নিলেন। আর রামবাবু ঘন-ঘন তামাক খেতে লাগলেন। দু বাড়িতেই কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল।

সন্ধের শেষ ডাউন রেলগাড়িটা ইস্টিশান ছেড়ে চলে গেল। তার কু-ঝিক-ঝিক শব্দ মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই চারদিক কাঁপিয়ে বাঘের ডাক উঠল—ঘ্রা-আ-আ-ম্! একবার। দুবার। তিন বার। আর তখন চারদিকে হলুদ আলোর বান ডাকিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ উঠে পড়ল আকাশে। কিন্তু সেই জ্যোৎস্নাতেও চারদিকটা আজ বড় ভুতুড়ে দেখাতে লাগল।

রাস্তাঘাট ফাঁকা, জনশূন্য। পথে কুকুর-বিড়াল পর্যন্ত নেই। সব দরজায় খিল পড়ে গেছে। হাড়-কাঁপানো শীতের বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

রাম কবিরাজ একা তাঁর দোকানঘরে বসে আছেন। আড্ডাধারীরা কেউ আজ আসেনি। চারদিক নিঃশব্দ। রাম কবিরাজ বসে-বসে ভাবছেন আর তামাক খাচ্ছেন। ভাবতে-ভাবতে এক সময়ে হঠাৎ আপন মনে বলে উঠলেন, "হুঁ, তাহলে এই হল ব্যাপার!"

যেই কথাটা বলেছেন অমনি তাকের ওপর শিশি-বোতল-গুলো ঠনঠন করে নড়ে উঠল। রাম কবিরাজ অবাক হয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলেন। ভাবলেন, মনের ভুল। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "হুঁ। তাহলে এই হল ব্যাপার!"

বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার শিশি-বোতলের ঠনঠন শব্দ।

রাম কবিরাজ জানেন, ঘাবড়ে গেলে বা উত্তেজিত হয়ে পড়লে কোনোদিন কোনো কাজ হয় না। এমনিতেও তিনি ভিতু মানুষ নন। কারণ, যারা সৎ ও ন্যায়পরায়ণ, তাদের ভয়ের কিছু নেই। মনটাকে শক্ত করে তিনি ইষ্টনাম জপ করতে লাগলেন। জপ করতে-করতেই বললেন, "কে? কী চাও?"

কপাটের আড়াল থেকে খোনা সুরে কে যেন বলে, "জপ বন্ধ করুন, নইলে কাছে আসি কী করে? আমার সময় নেই, কাজের কথাটা বলেই চলে যাব।"

রাম কবিরাজ জপ থামিয়ে বলেন, "এবার বলো।"

খোনা সুর কপাটের আড়াল থেকে ঘরের মধ্যে চলে আসে। কিন্তু রামবাবু কাউকে দেখতে পান না। বাতাসের ভিতর থেকে স্বরটা বলে, "ভয় পাবেন না। আমরা সব বুরুনের বন্ধুলোক। আমার নাম খোনাসুর।"

"বুরুন কোথায়?"

"গোসাঁই বাগানের পাতাল ঘরে। সমুদ্র দিঘির দক্ষিণের ঘাটে জলের তলায় ছয় নম্বর সিঁড়ির গায়ে যে ফাটল আছে সেইটেই হল সবচেয়ে সোজা রাস্তা। জলে ডুব দিয়ে ফাটলে ঢুকে দশ কদম হাঁটলেই পথ পাওয়া যাবে। যে পথ সোজা পাতালঘরে গেছে। সেখানে বুরুন আর ভুতুম দুজনেই আছে।"

"সেখানে যাওয়া যায় না?"

"তা যাবে না কেন? কৌশলে সব হয়। কিন্তু গিয়ে কিছু লাভ নেই। তারা সেখান থেকে আসতে চায় না।"

"সে কী?"

"আজ্ঞে সেই খবরটাই দিতে এলাম। হাবু তাদের বশী-করণ মন্ত্র দিয়ে আটকে রেখেছে। আমাদেরও মন্ত্রের জোরে বশ করে দিনরাত খাটাচ্ছে। একটুও জিরোতে পাই না। গা-গতরে ব্যথা। তা কবিরাজ-মশাইয়ের কাছে গা-ব্যথার কোনো ওষুধ আছে নাকি?"

"আছে। তবে সে মানুষের জন্য। তোমাদের কি আর সে ওষুধে কাজ হবে?"

"তাহলে শিগগির শিগগির আমাদের জন্যও ওষুধপত্র বের করে ফেলুন।"

রাম কবিরাজ চিন্তিত হয়ে বললেন, "কাজটা বড় সহজ নয় হে। প্রথমে ভেবে দেখতে হবে, তোমাদের যখন শরীরই

নেই, তখন অসুখটা হয় কোথায়। নাড়ীর গতি দেখে যে কিছু বুঝব তারও উপায় নেই। তারপর ধরো,তোমাদের পেট নেই, কাজেই ওষুধ পেটে গিয়ে ক্রিয়া করবে না। তোমাদের গায়ে মালিশও চলবে না। কাজেই তোমাদের জন্য বায়বীয় ওষুধ বের করতে হবে। সে কাজ ভারী শক্ত। তবে আমি চেষ্টা করব।"

খোনাসুর খুশি হয়ে বলে, "বড় উপকার হবে তাহলে কবিরাজ মশাই। আমাদের কথা তো কেউ ভাবে না। এই হাবু বদমাশটার কথাই ধরুন না। এখানে আসা ইস্তক কী অভৌতিক খাটানটাই না খাটাচ্ছে! বিছুটি-বন পরিষ্কার করো, কাঁটা-গাছ ওপড়াও, ঘর পরিষ্কার করো, দিঘির কচুরি-পানা তোলো, এটা আনো, সেটা নিয়ে যাও, অমুককে খবর দাও, তমুককে ধরে আনো কাজের কোনো শেষ নেই। তিন ধা নাচন নেচে মরছি। বাগে পেলেই হাবুর ঘাড় মটকাব।"

উৎসাহিত হয়ে রাম কবিরাজ বলেন, "সত্যি মটকাবে?"

"তবে আর বলছি কী? অবশ্য হাবুর ঘাড় মটকানো সহজ কাজ নয়। সে আমাদের মন্ত্রের জোরে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। ইচ্ছে থাকলেও কিছু করতে পারি না। তা বলে ভাববেন না যেন আমরা সবাই হাবুর হুকুম খুশি হয়ে তামিল করছি। সুযোগ বুঝলেই আমরা কাজে ফাঁকি দিই। এক লহমার কাজ করতে তিন দিন লাগিয়ে দিই, তিন দিনের কাজ সারতে তিন মাস কাটাই। আরবারে হাবুর কালী-পুজোয় ফটিকবাবু চাঁদা দেননি বলে হাবু রেগে গিয়ে আমাকে ডেকে বলল, যা তো, ফটিকের গোঁফ জোড়া উপড়ে নিয়ে আয়। আমি করলুম কী, ফটিকবাবুর গোঁফের বদলে তাঁর ছাগলের দাড়িগাছটা ছিঁড়ে নিয়ে গেলাম। হাবু প্রথমটায় বুঝতে পারেনি, পরে টের পেয়ে সে কী মার আমাকে! আমি মাথা চুলকে বললাম, আজ্ঞে অন্ধকারে ঠিক ঠাহর পাইনি। তখন আরো মারে দেখে বললাম, আজ্ঞে কানে ভাল শুনতে পাচ্ছি না। বুড়ো হচ্ছি তো, তাই ফটিক শুনতে ফটিকের ছাগল আর গোঁফ শুনতে দাড়ি শুনেছি। কিন্তু মানুষের উপকার করতে নেই কবিরাজ মশাই। এই যে ফটিকবাবুর একটা উপকার করেছিলাম, তার জন্য বরং ফটিকবাবুই উল্টে কত না শাপ-শাপান্ত করেছেন। বলেছেন, যে আমার ছাগলের দাড়ি ছিঁড়েছে তার ওলাউঠা হোক, সে নরকে যাক, নরকে যেন যমদূতেরা তাকে দশ হাজার বছর ধরে সেদ্ধ করে আরো দশ হাজার বছর ধরে ভেজে তারপর আরো দশ হাজার বছর রোদ্দুরে ফেলে রেখে শুকোয়।"

কবিরাজ মশাই সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "আহা, বুঝতে পারেনি ফটিক। আমি তাকে বুঝিয়ে বলবখন। তুমি রাগ কোরো না বাবা খোনাসুর।"

এই বলে কবিরাজ মশাই উঠে একটা কাগজের পুরিয়াতে একটু কর্পূর, গন্ধক, কালোজিরে, এলাচের গুঁড়ো, হিং এবং আরো কয়েকটা চূর্ণ মিশিয়ে টেবিলের ওপর রেখে বললেন, "এটা নিয়ে যাও। গায়ে-গতরে ব্যথা হলে বা হাঁফিয়ে পড়লে শুঁকে দেখো। এক শিশি কবিরাজী নস্যও নিয়ে যাও, ঐ তাকে আছে। এতে যদি কাজ হয় তবে আমি ভূতদের জন্য আরো নানা রকম ওষুধ বানাতে শুরু করব। আর সেই নতুন চিকিৎসাবিদ্যার নাম দেব ভৌত আয়ুর্বেদ।"

বাতাসের হাত বাড়িয়ে খোনাসুর পুরিয়াটা তুলে নিল। কবিরাজ মশাই দেখলেন পুরিয়াটা শূন্যে ভাসছে। খুব জোরে একটা শ্বাস টানার শব্দ হল। তারপর এক প্রবল হ্যাচ্ছোঃ। খোনাসুর বলে ওঠে, "আঃ! খুব ভাল কাজ হচ্ছে মশাই। গায়ের ব্যথাটা যেন হাঁচির সঙ্গে বেরিয়ে গেল। জব্বর ওষুধ।"

রাম কবিরাজ খুশি হয়ে বললেন, "ওষুধের জন্য আর ভেবো না। লোকে আজকাল আর কবিরাজের কাছে আসতে চায় না, হাতুড়ে এলোপ্যাথের দোরে গিয়ে ধর্না দেয়। সেই-জন্য মানুষের চিকিৎসা করতে আর রুচি হয় না। এবার থেকে না হয় ভূতেদের চিকিৎসা করে দেখব।"

খোনাসুর আর একবার হাঁচি দিয়ে বলল, "যে আজ্ঞে।"

রামবাবু গলায় আদর মাখিয়ে বললেন, "এবার বলো তো বাবা খোনাসুর, ছেলেদুটোকে উদ্ধার করি কোন উপায়ে?"

খোনাসুর ভয়-খাওয়া গলায় বলে, "ও বাবা! উদ্ধার করা বড় কঠিন কাজ কবিরাজ মশাই। যদি বা কোনো রকমে উদ্ধার করতে পারেন, তবে তাকে বাঁচাতে পারবেন না।"

রামবাবু চিন্তিত হয়ে বললেন, "তাহলে উপায়?"

"যদি কোনো রকমে বুরুন নিজের মনের জোর খাটিয়ে বশীকরণের মন্ত্র কাটতে পারে, একমাত্র তবেই সে উদ্ধার পাবে। এ বাইরের লোকের কাজ নয়। যা করবেন ভেবে চিন্তে করবেন...হ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যাঁচ্ছো...আঃ, আপনার ওষুধে খুব কাজ হচ্ছে মশাই।"

রামবাবু পরম তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, "তা আর হবে না! আমি হলাম ডাকসাইটে রাম কবিরাজ, মড়া বাঁচাতে পারি—"

কিন্তু কথাটা ভাল করে শেষ করার আগেই কবিরাজ মশাই টের পেলেন যে, পুরিয়া সমেত খোনাসুর সাঁ করে পালিয়ে গেল। রামবাবু বার বার ডাকাডাকি করেও আর তার সাড়া পেলেন না। 'কী হল রে বাবা' বলে কবিরাজ মশাই ভাবতে লাগলেন। তারপর তাঁর খেয়াল হল, অন্যমনস্কভাবে তিনি খোনাসুরের সামনে নিজের নামটা উচ্চারণ করে ফেলেছেন। ও নাম ওদের সহ্য হয় না। মনে মনে তিনি ঠিক করলেন ভূতেদের চিকিৎসা যদি করতেই হয় তবে ওদের সামনে নিজের নামটা ভুলেও মুখে আনা চলবে না।

৯

করালীবাবু দোল পূর্ণিমার জ্যোৎস্না রাতে তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তায় পায়চারি করছিলেন। ভারী শক্ত একটা রুট-ওভার সকাল থেকে কষবার চেষ্টা করছেন। পারেননি। পারবেন কী করে? সারাদিন গাঁয়ের ছেলেবুড়ো হুল্লোড় করে রং খেলেছে। অত হুল্লোড়ে কি অঙ্ক হয়? অঙ্ক হয়নি বলে করালীবাবুর মাথাটা তেতে আগুন হয়ে গেল। প্রায়ই এরকম হয়। আর মাথা গরম হলে বরাবর, কী শীত কী গ্রীষ্ম, কী দিন কী রাত, করালীবাবু গিয়ে পুকুরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গলা অবধি ডুবিয়ে বসে থাকেন। আর এই অভ্যাসের ফলে করালীবাবু নিজের অজান্তেই খুব বড় সাতারু হয়ে গেছেন। ইচ্ছে করলে তিনি পাঁচ সাত দশ মিনিট পর্যন্ত জলের নীচে ডুব দিয়ে থাকতে পারেন। বলতে কী, সাঁতারের কম্পিটিশনে নামলে করালীবাবুকে হারানোর মতো লোক নেই।

সে যাই হোক করালীবাবুর রুট ওভারের অঙ্কটা হয়নি আজ। সন্ধে অবধি পুকুরে ডুবে থেকে তাঁর মাথাটা এখন একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। রাস্তায় পায়চারি করতে করতে তিনি গোল চাঁদটার দিকে তাকিয়ে জিরো সংখ্যাটার কথা ভাব-ছিলেন। আর এই ভেবে অবাক হচ্ছিলেন যে, জিরোর মতো এত রহস্যময় ব্যাপার আর কিছুই নেই। ভেবে দেখলে জিরো বা শূন্যই হচ্ছে সব সংখ্যার উৎস। পৃথিবীর যাবতীয় সংখ্যা-তত্ত্বের মূলে রয়েছে ঐ শূন্য।

চারদিকে বানডাকা জ্যোৎস্নায় গাছপালা, আকাশ, মাটি এই যে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে, এর পিছনেও আছে একটা

প্রোপোরশন বা অনুপাত। আকাশ কতটা পরিষ্কার থাকলে, কতখানি জ্যোৎস্না উঠলে, কতগুলো গাছপালা এবং কতখানি মাঠ-ময়দান থাকলে কতটা সৌন্দর্যের সৃষ্টি হবে, তার পিছনেও কি অঙ্ক নেই ?

আসলে আকাশে, বাতাসে, জ্যোৎস্নায় বা অন্ধকারে সর্বত্রই অঙ্কের প্রভাব। ভেবে ভারী মুগ্ধ হয়ে গেলেন করালীবাবু।

আর ঠিক এই সময়েই বাতাস ছিঁড়ে, জ্যোৎস্না কাঁপিয়ে ভয়ংকর এক বাঘের ডাক উঠল 'ঘ্রা-ড়া-ড়া-ড়া—ম'! একবার। দুবার। তিনবার। 'বাঘ! বাঘ!' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে চারদিকে লোকজন দৌড়ে ঘরে বাড়িতে ঢুকে পড়ছে। করালীবাবু একটু চমকালেন বটে, কিন্তু ঘাবড়ালেন না। শুধু আপনমনে বললেন, "সাউণ্ড! সাউণ্ড মিনস ভাইব্রেশন। অ্যান্ড ভাইব্রেশন মিন্‌স এনার্জি।"

অনেক ভেবে করালীবাবু দেখলেন এই সুন্দর প্রোপোরশনেট জ্যোৎস্নারাতের মধ্যে বাঘের ডাকের মতো একটা নতুন এনার্জি বা ভাইব্রেশন ঢুকে পড়ায় প্রোপোরশনটা নষ্ট হয়ে গেল। অর্থাৎ পূর্ণিমার সৌন্দর্যটা আর রইল না। মানুষ ভয় পেয়ে গেল। আচ্ছা, ভয়টাও কি কোনো এনার্জি ? নাকি অ্যাবসেনস অব এনার্জি ?

বাড়ির লোকজন এসে করালীবাবুকে বাড়িতে ধরে নিয়ে গেল।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে পুব আকাশের দিকে চেয়ে টকটকে লাল সূর্যটা দেখে করালীবাবু আবার শূন্য সংখ্যাটা নিয়ে ভাবতে লাগলেন। শূন্যকে গুণ করা যায় না, ভাগ করা যায় না, শূন্য থেকে কিছু বিয়োগ করা যায় না—সব সময়েই নিটোল শূন্য থাকে।

এইসব ভাবতে ভাবতে করালীবাবু স্নান করলেন, খেলেন, ইস্কুলে গেলেন।

ইস্কুলে আজ বিশাল হট্টগোল। ছেলেরা কেউ ক্লাসে যাচ্ছে না। ইস্কুল বসবার ঘণ্টা পড়ছে না। চারদিকে লোকজন খুব গম্ভীর মুখে কথাবার্তা বলছে। শোনা গেল, কাল থেকে ইস্কুলের দুটি ছেলে বরুন আর ভুতুম নিরুদ্দেশ। কোথাও তাদের হদিশ মিলছে না। আবার গতকালই গঞ্জে বহুবার বাঘের ডাক শোনা গেছে। সকলে তাই দুইয়ে-দুইয়ে চার করে নিয়েছে। বেশির ভাগ লোকেরই ধারণা, বরুন আর ভুতুম এখন বাঘের পেটে। সুতরাং একদল ছাত্রের দাবি, বরুন আর ভুতুমের নামে শোক-প্রস্তাব নিয়ে ইস্কুল ছুটি দেওয়া হোক। কেউ কেউ বলছে, ছেলেদুটোকে কোনো দুষ্টু লোক চুরি করে নিয়ে গেছে। কেউ বলছে, তারা সমুদ্রদিঘিতে ডুবে গেছে।

সে যাই হোক, বরুন নিরুদ্দেশ হওয়াতে করালীবাবু খুবই হতাশ হলেন। বরুনের মত ছাত্র তিনি জীবনে দেখেননি। যদিও গত বার্ষিক পরীক্ষায় বরুন অঙ্কে তেরো পেয়েছিল, তবু ইদানীং অঙ্কে তার প্রতিভা দেখে করালীবাবুর দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, এ-ছেলে আইনস্টাইনের মতো বড় হবে। এরকম ছাত্র খোয়া গেলে কার না দুঃখ হয় ? বরুন তাঁকে একবার বলেছিল, "স্যার, অঙ্কের নিয়মে এক-এ এক-এ যোগ করে আমরা দুই করি, কিন্তু সেটা কি ঠিক ? পৃথিবীতে কোনো একটা জিনিসই ঠিক আর একটার মতো নয়। একটা গাছের লক্ষ পাতার মধ্যে মিলিয়ে দেখলেও দেখা যাবে, একটা পাতা হুবহু আর একটার মতো হয় না, আকার গঠন রং ওজন ইত্যাদিতে কিছু না কিছু তফাত থাকবেই। এমন কী, এক কণা বালির সঙ্গেও আর-এক কণা বালির তফাত আছে। কাজেই একের সঙ্গে এক যোগ করে দুই হয় না, কারণ দুটো এক তো আলাদা।" করালীবাবু খুবই অবাক হয়ে বলেছিলেন, "তাহলে কী হবে ? বরুন জবাব দিয়েছিল, "এক-এর সঙ্গে এক যোগ করলে পাই দুটো এক। তেমনি তিনটে এক বা চারটে এক।"

এইটুকু বয়সে বরুনের মাথায় এক-এর তত্ত্ব খেলতে দেখে করালীবাবু আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। করালীবাবুও জানেন, বস্তুতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে পৃথিবীতে কখনো দুটো জিনিস ঠিক একরকম হতেই পারে না। তাহলে এক-এর সঙ্গে এক যোগ করে দুই হয় কী করে ? এই নিয়ে করালীবাবু প্রায়ই ভাবেন।

হেডস্যার শচীন সরকার মাস্টারমশাইদের ডেকে বললেন, "যতদূর মনে হচ্ছে হতভাগ্য ছেলেদুটিকে বাঘেই নিয়েছে। কিন্তু প্রমাণ ছাড়া কনডোলেনস মিটিং করতে পারি না। তবে বাঘের উপদ্রবে ছেলেদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে ইস্কুল ছুটি দিয়ে দিচ্ছি। আপনারাও সতর্ক থাকবেন।"

হেডমাস্টারমশাইয়ের কথা শুনতে শুনতে এত দুঃখেও করালীবাবুর মাথায় অঙ্ক খেলছিল। তিনি ভাবছিলেন, দুটো ছেলেকে যদি একটা বাঘে খায় তবে একের সঙ্গে দুই যোগ হয়ে অঙ্কের নিয়মে হয় তিন। কিন্তু আদতে দুটো ছেলে প্লাস একটা বাঘ ইজ ইকুয়াল টু হয় একটা বাঘ। বরুন, ভুতুম আর বাঘ মিলে তিনটে প্রাণী হয়নি। অঙ্কের নিয়ম এখানে ব্যর্থ। আরো দুঃখের কথা, বরুনের মতো অঙ্কের ভাল ছাত্রকে খেয়ে ফেলেও বাঘটার অঙ্কের মাথা খোলার কোনো সম্ভাবনাই নেই। বাঘটা টেরই পাবে না সে অঙ্কের জগতের কত বড় একটা প্রতিভাকে ধ্বংস করেছে।

আবেগে করালীবাবুর চোখে জল এল। রাগে তাঁর গা ফুলতে লাগল। আপনমনে তিনি বললেন, "বাঘটাকে নিকেশ করতেই হবে।"

গেম স্যার পাশেই বসে ছিলেন। করালীবাবুর কথাটা তাঁর

কানে যেতেই তিনিও চোখ মুছে ধরা গলায় বললেন, "বুরুনের ওপর আমার অনেক আশা ছিল। অলিম্পিক থেকে তার অন্তত দশ-বারোটা সোনার মেডেল আনার কথা। বদমাশ বাঘটাকে নিকেশ করার কথা আমিও অনেক ভেবেছি। কিন্তু শুনছি সেটা নাকি কোন তান্ত্রিকের বাঘ, সে তান্ত্রিক আবার মন্ত্র-তন্ত্র-বশীকরণ জানে।"

করালীবাবু অঙ্ক আর বিজ্ঞান ছাড়া কিছুই মানেন না। তাই হা-হা করে হেসে বললেন, "কিচ্ছু ভাববেন না। আমাকে একটা মজবুত দেখে লাঠি সোটা যা হোক কিছু দিন তো! তারপর দেখবেন এনার্জি মোমেণ্টাম আর ভেলোসিটির কাছে সব মন্ত্রতন্ত্র ধুলো হয়ে যাবে।"

গেম স্যার খুশি হয়ে বললেন, "সে আর বেশি কথা কী? জ্যাভেলিনটাই নিয়ে যান। বল্লমকে বল্লম, লাঠিকে লাঠি।"

তাই হল। ছেলেরা যখন যে যার বাড়ি গেল, রাস্তাঘাট যখন একটু নির্জন হল, তখন জ্যাভেলিনটা কাঁধে ফেলে করালীবাবু হনহন করে গোসাঁইবাগানের দিকে রওনা হলেন।

রাম কবিরাজ দাওয়ায় বসে তামাক খেতে খেতে আকাশ-পাতাল ভাবছিলেন। বাড়ির লোকেরা সব প্রবল কান্নাকাটি করছে। তিনিও কোনো উপায় বের করতে পারছেন না। বুরুন গোসাঁইবাগানের পাতালঘরে আছে। সেখানে পৌঁছনো শক্ত হলেও অসম্ভব নয়। খোনাসুর শর্টকাট রাস্তা বলে দিয়ে গেছে। যে-কোনো ভাল সাঁতারুর পক্ষেই সেখানে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু মুশকিল হল, বুরুনের ভিতরে মনের জোর সৃষ্টি করা। বুরুনের ইচ্ছাশক্তি না জাগলে সে মন্ত্র কাটিয়ে বেরোতে পারবে না।

ভেবে ভেবে রোগা হয়ে গেছেন কবিরাজমশাই। চোখের কোলে কালি।

হঠাৎ রাস্তা দিয়ে করালীবাবুকে একটা বল্লম কাঁধে হেঁটে যেতে দেখে রামবাবুর মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। তিনি লাফ দিয়ে দাওয়া থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে গিয়ে করালীবাবুর কাছা টেনে ধরে বললেন, "করালীবাবু! চললেন কোথায়?"

করালীবাবু বুরুনের দাদুকে দেখে ব্যথিত মুখ করে বললেন, "বুরুনের জন্য আমরা সবাই দুঃখিত রামবাবু। আমি বাঘটাকে শিক্ষা দিতে যাচ্ছি।"

রামবাবু খুশি হয়ে তাঁর বিচক্ষণ চোখ দিয়ে করালী-বাবুর চেহারাটা ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, "আপনার বীরত্বে ভারী আনন্দ পেলাম। যাওয়ার আগে দয়া করে আমার একটা পাঁচন খেয়ে যান, তাতে গায়ে বল হবে। আর সেই সঙ্গে দুটো একটা গোপন শলা-পরামর্শও দিয়ে দেব। সবসময়ে বীরত্বে কাজ হয় না, কৌশলও চাই।"

এই বলে করালীবাবুকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন রামবাবু।

অনেকক্ষণ তাঁদের শলাপরামর্শ চলল।

১০

সন্ধের পর আজও শেষ ডাউন গাড়ি ইস্টিশান ছেড়ে কু-ঝিক-ঝিক মিষ্টি শব্দ তুলে চলে গেল। একটু বাদেই প্রতি-পদের চাঁদ একগাল হাসি ছড়িয়ে আকাশে উঠে পড়ল। এক-পাল শেয়াল চেঁচিয়ে উঠল কোথায় যেন, আর সেই শব্দে পাড়ার কুকুরগুলো ধমক-ধামক শুরু করে দিল। আর হঠাৎ এ-সময়ে করুণ সুরে ডেকে উঠল ফেউ। সবাই জানে ফেউ হল বাঘের সঙ্গী। ফেউয়ের ডাক মিলিয়ে যেতে না যেতেই 'হুা-আ-ড়া-ড়া-হুম!' ডাকে কেঁপে উঠল চারদিক। সেই শব্দে সন্ধে-রাতেই লোকালয়ে নিশুত নিস্তব্ধতা নেমে আসে। যে যার ঘরে বসে প্রাণভয়ে কাঁপে।

শহরের দক্ষিণধারে ভয়ংকর গোসাঁইবাগানের ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে অকুতোভয়ে এগিয়ে চলেছেন করালী স্যার। কাঁধে জ্যাভেলিন। রাম কবিরাজ করালীবাবুর গায়ে একটা ভারী দুর্গন্ধ তেল মাখিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, শীতের রাতে ঠাণ্ডা জলে নামতে আর ভয় রইল না। এ ভারী দুষ্প্রাপ্য তেল। এটা মেখে দক্ষিণ মেরুতে গেলেও নিউমোনিয়া ধরবে না। তা তেলটা বোধহয় ভালই হবে, কিন্তু ভারী বিশ্রী

গন্ধ।" কবিরাজমশাই করালীবাবুকে খানিকটা পাঁচনও খাইয়ে দিয়েছেন। সে পাঁচনটাও খেতে বিশ্রী। কিন্তু সেটা খাওয়ার পর থেকে মনটায় খুব স্ফূর্তি পাচ্ছেন করালীবাবু, আর মাথাটাও ঠান্ডা রয়েছে।

নিঃশব্দে সমুদ্রদিঘির ধারে এসে পৌঁছলেন করালীস্যার। একটা বাঁশঝোপের আড়ালে ছায়ায় দাঁড়িয়ে চারদিকটা একটু হিসেব করে নিলেন। চারদিক ছমছম করছে। জ্যোৎস্নার মুখে যেন একটা ভুতুড়ে কুয়াশার ঠুলি। চারপাশে যেন ছায়া-ছায়া অশরীরী ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু ভয়-ভয় করল করালীবাবুর। মনে-মনে একটা রুট ওভার করে ফেলতেই ভয়টা কেটে গেল। দিঘিটা সমুদ্রের মতোই বিশাল বটে। কিন্তু তাঁকে অতটা পার হতে হবে না। কবিরাজমশাইয়ের কথামতো ঠিক নিশানায় হেঁটে তিনি পশ্চিম দিকের ধারে চলে এসেছেন। এখান থেকে দক্ষিণের ঘাটে স্থলপথে যাওয়া আর নিরাপদ নয়। যেতে হবে জলে নেমে সাঁতরে। করালীবাবু হিসেব করে দেখলেন, এখান থেকে আগাগোড়া ডুব-সাঁতারে যেতে কম করেও বিশ মিনিট লাগবে। কিন্তু তাতে ঘাবড়ালেন না মোটেই। শুধু জলে নামার আগে বাঁশঝোপের আড়ালে বসে মনে-মনে খুব শক্ত একটা ইকোয়েশন কষে ফেললেন।

তারপর জামা-কাপড় খুলে শুধু একটা হাফপ্যান্ট-পরা অবস্থায় বাঁশঝোপের ছায়া থেকে সাপের মতো বুকে হেঁটে জ্যাভেলিন সমেত নিঃশব্দে জলে নেমে গেলেন করালীবাবু।

একটু শীত করছিল বটে, কিন্তু সে তেমন কিছু নয়। তবে অসুবিধে হচ্ছিল জলের তলাটা অন্ধকার বলে। কোন্ দিকে যাচ্ছেন, ঠিক নিশানায় এগোচ্ছেন কিনা তা বুঝতে পারছিলেন না। তবু নিঃশব্দে এগিয়ে চললেন। হঠাৎ টের পেলেন, তাঁর আশেপাশে খুব বড় বড় ডুবোজাহাজ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আতঙ্কে হিম হয়ে গেল তাঁর গা। সর্বনাশ! শত্রুপক্ষের যে ডুবোজাহাজ আছে তা তো জানা ছিল না তাড়াতাড়ি ভেসে উঠলেন করালীবাবু। আকাশে চাঁদের দিকে চেয়ে দশ লক্ষ দশ হাজার দশকে তিন লক্ষ তিন হাজার তিন দিয়ে ভাগ করে ফেললেন মনে-মনে। মনটা ভাল হয়ে গেল। ভাল করে চারদিকে চেয়ে দেখলেন, দক্ষিণের ঘাটে যেতে এখনো বেশ খানিকটা পথ বাকী। জ্যাভেলিনটা বাগিয়ে ধরে আবার ডুব দিতেই ভুল ভাঙল। ডুবোজাহাজ বলে যেগুলোকে ভেবেছিলেন সেগুলো আসলে সমুদ্রদিঘির বিখ্যাত কালবোশ, চিতল, বোয়াল, কাতলা আর পাকা রুই মাছ। এ-দিঘির মাছ কেউ ভয়ে ধরে না, তাই বহু-কাল ধরে বেড়ে-বেড়ে মাছগুলোর চেহারা হয়েছে পেল্লায়, গায়ে শ্যাওলা জমে গেছে।

আর একবার দম নিতে উঠে ফের ডুব দিতেই করালীবাবু একেবারে মুখোমুখি দেখেন, এক বিকট মূর্তি বিশাল হাত বাড়িয়ে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিকট দাঁত দেখিয়ে হাসছেও। করালীবাবু জ্যাভেলিন বাগিয়ে ধরে মনে-মনে আর একটা ইকোয়েশন করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভয়ে কিছু মনেই পড়ল না। বিকট মূর্তিটা জ্যাভেলিন বাগানো দেখেও ভয় খায়নি, হাত-পা ছড়িয়ে হাসছে। কিন্তু একটুও নড়েনি। করালীবাবু সাহস পেয়ে আর-একটু কাছে এগিয়ে দেখেন, ও হরি! এ যে সদ্য বিসর্জন-দেওয়া একটা কালীমূর্তি! এখনো কাঠামো থেকে মাটি বা রং খসেনি ভাল করে।

তিন নম্বর শ্বাস নিয়ে দম ধরে রেখে করালীবাবু দক্ষিণের ঘাট বরাবর পৌঁছে খুব সন্তর্পণে যেই আর-একবার শ্বাস নেওয়ার জন্য মাথা তুলেছেন অমনি খুব কাছেই বাজ-ডাকার মতো বাঘ ডাকল 'ঘ্রা-ড়া-ড়া-হু-ম্!"

সেই ডাকে খানিকটা অবশ হয়ে গিয়ে ডুব দিতে ভুলেই গেলেন করালীবাবু। খোলামেলা ঘাটের কাছে জ্যোৎস্নায় বোকার মতো মাথা উঁচু করে রয়েছেন। হঠাৎ ঘাটের পৈঠায় একটা বিশাল চেহারার মানুষের ছায়া দেখা গেল। লোকটা হুংকার দিয়ে বলে উঠল, "কে রে?"

করালীবাবু টুপ করে ডুব দিলেন। আসলে নিজের ইচ্ছেয় যে ডুব দিলেন তা নয়, মনে হল কে যেন তাঁর ঠ্যাং ধরে জলের নীচে টেনে নিয়ে ছেড়ে দিল। ভাগ্যিস টানল! নইলে তাঁর শরীর এমন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ডুব দেওয়ারও ক্ষমতা ছিল না।

জলের নীচে ছয় নম্বর ডুবো সিঁড়িটা খুঁজতে আরো কিছু সময় লাগত। কিন্তু মজা হল, করালীবাবু ডুববার সঙ্গে-সঙ্গে কে যেন তাঁর হাতের জ্যাভেলিনটা ধরে খুব আস্তে তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা ফাটলের মুখে ছেড়ে দিল।

কী হচ্ছে, ধরা পড়ে গেছেন কিনা, তা বুঝতে পারছিলেন না করালীবাবু। কিন্তু ভাববার সময় নেই। মনে মনে একটা সহজ ফ্যাকটর কষে নিয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে কয়েক কদম হাঁটতেই একটা পথ পেলেন। এখানে জল কোমর-সমান। পথটা উঁচু হয়ে উঠে গেছে। ঘোর অন্ধকারেও হাতড়ে-হাতড়ে বুঝলেন।

খুব দূর থেকে একটা সোরগোলের আওয়াজ আসছে। ওরা কি তবে টের পেল?

সময় নেই। করালীবাবু জ্যাভেলিন হাতে অন্ধকার পথটা বেয়ে উঠে গেলেন। নিখাদ অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গ। পদে পদে নুড়ি পাথর, শ্যাওলা, ঘুমন্ত ব্যাং পায়ের নীচে টের পাচ্ছেন। একটা সাপকেও কি মাড়ালেন? কে জানে! তবে করালীবাবু এগিয়ে গেলেন ঠিকই। অন্ধকারে ক্যালকুলেশন চলে না বলে বারকয়েক আছাড়ও খেলেন। তবু এগোলেন। বেশি দূর যেতে হল না। পাঁচ-নম্বর আছাড়ের পর সোজা গিয়ে একটা দরজায় সজোরে ধাক্কা খেয়ে 'বাবা রে' বলে বসে পড়লেন।

কিন্তু বিশ্রামের সময় নেই। হাতড়ে দেখেন দরজার গায়ে পুরনো তালা ঝুলছে। এক মুহূর্ত চিন্তা না করে জ্যাভেলিনের ফলাটা তালার ভিতরে ঢুকিয়ে চাড় দিতেই মরচে-ধরা তালা হড়াক করে খুলে গেল।

ঘরের ভিতরে কোনো আলো ছিল না, তবে অনেক ওপরের একটা বড় ঘুলঘুলি দিয়ে পুরো চাঁদটা দেখা যাচ্ছে। আর চাঁদটা ঠিক টর্চের মতো ফোকাস ফেলেছে সোজা বুরুনের মুখের ওপর। করালীবাবু দেখেন একটা চটের বিছানায় পাশাপাশি বুরুন আর ভুতুম শুয়ে ঘুমোচ্ছে। খুব শান্ত মুখ, মুখে একটু হাসি, তবে আবছা আলোতেও বোঝা যায়, ওরা খুব দুর্বল। একটুও নাড়াচাড়া বুঝি সইবে না। দুদিনেই রোগা হয়ে গেছে ছেলে দুটো।

বুরুনকে একটা কথা বলতে হবে। রাম কবিরাজ কথাটা বারবার শিখিয়ে দিয়েছেন করালীবাবুকে। কিন্তু কথাটা এতই সামান্য, এতই ছেলেমানুষী যে, সে কথাটা বুরুনকে বলার কোনো মানেই হয় না। অথচ রামবাবু বারবার তাঁকে বলে দিয়েছেন যে, এই বাক্যটা নাকি বুরুনের পক্ষে মন্ত্রের মতো কাজ করবে। কবিরাজমশাই বিচক্ষণ মানুষ। তাঁর ওপরে কথাও চলে না।

কথাটা বলার জন্য করালীবাবু আস্তে আস্তে বুরুনের শিয়রের কাছে এগিয়ে গেলেন। হাঁটু গেড়ে বসলেন। খুবই সোজা কথা। কবিরাজমশাই বলে দিয়েছেন একটু চেঁচিয়ে নামতার সুরে কথাটা বারকয়েক আওড়াতে হবে। কবিরাজমশাই বারবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কথাটা মনে থাকবে তো করালীবাবু? ভুলে যাবেন না তো? যতই সামান্য শোনাক, এ-কথাটা কিন্তু বুরুনের বেঁচে থাকার পক্ষে খুব জরুরি।"

ফুঃ! তখন হেসেছিলেন করালীবাবু। এর চেয়ে কত

শক্ত শক্ত কথা তার মনে থাকে। আর এ তো কোনো কথাই নয়। জলের মত সোজা একটা বাক্য। নামতার সুরে বলতে হবে।

ঘরের বাইরে হঠাৎ খুব কাছেই আবার 'ঘ্রা-ড়া-ড়া-হু-উ-ম' করে ডাক শোনা গেল আর একটা ধীর ভারী পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল।

সময় নেই. করালীবাবু বুরুনের কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব চেঁচিয়ে কথাটা বলতে গিয়েই বিস্ময়ে থ হয়ে গেলেন। কথাটা তাঁর একদম মনে নেই! বেমালুম ভুলে গেছেন।

'ঘ্রা-ড়া-ড়া-ড়া—হু-উ-ম !' আবার ডাকল বাঘটা। এবার খুব কাছেই। পায়ের শব্দটাও এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে।

করালীবাবু নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলছেন রাগে। কথাটা কিছুতেই মনে পড়ছে না যেঃ......হ্যাঁ হ্যাঁ একটা শব্দ ছিল অঙ্ক.....আর একটা যেন কী......কী যেন ......তেরো......তেরো......হ্যাঁ......

ওদিকে আর একটা দরজা। সেই দরজার লোহার হুড়কো খোলার শব্দ হচ্ছে।

করালীবাবুর হাতের খামচায় একগোছা চুল তাঁর মাথা থেকে উপড়ে এল। ......তেরো......তেরো......নামতার সুরে ......বুরুন......বুরুন......বুরুন......

দরজার পাল্লাটা ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দে খুলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। একটা মশালের হলুদ আলো দেখা দিল দরজার ফাঁকে। এক মস্ত চেহারার রক্তাম্বর-পরা লোক পাথরের মতো মুখে মশাল উঁচুতে তুলে ধরে ধীরে এগিয়ে আসে। তার পিছনে বিশাল ডোরাকাটা কালো-হলুদ বাঘ।

করালীবাবুর অবশ হাত থেকে জ্যাভেলিনটা পড়ে গেল মেঝেয়। বিস্ময়ে হ্যাঁ করে আছেন। মাথাটা ফাঁকা।

বাঘটা ডাকল, অং-ঘ্র-ড়-ড়-অ......

কী সাংঘাতিক রক্ত-জল-করা ডাক!

করালীবাবু অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন। যেতেনই. তবে একেবারে শেষ মুহূর্তে পুরো বাক্যটা মনে পড়ে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে করালীবাবু পাঠশালার সর্দার-পোড়োর মতো বিকট সুরে চেঁচাতে লাগলেন, "বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো! বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো! বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো! বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো! বুরুন তুমি......"

পাথরের মতো বিশাল চেহারার লোকটা এগিয়ে আসতে-আসতে হুঙ্কার দিল, "মা! মা গো! নর-রক্ত চাস মা? শব-সাধনা চাস মা? আজ তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

করালীবাবু সব ভুলে গেছেন, নিজের নামটাও মনে নেই। কিন্তু তিনি একনাগাড়ে নিখুঁত নামতার সুরে প্রাণপণে বলেই চলেছেন। বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো! বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো......"

"ঘ্রা-ড়া-ড়া-ড়া-হু-উ-ম!"

"তারা! তারা! মা!"

"ঘ্রা-ড়া-ড়া-হু-উ-ম।" বলে আর একবার ডাক ছেড়ে বাঘটা বিদ্যুৎবেগে লাফিয়ে পড়ল সামনে।

করালীবাবু শুধু টের পেলেন যে, বাঘটা তাঁর প্যান্টের কোমর কামড়ে ধরে পুঁটিমাছের মতো মুখে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর সেই বিশাল লোকটা হুংকার দিয়ে বলছে, "তারা! তারা!"

করালীবাবু বাঘের মুখ থেকে ঝুলে থেকেও প্রচণ্ড চেঁচিয়ে বলে যেতে লাগলেন, "বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো! বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো! বুরুন তুমি......"

ছোট্ট একটা খেলনা-এরোপ্লেনে করে বুরুন আর ভুতুম চাঁদের রাজ্যে চলে এসেছে। ভারী সুন্দর সোনালী মাঠ এখানে। সোনালী গাছপালা, সোনা রঙের ঘাস, আকাশে সোনাছড়ানো আলো।

চাঁদের বুড়ি চরকা থামিয়ে তাদের জন্য পিঠে বানাতে বসেছে। বুরুন আর ভুতুম চলল ততক্ষণে কাছের ছোট একটা রুপোলি পাহাড়ের জলে স্নান করতে।

চারদিকে পাখি ডাকছে। ময়ূর উড়ে বেড়াচ্ছে। মেঘের ভেলায় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা। চারদিকে খেলা, ম্যাজিক, চড়ুইভাতি, সার্কাস, আইসক্রীম। পড়া-শুনোর বালাই নেই, ইস্কুল-পাঠশালা নেই। শুধু মজা আর মজা।

ভুতুম বলল, "বুরুনদা, আমরা কিন্তু কোনোদিন ফিরে যাব না।"

"দূর! কে ফিরবে?"

বুরুন আর ভুতুম ম্যাজিক দেখল, সারকাস দেখল, বাচ্চাদের সঙ্গে খেলল, আইসক্রীম খেতে খেতে গিয়ে ঝর্নার জলে ইচ্ছেমতো স্নান করল, ঝর্নার নীচে একটা সুন্দর পুকুরে সাঁতার কাটতে লাগল।

হঠাৎ বুরুন শুনতে পেল এত আনন্দ আর অফুরন্ত মজার মধ্যে কে যেন হঠাৎ রসভঙ্গ করে বলে উঠল, "বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো!"

দপ করে যেন চারদিকের আনন্দের আলোটা নিবে গেল

পথচলা

অখিল নিয়োগী (স্বপন বুড়ো)

পথ চলা সোজা নয়—উঁচু-নিচু আছে,
চোখ চেয়ে চললেই তবে প্রাণ বাঁচে।
কোথা পথ আঁকাবাঁকা কোথা পথ সরু,
কোথায় খন্দ খানা, কোথা শুয়ে গরু।
পথের পাশেই কোথা কাদা-ভরা খাল,
সেথা করে হুটোপুটি শুয়োরের পাল!
পথে কোথা ফেলে রাখে রাশি রাশি খোয়া,
হোঁচট খেলেই চোখে দেখবি যে ধোঁয়া!
শিবের-বাহন শুয়ে আছে পথে ষণ্ড—
শিঙের গুঁতোয় হবি ময়দার মণ্ড!
পথ চলা সোজা নয়,— ওল্টায় ছাতা,
রোদ্দুরে ফেটে যায় টাক-ভরা মাথা।
কলার খোসায় কভু চিৎপাত পড়লে—
রুখবে না কেউ ভাই,—নির্ঘাত মরলে!
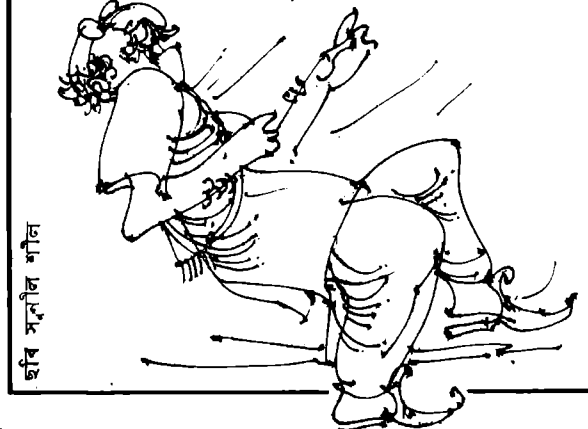
বুরুনের চোখে। মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। চারদিকে চেয়ে সে কে কথাটা বলল তা খুঁজছিল। সন্দেহবশে একটা পাখিকে ঢিল মেরে তাড়িয়ে দিল বুরুন। কিন্ত তবু কে যেন আবার বলে উঠল, "বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো! বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো!"

ভারী রেগে গেল বুরুন। ভীষণ চেঁচিয়ে বলল, "ভাল হবে না বলছি!"

কিন্তু আবার আড়াল থেকে, আবডাল থেকে, বাতাস থেকে, আকাশ থেকে কথাটা আসতেই লাগল, "বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো! বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো! বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো!"

রাগে বুরুন দশখানা হয়ে গেল। এক লাফে ঝর্নার জল থেকে উঠে বড়-বড় ঢিল তুলে চারদিকে ছোঁড়ে আর চেঁচায়, "ভাল হবে না বলে দিচ্ছি! সব ভেঙে ফেলব! সব নষ্ট করে দেব!"

পায়ের নীচে মাটি বলে উঠল, "বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো!"

পাহাড় বলে ওঠে, "বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো!"

তারপর সমস্বরে গাছপালা পাখি, নদী জল, চাঁদ, মেঘ সবাই নামতার সুরে বলতে থাকে, "বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো! বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো! বুরুন তুমি......"

রাগের চোটে বুরুন একটা গাছ উপড়ে নেয়। তারপর দুহাতে ধরে এলোপাথারি চারদিকে সব কিছু ভাঙতে থাকে। আকাশ ভাঙে, পাহাড় ভাঙে, মাটি ভাঙে........ভাঙতে...... ভাঙতে......ভাঙতে......চারদিকের সব ফাঁকা হয়ে যায়।...... সব মিলিয়ে যায়।

পাতালঘরে আস্তে করে বুরুন চোখ মেলে তাকায়। তাকিয়েই বুঝতে পারে, তার ওপর এতক্ষণ যে স্বপ্নের ভার চাপানো ছিল, তা সরে গেছে।

তার কানের কাছে ফিসফিস করে কে যেন বলে ওঠে, "বুরুন, এই প্রথম একজন নিজের শক্তিতে হাবুর মন্ত্র কেটে বেরিয়ে আসতে পারল। সাবাস! হাবুর আর কোনো ক্ষমতাই রইল না। যেই মুহূর্তে হাবুর মন্ত্র তুমি কেটেছ, সেই মুহূর্তেই হাবুর সব শক্তি চলে গেছে।"

বুরুন বলল, "নিধিদা!"

কিন্তু নিধিরাম তখন কোথায়! পলকে বাতাসের বেগে সে ছুটে গেছে তার দলবলকে খবর দিতে।

সুড়ঙ্গ ধরে মশাল-হাতে হাবু উঠছিল ওপরে। সামনে ভয়াল বাঘ। বাঘের মুখে করালীবাবু ঝুলছেন। ঝুলতে ঝুলতে তখনো অস্ফুট স্বরে বলছেন "বুরুন তুমি......"

হঠাৎ বাঘটা থেমে করালীবাবুকে যত্নের সঙ্গে মাটিতে শুইয়ে দিল। তারপর আস্তে-আস্তে ঘুরে হাবুর মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে বিশাল হাঁ করে গভীর স্বরে ডাকল, "হ্রা-ড়া-ড়া-হু-উ-ম!"

বাঘের দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে, জিভ দিয়ে নাল গড়াচ্ছে, গোঁফজোড়া কাঁটার মতো খাড়া হয়ে আছে।

আর সেই মুহূর্তে বাতাসে প্রচন্ড কোলাহল করে ভূতেরা বলে উঠল, "হাবু তুমি এবার মরো! হাবু তুমি এবার মরো! হাবু তুমি এবার মরো!" হুবহু করালীবাবুর নামতার সুর।

এক মুহূর্ত থ হয়ে থেকে পরমুহূর্তেই হাবু বুঝতে পারল, তার মন্ত্র আর কাজ করছে না। যাদের সে বশ করে রেখেছিল এতকাল, তারা সব রুখে দাঁড়িয়েছে।

হাবুর জীবনে এমন ঘটনা আর ঘটেনি। গদাই-দারোগার হাতে সে একবার বোকা বনেছিল বটে, কিন্তু তা বলে গদাই তার মন্ত্র কাটতে পারেনি। সারকাসের বাঘ ধরে এনে সাহসী গদাই তার পিঠে চেপে গোসাঁইবাগানে এমনভাবে দেখা দিয়ে-ছিল যে, হাবু ভেবেছিল গদাই বুঝি বেজায় মন্ত্রসিদ্ধ গুণী লোক। ঘাবড়ে গিয়ে হাবু বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিল, তাই তার মন্ত্রতন্ত্র কাজ করেনি। কিন্তু তারপর জেলখানায় বসে গোপনে সে আরো চর্চা করে খুব ক্ষমতা নিয়ে ফিরেছে। কিন্তু সব গুলিয়ে গেল। আর কোনো জারিজুরি খাটবে না।

মুহূর্তের মধ্যে বুদ্ধি খাটিয়ে হাবু মশালটা বাঘের মুখের মধ্যে গুঁজে দিয়ে পাশ কাটিয়ে চোঁ-চাঁ দৌড়তে লাগল। পিছনে তাড়া করে চলল ছ্যাঁকা খাওয়া কালান্তক বাঘ। বাঘের পিছনে ভূতের পাল। আর তার পিছনে হাফপ্যান্ট-পরা মশাল হাতে করালী স্যার।

করালী স্যার তখনো চেঁচাচ্ছেন, "বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো... "

*

হাবু কিন্তু সেযাত্রা প্রাণে বেঁচে যায়।

করালী স্যারের হাফপ্যান্ট পরা করাল চেহারা আর "বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো......" চেঁচানি শুনেই বোধহয় বাঘটা জঙ্গলে পালিয়ে যায়। হাবু প্রাণভয়ে দৌড়ে গিয়ে একটা বাবলা গাছের শেকড়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। ভূতেরা যখন গিয়ে তার ঘাড় মটকানোর চেষ্টা করছে, তখন করালী স্যার "বুরুন তুমি......" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে সেখানে হাজির হলেন। তাঁর গায়ে কবিরাজমশাই যে তেল মাখিয়ে দিয়েছিলেন সেই তেলের গন্ধে অধিকাংশ ভূতই তফাতে গিয়ে "ওয়াক" তুলতে লাগল বাদবাকী ভূতেরা 'বুরুন তুমি......' চেঁচানিকে নতুন কোনো মন্ত্র ভেবে ভয় খেয়ে সরে দাঁড়াল।

তাই বেঁচে গেল হাবু। তবে বেঁচে গিয়েও তার হেনস্তার আর শেষ রইল না। ইস্কুলের বুড়ো দফতরি রিটায়ার হয়ে দেশে চলে যাওয়ায় সে-জায়গায় হাবুকে বহাল করা হল।

হাবু এখন ইস্কুলের ঘণ্টা বাজায়, ক্লাসে ক্লাসে পরীক্ষা বা ছুটির নোটিস নিয়ে যায়। সেই হাবু আর নেই। চুপসে এতটুকু হয়ে গেছে। ভূত-প্রেতকে তার সাঙ্ঘাতিক ভয়, দিনরাত রাম-নাম জপ করে।

কবিরাজ মশাইয়ের যা পসার হয়েছে, তা আর বলার নয়। সারাক্ষণ তাঁর দোকানে রুগির ভিড়। তবে লোকে বলে যে, তাঁর রুগিদের মধ্যে সবাই মানুষ নয়।

খেলাধুলো বা লেখাপড়ায় বুরুনকে আর নিধিরাম সাহায্য করে না। রাম কবিরাজ নিষেধ করে দিয়েছেন। তবে বুরুন নিজের চেষ্টাতেই খেলা ও পড়ায় বেশ উন্নতি করে ফেলেছে। তবে হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষাতেও দেখা গেল যে, সে অঙ্কে সেই তেরোই পেয়েছে। অথচ একশ নম্বরের উত্তর নির্ভুল দিয়েছিল।

পরে অবশ্য খোঁজ নিয়ে দেখল, করালীবাবু স্যার ক্লাসের সব ছেলেকেই অঙ্কে ঢালাও তেরো নম্বর করে দিয়েছেন। কাউকে পাশ করাননি।

ছেলেরা গিয়ে যখন তাঁকে ধরল, তখন তিনি একগাল হেসে সকলের পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, "তেরো নম্বরটা খুব পাওয়ারফুল। বুঝলে! আমি এখন তেরো সংখ্যাটা নিয়ে খুব ভাবছি। ভেবে মনে হল, সকলেরই জীবনে অন্তত একবার অঙ্কে তেরো পাওয়াটা খুব দরকার।"

ঋজুদার সঙ্গে সিমলিপালে

বুদ্ধদেব গুহ

ভর-দুপুর। টাইগার প্রোজেক্টের ডিরেকটর সাংখালা সাহেব, যশীপুরের খৈরী-খ্যাত চৌধুরী সাহেব ও আরো একজন দক্ষিণ ভারতীয় একোলজিস্ট ওড়িশার ন্যাশনাল পার্ক সিমলিপালের পাহাড়ের মধ্যে বড়াকামড়ার ছোট বাংলোর বারান্দায় বসে লাঞ্চ খাচ্ছিলেন।

ঋজুদা তাঁদের টা-টা করে বেরিয়ে পড়লেন। জেনাবিলের দিকে। জীপের মুখটা ঘুরল, কিন্তু ট্রেলারটা ঘুরল না। ট্রেলারগুলো বড়ই বেয়াদব হয়। জীপ ডাইনে ঘুরলে বাঁয়ে ঘোরে, বাঁয়ে ঘুরলে ডাইনে। আমি আর বাচ্চু হ্যাট্ হ্যাট্ করে হালের বলদ তাড়াবার মতো করে নেমে পড়ে হাত দিয়ে পা দিয়ে ট্রেলারকে বাধ্য করলাম জীপের কথা শুনতে।

তারপর বড়াকামড়ার বাংলোর গড়ের উপরের সাঁকো পেরিয়ে এসে জীপ মুখ ঘোরাল ডানদিকে।

এই সিমলিপালের জঙ্গলে ঋজুদা একা আসেননি। সঙ্গে ঋজুদার জঙ্গলতুতো দাদা কানুদা এবং তার জঙ্গলপাগল স্ত্রী ও শালী, খুকুদি ও মণিদি। সঙ্গে দিদি ও জামাইবাবু-অন্তপ্রাণ বাচ্চু।

এত লোক সঙ্গে থাকায় আমি ঋজুদাকে মোটেই একা পাচ্ছি না। আমাকে এইসব নতুন লোকেরা মোটেই পাত্তাও দিচ্ছেন না। মনমরা হয়ে ট্রেলারে মালপত্রের উপরে বসে আছি। "খিদ্‌মদ্‌গার" বাচ্চু এবং "ইউসলেস" আমার জায়গা ডাঁই-করা মালপত্র ভরা ট্রেলারের উপর।

পাহাড়ী রাস্তা। জীপ যখন উৎরাইয়ে নামে তখন আমরা এ ওর ঘাড়ের উপর পড়ে একেবারে ট্রেলারের সামনে এসে পড়ে জীপের চাকার তলায় পড়ে যাই আর কী! আবার জীপ যেই চড়াইয়ে ওঠে, তখন আবার সড়াৎ করে ট্রেলারের পেছনে চলে গিয়ে গড়িয়ে চিৎপটাং হয়ে পড়ো-পড়ো, পাথরে। অনেক পাপ করলে মানুষকে জীপের ট্রেলারে চড়তে হয়।

বড়াকামড়ার বাংলোর সামনেই শবরদের একটা বস্তি। সার-সার খড়ের ঘর। নদীর ওপারে ঝুঁকে পড়া পাহাড়ের গায়ে। বাঁক নেওয়া বর্ষার ভরন্ত পাহাড়ী নদীর পাশে, নরম সবুজ প্রান্তরের উপর। দূর থেকে যেন পান্ডবদের বনবাসের পর্ণ-কুটির বলেই মনে হয়। এখন চৈত্রের শেষ। লক্ষ লক্ষ শাল-গাছে মঞ্জরী এসেছে। মেঘলা আকাশ। মেঘলা আকাশের পট-ভূমিতে পুষ্পভারাবনত শালগাছগুলিকে যে কী সুন্দর দেখাচ্ছে তা বোঝাবার মতো ভাষা আমার নেই। কাল সকাল থেকে একটানা বৃষ্টি হচ্ছিল। আজ ভোরে থেমে গেছে। বৃষ্টির পর লাল মাটির কাঁচা রাস্তা, পুষ্পশোভিত কচি-কলাপাতা-রঙা শালবন, ওয়াশের কাজের মতো পাহাড়শ্রেণীর নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে ট্রেলারে চড়ে জঙ্গলে ঘোরার মারাত্মক ঝুঁকি ও শারীরিক কষ্টও যেন ভুলে গেলাম।

হঠাৎ মণিদি বললেন, "হাতি! হাতি!"

কানুদা বললেন, "দিন-দুপুরে হাতি না ছাই। স্বপ্ন দেখছিস্।"

ওমা! চেয়ে দেখি, সত্যিই হাতি। দুটো প্রকান্ড প্রকান্ড হাতি ঝাঁটি-জঙ্গলে ভরা ছোট টিলা পেরিয়ে ওপারের উঁচু

Money Saver
Buy the Money Saver —
Get more Surf at less cost!
High Power
Surf
washes whitest
...and it shows!
MADE IN INDIA
নতুন ১.৫ কেজি প্যাকে।

টিলাতে যাচ্ছে হেলতে-দুলতে আর তাদের পায়ে পায়ে একটা গাবলু-গুবলু বাচ্চা। গোলগাল, গোবর-গণেশ, একহাত শুঁড়টাকে নাড়াতে নাড়াতে চলেছে।

বাচ্চু একদৃষ্টে চেয়ে ছিল, আমরা সকলেই। হঠাৎ বাচ্চু বলল, "রুদ্র, হাতির মাংস কখনও খেয়েছ? বোধ হয় পাঁঠার চেয়েও নরম হবে। দৌড়ে গিয়ে ধরি?"

বলেই, কারো পারমিশানের অপেক্ষা না করে ট্রেলার থেকে এক লাফে নেমে হাতিদের দিকে দৌড় লাগাল ও।

জীপের মধ্যে সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "কী হল? কী হল?"

কী হল, তা জানতে এতটুকু উৎসাহ না দেখিয়ে কানুদা উৎসারিত কণ্ঠে বললেন, "আমার ক্যামেরা! ক্যামেরা!" বলেই সামনের সীটে বসে পিছন দিকে জোরে গলফ-খেলা তাগড়া-হাত ছুঁড়লেন।

হাতটা এসে লাগল মণিদির নাকে।

মণিদি বললেন, "উঁ বাঁবাঁরেঁ।"

ঋজুদা চুপ করে ছিলেন, পাইপের ভুড়ুক ভুড়ুক আওয়াজ হচ্ছিল।

কানুদা শালীকে ধমকে বললেন, "মণি, ক্যামেরা কোথায়? শিগগির দে। এখন ন্যাকামি করিস না।"

"ন্যাঁকাঁমি নাঁ। নেঁই।" বলেই মণিদি নাকি সুরে কেঁদে উঠলেন।

ঠিক সেই সময়ে কানুদা বললেন, "নেই মানে? ইয়ার্কি পেয়েছিস?"

আমি ঘোড়ার পিঠে বসার মতো করে ট্রেলারের দুদিকে দু'পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে, বাচ্চুর কার্যকলাপ রিলে করছিলাম। বললাম, "এইবার সেরেছে। সর্বনাশ!"

সকলে চেয়ে দেখলেন, বড় হাতিটা বাচ্চুর দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বাচ্চু নির্বিকার। ও হাতির বাচ্চার রোস্ট্ খাবেই।

কানুদা আবার বললেন, "মণি, ক্যামেরা।"

মণিদি বললেন, "ডাঁলমুঁটের ঠোঁঙার মঁধ্যে রেঁখেঁছিলাঁম। ডাঁলমুঁটের ঠোঁঙাটা কাঁঠের বাঁক্সে। কাঁঠের বাঁক্সটা ট্রেঁলারে।"

কানুদা একটা চাপা কিন্তু তীব্র ধমক দিলেন মণিদিকে। সংক্ষিপ্তসার,—ইডিয়ট্।

মণিদি ভ্যাঁ-অ্যা করে কেঁদে দিলেন।

ওদিকে হাতি ডেকে উঠল, প্যাঁঅ্যাঅ্যা। বলেই, শুঁড় তুলে ডান পায়ে শুন্যে ফুটবলে লাথি মেরে এগিয়ে এল। শর্টস্-পরা ও হাওয়াইয়ান চপ্পল পরা বাচ্চু দৌড়ে পালিয়ে আসতে গিয়ে একটা হোঁচটা খেয়ে পড়ল ধুপাস্ করে। তার পর উঠে দৌড়ে এসেই দূর থেকে লং-জাম্প দিয়ে সোজা এসে ট্রেলারে পড়ল। প্রায় আমার ঘাড়ে। ও-ও ধুপ্ করে পড়ল, কানুদাও বললেন, "গেল।"

বাচ্চু লজ্জিত হয়ে পিছনে না তাকিয়েই বলল, "কী গেল? হাতি? চলে গেল?"

তারপর সঙ্গে সঙ্গে বলল, "আমার একপাটি চপ্পলও!"

মণিদি বললেন, "নাঁ-আঁ-আঁ। বোঁধ হঁয় ভেঙেঁ গেঁল। কাঁনুদার ক্যাঁমেঁরা, উঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ—।"

কানুদা আবার বললেন, "ইডিয়ট্।"

ঋজুদা জীপটা জোরে চালিয়ে দিয়ে বলল, "কে? বাচ্চু, না মণিদি?"

"দুজনেই।" কানুদা রেগে বললেন।

এরপর জীপের আরোহীরা নিস্তব্ধ। শুধু মাঝে মাঝে মণিদির নাক টানার শব্দ।

কিন্তু রাস্তার দৃশ্যের তুলনা নেই। কানুদার মতো ঋজুদা ক্যামেরাতে বিশ্বাস করে না। চোখের টু-পয়েণ্ট লেন্সে এই-সব নিসর্গ-ছবি তুলে নিয়ে মস্তিষ্কের মধ্যের অন্ধকার ল্যাবরেটরিতে লুকিয়ে রেখে দেয় অবচেতনের ভাঁড়ারে। যখন যেমন দরকার পড়ে, তখন তেমন সেই সব মুহূর্তের, দৃশ্যের, পরিবেশের শব্দ, গন্ধ, রূপের সামগ্রিক চেহারাটা তার কলমের মুখ থেকে সাদা পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের মস্তিষ্ক যা পারে, যা ধরে রাখে; পৃথিবীর কোনো ক্যামেরা বা টেপ-রেকর্ডারই তা পারে না। মানুষ যেদিন গন্ধ-ধরা যন্ত্রও বের করবে—সেদিনও পারবে না।

পথের বাঁকের হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে-আসা বুনো চাঁপার গন্ধ, বা মেঘলা আকাশের মৃদু-মৃদু হাওয়ায় আলতো হয়ে ভাসতে-থাকা শালফুলের গন্ধকে কি কোনো যন্ত্র ধরতে পারে?

আমরা ময়ূরভঞ্জের রাজার শিকারের বাংলো ভঞ্জবাসার পথ ছেড়ে এসেছি। পথটা বড়াকামড়া বাংলো থেকে নদী পেরিয়ে লাল মাটির লালিমা মেখে ছুটে গেছে সবুজ জঙ্গলের গভীরে। গতকাল আমরা রাজার বাড়ি চাহালাতে ছিলাম। চাহালা নামটার একটা ইতিহাস আছে। এখানে রাজা প্রত্যেকবার শিকারে আসতেন। একবার হাঁকা শিকারের সময় রাজা এবং তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা অনেক জানোয়ার মারলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল শিলাবৃষ্টি। সে কী শিলাবৃষ্টি! রাজার ক'জন বন্ধু মারা গেলেন, মারা গেল অনেক হাঁকাওয়ালা। রাজাও নাকি আহত হয়েছিলেন। লোকে বলতে লাগল যে, ভগবানের আসন টলে গেল। মরণোন্মুখ ও আহত পশুপাখির কান্নায় ও চিৎকারে ভগবানের আসন টলে গেছিল সেদিন। সেই থেকে নাম চাহালা। সেই দিন থেকে চাহালাতে শিকার বন্ধ। এমন কী, গাছ পর্যন্ত কাটা হত না রাজার আমলে। এখনও অনেক বনবিভাগের অফিসার সেকথা মেনে চলেন। বাংলোর হাতায় একটা পিয়াশাল গাছ আছে কুয়োয় যাওয়ার পথে, তার চারদিকে কাঁটা তার দিয়ে ঘিরে রেখেছেন রেঞ্জার মিশ্রবাবু। পাছে ভুল করে গাছটার কেউ ক্ষতি করে।

এখানে প্রকৃতির পুত্র-কন্যাদের উপর বিন্দুমাত্র অন্যায় হলে আবারও ভগবানের আসন টলতে পারে। সকলেই এই ভয় বুকে নিয়ে বাঁচেন এখানে।

চাহালা বেশ উঁচু। গরমের দিনেও ঠাণ্ডা। অনেকগুলো ইউক্যালিপটাস গাছ আছে হাতার মধ্যে, বৃত্তাকারে লাগানো। বসন্ত সকালের সোনা রোদ যখন ইউক্যালিপটাসের মসৃণ পাতায় চমকাতে থাকে, সুনীল আকাশের নীচে তখন নীলকণ্ঠ পাখি বুকের মধ্যে চমক তুলে ডেকে-ডেকে ওড়ে। টিয়ার ঝাঁক শিহর তুলে একদল ছোট্ট সবুজ জেট-প্লেনের মত ছুটে যায় নক্ষত্র জয়ের জন্য নীলোৎপল আকাশে।

একটা পথ বাংলোর ডাইনে বেরিয়ে গেছে হাল্‌দিয়ার দিকে। বারো কিলোমিটার। অন্য পথ, কাইরাকাচার দিকে। এই দু'জায়গায়ই বনবিভাগের ছোট্ট মাটির ঘর আছে। খড়ে-ছাওয়া বাংলো। তার চারপাশে হাতি যাতে না আসতে পারে, সেজন্যে গভীর গড় কাটা। ছোট্ট নিকোনো মাটির উঠোন। ছোট্ট বারান্দা। স্বপ্নে দেখা ছবির মত। পাশেই ঝর্না। বড় বড় গাছ ঝুঁকে পড়েছে চারধার থেকে। মাটির উঠোনে টুপ্-টাপ্ পাতা পড়ে ঝরে ঝরে। নির্জন দুপুরে কাঁচপোকা ওড়ে বুঁ—বুঁবুঁ—বুঁ ই-ই-ই আওয়াজ করে। জংলী হাইবিস্কাস্-এর সরু ডালে বসে নানারঙা মৌটুসী পাখি শিস্ দেয়। দূর থেকে হাতির দলের বৃংহণ ভেসে আসে, কোটরা হরিণ ডেকে ওঠে বাক্, বাক্, বাক্ করে। তার উদাত্ত আওয়াজ অনু-রণিত হয় পাহাড়ে-পাহাড়ে বনে বনে। উঁচু গাছের ডাল

থেকে অর্কিড দোলে মন্থর খেয়ালী হাওয়ায়। গন্ধ ওড়ে।

চাহালা থেকে আরও একটা রাস্তা গেছে ন-আনা হয়ে, বড়াই পানি জলপ্রপাতের পাশ দিয়ে। যে প্রপাত থেকে বুড়াবালাম্ নদীর সৃষ্টি। তারপর পৌঁছেছে গিয়ে ধুধুরুচম্পাতে। কী দারুণ নামটা, না? ধুধুরুচম্পা। এখানে আরো সব সুন্দর সুন্দর নামের জায়গা আছে। যেমন বাছুরিচরা। ধুধুরুচম্পাতে পৌঁছলে মনে হয় খাসীয়া পাহাড়ের কোনো নিভৃত জায়গায় এসেছি, অথবা কুমায়ুনের। চিড় আর চিড়। শুধু চিড়ের বন। ময়ূরভঞ্জের রাজা বহু-বহু বছর আগে এই উঁচু মালভূমিতে পাইন গাছ এনে লাগিয়েছিলেন। ঘন গহন পাইন বন। লোক নেই, জন নেই, দোকান নেই, শুধু বন আর বন। হাওয়া ওঠে যখন পাইনের বনে, তখন এমন এক মর্মরধ্বনি ওঠে যে কী বলব। পাইনের গন্ধ ভাসে হাওয়ায়। চিড়ের ফলগুলো ঝরা চিড়পাতার মখমল গালচের উপরে নিঃশব্দে গড়িয়ে যায়। গা শিরশির করে ভাল লাগায়। তার সঙ্গে মিশে যায় কত না নাম-জানা এবং না-জানা ফুলের গন্ধ।

প্রত্যেক জঙ্গলের গায়েরই একটা নিজস্ব গন্ধ আছে। প্রত্যেক মানুষের গায়ের গন্ধের মতো। গন্ধ ঋতুতে-ঋতুতে বদলায়। যেমন বদলায় শব্দ; যেমন বদলায় রূপ। চৈত্রের হাওয়ায় বনের বুকে যে কথা জাগে, সে কথার সঙ্গে শ্রাবণের কথা বা মাঘের কথার কত তফাত! সে রূপেরই বা কত তফাত! যার চোখ আছে, সে দেখে, যার কান আছে সেই শোনে, যার হৃদয় আছে সে-ই শুধু হৃদয় দিয়ে তা উপলব্ধি করে।

অনেকেই জঙ্গলে যান, হৈ-হৈ করেন, পিকনিক করে চলে আসেন, কিন্তু জঙ্গল তাঁদের জন্যে নয়। পিকনিক করার অনেক জায়গা আছে। জঙ্গলে গেলে নিজেরা কথা না বলে জঙ্গলের কী বলার আছে তা শুনতে হয়।

ন-আনা জায়গাটার নামটাও ভারী মজার, তাই না? এর একটা ইতিহাস আছে। রাজার খাজনা ছিল এখানে ন-আনা। তাই জায়গাটার নাম ন-আনা।

ন-আনা জায়গাটাও ভারী সুন্দর। ধুধুরুচম্পা বা জেনাবিলের মতো এখানকার বাংলো কাঠের দোতলা নয়। পাকা বাংলো। চাহালাতেও। বাংলোটা একটা টিলার মাথায়—বহুদূর চোখ যায়। অনেকখানি জায়গা জঙ্গল কেটে ফাঁকা করা আছে। পাহাড়ী নদী গেছে এঁকেবেঁকে। ধু-ধু উদোম টাঁড়—কিন্তু রুক্ষ নয়।

এই চৈত্রশেষের বৃষ্টিতেও চারদিক সতেজ সবুজ দেখাচ্ছে। আমরা যখন ন-আনায় যাচ্ছিলাম তখন আমাদের সঙ্গে একজন গোন্দ্ দম্পতীর দেখা হয়ে গেছিল। তীর-ধনুক হাতে নিয়ে চলেছিল কালো ছিপছিপে বাবরি-চুলের ছেলেটি আর হলুদ রঙে ছোপানো শাড়ি পরা মেয়েটি। মেঘলা আকাশের নীচে।

কানুদাকে শুধোলেন ঋজুদা, "রাতে কোথায় থাকা হবে?"

"জেনাবিলে।" কানুদা বললেন।

বাচ্চু বলল, "এই সেরেছে।"

আমি বললাম, "কেন? অসুবিধা কিসের?"

ও বলল, "না। পরে বলব।"

দেখতে দেখতে আমরা দেও নদীতে এসে পড়লাম। বড় বড় মাছ আছে নদীটাতে। একটা দহের মতো হয়েছে। বর্ষার লাল মাটি ধোওয়া ঘোলা-জল ভরে রয়েছে। কানায় কানায়।

হঠাৎ বাচ্চু আমাকে বলল, "কানায় কানায় ইংরিজী কী?"

আমি অনেক ভাবলাম। তারপর বললাম, "জানি না।"

কানুদা বললেন, "মণি, নাক কেমন?"

মণিদি বললেন, "ভাল। একটু রক্ত বেরিয়েছে।"

খুকুদি বললেন, "তোর একটুতেই বাড়াবাড়ি।"

মণিদি বললেন, "হুঁ তোর নিজের বর কিনা! হুঁ...!"

ঋজুদা বললেন, "ওঁ মণিপদ্মে হুম্।"

কানুদা বললেন, "বাঁদিকে নয়; ডানদিকে।"

ভুল করে ঋজুদা বাঁদিকে চলে যাচ্ছিল। কানুদা স্টিয়ারিং ডানদিকে ঘুরিয়ে দিলেন।

দেও নদী পেরিয়ে আমরা দেবস্থলীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। জনমানব নেই, লোকালয় নেই—জঙ্গল আর জঙ্গল। মাইলের পর মাইল থমথমে নিস্তব্ধতা। দেবস্থলীতে একটা ছোট্ট খড়ের ঘর—চারধারে গড় কাটা হাতির জন্যে। টাইগার প্রোজেক্টের বাংলো। কোনো ফরেস্ট গার্ড থাকেন বোধ হয়। এখন কাউকে দেখলাম না।

বাচ্চু বলল, "রুদ্র, তুই কখনও বাঘের মাংস খেয়েছিস?"

আমি বললাম, "না। তবে প্রায় সব জানোয়ারেরই খেয়েছি—এক গাধা ছাড়া।"

বাচ্চু বলল, "কাক কখনও কাকের মাংস খায়?"

আমি বললাম, "কী বললি?"

বলতেই সামনে থেকে ওঁরা সকলে হেসে উঠলেন।

আমার কান লাল হয়ে উঠল। এই জন্যেই অল্প-চেনা লোকদের সঙ্গে আসতে চাই না কোথাও। ঋজুদাটা আর মেশার লোক পেল না। ভাল লাগে না।

দূর থেকে পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের সমান প্রান্তরে ছবির মতো জেনাবিল গ্রামটা চোখে পড়ল। একটা হাতির কঙ্কাল পড়ে আছে। দুটো হাতি নাকি লড়াই করেছিল এখানে, সিমলিপালের রিপোরটার কানুদা বললেন।

মণিদি বললেন, "না। লড়াই না। আদর।"

বাচ্চু বলল, "বাঁদর।"

কানুদা বললেন, "কোথায়?"

ঋজুদা বললেন, "ট্রেলারে।"

অনেকগুলো বাঁদর পথ পেরিয়ে এপাশ থেকে ওপাশে গেল।

কানুদা বললেন, "পারফেক্ট হেলথ।"

জেনাবিলের কাঠের বাংলোটা হাতিরা ধাক্কাধাক্কি করে ফেলে দেওয়ার উপক্রম করেছিল। বাংলোটা হেলে গেছে। বড়বড় কাঠের গুঁড়িগুলোকে সোজা করে বসাবার জন্যে ও পাশে পাশে ঠেকনো দেওয়ার জন্যে বিরাট বিরাট গর্ত খোঁড়া হয়েছে। বাংলো পুরোপুরি সারাবার আগে বহু লোকের যে পা-ভাঙবে, মাথা ফাটবে এই গর্তে পড়ে, তাতে সন্দেহ নেই।

বাংলোটার সব ভাল। কিতু বাথরুম নেই। কোনো ফার্নিচারও নেই। একটা চেয়ার পর্যন্ত নয়। মাটিতে শোওয়া, মাটিতে বসা। নীচে গার্ডের ঘরে রান্না করা। বেশ দূরের ঝর্নাতে চান, হাত মুখ ধোওয়া। সিমলিপালের বেশির ভাগ বাংলোতেই রান্নাবান্না সব নিজেদেরই করতে হয়। সে জন্যে অসুবিধা নেই। কিন্তু বাঘ-হাতির জঙ্গলে রাত-বিরেতে প্রাকৃতিক আহ্বানে সাড়া দিতে জঙ্গলে যাওয়া একটু অসুবিধের!

বাংলোয় পৌঁছেই খুকুদি বললেন, "মণি, তাড়াতাড়ি স্টোভটা বের কর। চা বানাই। তারপর খিচুড়ির বন্দোবস্ত করে বেরিয়ে পড়ব এক চক্কর। সন্ধের মুখে-মুখেই তো জানোয়ার বেরোয়।" তারপরই বললেন, "মুগের ডাল আছে?"

ঋজুদা এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। এখন জীপ থেকে নেমে গার্ডের ঘরের দাওয়ায় পা-ছড়িয়ে বসে পাইপে নতুন করে তামাক ভরতে ভরতে বলল, "খুকুদি, তাড়াতাড়ি চা।"

চা খেয়ে খেয়ে খুকুদি ডিস্‌পেপ্‌টিক। ঋজুদার মতো চা-ভক্ত লোক পেয়ে খুশি।

মণিদি স্টোভ বের করলেন। খুকুদি বললেন, "মুগের ডাল দিয়ে খিচুড়িটা ভাল করে রাঁধতে হবে রাতে। সকালবেলা ভাল হয়নি।"

বাচ্চু আতঙ্কিত গলায় বলল, "আবারও খিচুড়ি?"

খুকুদি বললেন, "না তো কী! এই জঙ্গলে তোমার জন্যে বিরিয়ানি পাব কোত্থেকে?"

বাচ্চু বলল, "না, তা বলছি না। মানে, একটু অসুবিধা ছিল।" তারপরই বলল, "ওষুধের বাক্সে কি কিছু আছে?"

"ও! তোর বুঝি পেট খারাপ হয়েছে?" খুকুদি বললেন।

বাচ্চু বলল, "দশদিন হল এবেলা খিচুড়ি, ওবেলা খিচুড়ি তো।" তারপর চারধারের জঙ্গলে চোখ বুলিয়ে নিয়েই বলল, "আমি নেই। যা খেয়েছি সকালে, অনেক খেয়েছি। আর খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে নেই।"

আমি বললাম, "ভয় কিসের? যেদিকে তাকাবি, সেদিকেই তো উদার, উন্মুক্ত।"

বাচ্চু রেগে বলল, "তুই যা না, যতবার খুশি।"

মণিদি বললেন, "বাঁদর।"

আমি ও বাচ্চু দুজনেই একসঙ্গে তাকালাম। তারপর বুঝলাম যে আমরা নই।

একটা বড় বাঁদর গার্ডের ঘরের পাশের গাছে বসে আছে।

তাড়াতাড়ি করে চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম একটা বড় চক্কর ঘুরে আসবার জন্যে। জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে জীপের ট্রেলার খুলে রেখে। জেনাবিল থেকে ধুধুরুচম্না যাওয়ার এই স্বল্প-ব্যবহৃত পথটাতে যে কত জীবজন্তু দেখেছিলাম আমরা আসার সময়, তা বলার নয়। দিনের বেলা দলে-দলে হাতি, ময়ূর, হিমালয়ান স্কুইরেল, বাঁদর, বার্কিং ডিয়ার।

প্রায় পাঁচ কিলোমিটার মতো গেছি, একদল বুনো কুকুর লাফাতে লাফাতে রাস্তা পেরুল। মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করছিল ওরা।

ঋজুদা বলল, "বুনো কুকুর এসেছে যখন, তখন এখানে এখন কিছু দেখা যাবে না।"

কানুদা বললেন, "চলোই না একটু ভিতরে।"

আসন্ন সন্ধ্যার আধা-অন্ধকারে ময়ূর ডাকছে, মুরগী ডাকছে, বাঁদর হুপ্-হুপ-হুপ্-হুপ করে উঠছে গভীর জঙ্গল থেকে। হাতির দল দূর দিয়ে দিনের শেষে ঘুমের দেশে চলেছে সারি বেঁধে, গায়ে লাল মাটি মেখে। মনে হয় স্বপ্ন। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না সত্যি বলে।

হঠাৎ ঋজুদা জীপটা হল্ট্ করিয়ে দিয়ে বলল, "মামা।"

বাচ্চু বলল, "কার মামা?"

খুকুদির লম্বা হাতটা জীপের পেছনের আধো-অন্ধকারে এসে বাচ্চুর কানে আঠা হয়ে সেঁটে গেল। খুকুদির হাতটা বাচ্চুর কানে পড়তেই বাচ্চুর ও আমার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল।

পথের ডানদিকে খাদ—বাঁদিকে পাহাড়। সূর্য ডুবে এসেছে। মামা আসছে গোঁফে তাড়া দিয়ে সোজা হেঁটে জীপের একেবারে মুখোমুখি।

সকলে স্ট্যাচু হয়ে গেছে জীপের মধ্যে। শুধু ঋজুদার পাইপের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

প্রকাণ্ড বড় চিতা। চমৎকার চিক্কণ চেহারা। গোঁফ দিয়ে জেল্লা বেরুচ্ছে। এ-জঙ্গলে মানুষ বোধহয় একেবারেই আসে না, নইলে চিতার এমন ব্যবহার আমি কখনও দেখিনি।

জীপের থেকে হাত কুড়ি দূরে চিতাটা সোজা বুক চিতিয়ে

দাঁড়াল। দিনের শেষ আলোর ফালি এসে পড়ল ওর গায়ে। সে এক দারুণ সৌন্দর্য ও স্তব্ধতার মুহূর্ত।

সেই নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করে হঠাৎ কানুদা উত্তেজিত হয়ে বললেন, "মণি, ক্যামেরা!" বলেই সকালের মতো আবারও হাত ছুঁড়লেন।

'মাঁ-গোঁ-ও' বলে মণিদি জীপের মধ্যেই বসে পড়লেন।

চিতাটা ভীষণ ভয় পেয়ে চমকে উঠে এক লাফে খাদের দিকে দৌড়ে গেল। তারপর কী করে নামল খাদ বেয়ে, তা সে চিতাই জানে। ডিগবাজি খেয়ে নিশ্চয়ই ওরও নাক ভাঙল।

খুকুদি বললেন, "এটা বাড়াবাড়ি কানু, তোমার ক্যামেরা তুমি ঠিক করে রাখতে পারো না? মেয়েটার নাক দিয়ে এখনও রক্ত ঝরছে, তার ওপর আবার আঘাত?"

কানুদা বললেন, "ক্যামেরা কোথায়?"

"কাঁজুবাঁদামে'র টিঁনেঁ।" মণিদি কোঁকাতে কোঁকাতে বললেন।

কানুদা চিতাবাঘটা লাফানোর আগে যেমন ধনুকের মতো বেঁকে গেছিল, তেমনি রাগে বেঁকে গিয়ে বললেন, "দেয়ারস্ আ লিমিট। ডালমুটের ঠোঙা থেকে বের করে কাজুবাদামের টিনে—ক্যামেরা?"

মণিদি জামাইবাবুকে খুব ভালবাসেন।

বললেন, "তুঁমিঁই নাঁ বঁলেছিলে বৃষ্টিতে লেন্সে ফাঙ্গাঁস পড়ে যাবে? আমি তাঁই যঁত্ন কঁরে-এঁ-এঁ-এঁ। উঁ-হুঁ-হুঁ—।"

ঋজুদা জীপ থেকে নেমে বললেন, "এইরকম কোনো জায়গাতেই শূর্পণখার নাক কাটা গেছিল। এখানে প্রত্যেকের নাক সাবধানে রাখা উচিত।" বলে রুমাল বের করে নিজের নাক মুছল।

খুকুদি বললেন, "বাচ্চু, মণির নাকে ওয়াটার বটল্ থেকে একটু জল দে তো।"

কোথায় বাচ্চু?

তাকিয়ে দেখি বাচ্চু নেই। কখন যে হাওয়া হয়েছে, কেউই লক্ষ করিনি।

বাঘও ডানদিকে খাদে লাফিয়েছে, বাচ্চুও বাঘকে ডোণ্ট-কেয়ার করে বাঁদিকে পাহাড়ে চড়েছে। ও বলেইছিল যে, ওর একটু অসুবিধা আছে। কিন্তু বাঘের চেয়েও যে বেশি ভয়াবহ কিছু আছে এ-কথাটা সেবারেই প্রথম জানলাম। বাঘ তো বাঘই; কিন্তু খিচুড়ি—ঘোঘ।

ছবি মদন সরকার

গঙ্গা-যমুনা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
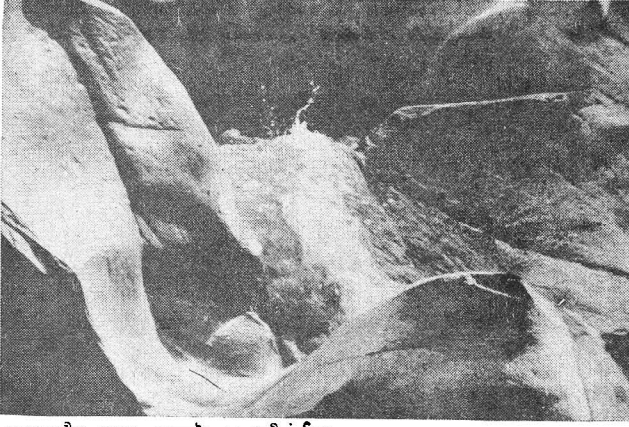
গঙ্গোত্রীর গঙ্গা ফোটো রঘুবীর সিং

আমাদের ট্যাক্সি যখন সায়নাচটিতে পৌঁছয়, ঘড়িতে তখন দেড়টা বাজে। মে মাসের ঝকঝকে দুপুর, মাথার উপরে মস্ত বড় নীল আকাশ, তার মধ্যিখানে বসে সূয্যিমামা একেবারে মুক্তহস্তে রোদ্দুর ছড়াচ্ছেন। তবু—সেই প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালেও—আমাদের কিছুমাত্র গরম লাগছে না। লাগবে কী করে, এ কি আর কলকাতা, আমরা ইতিমধ্যে পাহাড়িয়া পথে অনেক উঁচুতে উঠে এসেছি যে। একটু একটু শীত করছিল বলে হাল্কা একটা জাম্পার পরে নিলুম। তারপর নদীর পশ্চিম-তীর থেকে ব্রিজ পেরিয়ে পূর্ব-তীরে পৌঁছে দেখি, সেখানে গাড়ির গাদি লেগে গেছে। মানুষ-জনের ভিড়ও নেহাত কম নয়। ট্যাক্সি থেকে নেমে অরুণদা সেই ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, "এক্ষুনি আমি ঘোড়া নিয়ে আসছি।"

দলে আমরা চারজন। অরুণদা, আমি, বৌদি আর রুচি। সায়নাচটির পরে আর গাড়ি যায় না। তাই ঘোড়া চাই। হেঁটেও অবশ্য যাওয়া যায়। কিন্তু ওই যে বলে 'ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া' কথাটা তো আর মিথ্যে নয়, অন্তত আমার ক্ষেত্রে ষোল-আনা সত্যি। তাই কলকাতায় বসে ম্যাপ-ট্যাপ দেখে অরুণদা যখন বলেছিলেন যে, সায়নাচটি থেকে ঘোড়া পাওয়া যায়, কিন্তু ভারী তো কুড়ি কিলোমিটার পথ, দরকার হলে আমরা হেঁটেই পাড়ি দেব তখন আমি বলেছিলুম, "অসম্ভব, ইচ্ছে হয় তো তোমরা হেঁটে যেতে পারো, আমার বাপু ঘোড়া ছাড়া চলবে না।" অরুণদা তাই ঘোড়া ধরতে বেরিয়ে পড়লেন, আর ট্যাক্সি থেকে নেমে চা খেতে-খেতে আমরা চতুর্দিকের পাহাড়-পর্বত অরণ্য আর নদীর শোভা দেখতে লাগলুম।

তোমরা ভাবছ, সায়নাচটি আবার কোথায়। কিন্তু সে-কথা বলতে হলে গোটা প্ল্যানটার কথাই বলতে হয়। গত মে মাসের সাত তারিখে, কলকাতার ভ্যাপসা গরমে ঘামতে-ঘামতে, যখন একদিন তোমাদের জন্য মাসিক আনন্দমেলার পাতা সাজাচ্ছি, তখন হঠাৎ অরুণদার ফোন এল। "গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী যাবে?"

হতভম্ব হয়ে আমি বললুম, "কবে?"

"সতেরো তারিখে। রাজী?"

ঢোক গিলে বললুম বটে যে, রাজী, কিন্তু যাব বললেই তো আর যাওয়া হয় না। পয়সাকড়ি জোগাড় করতে হবে, শীতের জামাকাপড় কাচিয়ে নিতে হবে, তা ছাড়া টুকিটাকি আরও কত কাজ পড়ে রয়েছে। তার জন্যে আমাদের যাওয়া অবশ্য আটকে রইল না। ভাল কাজ কি আর আটকে থাকে। বাধাবিঘ্নগুলোকে চটপট ডিঙিয়ে সতেরো তারিখ বিকেলবেলায় আমরা রাজধানী এক্সপ্রেসে উঠে পড়লুম।

দিল্লি পৌঁছলুম পরদিন বেলা সাড়ে দশটায়। রাত্তিরের খাওয়াটা বেশ ভালই হয়েছিল, কিন্তু ঘুম একদম হয়নি। চেয়ার-কারে গিয়েছিলুম তো, তাতে ওই বসাই চলে, ঘুমোনো চলে না, তায় জানালাগুলো বন্ধ, তাই বাইরের দৃশ্য দেখে যে সময় কাটাব, তারও উপায় নেই। এদিকে আবার বই-টইও পড়তে পারছি না, তার কারণ দশটা বাজতে-না-বাজতেই বাতি নিবিয়ে দিয়েছে। জনাকয় যাত্রী অবশ্য চেয়ারে বসেই মৃদুমন্দ নাক ডাকাতে লাগলেন, কিন্তু আমার একদম ঘুম হল না। না-পারছি ঘুমোতে, না-পারছি বাইরের দৃশ্য দেখতে, না-পারছি বই পড়তে, —সে যে কী যন্ত্রণা, তা কী করে বোঝাব!

দিল্লিতে আমরা রফি মার্গের একটা বাড়িতে উঠেছিলুম। অরুণদার কী কাজ ছিল, তিনি বেরিয়ে গেলেন। চান-টান করে, চাপাটি আর কিমা-কারি খেয়ে, আমিও অমনি খাটের উপরে লম্বা হলুম। ভেবেছিলুম, দুপুরে একটা মস্ত বড় ঘুম লাগিয়ে রাত্তিরের ক্ষতিটা পুষিয়ে নেব। কিন্তু রুচি বলল, "সেটি হচ্ছে না, চলো, কনট সার্কাস থেকে ঘুরে আসি।"

এক বন্ধু একটা গাড়ি দিয়েছিলেন। বেরিয়ে পড়তে তাই কোনো অসুবিধে হল না। তবে বার হয়ে বুঝলুম যে, না-বেরুলেই ভাল হত। একে মে মাস, তার উপরে আবার কনট সার্কাসে গিয়ে দেখি, দোকানপাট সব বন্ধ। শুনলুম, মঙ্গলবারে নাকি কনট সার্কাস এলাকায় দোকান খোলেনা। রুচির কী সব কেনাকাটা করবার ছিল, দোকান বন্ধ দেখে সে তো মহা খাপ্পা. শেষ পর্যন্ত এক গ্লাস লস্যি খাইয়ে তাকে ঠাণ্ডা করতে হল।

রফি মার্গে ফিরে শুনি, অরুণদা ইতিমধ্যে ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। বিকেল সাড়ে ছটায় সেই ট্যাক্সিতে উঠে আমরা হৃষীকেশের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লুম।

গীতা-ভবন, লছমনঝুলা ফোটো বীরেন সিংহ

২
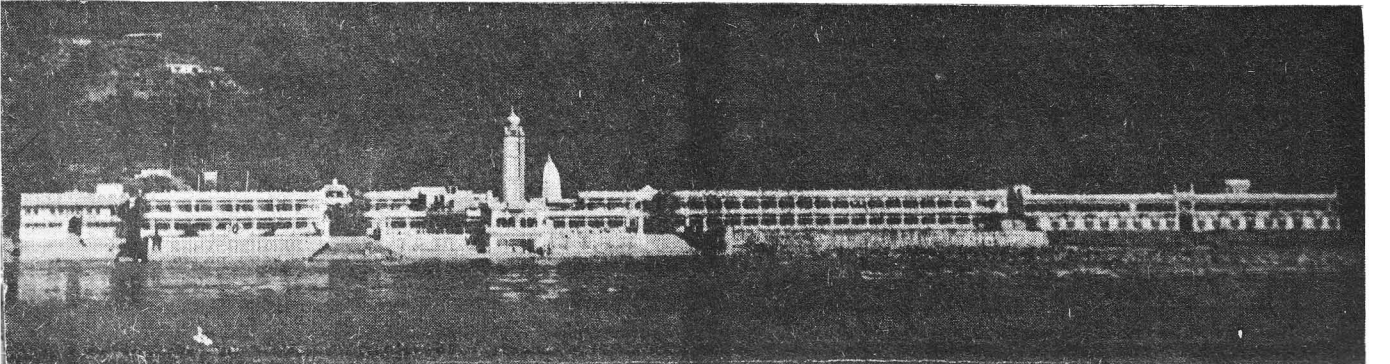
আমাদের ড্রাইভারটি খুব সংগীত-রসিক। তার ট্রানজিস্টরে যখন তুমুল আওয়াজে গান চলতে থাকে, তখন বাঁ-হাত স্টীয়ারিং হুইলে রেখে ডান-হাতে সে গাড়ির গায়ে তবলা বাজায়। তা ছাড়া সে খুব খাদ্যরসিকও বটে। পথের ধারে খাবারের দোকান দেখলেই হল, অমনি সে গাড়ি থামিয়ে গোটাকয় লাড্ডু ও অন্তত এক গ্লাস ফলের রস খেয়ে নেয়। আমি হিসেব রেখে যাচ্ছিলুম। দেখলুম, মুজঃফরনগর ও রুরকির মধ্যে আটবার গাড়ি থামিয়ে সে অন্তত বত্রিশটা লাড্ডু ও দশ গ্লাস ফলের রস খেয়েছে।

জলে-ভরা ক্যানালের পাশ দিয়ে যখন রুরকিতে ঢুকি, ঘড়িতে তখন রাত এগারোটা। ইতিমধ্যে আমারও একটু একটু খিদে পেয়েছিল। বৌদিকে বললুম, "কতক্ষণ আর অন্যের খাওয়া দেখব? এবারে বরং আমরাও যা-হোক কিছু খেয়ে নিই।" তাতে অরুণদা বললেন, "আরে না না, যা-হোক কিছু খাব কেন, একটু বাদেই তো হরিদ্বারে পৌঁছচ্ছি, সেখানে দেখো রাবড়ি আর গরম-গরম কচুরি দিয়ে কীরকম ফার্স্ট ক্লাস ডিনার হয়।"

কিন্তু পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে যখন হরিদ্বারে পৌঁছলুম, তখন সেখানে সমস্ত দোকানে ঝাঁপ পড়ে গেছে। অনেক কাকুতি মিনতি করে, "আরে ভাই, মেহেরবানি কর্‌কে জেরা শুনিয়ে তো" বলে-টলে মোটামুটি দয়ালু একজন দোকানীকে ঘুম থেকে ওঠানো গেল বটে, কিন্তু তার দোকানে—রাবড়ি-কচুরি তো দূরের কথা—রুটি-তরকারিও পাওয়া গেল না। ঘুম-জড়ানো গলায় সে জানাল যে, তার ভাঁড়ারে স্রেফ গোটা-আষ্টেক হাতে-গড়া রুটি আছে, ইচ্ছে হলে আমরা খেয়ে নিতে পারি।

তাই কখনো খাওয়া যায়? শুধু শুকনো রুটি? ডাল নেই, তরকারি নেই, নিজেদের একেবারে নিধিরাম সর্দার বলে মনে হচ্ছিল। অরুণদাকে বললুম, "কী করব?" এতক্ষণ তিনি খুব মেজাজী গলায় কথা বলছিলেন, কিন্তু ব্যাপার দেখে তাঁরও চক্ষুঃস্থির। মিনমিন করে বললেন, "শুকনো রুটি? না না, তার চেয়ে বরং হৃষীকেশেই চলে যাওয়া যাক।"

হৃষীকেশে পৌঁছলুম সাড়ে বারোটায়। সেখানে রুটিও জুটল না। নদীর পাশ দিয়ে-দিয়ে চলেছি, আবছা মতো পাহাড়-টাহাড়ও চোখে পড়ছে, কিন্তু পেটের মধ্যে খিদে থাকলে কি আর প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়? রাত্তিরটা যে অনাহারে কাটবে, সেটা অবশ্য আমি আগেই আঁচ করেছিলুম। কিন্তু তাই বলে যে মাঝ-রাত্তিরে হঠাৎ একপাল কুকুর আমাদের পিছু নেবে, তা আমি ভাবতে পারিনি।

কার্যত কিন্তু তাই হল। ঠিক ছিল যে, আমরা টুরিস্ট বাংলোয় উঠব। কিন্তু সেই বাংলো যে কোথায়, মাঝ-রাত্তিরে সে-কথা কাকে জিজ্ঞেস করি? দৃশ্যটা একবার কল্পনা করো। গোটা শহর ঘুমিয়ে আছে, রাস্তায় একটাও লোক নেই, ফাঁকা রাস্তায় আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি, ট্যাকসিওয়ালার ধারণা হয়েছে যে, আমরা পাগল কিংবা বাউন্ডুলে, হয়তো সে এমন কথাও ভাবছে যে, ভাড়া দেবার পয়সাই আমাদের নেই, খুব সম্ভব সেই জন্যেই সে হাত জোড় করে বারবার আমাদের বলছে, "মুঝে ছোড় দিজিয়ে সাব্‌", খিদেয় আমাদের পেট চুঁইচুঁই করছে, তার উপরে আবার কী জানি কেন একপাল নেড়ীকুত্তা আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে। যতই 'হ্যাট্‌ হ্যাট্‌' করি, কিছুতেই তারা আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না। ঢিল ছুঁড়লে তখনকার মতো একটু সরে যায় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভৌ ভৌ করে এগিয়ে আসে। একটা বাচ্চা-মতন কুকুর সম্ভবত ভেবেছিল যে, ঢিল ছুঁড়ে আমরা তাদের সঙ্গে খেলা করছি। মুখে করে একটা ঢিল কুড়িয়ে এনে আমার পায়ের কাছে সেটাকে রেখে সে তাই ঘনঘন লেজ নাড়তে লাগল।

আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলুম রাত দেড়টায়। চৌকিদার এসে তালা খুলে ঘর দেখিয়ে দিল। রুচি বলল, "নীরেনকাকার কথা-মতো রুরকিতে খেয়ে নিলেই হত।" অরুণদা তাকে বললেন, "দিল্লি থেকে দু বাক্স নিমকি-বিস্কুট এনেছি। তার থেকে খানকয় খেয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘুমিয়ে পড়ো দিকিনি। কাল সকালে রাবড়ি আর কচুড়ি দিয়ে ব্রেকফাস্ট করা যাবে।"

বাক্স খুলে দেখি, শ' দুয়েক নিমকি-বিস্কুট তো আছেই, ডালমুটও আছে প্রচুর। খান দুই নিমকি আর একগাল ডালমুট খেয়ে, কম্বল টেনে নিয়ে, আমরা শুয়ে পড়লুম।

৩

কথা ছিল, রাতটা হৃষীকেশে কাটিয়ে ১৯ মে ভোরে আমরা গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর পথে রওনা হব। কিন্তু শেষ রাত্তিরে যখন আমার ঘুম ভাঙল, আকাশ ভেঙে তখন অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে। ঝমাঝম ঝমাঝম শব্দ শুনেই বুঝতে পেরেছিলুম যে, আজ আর রওনা হওয়া সম্ভব নয়। তা হলে আর বিছানা ছেড়ে উঠবার দরকার কী, তার চেয়ে বরং আর এক কিস্তি ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

দ্বিতীয় কিস্তির ঘুম ভাঙল বেলা আটটায়। চোখেমুখে জল দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালুম। চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। রাত্তিরে ভাল করে বুঝতে পারিনি, এখন সকালবেলায় দেখলুম, আমাদের বাংলোর ঠিক পিছনেই পাহাড়। একটু আগেই বৃষ্টির জলে চান করে উঠেছে তো, তাই পাহাড়গুলোর কোমরে এখন ধপধপে সাদা মেঘের তোয়ালে জড়ানো। বাংলোর সামনে এক টুকরো ঘাসে-ছাওয়া জমি। তার একদিকে কয়েকটা পাহাড়িয়া গাছ। গাছের পাতা থেকে তখনও টুপটাপ করে বৃষ্টির জল ঝরছিল। হঠাৎ মনে হল, কী হবে গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী গিয়ে, তার চেয়ে বরং কয়েকটা দিন এইখানেই কাটিয়ে দিই।

কিন্তু তা কি হবার জো আছে! টুরিস্ট-বাংলোর বালক-ভৃত্য সরজিৎ সিং ইতিমধ্যে চা দিয়ে গিয়েছিল। চা খেয়ে অরুণদা বললেন, "চলো, বেরিয়ে পড়ি। দিল্লির ট্যাক্‌সিতে তো হৃষীকেশ অব্দি এলুম, এখন এখান থেকে আবার ট্যাক্‌সি ধরতে হবে না?"

কীভাবে ধরব? শুনেছিলুম, এখানকার পর্যটন-দফতর থেকে যাত্রীদের এ-ব্যাপারে সাহায্য করা হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে শুনি, বৃষ্টির জন্যে পাহাড়ে ধস্‌ নেমেছে, তাই বাস কিংবা ট্যাকসি আজ আর রওনা হবে না। কাল রওনা হবে কি না, জিজ্ঞেস করতে তাঁরা বললেন, "বিকেলে আসুন, তখন বলব।"

বিকেল পর্যন্ত হৃষীকেশেই বসে থাকব নাকি? চটপট একটা দোকানে ঢুকে চানা-বটোরা, কালাকাঁদ আর ছানার কেক্‌ দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা হরিদ্বারে চলে গেলুম। সেখানকার হরকি পৈরীর নাম তোমরা শুনেছ নিশ্চয়? পবিত্র জায়গা। গিয়ে দেখি, হাজার-হাজার পুণ্যার্থী সেখানে স্নান করছেন। জল একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা, স্রোতও মারাত্মক। স্রোতের টানে মানুষজন যাতে ভেসে না যায়, তাই ঘাটের ধারে লোহার শেকল বাঁধা, সেই শেকল ধরে চান করলে আর ডুবে মরবার ভয় নেই। আমরা তো গামছা-তোয়ালে সঙ্গে আনিনি, তাই মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে জলের মধ্যে মাছের খেলা দেখতে লাগলুম। সে ভারী মজার ব্যাপার। মাছকে খাওয়াবার জন্যে হরকি পৈরীতে আটা-ময়দার গুলি পাওয়া যায়। একঠোঙা গুলি কিনে জলের মধ্যে ছুঁড়তে থাকো; দেখবে মস্ত-মস্ত মাছ অমনি ভুশ করে ভেসে উঠে কপাকপ সেই গুলিগুলোকে খেয়ে নিচ্ছে।

কিন্তু জলে অত মাছ থাকলে কী হয়, এ-সব জায়গায় কেউ আমিষ খায় না। যে-হোটেলেই যাও, নিরামিষ খেতে হবে। তারই মধ্যে মোটামুটি পরিচ্ছন্ন একটি হোটেলে ঢুকে আমরা

দুপুরের খাওয়া চুকিয়ে নিলুম। তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফের রওনা হলুম হৃষীকেশের দিকে। হৃষীকেশে অবশ্য থামলুম না। আর-একটু এগিয়ে থামলুম গিয়ে ঝুলন্ত সেই ব্রিজের কাছে, যার উপর দিয়ে হেঁটে নদী পেরোলেই লছমনঝুলায় পৌঁছে যাওয়া যায়।

হৃষীকেশ আর লছমনঝুলা, নদীর এ-পার ও-পার। হরিদ্বার থেকেই একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিলুম। যেখানে যাই, মস্ত-মস্ত বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। চটিওয়ালার খাবার-এর বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের মধ্যে টিকিওয়ালা, হাসিখুশী ও মোটাসোটা এক বুড়োর ছবি। মুখের ভাব দেখলেই বোঝা যায় যে, চটিওয়ালার খাবার খেয়ে তার খুব আহ্লাদ হয়েছে। তা চটিওয়ালার দোকান হল লছমনঝুলায়।

লছমনঝুলা জায়গাটি যেমন শান্ত, তেমনি সুন্দর। পাহাড়ের কোলে ছোট্ট জায়গা। লোকজন কম। গেরস্ত-বাড়ি নেই বললেই হয়। তবে সাধু-সন্ন্যাসীর আখড়া ও আশ্রম আছে অগুন্তি। সাধুবাবাদের কেউ-কেউ আবার পথের ধারেই ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। সেই সব দেখে আমরা স্বর্গাশ্রমে এলুম। এই স্বর্গাশ্রমের নদীর ধারেই হল চটিওয়ালার খাবারের দোকান। আমাদের অবশ্য খিদে ছিল না। তাই স্রেফ এক-এক গ্লাস লস্যি খেয়ে, নৌকোয় নদী পার হয়ে, হৃষীকেশ ফিরলুম। তখন সন্ধে হয়ে গেছে।

পর্যটন-দফতরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, পরের দিনও বাস কিংবা ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না। তাহলে উপায়?

নিরুপায়ের উপায় হয়ে দেখা দিল মদনলাল। তরুণ ট্যাক্সি-ওয়ালা। বয়স বোধহয় কুড়ি-বাইশের বেশী হবে না। সে বলল, "বাবুজী, বৃষ্টি হোক আর না-ই হোক, পাহাড়িয়া পথে গাড়ি বার করাটাই একটা ঝুঁকির ব্যাপার। তা আপনারা যদি ঝুঁকি নিতে রাজী থাকেন তো আমিও রাজী।"

২০ মে ভোরবেলায় সে ট্যাক্সি নিয়ে টুরিস্ট বাংলোয় চলে এল। তৈরী হতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। বাংলোর ভাড়া মিটিয়ে, জয় গঙ্গা বলে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। ঘড়িতে তখন সওয়া ছটা।

হৃষীকেশের শিয়রে যারা প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে, সেই পাহাড়গুলোর ঘোরানো পথে পাক খেতে-খেতে মাত্র মিনিট কুড়ির মধ্যে আমরা নরেন্দ্রনগরে পৌঁছে গেলুম। জায়গাটা বলতে গেলে হৃষীকেশের একেবারে মাথার উপরে। ছিমছাম ছোট্টমতো পাহাড়িয়া শহর। শহরের মাঝখানে পরিপাটি মার্কেট-প্লেস। কিন্তু দু-দণ্ড যে থেমে থাকব, তার উপায় কী, চটপট সায়না-চটিতে পৌঁছতে হবে তো, তাই ট্যাক্সি একেবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। হিন্দোলা, আগরখাল, ফাকট, জাজল, নাগনী, চামুয়া, টিহরি, গোদিসরাই, চলদিয়ানা, জাম, নাগুন—একটার-পর-একটা জায়গা আমরা পার হয়ে যাচ্ছি। এত ঝটিতি পার হচ্ছি যে, কোনও-কিছুই একটু সুস্থির হয়ে দেখা যাচ্ছে না। এরই মধ্যে অরুণদা একবার দ্যাখো দ্যাখো বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। আমি তো চমকে উঠে বাইরে তাকালুম। দেখলুম, বরফে ঢাকা একটি পাহাড়-চূড়া সকালবেলার রোদ্দুরে একেবারে ঝকঝক করছে। পর্বতকে যে কেন যোগী বলে কল্পনা করা হয়, সেটা বুঝতে হলে তার বরফে-ঢাকা চূড়ার দিকে তাকাতে হবে। সত্যি তখন মনে হবে যেন ঊর্ধ্বাঙ্গে ভস্ম মেখে এক সন্ন্যাসী বসে ধ্যান করছেন। রুচি বলল, "ভস্ম আবার এত সাদা হয় নাকি? বরং বলো, পাহাড়গুলো চান-টান করে নিয়ে সারা গায়ে ট্যালকম পাউডার ছড়িয়ে বসে আছে।"

ধরাসুতেও বরফে-ঢাকা পাহাড়-চূড়া চোখে পড়ল। পথ এখান থেকে দুদিকে চলে গেছে। ডাইনে গঙ্গোত্রী, বাঁয়ে যমু-

হরকি পৈরী, হরিদ্বার ফোটো বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত
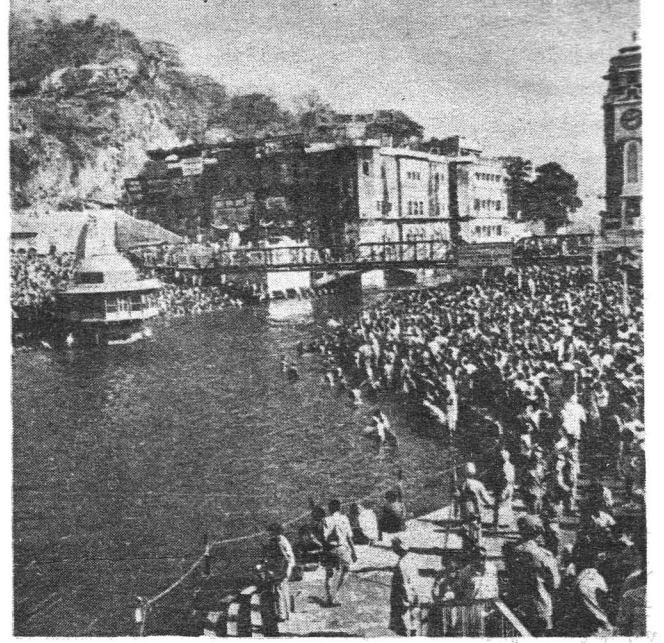
নোত্রী। আমরা যমুনোত্রীর পথ ধরে বড়কোট, গঙ্গানী, কুতনৌর, যমুনাচটি ইত্যাদি সব জায়গা পার হয়ে যখন সায়নাচটিতে পৌঁছলুম, আগেই বলেছি, তখন দেড়টা বাজে।

ট্যাক্সির পথ আপাতত এইখানেই শেষ। মদনলাল বলল, "আমি ট্যাক্সি নিয়ে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করব। আপনারা যমুনামাঈকে ডাকতে-ডাকতে ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে যান।"

অরুণদা তক্ষুনি ঘোড়া ধরতে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু ঘণ্টা দেড়েক বাদে তিনি চারপেয়ে যে জীবগুলোকে নিয়ে ফিরে এলেন, তাদের দিকে তাকিয়েই আমার আক্কেল গুড়ুম।

এর নাম ঘোড়া? এমন ক্যাবলা-মার্কা নাদাপেটা জন্তু আমি জন্মে দেখিনি। রোগা-পটকা চেহারা, হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু জালার মত বিশাল ভুঁড়ি। এত বড় ভুঁড়ি নিয়ে এরা মস্ত-মস্ত চড়াই ভেঙে উপরে উঠবে কী করে? তার উপরে আবার চারটে ঘোড়াই ভীষণ পেটুক। মুখ নিচু করে খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। কুটোকাটা, শুকনো পাতা, যা-কিছু পাচ্ছে তা-ই খেয়ে নিচ্ছে। তারই মধ্যে আবার একটা ঘোড়া হঠাৎ, বলা নেই কওয়া নেই, আমার পাঞ্জাবির খুট চিবোতে শুরু করেছিল। ব্যাপারটা আমার একটুও ভাল লাগেনি। কিন্তু জোরগলায় ধমক দিতেই ভড়কে গিয়ে চার-পা তুলে সেটা এমন দৌড় লাগল যে, আমি তো হাঁ।

যাই হোক, অনেক কষ্টে তো সেটাকে আবার ধরে আনা হল। তখন সমস্যা দেখা দিল চড়া নিয়ে। ঘোড়াগুলো রোগা-পটকা হলেও উঁচু নেহাত কম নয়। কিন্তু জিন-টিন নেই. স্রেফ পিঠের উপরে সরুমতন দুটো কোল-বালিশ সাজিয়ে তার উপরে এক-টুকরো চট্ বিছিয়ে রাখা হয়েছে।

অরুণদা খুব চিন্তিতভাবে বললেন, "সামনের দিক থেকে ওর কান পাকড়ে যদি উঠতে যাই তো কামড়ে দেবে! আর পিছনের দিক থেকে ওর লেজ পাকড়ে যদি উঠতে যাই তো নির্ঘাত লাথি ঝাড়বে।"

আমি বললুম, "কিন্তু পাশ দিয়ে উঠব কী করে? রেকাব তো নেই!"

রুচি বলল, "হাইজাম্প্ মেরে উঠলে কেমন হয়?"

অরুণদা বললেন, "ঠাট্টা হচ্ছে? মনে রেখো, ইস্কুলে একবার হাইজাম্পে আমি ফার্স্ট হয়েছিলুম। কিন্তু সে-সব দিন আর
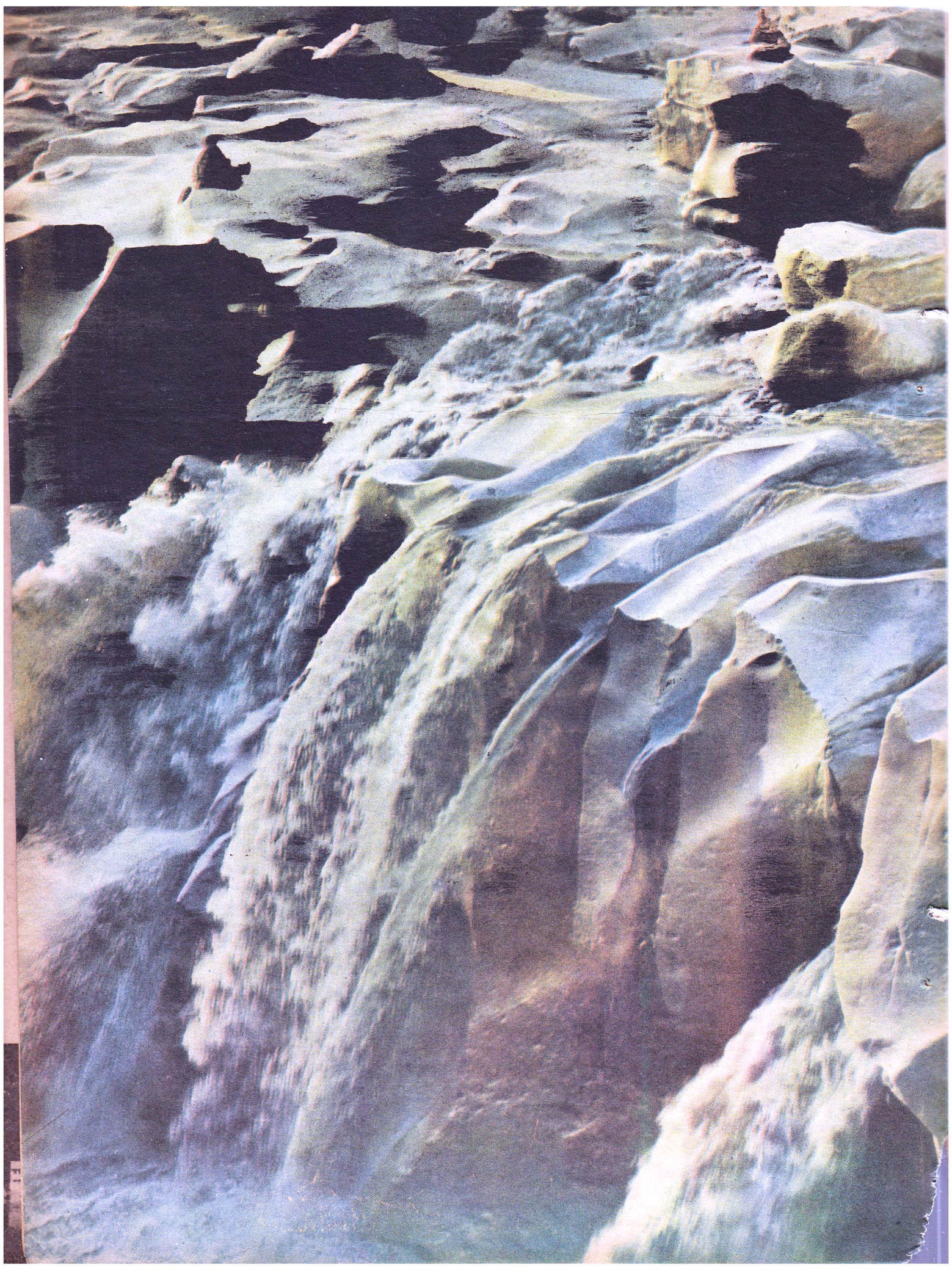
পথের প্রান্তে ফোটো সৌমেন্দ্রমোহন গোস্বামী

নেই। এখন একটা মই পেলে ভাল হত।”

বৌদি বললেন, “মই পেতে যদি ঘোড়ায় উঠি তো সবকটা ঘোড়া একসঙ্গে হেসে উঠবে। তার চেয়ে বরং উঁচু-মতন একটা পাথরের পাশে নিয়ে ঘোড়াগুলোকে দাঁড় করাও; পাথরে পা রেখে আমরা ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়ব।”

অরুণদা বললেন, “আমিও ঠিক এই কথাই ভাবছিলুম।”

ঘোড়ায় চেপে আমরা যখন রওনা হলুম, তখন প্রায় চারটে বাজে। সকাল থেকে বলতে গেলে প্রায় কিছুই খাইনি। বৌদি আমাদের হাতে-হাতে খান চারেক করে নিমকি ধরিয়ে দিয়েছিলেন, অশ্বারোহী অবস্থায় অনেক কষ্টে ব্যালান্স সামলে শুধু সেই শুকনো নিমকি দিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সারতে হল। আমি আর রুচি তাই নিয়ে একটু গাঁইগুঁই করায় অরুণদা বললেন, “দ্যাখো, খাওয়াটাই সব নয়, আসল কথা হচ্ছে সৌন্দর্য উপভোগ। আর তা ছাড়া এই কথাটা সব সময়ে মনে রাখবে যে, মারাঠী অশ্বারোহীরা স্রেফ চানা খেয়ে মোগলদের সঙ্গে লড়ত।”

হনুমান-চটিতে পৌঁছতে সাড়ে পাঁচটা বাজল। পথের মধ্যে আর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। তবে কিনা, ডিনামাইট

তীর্থযাত্রী ফোটো সৌমেন্দ্রমোহন গোস্বামী

দিয়ে পাহাড় ফাটিয়ে রাস্তা বানানো হচ্ছিল তো, সেই ধুমধাড়াক্কা হুড়ুগুড়ুম শব্দে ভড়কে গিয়ে আমার ঘোড়াটা একেবারে অন্য পথে ঘুরে গিয়ে, ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে। তার খানিক বাদেই নামে তুমুল বৃষ্টি। বৃষ্টিতে ভিজে ঢোল হয়ে আমরা চটিতে গিয়ে পৌঁছলুম। তোমরা যারা ইংরেজি কবিতা পড়েছ, তাদের কেউ কেউ হয়তো জন গিলপিনকে চেনো। ভদ্রলোক একবার ঘোড়ায় উঠে মহা ফ্যাসাদে পড়েছিলেন। তা, আমরা যখন হনুমান-চটিতে গিয়ে পৌঁছই, তখন যদি তোমরা আমাদের দেখতে, তাহলে নিশ্চয় তোমাদের মনে হত যে, সেই জন গিলপিনই যেন তাঁর গোটা সংসারকে ঘোড়ায় চাপিয়ে সফরে বেরিয়েছেন।

হনুমান-চটি একেবারে যমুনার ধারে। খুব যে পরিচ্ছন্ন, তা নয়। কিন্তু তখন আমাদের যা অবস্থা, তাতে কোনক্রমে কোথাও মাথা গুঁজবার মতো একটা ঠাঁই পেলেই আমরা বর্তে যাই। তা, নড়বড়ে একটা সিঁড়ির পাথরের ধাপে পা রেখে-রেখে সেই চটির কাঠের বাড়ির দোতলায় উঠে একটা ঘর আমরা পেয়ে গেলুম। তার সঙ্গে পেলুম চারটে তোষক, চারটে বালিশ আর খান-আষ্টেক কম্বল। খাবার বলতে নুন-পোড়া আলুর চোখা আর হাতে-গরম মোটা-মোটা রুটি। খিদের মুখে তা-ই যেন অমৃত বলে মনে হল। কিন্তু তাতে পেট ভরল না। ফলে আবার কিছু নিমকি খেয়ে পেট ভরাতে হল। তারপর যখন মোমবাতি নিভিয়ে কম্বলের তলায় গিয়ে ঢুকলুম, সারা দিনের ক্লান্তিতে আমাদের চোখ তখন জড়িয়ে আসছে।

৪

ভোরে উঠে চারদিকে তাকিয়ে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। বেশ খানিকটা উঁচু থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে, মস্ত-মস্ত পাথরে ঠোকাঠুকি খেতে খেতে, ঢেউয়ে-ঢেউয়ে তোলপাড় কান্ড ঘটিয়ে গর্জন করতে করতে বয়ে যাচ্ছে যমুনা নদী। নদী তো নয়, যেন মস্ত একটা অজগর। খালি ফুঁসছে আর ফুঁসছে। এদিকে চটি, ওদিকে বন আর পাহাড়। নদীর উপরে সরু একটা ঝুলন্ত পোল। ওপারের জঙ্গল থেকে একটি-দুটি লোক সেই সাত-সকালে পোল পেরিয়ে এদিকে আসছে। তোমরা তো জানোই যে, নদী যখন পাহাড় থেকে নামে, তখন তার শরীর থাকে রোগা-মতন, তারপরে সমতলে নেমে হাত-পা ছড়িয়ে সে চওড়া হয়ে যায়। যমুনা এখানে পাহাড়ের দেওয়ালে বন্দিনী, তার শরীর এখানে বড্ড রোগা, কিন্তু সেই রোগা শরীরে অত জল সে ধরে রাখবে কী করে, রাগে সে তাই সারাক্ষণ শুধু গজরাচ্ছে, আর নীচে নামবার জন্যে পাহাড়ে-পর্বতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে খ্যাপার মতন ছুটে চলেছে।

চটির একতলায় আস্তাবল। আমাদের ঘোড়াগুলো রাত্তিরে সেখানে বাঁধা ছিল। গোটা দুই নিমকি আর এককাপ করে চা খেয়ে যে যার ঘোড়ায় উঠে আবার আমরা পথে বেরিয়ে পড়লুম।

হনুমান-চটি থেকে খানিকটা পথ একেবারে খাড়া উঠে যেতে হয়। পথের দু-দিকে মাঝে-মাঝেই বরফে-ঢাকা পাহাড়-চুড়ো চোখে পড়ে, কিন্তু সে ওই পলকের দেখা, বেশিক্ষণ সেদিকে চোখ রাখতে ভরসা হয় না। তার কারণ, পথ একেবারে যাচ্ছেতাই। একে তো পাহাড়ী পথে ঘোড়াগুলো একেবারে খাদের কিনার ঘেঁষে চলে, পাছে উপর থেকে পাথর খসে পড়ে সেই ভয়ে তারা পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলতে চায় না, তার উপরে আবার জায়গায়-জায়গায় সেই পথ এত সরু যে, মনে হয়, ঘোড়া যদি সেখানে হঠাৎ একবার টক্কর খায় তো আর দেখতে হবে না, তৎক্ষণাৎ একেবারে হাজার-ফুট নীচের পাতালে গিয়ে ছিটকে পড়ব। এক-জায়গায় তো পথ একেবারে নেই-ই। ধস নেমে পথ সেখানে বিলকুল ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেছে। আবার কবে পাহাড়ের গা

কেটে রাস্তা বানানো হবে, কে জানে, ইতিমধ্যে পাহাড়ের গায়ে-গায়ে তক্তা বসিয়ে লোক-চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেখে মনে হয় যেন টানা-লম্বা একটা ঝুল-বারান্দা। তার উপর দিয়ে ঘোড়া চলে না, হেঁটে পার হতে হয়। আমি তো পাহাড়ের-গা-থেকে-বেরিয়ে-আসা ঘাস লতা আর শিকড় আঁকড়ে ধরে, ইষ্টনাম জপ করতে-করতে সেই জায়গাটা পেরিয়ে গেলুম। ইতিমধ্যে আমরা ফুল-চটি পেরিয়ে এসেছি। আটটা-পঁয়তাল্লিশে জানকী-চটিতে পৌঁছলুম।

জানকী-চটিতে থাকার ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই। ধর্মশালা ছাড়াও একটা সরকারী যাত্রী-নিবাস আছে। তবে সেখানকার চৌকিদারটি অতি চালবাজ। এমন ভাব দেখায় যেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তার শ্বশুর কিংবা রাজ্যপাল তার মেসোমশাই। কিন্তু তাতে ঘাবড়ে না-গিয়ে যদি তার সঙ্গে খাতির জমিয়ে নাও, তাহলে সে হয়তো দয়া করে এমন একটা ঘর তোমাকে ছেড়ে দিতে পারে, যার জানলা খুলবামাত্র ধপধপে বরফে-ঢাকা মস্ত দুটি পাহাড়-চূড়া তোমার চোখের সামনে ঝকমকিয়ে উঠবে। চৌকিদার তখন তোমাকে এও জানিয়ে দেবে যে, ওই বরফই হল যমুনা-নদীর উৎস।

আমরা অবশ্য বেশিক্ষণ সেই বরফের বাহার দেখতে পারিনি। ঠিক ছিল, জানকী-চটিতে বিশ্রাম নেওয়া হবে না। যা-হোক একটা আশ্রয় খুঁজে নিয়ে, সুটকেসগুলোকে সেখানে জমা রেখে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়ব, যাতে যমুনোত্রী দেখে সেই-দিন বিকেলের মধ্যেই আবার জানকী-চটিতে আমরা ফিরে আসতে পারি। সেই প্ল্যান অনুযায়ী ঘোড়ায় চেপে আবার সকাল দশটার মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম। খানিক এগিয়ে একটা অদ্ভুত জায়গা আমাদের চোখে পড়ল। চারদিকে পাহাড়, তার মধ্যে অনেকখানি সমতল জমি, সেই জমির উপরে মস্ত মস্ত সব গাছ। কিন্তু একটা গাছেও পাতা নেই। দেখে মনে হয়, গাছ তো নয়, গাছের কঙ্কাল। ঘোড়ার মালিক আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে যাচ্ছিল। সে বলল, হঠাৎ আগুন লেগে গাছগুলো পুড়ে গিয়েছে। সে যে কী বীভৎস দৃশ্য, তা বলে বোঝাতে পারব না। মনে হচ্ছিল যেন মস্ত একটা শ্মশানের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। তার উপরে আবার প্রত্যেকটা চড়াই-ই এত খাড়া যে, সওয়ার নিয়ে আর সেই রোগাপট্‌কা ঘোড়ার পক্ষে উপরে ওঠা সম্ভব নয়। এক-একটা চড়াই ভাঙি, আর মিনিট দুই-তিন জিরিয়ে নিই। মনে হয়, দম বন্ধ হয়ে আসছে, বুক ফেটে যাবে। কিন্তু মজা কী জানো, মিনিট-দুয়েক বিশ্রাম নিলেই যেন পাহাড়ের সেই ঠান্ডা বাতাসের স্পর্শে সমস্ত ক্লান্তি আবার নিমেষে কেটে যায়। হাঁটতে-হাঁটতে আর জিরোতে-জিরোতে তা প্রায় তিরিশ-বত্রিশটা চড়াই ভেঙে আমরা যখন যমুনোত্রীতে গিয়ে পৌঁছলুম, তখন সাড়ে বারোটা বাজে।

অরুণদা বললেন, "জানকী-চটি হল আট হাজার ফুট, আর যমুনোত্রী হল দশ হাজার আটশো ফুট। অর্থাৎ মাত্র আড়াই ঘন্টায় আমরা প্রায় তিন হাজার ফুট উপরে উঠে এসেছি।"

উপরে উঠতে-উঠতে যখন খাদের দিকে তাকাই, তখন দেখেছিলুম যে, নদীর উপরে অনেক জায়গাতেই মস্ত-মস্ত বরফের চাঙড় জমাট বেঁধে যেন ছাতের মত হয়ে ঝুলে আছে, আর তার তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জলধারা। তখনই বুঝেছিলুম যে, আমরা একেবারে বরফের রাজ্যে এসে পৌঁছে গেছি। কিন্তু তাই বলে যে আকাশ থেকে হঠাৎ রাশি-রাশি টিকটিকির-ডিম ঝরতে থাকবে, অতটা তখনও বুঝতে পারিনি। কী হয়েছিল জানো? যমুনোত্রীতে পৌঁছে নদীর ধারে একটা মস্ত পাথরের উপরে বসে তো আমরা হিহি করে কাঁপছি; সেইসময়ে, বলা নেই কওয়া নেই, আকাশ থেকে হঠাৎ অজস্র টিকটিকির ডিম ঝরে পড়তে লাগল। চেয়ে দেখি, আমার কোঁচড় একেবারে ডিমে-ডিমে বোঝাই। অরুণদা বললেন, "ডিম নয়, বৃষ্টির ফোঁটা, এত ঠান্ডা যে, মেঘ থেকে মাটিতে পৌঁছবার আগেই বরফ হয়ে যাচ্ছে।"

যমুনোত্রীতে রয়েছে যমুনা নদীর মন্দির। তার পাশেই একটা মস্ত বড় উষ্ণকুণ্ড। একটা পুঁটলিতে চাল আর আলু বেঁধে সেই পুঁটলিটাকে যদি কুণ্ডের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখো তো আর দেখতে হবে না, মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যেই তোমার ভাত আর আলুসেদ্ধর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তা অনেকেই দেখলুম কুণ্ডের মধ্যে পুঁটলি ঝুলিয়ে বসে আছেন। কী মজা বলো তো! হাঁড়ি-কুড়ির দরকার হয় না, ঘুঁটে-কয়লা দিয়ে উনুন জ্বালাবার দরকার হয় না, স্রেফ সঙ্গে কিছু চাল ডাল আর আলু থাকলেই দিব্যি মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা হয়ে যায়। আমাদের অবশ্য অতটা দূরদৃষ্টি ছিল না, তাই চাল-ডাল সঙ্গে নিয়ে যাইনি। তার ফল হল এই যে, বৌদি গিয়ে যমুনাদেবীর মন্দিরে পুজো সেরে আসবার পরে আবার সেই খাস্তা-নিমকি দিয়ে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজ সমাধা করতে হল।

তার আগে নমো-নমো করে স্নান করে নিয়েছি। বরফ-গলা জল তো, গায়ে লাগলে মনে হয় যেন কেউ একখানা ধারালো ছুরি বসিয়ে দিল। স্রোতও দারুণ। তাই আঁজলা ভরে জল তুলে নিয়ে মাথায় একটু থাবড়ে নিয়েছিলুম, জলে নামতে আর সাহস হয়নি। জলধারা যেখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, তার দুদিকে কালো কঠিন পাহাড়। সেই পাহাড়ের একটা খাঁজে, অনেক উঁচুতে, দুটো কাক একেবারে চুপচাপ বসে আছে। দেখে ভারি আশ্চর্য লাগল। কাক কি এত উঁচুতে, এত ঠান্ডাতেও ঘর বাঁধে?

ফিরতি পথে খানিক নীচে নেমে অবশ্য ভারী আশ্চর্য এক রকমের পাখি দেখেছিলুম। জোড়ায়-জোড়ায় ঘোরে। কিন্তু জোড়ার দুটো পাখির রঙ দেখা গেল পরস্পরের একেবারে উলটো। একটার যদি মুখ কালো, লেজ কালো আর বুক একেবারে ডগডগে লাল, তো অন্যটার মুখ লাল, লেজ লাল আর বুক একেবারে মিশকালো।

যাবার সময়ে তো ভাল করে সবকিছু দেখবার অবকাশ হয়নি, এবারে ফিরতি পথে ফুলও দেখলুম অনেক। তার বেশিরভাগই পাহাড়ের গায়ে ঝোপেঝাড়ে ফুটে আছে। তবে যে-ফুল সবচেয়ে ভাল লাগল, তার গাছগুলো বেশ উঁচু, আর তার রঙ দেখলুম দু'রকম হয়। ডগডগে লাল, নয়তো গোলাপী। ঘোড়াওয়ালাকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, এ হল ব্রাঁস ফুল। কিন্তু অন্য-একজন তীর্থযাত্রী বললেন, ও-সব বাজে কথায় কান দেবেন না, এই হচ্ছে ব্রহ্মকমল।

ফিরতি পথে বৃষ্টি আমাদের খুব ভুগিয়েছিল। বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে তা প্রায় সাড়ে চারটে নাগাদ আমরা আবার জানকী-চটিতে ফিরে আসি।

৫

ভেবেছিলুম, জানকী-চটিতে ফিরে চারপাশটা একবার ভাল করে ঘুরে দেখব। কিন্তু যমুনোত্রীতে যাবার পথে চড়াই ভাঙতে-ভাঙতে পা এমন ব্যথা হয়ে গিয়েছিল আর ফিরতি-পথে বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে মেজাজ এমন বিগড়ে গিয়েছিল যে, ঘোরাঘুরির ব্যাপারে কারও আর তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। সাতটার মধ্যেই কম্বল টেনে আমরা শুয়ে পড়লুম। মাঝরাত্তিরে আমার ঘুম একবার ভেঙে গিয়েছিল। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশে তখন জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে; আর আমাদের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে রুপোর মতো ঝকঝকে সেই পাহাড়-চূড়া। সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে কখন যে আবার ঘুমে আমার চোখের পাতা জড়িয়ে এসেছিল, কিচ্ছু জানি না।

ঘুম ভাঙল ভোর পাঁচটায়। জানকী-চটি তার আগেই জেগে উঠেছে। কাল সন্ধের সময়েও যাত্রী-নিবাস একেবারে ফাঁকা ছিল,

টু-শব্দটি কোথাও শোনা যাচ্ছিল না। আজ সাত-সকালেই কিন্তু সরগরম। কারা এল? যারাই আসুক, আমরা ঘুমিয়ে পড়বার পরে এসেছে। বাইরে এসে দেখি, ওরেব্বাবা, প্রতিটি ঘরে লোক ঢুকেছে, বারান্দাতেও পা ফেলবার জায়গা নেই। বিস্তর লোক। কেউ বালতি করে জল আনছে, কেউ দাঁতন করছে, কেউ উনুন জ্বেলে জল গরম করছে। শুনলুম, হৃষীকেশ থেকে কালই সকালে প্রথম যাত্রী-বোঝাই বাস ছেড়েছে। যাত্রীদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তখন অবশ্য আর তাদের সঙ্গে আলাপ জমাবার সময় নেই। চটপট মুখ ধুয়ে, চা খেয়ে, ঘোড়ায় চেপে আমরা সায়নাচটির পথে রওনা হলুম।

এই ফিরতি-পথেই এমন একটা ব্যাপার ঘটে, যার ফলে আমি তক্ষুনি-তক্ষুনি প্রতিজ্ঞা করে ফেলি যে, জীবনে আর কক্ষনো আমি ঘোড়ায় চড়ব না। ঘটনাস্থল হল জানকী-চটি আর হনুমান-চটির মধ্যিখানে। খাদ সেখানে দারুণ গভীর, আর সেই খাদের তলা দিয়ে গর্জন করতে-করতে ছুটে যাচ্ছে যমুনা নদী। হয়েছে কী, আমার ঠিক পিছনেই এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক ঘোড়ার পিঠে তাঁর মস্ত হোল্ডলটাকে চাপিয়ে দিয়ে নিজে পায়ে হেঁটে আসছিলেন। হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে উঠতে পিছন ফিরে দেখি যে, ঘোড়ার পিঠ থেকে তাঁর হোল্ডলটা খাদের মধ্যে পড়ে গিয়ে পাথরে-পাথরে ঠোক্কর খেতে-খেতে নদীর দিকে চলেছে। তাই দেখে তিনি 'হায়-হায়' করছেন আর বাদবাকী লোক হৈ-হৈ করছে। আমার ঘোড়াটা এতক্ষণ বেশ ঠাণ্ডা মেজাজে ধীরেসুস্থে এগোচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ এই 'হায়-হায়' আর হৈ-হৈতে ভড়কে গিয়ে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকল। চড়াইয়ের পথে পাথরে পা রেখে-রেখে আস্তে-আস্তে নীচে নামতে হয়, হুড়ুম-দুড়ুম করে নামতে নেই। অমনভাবে নামতে গেলে যে-কোনও মুহূর্তে পাথরে ঠোক্কর লেগে মুখ থুবড়ে পড়বার আশঙ্কা। আমার ঘোড়াটা সম্ভবত এই সহজ কথাটা ভুলে গিয়েছিল। তার ফলে যা হবার তা-ই হল। কিন্তু ঘোড়াটা যখন হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে, কপালক্রমে ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা একটা গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিলুম। ঘোড়াও হোঁচট খেল, আর আমিও অমনি 'দুগ্গা' বলে সেই গাছের একটা ডাল একেবারে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরলুম। পরমুহূর্তে দেখি, ঘোড়া নেই, আমি শূন্যে ঝুলছি।

অনেক কষ্টে তো নীচে নামলুম। দেখি, হাতের তালুতে কাঠের চোঁচ বিঁধে গিয়ে দরদর করে করে রক্ত পড়ছে। কাছেই একটা ঝর্না। সেখানে হাত ধুয়ে নিয়ে, ডেটল লাগিয়ে, রুমাল দিয়ে কোনক্রমে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে ফের রওনা হওয়া গেল। খানিক বাদেই হনুমান-চটি। কিন্তু সেখানে আমরা থামলুম না। যেমন করেই হোক, দশটার মধ্যে সায়নাচটিতে পেঁাছতে হবে। তা অবশ্য পারা গেল না। সায়নাচটিতে পেঁাছতে-পেঁাছতে প্রায় এগারোটা বেজে যায়। ট্যাক্সি-ড্রাইভার মদনলাল সেখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমরা গিয়ে পেঁাছতেই সে একগাল হেসে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল।

তীর্থ মানেই ভিড়। সায়নাচটি অবশ্য তীর্থ নয়, তবে তীর্থে যাবার পথের উপরে একটা মস্ত বড় ঘাঁটি তো বটেই। তার উপরে আবার পাকা রাস্তা এইখানেই শেষ। বাস-লরি-ট্যাক্সি ইত্যাদি যাবতীয় চার-চাকার গাড়ি এই পর্যন্ত এসেই থেমে পড়তে বাধ্য হয়, তারপর যাত্রীরা পায়ে হেঁটে কিংবা ঘোড়ায় চেপে এগোয়, আর এইসব যানবাহন তাদের প্রত্যাগমনের জন্যে সায়নাচটিতে বসে অপেক্ষা করতে থাকে। তীর্থযাত্রার মাসগুলিতে এইখানে তাই সারাক্ষণই গাড়ির গাদি। লোকজনেরও দারুণ ভিড়। তার উপরে মাঝে-মাঝেই বৃষ্টি নামছে। ফলে জায়গাটা খুব নোংরা হয়ে আছে। একটু চেষ্টা করলেই কিন্তু সায়নাচটিকে অনেক সুন্দর আর পরিচ্ছন্ন করে রাখা যেত।

তা সে যা-ই হোক, এই সায়নাচটিতেই সেদিন এক বিচিত্র সাধুর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। বছর ষাটেক বয়স; মাথায় জটা; মুখে দাড়ি। ধুনি জ্বালিয়ে চুপচাপ তিনি বসে ছিলেন। অন্য-সব সাধুর সামনে অনেক ভক্ত, কিন্তু এঁর সামনে একটিও লোক নেই। আমি গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই পরিষ্কার বাংলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি বাঙালী বুঝি?"

সেদিন সেই সাধুর কাছে যে গল্প শুনেছিলুম, তাতে অবাক হয়ে যাই। ভদ্রলোক কলকাতার মানুষ। ছাপোষা গেরস্ত। চাকরি করে সংসার চালাতেন। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখতেন। কিন্তু বড্ড ভিতু। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষদিকে কলকাতায় যখন জাপানী বোমা পড়ে, তখন তাঁর ধারণা হয় যে, গোটা শহরটাই এবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই তিনি তাঁর সংসারের লোকজনদের বলেন, চলো, এই বেলা কলকাতা থেকে পালাই। তারা তাতে রাজী হয় না। ফলে তিনি একাই কলকাতা থেকে পালিয়ে আসেন। পালাবার আগে বলে আসেন, "আমার কথা তো শুনলে না। কিন্তু দেখো, তোমরা ঠিক মারা পড়বে।" প্রথমে গিয়েছিলেন হরিদ্বারে; তারপর অনেক বছর ধরে অনেক জায়গায় ঘুরতে-ঘুরতে শেষ পর্যন্ত এই সায়নাচটিতে এসে উঠেছেন। কিন্তু জপ-তপে তাঁর মতি নেই, আসলে তিনি কলকাতাতেই ফিরতে চান।

শুনে তো আমি হতভম্ব। বললুম, "বা রে, তাহলে ফিরে গেলেই তো পারতেন। কলকাতা যখন ধ্বংস হল না, বোমা খেয়েও বেঁচেবর্তে রইল, তখন সেখানে ফিরলেন না কেন?"

উত্তরে ভদ্রলোক একটু লাজুক হেসে বললেন, "লজ্জায়। যাদের ছেড়ে সেদিন পালিয়ে এসেছিলুম, ফিরে গেলে তারা ভিতু বলবে, দুয়ো দেবে। তাই ফেরা হল না।"

বোঝো ব্যাপার। সেই কবে কলকাতায় জাপানী বোমা পড়েছিল, তারপর কত বছর কেটে গেছে, অথচ এই মানুষটি আজও লজ্জায় সেখানে ফিরে যেতে পারছেন না; জপ-তপে আগ্রহ নেই, তবু সন্ন্যাসী সেজে পাহাড়ে-জঙ্গলে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

আমি আর কথা বাড়ালুম না। মদনলাল ওদিকে ঘনঘন হর্ন দিচ্ছিল। তাই সন্ন্যাসীর সামনে একটা টাকা ফেলে দিয়ে আমি গাড়িতে এসে উঠলুম।

রুচি জিজ্ঞেস করল, "সাধুবাবার সঙ্গে অত কী কথা হচ্ছিল নীরেনকাকা?"

আমি বললুম, "আমার তো খুব সাধু হবার ইচ্ছে, তাই লোটা-কম্বল আর গেরুয়া কাপড়ের দাম কত সেইটে জেনে নিলুম।"

"সাধু হয়ে তোমার কী লাভ হবে?"

"কত ভক্ত এসে আমাকে পেন্নাম করবে। কত দুধ-ঘি-ছানা খাব। তোদের মতো আর গুচ্ছের খাস্তা-নিমকি খেয়ে তখন পেট ভরাতে হবে না। সেটাই মস্ত লাভ।"

এমনিতে যে নিমকি খেতে আমার খুব খারাপ লাগে, তা নয়। কিন্তু তাই বলে কি দিনরাত শুধু নিমকি খাওয়া যায় নাকি! সত্যি বলতে কী, যমুনোত্রী আর গঙ্গোত্রীর পথে এবারে যত নিমকি খেয়েছিলুম, তত নিমকি বোধহয় সারা জীবনেও আমি খাইনি। নিমকি দিয়ে ব্রেকফাস্ট, নিমকি দিয়ে লাঞ্চ, নিমকি দিয়ে বিকেলের চা, নিমকি দিয়ে ডিনার। সে এক ভয়াবহ কাণ্ড! নিমকি খেতে-খেতে যেন পাগল হয়ে যাচ্ছিলুম। তারই মধ্যে আবার জানকী-চটিতে মধ্যরাত্রে স্বপ্ন দেখেছিলুম যে, আমি একটা নেমন্তন্ন-বাড়িতে গেছি, আর সেখানে দুজন ষণ্ডামতন লোক আমাকে জাপটে ধরে নিমকি খাইয়ে দিচ্ছে। সেই দুঃস্বপ্ন দেখে আমি যখন আর্তনাদ করে বিছানার উপরে উঠে বসি, তখন
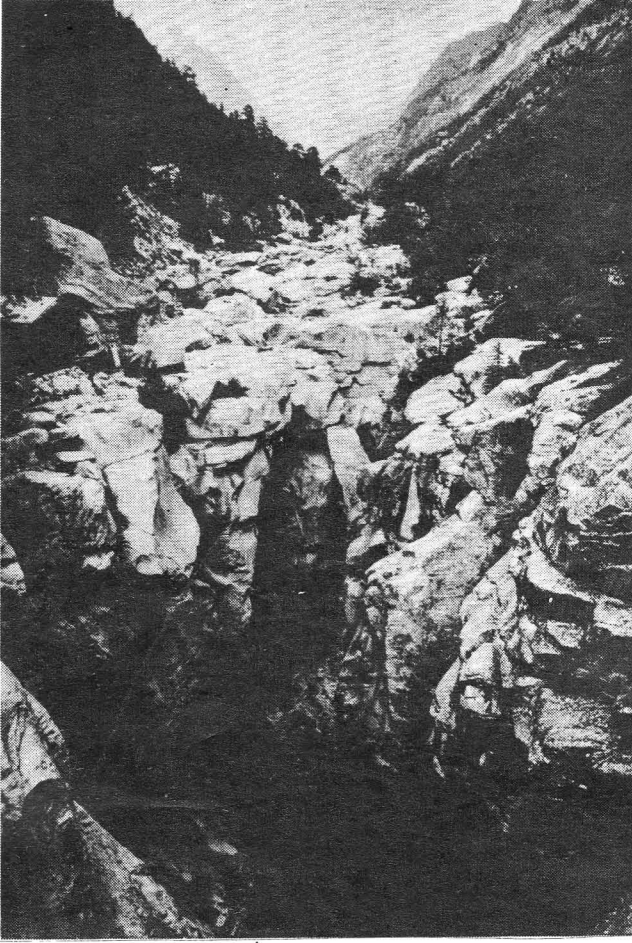
দুদিকে পাহাড়, মধ্যে খাদ, গঙ্গোত্রী ফোটো রঘুবীর সিং

সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যেও আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে গলগল করে ঘাম গড়াচ্ছে। মনে-মনে তখনই আমি প্রার্থনা করেছিলুম যে, হে ভগবান, দিল্লি থেকে অরুণদা ওই যে বিরাট দু বাক্স খাস্তা-নিমকি নিয়ে এসেছেন, যেমন করেই হোক, ওই বাক্স দুটোকে তুমি খাদের মধ্যে ফেলে দাও।

তা ভগবান আর সে-কথা শুনলেন কই! ট্যাক্সিতে উঠতে-উঠতেই আড়চোখে দেখে নিয়েছিলুম যে, অরুণদা অতি যত্ন করে বাক্স দুটোকে গুছিয়ে রাখছেন। ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "আজও কি ওই দিয়ে লাঞ্চ হবে নাকি?"

অরুণদা বললেন, "না, আজ আমরা বড়কোটে পেঁছে বিরিয়ানি আর মোরগ মুসল্লাম খাব।"

শুনে কী যে আনন্দ হল, বুঝিয়ে বলতে পারব না। ওয়াজিনি, যমুনা-চটি, কুতনৌর, গঙ্গানি, সির্মানি, ডাণ্ডিলগাঁও—একটার-পর-একটা জায়গা যেন স্বপ্নের মতো পেরিয়ে আসতে লাগলুম। বৃষ্টি নেই, আকাশ একেবারে টলটলে নীল, রোদ্দুর আর ছায়া পরস্পরকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, পাহাড়ের গা বেয়ে রুপোলী ফিতের মতো ঝর্না নেমে আসছে, বাচ্চা-বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা পাহাড়িয়া বস্তির ধারে খেলা করছে, চারদিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল যে, আহা, এ যেন স্বর্গরাজ্য।

আসলে কিন্তু দুঃখকষ্ট এখানেও কিছু কম নেই। এখানকার লোকজন বড় গরিব। কত কষ্ট করে যে এরা জীবনধারণ করে! মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, বিস্তর চড়াই ভেঙে, ঝর্না থেকে খাবার জল নিয়ে আসতে হয়। চাষবাসের জন্যও জল চাই। অথচ পাহাড়ের ঢালু গায়ে বৃষ্টির জল দাঁড়ায় না, গড়িয়ে পড়ে যায়। তাই এরা কী করে জানো? ছোট-ছোট জমির চারদিকে পাথর সাজিয়ে বেড়া বেঁধে নেয়, অন্তত খানিকটা জল যাতে সেই ঢালু জমির মধ্যে আটকে থাকে। এইভাবে জল বেঁধে নিয়ে এরা জমি তৈরি করে, লাঙল দেয়, বীজ বোনে, ফসল ফলায়। ধান গম ভুট্টা, চানা—হরেক রকমের ফসল।

দেখতে-দেখতে বড়কোটে পেঁছে গেলুম। যাবার পথে ভাল করে দেখবার মতো সময় ছিল না, এখন ফিরতি পথে দেখলুম, দিব্যি জায়গা। রাস্তা এখানে বেশ চওড়া। রাস্তার ধারে দর্জির দোকান, মনোহারী দোকান। টেবিল-চেয়ার-সাজানো একটা হোটেলও চোখে পড়ল। সেখানে অবশ্য না আছে বিরিয়ানি, না আছে মোরগ মুসল্লাম। খাবার বলতে শুধুই পুরী, ডাল আর তরকারি। কিন্তু তাতেই আমরা বর্তে গেলুম। যাক বাবা, এবেলা তাহলে আর নিমকি খেতে হল না!

পাহাড়ের কোমর ধরে পাক খেতে-খেতে বড়কোট থেকে রাস্তা ক্রমাগত নীচে নেমে গেছে। ধরাসু পেঁছতে আড়াই হাজার ফুট নীচে নামতে হল। এ হল তে-মাথা মোড়। এখান থেকে একটা পথ গেছে মুসৌরীর দিকে, একটা পথ গেছে টিহরির দিকে, আর একটা পথ ফের উত্তরে ঘুরে চলে গেছে গঙ্গোত্রীর দিকে। আসলে, আমরা যদি পাখির মত উড়ে যেতে পারতুম, তাহলে দেখা যেত যে, যমুনোত্রী থেকে গঙ্গোত্রী খুব দূরে নয়। কিন্তু আমাদের তো ডানা নেই, তাই গাড়িতে উঠতে হয়েছে, আর গাড়ি যাবার কোনও সরাসরি রাস্তা নেই বলে বিস্তর পথ ঘুরতে হচ্ছে। কে জানে, তোমরা যখন বড় হবে, তখন হয়তো যমুনোত্রী আর গঙ্গোত্রীর মধ্যে হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু হয়ে যাবে, ফলে তোমাদের আর এত ঘুরতে হবে না।

আমার কিন্তু ঘুরতেই মজা। পাহাড়িয়া পথে ঘুরতে-ঘুরতে কখনো নীচে নামছি, কখনো উপরে উঠছি, কখনো আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে সবুজ একটা উপত্যকা কিংবা দুরন্ত একটা নদী, আবার কখনো-বা ঝকঝক করে উঠছে রুপোর-মুকুট-পরা পাহাড়-চুড়া, সত্যি সে ভারী মজার ব্যাপার। চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে যদি এক-জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় পেঁছে যেতুম, তাহলে কি এত মজা পাওয়া যেত? কত-কিছুই তো দেখতে পেতুম না।

ডুণ্ডা ভ্যালি যে দেখতে পেতুম না, সেটাই হত সবচেয়ে লোকসানের ব্যাপার। উত্তরকাশীর পথে পড়ে এই ডুণ্ডা। অনেকখানি পথ এখানে সমতল। একদিক দিয়ে বয়ে গিয়েছে গঙ্গানদী। অন্যদিকে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের পর পাহাড়। মাঝখানে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে শান্ত সবুজ উপত্যকা। তখন বিকেল হয়ে আসছে। ফসলের খেত, পাইনের সারি, ফুলের বাগান আর ছোট-ছোট বাংলোবাড়ির লাল টালির ছাতের উপরে পড়েছে পড়ন্ত সূর্যের কোমল কমলা-রঙা আলো। সব মিলিয়ে জায়গাটাকে যেন রূপকথার রাজ্যের মতন দেখাচ্ছে। মানে, আমি তো কখনো কোনো রূপকথার রাজ্যে যাইনি। কিন্তু কী জানি কেন, আমার মনে হতে লাগল যে, রূপকথার রাজ্য নিশ্চয় এই-রকমেরই শান্ত রঙিন আর সুন্দর হয়।

আমরা যখন উত্তরকাশীতে পেঁছলুম, তখন প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে। উত্তরকাশী হল জেলা-শহর। অনেক লোক, অনেক দোকানপাট, অনেক রেস্তোরাঁ আর অনেক হোটেল-বাড়ি। কিন্তু খুব পরিচ্ছন্ন। শহরটা একেবারে পাহাড়ের কোলের মধ্যে গড়ে উঠেছে তো, তাই রাস্তাগুলিও উঁচু-নিচু। হাঁটতে তাই একটু পরিশ্রম হয়, কিন্তু তেমনি আবার মজাও লাগে। তার উপরে আবার শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে গঙ্গা। তাতে এই পাহাড়িয়া শহরের শোভা আরও খোলতাই হয়েছে।

কথা ছিল, সদর রাস্তার উপরে একটা সরকারী যাত্রী-নিবাসে আমরা রাত কাটাব। কিন্তু সেখানে পেঁছে দেখলুম, তরুণ জনাকয় সরকারী অফিসার সেটিকে দখল করে রেখেছেন। ফলে

সেখানে আমাদের জায়গা হল না। তাতে অবশ্য আমাদের লাভই হল। কেননা, একটু খোঁজাখুঁজি করতেই তার চেয়ে আরও অনেক বেশী ভাল একটা বাংলো আমরা পেয়ে গেলুম। নতুন বাংলো, আসবাবপত্র ফিটফাট, শোবার ঘরের লাগোয়া একেবারে হাল-ফ্যাশনের বাথরুম, তার উপরে আবার দোতলায় আমাদের ঘরের সামনে চওড়া একটা বারান্দা। সুটকেশ নামিয়ে রেখে অরুণদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "সবই তো হল, কিন্তু খাব কী?"

বৌদি বললেন, "এখানেও যদি নিমকি দিয়ে ডিনার খাই তো এই সুন্দর ঘরের অমর্যাদা হবে। চলো, হাত-মুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়ি। সদর-রাস্তার ধারে অনেক ভাল-ভাল হোটেল রয়েছে। মনে হচ্ছে, সেখানে হয়তো বিরিয়ানি আর মোরগ-মুসল্লাম তোমরা পেতেও পারো।"

তা অবশ্য পাওয়া গেল না। তবে কিনা সরু চালের যে ভাত সেখানে পেয়েছিলুম, তাতে ভুরভুর করছিল ভারী মিষ্টি একটি সুগন্ধ। ভাতও যে কত সুদৃশ্য আর রুচিকর হতে পারে, রেশনের চাল খেতে-খেতে তা তো আমরা ভুলেই গেছি, উত্তর-কাশীর হোটেলের সেই ভাত দেখে তাই খিদেটা যেন চনমন করে উঠল। সঙ্গে ছিল শিমের বিচির ডাল, আলুভাজা আর মাটন কারি। তার উপরে আবার পথের ধারের এক দোকান থেকে অরুণদা একটি খরমুজা কিনে এনেছিলেন। তার ভেতরটা সবুজ, কিন্তু তাতে কী, খেয়ে দেখলুম, যেমন রসালো তেমনি মিষ্টি।

হোটেল থেকে বেরিয়ে গেলুম গঙ্গার ধারে এক শিবমন্দিরে। যেমন নির্জন শান্ত পরিবেশ, তেমনি পরিচ্ছন্ন মন্দির। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে, গঙ্গার উপরে পড়েছে বিজলি-বাতির আলো, ঢেউয়ের দোলায় সেই আলো ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, অন্ধকারে বসে কে যেন খুব শান্ত ও মধুর গলায় সংস্কৃত স্তোত্র উচ্চারণ করছে—সব মিলিয়ে ভারী ভাল লাগছিল আমাদের।

রাত আর একটু গভীর হতে বাংলোয় ফিরে এলুম আমরা। এবারে কম্বল টেনে শুয়ে পড়াই ভাল। ভোর পাঁচটায় গঙ্গোত্রীর পথে বেরিয়ে পড়ব।

৭

ঘুম থেকে উঠলুম সাড়ে চারটেয়। কিন্তু বাংলো-বাড়ির চত্বর থেকে মদনলাল যদিও ঘনঘন হর্ন বাজাচ্ছিল, তবু সাড়ে পাঁচটার আগে রওনা হওয়া গেল না। তখনও অবশ্য গোটা শহর ঘুমে আচ্ছন্ন, দোকানপাট খোলেনি, পথেঘাটে জনমানিষ্যি নেই। শহর ছাড়িয়ে মস্ত একটা ব্রিজ পেরিয়ে আমরা এগোচ্ছিলুম। হঠাৎ দেখি রাস্তা বন্ধ। কী ব্যাপার? ধস্ নামল নাকি? না না, সে-সব কিছু নয়, ভেড়া। শয়ে-শয়ে ভেড়া। ওই সাতসকালে তাদের চরাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নীচের পাহাড়ে যখন ঘাস মেলে না, রাখাল তখন ভেড়াগুলোকে আরও উঁচু পাহাড়ে চরাতে নিয়ে যায়। তা হঠাৎ হেডলাইট পড়তে, বিষম ভড়কে গিয়ে, সেই অগুন্তি ভেড়া একেবারে দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে এমন উল্টো-পাল্টা দৌড়তে শুরু করল যে, সে আর কহতব্য নয়। যাই হোক, এ-সব জায়গায় ভেড়ার পালের সঙ্গে থাকে ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া লোম-ওয়ালা মস্ত-মস্ত কুকুর। এই কুকুরগুলিই বন্যজন্তুর হামলা থেকে ভেড়াগুলোকে রক্ষা করে। ভারী শিক্ষিত কুকুর। তারাই গিয়ে হরেক জায়গা থেকে ভেড়াগুলোকে ফের খেদিয়ে নিয়ে এসে সারবন্দী করে দাঁড় করিয়ে দিল, আর আমরাও তখন পথ পেয়ে ফের এগুতে পারলুম।

যমুনোত্রীর পথের প্রথম অংশটা গিয়েছিলুম ট্যাক্সিতে; তারপর বাকী অংশটা ঘোড়ায় চেপে আর পায়ে হেঁটে। কিন্তু এদিককার ব্যবস্থাটা শুনলুম অন্যরকম। গঙ্গোত্রীর পথে লংকা বলে একটা জায়গা আছে। সেই পর্যন্ত ট্যাক্সিতে যাওয়া যাবে।
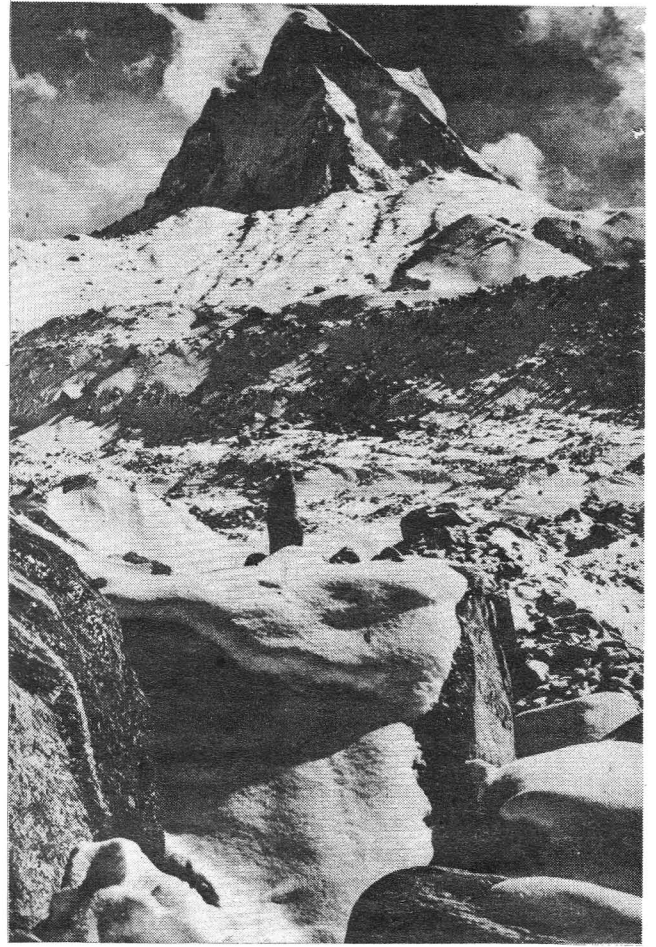
গঙ্গোত্রী ছাড়িয়ে ফোটো রঘুবীর সিং

তারপর সেখান থেকে ভৈরবঘাট পর্যন্ত যেতে হবে পায়ে হেঁটে। বাস্, ভৈরবঘাটে পৌঁছতে পারলে আর ভাবনা নেই, শেষের এক মাইল পথ পার করিয়ে দেবার জন্যে নাকি জীপের ব্যবস্থা আছে। সেই জীপ নিয়ে যে কী কেলেঙ্কারি কাণ্ড চলে, সে-কথা পরে বলব, তার আগে বরং লঙ্কায় পৌঁছই।

যমুনোত্রী গিয়েছিলুম যমুনা-নদীর ধার দিয়ে দিয়ে। গঙ্গোত্রী যাবার বেলাতেও তেমনি গঙ্গানদীর ধার দিয়ে-দিয়ে যেতে হয়। পাহাড়িয়া পথে পাক খেতে-খেতে ট্যাক্সি কখনও নীচে নেমে যাচ্ছে, আবার কখনও উঠে আসছে গা-শিরশির উঁচুতে। তবে নীচেই নামি আর উপরেই উঠি, গঙ্গা কিন্তু পাশে-পাশেই আছে, কখনও খুব দূরে চলে যাচ্ছে না। যখন নীচে নামছি, তখন দেখছি, ওরেব্বাবা, জলের কী তোড়, ওই জলে যদি হাতি নামে তো হাতিও মুহূর্তে ভেসে যাবে। আবার যখন অনেক উঁচুতে উঠছি, তখনও একটু ঠাহর করলেই দেখা যাচ্ছে যে, ওই তো, খাদের ওই অতল তলা দিয়ে সরু একটা ফিতের মতো বয়ে যাচ্ছে গঙ্গানদী।

পাহাড়ের গায়ে পাইন-বন। আমরা যেমন খেজুরগাছের গলার কাছটা চেঁছে দিয়ে সেখানে একটা হাঁড়ি বেঁধে দিই, আর সেই হাঁড়ির মধ্যে টুপ-টুপ করে রস পড়তে থাকে, এখানে এইসব পাইন গাছের গোড়ায় তেমনি খানিকটা জায়গা চেঁছে দিয়ে মুখখোলা এক-একটা কৌটো বেঁধে রাখা হয়েছে, আর সেই কৌটোর মধ্যে জমছে আঠার মতো রস। পাইনের রস অবশ্য খাওয়া যায় না, তবে হরেক কাজে লাগে।

আরও খানিকটা উঠে খুব শীত করতে লাগল। তখন চার-দিকে একটু নজর করে দেখি, বাস্ রে, ফের সেই বরফের রাজ্যে

এসে গেছি। আমাদের আশেপাশে আর খানিক-খানিক উঁচুতে তো বটেই, নীচের পাহাড়েরও খাঁজে-খাঁজে জমে আছে ধপধপে সাদা বরফ। তারপরে তো খানিকটা পথ স্রেফ বরফের উপর দিয়েই আমাদের ট্যাক্সি চলতে লাগল। আমি প্রথমটায় বিশ্বাস করিনি। অরুণদা তখন মদনলালকে বলে ট্যাক্সি থামিয়ে আমাকে নিয়ে পথের উপরে নেমে পড়লেন। বললেন, "বিশ্বাস হচ্ছিল না তো? এবারে পরখ করে দ্যাখো।" আমার পকেটে ছিল একটা আম-কাটা ছুরি। কাজে-অকাজে কখন দরকার হবে, বলা যায় না তো, তাই সঙ্গে-সঙ্গে থাকে। ছুরিটা বার করে পথের উপরে গোটা দুচ্চার খোঁচা মেরে দেখি, তা-ই বটে। পাশের পাহাড় থেকে বরফের ধারা নেমে এসে পথের উপর দিয়ে খাদের মধ্যে নেমে গেছে। নরম ঝুরঝুরে নয়, একেবারে থান-ইঁটের মতো শক্ত জমাট বরফ।

লঙ্কায় পৌঁছলুম পৌনে দশটায়। এখানেও দেখি সায়নাচটির মতো গাড়ির গাদি লেগে গেছে। লোকজনের ভিড়ও তেমনি। তার উপরে আবার মালপত্র বইবার জন্যে সরাসরি লোক ঠিক করবার উপায় নেই। এজেন্টের কাছে গিয়ে নাম লেখাতে হবে, তারপর সেই এজেন্টই লোক ঠিক করে দেবে। ব্যবস্থাটা অবশ্য মন্দ নয়, কিন্তু সব ব্যবস্থারই সাফল্য নির্ভর করে ব্যবস্থাপকদের দক্ষতার উপরে। তা আমরা যার কাছে নাম লেখাবার জন্যে গিয়ে লাইন দিয়েছিলুম, সে-লোকটা মোটেই দক্ষ নয়। অতিশয় ভ্যাবলা-গোছের লোক। একে তো চটপট নম্বর লিখে টিকিট দিতে পারছে না, গুচ্ছের চিরকুটের উপরে কাগের ঠ্যাং আর বগের ঠ্যাঙের মতো কী-সব লিখছে, তার উপরে আবার একবার বলছে 'একে নিন', একবার বলছে 'ওকে নিন'। আমি এর মধ্যে এক ফাঁকে গিয়ে গরম-গরম এক প্লেট হালুয়া আর এক গেলাস চা খেয়ে এসে-ছিলুম। কিন্তু ফিরে এসে দেখি, এজেন্টের চারপাশে যাত্রীদের ভিড় তো কিছুমাত্র কমেইনি, বরং আরও চতুর্গুণ বেড়ে গেছে। অরুণদা তো মহা খাপ্পা। শেষপর্যন্ত আর থাকতে না-পেরে ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কাকে নেব?" এজেন্ট তাতে ঘাবড়ে গিয়ে, মাথা চুলকে বলল, "আপ্ বাহাদুরকো লে লিজিয়ে।"

কিন্তু তাতেই কি আমাদের সমস্যা মিটল? মোটেই না। অরুণদা আর আমি সেই জগদ্দল ভিড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে যখন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কওন্ বাহাদুর হ্যায়, তখন অন্তত সাত-আটজন লোক এগিয়ে এল আমাদের দিকে, এবং তাদের প্রত্যেকেই বলল যে, তার নামই বাহাদুর। অরুণদা বললেন, "এ তো মহা জ্বালা হল দেখছি!" তারপর 'ধুত্তোর' বলে এজেন্টের-দেওয়া টিকিটটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে, সেখান থেকে একেবারে অন্যদিকে চলে এসে, ভালমানুষ-গোছের একজন পাহাড়িয়া লোককে ধরে বললেন, "এই, তুমি আমাদের মালপত্তর নিয়ে ভৈরবঘাটে যাবে?"

তাতে সে একগাল হেসে বলল, "জরুর।"

মালপত্তর মানে দুটো সুটকেস। চটপট তার ঘাড়ে সেই সুট-কেস দুটোকে চাপিয়ে দিয়ে আমরা ভৈরবঘাটের দিকে পা বাড়ালুম।

লঙ্কা থেকে ভৈরবঘাটের দূরত্ব খুব বেশী নয়। নেহাতই কয়েক কিলোমিটার। কিন্তু সেই সামান্য পথ পাড়ি দিতেই দম একেবারে বেরিয়ে যায়। প্রথমে তো উৎরাইয়ের পথে নেমে যেতে হয় অনেক নীচে, কিন্তু তারপরেই শুরু হয় চড়াইয়ের খেলা। কী চড়াই, কী চড়াই! চড়াই ভেঙে উপরে উঠতে-উঠতে প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল যে এইবার ঠিক বসে পড়তে হবে, আর পারা যাবে না! কিন্তু ওই যে বলেছি, পাহাড়িয়া পথে মিনিট কয়েক বিশ্রাম নিলেই যেন সমস্ত ক্লান্তি জুড়িয়ে যায়, বুকে আবার নতুন করে বল আসে। যতবার হিমালয়ে বেড়াতে গেছি, ততবারই এই আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ করেছি। এখানকার বাতাসই এমন নির্মল আর সতেজ যে ক্লান্ত শরীরকে আবার নিমেষে চাঙ্গা করে দেয়।

যেমন মিষ্টি বাতাস, তেমনি সুন্দর চতুর্দিকের দৃশ্যাবলী। আকাশের মুখখানা আজ ঝকঝকে নীল। সাদা-সাদা মেঘগুলো পাহাড়-চূড়ার সাদা বরফের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। পথের পাশের গাছে আর লতায় ফুটে আছে লাল আর সাদা ফুলের গুচ্ছ। ওদিকে—অনেক নীচে—পাথুরে দেওয়াল ফাটিয়ে গঙ্গা যেন এক উন্মাদিনীর মতো ঢেউয়ের হাততালি বাজাতে-বাজাতে ছুটে চলেছে। এমন জায়গায় এলে কার না ভাল লাগে বলো! আমারও দারুণ ভাল লাগছিল। মনে হচ্ছিল, আমি খুব ভাগ্যবান, তাই এ-সব দেখতে পেলুম।

কিন্তু ভৈরবঘাটে পৌঁছেই মন আবার খিঁচড়ে গেল। শুনে-ছিলুম, জীপে জায়গা পেতে কোনও অসুবিধে হবে না। কিন্তু গিয়ে দেখি, দারুণ ভিড়, এক-একটা জীপ আসছে আর শয়ে-শয়ে তীর্থযাত্রী গিয়ে একেবারে কাঁঠালে মাছি পড়ার মতো তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। অর্থাৎ এখানেও সেই নৈরাজ্য। অথচ পুলিস রয়েছে। যাত্রীদের তারা যদি ঠিকমতো একটা লাইনে দাঁড় করিয়ে দেয়, তাহলে কিন্তু এত হুড়োহুড়ি হয় না। পুলিস যে তাদের নম্বর-লাগানো স্লিপ দিচ্ছে না, তাও নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে পরের-নম্বরের লোক কী ক'রে আগের-নম্বরের লোককে টপকে গিয়ে জীপের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারছে, আর তাই নিয়ে নালিশ করা সত্ত্বেও যে পুলিসের লোকরা অন্যদিকে তাকিয়ে থাকছে কেন, সেটা ঠিক বোঝা গেল না। যাই হোক, অনেক কষ্টে তো জীপের মধ্যে জায়গা পেলুম। কিন্তু ঢুকেই মনে হল, জায়গা না-পেলেই ছিল ভাল। ওরেব্বাবা, সে একেবারে বস্তার মধ্যে আলু বোঝাই করবার ব্যাপার! লোক ক্রমাগত ঢুকছে তো ঢুকছেই। সবাই কি আর বসবার জন্য আসন পাচ্ছে? মোটেই না। কিছু লোক যেমন আসনে বসেছে, তেমনি কিছু লোক বসেছে অন্য-লোকের হাঁটু কিংবা ভুঁড়ির উপরে, আর বাদবাকী লোক এর-ওর-তার গা-হাত-পা মাড়িয়ে দিয়ে, নিজেদের শরীরটাকে একেবারে অবিশ্বাস্যরকম বাঁকিয়ে-চুরিয়ে ত্রিভঙ্গ কিংবা চতুর্ভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার উপরে আবার পাহাড়িয়া পথে চড়াই-উৎরাই ভাঙতে ভাঙতে আর সেইসঙ্গে বেদম ঝাঁকুনি খেতে-খেতে সেই জীপ যখন চলতে লাগল, তখন যে কী অবস্থার সৃষ্টি হল, তা না-বলাই ভাল। আমার বাঁ-পায়ের একটা আঙুল একেবারে থেঁতলে গিয়েছিল। তাই ভাবছিলুম যে, আর নয়, সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল, জীপ থামিয়ে বরং রাস্তায় নেমে যাই, কিন্তু ঠিক তক্ষুনি একটা ভয়ঙ্কর রকম ঝাঁকুনি খেয়ে প্রায় তিন-মন ওজনের এক দামোদর শেঠ আমার উপরে ছিটকে পড়লেন, আর আমিও সেই যে চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে গেলুম, গঙ্গোত্রী পৌঁছবার আগে আর আমার হাত-পা নাড়বার কোনও উপায়ই রইল না।

গঙ্গোত্রীতে পৌঁছে অবশ্য পথের কষ্ট ভুলে গিয়েছিলুম। এখানেও একেবারে চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ধপধপে-বরফে-ঢাকা পাহাড়চূড়া। ওই বরফ থেকেই নেমে আসছে ক্ষীণ জলধারা, ক্রমাগত চওড়া হতে-হতে শেষ পর্যন্ত যা কিনা বিরাট চেহারার নদী হয়ে উঠেছে। গঙ্গোত্রীর গঙ্গা দেখে অবশ্য সেই বিরাট চেহারার কথা কল্পনাই করা যায় না। কলকাতায় কিংবা পাটনায় কিংবা কাশীতে তোমরা যে গঙ্গা দেখেছ, এখানকার গঙ্গা তার চেয়ে অনেক রোগা। কিন্তু সেই রোগা শরীরেও তার কী তেজ! মস্ত-মস্ত পাথরের চাঁইয়ের বাধা ডিঙিয়ে দুদ্দাড় করে সে ছুটে যাচ্ছে। একেবারে বরফ-গলা জল তো, তাই বিষম ঠাণ্ডা, তার উপরে আবার তেমনি ভয়ংকর স্রোত, এখানেও তাই জলে না-নেমে 'গঙ্গা-গঙ্গা' বলে মাথার উপরে দু বাটি জল ঢেলে নিলুম, কিন্তু তাইতেই মনে হল যে, সর্বাঙ্গ একেবারে অসাড় হয়ে গেছে।

অরুণদা আর বৌদি অবশ্য জলে নেমে চান করলেন। তার-

পরে হিহি করে কাঁপতে-কাঁপতে গেলেন গঙ্গা-মন্দিরে পুজো দিতে। মন্দিরটি এখানে খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চত্বরটিও বেশ বড়। চত্বরের পিছনে দু-চারটে খাবার-দোকানও রয়েছে। চটপট খাওয়া চুকিয়ে আমরা আবার জীপের লাইনে এসে দাঁড়ালুম। যেমন করেই হোক, বিকেলের আগে ভৈরবঘাটে ফিরতে হবে, দিনের আলো থাকতে-থাকতে যাতে পায়ে-হাঁটা পথ পেরিয়ে লঙ্কায় পৌঁছতে পারি।

আমরা যখন গিয়ে দাঁড়াই, লাইনে তখন খুব বেশি লোক ছিল না। তবু অবাক হয়ে দেখলুম যে, একটার পর একটা জীপ এসে দাঁড়াচ্ছে, আর কোত্থেকে যেন একদল লোক এসে আমাদের আগেই সেগুলো বোঝাই করে ফেলছে। পুলিস কিন্তু নির্বিকার। এই উড়ে এসে জুড়ে বসার ব্যাপারটা ভৈরবঘাটেও দেখেছিলুম। এখানেও দেখলুম। আমরা বুঝেই গেলুম এর সঙ্গে পুলিসেরও যোগসাজশ রয়েছে, এবং এইরকম যদি চলতে থাকে, তাহলে আজ আর ভৈরবঘাটে পৌঁছবার কোনও আশা নেই। রুচি তো বিষম রেগে গেল। সে ক্রমাগত বলতে লাগল, "এ অন্যায়, খুব অন্যায়।" লাইনের অন্য-কিছু লোকও খেপে উঠেছিল। তখন আমরা সবাই মিলে করলুম কী, পরের জীপটা আসতেই অমনি সবাই গিয়ে সেটাকে ঘিরে ধরে বললুম যে, লাইন থেকে পরপর লোক না তুললে কোনও জীপকেই আমরা এখান থেকে যেতে দেব না।

পুলিস তো তাই দেখে চম্পট। কিন্তু খানিক বাদেই দেখি থানা থেকে আরও অনেক পুলিস এসে গেছে। তারা এসে কোথায় অন্যায়ের প্রতিকার করবে, তা নয়, উল্টে আরও আমাদের উপরেই মহা হম্বিতম্বি লাগিয়ে দিল। যে-লোকটি তাদের কর্তা তাঁর মস্ত গোঁফ, সেই গোঁফ চুমড়ে তিনি বললেন, "আপনারা সবাই সরে যান, নয়তো আমাকে লাঠি চালাতে হবে।" কিন্তু আমাদেরও তখন গোঁ চেপে গেছে। বললুম, ধরতে হয় ধরো, মারতে হয় মারো, কিন্তু পরপর লোক ওঠাতে হবে, নইলে আমরা এক পা'ও নড়ছি না।

কী ভাবছ তোমরা? লাঠি চলল? মোটেই না। বরং পুলিসকে শেষপর্যন্ত নরম হয়ে বলতে হল যে, ঠিক আছে, লাইনের লোকই আগে জীপে উঠবে।

রুচি সেদিন খুব সাহস দেখিয়েছিল। তার একটা পুরস্কার দেওয়া চাই তো। তাই ভৈরবঘাটে পৌঁছে আমরা পায়ে হেঁটে লঙ্কার দিকে রওনা হলুম বটে কিন্তু রুচি গেল কাণ্ডিতে চেপে। পাহাড়িয়া গরিব মানুষরা যেমন মালপত্র বয়, তেমনি লোকও বয়। তাদের পিঠে ঝুড়ি বাঁধা থাকে, সেই ঝুড়িতে বসিয়ে বুড়োবুড়ি আর বাচ্চা ছেলেমেয়েকে তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে দেয়। তাকেই বলে কাণ্ডিতে চেপে যাওয়া।

মদনলাল তার ট্যাক্সি নিয়ে লঙ্কায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমরা আর দেরি না-করে তক্ষুনি সেখান থেকে উত্তরকাশীর পথে বেরিয়ে পড়লুম।

ফিরতি-পথে আবার এক-জায়গায় আটকে পড়েছিলুম। এবারেও সেই ভেড়ার পাল। রুচি বলল শয়ে-শয়ে ভেড়া। কিন্তু আমার মনে হল হাজার-হাজার। আসছে তো আসছেই, কিছুতেই আর ফুরোয় না। তারপর, ভেড়ার পাল যদি-বা ফুরোল, তো আসতে লাগল গলায়-ঘণ্টা-বাঁধা ইয়া তাগড়া দুধেল গোরুর পাল। গোরুর পরে মোষ। একটা মোষের পিঠে দেখলুম ছোট্ট একটা বাঁদর বসে আছে। বোঝাই গেল যে, সেটা পোষা বাঁদর। মোষের পরে এল বাঘের মতো গোটা ছয়েক কুকুর। সবশেষে এল চারটে ঘোড়া। প্রথম ঘোড়ার পিঠে কর্তামশাই, আর তাঁর পিছনের তিন ঘোড়ায়—যদ্দুর বুঝলুম—তাঁর বউ আর দুই ছেলে। কর্তামশাইয়ের বিশাল চেহারা, টকটকে গায়ের রং, গোঁফজোড়াও বেশ জাঁদরেল-গোছের। সপরিবারে কোথায় চলেছেন জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, উঁচু পাহাড়ে। কেন? না নীচের পাহাড়ে ভেড়া
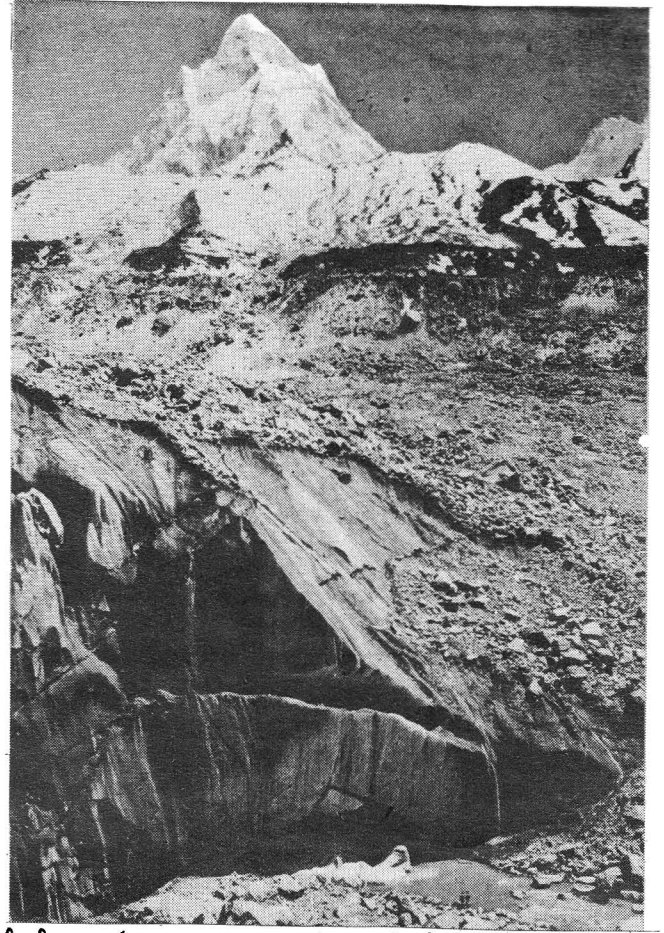
শিবলিঙ্গ পর্বত-চূড়া, গোমুখ ফোটো রঘুবীর সিং

গোরু আর মোষের খাদ্য ফুরিয়ে গেছে।

তখন সন্ধে হয়ে আসছিল। পাহাড়ের একদিকে খাদ, অন্যদিকে জঙ্গল। জঙ্গলে আছে হিংস্র জন্তু-জানোয়ার। অরুণদা তাই জিজ্ঞেস করলেন "রাত কাটাবেন কোথায়?"

"এই একটু এগিয়ে একটা ফাঁকামত জায়গা দেখে তাঁবু খাটিয়ে নেব।"

"বাঘের ভয় নেই?"

"তাঁবুর সামনে আগুন জ্বলবে। তবে আর ভয় কিসের?"

"কিন্তু ভেড়া গোরু মোষ তো তাঁবুতে থাকবে না। ওগুলোকে তো বাঘে খেতে পারে?"

শুনে কর্তামশাই হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, "কুত্তাগুলোকে দেখলেন না? ভেড়া-গোরু ওরাই পাহারা দেয়। যদি হামার কুত্তাকে দেখতে পায় তো বাঘই লেজ গুটিয়ে এই জঙ্গল ছেড়ে পালাবে।"

ঘোড়াগুলো চলে গেল। মনে হল, আমাদের কথা শুনে শুধু কর্তামশাই কেন, তাঁর বউ আর দুই ছেলেও খুব হাসছে। আমরা চুপ করে রইলুম। খানিক বাদে অরুণদা বললেন, "সত্যি, যে-দেশে জন্মেছি, বলতে গেলে তার প্রায় কিছুই আমরা জানি না।"

আর-একটু এগুতেই ট্যাক্সি হঠাৎ থেমে গেল। কিছুতেই আর স্টার্ট নেয় না। ব্যাপার কী? যন্ত্রপাতি নিয়ে রাস্তায় নামতে-নামতে মদনলাল বলল, "কিছু একটা বিগড়ে গেছে নিশ্চয়। এখুনি ঠিক হয়ে যাবে। আপনারা ভয় পাবেন না।"

কিন্তু ভয় না পেয়ে উপায় কী। ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এসেছে। রাস্তার পাশেই জঙ্গল। বললুম, "অরুণদা, সত্যি এই বনে বাঘ আছে নাকি?"

গঙ্গার যেখানে শুরু ফোটো রঘুবীর সিং

অরুণদা বললেন, "থাকা বিচিত্র নয়।"

রুচি বলল, "কর্তামশাইয়ের কাছ থেকে তখন একটা কুকুর চেয়ে রাখলেই হত।"

গাড়ি অবশ্য আধ-ঘন্টার মধ্যেই ঠিক হয়ে গেল। উত্তর-কাশীতে পৌঁছতে সেদিন রাত প্রায় বারোটা বেজে যায়। গোটা শহর তখন ঘুমুচ্ছে। আগের রাত্তিরে যে-বাংলোয় আমরা ছিলুম, এবারে তার ঠিক পাশেই পি-ডব্লু-ডির বাংলোয় আমরা জায়গা পাই। সেখানকার চৌকিদারকে ঘুম থেকে তুলতে অবশ্য সেই শীতের রাত্তিরেও আমাদের ঘাম ছুটে গিয়েছিল।

পরদিন তো আর সকাল-সকাল উঠবার কোনও দরকার ছিল না, তাই আমাদের ঘুম ভাঙতে প্রায় সাতটা বাজল। খানকয় নিমকি তখনও অবশিষ্ট ছিল। তাই দিয়ে চা খেয়ে সাড়ে-সাতটায় আমরা আবার পথে বেরিয়ে পড়লুম। না, আর আমরা হৃষীকেশের দিকে যাচ্ছি না। এবারে আমরা মুসৌরী আর দেরাদুন হয়ে দিল্লি ফিরব। তাই ধরাসু পর্যন্ত এসে, বাঁয়ে টিহ্‌রির দিকে মোড় না-নিয়ে, ট্যাক্সি এবারে অন্যপথ ধরল। এটিও খুব সুন্দর পথ। একদিকে খাদ, একদিকে পাইন-বন। মাঝে-মাঝে নদী। নদীর উপরে ব্রীজ। যখন উঁচুতে উঠি, তখন বরফে-ঢাকা পাহাড়-চূড়া চোখে পড়ে। আবার যখন নীচে নেমে আসি, তখন হঠাৎ-হঠাৎ আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে মখমলের মতো কোমল সবুজ উপত্যকা। এই পথ দিয়ে চলতে-চলতে বড় সুন্দর দুটি পাখি দেখেছিলুম। একটির রঙ বাদামী। দেখতে বাজপাখির মতো, তবে আকারে তার চেয়ে অনেক অনেক বড়। ঠোঁটটিও বেশ বাঁকানো। পথের ধারে একটা ঝোপের পাশে বসে ছিল। আমরা তার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছতে, ঘাড় বাঁকিয়ে একবার আমাদের দেখে নিয়েই ভারী মসৃণভাবে উড়াল দিয়ে খানিক দূরের একটি পাহাড়-চূড়ার দিকে চলে গেল। আর-একটি পাখি পুরোপুরি নীলবর্ণ। নীল যে এত ঝকমকে উজ্জ্বল হতে পারে তা আমরা জানতাম না।

মুসৌরীর খুব কাছেই রয়েছে সুন্দর একটি জলপ্রপাত। মোটরগাড়িতে চড়ে বিস্তর লোক সেখানে বেড়াতে এসেছে। তার পাশ দিয়ে যেতে-যেতে দেখলুম, সাইকেল, স্কুটার আর মোটরগাড়িতে বিস্তর লোক সেখানে বেড়াতে এসেছে। মিনিট কয়েকের জন্যে গাড়ি থামিয়ে একটা দোকান থেকে আমরা চটপট এক-এক বোতল লেমোনেড খেয়ে নিলুম। তারপর যখন মুসৌরীতে গিয়ে ঢুকলুম, তখন দুটো বাজে। মুসৌরী খুব নামজাদা শৈলাবাস। তার গায়ে এখনও পুরনো দিনের গন্ধ জড়িয়ে আছে। আমার সেটা ভালই লাগল। সবচেয়ে ভাল লাগল রিকশারই মতো তবে রিকশার চেয়ে অনেক বড়, রঙচঙে আর সামনের-দিকে-ডান্ডা-লাগানো সেই গাড়িগুলো, যা টানতে দেখলুম দুজন লোকের দরকার হয়।

পথগুলি উঁচুনিচু। একদিকে ঘরবাড়ি, অন্যদিকে—পথের ধারে-ধারে—টানা রেলিং বসানো। সেই রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অনেকে গল্প করছে। হঠাৎ-হঠাৎ দার্জিলিং কিংবা শিলংয়ের কথা মনে পড়ে যায়। 'ভিউ পয়েন্ট'-এর কাছে, শৌখিন একটা দোকানে ঢুকে সেদিন একেবারে আশ মিটিয়ে খাওয়া হয়েছিল। অরুণদা বললেন, "কে কী খাবে বলো।" রুচি বলল, "ভয়ে বলব না নির্ভয়ে বলব?" অরুণদা তাঁর মানিব্যাগটা বার করে টেবিলের উপর রেখে বললেন, "নির্ভয়ে বলো।" তখন রুচি বলল, "মুরগী রোস্ট।" বৌদি বললেন, "সরু-চালের ভাত আর রুইমাছের কালিয়া।" আমি বললুম, "সেই সঙ্গে একটু মুগের ডাল আর ভেটকি-ফ্রাই। কিন্তু অরুণদা, তুমি কী খাবে?"

"আমি?" একগাল হেসে অরুণদা বললেন, "বিরিয়ানি আর মোরগ মুসল্লাম।"

খাওয়া-দাওয়ার পরে মুসৌরীতে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে তারপর আঁকাবাঁকা পাহাড়িয়া পথ ধরে আমরা নীচে নামতে লাগলুম। দেরাদুনে পৌঁছলুম বিকেলবেলায়। মদনলালকে সেখানে ছেড়ে দিতে হল। এই ক'দিনে তার উপর আমাদের প্রত্যেকেরই বড্ড মায়া পড়ে গিয়েছিল। ভারী মিষ্টি স্বভাবের ছেলে। বিশেষ কথাবার্তা বলে না, স্বভাবটা একটু চাপা, কিন্তু মুখে সবসময়েই হাসি লেগে আছে। যাবার সময় মদনলাল বলল, "আবার যখন পাহাড়ে আসবেন, তখন হৃষীকেশে এসে আমাকে ডেকে পাঠাবেন, আমি ওই ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডেই থাকি।"

দেরাদুনে আমরা আধঘন্টাও থাকতে পারিনি। বড়-ডাকঘরে গিয়ে অরুণদা একটা ট্রাঙ্ক-কল করে এলেন, তারপরেই আর-একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা ফের পথে বেরিয়ে পড়লুম, রাত দশটার মধ্যে দিল্লি পৌঁছতে হবে।

পিচ-ঢালা রাস্তা। দুদিকে ফসলের খেত আর ফলের বাগান। পেয়ারা-গাছগুলো রাশি-রাশি পেয়ারার ভারে নুয়ে আছে। মাঠও একেবারে ঘন-সবুজ। মাঝে-মাঝে লোকালয়। ঘরবাড়ি দোকানপাট। ইঁদারা থেকে কপিকলে জল তোলা হচ্ছে, ঘর্ঘর শব্দ করে চলছে গম-পেষাইয়ের চাক্কি। দেখে বোঝা যায় যে, গোটা এলাকাটাই বেশ সচ্ছল, চাষী-গেরস্তের হাতেও এদিকে পয়সাকড়ি কিছু কম নেই।

গাড়ি ছুটছে। পথ একেবারে সমতল। দিগন্ত পর্যন্ত চোখ চলে যায়, দৃষ্টি কোথাও বাধা পায় না। অথচ কালকেও এই সময়ে আমরা আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরেছি। সেই পাহাড়গুলো কোথায় গেল? সবটাই যেন স্বপ্নের মতো লাগছে। সত্যিই কি আমরা ওখানে গিয়েছিলুম নাকি?

এই রচনায় ব্যবহৃত রঙিন আলোকচিত্রগুলি শ্রীরঘুবীর সিং তুলেছেন। রঙিন চিত্রটি শ্রীঅন্নদা মুনশীর আঁকা।

ধাঁধা-কাহিনী

তারাপদ রায়

ধাঁধার অত্যাচারে বাড়িসুদ্ধ লোকের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাতাইবাবুর বাবা যথাসাধ্য বাড়ির বাইরে পালিয়ে পালিয়ে থাকেন। অনেক রাতে তাতাইবাবু ঘুমিয়ে পড়লে পা টিপে-টিপে বাড়ি ফেরেন, আর সকাল-সকাল বেরিয়ে পড়েন তাতাইবাবু ঘুম থেকে উঠে সবাক হওয়ার আগেই। তাতাইবাবুর মা বেচারির রক্ষা নেই, তাঁকে বাড়ি থাকতেই হয়। সকাল-সন্ধ্যা তাঁর উপর দিয়ে ধাঁধার ঝড় বয়ে যায়। শুধু তাতাইবাবুর মা একাই নন, কাকার অবস্থাও কাহিল। কিন্তু কাকা বেশি বুদ্ধি খেলাতে পারেন না, তাই তাতাইবাবু তাঁকে সবসময় আক্রমণ করেন না। ছেড়েও যে দেন তা নয়, তাতাইবাবু কাউকেই ছাড়েন না। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীর বাসায় আসা বন্ধ হয়ে গেছে। ধাঁধার ধাক্কা সামলাতে না পেরে গত তিন মাসে সাতজন কাজের লোক পালিয়ে গেছে, তার মধ্যে দুজন মাইনে না নিয়ে। এমন কী, ডাকপিয়ন পর্যন্ত তাতাইবাবুর বুদ্ধির পরীক্ষার জ্বালায় এখন আর এ-বাড়িতে আসে না, উল্টোদিকের একটা বাড়ির ডাকবাক্সে তাতাইবাবুদের চিঠিপত্র ফেলে দিয়ে যায়।

আর এসব কি সামান্য ধাঁধা নাকি? সেই সেকালের বাঘ, পান, ছাগলের নৌকোয় নদী পার হওয়া কিংবা বানরের তেল-মাখা বাঁশ বেয়ে ওঠার বুদ্ধির পরীক্ষা হলে তবু রক্ষা ছিল। তা নয়, একেবারে প্রথমেই হয়তো আরম্ভ হল, ভূমধ্যসাগরে ভীষণ সাইক্লোন, আপনি একটি জাহাজের চালক, সেই জাহাজে আর কোন যাত্রী বা নাবিক নেই, শুধু একটা বিশাল ধেড়ে ইঁদুর রয়েছে; এবার ভেবে বলুন ইঁদুরটা কী রঙের? তাতাইবাবুর ধারণা এ ধাঁধাটা খুবই সোজা, যে কেউ জবাব দিতে পারবে, সুতরাং উত্তরের অপেক্ষা না করে পরমুহূর্তেই তিনি চলে যান পিরামিডের ধাঁধায়। তিনটে পিরামিড, সেগুলি পাশাপাশি সমান দূরে, প্রথমটার ছায়া দ্বিতীয়টার ডবল, দ্বিতীয়টার ছায়া তৃতীয়টার আদ্ধেক, কোন্ পিরামিড কত উঁচু? উত্তর এখনই দেবার দরকার নেই, ভেবে-চিন্তে কাল-পরশু যেদিন হয় বলবেন। ইতিমধ্যে তাতাইবাবু আরেকটা কাজ চাপিয়ে দিয়েছেন, লাল-নীল-সাদা মার্বেল অন্ধকার ঘরে হলুদ বাক্সের মধ্য থেকে তুলে আনতে হবে। ততক্ষণে আপনার চোখের সামনে হাজার-হাজার হলুদ রঙের মার্বেল গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে, আপনি নিজেও গড়িয়ে পড়ছেন একটা পিরামিডের চূড়া থেকে।

সুতরাং বাসায় লোক আসা বন্ধ। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? কয়েকদিন আগে, তাতাইবাবু পিকোলোদিদির কাছ থেকে একটা বিলিতি ধাঁধার বই চেয়ে এনেছেন, তার সব তাতাইবাবু ভাল বুঝতে পারছেন না, তবু যেটুকু পারছেন তাতেই যথেষ্ট। ডাকযোগে ঠাকুর্দাকে এবং টেলিফোনে মামার বাড়ির সবাইকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছেন।

তাতাইবাবুর ঠাকুর্দা মহোদয় স্বাভাবিক ভাবেই বুড়ো মানুষ, তিনি একদিন প্রিয় পৌত্রের কাছ থেকে বহুদূরে দেশের বাড়িতে চিঠি পেলেন.

"শ্রীচরণেষু,

আমাদের বাড়িতে যদি চারদিকে ঘোরানো গোল বারান্দা

থাকত, যদি বারান্দায় দশফুট অন্তর একটা করে গোল থাম থাকত, প্রত্যেক থামে যদি দশফুট লম্বা একটা করে অজগর সাপ থাকত, প্রত্যেকটা অজগর সাপের যদি প্রতিদিন একশোটা করে ছোট সাপ খাওয়ার জন্যে লাগত, প্রত্যেকটা ছোট সাপ যদি একফুট করে লম্বা হত, আবার প্রত্যেকটা একফুট লম্বা সাপ যদি দৈনিক এক ইঞ্চি লম্বা একটা করে ছোট কেঁচো খেত......"

মফঃস্বলবাসী বৃদ্ধ পিতামহ এই পর্যন্ত পড়ে কীরকম অস্থির হয়ে ওঠেন, তাড়াতাড়ি এক কলসি জল খেয়ে ফের একটা খামে ভরে ফেরত ডাকে তাতাইবাবুর চিঠিটি তাতাইবাবুর বাবার কাছে সঙ্গে-সঙ্গে রওনা করিয়ে দেন। তাতাইবাবুর বাবার অবশ্য তাতাইবাবুর ঠাকুর্দার মত অতটা শক্ত মনোবল নয়, তিনি প্রথম লাইনে ঐ থামে থামে দশফুট লম্বা অজগর সাপ পর্যন্ত পাঠ করেই ভিরমি খেয়ে পড়ে যান।

তাতাইবাবুর মামার বাড়ির অবস্থা আরও কাহিল। তখনো রাতের অন্ধকার ভাল করে কাটেনি, শুধু একটু ভোর-ভোর ভাব, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল, চমকে উঠে ঘুম জড়ানো চোখে তাতাইবাবুর ছোট দাদু ফোন ধরলেন, "হ্যালো ছোটদাদু, ঘুম ভেঙেছে? আচ্ছা বলো তো, হুমায়ুনের পরে ভারতের সম্রাট কে হন?" প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ছোটদাদু ইতিহাস পড়েছেন, তবুও এটা ভুলে যাননি। কিন্তু তিনিও জানেন সোজাসুজি উত্তর দেওয়া মানে কোনো ধাঁধার প্যাঁচে পড়ে যাওয়া, তাই এড়াতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্ হুমায়ুন?" "কোন হুমায়ুন আবার কী? একটাই তো হুমায়ুন, মোগল সম্রাট হুমায়ুন।" ছোটদাদু রক্ষা পাওয়ার জন্যে বলেন, "বুঝলাম, তা হলে এ তো সোজা উত্তর, হুমায়ুনের পরে সম্রাট হলেন আকবর।" এবার তাতাইবাবু আবার প্রশ্ন করলেন, "আকবর সিংহাসন লাভ করার পর প্রথম কী করলেন?" দুঃখের বিষয়, তাতাইবাবুর ছোটদাদু মাত্র কয়েকদিন আগেই এই ধাঁধাটির উত্তর কোথায় যেন শুনেছেন না পড়েছেন, তিনি চটপট জবাব দিলেন, "আকবর সিংহাসন লাভ করেই প্রথম যা করলেন সেটা হল তিনি সিংহাসনে বসলেন।" তাতাইবাবু কিন্তু অদমিত, তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন, "গুজরাটের সিংহের সঙ্গে আফ্রিকার সিংহের পার্থক্য কতটা?" এই প্রশ্নের সোজা উত্তর, প্রায় তিন হাজার মাইল। এই উত্তর জানা ছোটদাদুর পক্ষে সম্ভব নয়, সুতরাং ভদ্রলোক অসহায়ভাবে হেরে গেলেন।

সবাই হেরে যাচ্ছে, বাবা প্রায় পলাতক, অন্যেরা আত্মসমর্পণ করেছে, বাকিরা এদিক পানে আসছেই না। তাতাইবাবু বিজয় পতাকা উড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। এইভাবে চমৎকার চলছিল, মধ্য থেকে বাদ সাধলেন ডোডোবাবু।

ডোডোবাবু আজকাল নরেন্দ্রপুরে বোর্ডিং-য়ে থেকে পড়াশুনা করছেন। সেখানে হাজার ছেলের হাজার রকম ধাঁধা। সেই হাজার ধাঁধার বোঝা কাঁধে করে ডোডোবাবু ছুটিতে বাড়ি এসেছেন। ডোডোবাবু ফিরে আসা মাত্র তাতাইবাবু উল্লসিত হয়ে পড়লেন, যাক এতদিনে একটা প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া গেল। অবশ্য তাতাইবাবু মনে মনে জানেন, ডোডোবাবু ধাঁধায় নির্ঘাত হারবেন, অন্তত আগে তো ডোডোবাবু একদম ধাঁধা জানতেন

না। তাতাইবাবু অন্তর্যামী নন, তিনি কী করে জানবেন যে, সেদিনের শান্ত, নিরীহ ডোডোবাবু এই অল্প সময়ে দুর্দান্ত ধাঁধাবাগীশ হয়ে উঠেছেন।

ফলে যা হল, তা যাঁরা কোনোদিন ধাঁধার লড়াই দেখেন নি, তাঁরা কখনোই অনুমান করতে পারবেন না।

ডোডোবাবু ফিরে এসেই হাসি-হাসি মুখে তাতাইবাবুদের বাড়ি চলে এলেন। তাতাইবাবু এগিয়ে গিয়ে ডোডোবাবুকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন। ডোডোবাবু ঘরে ঢুকে তাতাইবাবুর পাশে এসে বসলেন। তাতাইবাবু বললেন, "কদিন আছেন?" ডোডোবাবু বললেন, "এই সামনের সোম-মঙ্গলবার নাগাদ ফিরতে হবে।" সঙ্গে সঙ্গে তাতাইবাবু ঝাঁপিয়ে পড়লেন, "সোমের প্রথম, মঙ্গলের শেষ, কী মাছ বলুন দেখি?" এই সামান্য প্রশ্ন ডোডোবাবুর কাছে এখন যাকে বলে জল-ভাত, চোখ নাচিয়ে জবাব দিলেন, "সোল মাছ।" তারপর একটু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "অবশ্য বানান ভুল, তালব্য শ হবে।" সেটা তাতাইবাবুও জানেন, কিন্তু ধাঁধার খেলায় এরকম একটু হেরফের সবসময়েই চলে, তাই ডোডোবাবুর সংশোধনী উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট না হয়ে চটে গিয়ে কী একটা কঠিন প্রশ্ন করতে গেলেন। তার আগেই ডোডোবাবু তাঁকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "তার থেকে শুদ্ধ বানানের ধাঁধা দিচ্ছি একটা, বলুন তো কোন্ মাছ বারুইপুরে আছে?" সোজা প্রশ্নের সোজা জবাব, তড়িৎ গতিতে ভেবে নিয়ে তাতাইবাবু বললেন, "রুই মাছ।"

এইভাবে অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তারপর দিন নেই, রাত নেই, অবিরাম তুমুল লড়াই। সে যুদ্ধের নমুনা দেওয়া কঠিন। রাত দশটা বাজে, তাতাইবাবুদের বাড়ির জানলায় ডোডোবাবুর মুখ দেখা গেল। তাতাইবাবু এগিয়ে যেতেই ডোডোবাবু বললেন, "চারটে বেড়ালছানা, একটা সাদা, একটা কালো আর দুটো সাদা-কালো।" ডোডোবাবুর মা সেই সময়ে তাতাইবাবুদের বাসায় বসেছিলেন, তাঁর আবার বেড়ালছানায় এলার্জি, তিনি বললেন, "না, না, বেড়ালছানা এনো না।" তাতাইবাবু এগিয়ে এসে উদ্ধার করলেন, "না, না, বেড়ালছানা নয়, এটা একটা ধাঁধার জবাব।" তারপর ডোডোবাবুর দিকে ঘুরে বললেন, "ঠিক আছে ডোডোবাবু, আর দুটো বাকি রইল।" ডোডোবাবু মাকে সঙ্গে করে বাড়ির দিকে যেতে-যেতে বললেন, "আমারও চারটে উত্তর পাওনা আছে আপনার কাছে।"

অবশ্য চারটে তিনটে হতে দেরি হল না। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাতাইবাবু ডোডোবাবুদের বাড়িতে দৌড়ে গিয়ে একই প্রক্রিয়ায় জানলায় দাঁড়িয়ে বললেন, "সবচেয়ে চওড়া থালটা একশো সাড়ে বারো ফুট।"

দিনরাত্র ডোডোবাবু তাতাইবাবু চিন্তামগ্ন। আহার-নিদ্রা মাথায় উঠেছে। কথাবার্তা নেই, শুধু কখনো-কখনো হয় একটা প্রশ্ন, না হয় একটা উত্তর। তাতাইবাবুর গতকাল বিকালের প্রশ্নের হয়তো ডোডোবাবু উত্তর দিলেন আজ দুপুরে। তার কোনো পারম্পর্য নেই, ধারাবাহিকতা নেই, শুধু দুজনে বুঝতে পারছেন দুজনের ভাষা, সে এক সাংকেতিক, রহস্যময়, দুর্বোধ পরিবেশ।

আবার, কখনো-কখনো পুরো ব্যাপারটা রীতিমত তরল এবং হাস্যকর হয়ে উঠছে। ডোডোবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, ধরুন আপনার সিঁড়ির উপরে চেনে বাঁধা একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে, আপনি ঘরে বসে বিরক্ত হচ্ছেন, কী করে সিঁড়িতে কুকুরের চেঁচানি বন্ধ করবেন?" তাতাইবাবুও সরাসরি জানালেন, "সিঁড়ির কুকুরটাকে ঘরে নিয়ে আসব। তাহলেই সিঁড়ির চেঁচানি বন্ধ।" আরেক মুহূর্তেই দুজনে মুখোমুখি দাঁত খিঁচিয়ে উঠছেন। ডোডোবাবু বলছেন, তিনি শুদ্ধ, তাতাইবাবু ভুল ; তাতাইবাবু বলছেন, তিনি শুদ্ধ, ডোডোবাবু ভুল।

ছুটির পর ইস্কুল খুললেই ডোডোবাবু তাতাইবাবু দুজনেরই পরীক্ষা। পরীক্ষার পড়া একেবারে চুলোয় গেছে, এখন সমস্ত সময় কাটছে ধাঁধা নিয়ে চুলোচুলিতে।

শেষ পর্যন্ত তাতাইবাবুর বাবা একদিন মরীয়া হয়ে দুজনকে ধরলেন। "আপনারা ভাবছেন কী? রাতদিন পিরামিড, থাল আর থামের হিসেব নিয়ে কাটাকাটি করছেন, এদিকে অঙ্কের খাতায় ধুলো পড়ে গেছে। ইতিহাস-বইয়ের পাত্তা নেই, আর আপনারা আকবর সিংহাসনে বসল কী দাঁড়াল তাই নিয়ে হল্লা করছেন। অথচ আমি জানি একটা সোজা ধাঁধার পর্যন্ত জবাব দেবার ক্ষমতা আপনাদের নেই।"

ডোডোবাবু তাতাইবাবু দুজনেই এই হঠাৎ আক্রমণে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, তবু ঐ সোজা ধাঁধার উল্লেখে দুজনেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, "কী সোজা ধাঁধা যা আমরা পারব না?"

তাতাইবাবুর বাবা অল্প বয়সে নিজেও দু-একটা ধাঁধা জানতেন, তারই মধ্যে খুব মজার একটা তাঁর মনে ছিল, তিনি জানেন এই ধাঁধাটা এঁরা দুজনে কেউই জানেন না, সুতরাং যথেষ্ট গম্ভীর হয়ে বললেন, "দুটো নারকেল গাছ, তার একটাতে একটা কাঠবেড়ালি নিচু থেকে উপরের দিকে উঠছে, আরেকটায় চারটে কাঠবেড়ালি উপর থেকে নীচে নামছে। যে কাঠবেড়ালিটা উপরে উঠছে, সে যেগুলো নীচে নামছে তাদের প্রথমটাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার পিছে কটা কাঠবেড়ালি আছে? প্রথমটা বলল, তিনটে। তারপর দ্বিতীয়টাকে প্রশ্ন করাতে দ্বিতীয়টাও বলল যে, তার পিছনে তিনটে কাঠবেড়ালি আছে। তৃতীয় এবং অবশেষে চতুর্থটাও বলল, তাদের পিছনে তিনটে করে কাঠবেড়ালি আছে। এবার আপনারা দুজনে ভাল করে ভেবে চিন্তে বলুন, এটা কী করে হল?"

ডোডোবাবু-তাতাইবাবু দুজনেই বসে-বসে মাথা চুলকোতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ধরে, যতক্ষণ না তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, দুজনে মিলে আলাদা-আলাদা বসে ভাবলেন, তারপরে একত্রে বসে আলোচনা করতে লাগলেন। নারকেল গাছ এবং কাঠবেড়ালির অনেক ছবি আঁকা হল। শেষে দুজনেই হার মানলেন। তখন তাতাইবাবুর বাবা একটু হেসে বললেন, "এই সোজা জিনিসটা ধরতে পারলেন না। পেছনের তিনটে কাঠবেড়ালি ডাহা মিথ্যুক, সোজা মিথ্যে কথা বলেছে।" ডোডোবাবু তাতাইবাবু দুজনেই প্রতিবাদ করে উঠলেন. "এটা বাজে ব্যাপার, এটা ধাঁধা নয়।" তাতাইবাবুর বাবা ধমকিয়ে উঠলেন, "আপনাদেরও সমস্ত বাজে ব্যাপার। পড়াশুনো, খাওয়া-দাওয়া ফেলে সারাদিনরাত ধাঁধা চলতে পারে না।" ডোডোবাবু একেবারে চুপসে গেলেন। এরই মধ্যে তাতাইবাবু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, "কিন্তু ধাঁধা তো বুদ্ধির ব্যাপার।" তাতাইবাবুর বাবা বললেন, "অত বেশি বুদ্ধির দরকার নেই, মাসে একদিন যে-দিন আনন্দমেলা বেরোয়, বুদ্ধির পরীক্ষা হবে। অন্যদিন সাবধান।"

ডোডোবাবু তাতাইবাবু এরপর সাবধান হয়ে গেছেন। এখন থেকে মাসে একদিন প্রকাশ্যে আর কখনো-সখনো লুকিয়ে চুরিয়ে একটু আধটু ধাঁধার খেলা চলে। ডোডোবাবু নরেন্দ্রপুরে ফিরে গিয়েছেন, তাতাইবাবুও এখন পণ্ডিতিয়ায় একা-একা। দেখা যাক আবার যখন ছুটিতে ডোডোবাবু আসবেন তখনো এঁদের ধাঁধার নেশা থাকে কিনা।

ছবি বিমল দাশ

শৈলেন ঘোষ

ছবি বিমল দাশ

টৌরা আর বাদশা

কে জানত যে খাঁচার দরজাটা খুললেই পাখিটা অমন আচমকা উড়ে পালাবে! পাখিটা যে আজ তক্কে-তক্কে ছিল, সে-কথা ঘুণাক্ষরেও টৌরা জানতে পারেনি! পাখি পেটে-পেটে কী বুদ্ধি ফেঁদে রেখেছে, তা মানুষে জানবে কেমন করে! পালাবি, পালা, কে বারণ করছে! তাই বলে টৌরার হাতের ফাঁক দিয়ে! কে বলেছিল ওই ছোট্ট মেয়েটাকে অমন বিপদে ফেলতে!

অবশ্য টৌরার কোন দোষ ছিল না। সকাল থেকে নতুন-মায়ের হুকুম শুনতে শুনতে যেন আর শরীর বইছে না। ভারি ক্লান্ত। আজ সে ভারি আনমনা। কোন সকালে সে বাদশাকে ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। তারপর ঘর পরিষ্কার করেছে। বাসন মেজেছে। দোকান ছুটেছে। বাদশার জামা কেচেছে। কাজের কি আর শেষ আছে। এত কাজ ওই একফোঁটা মেয়ে যে মুখ বুজে করতে পারছে সেইটাই বাহাদুরি। কাল বাবা বাদশার জন্যে একটা রঙিন ছবির বই কিনে এনে দিয়েছে। কী সুন্দর বইটা। কত ছবি। একটা ছবি অবশ্য বাদশা ওকে দেখিয়েছে। এক পেটমোটা ভোম্বল সর্দার তরোয়াল নিয়ে লড়াই করতে গিয়ে দুম-ফট! পা পিছলে আলুরদম। ছবিটা দেখে কী হাসিই না পাচ্ছিল টৌরার। কিন্তু সব ছবি তো আর দেখা হয়নি। হয়তো পাতায় পাতায় আরও কত মজার মজার ছবি আছে। কখন থেকে ভাবছে বইটা দেখবে, এখনও পর্যন্ত ফুরসুত পেল না। টৌরার ভারি ইচ্ছে, অনেক পড়বে সে। অনেক পড়তে-পড়তে ও ছোট্ট ভাই বাদশাকে দেখাবে রাতের অন্ধকারে নীল আকাশের কোন পারে সপ্তঋষি তারার আলো জেবলে ধ্যান করছেন। নয়তো কোন পথটি পেরিয়ে পেরিয়ে চাঁদের দেশে মানুষ যাচ্ছে। কিম্বা শীতের ভোরে কোন পাখিটি অনেক পাহাড় অনেক বন পাড়ি দিয়ে এই বনেতে বাসা বেঁধে গান গাইছে!

সে না হয় হল। বই না হয় না-ই দেখা হল। কিন্তু পাখিটা যে উড়ে পালাল, তার কী হবে! রোজ সকালে টৌরা পাখিকে চান করাবে। খাঁচাটা পরিষ্কার করবে। একবাটি ছোলা দেবে, খাবার জল দেবে। তারপর খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে

আদর করে বলবে, "পাখি, পাখি, বলো তো বাদশা-দাদা ঘরে এসো, আমার কাছে একটু বসো।" কিন্তু পাখি ছোলা খাবে আর টোরার দিকে চেয়ে চেয়ে ল্যাজ নাড়বে! কথা বলবে না! কথা বলে না বলে টোরা ধমক দেয়, পাখি অমনি খাঁচার ভেতর ঝটপটিয়ে কপচায়! কিন্তু আজ! পাখি ফুড়ুত! অবশ্যি টোরা যে চেষ্টা করেনি, তা নয়! ধড়ফড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেছল পাখিটাকে! কিন্তু ফোক্কা! পাখি পগারপার! উলটে টোরার হাতের ঠ্যালা খেয়ে খাঁচাটা গোঁত মেরেছে! ছোলার বাটি ছিটকে ছড়িয়ে নৈরেকার!

নতুন-মা তো আর কালা নয়! শব্দ শুনেই চেঁচিয়ে উঠেছে, "কী হল রে টোরা?"

নতুন-মায়ের মুখখানা চোখে ভেসে উঠতেই ভীষণ ভয়ে কেঁপে উঠল টোরার বুকখানা!

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে নতুন-মা, "কী ফেললি, কী?"

টোরার মুখে রা নেই। খাঁচাটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে কাঁপছে সে!

টোরার মুখে রা না-থাক, নতুন-মায়ের চোখে তো আর ঠুলি বাঁধা নেই। ছিটকে-পড়া খাঁচাটার হাঁ-করা দরজাটা দেখলে কাণ্ডটা যে কী হয়েছে, সে তো আর জানতে বাকি থাকে না। আঁতকে উঠেছে নতুন-মা। চিৎকার করে উঠল, "পাখি কোথা গেল?"

আমতা-আমতা করে ধরা-গলায় উত্তর দিলে টোরা, "উড়ে গেল।"

তারপর যে কী হবে, সেসব টোরার জানা। নতুন-মা চিল-চেঁচিয়ে পাড়া মাত করবে। টোরাকে বকতে-বকতে পাঁচশোবার বলবে, "আহ্লাদী মেয়ে, আমার হাড়মাস কালি করে দিলে। কাজ তো কত করছ, শুধু অকম্ম! এবার তোকে দূর করে দেব। দেখি এবার তোকে কে রক্ষে করে!"

টোরা আর একটি কথা বলবে না। নিজের ঘরে গিয়ে চুপটি করে বসে থাকবে। তারপর বাবা যখন আসবে, টোরাকে ডাকবে। লুকিয়ে-লুকিয়ে আদর করবে। তখন টোরার ভয় ভাঙবে।

কিন্তু আজ তো তা হল না। আজ তো নতুন-মা ওকে শুধু গাল পেড়ে ক্ষান্ত হল না। হঠাৎ টোরার গালে চড় মারল। নরম তুলতুলে গালটা ওর লাল হয়ে গেল। ওর কানটা ধরে হিড়হিড় করে টানতে-টানতে সত্যিই বার করে দিল। বার করে দিল ঘর থেকে রাস্তায়। অভিমানে মুখটা ফুলে উঠেছে টোরার! নিমেষে সে যেন বে-বাক হয়ে গেল! সত্যিই কি নতুন মা আজ তাকে দূর করে দিল!

টোরাকে কেউ মারে না। কোনদিনও না। আজই প্রথম ও মার খেল। মার খেল নতুন-মায়ের হাতে। কেন? ও তো কোন দোষ করেনি। ও তো ছোট্ট। পাখিটা তো ও আর ইচ্ছে করে আকাশে উড়িয়ে দেয়নি। পাখিটা যে অমন মতলব এঁটে বসেছিল, খাঁচা খুললেই পালাবে, সে আর টোরা জানবে কেমন করে! তাই বলে টোরাকে অমন করে মারবে, ঘর থেকে বার করে দেবে নতুন-মা! সবাই দেখছে টোরাকে। ভাবছে, না জানি কী অন্যায় করেছে টোরা! কী লজ্জা!

না, সবাই জানে টোরা কোন অন্যায় করেনি। সবাই জানে নতুন-মা টোরাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। রাতদিন হেনস্তা করবে। সৎ মেয়ে তো! দুবেলা নাকে দড়ি দিয়ে খাটাবে। ওর কি এখন খাটবার বয়েস! আহা! খাটতে-খাটতে মেয়ের কী

দশা হয়েছে এখন! ওর মা যখন বেঁচে ছিল, তখন কী যত্নেই না ছিল টোরা! দেখতেও ছিল তেমনি। গায়ের রঙ ছিল যেমন, মুখখানাও তেমনি মিষ্টি। ভারি ভালবাসতে ইচ্ছে করে!

টোরাকে ভালবাসে সবাই। সবাই জানে, ভারি লক্ষ্মী মেয়ে টোরা। ভারি নরম। নরম তার মনটি, মনের ভেতরটি!

ঘরের দরজা বন্ধ। এখন কী করবে টোরা ভেবে পাচ্ছে না। লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে টোরা। ভয় হচ্ছে, সত্যিই যদি নতুন-মা ওকে আর ঘরে ঢুকতে না দেয়! তবে যাবে কোথা সে? জানে না সে কোথায় তার আপনজন আছে। কে তাকে আদর করবে বাবার মত। ভালবাসবে ছোট্ট ভাই বাদশার মত।

খুব ভালমানুষ টোরার বাবা। নতুন-মা টোরাকে বকলেও বাবা কিছু বলবে না। বাবা তো জানে কিছু বললেই নতুন-মা চেঁচিয়ে-মেচিয়ে পাড়া মাত করবে। কী দরকার। একটা কথা বললে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে যে দশটা কথা শুনিয়ে দেয়, তার সঙ্গে লেগে কী লাভ! মেয়েকে বকলে দুঃখে বুকটা ভরে যায় বাবার! আর তাই সেই ভার নামাতে সে মেয়েকেই বুকে জড়িয়ে আদর করে।

সত্যি, বাবার জন্যে টোরারও ভীষণ খারাপ লাগে। আগে বাবা কত গল্প বলত, মুখখানা সব সময় হাসি-খুশি। আর এখন? ভারি চুপচাপ বাবা! খুব মেঘ করলে আকাশটা যেমন অন্ধকার হয়ে যায়, বাবার মুখখানাও তেমনি অন্ধকার! টোরা সব বোঝে। কিন্তু কী করবে ওই এক ফোঁটা ছোট্ট মেয়ে! মাঝে মাঝে ভাবে, বাবার হাত ধরে চলে যাবে কোথাও। অনেক দূরে। না, পারে না। সে-কথা ভাবলেই ওর ভাইটির কথা মনে পড়ে যায়। বাদশা এত ভালবাসে তাকে। ভাবতেই পারে না টোরা তার ভাইকে ছেড়ে সে অনেক দূরে চলে যাবে। বাদশা তার সৎ-ভাই। কিন্তু টোরার কোনদিনই তো সে-কথা মনে হয় না। বাদশাও জানে টোরা তার দিদি। দিদির আবার পর-আপন আছে নাকি! দিদির সঙ্গে বাদশা ইস্কুলে যায়। ইস্কুলে যাবার আগে দিদি ওকে জামা-প্যান্ট পরিয়ে দেবে। বই-খাতা গুছিয়ে দেবে। জুতোয় ফিতে বেঁধে দেবে। ইস্কুল তো খুব দূরে নয়। তবু দিদির হাত ধরে ইস্কুলে যেতে বাদশার খুব ভাল লাগে। ওইটুকু রাস্তা যেন কত মজার! দিদির সঙ্গে কথা, শুধু কথা। গল্প আর গল্প। যেন শেষ নেই তার। এ-মজা যেন শেষ হবে না কোনদিনও। বাদশা দিদির সঙ্গে না খেলে ওর যেন খিদে মেটে না। এক সঙ্গে খেলবে, ঘুমুবে, নয়তো রাত্তিরবেলা মোমবাতির আলো জেলে দুজনে গুনগুন করে ছড়া পড়বে, কিম্বা গান গাইবে। তারপর যখন মোমের আলো জ্বলতে-জ্বলতে নিভে আসবে, আগুনের ছোঁয়ায়-ছোঁয়ায় মোমের ফোঁটা গড়িয়ে-গড়িয়ে ফুরিয়ে যাবে, তখন হাই উঠবে বাদশার। দিদি বলবে, "বাদশা, এবার ঘুমো।"

বাদশা উত্তর দেবে, "তুই ভাবছিস আমার ঘুম পাচ্ছে?"

দিদি বলবে, "অনেক রাত হল।"

বাদশা দিদির দিকে চাইবে অন্ধকারে। তারপর বলবে, "রাত কই রে। এখনও রেলগাড়িটা গেল না।"

রেলগাড়িটা রোজ যায়। রোজ যায় এমনি সময় এই রাতে, ওই দূরের অন্ধকার ছুঁয়ে ছুঁয়ে। কু! জেগে থাকলেই বাদশা ছুটে যাবে জানলার ধারে। জানলার গরাদে গাল দুটি ঠেকিয়ে দেখবে। দেখবে রেলকাম ঝমাঝম করতে করতে রাতের গাড়ি ছুটছে। অন্ধকারে গাড়ির সঙ্গে আলোর ঝিকিমিকি রোশনাইটাও যখন ছুটতে থাকে, তখন বাদশারও মন ছুটে চলে। মন চলে যায় অ-নে-ক অনেক দূরে। হয়তো কোন পাহাড়ের দুর্গম চূড়ায়, নয়তো গাছ-গাছালি-ভরা কোন গহন বনের গভীরে। কিম্বা ঢেউ ভাঙা উচ্ছল কোন সমুদ্রের তীরে তীরে।

অবিশ্যি কোনটাই দেখেনি বাদশা। দেখেনি পাহাড়, জানে না সমুদ্র কেমনতর। কে জানে, গহন বনের গভীরে সূর্যের আলো যায় কি না যায়। ও শুনেছে, পাহাড়ের চূড়া আকাশের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। পাহাড়ের চূড়ায় তুষারের মুকুট সূর্যের আলোয় ঝিকমিকিয়ে উঠলে চোখ ঝলসে যায়। সে নাকি ভারি ভাল লাগে দেখতে। ও দিদিকে বলে, "দিদি, বড় হলে রেলগাড়ি চেপে আমরা দুজনা অনেক দূরে চলে যাব। পাহাড় ডিঙিয়ে, বন পেরিয়ে সমুদ্দুরে পাড়ি দেব। যাবি না তুই?"

টোরা হাসে।

হাসতে দেখলেই বাদশা দিদিকে জড়িয়ে ধরবে। দিদির হাসিটা এত ভাল লাগে বাদশার।

হাসতে হাসতেই দিদি বলবে, "আমি গেলে মাকে দেখবে কে?"

বাদশা বলে, "দিদি, তুই ভারি বোকা! মার কাছে তো রাতদিন বকা খাচ্ছিস, তবু মার জন্যে তোর এত ভাবনা!"

টোরা চাপা সুরে ধমক দেবে বাদশাকে। বলবে, "ছিঃ, ও কথা বলতে আছে! দোষ করলে মা বকবে না?"

"তুই দোষ না করলেও তো মা তোকে বকে। আমি যেন জানি না।"

"চুপ!" টোরা ভয় পায়। তাড়াতাড়ি বাদশার মুখখানা দুহাত দিয়ে চেপে ধরবে। বলবে, "মা জানতে পারলে আস্ত রাখবে না।"

"টোরা।"

কে ডাকল। এতক্ষণ সে তো রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। মা তাকে বার করে দিয়েছে। ডাক শুনে চমকে গেছল টোরা। পেছন ফিরে দেখে বাবা।

"কী হয়েছে মা?" বাবা অবাক হয়ে জিগ্যেস করলে।

টোরা কিছু বলতে পারল না।

"মা বকেছে?" বাবা আবার জিগ্যেস করলে।

ঘরের ভেতর থেকে মা চেঁচিয়ে উঠল, "না, মেয়েকে পুজো করবে। ধিঙ্গি মেয়ে আমার পাখিটাকে উড়িয়ে দিলে। রথ দেখতে গিয়ে আমি শখ করে কিনে এনেছিলুম। আমার ময়না। সবে কেষ্ট-কেষ্ট বলতে শিখেছে। তা আমার সাধ-আহ্লাদ করবার জো নেই! মেয়েছেলের অত নাচন-কোঁদনের কী আছে। কাজের নামে অষ্টরম্ভা। শুধু লোকসান করছে!"

বাবার বুঝতে বাকি রইল না কী হয়েছে। টোরার হাত ধরে বললে, "চ মা।"

বাবার হাত ধরে ঘরে ঢুকল টোরা।

বাবা মাকে বললে, "পাখি গেছে আবার হবে। কিন্তু তাই বলে বাচ্চা মেয়েকে অমন করে ঘর থেকে বার করে দিতে আছে!"

'বাচ্চা' শুনে ঘরের গিন্নি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। বললে, "বলি বাচ্চাটা তুমি দেখলে কোথায়? তোমার আহ্লাদী মেয়ে তোমার কাছেই বাচ্চা থাক। আমার দরকার নেই অমন মেয়ের। তুমি থাকো মেয়েকে নিয়ে। আমি কালই বাপের বাড়ি চলে যাব।" চিৎকার করে পাড়া মাত করলে নতুন-মা।

চিৎকার শুনলে যেন বুক শুকিয়ে যায় টোরার বাবার।

আর কথা বলতে ইচ্ছে করে না। কথা বলে লাভ কী। যে বোঝে না, তার সঙ্গে কথা বললে কথা বাড়বেই শুধু। থামবে না।

টোরার চোখ দুটি ছলছল করছে। নিজের ঘরে গিয়ে জানলায় মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল টোরা। যখন অনেক ব্যথায় ওর মন ভরে যায়, তখন এই জানলাটি যেন আপন-জনের মত ওকে ভালবেসে আদর করে। আর তখন টোরার চোখের জল গাল বেয়ে উপচে পড়বে। ভাগ্যিস বাদশা ইস্কুলে গেছে। নইলে বাদশা দেখে ফেললে কিছুই যে বলতে পারত না টোরা! দু হাতের মুঠি দিয়ে চোখের পাতা আড়াল করলেও কি তখন সে কান্না লুকোতে পারত?

টোরাকে কেউ কাঁদতে দেখেনি। কোনদিনও না। অনেক দুঃখে যখন ওর বুক ভার হয়ে যায়, তখনও ওর ঠোঁট দুটিতে মিষ্টি হাসির আলতো ছোঁয়া লেগে থাকবে। হাসলেই কেমন টোল খেয়ে গাল দুটি ভেঙে যায়! তখন এত ভাল লাগে মেয়েটাকে। অবিশ্যি এখন তো বড় হয়েছে। যখন আরও ছোট্ট ছিল, ছোট্ট হাত দুটি বাড়িয়ে ওই সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে নাচত কিম্বা হাসত, মনে হত, যেন একটি রঙিন পাখি উড়ছে অথবা গান গাইছে। আচ্ছা বলো, এখন কি ওর কাজ করার বয়েস? এখন তো ও খেলবে, গল্প শুনবে, নয়তো গান শুনবে। নদীর ওপার থেকে যে-গান ভেসে আসে সোনালী রাতে আলোর পাল তুলে। বাদশার মত টোরারও তো ইচ্ছে যায় ইস্কুলে যেতে, বই পড়তে। কিন্তু সে তো তার হল না।

আজ রাত এসেছিল চুপি-চুপি। ওই আকাশ উপচে পড়া রাতের তারারা কেমন যেন টোরার অজান্তে আকাশের বুক জুড়ে জেগে উঠেছে। আজ সারা দিন দিদির সঙ্গে কথা হয়নি বাদশার। আজ ও ইস্কুল থেকে ফিরেছে বাবার সঙ্গে। বাদশা জানে পাখিটা উড়ে গেছে। মা দিদিকে মেরেছে। কী জানি কেন, দিদির দিকে চেয়ে ওর ভারি দুঃখ হচ্ছিল। ও ভেবে পায় না, কেন যে মা দিদিকে দেখতে পারে না। অথচ দিদি মা বলতে অজ্ঞান। দিদি মাকে এত ভালবাসে, অথচ মা যেন দিদির ওপর তিরিক্ষি হয়েই আছে। রাগ ধরে মায়ের ওপর। আচ্ছা, সব্বার মা'ই-তো মেয়েকে আদর করে, যত্ন করে। আর বাদশার মা দিন রাত উঠতে-বসতে দিদিকে কেন বকাবকি করে? দিদি তো লক্ষ্মী, দিদি তো কারো সঙ্গে লাগে না। মুখ বুজে তো মায়ের হুকুমই শুনছে দিন রাত।

ভাবতে ভাবতে কেমন অবাক হয়ে যায়, বাদশা। ওর ভাবনার সঙ্গে ঘরের অন্ধকারটা মোমের আলোয় যেন কেবলই কেঁপে উঠছে। আজ রাতে বাদশা দিদিকে বলতে পারল না, "দিদি, একটা গল্প বল।" বলতে পারল না, "দিদি একটা গান শোনা।"

আলো নিভে আসছে। বাদশা চুপচাপ শুয়ে ছিল বিছানায়। টোরা নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জানলায় রাতের অন্ধকারে চোখ মেলে। টোরা হয়তো ভাবছিল পাখিটার কথা। কিম্বা দেখছিল অসংখ্য জোনাকির আলোর উড়ন্ত বিন্দুগুলি। ওরা জ্বলে উঠে হারিয়ে যায়। হারিয়ে গিয়ে আবার জ্বলে ওঠে। এ যেন অন্ধকারের সঙ্গে আলোর লুকোচুরি খেলা!

হঠাৎ বাদশাই প্রথম কথা বললে, "দিদি, শুবি না?"

দিদি উত্তর দিলে, "ঘুম পাচ্ছে না।"

বাদশা আবার বললে, "সত্যিই তো, অমন করে মারলে কখনও মানুষের চোখে ঘুম আসে?"

টোরা চেয়ে দেখলে বাদশার দিকে একবারটি। তারপর জিগ্যেস করলে, "তুই ঘুমুবি না?"

"আমারও ঘুম পাচ্ছে না।"

কোন উত্তর দিল না টোরা। আবার নিস্তব্ধ, আবার নিঃঝুম চারিদিক। থমথম করছে ঘরের ভেতরটা, বাইরের আকাশটা। হঠাৎ গাছের বাসায় হয়তো ঘুমের ঘোরে একটি পাখি ডানা ঝাপটাল। চমকে উঠল টোরা। যেন ভয়ে বুকটাও থমকে গেল তার।

"দেখ দিদি, পাখিটা উড়ে গেছে ভালই হয়েছে।" হঠাৎ যেন দিদিকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললে বাদশা। "একটা নিরীহ জীবকে ধরে এনে খাঁচায় রাখার কী দরকার! বল, আমায় যদি কেউ খাঁচায় বন্দী করে রাখে?"

এবারও কোন উত্তর দিল না টোরা। ওর মন বারবার শুধু ভাবছে একটি কথা। একটি পাখির কথা। সত্যি এমন অকৃতজ্ঞ পাখিটা, জোড়া পাবে না তুমি। কেন, টোরা কি তাকে ভালবাসেনি? না, যত্ন-আত্তি করেনি? রোজ নিজের হাতে সে খাবার দিয়েছে। খাঁচার ভেতর হাত গলিয়ে, গায়ে হাত বুলিয়ে কত আদর করেছে। আর পাখিটা কিনা তাকেই ফ্যাসাদে ফেলে, তারই হাতের ফাঁক গলে পালাল। যাক, যাক! টোরার খারাপ হোক, যত পারে হোক! তাতে তোর কী! তোর মনের বাসনা তো পূর্ণ হয়েছে, তুই তো মুক্তি পেয়েছিস, তা হলেই হল। এখন টোরাকে কেউ মারুক কি ঘর থেকে বার করে দিক, তাতে তোর তো আর কিছু এসে যাচ্ছে না। মা দুর্গা তোকে রক্ষা করেছেন, এই দেখেই টোরার চক্ষু সার্থক! ভাবতে-ভাবতে টোরার চোখ দিয়ে আবার জল গড়িয়ে পড়ল।

মোমবাতিটা নিভে গেছে। কখন যে বাদশা ঘুমিয়ে পড়েছে, খেয়াল করেনি টোরা। চোখের জল মুছতে-মুছতে বাদশার পাশে সে-ও শুয়ে পড়ল। মনটা খুব খারাপ-খারাপ লাগলেও দিনটা তবু কেটে যায় এক রকম। কিন্তু রাত যখন ঘনিয়ে আসে, যখন সব নিশ্চুপ হয়ে যায়, সাড়া শব্দ শোনা যায় না, তখন যেন দুঃখের ভাবনাগুলো পেয়ে বসে মানুষকে। অন্ধকার রাতটা ভাবনার পাল-তোলা নৌকো ভেসে যায়। থামতে বলো, কিছুতেই শুনবে না। নৌকো দুলবে। আর দুলতে-দুলতে বয়ে যাবে।

দুলছিল টোরার মনও। দুলতে-দুলতেই টোরার চোখের পাতা দুটি ঘুমের ছোঁয়ায় বুজে গেল। ওর ক্লান্ত মুখখানি ঘুমের আবেশে কেমন শান্ত হয়ে গেছে। এখন আর টোরার কিচ্ছু মনে পড়বে না। মনে পড়বে না, ওর মা নেই। ওর মা নেই বলে এত অপমান তাকে সইতে হয়। ওরও তো মন বলে, আর সবার মায়ের মত ওরও মা ওকে আদর করুক। ইচ্ছে করে নতুন-মায়ের মত ওর কপালেও কেউ লাল চুমকির টিপ পরিয়ে দিক। রাঙা টুকটুকে পা দুটিতে লাল টকটক আলতা দিয়ে সাজিয়ে দিক। কে দেবে? ওর ওই ছোট্ট ভাইটি? ধ্যাৎ!

বাদশা কবে যে বড় হবে কে জানে! টোরা ভাবে, বাদশা বড় হলে অনেক লেখাপড়া শিখবে। অনেক নাম-যশ হবে। লোকের মুখে মুখে বাদশার নাম শুনতে-শুনতে টোরার বুকখানা গর্বে ভরে উঠবে। কিন্তু সে তো এখনও অনেক দেরি। বাদশা যা ছোট! বাদশা যদি টোরার চেয়ে বড় হত, তাহলে বেশ হত। তখন যা মজা হত না, টোরা তখন খালি ডাকাডাকি করত, "বাদশা-দাদা।"

"বাদশা-দাদা।" সত্যিই হঠাৎ কে ডাকল না?

"বাদশা-দাদা।"

হ্যাঁ তো, আবার তো ডাকল। এত রাত্তিরে কে ডাকছে বাদশাকে?

কিন্তু সাড়া দেবে কে? অঘোরে ঘুমুচ্ছে বাদশা। ঘুমিয়ে পড়েছে টোরা। ও ডাক কি শুনতে পাবে?

শুনতে পেল। ডাক না। রাত-পহরের রেলটা কু বাজিয়ে ঝিকঝিক করতে-করতে ছুটে চলেছে। সেই শব্দে হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল বাদশার। চমকে উঠেছে। ঘুম জড়ানো চোখে বিছানায় শুয়ে শুয়েই ও চেয়ে দেখলে জানলাটার দিকে। কান পেতে রইল, যতক্ষণ শোনা যায়, কু-কু ঝিক-ঝিক। ওই শব্দ শুনলেই বাদশার যেন মনে হয়, রেলগাড়িটা বাজনা বাজিয়ে নাচতে-নাচতে লাইনের ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। তারপর রাতের অন্ধকারে সেই বাজনার রেশটুকু ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে, আরও দূরে। যেতে যেতে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল সেই বাজনা। পাশ ফিরল বাদশা। মুখ তুলে দেখল, দিদি ঘুমুচ্ছে। এখন অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু দিনের বেলা ও স্পষ্ট দেখেছে, কেঁদে কেঁদে দিদির চোখ দুটি ফুলে গেছে। মা যে কেন এমন নির্দয় হয়, ভেবে পায় না বাদশা। আহা! অমন করে মারতে আছে? আচ্ছা, না হয় মেরেছে, তারপর তো একটু আদর করবে? তা নয়, দিদির দিকে একবার চেয়েও দেখলে না। এ কী রাগ বাবা? রাগের কি শেষ নেই! না কি, রাগ শেষ হয় না?

"বাদশা-দাদা।"

চমকে উঠল বাদশা। শুনতে পেয়েছে সে। কে ডাকল? বাদশার বুকটা চমকে ধড়ফড়িয়ে উঠল।

"বাদশা-দাদা।"

আবার ডেকেছে। বাদশা তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

"বাদশা-দাদা।"

আরে, এ কী! পাখিটা ডাকছে নাকি! এত রাত্তিরে পাখি এল কোত্থেকে?

বাদশা চুপি চুপি ডাকল, "দিদি, এই দিদি।"

টোরার ঘুম ভেঙে গেল, "কী রে?"

বাদশা চাপা গলায় বললে, "পাখি!"

টোরা উঠে পড়ল, "কই?"

বাদশা উত্তর দিলে, "কী জানি। আমার নাম ধরে ডাকল।"

বলতে না বলতেই আবার ডেকেছে, "বাদশা-দাদা।"

হ্যাঁ, তাই তো! সত্যিই তো তাদের পাখির গলা! ঠিক তেমনি অস্পষ্ট, ভাঙা-ভাঙা ডাক! টোরার বুকটা কেঁপে উঠল। বাদশার কানের কাছে মুখটা এনে ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করলে, "কোথায় ডাকছে বল তো?"

বাদশা দিদির চেয়েও আরও আস্তে বললে, "মনে হচ্ছে জানলার ধারে ওই জামগাছটায়। যাবি? চ, ধরে আনি।"

ধরতে পারলে তো খুব ভাল। কিন্তু উড়ন্ত পাখিকে ধরবে কেমন করে টোরা জানে না। তাই ছোট্ট ভাইকে জিগ্যেস করলে, "কেমন করে ধরবি?"

বাদশা উত্তর দিলে, "চ না, বাইরে গিয়ে দেখি।"

"যাবি কেমন করে?" ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলে টোরা।

"দরজা খুলে।"

"মা জানতে পারলে?"

"পারলেই বা। আমরা তো চুরি করতে যাচ্ছি না। মায়ের জন্যেই তো পাখি ধরতে যাচ্ছি।" সাফ উত্তর দিলে বাদশা।

সায় দিতে ভয় করল না টোরার। কেননা, পাখিটা ধরে আনতে পারলে, নতুন-মা যে খুব খুশি হবে, এটা টোরা ঠিক জানে। কিন্তু এও জানে টোরা, এই রাতের অন্ধকারে

পাখিটাকে খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত। তাই টোরা অনেকটা সন্দেহ ভরা মনেই জিগ্যেস করলে, "কিন্তু বাদশা, অন্ধকার যে!"

অন্ধকারকে ভয় পায় না বাদশা। তাই দিদিকে সাহস দিয়ে বললে, "অন্ধকার তো কী হয়েছে! তুই ঘাবড়াচ্ছিস কেন? হাত বাড়িয়ে ডাকলেই দেখবি, পাখি লক্ষ্মীটির মত হাতের ওপর নেমে আসবে। আমি বলছি, ওর ঠিক মন কেমন করছে। মন কেমন করছে বলেই তো আমাদের জানলার ধারে কেঁদে বেড়াচ্ছে।"

বাদশার কথা শুনে টোরারও মনটা অভিমানে ঝাপসা হয়ে গেল। সত্যিই বলো, পাখিটার জন্যে টোরা কি কম করে। আর তুই এমন, কিছু না-বলে না-কয়ে টোরাকে এমন একটা বিপদে ফেললি? তোর তো বোঝা উচিত ছিল, তুই পালালে নতুন-মা টোরাকে আস্ত রাখবে না। কাউকে যে দুঃখ দিতে নেই এ-কথাটা বুঝবি কবে? অন্যকে দুঃখ দিলে নিজেকেও যে দুঃখ পেতে হয়, এখন হাড়ে হাড়ে বোঝ! যাকগে, যাক, যখন সুমতি হয়েছে, তখন আর কিছু না-বলাই ভাল। তাই টোরা বাদশাকে বললে, "চ তাহলে।"

পাখিটা আবার ডেকেছে, "বাদশা-দাদা।"

ঘরের দরজাটা খুলবে বলে খিলটায় হাত দিল টোরা।

বাদশা বললে, "দেখিস, মা না উঠে পড়ে। তাহলে সব মজা মাটি! পাখিটা ধরে এনে চুপচাপ খাঁচায় রেখে দেব। তারপর কাল মা যখন দেখবে, তাক লেগে যাবে। দেখি তখন মা তোকে কেমন না আদর করে!"

টোরার মুখখানা আনন্দে উছলে উঠল। টোরা নিঃশব্দে খিলটা খুলে ফেললে। তারপর বাদশা আর টোরা আলতো পায়ে নিঃসাড়ে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল।

"বাদশা-দাদা।" ওদের বাইরে দেখেই যেন পাখিটা খুশিতে ডেকে উঠল। জামগাছের নীচে এসে টোরা চাপা গলায় পাখিটাকে ডাকল, "আয়, আয়।"

হঠাৎ পাখি ডেকে উঠল, "টোরা-দিদি।"

অবাক কাণ্ড! পাখিটা তো এর আগে কোনদিনই টোরার নাম ধরে ডাকেনি। আজ হঠাৎ ডাকল কেমন করে!

টোরা আবার ডাকল, "আ টু টু, পাখি আয়।"

পাখি আবার ডাকল "টোরা-দিদি।"

এখন তো আর অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছে না টোরা আর বাদশাকে যে নাম ধরে ডাকবে! এ নিশ্চয়ই পাখিটা। কিন্তু কোথায় যে লুকিয়ে আছে দুষ্টুটা গাছের ফাঁকে, একদম নজর যাচ্ছে না। ওপরে তাকালেই ওরা দেখছে, পাতার ঝিলি-মিলির আড়াল থেকে আকাশটা উঁকি মারছে। আকাশ-ভর্তি আলোর তারাগুলো যেন এক-একটা অবাক গল্পের ছবি।

"ফুড়ুত!"

টোরা আর বাদশা স্পষ্ট দেখলে জামগাছ থেকে পাখিটা উড়ে গেল। ইশ! এত কাণ্ড করে শেষে এই! টোরার মুখ-খানা হতাশায় চুপসে গেল। কিন্তু বাদশা দমবার পাত্র নয়। বাদশা বললে, "পালাবে কোথায়! আয় দেখি!"

পাখি এবার অন্ধকারে উড়তে উড়তে, ঘুরতে ঘুরতে দুষ্টুমি করে ডাকলে, "বাদশা-দাদা, টোরা-দিদি।"

বাদশা ছুটল পাখির পেছনে। ডাক দিল, "আয় পাখি, পাখি আয়।"

টোরা ডাকল, "পাখি, পাখি আয়, আয়।"

তারপর পাখি উড়ছে, বাদশাও ছুটছে।

পাখিও ডাকছে, টোরাও ডাকছে।

আঁধার রাতে অমন করে যে একা-একা ছুটতে নেই,

এ-কথা বুঝতে পারেনি টোরা। বোঝেনি বাদশা। বোঝা যায়ও না। কেননা, টোরা জানে পাখিটার জন্যে নতুন-মা ভারি কষ্ট পেয়েছে। আবার যদি ফিরে আসে পাখি, খুব খুশি হবে নতুন-মা। নতুন-মাকে খুশি দেখলেই টোরাও খুশি! অবিশ্যি বাদশা ভাবছে অন্য কথা! ভাবছে, একবার পাখিটাকে ধরতে পারলে হয়। মাকে যা বলবে না বাদশা! ছিঃ ছিঃ, দিদিকে শুধুমুধু মারাটা কি ঠিক হয়েছে! দিদির দোষটা কী শুনি?

সত্যিই পাখিটার লোভে টোরা আর বাদশা কেমন যেন ভুলে গেল সব কিছু। ভুলে গেল, যে-পাখি উড়ন্ত তার পেছনে ধাওয়া করলে তাকে ধরা যায় না। তাই ছুটতে ছুটতে এমন জেদ বেড়ে গেল যে, খেয়ালই করল না কোথায় চলেছে তারা।

এ কী! হঠাৎ পাখিটা যেন ওদের সঙ্গে চোর-চোর খেলা শুরু করে দিলে! হাওয়ায় ভাসছে পাখি। ভাসতে ভাসতে হঠাৎ হঠাৎ নেমে আসছে একেবারে ওদের হাতের নাগালে। যেই বাদশা আর টোরা ধরতে যাচ্ছে, পাখি ভড়কি দিয়ে ফুড়ুত করে উড়ে পালাচ্ছে। আশ্চর্য কথা! বলে পাখি নাকি রাত-দুপুরে চোখে দেখে না। কিন্তু এখন ওই উড়ন্ত পাখির কসরতের কাণ্ডকারখানা দেখলে কে বলবে এ-কথা! উল্টে অন্ধকারে টোরা আর বাদশারই চোখে ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। ধাধা যতই লাগছে, ওদের গোঁ ততই বাড়ছে। যেমন করে হোক পাখি তারা ধরবেই ধরবে!

হাঁপিয়ে গেছে বাদশা। টোরাও হাঁপাচ্ছে। টোরা বাদশাকে চেঁচিয়ে বললে, "বাদশা, তুই আর ছুটিস না। দাঁড়া। আমি দেখছি।"

বাদশা উত্তর দিলে, "তুই একা পারবি না।"

তাই বাদশাও পাখিটাকে ধরবে বলে হাত পাকাচ্ছে, লাফ মারছে, ভড়কিও খাচ্ছে। উড়ন্ত পাখি ধরা কি আর বাদশার কম্ম। না, বাদশার কম্ম নয়! কিন্তু দিদির মুখ তাকে রাখতেই হবে। দিদির জন্যে কোন কাজই তার কাছে অসাধ্য নয়!

পাখিটা উড়তে উড়তে এবার একদম আচমকা মেরেছে এক ঝটকা। মেরেছে এক্কেবারে টোরার হাতের মধ্যে। হয়তো পাখিটা ভেবেছিল টোরার হাতে ঠুকরে দিয়ে পালাবে। টোরা তো তাই না দেখে থতমত খেয়ে গেছে! কিন্তু ঘাবড়াল না। চোন-কান বুজে হাতের মুঠি পাকিয়ে ছোঁ মারতেই বাছাধন পাখি হাতের মধ্যে সড়াত! ধরা পড়েছে! আর কোন কথা আছে! টোরা একেবারে প্রাণপণে চেপে ধরলে পাখিটাকে! পাখি চিল্লিয়ে ডেকে উঠল, "ক্যা-অ্যা-অ্যা! তারপরেই থেমে গেল।

বাদশা তাই না দেখে একেবারে খুশিতে লাফিয়ে উঠল, "দিদি!"

কিন্তু দিদি! দিদির তো মুখখানি খুশিতে উছলে পড়ল না। হাতের পাখি হাতে নিয়ে টোরা কেমন যেন থমকে গেল। পাখিটা চিৎকার করেই অমন ঠাণ্ডা হয়ে গেল কেন! টোরা তাড়াতাড়ি হাতের মুঠিটা খুলে ফেলতেই পাখিটা হাত ফসকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। যাঃ, টোরার হাতের চাপে পাখিটা মরে গেছে!

কিন্তু পাখিটা মরেছে কি মরেনি, এ-কথাটা বুঝতে না বুঝতেই, হঠাৎ আর এক কাণ্ড! মরা পাখিটা টোরার হাত থেকে যেই মাটিতে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল আকাশে। থরথর করে মাটি কেঁপে যেন সব কিছু ভেঙে ভেঙে চুরমার করে ফেলছে। গাছের পাতায়-পাতায় এতক্ষণ যে-হাওয়া ঝুরঝুরু বয়ে চলেছিল, সেই হাওয়া হঠাৎ ঝড়ের বেগে লাফিয়ে লাফিয়ে মাতামাতি

লাগিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে কী ধুলো! টোরা আর বাদশার চোখেমুখে সেই ধুলো ঝাপটা মেরে ঝড়ের সঙ্গে লুটোপুটি খাচ্ছে! সেই প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার মধ্যে বাদশা চিলের মত চেঁচিয়ে উঠল, "দিদি!"

টোরা অন্ধকারে দু হাত বাড়িয়ে ডাক দিল, "বাদশা!" কে কাকে খুঁজে পাবে এই দুর্যোগে! টোরা আর বাদশা ঝড়ের ধাক্কায় এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ল। অন্ধকারে অন্ধের মত হাবুডুবু খেতে লাগল। কখনও বিদ্যুৎ, কখনও বজ্রপাত, প্রচণ্ড ঝড় আর মুঠোমুঠো ধুলো, সব মিলিয়ে এক ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে গেল টোরা আর বাদশা। চিৎকার করে কেঁদে উঠল বাদশা, "দিদি, আমার কাছে আয়!"

দিদি চিৎকার করে জিগ্যেস করলে, "বাদশা, তুই কোথা?"

বাদশা উত্তর দিলে, "আমি এখানে।"

কিন্তু কোনদিকে যাবে টোরা? কোথায় আছে বাদশা? চোখ তো চাইতেই পারছে না। চোখ চাইলেই ঝাঁক ঝাঁক ধুলো উড়ে এসে চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়ছে। কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তবু ডাক দিল টোরা, "বাদশা, আমি এখানে আছি, আমার কাছে আয়। আমি তোকে দেখতে পাচ্ছি না।"

বাদশা উত্তর দিলে, "আমিও দেখতে পাচ্ছি না। তুই কোনদিকে?"

"এই দিকে!"

এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগে এইদিকে এক ঝাঁক পাখি ঝড়ের সঙ্গে ঘূর্ণি খেতে খেতে টোরার মাথার ওপর পাক খাচ্ছে! কী সাংঘাতিক বিকট দেখতে সেই পাখিগুলোকে। বীভৎস কুচ্ছিত কালো মিশমিশে তাদের গায়ের রঙ! বলতে পারো, যেন এক-একটা দানব। ঝড়ের আকাশ কালো করে তেড়ে আসছে টোরার দিকে। কালো রাতে তাদের হিংস্র চোখগুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। ঠোঁট যেন ধারালো ছুরির মত তীক্ষ্ন! হঠাৎ মস্ত মস্ত ডানাগুলো আগুনজ্বালা হাপরের মত ঝটপটিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল টোরার ঘাড়ের ওপর। তারপর ডানা ঝাপটিয়ে টোরাকে থাবড়াতে লাগল। নোখ দিয়ে খামচাতে লাগল। ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাতে লাগল। টোরা যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে ককিয়ে উঠল, "বাদশা!"

বাদশার সাড়া পাওয়া গেল না।

ঝাঁকে ঝাঁকে দানব-পাখি টোরাকে খামচে-ছিঁড়ে নাস্তানাবুদ করে ছাড়লে। টোরা ঝড়ের সঙ্গে ঘুরপাক খেতে-খেতে পাখির হাত থেকে বাঁচার জন্যে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু কে শুনবে সেই চিৎকার? ঝড়ের দামামা আর পাখিদের কর্কশ চেঁচানি ছাপিয়ে সে চিৎকার কার কানে যাবে?

পারেনি টোরা। পারেনি পাখির সঙ্গে লড়াই করে ওই দানব-পাখির হাত থেকে বাঁচতে। টোরার যেন দম আটকে আসছে। ছুটতে ছুটতে, লাফাতে-লাফাতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল টোরা। তারপর আর কিছু জানার কথা নয় ওর। ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইল মাটির ওপর।

২

ঝড় থেমে গেছল। হয়তো অনেক আগেই। কত আগে টের পায়নি টোরা। কেননা, যখন ও চোখ চাইল, দেখল কেমন সব থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। না আছে ঝড়ের দাপাদাপি, পাখিদের কিচিমিচি। কিন্তু চারিদিকে এত কুয়াশা কেন? যেদিকে চায় সে, শুধু কুয়াশা আর কুয়াশা। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না টোরা। ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ল টোরা। উঠতে গিয়ে মাথাটা ঝিমঝিম করছে। কী ব্যথা সারা দেহ জুড়ে। কেটে গেছে, ছড়ে-ছিঁড়ে গেছে হাত-পা!

কিন্তু এ কোথায় সে? কোথায় এসে পড়েছে টোরা? জায়গাটা যেন ভয়ঙ্কর চুপসি মেরে থমকে আছে। ভীষণ অস্বস্তিতে দম আটকে আসছে। দাঁড়িয়ে পড়ল টোরা। সেই কুয়াশার জালের মধ্যে কানামাছির মত হাতড়াতে লাগল। পথ কোনদিকে? কোনদিকে যাবে সে?

হঠাৎ যেন চমক দিয়ে ওর মনের ভেতরটা শিউরে উঠল! বাদশা! তাই তো, বাদশা কোথা গেল! এত কুয়াশা, তাকে তো দেখা যাচ্ছে না! কুয়াশার মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে বাদশা?

টোরা নরম গলায় চুপিসারে ডাকল, "বাদশা!"

বাদশার সাড়া পেল না।

আবার ডাকল, "বাদশা!"

তবুও সাড়া নেই।

বুক শুকিয়ে গেল টোরার। কী হবে এখন? এই কুয়াশার মধ্যে বাদশাকে সে কোথায় খুঁজবে? এবার চিৎকার করে ডেকে উঠল, "বাদশা!"

এবারও ভোঁ-ভোঁ! শুধু তার ডাকের সুরটা প্রতিধ্বনি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সেই কুয়াশার মধ্যে। কেঁদে ফেললে টোরা হাউ-হাউ করে।

হঠাৎ কারা হেসে উঠল, "হো-হো-হো!"

হাসির শব্দে কান্নাটা আচমকা থমকে বুকের মধ্যে আটকে গেছে টোরার। ভীষণ ভয় পেয়ে গেল টোরা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল! তক্ষুনি হঠাৎ বাতাস বইতে শুরু করল। কার হাতের জাদুর ছোঁয়ায় সেই গাঢ় কুয়াশাটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। বে-বাক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে টোরা। দেখছে, কুয়াশা মিলিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল রাজবাড়ির দরবারের মত এক বিরাট ঘর। সে-দরবার বহুদিনের পুরানো। ভাঙা, জীর্ণ। যেদিকে চাও, বড় বড় থাম। ফেটে গেছে, ইঁট ঝুলছে। উঁচু উঁচু দেওয়াল। খসে পড়েছে চুন-বালি। মাথার ওপর খাড়া মস্ত এক গম্বুজ। মনে হচ্ছে এই বুঝি হুড়মুড় করে ঘাড়ে পড়ে! গম্বুজের নীচে একলা দাঁড়িয়ে টোরা। হঠাৎ গম্বুজের ডালা খুলে ওর চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে নেমে এল এক বিকট মূর্তি! কালো অন্ধকারের মত সে ভয়ঙ্কর! বীভৎস মুখের হাঁয়ের ভেতর জিবটা তার লকলক করছে। যেন গিলতে আসছে টোরাকে। চোখ দুটো ভাঁটার মত। হাত-পায়ের নোখগুলো লম্বা আর খোঁচা-খোঁচা! তার মাথায় ঝাঁকড়া খসখসে একরাশ চুল। পিঠে ছড়িয়ে আছে উড়ন্ত পাখির ডানা। সেটা ঝটপট করে ঝাপটা মারছে, হাওয়ার ঢেউ উঠছে সারা ঘরে! এ যেন এক উড়ন্ত দানব!

আতঙ্কে চেয়ে দেখলে টোরা। "কে!"

"গর-র-র" করে গর্জে উঠল দানবটা। তার গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে থরথর করে কেঁপে উঠল দরবারটা। মনে হল তার মুখ দিয়ে এক ঝলক আগুন বেরিয়ে এসে টোরার মুখের সামনে ঝলসে উঠল। টোরা ভয়ে পিছিয়ে গেল! দানবটা হাত বাড়িয়ে টোরাকে আগলে ধরলে!

টোরা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে জিগ্যেস করলে, "কী চাই তোমার?"

তখন সেই দানব তার বিরাট মাথাটা নাড়তে নাড়তে প্রচণ্ড গর্জন করে বললে, "হাতের মুঠিতে চেপে পাখি মেরেছিস তুই!"

টোরা তেমনি ভয়ে জড়সড় হয়ে বললে, "না, আমি

ইচ্ছে করে মারিনি। আমি হাত দিয়ে ধরতেই পাখিটা মরে গেল।"

"আমিও যদি আমার পায়ের নোখ দিয়ে তোর গলাটা চেপটে ধরে মেরে ফেলি! কিংবা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোর মাথাটা ফুটো করে দিই। তখন তোর কেমন লাগে!"

"ওটা আমার মায়ের পাখি। দুষ্টুমি করে আমার হাত ফসকে পালিয়েছিল। পাখিটার জন্যে মায়ের মন কেমন করছে বলেই আমি ধরতে গেছলুম।"

"মায়ের জন্যে তোর তো ভারি দরদ।" ধমকে দিলে দানবটা।

"মায়ের কষ্ট দেখলে আমি থাকতে পারি না।" উত্তর দিল টোরা।

দানবটা ভীষণ লাফিয়ে উঠল। সাংঘাতিক তর্জন-গর্জন শুরু করে দিলে। তারপর রক্ত-বর্ণ চোখ দুটো বার করে বললে, "আমি কোন কথা শুনতে চাই না। আমি পাখিটাকে জীবন্ত দেখতে চাই। তুই যদি পাখির প্রাণ ফিরিয়ে দিতে না পারিস, তোর ভাইকে ফিরে পাবি না।"

টোরা শিউরে উঠল! তাহলে এই দানবটা বাদশাকে লুকিয়ে রেখেছে! টোরা বুঝে উঠতে পারছে না, এখন সে কী করবে! যে-পাখি মরে গেছে, তার প্রাণ সে কী করে ফিরিয়ে দেবে! তাই টোরা এবার কাকুতি-মিনতি করে বললে, "পাখির প্রাণ আমি দেব কী করে? প্রাণ তো ভগবানের। কিন্তু তুমি আমার ভাইকে ফিরিয়ে না দিলে মায়ের কাছে আমি মুখ দেখাব কেমন করে?"

এবার প্রচন্ড চটে গেল দানবটা। বললে, "আমি কোন কথা শুনতে চাই না। বল, তুই পাখির প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারবি কিনা।"

টোরা বললে, "আমি যা পারি না, তা কেমন করে বলব পারব?"

"বেশ! তবে তোর মাকে ভুলতে হবে।"

টোরা চিৎকার করে উঠল, "না, মাকে আমি ভুলতে পারি না, পারব না। মা আমার ভালবাসার।"

"মাকে না ভুললে, ভাইকেও ফিরে পাবি না।"

তেমনি আকুল হয়ে টোরা উত্তর দিলে, "ভাইকে ফিরিয়ে দাও, ভাই আমার আদরের।"

"আবার ভাই-ভাই করলে আমি তোকে বেঁধে রাখব।"

"আমাকে বাঁধো, আমি মেনে নেব। তাহলে তুমি আমার ভাইকে ছেড়ে দেবে?"

দানবটা হুংকার ছাড়লে, "ফের ওকথা বললে তোর মুখ-খানা আমি আগুনে ঝলসে দেব।"

খুব শান্ত গলায় টোরা উত্তর দিলে, "বেশ তো, তোমার যদি তাই ইচ্ছা যায়, ঝলসে দিও আমার মুখখানা। কিন্তু ভাইকে আমার ছেড়ে দিও।"

দানব আরও রেগে গেল। বললে, "তোর ভাইকেও আমি পুড়িয়ে মারব।"

টোরার শান্ত গলাটা ভীষণ শব্দে ফেটে পড়ল। চিৎকার করে উঠল টোরা, "না। যে বলে অমন কথা, সে যেন বোবা হয়ে যায়।"

"তোর এতদূর আস্পর্ধা, আমাকে তুই শাপান্ত করছিস! তুই পাখি মেরেছিস। তুই খুনী।" বলে সেই কালো দানবটা হঠাৎ এক মুঠো ধুলো নিয়ে টোরার মুখে ছুড়ে মারল। মেরেই হো হো করে হাসতে হাসতে নৃত্য শুরু করে দিলে।

টোরার চোখ দুটি ভীষণ জ্বলে উঠেছে। টোরা যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কাতরে উঠল, "আ—আ।"

দানবটা বললে, "এই তোর শাস্তি। তোর ওই মুখে আমি জাদু মেরেছি। এখন তোর ওই মুখ যে দেখবে, সে জন্তু হয়ে যাবে। তোর মা হবে, তোর ভাই হবে, তোর বাবা হবে। এমন কী, অজানা অচেনা যে দেখবে সে-ই হবে। তারপর সেই জন্তু তোকে ছিঁড়ে খাবে।"

চিৎকার করে উঠল টোরা, "না।" টোরার তীক্ষ্ণ গলার স্বরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে ওই বিশাল দরবারের গম্বুজ গমগম করে উঠল। এমন সময় হঠাৎ যেন বাদশা ডাকল, "দিদি।"

প্রথমটা বুঝতে পারেনি টোরা। তারপর আবার যখন ডেকেছে, সে-ডাক চিনতে ভুল হয়নি টোরার। ও চেঁচিয়ে সাড়া দিলে, "বাদশা।"

দানবটা বিচ্ছিরি মুখ খিঁচিয়ে হেসে উঠে বললে, "ওই তোর ভাই! এবার তোর মুখ দেখবে। তারপর তোর ভাই হবে জন্তু! হা হা হা!"

ভয়ে কুঁচকে গেল টোরা। প্রথমটা বাদশার ডাক শুনে, খুশিতে ওর চোখের পাতা দুটি নেচে উঠেছিল। কিন্তু তারপর? দিদি বলে বাদশা সেই দরবার-ঘরে ছুটে আসতেই, টোরা দু হাত দিয়ে নিজের মুখটা ঢেকে ফেললে। না, ও কিছুতেই নিজের মুখখানা বাদশাকে দেখতে দেবে না। না, তার ভাইকে সে জন্তু হতে দেবে না। কিছুতেই না। মুখ চেপেই টোরা ছুট দিল। টোরা বাদশাকে পিছনে ফেলে পালাল।

বাদশা টোরাকে ছুটতে দেখে চেঁচিয়ে ডাকলে, "দিদি, আমি।"

টোরা তখন ছুটতে ছুটতে দরবার-ঘরের বাইরে চলে গেছে। বাদশা দিদির কাছে যাবার আগেই, দিদি প্রাণপণে ছুটছে। দরবারের দরজা ডিঙিয়ে দিদি আকাশের নীচে পৌঁছে গেছে। দিদিকে ডাকতে ডাকতে বাদশাও ছুটল। আর দানবটা ঠ্যাং ছুঁড়ে, ডানা ঝাপটিয়ে খুশিতে সিটি মারলে, টি—টি! সিটি দিতে-দিতে দরবারের ধুলো-বালির ওপর নাচন-কোঁদন শুরু করে দিলে। ধুলোয়-ধুলোয় ভরে গেল দরবার-ঘর। সেই ধুলোর সঙ্গে ঝটাপটি করতে করতে কোথায় যে সে ফুস করে লুকিয়ে পড়ল, আর দেখাই গেল না।

"দি—দি।" যত জোর ছিল গলায়, বাদশা চেঁচিয়ে উঠল।

তবু টোরা দাঁড়াল না। দাঁড়াবেও না। ভাইয়ের জন্যে তার মন ভেঙে খানখান হয়ে গেলেও ভাইয়ের দিকে ও এক-বার চেয়েও দেখবে না। ও মুখ ঘুরিয়ে ছুটবে। বাদশা যেন ওর মুখখানা দেখে না ফেলে। না, না, তার মুখ দেখলে যে বাদশা জন্তু হয়ে যাবে!

বাদশাও ছুটল দিদির পিছু। প্রাণপণে ছুটেও সে পৌঁছুতে পারল না দিদির নাগালে। টোরা ছুটতে ছুটতে এগিয়ে যায়, বাদশা দেখতে দেখতে হারিয়ে যায়। বাদশা কেঁদে ফেলে, "দিদি, দাঁড়া, দিদি।"

দিদি দাঁড়াবে না।

কাঁদতে-কাঁদতে আবার ডাকে বাদশা, "দিদি, দিদি, ফিরে চা।"

দিদি ফিরেও চাইবে না।

তখন সেই কান্না আকুল হয়ে বেজে ওঠে। বেজে ওঠে গাছের পাতায়, ফুলের রঙে, আকাশের নীলে। সে যেন এক সুরের ঢেউ। কান পাতো, শুনবে, সে-সুর বাজছে, ঝুন-ঝুন, টুন-টুন। বাজতে-বাজতে হাওয়ায় ছড়িয়ে যায়।

টোরা শুনতে পেল সে-সুর, তবু থামল না। বাদশার

কথা একটুও ভাবল না।

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ কী দেখে এমন আঁতকে ওঠে টোরা? ওর যেন ধাঁধা লেগে গেল চোখে। ও যেন দেখে সেই সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওর পিছু পিছু ছুটে আসছে, রাস্তার দুপাশের ছোট-বড় ঘরবাড়ি, মস্ত-মস্ত গাছ-গাছালি। লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটছে ওরা, কিম্বা ছুটতে ছুটতে হাসছে ওরা।

টোরা ভয় পেল! ও তো কোনদিন শোনেনি, গাছ ছোটে, ঘর হাঁটে! এ আবার কেমনতরো কাণ্ড!

ভাবতে না ভাবতেই আর-এক ধাঁধা। টোরা দেখে গাছগুলো আর গাছ নেই। গাছগুলো যে সব মানুষ হয়ে গেছে! মানুষগুলো টোরার পেছনে ছুটে আসছে!

তারা ছুটছে, সুর উঠছে। সুরের তালে-তালে সেই মানুষগুলোর ঢলঢলে প্যান্ট পায়ের কাছে ল্যাকপ্যাক, ল্যাকপ্যাক করছে। তারা যেন ধরবে টোরাকে! হ্যাঁ, ওই তো তারা হাত বাড়িয়েছে! ওই তো, লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে, পেছন থেকে টোরার ঘাড়টা খপাত করে ধরে ফেললে! টোরা আর ছুটতে পারল না। টোরাকে ওরা চ্যাং-দোলা করে ঘাড়ে তুলে নিলে। তারপর সেই বাজনার সুরে-সুরে টোরাকে ঘাড়ে নিয়ে, বিকট চেঁচিয়ে গান গাইতে লাগল, নাচতে লাগল।

টোরার প্রাণ যায়! সে-রকম নাচ টোরা জন্মে দেখেনি। কখনও তারা হাত-পাগুলো প্রচণ্ড কাঁপাতে কাঁপাতে বসে পড়ছে, আবার দাঁড়াচ্ছে। পা ছুঁড়ছে হাত বেঁকাচ্ছে।

হঠাৎ ভীষণ ভয় পেয়ে গেল টোরা। হঠাৎ দেখল কী, মানুষগুলোর মুখ আর মানুষের মত নেই। এক-একটা হিংসুটে জন্তুর মত তাদের মুখের চেহারা। গায়ে তাদের লম্বা-লম্বা লোম। হাতের থাবায় খাড়া-খাড়া নোখ!

আঁতকে উঠে চিৎকার করে টোরা বললে, "আমায় ছেড়ে দাও!"

ছাড়ল না তারা। উল্টে তাদের ধারালো নোখ দিয়ে যেন টোরাকে ছিঁড়ে কুটোকুটি করে ফেলতে চাইছে।

টোরা জানে, এবার তার বাঁচার কোন রাস্তা নেই। দানবের অভিশাপ সত্যি-সত্যি ফলে গেল। ওর মুখ দেখলে যদি মানুষে জন্তু হয়েই যায়, তবে ওর বেঁচে লাভই-বা কী! আর তাই মিছিমিছি বাঁচবার জন্যে টোরার কাঁদতেও মন চাইল না। এই জন্তুগুলোর কথা ছেড়েই দাও! যে-মাকে সে এত ভালবাসে, সেই মা-ই যখন তাকে দু চক্ষে দেখতে পারে না, তখন আর পরকে কী বলবে!

"দি—দি।" ওই বাদশা ছুটে আসছে।

সে-ডাক শুনে টোরা শিউরে উঠল। কী হবে? এই অপয়া মুখ সে কেমন করে দেখাবে বাদশাকে? ও কেমন করে চেয়ে দেখবে একবারটি বাদশার মুখের দিকে?

ওই জন্তু-মুখো মানুষগুলো বাদশার ডাক শুনেই নাচতে-নাচতে থমকে দাঁড়াল। ওরা টোরাকে ঘাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। টোরাকে ছেড়ে ওরা বাদশার দিকে ছুটে গেল। যেন এক-একটা জীবন্ত শয়তান।

টোরা নিশ্চিত জানত, এই জন্তুগুলোর হাত থেকে তার ভাই আর রেহাই পাবে না। তা হলে এখন তোমরাই বলো, কী করবে টোরা? এখন কেমন করে বাঁচাবে তার ভাই বাদশাকে?

টোরা থাকতে পারল না। চেঁচিয়ে ফেলল "বাদশা, এদিকে আসিস না।"

বাদশা নিশ্চয়ই শুনতে পায়নি। ওই তো বাদশা এদিকেই আসছে! টোরা যদি লুকিয়ে না-পড়ে, ও যে এক্ষুনি দেখে ফেলবে! তারপর এই জন্তুগুলোর মত—না, ভাবতে পারছে না টোরা। টোরা চক্ষের নিমেষে লুকিয়ে পড়ল একটা ঝোপের আড়ালে।

বাদশা এখন জন্তুগুলোর একেবারে মুখোমুখি! দাঁড়িয়ে পড়ল ভয়ে! কী বীভৎস দেখতে জন্তুগুলোকে। এমন অদ্ভুত জীব বাদশা দেখেইনি কোনদিন। সামনা-সামনি দেখা তো দূরের কথা, ওর অমন যে নানান ছবির বই আছে, তাতেও দেখেনি। ও কী, ওরা বাদশার দিকে তেড়ে যাচ্ছে কেন? বাদশাকে ওরা গিলে খাবে নাকি! আর ওখানে দাঁড়ায় বাদশা! মার ছুট!

কিন্তু পালাতে পারল না বাদশা। জন্তুগুলোর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তো চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। জন্তুগুলো মারল লাফ। লাফিয়ে পড়ল বাদশার ঘাড়ে। ওকে ধরে ফেলেছে। তারপর ওকে নিয়ে লোফালুফি শুরু করে দিলে। ওঃ! বাদশার নড়াটা বুঝি ছেঁড়ে, প্রাণ বুঝি যায়-যায়!

লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখছে টোরা। ওর বুকের ভেতরটা গুমরুচ্ছে। এখন কেমন করে সে বাঁচাবে তার ছোট্ট ভাইটিকে?

বাদশা যখন আর পারছিল না, তখন ওর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। ও হাঁপাচ্ছিল বে-দম হয়ে। আর ওর চোখে-মুখে বিন্দু-বিন্দু ক্লান্তির ছোঁয়া ফোঁটা ফোঁটা হয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। তখন আর চুপ থাকতে পারেনি টোরা। টোরা যেন মুখ ফসকে আপনা থেকেই ডেকে উঠেছিল, "বাদশা!"

ইশ! এখন কী হবে! বাদশা যদি শুনে ফেলে থাকে! না, খুব রক্ষে! বাদশা শোনেনি। শুনেছে ওই জন্তুগুলো। ওদের কানকে ফাঁকি দেবে কে? টোরা?

পারেনি ফাঁকি দিতে। ওরা শুনতে পেয়েছে টোরার গলা। ওরা দেখতে পেয়েছে টোরার ছোটা। হ্যাঁ, টোরা ছুটেছে! আগু-পিছু কিচ্ছু না ভেবে একেবারে তীরবেগে ছুটেছে। একবার পিছনে ফিরেও তাকাল না। দেখল না, তার পালানো দেখে, জন্তুগুলো হাসতে-হাসতে ডিগবাজি মারছে আর তুড়তুড়ি কাটছে! তুড়-ড়-ড়! ওর পেছনে ছুটছে না, তাড়াও মারছে না।

এক নিশ্বাসে অনেকটা পথ চলে এসেছে টোরা। অনেক ঝোপ ডিঙিয়েছে, অনেকটা বন। এতক্ষণ যে চিৎকার ওর কানে তালা ধরিয়ে দিয়েছিল, সে চিৎকার আর নেই। নিস্তব্ধ, নিঃঝুম চারিদিক। তাই থামল। ওই গাছের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ওর যেন ইচ্ছে হচ্ছিল একটু বসে বসে কাঁদে। কিম্বা ওই খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করে, সে কী পাপ করেছে যে তার কপাল এত মন্দ। এ অলক্ষুনে মুখ নিয়ে সে কোথা যাবে? এই অলক্ষুনে মুখ নিয়ে সে কেমন করে ভাইকে নিয়ে মায়ের কাছে ফিরবে?

যখন কেউ থাকে না নিজের কাছে, যখন মনে হয় ওই আকাশই আপনজন, তখন ভারি ভাল লাগে টোরার। কথা যখন কেউ বলে না, তখন যেন আকাশই কথা বলে টোরার সঙ্গে। ওই সুন্দর আকাশ ওকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। আকাশের তারারা চোখ টিপে ওর সঙ্গে লুকোচুরি খেলে!

আঃ। কী মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আসছে! এ তো ফুল না! ফুলের মধু না! কোথা থেকে ভেসে আসছে এই সুগন্ধ বাতাস? এত ভাল লাগছে টোরার। কেমন যেন আনমনা হয়ে সেই গন্ধের পথ চিনে-চিনে এগিয়ে চলল টোরা। সামনে পাহাড়। মস্ত উঁচু পাহাড়ের গায়ে-গায়ে নানান গাছ-গাছালি। গাছ-গাছালির সবুজ পাতায় মিষ্টি হাতের ছোঁয়া বুলিয়ে আদর করছে ঝুরঝুরে বাতাস। টোরা পাহাড়ের

কাছাকাছি যতই এগোচ্ছে, সে-গন্ধ ততই কাছে আসছে। টোরা পাহাড়ের পায়ের কাছে, পাথরের গায়ে গায়ে পা ফেলে খুঁজতে লাগল। ও ভাবল, এখানে নিশ্চয়ই কেউ আছে। হয়তো এমন কেউ, যে ওকে ভালবাসবে। ওর দুঃখ বুঝবে।

সামনে একটা মস্ত গুহা। অন্ধকার। সেই মিষ্টি সুবাস এই গুহার ভেতর থেকেই আসছে যেন! কে আছে গুহার ভেতরে?

ভয়ানক নিস্তব্ধ। ওর নিশ্বাসের শব্দটুকু ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না। ওর নরম পায়ের ছন্দটুকু পাথরের গায়ে-গায়ে যে শব্দ তুলছে, তা টোরার নিজের কানেই নিতান্ত অস্পষ্ট বেজে যাচ্ছে। টোরা গুহার ভেতরে এগিয়ে গেল।

সামনে আলো। অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে পড়ল টোরা! প্রদীপ জ্বলছে। কেবল একটি প্রদীপ। অন্ধকারে একটি শিখা। প্রদীপের আলোয় স্পষ্ট দেখল টোরা এক দেবতার মূর্তি। এই অন্ধকার গুহার ভেতরে এ মূর্তির পায়ের কাছে কে জ্বেলেছে প্রদীপের শিখা! কে দিয়েছে আলোর ছোঁয়া!

কে'দে ফেলল টোরা। ওর চোখের পাতা বেয়ে কান্নার ফোঁটাগুলি মুক্তোর মত ছড়িয়ে পড়ছে। হয়তো আনন্দে। এই অজানা জায়গায় ও একা। একাকী একটি ছোট্ট মেয়ে। ও জানে না, কী করবে এখন! ও জানে না, কেমন করে তার ভাইকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। মায়ের কাছে ভাইকে পৌঁছে দেবে। এই দেবতা কি টোরাকে দয়া করবে না? দেবতা কি শুধুই পাথর!

আকুল হয়ে দেবতার পায়ের কাছে প্রণাম করল টোরা। মনে মনে বললে, "ঠাকুর, বলো তুমি, আমার ভাইকে কেমন করে ফিরে পাব? বলো ঠাকুর, আমার মায়ের কাছে কেমন করে যেতে পারব? তুমি তো ঠাকুর সব জানো। তুমি তো জানো ঠাকুর, আমার এ অলক্ষুনে মুখ যে দেখবে, সে-ই জন্তু হয়ে যাবে! আমি কী করব? আমি কী করব ঠাকুর?" বলে হাউ হাউ করে কে'দে উঠল টোরা!

এ কী!! হঠাৎ প্রদীপটা পিলসুজের ওপর থেকে পড়ে গেল কেন! এই দেখো, প্রদীপ যে মাটিতে পড়ে নিভে গেল! বুঝতে পারেনি টোরা, তার অসাবধানে তার আঁচলের ছোঁয়া লেগেছে প্রদীপের গায়ে। কী হবে!

উঃ! কী জমাট অন্ধকার! কিচ্ছু দেখা যায় না! ওই সুন্দর দেবতার মূর্তিটি পর্যন্ত অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

আর টোরা? টোরা কোথায় গেল? অন্ধকারে সে কোথায় হারিয়ে গেল?

দেখো, দেখো, টোরা হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেছে। অন্ধকারের সঙ্গে অন্ধকার হয়ে মিশে আছে যে! টোরা যে অদৃশ্য হয়ে গেল! টোরা দেখছে, সে আছে। কিন্তু তুমি দেখছ, সে নেই। দেখা যাচ্ছে না, তার সেই ফুটফুটে মুখটি। সেই ডাগর ডাগর চোখ দুটি। লাল টুকটুক ঠোঁট দুটি কিম্বা আলতা-ছোঁয়া পা দুটি! কী হল তার? আবার তার কী অভিশাপ লাগল?

টোরা কাঁদছে! তুমি শুনছ টোরা কাঁদছে, কিন্তু দেখছ না তার কান্নার জল। তুমি শুনছ টোরার পায়ের শব্দ, কিন্তু বুঝছ না কোথায় সে চলছে! তার হাতের চুড়ি বেজে যায় ঠুং ঠুং, কিন্তু দেখছ না কোথায় সে বেজে পড়ছে! ডুকরে ডুকরে কে'দে ওঠে টোরা, "এ আমার কী হল?"

এই অন্ধকার গুহায়, অজানা দেবতার ঘরে অদৃশ্য টোরা কাঁদছে!

হঠাৎ কে যেন কথা বলল, "কে কাঁদে রে, কে কাঁদে?"

টোরার অদৃশ্য মূর্তি অদৃশ্য চোখে এদিক ওদিক চাইল।

সে-ই আবার বলল, "কী তোর নাম?"

"আমি টোরা।"

"কী করে প্রদীপ নিভল?"

"আমার আঁচল লেগে প্রদীপ নিভে গেল।"

তখন সেই না-দেখা মানুষ গম্ভীর গলায় বললে, "যারা অসাবধানী তারাই বারবার ভুল করে।"

টোরা মুখ ফুটে একটি কথাও বলতে পারল না।

আবার সে বললে, "তুই অসাবধানী। তোর অসাবধানতার জন্যে খাঁচার থেকে তোদের পাখিটা উড়ে পালাল। তোরই অসাবধানতার জন্যে সেই পাখি তোরই হাতের চাপে মারা গেল। আর এখন তোরই অসাবধানতার জন্যে দেবতার প্রদীপ নিভল। আর সেই পাপে তুই-ও অদৃশ্য হয়ে গেলি! তুই সবাইকে দেখতে পাবি, কিন্তু তোকে আর কেউ দেখতে পাবে না। তারপর একদিন তোর অদৃশ্য শরীরটা নিয়ে হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে নীল আকাশে মিশে যাবি। সেদিন তুই আর কাঁদতেও পারবি না।"

"না—!" চিৎকার করে কে'দে উঠল টোরা "আমাকে তুমি বাঁচাও। আমি না থাকলে, কে আমার মাকে দেখবে! কে তার ঘর-কন্নার কাজ করে দেবে। কে আমার বাবাকে যত্ন করবে। ভাইকে গল্প বলে ঘুম পাড়াবে।"

"তোর মা তো তোকে দেখতে পারে না। তবু মায়ের জন্যে তোর এত ভাবনা কেন?"

"কে বললে মা আমায় দেখতে পারে না। মা আমার ভালর জন্যেই তো আমাকে বকে। কার মা তার মেয়েকে বকে না? আবার ভালও বাসে না?"

"তোর মা তো পর। ও তো বাদশার মা।"

"মা কখনও পর হয়? বাদশা তো আমার ভাই।"

সেই কণ্ঠস্বর কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। আর টোরার অদৃশ্য চোখ দুটি ইতিউতি ঘুরে ঘুরে তাকে খুঁজে বেড়ালে। কিন্তু তাকে দেখতে পেলে না। না পেয়ে, টোরাই আবার

বললে, "চুপ করলে কেন?" তুমি আমায় বলে দাও কেমন করে আমি ফিরে পাব আমার সব কিছু!"

হয়তো সেই না-দেখা মানুষের মন টোরার কথা শুনে খুশি হয়েছিল। হয়তো মনে হয়েছিল অনেক দুঃখেও যে অন্যের মাকে আপন করে নেয়, সে লক্ষ্মী মেয়ে। তার দুঃখ ঘোচাতেই হবে। তাই সেই না-দেখা মানুষের কণ্ঠস্বর আবার শুনতে পেলে টোরা। সে বললে, "তোর আবার সব কিছু ফিরে পেতে গেলে তোকে যে এই প্রদীপ জ্বালতে হবে!"

টোরা বললে, "আমি জ্বালব।"

"কিন্তু এ যে শক্ত কাজ। তুই যে ছোট্ট। তুই তো পারবি না।"

টোরা ব্যাকুল হয়ে বললে, "হ্যাঁ, আমি পারব। আমি রোজ সন্ধ্যায় আমার ঠাকুরের কাছে প্রদীপ জ্বেলে দিই।"

তখন সেই কণ্ঠস্বর বললে, "তবে শোন। এই গুহার ওপরে যে পাহাড়, সেই পাহাড়ের চূড়ায় তোকে যেতে হবে। সেই পাহাড়ের চূড়ায় খোলা আকাশের নীচে জ্বলছে আর এক প্রদীপ। এই নিভন্ত প্রদীপের শিখাটি সেই জ্বলন্ত প্রদীপের শিখায় জ্বালাতে হবে। যদি পারিস, তুই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবি।"

টোরার কণ্ঠস্বর আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠল, "পারব, পারব, পারব।"

আবার সেই না-দেখা মানুষ বললে, "বেশ, তবে তুলে নে ওই প্রদীপ।"

টোরা অন্ধকারে তার অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে হাতড়ে হাতড়ে মাটি থেকে সেই প্রদীপটা তুলে নিল। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠল। এ যে সোনার প্রদীপ!

সে তখন বললে, "শুধু প্রদীপ নিলেই তো হবে না।"

টোরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "তবে?"

"জ্বলবে কেমন করে?"

"কেন জ্বলবে না?"

"প্রদীপের শিখা তো শুকিয়ে গেছে। ওকে ভিজিয়ে নিতে হবে!"

"কেমন করে? কী দিয়ে ভেজাব?"

"ভেজাতে হবে একটি ফুলের কান্নার জলে!"

অবাক হল টোরা। "ফুল কাঁদে?"

"হ্যাঁ, ফুল কাঁদে। যেমন তুই কাঁদিস। একটি ফুলের এক ফোঁটা চোখের জলে এর শিখাটি ভিজিয়ে নিলে, তবেই প্রদীপ জ্বলবে।"

টোরা হতাশ হয়ে চেয়ে রইল সেই কালো অন্ধকারের দিকে। কালো অন্ধকারে ও আলোর দেবতাকে দেখতে পাচ্ছে না একটুও। ও বুঝতে পারছে না এ কার কণ্ঠস্বর, দেবতার না অন্য কারও। তবু অন্ধকারেই অন্ধের মত হাত জোড় করে বললে, "ঠাকুর, তুমি যখন এত দয়াই করলে তখন বলে দাও কোথায় কাঁদছে সেই ফুল? কোথায় গেলে তার দেখা পাব?"

তখন সেই কণ্ঠস্বর আবার বললে, "যেখানে জলও আছে, স্থলও আছে। পাখিও আছে, ফুলও আছে। হাসিও আছে, খুশিও আছে। শুধু সেখানে নেই টোরা। সেখানেই তোকে যেতে হবে।"

টোরা উঠে দাঁড়াল। প্রদীপটি হাতে নিলে। সে অদৃশ্য, কিন্তু প্রদীপ তো নয়! তাকে না-দেখা গেলেও এই প্রদীপ তো সবাই দেখতে পাবে, সোনার প্রদীপ দেখলে, কেউ নিয়ে নেয় যদি। ভয় হল। কিন্তু ভয় পেলে তার চলবে না। তাকে বেরিয়ে আসতে হবে গুহার অন্ধকার থেকে বাইরে। তারপর ও হাঁটবে। ওর পায়ের ছন্দে-ছন্দে প্রদীপও দুলে দুলে এগিয়ে যাবে। মনে হবে, একটি আশ্চর্য সোনার পাখি শূন্যে একা-একা ভেসে যাচ্ছে।

টোরা গুহার অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে আকাশের আলোয় বেরিয়ে এল। তারপর একটু দাঁড়াল। ভাবল, কোনদিকে যাবে সে! কোনদিকে জল আছে, স্থল আছে। পাখি আছে, ফুল আছে। হাসি আছে, খুশি আছে? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কেমন যেন অবাক লাগল টোরার। ওর মনে হল, এসব তো সবখানেই আছে! তা ঠিক। তাহলে? সে কোনখানে যাবে? কেমন করে যাবে?

৩

"টোরা, টোরা, টোরা!" কে যেন ফিসফিসিয়ে টোরার নাম ধরে কানে কানে ডেকে গেল। ও তো কাউকে দেখতে পেলে না। শুধু ওর চারপাশে হাওয়া বয়ে চলেছে ঝুর ঝুর করে! আঃ! কী মিষ্টি। তবে কি হাওয়ার সঙ্গে গলা মিলিয়ে কেউ ডাকল তাকে?

টোরা মিষ্টি শান্ত গলায় জিগ্যেস করলে, "কে তুমি, ডাকছ আমায়?"

"টোরা, টোরা, আমিও তোমার মত অদৃশ্য। আমার সঙ্গে যাবে তুমি?"

"কোথায়?"

"যেখানে ফুল কাঁদে? কাঁদতে কাঁদতে ফুলের চোখে জল গড়ায়?"

"তুমি সেখানে আমায় নিয়ে যাবে?" আনন্দে টোরার মন নেচে উঠল। আনন্দে উচ্ছল হয়ে সে জিগ্যেস করলে, "তুমি কে? তোমায় দেখছি না তো?"

সে বললে, "আমি হাওয়ার দোলনা।"

অমনি টোরার পা দুটি দুলে উঠেছে।

হাওয়া বললে, "অবিশ্যি ভয় কিছু নেই। কেননা, আমি তোমায় আমার দোলনায় নিয়ে যাব!"

টোরার চোখ দুটি ভয়ে কুঁচকে গেল। বললে, "যদি পড়ে যাই!"

"যারা ভয় পায়, তারা পড়ে। পড়তে পড়তে মরে। কিন্তু তুমি আর পড়বে কী! তুমি তো অদৃশ্য!"

দুঃখে টোরার গলাটা ভার হয়ে গেল। টোরা উত্তর দিলে, "ও হ্যাঁ, আমি তো অদৃশ্য। বেশ, তুমি নিয়ে চল, আমি ভয় পাব না!"

অমনি ঝুরঝুরে হাওয়া ফুরফুর করে বয়ে চলল। সেই হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে টোরা ভেসে যায়, হারিয়ে যায় ওই আকাশে।

হাওয়া জিগ্যেস করলে, "টোরা, ভয় পাচ্ছ?"

টোরা বললে, "ভাল লাগছে!"

পাহাড়টা পেরিয়ে পেরিয়ে নদী এল। ওই নীল আকাশের ওপার থেকে চোখ মেলে দেখতে-দেখতে টোরার মনে হল, নদী যেন সবুজ বর্ণের কপালে রুপোলি আলোর টায়রা! ঝিকমিক করছে!

টোরা হাওয়ার দোলনায় ভাসতে-ভাসতে জল দেখল, স্থল দেখল। পাখি দেখল, ফুল দেখল। হাসি দেখল, খুশি দেখল।

দেখল আর অবাক হয়ে গেল। মাটিতে হেঁটে হেঁটে দেখা একরকম। আর আকাশে উড়ে উড়ে দেখা আরেক রকম। আকাশ থেকে পৃথিবীটা যেন খেলাঘর! কেমন এইটুকু-টুকু হয়ে গেছে সব!

তারপর?

তারপর হাওয়া বললে, "টোরা, নামতে হবে।"

টোরা জিগ্যেস করলে, "এইখানে?"

হাওয়া বললে, "এই বনে।"

"এই বনে ফুলের কান্না পাব?"

"কান্নার জল পাবে।"

"তবে নামি।" সায় দিল টোরা।

টোরার কথা শেষ হতে না হতেই, হাওয়া হুস হুস করে টোরাকে নিয়ে সেই বনের গভীরে নেমে এল।

টোরা বনের ঘাসে পা ফেলে হাওয়াকে বললে, "ভীষণ গহন বন।"

হাওয়া বললে, "বন যদি না গহন হয়, মজা কিসের?"

টোরা জিগ্যেস করলে, "বাঘ আছে?"

"বাঘ আছে, বাঘের মাসীও আছে।"

"এখানেই কান্না খুঁজতে হবে?"

হাওয়া উত্তর দিলে, "হ্যাঁ।"

"কিন্তু খুঁজতে খুঁজতে গভীর বনে হারিয়ে গেলে?"

"হারিয়ে গেলেই খুঁজে পাবে।" বলে হাওয়া হা-হা-হা করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে ঝড়ের বেগে ঘুরপাক খেতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে গাছের পাতায়, গাছের ডালে হুটোপাটি লাগিয়ে দিলে। তারপর যে হঠাৎ কোথায় লুকিয়ে পড়ল, টোরা আর দেখতে পেলে না।

টোরা চেঁচিয়ে ডাকলে, "কোথা লুকালে?"

কে উত্তর দেবে? হাওয়া তখন হাওয়া হয়ে গেছে। আর ঠিক তক্ষুনি টোরার যেন শীত-শীত পাচ্ছে। মনে হল উত্তুরে হাওয়া ঝির ঝির করে বয়ে বয়ে বনের পাতা ঝরাচ্ছে। গাছের শুকনো পাতাগুলো ঝরতে ঝরতে যখনই ওর পায়ের ওপর উড়ে আসছে, তখন ওর মনে হচ্ছে এখন সে ভারি একলা। হাওয়াটা যে তাকে এমন একটা না-চেনা, না-জানা জায়গায় একলা ফেলে পালাবে, এটা তো সে ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারেনি! বলো, এখন এই গা-ছমছম বনে একা-একা সে কী করবে? কোথায় খুঁজবে ফুলের কান্না?

একদল পাখি পাইন গাছটার পাতায় পাতায় খেলা করছে আর খুব গান গাইছে। এক-একটা পাখি গাইতে গাইতে কেমন শিস দেয়! কেউ কেউ নাচে আবার। হাসে আবার। যাই বলো, টোরা কোনদিন পাখিকে হাসতে দেখেনি! ওরা তো আর টোরাকে দেখতে পাচ্ছে না। তাই ভয়ও পাচ্ছে না। খুব হাসছে, খুব গাইছে, ধিনিক-ধিনিক নাচছে।

দেখছে টোরা। যতই দেখছে, ভাল লাগছে। আর মনে মনে ভাবছে, এই এক-বন পাখি যদি মায়ের জন্যে নিয়ে যেতে পারি! না, না, এখন ওসব কথায় না যাওয়াই ভাল। এখন কান্নার কথা। ফুলের কান্না!

হঠাৎ টোরার মনে হল, আচ্ছা পাখিরা তো সারা রাজ্যি উড়ে বেড়াচ্ছে, ওরা তো জানতে পারে কান্না-ঝরা ফুলের কথা! আচ্ছা, একবার পাখিদের যদি ডাকে ও, যদি জিগ্যেস করে?

তাই কী মিষ্টি সুরে ডাকল টোরা:

> গহন বনের রঙিন পাখি,
> বল্ না আমায় বল্,
> কোথায় আমি খুঁজে পাব
> ফুলের চোখে জল?

ওমা! এ কী হল! টোরার গলার স্বর শুনে যেন ভীষণ ভয় পেয়ে গেলে পাখির দল! কীরে বাবা! মানুষের দেখা নেই কোথাও, অথচ মানুষের গলা আসে কোত্থেকে! আর থাকে ওখানে? গান থামিয়ে, নাচ থামিয়ে ভো-কাট্টা! এ-গাছে, ও-গাছে যে-গাছে যত পাখি ছিল, সব গাছ ছেড়ে, গাছের ডাল ছেড়ে একেবারে টোরার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

টোরা সেইদিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগল "তাই তো, পাখিরা পালাল কেন?"

এমন সময় এক ঝলক হাওয়া গাছের পাতার ওপর দিয়ে ভেসে গেল। আর ঠিক তক্ষুনি মনে হল, যেন পাতাদের গায়ে কে সুড়সুড়ি দিয়ে দিয়েছে! এ-পাতা ও-পাতার গায়ে লুটোপুটি খেয়ে খিলখিল করে হেসে কুটোকুটি! টোরা ভাবল, গাছের পাতাও হাসে! যখন হাসে, তখন নিশ্চয়ই টোরার কথাও বুঝতে পারবে! তাই টোরা এবার গাছের পাতাদের ডাকলে:

> গহন বনের সবুজ পাতা,
> বল্ না আমায় বল্,
> কোথায় আমি খুঁজে পাব
> ফুলের চোখে জল?

চোখের পলকে তখন এক কাণ্ড! টোরার মুখের বাক্যি তখনও মুখেই! দেখে কী, সেই বনভর্তি গাছ, গাছভর্তি সবুজ পাতা সব একেবারে ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ল। ঝরে পড়ে হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সারা বনে ছোটাছুটি, হাঁটাহাঁটি শুরু করে দিলে। সে এক তাজ্জব ব্যাপার! গাছ আছে পাতা নেই। ডাল-পালা খাঁ-খাঁ! কঙ্কালসার! মনে হচ্ছে যেন, কোমরভাঙা একশো দুশো বছরের হাড়-জিরজিরে এক-একটা বুড়ি কিম্বা বুড়ো, লিকলিকে হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পাতা ঝরল বলে, সেই গহন বন আর গহন রইল না। বনের অন্ধকারে আলো আর আলো! সেই কাণ্ডকারখানা দেখে বনের সব জন্তুগুলো তো থ বনে গেল। যে যেদিকে পারল, দে পিটটান! আর টোরা কোনদিকে যাবে, কাকে ডাকবে, কিছুই ভেবে না-পেয়ে শুকনো গাছের, শুকনো পাতার দিকে হাঁদার মত চেয়ে রইল! পথ কোথায়, কোনদিকে যাবে, কিছুই বুঝতে পারছে না টোরা। সে যে সত্যিই অলক্ষুনে! অলক্ষুনে না হলে এমন হবে কেন? এমন যে পাখ-পাখালি, গাছ-গাছালিতে ভরা সুন্দর বন, তার দৃষ্টি লেগে সে-বন তবে ঝরবে কেন? এখন আর কিছু ভাবতে পারছে না টোরা। ফুলের চোখে জল তো পাওয়া দূরের কথা। এখন তো এ-বনের যেন মরুর দশা। যেদিকে চাও খাঁ খাঁ করছে!

ভারি দুঃখ লাগছে টোরার। সেই সোনার প্রদীপটি হাতে নিয়ে এখন সে এখানে একা! ডাকলেও কেউ সাড়া দেবে না। সাড়া দিলেও কেউ টোরাকে দেখতে পাবে না। খুঁজেও পাবে না।

কেঁদে ফেলল টোরা! শূন্য এই বনে ওর কান্না কেউ শুনতে পাচ্ছে না। কেউ জানছে না, কে কাঁদে, কেন কাঁদে। টোরা যেমন হাওয়ার সঙ্গে হাওয়ার মত অদৃশ্য, টোরার কান্নাও তেমনি হাওয়ার সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে ভেসে ভেসে ফিরে যাচ্ছে। ফিরে যায়, অনেক কাছে আবার অনেক দূরে। ধীরে ধীরে পা ফেলে টোরা। ধীরে ধীরে সে কান্নার সুর যেন একটি মিষ্টি গানের ঢেউয়ের মত উছলে পড়ে! অনেক ব্যথা, অনেক সুরের মুক্তা হয়ে হাহাকার করে ছড়িয়ে পড়ছিল। এ কি কান্না? না, কান্নার গান? কে বলবে, টোরা কাঁদছিল, না কান্নার ছলে গাইছিল এই শূন্য বনে একা?

এই শূন্য বনে একটু আগে কত না প্রজাপতি রঙিন

পাখনা ছড়িয়ে নেচে বেড়িয়েছে। কত না মৌমাছি ফুলের কানে গুনগুনিয়ে গান শুনিয়েছে। গাছের ডালে বহুরূপী কত রূপের বাহার দেখিয়ে ছুটে বেড়িয়েছে। হয়তো ছাপ-ছাপ চিতাবাঘ ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে বসে শিকার খুঁজেছে। কিম্বা লম্বা-লম্বা সাপ লতায়-পাতায় জড়িয়ে-মড়িয়ে অঘোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছে। কিন্তু এখন? সব শূন্য। এখন এই শূন্য বনে টোরার এ-কান্না কে শুনবে, শুধু ওই শূন্য আকাশ ছাড়া?

হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁত করে চমকে উঠল কেন টোরার? কাকে দেখলে টোরা? কে যায় তার চোখের সামনে দিয়ে? এ কী! এ যে বাদশা!

বাদশা? হ্যাঁ, সত্যিই তো! কিন্তু ওর এমন দশা কেন? কী হয়েছে তার? কেন গাধার মত গাড়ি টানছে? কার গাড়ি টানছে? ও কে বসে আছে গাড়ির ওপর।

গাড়িটার দুটো চাকা। মাথা ঢাকা। ঠিক যেন এক্কা-গাড়ি। গাড়ির সওয়ার একটা বুড়ি! দেখো, কেমন ঠ্যাং ছড়িয়ে আরাম করে বসে আছে বুড়িটা! লজ্জা নেই তো! একটা ছোট্ট ছেলে গাড়ি টানছে আর বুড়ি কিনা তার পিঠে চাবুক মেরে হ্যাট-হ্যাট করছে! এ কী রে! বাদশাকে কি সত্যিই গাধা পেয়েছে! বেচারা বাদশা পারবে কেন ওই একটা ইয়া পেল্লাই গাড়ি টানতে! পারছে না বলেই হোঁচট খাচ্ছে। হোঁচট খেলেই, বুড়িটা চাবুক হাঁকড়াচ্ছে! আর বাদশা "বাবা গো" বলে কেঁদে উঠছে!

যে টোরা এতক্ষণ কাঁদছিল, বাদশাকে দেখে তার কান্না হারিয়ে গেল। কী করবে এখন টোরা? কাকে ডাকবে? বাদশা তার এত কাছে থেকেও কত দূরে! এ দুর্দশা থেকে সে কেমন করে বাঁচাবে বাদশাকে? কী দোষ করেছে বাদশা যে একটা বুড়ি নিষ্ঠুরের মত তার কাঁধে গাড়ি জুতে আরাম করে হাওয়া খাচ্ছে! এ কেমন করে হয়? জন্তু-মার্কা মানুষগুলোর হাত থেকে তবে কি শেষে বাদশা এই বুড়িটার হাতে পড়েছে।

থাকতে পারল না টোরা। এখন আর বাদশার সামনে যেতে টোরার ভয় নেই। টোরা জানে এখন তো আর বাদশা তার মুখখানা দেখতে পাচ্ছে না, যে দেখলেই জন্তু হয়ে যাবে! কিন্তু টোরাই বা বলবে কী। ও তো বলতে পারবে না যে, অসাবধানী হয়ে সে দেবতার প্রদীপ নিভিয়ে ফেলেছে বলেই আজ সে অদৃশ্য! এ-কথা বললে যে ভীষণ কষ্ট পাবে বাদশা। তবে?

"আ—!" আর্তনাদ করে উঠল বাদশা। ওর পিঠে বুড়িটা আবার চাবুক মেরেছে। কিন্তু ও যে পারছে না! পারছে না গাড়ি টানতে!

টোরা দাঁড়াল না। প্রদীপটা হাতে নিয়েই ছুটে গেল। ছুটে গেল গাড়িটার পেছনে। আহা! ভায়ের কষ্ট সে যে আর দেখতে পারছে না! টোরা পেছন থেকেই তার অদৃশ্য হাত দিয়ে ঠেলা দিল গাড়িটায়। গাড়ির গায়ে টোরার হাতের ধাক্কা লাগতেই গাড়ি হুড়মুড়িয়ে এগিয়ে গেল। বাদশার ছুটতে আর কষ্ট নেই। বাদশা ছুটল আর বুড়িটা দাঁত ছরকুট্টে হেসে উঠল।

বাদশা নিজেই অবাক হয়ে গেল! বেড়ে মজা তো! এতক্ষণ যে-গাড়ি টানতে তার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল, সেই গাড়ি হঠাৎ এত হালকা হয়ে গেল কী করে? কেউ ঠেলছে নাকি পেছন থেকে? কই, না। সামনে-পিছে ডাইনে-বাঁয়ে কই, কেউ নেই তো!

আরও জোরে ঠেলল টোরা। আরও জোরে ছুটল বাদশা। ওর পিঠে চাবুক মেরে বুড়িটা আর হ্যাট হ্যাট করে তেড়ে উঠল না। উল্টে সেই দাঁত-খিঁচুনি বুড়ি, নাক-খিঁচুনি দিয়ে গাড়ির ওপর সটান দাঁড়িয়ে উঠে নৃত্য শুরু করে দিল! ব্যস! এবার উল্টো বিপত্তি! বাদশা পারবে কেন টাল সামলাতে? বাদশা তো বাদশা! অমন একশোটা বাদশা এলেও কি অমন বিচ্ছিরি বুড়িকে সামাল দিতে পারে? বাদশার হাত ফসকে গাড়ি দুমফট! আর বুড়িও পা হড়কে চিত-ফট! বুদ্ধি দেখো বুড়ির! ওই একটা দুধের ছেলের ঘাড়ে গাড়ি জুতে তুই গাড়ির ওপর নাচানাচি করছিস কোন আক্কেলে! তোর দয়া-মায়া নেই, না বুদ্ধির মাথা খেয়ে বসে আছিস? ছিঃ, ছিঃ!

তুমি তো বলছ, ছিঃ, ছিঃ! এদিকে ডিগবাজি খেয়ে বুড়ির যে কোমর গেল! বুড়ির এমন লাগা লেগেছে না, মাটিতে চিৎপাত হয়ে চিৎকার শুরু করে দিলে বুড়ি, "উরি বাবা রে!"

বাদশা একদম থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কী যে করবে, কিছু ঠাওরই করতে পারল না। কিন্তু বুড়ি, সে তো আর ছেড়ে দেবার পাত্তর নয়! মাটি খামচে লেংচে লেংচে উঠে দাঁড়ালে। রক্তচক্ষু ড্যাবড়েবিয়ে, খপাত করে বাদশার কানটা ধরে ফেললে। তারপর এমন টান দিলে, এই দেখো, বাদশার কান বুঝি ছিঁড়ে যায়! সঙ্গে সঙ্গে চিল্লিয়ে উঠেছে, "পাজি, হতচ্ছাড়া! তোর এত বড় বুকের পাটা যে তুই আমায় ফেলে দিয়ে মারতে চাস! তোর আমি মুন্ডুপাত করব।" বলেই এমন প্যাঁ—অ্যাঁ করে কেঁদে উঠল যে, দেখেশুনে বাদশা ভ্যাবাচ্যাকা। যাচ্চলে! এত বড় বুড়িটা কেমন কাঁদছে দেখ! কাঁদবে না? কোমরে কি কম লাগাটা লেগেছে! কেঁদে একেবারে পাড়া মাথায় করে চেঁচাতে লাগল, "ওগো, তোমরা কে কোথায় আছ গো, এই শয়তান ছেলেটা আমার কোমর ভেঙে দিল গো!"

অবিশ্যি এখানে আর আসবে কে? কেউ তো আর কাছে-পিঠে নেই! যতই চেঁচাও, ফোক্কা! শেষে বুড়িটা রেগে-মেগে বেমক্কা এক চড় কষিয়ে দিলে বাদশার গালে। তারপর কানটা ধরে হিড়হিড় টানতে শুরু করে দিলে!

থাকতে পারল না টোরা। বুড়িটার তো আস্পর্ধা কম নয়! তার ভায়ের গায়ে হাত তোলা! ছুটে গেল টোরা একেবারে বুড়ির পেছনে। পেছন থেকে বুড়ির নুটি বাঁধা ঝুঁটিটা হ্যাঁচকা মেরে নুড়োনুড়ি করে দিলে। বুড়ি হাউ-মাউ করে চেঁচিয়ে উঠে, পেছন ফিরে দেখে ভোঁ-ভাঁ! কেউ তো নেই! বুড়ি একেবারে থ! যাচ্চলে! কে তার ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিল।

টোরা তো নেড়ে দিয়েই লুকিয়ে পড়েছে! সামনে থাকলেই বা কী! ওকে তো আর দেখতে পেত না। কিন্তু মুশকিল ওই যে, হাতে তার প্রদীপ! সেটা তো দেখে ফেলতে পারে!

বুড়ি পেছনে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভয় পেল, না রেগে গেল, তা জানি না, বাদশার দিকে তেড়ে গিয়ে বাদশাকেই গালপাড়া শুরু করে দিলে! বাদশা বেচারী কী যে হল, কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁদার মত দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বুড়ির গাল খেতে লাগল।

টোরা চুপি-চুপি আবার এসেছে বুড়ির পেছনে। এবার বুড়ির কোমরে দিয়েছে এক রামচিমটি। বুড়ি চিমটি খেয়ে, হাত-পা ছুঁড়ে গলা ফাটাল, "বাবা গো, মা গো।" বুড়ি যতই চিল্লাচ্ছে, টোরা ততই খামচে ধরছে!

টোরার ওই রামচিমটি বুড়ি কতক্ষণ সহ্য করবে?

শেষমেষ ঠ্যাং ছুড়ে লাফালাফি শুরু করে দিলে! তারপর থাক পড়ে তোর ঠেলাগাড়ি। বাদশাকে ঝপাং করে জাপটে ধরে মার ছুট! বাবা রে বাবা! ওই ল্যাকপ্যাকে-মার্কা বুড়িটার কী শক্তি দেখ। ভেবেছিলুম, বুঝি ফুঁ দিলে ফুস হয়ে যাবে। ও হরি! এখন দেখছি সে-গুড়ে বালি! বাদশাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে দৌড়ুচ্ছে দেখ, যেন একটা শ্যাওড়াগাছের ডাইনি!

বুড়িটা ছুটতে ছুটতে একটা আঁধার-আঁধার জায়গায় এসে দাঁড়াল। হাঁপাচ্ছে। পেছন ফিরে দেখলে! না, জন-মনুষ্যি নেই! আঁধার জায়গায় মস্ত ঝোপের আড়ালে একটা ঘুপচি-মত ঘর। বুড়ি চুপি চুপি ঘরের চাবি খুলে, বাদশার ঘাড়টা ধরে ঘরে সেঁদিয়ে দিলে। তারপর আর একবার ভাল করে বাইরের আঁদাড়-পাদাড়টা লক্ষ করে নিজেও ঘরে ঢুকে গেল। ভেতর থেকে ঘরের হুড়কো এঁটে দিলে! বুড়ি জানতেও পারল না, এদিকে টোরাও হাজির! সে-ও যে তার পেছনে-পেছনে ছুটে এসেছে, বুড়ি সে-কথা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি!

টোরা ছুটে এল ঠিকই, কিন্তু ঘরে আর ঢুকতে হল না ওকে! ও ছুটে আসার আগেই দোর বন্ধ! অবিশ্যি হুট করে ঘরে ঢোকাও তো যাবে না। ওর হাতে প্রদীপ! প্রদীপ নিয়েই তো যত মুশকিল! বুড়িটা একবার যদি দেখে ফেলে তো ব্যস! তখন কি আর ছেড়ে কথা বলবে?

সত্যিই ছেড়ে কথা বলেনি। বলেনি বাদশাকে। ঘরের মধ্যে তখন তুলকালাম শুরু হয়ে গেছে। কী চিৎকার আর দাঁত-খিঁচুনি! বাদশাকে ধরে এমন মার দিলে যে, বাদশা ককিয়ে উঠল! বাইরে থেকে টোরার তো আর শুনতে কিছু বাকি থাকছে না। ছটফটিয়ে উঠল টোরার মন। এখন সে কী করবে? কেমন করে তার ভুইকে সে রক্ষা করবে?

ছুটে গেল টোরা দরজাটার কাছে। কান পাতলে! তারপর ওর ছোট্ট হাতে যত শক্তি ছিল সব শক্তি দিয়ে দরজায় ঠেলা দিলে। দরজা কেঁপে উঠল, খট-খট-খট!

নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছিল বুড়িটা। নইলে চেঁচাতে চেঁচাতে হঠাৎ অমন থামবে কেন! একদম চুপচাপ! বুড়ির গলায় আর টুঁ শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছে না টোরা! কীরে বাবা! বুড়ি ভড়কে গেল নাকি!

আবার দরজায় ঠেলা দিলে টোরা।

বুড়ি গলায় খেঁকারি মেরে ক্যারকেরিয়ে সাড়া দিলে "দরজায় ঠেলা মারে কে র‍্যা?"

টোরা সাড়া না দিয়ে আবার ঠেলা দিলে।

বুড়ি দরজার হুড়কো খুললে।

শুনতে পেয়েছিল টোরা হুড়কো খোলার শব্দটা। তাই আবার চটপট লুকিয়ে পড়েছে!

দরজা খুলে, একটুখানি ফাঁক করে উঁকি মারলে বুড়ি। বাইরে তো কেউ নেই। কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না। দরজা আর-একটু ফাঁক করে গলা বাড়াল! কই, জন-মানুষের তো চিহ্ন নেই! তাহলে বোধ হয় বাতাসে ঠেলা মেরেছে! তবু নিশ্চিন্ত হবার জন্যে বাইরে পা বাড়িয়ে রা কাড়লে, "দরজা ঠেললি কে? কাকে চাই?"

এখনও কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই।

বুড়ি এবার দরজা ডিঙিয়ে একেবারে বাইরে বেরিয়ে এসেছে! দেখো, দেখো, বুড়ির চোখ দুটো দেখো! কী সাংঘাতিক দেখতে! দেখলেই মনে হয়, কুচুটেপনায় ভর্তি একেবারে! আড়চোখে টেরিয়ে-টেরিয়ে ইদিক-ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ বলব কী, টোরার হাতের সোনার প্রদীপটার দিকে তার নজর পড়ে গেছে! এই রে! এ কী করল টোরা। আবার অসাবধানীর মত কাজ করে বসল!

বুড়ি প্রথমটা বুঝতেই পারেনি! বুঝতে পারেনি ওটা কী! তারপর কাছে আসতেই সোনা যখন ঝকমক করে চোখের সামনে ঠিকরে উঠল, তখন কি আর বুড়িকে বলে দিতে হবে এটা কী! বুড়ির তো চক্ষু চড়কগাছ! বলে, সোনার প্রদীপ হাওয়ায় ভাসছে! এ-কেমনতর আজবকাণ্ড! বুড়ি তখন করল কী, হাত বাড়াল! এই সেরেছে! ধরে ফেলল না কী!

হুঁঃ! অত সোজা!

টোরার অবিশ্যি প্রথমটা বাদশার কান্না শুনে ভারি মন খারাপ লাগছিল। কিন্তু বুড়ি প্রদীপটা ধরবার জন্যে হাত বাড়াতেই আর দেখতে হয়! টোরা চটপট হাতটা সরিয়ে নিলে! বুড়ির হাতে ফোকক্স!

বুড়ি তো থ! ভাবলে এ পিদিম ভাগে দেখি!

এবার বুড়ি গুটি গুটি পা ফেলে এগিয়ে গেল। একেবারে প্রদীপটার সামনে। তারপর আঙুল দুটো শক্ত করলে। যেমন করে ফড়িং ধরে, তেমনি নিঃসাড়ে সামাল দিয়ে, আঙুল পাকিয়ে যেই ধরতে গেছে, অমনি ফুড়ুত!

এবার বুড়ির চোখ দুটো লোভে জ্বলজ্বল করে উঠল। চোখের তারায় সোনার ছায়া! বুড়ি এবার মরীয়া! কাপড়ের আঁচলটা কোমরে বেশ করে জড়ালে। মাথার চুলে নুটি বেঁধে শক্ত করে প্যাঁচ কষল। তারপর ধাঁই ধপাধপ শুরু করে দিলে।

প্রদীপ এদিক যায়।

বুড়িও এদিক ছোটে।

প্রদীপ ওপরে ওঠে।

বুড়িও লেংচি মেরে হাত তোলে।

প্রদীপ মাটিতে গড়ায়।

বুড়িও গড়াগড়ি খায়।

শেষে ঘেমে-নেয়ে, কেশে-হেঁচে, বুড়ির বুকের ধুকধুকি এই বুঝি ঠান্ডা মেরে যায়!

না, তা হল না। উল্টে, টোরার হাত থেকেই যে প্রদীপটা ফসকে গেল! ফসকে যেতেই মাটিতে পড়েছে। আর দেখতে! বুড়ি একেবারে প্রদীপটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মারলে ছোঁ! ব্যস! ওই দেখো, প্রদীপ সটান বুড়ির হাতের মুঠোর মধ্যে।

ঈশ! এ কী হল! প্রদীপটাও টোরার হাত ফসকে গেল! সত্যিই! এখন তোমায় বলতেই হবে মেয়েটা অসাবধানী! মেয়েটা বোকা!

না, মোটেই না! এখন টোরাকে যে বলবে বোকা, আমি বলব সে-ই বোকা! আমি যদি বলি, প্রদীপটা টোরা ইচ্ছে করে বুড়িকে দিয়েছে, তাহলে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে না!

ইচ্ছে করেই তো! এই দেখ না এবার মজাটা! প্রদীপটা যেই না হাতে পাওয়া, অমনি সেই সুঁটকি বুড়ির তখন সে কী ধেই-ধেই নাচুনি! নাচুক বুড়ি। যত পারে নাচুক। এদিকে টোরা যে তার ঘরে ঢুকে পড়েছে, সে তো আর দেখতে পায়নি! সাধ করে কি আর প্রদীপটা হাতছাড়া করেছে টোরা!

নাচ শেষ করে হাঁপাতে হাঁপাতে বুড়ি যখন ঘরে ঢুকল, তখন টোরা বাদশার সামনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। টোরাকে যেমন বুড়িও দেখতে পাচ্ছে না, বাদশাও দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পাচ্ছে না দিদি তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে!

বুড়ি ঘরে ঢুকেই আঁচলে বাঁধা চাবি দিয়ে, কাঠের সিন্দুক খুলে প্রদীপটা ঝটপট লুকিয়ে ফেললে। আর মনে মনে ভাবলে, অ্যাদ্দিনে বোধহয় কপাল খুলল!

বাদশা আর কাঁদছে না। বুড়িকে দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাদশা। বুড়ি এক বাটি তেল আনলে। তারপর বাদশার কাছে এসে ওর গালে ঠাস করে চড় মেরে কড়কে উঠে বললে, "দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে ন্যাকামি হচ্ছে! এই নে, এই তেল দিয়ে আমার কোমর মালিশ কর! হতচ্ছাড়া ছেলে আমায় এমন ফেলে দিয়েছে যে, কোমরের যন্ত্রণায় আমি মরতে বসেছি!" বলে আবার বাদশার গালে একটা ঠোনা মেরে মাদুরের ওপর শুয়ে পড়ল। বাদশা তেল দিয়ে বুড়ির কোমর মালিশ করতে বসল। এ-কম্ম কি বাদশা পারে? না, করেছে কোনদিন? সে-কথা বললে কে শুনছে? না পারলেও উপায় নেই। করতেই হবে!

বাদশা পারছে না। ওর তো আর গায়ে তেমন শক্তি নেই যে খুব জোরে দলাই-মলাই করবে! বাদশা যতই পারছে না, বুড়ি ততই খ্যান খ্যান করে খেঁকিয়ে উঠছে!

টোরা এতক্ষণ চুপচাপ দেখছিল। তারপর চুপিসাড়ে বুড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল! ভাবল হয়তো কিছু। ওর মাথায় কী বুদ্ধি খেলছে, ও ছাড়া আর কেউ জানে না। আর তাই বুড়ি যখন আবার বাদশাকে খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল, টোরা করল কী, দুহাত দিয়ে বুড়ির কোমরটা তেড়েমেড়ে টিপতে লাগল। বাদশা জানতেও পারল না, পাশে তার দিদি। তার সঙ্গে দিদিও বুড়ির কোমরে তেল মালিশ করছে।

কী খুশি বুড়িটা! আরামে একেবারে চক্ষু স্বর্গে তুলে বললে, "এই তো ভাল ছেলের কাজ! ভাল করে আমার সেবা-যত্ন কর, খেতে দেব, পরতে দেব। তবে হ্যাঁ, ফাঁকি দিয়েছ কি মুণ্ডুপাত করব।"

টোরা শুনছে বুড়ির কথা।

বুড়ি আবার নিজের মনেই বিড়বিড় করতে শুরু করলে, "এমন উদ্ভুট্টি কান্ড কখনও দেখিনি! আমার তিন-কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, কিন্তু পিলসুজের পিদিম যে এমন ভড়াক মেরে আকাশে ওড়ে, এই পেত্থম দেখলুম! উঃ! একটা আস্ত সোনার পিদিম! এখন আমি কী করব, বেচব না রাখব? না, বেচব না, রাখব! পয়মন্ত প্রদীপ যখন ধরা দিয়েছে, তখন কে জানে, ভাগ্যে আমার আরও কী আছে!"

বুড়ি এবার আরামে ঢুলুঢুলু হল! বললে, "বাঃ, ছেলেটা তো বেশ দলাই-মলাই করতে পারে!"

টোরা মনে মনে ভাবল, "তোমার আরাম করাচ্ছি, দাঁড়াও।"

"কিন্তু তখন আমার কোমরে চিমটি কাটল কে?" বুড়ি চিন্তা করতে বসল। কাছে-পিঠে কেউ ছিল না, অথচ—! কী জানি বাবা! ভূত-পেরেত নয়তো! হাওয়া, হাওয়া, সবই হাওয়া! তবে হ্যাঁ, তুমি ভূতই হও আর পেরেতই হও, একবার যদি বাছাধন ধরতে পারতুম, তবে দেখিয়ে দিতুম, চিমটি কাটা কাকে বলে। একেবারে পিণ্ডি চটকিয়ে ছাড়তুম!"

টোরা আর থাকতে পারল না। হঠাৎ বুড়ির কোমরে এমন কাতুকুতু দিয়ে দিলে যে, বুড়ি একেবারে হাসতে-হাসতে যায় আর কী! বুড়ি খিলখিলিয়ে হেসে উঠল, "এই ছাড়, ছাড়।"

টোরা ছেড়ে দিল। বুড়ির হাসি থামল। দেখেশুনে বাদশা তো একদম হাঁদা হয়ে গেছে! বাদশা ভাবল, তাই তো,

হলটা কী! বুড়ি এমন পাগলের মত হাসে কেন?

কাতুকুতুর রেশ জুড়াতে তো আর সময় লাগল না! এবার দেখো, বুড়ির মুখের ছিরি! রেগে কাঁই! রাগটা দপ করে জ্বলে উঠতেই বুড়ি খপ করে বাদশার চুলের মুঠি ধরলে। তেড়েমেড়ে বলে উঠল, "ছেলের নামে ঠিকানা নেই, আমার সঙ্গে ফুক্কুড়ি! আমায় তুই কাতুকুতু দিস! হতচ্ছাড়া, আমি তোর ঠাট্টার যুগ্যি!" বলে চুলের মুঠি ধরে এমন নাড়ানাড়ি করে দিলে যে, বাদশার প্রাণ যেন গেল-গেল! তারপর বুড়ি বাদশার চুল ছেড়ে খেঁকিয়ে উঠে বললে, "কুয়ো থেকে জল তোল, আমি চান করব।"

বাবা! কুয়োটা কী গভীর! বালতি ফেলে, ওই নীচ থেকে বাদশা কেমন করে জল তুলবে! এ-সব কাজ কোনদিন করেছে নাকি বাদশা।

বাদশা এতক্ষণে কথা বললে, "পাতকুয়োর জল অনেক নীচে।"

"নীচে থাকবে না তো কি তোমার মাথার ওপর থাকবে?" বুড়ি তেমনি তিরিক্ষি হয়েই বললে।

"অত নিচু থেকে জল তুলতে আমি পারব না।"

আর দেখতে! বুড়ি গলার সুর পঞ্চমে তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "আমার মুখের ওপর চোপা! হাড়বজ্জাত ছেলে! পারব না! তোল জল!"

বাদশা তখন কী করে, অগত্যা কুয়োর কাছে এসে, দড়ি বাঁধা বালতিটা সড়াত করে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিলে। বালতি জলের মধ্যে গোঁত্তা খেয়ে ভর্তি হয়ে গেল। ভর্তি তো হল, কিন্তু আর যে টেনে তুলতে পারে না বাদশা!

কিন্তু বাদশা তো জানে না, তার দিদি তার পাশেই দাঁড়িয়ে! বাদশা বালতি-বাঁধা দড়িটা টানতে টানতে যখন হিমসিম, তখন হঠাৎ বাদশার মনে হল, দড়ি টানতে এখন

তো বেশ হালকা লাগছে! বালতি যেন আপনা থেকে উঠে আসছে। কোন কষ্ট হচ্ছে না তো তার! অবাক হয়ে গেল বাদশা!

অবাক হবার তো কিছু নেই! বাদশার দিদিও যে টেনে তুলছে বাদশার সঙ্গে দড়িতে হাত দিয়ে এ তো আর সে জানতে পারছে না। বাদশা কেমন সটান জল তুলে, বালতি নিয়ে বুড়ির সামনে এসে দাঁড়াল! বুড়ি ততক্ষণে কুয়োতলায় হাজির। মাথায় তেল চাপড়াতে-চাপড়াতে বললে, "ঢাল।"

হুশ! বাদশা বুড়ির মাথায় জল ঢেলে দিল।

বার বার তিনবার। তিন বালতি জল ঢেলে, যখন চার বালতি ঢালবে, তখন টোরার মাথায় একটা দুষ্টু মতলব জুড়ে বসল। টোরা করল কী, কুয়োর জলে বালতিটা ডুবিয়ে, একেবারে যখন খুব গভীরে নেমে গেল বালতিটা, তখন টেনে তুললে। কুয়োর খুব গভীরে তো পেঁকো জল! সেই পেঁকো-জলের জলটুকু ফেলে, পাঁক ভর্তি বালতিটা ওপরে উঠে এল। অবিশ্যি কষ্ট হল খুব! টেনে তুলেই হুশ! একেবারে বুড়ির মাথায়! ঈশ! এ যে সেই দোলখেলার ছ্যাররা-ব্যাররা! বুড়ির মাথায় পাঁক, মুখে পাঁক! পিঠে পাঁক, পেটে পাঁক! বুড়ির সব্বশরীরে পাঁকে পাঁকে পাঁকাক্কার! ম্যাগো মা! কী যাচ্ছেতাই গন্ধ!

বুড়ি তো গন্ধের চোটে নাকে আঙুল টিপে এই বমি করে তো সেই বমি করে। বুড়ি ওয়াক থু ওয়াক থু করতে করতে পাড়া মাত করে চেঁচিয়ে উঠল, "হতচ্ছাড়া ছেলে! আমার গায়ে তুই পাঁক ঢাললি! আয়, তোকে কুয়োয় পুঁতি।" বলে বুড়ি যেই বাদশাকে ধরতে যাবে, অমনি টোরা করেছে কী, পেছন থেকে বুড়ির ঠ্যাং ধরে দিয়েছে টেনে! বুড়ি সড়াত! একেই তো পাতকোতলায় শ্যাওলা। তার ওপর কুয়োর পাঁক! আর দেখতে! বুড়ি ডিগবাজি খেয়ে সেই জলে-পাঁকে জ্যান্ত সাপের মত কিলবিল করে হাত পা ছোড়াছুড়ি লাগিয়ে দিলে! ভয়ে বাদশা কেঁদে উঠল, "আমি করিনি।"

কিন্তু কে শুনছে সে-কথা! বলি, বুড়িটা কি চোখের মাথা খেয়ে বসে আছে! দেখতে পাচ্ছে না বাদশা তার সামনে দাঁড়িয়ে!

সে আর কে দেখে! বুড়ি কোঁকাতে কোঁকাতে কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে বাদশার ঘাড়ে-পিঠে দে দমাদ্দম! বাদশা কেঁদে উঠল। কাঁদলে কী হবে! বুড়ি খ্যানখ্যান গলায় তেড়ে উঠল, "বজ্জাত ছেলে, শয়তানি করার জায়গা পাসনি! আয় তোকে যমের ঘরে দিয়ে আসি।" বলে বাদশার কানটা ধরে হিড়হিড় করে টানতে লাগল। টানতে টানতে একটা অন্ধকার, স্যাঁত-সেঁতে ঘরে বাদশাকে ঠেলেমেলে ঢুকিয়ে দিয়ে, ঘরের দোরে শেকল তুলে দিল। বললে, "থাক এইখানে। পড়ে পড়ে যত পারিস কাঁদ। যমে এসে নিয়ে গেলে তবে ঘরের দোর খুলব।" বলে বুড়ির গজগজানি আর গাল-পাড়ানির সে কী ধুম!

৪

অন্ধকার ঘরে, এক কোণে বাদশা লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে গজরাচ্ছে, "অ্যাঁ-অ্যাঁ। আমায় শুধু-মুধু মারতে এসেছে। নিজে পা পিছলে পড়ে গেল, আবার কথা বলছে! গায়ের জোর দেখাবার জায়গা পায়নি। দিদি যদি থাকত, তোমার জোর দেখান ঘুচিয়ে দিত।"

তা সে-কথা তো আর বুড়ি শুনতে পাচ্ছে না। রেগে ফোঁস-ফোঁসিয়ে বুড়ি তড়িঘড়ি ক'বালতি জল ঢেলে, গায়ে ল্যাপটানো পাঁক ধুয়ে ফেললে। তারপর চিঁড়ে-মুড়কির ফলার চটকে গপ্‌গপ্ গিলতে বসল। গেলা-টেলা হলে, আবার দেরাজের চাবি খুললে। চুপি চুপি প্রদীপটা বার করে পাঁশুটে চোখ দুটো ড্যাবডেবিয়ে দেখতে লাগল। কী লোভ দেখো, বুড়ির চোখ দুটোতে! দেখতে দেখতে কেমন ফিক করে হেসে উঠল! হাসতে হাসতে নিজের মনেই বললে, "বলি তোর তো ডানা নেই, ঠ্যাং নেই। তা কেমন করে ফুরফুরিয়ে উড়ছিলি বাছা? দেখিস আবার যেন উড়ে পালাস না!" বলে প্রদীপ-টাকে আদর করার সে কী ছিরি! আদর করে নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে চুমু খেলে, "সোনা আমার, মানিক আমার।" আহা! কী রোশনাই ঝকঝকাচ্ছে প্রদীপের গা বেয়ে! মুছে-টুছে, দেরাজের মধ্যে যত্ন করে রেখে দিয়ে দেরাজের চাবি এঁটে রাখলে। তারপর নিজের কাপড়ের খুঁটে সেই চাবির তাড়া বেশ করে বেঁধে, চাটাই বিছিয়ে, একটা তেল চিটচিটে বালিশ মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ল। আঃ! তখন পাতকো-তলায় পড়ে গিয়ে কোমরে যা লেগেছে না! ব্যথাটা এখনও টনটনাচ্ছে। বুড়ো হাড় তো! বুড়ি টনটনে ব্যথা নিয়ে একবার এ-পাশ একবার ও-পাশ করতে করতে ভাবতে লাগল সোনার প্রদীপটার কথা। তাই তো, এখন সে সোনার প্রদীপটা নিয়ে কী করবে! বাজারে বেচে আসবে, না প্রদীপ ভেঙে একটা বিছে হার গড়াবে! হুঃ! খেপেছ! এ প্রদীপ কখনও ভাঙে, না বেচে! এ বাবা কপালের ধন। কপাল না ফিরলে এমন ধারা ঘটনা ঘটে কখনও! এ সব ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছে। তারপরই বুড়ি চোখ দুটো কপালে তুলে বললে, "আহা ঠাকুর, তুমি বাঁচালেই আমি বাঁচি।" বলে, কেঠো-কেঠো হাত দুটো ঠক করে কপালে ঠেকিয়ে ঠাকুরকে নমস্কার করলে।

হঠাৎ বুড়ির মনে হল, আচ্ছা আমি প্রদীপটা নিয়ে পাঁচ-জনকে ভেলকি দেখাতে পারি! আরে বাবা, এ কী শুধু প্রদীপ! এ যেন সেই ডানা কাটা উড়ুক্কু পাখি। হাওয়ায় ছেড়ে দাও, ফুরফুর করে উড়তে শুরু করে দেবে। ওঃ সে যা হয় না! যে দেখবে তার চক্ষু চড়ক গাছ! ধরো, হাটের লোক দেখল। তারপর মনে করো না, মাঠের লোক দেখল। শহর-গঞ্জের লোক দেখল। তারপর মনে করো, আমার খুব নাম-ডাক হল। পয়সা-কড়ি হল। ধরো, এই ভাঙা বাড়িটা মস্ত বাড়ি হয়ে গেল। অনেক ঝি-চাকর হল। হাতি-ঘোড়া হল। আরি-ব্বাস! তখন আমায় দেখে কে! মখমলের গদির ওপর ঠ্যাং ছড়িয়ে গড়াগড়ি খাব আর হাই তুলব। তখন যদি রাজার ব্যাটা এসেও আমার পায়ে ধরে সাধাসাধি করে, বলে, "ঠাকমা, ঠাকমা, প্রদীপটা একবার দেখাও" ভেবেছ আমি গলে যাব? উঁহু! সেটি হচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, রাজা যদি নিজে এসে কান্না-কাটি করে, তখন না-হয় দেখা যাবে! কিন্তু তখন কি আমি ছেড়ে কথা বলব! কেন ছাড়তে যাব! বলো, আমার ক্ষেমতা রাজার চেয়ে কম কিসে? রাজা, রাজবাড়িতে রাজা! আর আমি? আমার আছে সোনার পিদিম। ডানা নেই, ঠ্যাং নেই, অথচ হাওয়ায় উড়ছে! এমন ধন রাজার আছে! আর দেখতে চাইলেই কি আমি রাজাকে দেখাচ্ছি! আগে রফা হোক। রাজা যদি বলে অর্ধেক রাজত্ব দেব? ফুস, ওতে টলব আমি? তারপর যদি বলে, অর্ধেক রাজকোষ দেব? নিতে বয়ে গেছে আমার! একটুও নড়ছি না। যদি বলে, হাতি দেব, ঘোড়া দেব, ময়ূরপঙ্ক্ষী নাও দেব? আমি সঙ্গে-সঙ্গে হেসে উঠব। তখন যদি রাজা রেগেমেগে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বলে ওঠে, তবে তোমার কী চাই? তখন আমি বলতে ছাড়ব, আমার গোটা রাজত্ব চাই। তারপর রাজত্বটা আমার হাতে তুলে দিলে, আমি ফিকফিক করে হাসব আর বলব, সবই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছে! তখন কি আর কোমরের এই ব্যথা মালিশ করার জন্যে লোক খুঁজতে হবে? তখন তো খোদ রাজবাড়ির রানীই আমার খাসমহলের দাসী। দাসী যখন পায়ের কাছে নত হয়ে বলবে,

মাসী, মাসী, তোমার জন্যে দাওয়াই এনেছি কাসির, তখন আমি গম্ভীর গলায় বলব, কোথাকার দাসী রে তুই? কে বললে আমার কাসি! তখন দাসী নিশ্চয়ই ঠকঠক করে কাঁপবে ভয়ে। কাঁপতে কাঁপতে তখন দাসী আবার জিগ্যেস করবে, মাতা, মাতা, তোমার ধরেছে বোধ হয় মাথা? তখন আমি ধমকে উঠে বলব, তুই একটা যা-তা। দেখতে পাচ্ছিস না, আমার কোমরে ব্যথা? মালিশ কর। তখন আমি মখমল বিছানো সোনার পালঙ্কে মটকা মেরে পড়ে থাকব, আর দাসী আমার সেবা করবে! ওঃ! সে কী আরাম! বলে যেই না বুড়ি আনন্দে হাত-পা ছুড়ে তড়াং করে উঠে বসতে গেছে, ব্যস! বুড়ির কোমরে লেগেছে হ্যাঁচকা! উঁহু-হু-হু! বুড়ি যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে উঠল। তারপর চাটাইয়ের ওপর কাতরাতে-কাতরাতে আবার বাদশাকে গাল পাড়তে লাগল।

কিন্তু বাদশা? ভাগ্য মন্দ না হলে ও কখনও এই বুড়ির পাল্লায় পড়ে! সেই যে ঢলঢলে প্যান্ট-পরা জন্তুমুখো মানুষ-গুলো, তাকে কি কম ভুগিয়েছে! কী হেনস্তাটাই না গেছে বাদশার! তাদের খপ্পর থেকে বাঁচতে গিয়েই তো আজ এই বিপদ। দোষের মধ্যে কী, না বাদশা না-বলে বুড়ির ঘরে ঢুকে লুকিয়ে পড়েছিল। তাই বলে বুড়িটা তাকে একেবারে চোর ঠাওরাবে! অবিশ্যি এ-কথা সত্যি, বাদশা বুড়িকে জিগ্যেস করে তার ঘরে ঢোকেনি। ঠিক আছে, মানলুম বাদশার দোষ। কিন্তু তাকে চোর ঠাওরাবার আগে, জিগ্যেস তো করবি, কী হয়েছে তার। ভাল রে ভাল, সে সব জিগ্যেস করা নেই, উল্টে কোন আক্কেলে বুড়ি বাদশার ঘাড়ে জোয়াল চড়িয়ে গাড়ি টানায়! তা বলি, লাজ-লজ্জা বলে তো একটা কথা আছে। না কি বুদ্ধি-সুদ্ধিও লোপাট হয়ে গেছে বুড়ির মগজ থেকে! একেই বলে মরণদশা!

বলবেই তো! তিন কুলে তো বুড়ির কেউ নেই। থাকার মধ্যে এই ভাঙা-ফুটো বাড়িটা আর ছ্যারছ্যারে গাড়িটা। তাও বা কী। এতদিন তো গাড়িটা মুখ থুবড়ে পড়েই ছিল। বুড়ির কাঁখে যেদিন বাতের ব্যথা ধরল, সেদিন থেকেই চিন্তে। সেদিন থেকেই উনি খোয়াব দেখছেন। আর দেখতে-দেখতে ভাবছেন, আহা রে, একটা যদি ঘোড়া থাকত, তবে গাড়িতে জুতি। গাড়ি চেপে হাওয়া খাই, আরাম করি। মাটিতে পা ফেললে কাঁখে লাগে। ঠ্যাংয়ে ঠ্যাংয়ে ঠোক্কর লেগে ভারি বাজে! তা ঘোড়া ছেড়ে, একটা ভেড়াও কি বুড়ির ঘরের ধারে-কাছে আসে! জন্মাবার সময় মা বোধ হয় মুখে মধু দিতে ভুলে গেছল। নইলে মশায়, অমন মুখ হয়! কাছে-পিঠে কাউকে দেখেছে কি, ব্যস! আর রক্ষে নেই। মুখে যেন তুবড়ি ফুটছে। তাও যদি জানতুম বুড়ির ঘর ভর্তি টাকাকড়ি, গয়নাগাটি ঝনঝন করছে! তবেই হয়েছে। সে-কথাটি ভুলে যাও। টাকা থাকলেও কি বুড়িকে দেখে তুমি বুঝতে পারবে! কেননা তিনি পরেন ছেঁড়া কাপড়, তিনি খান চিঁড়ে-মুড়কি। আর তিনি শোবেন ছেঁড়া চাটাইয়ে। এক নম্বরের কঞ্জুস। আমায় বলতে হবে কেন, সে তো তোমরা নিজেরাই দেখলে। নিজে গাণ্ডে-পিণ্ডে গিলল, কিন্তু কই, বাদশাকে একটু দিল! বয়ে গেছে। নিজের নিয়েই বুড়ি মত্ত। নিজের হলেই হচ্ছে। নিজে খাব, নিজে পরব, নিজে গাড়ি চাপব। অন্যে মরলে বুড়ির কী!

আর বাদশা কী করে যে রক্ষে পেয়েছে সেই জন্তুমুখো মানুষগুলোর হাত থেকে, তা সে নিজেই জানে। ও তো ভেবেই পায় না, অত করে ডাকতেও দিদি কেন একবারও ফিরে তাকাল না। কী বলে দিদি তাকে এই বজ্জাত লোক-গুলোর হাতে ফেলে পালাল! কী কুচ্ছিত তাদের মুখগুলো! হিংসুটে চোখগুলো যেন লোভে জ্বলছে!

কিন্তু দিদি কী করবে! দিদির কী দোষ! বাদশা যে তার মুখ দেখলে জন্তু হয়ে যাবে, সে তো আর বাদশার জানার কথা নয়। না পালিয়ে কী করবে সে?

বাদশাও ছুটে পালিয়েছিল ওদের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে। কিন্তু ছুটলেই কি পার পাওয়া যায়! কেননা, ওরা বাদশার চেয়ে অনেক বড়। লম্বা-লম্বা পা ফেলে বাদশাকে ধরা এমন কী শক্ত কাজ! কিন্তু আসলে জায়গাটা তো ঝোপে-ঝাড়ে ভর্তি। বাদশা ওদের তাড়া খেয়ে এক ফাঁকে ঝুপ করে যে কোথায় লুকিয়ে পড়ল, কেউ দেখতে পেলে না। তন্ন তন্ন করে খুঁজে সেই জন্তুমুখো মানুষগুলো একেবারে হন্দ হয়ে গেল। তারপর সন্ধে যখন হয়ে গেল, তখন ভারি মুশকিল। এবার খুঁজবি কোথায় খোঁজ। অন্ধকারে শিকার ভো-কাট্টা! আর তখনই, বাঁচবার জন্যে, বুড়ির ঘরে হাজির হয়ে লুকিয়ে পড়েছিল বাদশা। কিন্তু ধরা পড়তে তো আর সময় লাগেনি। বয়েস হলে কী হবে! সেই অন্ধকার রাত্তিরেও বুড়ির চোখ জ্বলছে। কটা-কটা বেড়াল চোখ! দেখে ফেলেছে বুড়ি বাদশাকে! তেড়ে উঠল, "কে রে, ওখানে ঘাপটি মেরে বসে আছে?"

বাদশা প্রথমটা থতমত খেয়ে চমকে উঠেছিল। তারপর বুড়িকে দেখে ওর যেন ধড়ে প্রাণ এল। বললে, "আমাকে চোরে তাড়া করেছে!"

বুড়ি কোথায় ওই ছোট্ট ছেলেটার কথায় বিশ্বাস করে ওকে আশ্রয় দেবে, তা নয়, উল্টে বলে কি, "তোকে চোরে তাড়া করেছে, না তুই নিজে চোর?" বলে বুড়ি ক্যাঁক করে বাদশার ঘাড়টা খাবলে ধরলে।

বাদশা কাকুতি-মিনতি করে চেঁচিয়ে উঠল, "আমি চোর না, চোর না, আমি বাদশা।"

বুড়ি উত্তর দিল, "ঠিক কথা। যারা চোর তারাই বাদশা। চ, তোকে পুলিসে দেব।"

বাদশা বললে, "বিশ্বাস করো, আমি চোর নই।"

চোরকে কে বিশ্বাস করে? তাই বুড়ি বাদশার ঘাড়টা ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে জিগ্যেস করলে, "বল, কী চুরি করেছিস? দেখি তোর পকেট!"

বাদশা পকেট দেখাল। ট্যাঁক দেখাল। হাত দেখাল। কিচ্ছু পেল না বুড়ি। তাহলে আর চটবে না? তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বুড়ি বললে, "বল, কোথায় রেখেছিস চোরাই মাল।"

"চুরি করিনি।" উত্তর দিলে বাদশা।

"চ তবে!"

"কোথায়?"

"পুলিসে!"

বাদশা এবার ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। বুড়িকে জড়িয়ে ধরে বললে, "না, আমায় পুলিসে দিও না। পুলিস বড় মারে।"

বলতেই বুড়িটা খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বললে,

আহা মরি, ডালের বড়ি
শুক্তে দিয়ে খাই,
চোরের ব্যাটা ভয় পেয়েছে
হেসেই মরে যাই!

ছড়া-পড়া বুড়ির ফোকলা দাঁতের দিকে বাদশা হাঁ করে তাকিয়ে রইল ঠায় একদৃষ্টে। হঠাৎ যেন বাদশার মনে হল, বুড়ির চোখের ভেতর কী একটা মতলব কিলবিল করে ঘুরপাক খাচ্ছে।

হ্যাঁ, যা ভেবেছি ঠিক তাই। বুড়ি বাদশার মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল, "পুলিসে যদি না যেতে চাস, তো আমার

সেবা কর। ঘর-কন্নার কাজ করতে পারিস?"
বাদশা জিগ্যেস করলে, "কী কাজ?"
"বাসন মাজতে পারিস?"
বাদশা উত্তর দিলে, "কোনদিন মাজিনি।"
"বাটনা বাটতে?"
"কোনদিন বাটিনি।"
"ফল কুটতে?"
"কোনদিন কুটিনি।"
"জল তুলতে?"
"কোনদিন তুলিনি।"
"গাড়ি চালাতে?"

গাড়ির নাম শুনেই বাদশার মন চনমন করে উঠল। তখন ও বুড়ির ঘরের দোর-গোড়ায় একটা এক্কা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। ভাবল, বোধ হয়, সেই এক্কা গাড়িতে ঘোড়া জুতে ওকে হ্যাট হ্যাট করে চালাতে হবে। আর কিছু না হোক, পুলিসের ঘর করার চেয়ে সে অনেক ভাল। তাই আর দোনোমনো না করে সে ঝট করে বলে বসল, "হ্যাঁ, পারি।"

বললে তো পারি। কিন্তু বুঝতে তো পারেনি, ঘোড়া না আর কিছু। বুড়ি ঘোড়ার বদলে তার ঘাড়েই গাড়ি জুতে, তাকে দিয়েই গাড়ি ঠেলাবে। কী নিষ্ঠুর বুড়ি দেখ! ভাগ্যিস তখন টোরা দেখতে পেয়েছিল!

রাত এল। এতক্ষণ টোরার যে কী কষ্টে সময় কেটেছে, তা ভগবানই জানেন! এতক্ষণ টোরা বোবার মত চুপচাপ সব দেখেছে। দেখেছে, বুড়িটা নিষ্ঠুরের মত মারতে মারতে তার ভাইকে ঘরের মধ্যে ফেলে দিয়ে শেকল তুলে বন্দী করে রেখেছে! দেখেছে, বুড়িটা একলসেঁড়ের মত নিজে গান্ডে-পিন্ডে গিলেছে, কিন্তু ভাইকে এক ফোঁটা জলও দেয়নি। দেখে শুনে কী কষ্ট যে হয়েছে টোরার, তা সে-ই জানে। কিন্তু টোরা আর কী করবে! ওর আর কতটুকু ক্ষমতা বলো! ও যেন এই রাতটুকুর জন্যেই সময় গুনছিল। ভেবেছিল, এই রাতের অন্ধকারে ওর আদরের ভাইটির কাছে সে যাবে। সে তার চোখের জল মুছিয়ে দেবে। কিন্তু তার আগে তো প্রদীপটা আবার ফিরে পেতে হবে! মুশকিল, সেটা যে দেরাজে চাবি এঁটে লুকিয়ে রেখেছে বুড়ি! তা হলে?

এতক্ষণ বুড়ি চাবিটা আঁচলেই বেঁধে রেখেছিল। কিন্তু রাত্তিরে শোবার সময় সেই চাবি বুড়ি আঁচল থেকে খুলে বালিশের তলায়, মাথার নীচে লুকিয়ে রাখলে। সেটা স্পষ্ট দেখেছিল টোরা। দেখলে কী হবে! এখন সেটা পাবে কী করে টোরা?

টোরা জানে, যদিও বুড়ি তাকে দেখতে পাচ্ছে না, তবু হুট করে কিছু না করাই ভাল। বুড়ি যদি একবার টের পেয়ে যায়, তাহলে সব মতলব ভেস্তে যাবে। বুড়ি ঘুমিয়ে পড়ুক, তারপর যা করবার করবে টোরা।

অবিশ্যি ঘুম পাড়াবার জন্যে, বুড়িকে তো আর ঘুম-পাড়ানি গান শোনাতে হবে না। বিছানায় শুয়ে পড়ে একবার এপাশ, আর একবার ওপাশ করেই তিনি নিদ্রা গেলেন। বাবা! নাক ডাকানির বহর দেখ! যেন বর্ষার জলে কোলা ব্যাঙ গাল ফুলিয়ে ভ্যাঙাচ্ছে!

এই ভাল। টোরা চুপচাপ তার অদৃশ্য হাতটা বুড়ির বালিশের তলায় সেঁদিয়ে দিলে। বালিশটা নড়ে গেছে! এই রে! না, তেমন কিছু ভয় পাবার মত কান্ড ঘটল না। বুড়ি শুধু এপাশ থেকে ওপাশে ফিরে শুল। টোরা চটপট হাতটা সরিয়ে নিলে বালিশের তলা থেকে। একটু পরে বুড়ি আবার ঘুমে অচৈতন্য! এবার আর ব্যাঙের ভ্যাঙচানি নয়। বুড়ির নাকে ভিমরুলের ভ্যানভ্যানানি!

আবার হাত বাড়াল টোরা। আবার হাত সেঁদিয়ে দিল বালিশের নীচে। এবার খুব সামলে। বালিশ যেন না নড়ে! তা বললে কে শুনছে। বালিশ নড়বেই। নড়ুক। তবু রক্ষে, এবার বুড়ির নাক-ডাকানি থামেনি! একেবারে মড়ার মত নেতিয়ে পড়েছে বুড়ি। সেই তক্কে নিঃসাড়ে চাবিটা বালিশের নীচ থেকে বার করে আনল টোরা। কিছু বুঝতেই পারল না বুড়ি।

দেরাজ খুলে ফেলল টোরা। সামনেই প্রদীপ। হাত বাড়াতেই প্রদীপ ওর হাতের মুঠোয়।

প্রদীপ পেয়েই টোরা তাড়াতাড়ি আবার বন্ধ করে দিল দেরাজটা। যদি বুড়ির আচমকা ঘুম ভেঙে যায়! বলা তো যায় না! বন্ধ করেই চাবির গোছাটা বুড়ির পাশেই রেখে দিল। কারণ বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে বুড়ির ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে আর সাহস নেই টোরার। প্রদীপ নিয়ে টোরা ছুটল ভাইয়ের কাছে।

ঘরে বন্দী তার ভাই। দরজায় শিকল তোলা। এত উঁচু, ওখানে কেমন করে হাত যাবে টোরার? হাত যে যাবে না, টোরা সে আগেই জানে, তাই কেমন করে ও আবার ঘরের শিকল খুলবে, সে বুদ্ধি আগেই ঠাউরে রেখেছিল টোরা। তাই টোরা কুয়ো-তলায় ছুটল। বুড়ির চান করার বালতিটা খুঁজে বার করলে। নিয়ে এল সেটা ওই বন্ধ ঘরের সামনে। উপুড় করে তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল টোরা। হাত বাড়াল। টোরার হাতের নাগালে দরজার শিকল। শিকল খুলে ফেললে। ঘরে ঢুকে গেল টোরা।

ভাই তার ঘরের মেঝের ওপর পড়ে আছে। ঘুমুচ্ছে। নিশ্চুপ, নিঃসাড়। আহা! কী চেহারা হয়েছে বাদশার। মুখ-খানা শুকিয়ে যেন এইটুকু হয়ে গেছে।

টোরা থাকতে পারল না। এত অনাদর তো তার ভাইকে কেউ কোনদিন করে না। এত কষ্ট বাদশা কখনও সইতে পারে! তাই সে আলতো হাতের ছোঁয়া দিয়ে ভায়ের কপালের চুলগুলি সরিয়ে দিল। একটি চুমু খেল ওর কপালে। তারপর কান্নার জল ছলছলিয়ে উপচে গেল টোরার দু চোখে। ঠিক তখুনি বাদশার ঘুমন্ত চোখের তারায় কে যেন একটি একটি রঙিন ছবি এঁকে যায় স্বপ্নের রঙ ছড়িয়ে! কান্না নয়, বাদশার যেন মনে হচ্ছে, দিদি গান গাইছে। ঝরনার জলতরঙ্গের মত সেই গানের সুর ছড়িয়ে পড়ছে তার বুকের ভেতর। বাদশা দিদিকে দেখতে পাচ্ছে যেন। দেখতে পাচ্ছে, ওই আলোর আকাশের নীচে। ও দিদির সঙ্গে খেলছে। কিম্বা ছুটতে ছুটতে ফড়িং ধরছে। রেলগাড়িটা কু বাজিয়ে ছুটে আসে ইসটিশানের আস্তানায়। দিদি ছুটতে-ছুটতে টুপ করে লুকিয়ে পড়ে রেলের কামরায়। লুকিয়ে লুকিয়ে ডাক দেয় "বাদশা নামে টুকি।" খুঁজে পায় না বাদশা। বাদশা ডাকে, "দিদি, তুই কই?" অমনি গাড়ি ছেড়ে দিল, কু ঝিক ঝিক। দিদি গাড়ির জানলায় মুখ বাড়িয়ে, চোখ টিপলে "এই তো আমি। দুয়ো! বাদশা ধরতে পারে না!" বলে দিদি খল-খলিয়ে হেসে উঠল

বাদশা সত্যিই পারল না ধরতে। কিন্তু দিদির সেই হাসির সঙ্গে, কু ঝিক ঝিক রেলের দোলায় দুলতে দুলতে কত গান যেন একসঙ্গে বেজে ওঠে। দিদি সেই গানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে রেলগাড়ির জানলায় মুখ বাড়িয়ে চেয়ে থাকে বাদশার দিকে। রেলগাড়ি ছুটে যায়। কাছ থেকে দূরে যায়। আরও দূরে, অনেক দূরে। বাদশা হাতছানি দিয়ে ডাকে, "দিদি আয়।"

কিন্তু দিদির রেলগাড়ি তো ফিরবে না। ও শুধু ছুটবে। ছুটতে-ছুটতে ওই যে আকাশটা যেখানে মাটির সঙ্গে মিশেছে, ওখানে হারিয়ে যাবে। বাদশার চোখে সব ঝাপসা এখন। ওর স্বপন-ভরা ঘুমন্ত চোখ দুটি বেয়ে জল গড়ায় আর কাঁদে. "দিদি আয়, দিদি আয়।"

দিদি জানতেই পারল না বাদশার এই স্বপ্নের কথা। দিদি দেখল শুধু বাদশার দু চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। ওর কপাল থেকে হাত সরিয়ে নিল টোরা। তারপর হাত বাড়াল, বাদশার ওই ঘুমন্ত চোখ দুটির দিকে। না, সে দেবে না বাদশার চোখের জল মাটিতে পড়তে। ও মুছে দেবে। তারপর বাদশার কানে-কানে ফিসফিস করে বলবে, "বাদশা, তুই আর আমায় দেখতে পাবি না রে। অসাবধানে ঠাকুরের প্রদীপ নিভিয়ে ফেলে আমি যে অদৃশ্য হয়ে গেছি। আমায় আর কেউ-ই দেখতে পাবে না। আমি যতদিন না ফুলের কান্না খুঁজে পাব, যতদিন না সেই কান্নার জল দিয়ে প্রদীপ জ্বালতে পারব, ততদিন যে আমি অসহায়! আমার যে সব হারিয়ে গেছে বাদশা। কে জানে, আমি কোথায় সে-ফুল পাব, যে কাঁদে!"

হঠাৎ এত হাওয়া আসে কেন ঘরের দরজা ঠেলে? ঝড় উঠল নাকি বাইরে?

না তো। হাওয়া খালি বয়ে যায়। যেতে যেতে হাওয়া যেন কথা কয়।

চমকে উঠল টোরা। সত্যিই তো। হাওয়া যেন টোরার কানে ফিসফিসিয়ে বলে যায়, "ওই তো ফুল কাঁদছে, ওই তো ফুল কাঁদছে।"

টোরা আপন মনেই জিগ্যেস করে, "কই তো ফুল কাঁদছে?"

হাওয়া হু হু শব্দে বইতে-বইতে বললে, "চোখ থাকলেই দেখতে পাবে, দেখতে পাবে, দেখতে পাবে।"

টোরা তখন দু চোখ মেলে ঘরের অন্ধকারে ফুল খুঁজতে লাগল।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে টোরা। ওর চোখের তারা দুটি স্থির হয়ে চেয়ে রইল বাদশার চোখের দিকে।

অমনি হাওয়া খিলখিল, খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বললে, "হ্যাঁ, ঠিক দেখেছ, ঠিক দেখেছ। ওই তো ফুল, কান্না ফুলের!"

ঠিক তক্ষুনি টোরার যেন মনে হল, বাদশার কান্নার জল, অন্ধকারে ঝলমল করে একটি একটি মুক্তোর মত গড়িয়ে গড়িয়ে হারিয়ে যাচ্ছে।

টোরা বললে, "ও তো আমার ভাই, বাদশা।"

হাওয়া উত্তর দিলে,

যার মনে পাপ নেই,
দ্বেষ নেই, দোষ নেই,
রাগ নেই, রোষ নেই,
তার নাম রঙ।

যার রঙে আলো আছে,
হাসি আর খুশি আছে,
সুর-ভরা বাঁশি আছে,
তার নাম ফুল।

"সত্যি।" বুকের আনন্দ চেপে রাখতে পারল না টোরা হাওয়ার কথা শুনে।

হাওয়া বললে, "সত্যি, সত্যি, সত্যি!" বলতে বলতে হাওয়া দোর ডিঙিয়ে, ঘর ছাড়িয়ে নাচতে লাগল।

আর টোরা? খুশিতে হাত বাড়িয়ে বাদশার চোখের জল সোনার প্রদীপে ভরে নিল। ভরে নিয়ে বাদশার চোখ দুটি মুছে দিল। তারপর শেষবারের মত ওর মুখটি দেখতে দেখতে আনমনা হয়ে যায় টোরা। নরম গলায় ডেকে ওঠে, "বাদশা।"

ঘুমন্ত বাদশা চমকে উঠেছে। চোখের ঘুম তার ছুটে গেল। ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ল। কে ডাকল তাকে? এ যেন তার দিদির গলা! বাদশাও ডাক দিল, "দিদি।"

বাদশার ডাকে কে সাড়া দেবে! ততক্ষণে দিদি ঘর ছেড়ে বাইরে। সে যখন ফুলের চোখের জল পেয়েছে, তখন এই অন্ধকার রাত্তিরেই তাকে যেতে হবে ওই পাহাড়ের চূড়ায়। মন্দিরে। এ প্রদীপ তাকে জ্বালাতেই হবে। নইলে সে যে কিছুই ফিরে পাবে না।

"দিদি!" ব্যাকুল হয়ে ঘর থেকে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে এল বাদশা। কিন্তু দিদির দেখাও পেল না। দিদি সাড়াও দিল না।

আবার চেঁচাল বাদশা, "দিদি, আমি এখানে।"

ডাকতে ডাকতে বাইরে বেরিয়ে এসেছে বাদশা।

এদিকে বাদশার চেঁচামেচিতে বুড়ির ঘুম গোল্লায় গেল। আঁকপাঁকিয়ে উঠে পড়ল। তরতরিয়ে তেড়ে এল। আর যেই না বুড়িকে দেখা, বাদশাও মার ছুট!

বুড়ি তো আর বাদশার মত ছুটতে পারে না! তাই ধরতেও পারে না। তার ওপর কোমরে কনকনানি টনটনাচ্ছে। তাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে উঠল, "চোর, চোর, ধর, ধর!"

বাদশা তখন কোথায় চলে গেছে। কত দূরে। আর ধরতে হচ্ছে না। বাদশা হাওয়ার চেয়ে আগে ছুটেছে।

তখন আর বুড়ি কী করে, ঘরের চৌকাঠে ঠ্যাং ছড়িয়ে চিল্লাচিল্লি করতে করতে মাথা খুঁড়তে লাগল।

ছুটছে বাদশা। ডাকছে দিদিকে, খুঁজছে দিদিকে, "দিদি, দিদি, কই তুই?" সেই ডাক অন্ধকারকে খানখান করে ফিরে-ফিরে ঘুরছে।

হঠাৎ এ কী! সেই অন্ধকারটা যেন আরও অন্ধকার হয়ে গেল! হ্যাঁ, সেই আরও অন্ধকারে, আবার সেই কালো-ডানার দানো-পাখিদের ভয়-জাগানো পতপতানি আওয়াজ বাতাসে ভেসে আসছে। ওরা দেখতে পেয়েছে বাদশাকে। ওরা বাদশাকে ধরবে।

বাদশা সেই পতপতানি শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল। আকাশের দিকে চাইল। কিন্তু এবার ভয় পেল না বাদশা। সেই ভয়ঙ্কর পাখিগুলোর দিকে হাত উঁচিয়ে সে বললে, "ওরে দানব, ভয় দেখাবি কাকে? আমাকে? আমাকে যে ভয় দেখায়, সে এখনও জন্মায়নি।"

পাখিগুলো নেমে আসছে।

না, আজ আর কিছুতেই ধরা দেবে না বাদশা। বাদশা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাদের দিকে।

এবার পাখিগুলো বাদশাকে ছোঁ মারবে।

বাদশাও ঘুষি পাকালে।

পাখিগুলো ছোঁ মারল।

বাদশা লড়াই শুরু করে দিলে। অসংখ্য পাখি আর বাদশা একা!

বাদশা লড়ছে। ওরা মস্ত মস্ত ডানার খোঁচা খোঁচা পালক দিয়ে ঝাপটা মারছে বাদশাকে। বাদশা রুখছে সে মার।

ওরা খোঁচা-খোঁচা ঠ্যাং দিয়ে খামছে দিচ্ছে বাদশাকে।

বাদশা ওদের ঠ্যাংয়ের আঙুলগুলো মচকে দিচ্ছে।

ওরা লম্বা লম্বা ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে দিচ্ছে বাদশার মাথা, বাদশার হাত, বাদশার পিঠ। তখন দারুণ লড়াই শুরু হয়ে গেল।

যে ডানা মারে, তার ডানা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেয় বাদশা। যে খামচে দেয়, তার ঠ্যাং ভেঙে দেয় বাদশা। যে ঠোক্কর মারে, তার ঠোঁট উপড়ে ফেলে বাদশা। কেউ মরল, কেউ ছটফটিয়ে কাতরাতে লাগল। নয়তো মারের চোটে বৃন্দাবনে পালাল। কিন্তু ওই দানবের দল তো ছোট নয়! একটা যায় তো দশটা আসে। আসুক! বাদশার সঙ্গে আজ কেউ পারবে না। বাদশা সবাইকে আজ খতম করে ছাড়বে। দে মার দে মার! কী বাহাদুর ছেলে, দেখ!

সত্যি! শেষকালে পালা পালা। দানব-পাখিগুলো বাদশার মারের চোটে যে যেদিকে পারল রণে ভঙ্গ দিয়ে একদম ভাগলবা!

বাদশা জিতে গেছে! বাদশার গা কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে। পড়ুক। জয়ের আনন্দে ওর বুকটা ফুলে উঠেছে। কিন্তু দিদি? দিদি কোথা? দিদি নইলে তার এই বীর ভাইকে কে আদর করবে? গায়ের রক্ত মুছে দেবে?

বাদশা আবার ডাকল, "দিদি!"

ডাকতে ডাকতে খুঁজতে লাগল।

তখন দিদি অনেক দূরে। অনেক দূরে ওই পাহাড়ের পাথর ডিঙিয়ে সে চূড়ায় যাবে। সেখানে আলো জ্বলছে। তার হাতে এই প্রদীপ, সেটি টোরা জ্বালবেই সেই আলোতে।

কিন্তু টোরা যে জানে না, এক ভয়ঙ্কর বিপদ তার সামনেও ও'র পেতে দাঁড়িয়ে আছে! কে জানত দানো-পাখিদের সেই যে সর্দার, সে তার পিছু নিয়েছে। ওই তো সে টোরার মাথার ওপর উড়ে উড়ে এগিয়ে আসছে। ওর হাতের প্রদীপটির দিকে লক্ষ রেখে। দেখতে পায়নি টোরা। দেখা সম্ভবও না। কেননা, রাতের কালোর সঙ্গে, দানোর ডানার কালো এক হয়ে মিশে আছে।

কত উঁচু পাহাড়টা! ওর ছোট্ট ছোট্ট পা দুটি পাথরের গায়ে গায়ে লাফ দিয়ে কত কষ্টে এগিয়ে চলেছে। কত সাবধানে, সোনার প্রদীপে কান্নার জলটি সে সামলে রেখেছে। যেন চলতে গিয়ে ছলকে পড়ে না যায়! যেন তার পা দুটি হোঁচট খেয়ে উল্টে না পড়ে। চোখ তার সেই দিকেই সজাগ। না, অসাবধানী সে আর হবে না। কিছুতেই না।

অনেক উঁচুতে উঠে এসেছে টোরা। এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ওই দূরে পাহাড়ের মাথার ওপর ওর প্রদীপের আলো জ্বলছে। ছোট্ট একটি প্রদীপ, কিন্তু তার আলোর ঝিলিমিলি উছলে ছড়িয়ে পড়ছে পাহাড়ের গায়ে। দৃষ্টি এখন ওই আলোর দিকে। ওই আলোয়, প্রদীপের শিখাটি ও জ্বেলে নেবে। তখন ও ফিরে পাবে সব কিছু। অদৃশ্য টোরা ফিরে পাবে নিজেকে। নিজেকে ফিরে না পেলে ভাইকে সে কেমন করে ফিরে পাবে!

আঃ! কী শান্ত নিশ্চুপ চারিদিক। নিশ্চুপ এই পাহাড়ের মত ভারি স্থির ওই নীল আকাশের চাঁদোয়াটা। ওই আকাশ যেন পাহাড়কে ডাকছে চোখ টিপে। আর পাহাড় মুখ বাড়িয়ে হাতছানি দিচ্ছে আকাশকে। একাকী জ্বলতে জ্বলতে পাহাড়ের এই প্রদীপটি তাই দেখে দুলছে, নাচছে, নাকি হাসছে।

দাঁড়াল টোরা! তার অদৃশ্য চোখ দুটি স্থির হয়ে গেল তাই দেখে। ধীরে ধীরে এগিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল টোরা।

হাতের সোনার প্রদীপটি পাহাড়ের সেই জ্বলন্ত প্রদীপের শিখায় ছোঁয়াল। ওই তো! প্রদীপ জ্বলে উঠেছে!

দেখো, দেখো, কী আশ্চর্য প্রদীপ জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে টোরার শরীরটি ওই তো আবার ফুটে উঠেছে! ওই তো আলোয় তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওই দেখা যাচ্ছে, তার মুখটি। ওই তার চোখ দুটি। প্রদীপটি হাতে নিয়ে ওই তো টোরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

আনন্দে বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে নেচে উঠল টোরার। সে নিজেকে দেখতে পেয়েছে। এ কেমন করে হয়! এ কি জাদু? না দেবতার বর!

এত আনন্দেও এবার কিন্তু টোরা একটুও অসাবধানী হল না। জ্বলন্ত প্রদীপের শিখাটি সে বুক দিয়ে আড়াল করে রাখল। না, এ-প্রদীপ সে আর নিবতে দেবে না। কিছুতেই না। এ প্রদীপ যে দেবতার, তার পায়ের কাছে সে আবার রেখে আসবে।

শেষবারের মত দেবতাকে প্রণাম করে বেরিয়ে এল টোরা মন্দিরের দরজা পেরিয়ে। বাইরে এই পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ধীরে ধীরে হাওয়া বইছে। সেই হাওয়ার দোলায় প্রদীপের শিখাটির মত টোরার মনটিও দুলছে। এবার ওকে ফিরতে হবে। ফিরতে হবে, এই পাহাড়ের পায়ের কাছে, সেই গুহার মন্দিরে। টোরা পা বাড়াল। কিন্তু টোরা দেখতে পেল না, সামনে তার কে দাঁড়িয়ে! কিসের বিপদ!

থতমত খেয়ে আচমকা চিৎকার করে উঠেছিল টোরা! এখন টোরা দেখতে পেয়েছে। একটা ভয়ঙ্কর জীব। থুপসি মেরে উপুড় হয়ে পড়ে সে তার দিকে চেয়ে আছে। টোরা স্পষ্ট দেখছে, তার আটটা ঠ্যাং। সাপের মত কিলবিল করছে। তার বুকের একটা গর্তের ভেতর থেকে কালো মেঘের মত ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সেই ধোঁয়া টোরার মুখে-চোখে লেগে কেমন যেন সব ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। তারপর সেই আটটা ঠ্যাং নড়ে উঠল। নড়তে নড়তে টোরার দিকে এগিয়ে এল। হয়তো এক্ষুনি সে তার ওই আটটা ঠ্যাং দিয়ে টোরাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জাপটে ধরবে। তাহলে টোরা কী করবে তখন?

টোরা ভীষণ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে বলে উঠল, "আমায় মেরো না।"

সেই আট-ঠ্যাঙে জন্তুটা তখন আটটা ঠ্যাং কিলবিল করে হেসে উঠল, হা-হা-হা! তার হাসির শব্দে পাহাড়ের পাথরগুলো ছিটকে গেল। গুড়ুম গুড়ুম করে মেঘ ডাকল।

টোরা প্রদীপটা হাতের আড়ালে লুকিয়ে বললে, "আমার এ-প্রদীপ তুমি নিবিয়ে দিও না!"

এবার সেই আট-ঠ্যাঙে কথা বলল, "তুই কার হুকুমে মন্দিরে ঢুকেছিস? এই মন্দির আমার!" তার গলার শব্দ শুনে মনে হচ্ছে, কে যেন ঢাক পেটাচ্ছে তার গলার ভেতর।

টোরা বললে, "মন্দির তো দেবতার। সেখানে তো সবাই যেতে পারে।"

এবার সে ঢাকের মত গুড়ুম গুড়ুম গর্জন করে উঠল। বললে, "আমি মন্দিরের দেবতাকে রক্ষা করি। যারা মন্দিরে চুরি করতে ঢোকে, তাদের আমি পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে ফেলে দিই।"

"আমি তো কিছু চুরি করিনি।" উত্তর দিলে টোরা।

"তুই আলো চুরি করেছিস। প্রদীপের আলো।"

"আলো কি চুরি করা যায়? তা তো আমি জানতুম না।" টোরা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, "আমি আর কখনও করব না। এবারটি আমায় ছেড়ে দাও।"

"না।" সেই আট-ঠ্যাঙে এবার হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। টোরা শেষবারের মত কেঁদে উঠল, "আমায় ছেড়ে দাও, আমায় দয়া করো।"

এতক্ষণ আর কে দেখেছে ওই আকাশের দিকে। সেই দানো-পাখিটা টোরার মাথার ওপর পাক খাচ্ছে। তার কালো ছায়াটা হঠাৎ টোরার মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। ছোঁ মারল

পাখিটা। সে টোরার হাত থেকে প্রদীপটা ছিনিয়ে নেবে। কিন্তু পারল না। দেখে ফেলেছে পাহাড়ের এই আট-ঠ্যাঙে জন্তুটা আকাশের ওই কালো-ডানার দানোটাকে। ছোঁ মারার সঙ্গে সঙ্গে সে তার আটটা ঠ্যাং দিয়ে ধরে ফেলেছে দানোটার কালো ডানা। আর দানোটাও অমনি তার মস্ত ধারালো ঠোঁট দিয়ে ঝাড়লে এক বোম্বাই ঠোক্কর আট-ঠ্যাঙের গর্দানে। তারপর যা লেগে যা ঝটাপটি। আট-ঠ্যাঙের গায়ে যত ক্ষমতা, দানোর গায়েও তত শক্তি। আট-ঠেঙো তার ঠ্যাং দিয়ে জড়িয়ে ধরে দানোটাকে যতই চটকাচ্ছে, দানো-পাখিটাও ততই ঠুকরে ঠুকরে রক্তারক্তি কাণ্ড করে ছাড়ছে। কী ভীষণ লড়াই। আর কী প্রচণ্ড আর্তনাদ পাহাড়ের মাথার ওপর। যেন একশোটা ঢাকের শব্দ কান ফাটিয়ে একসঙ্গে বেজে উঠছে। তাদের ধস্তাধস্তিতে পাহাড় কেঁপে উঠল।

টোরা তো দেখেশুনে থ। এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল টোরা। তারপর যখন ভয়ানক তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল, তখন ভাবল, এই সুযোগ। টোরা ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে তরতর করে নামতে শুরু করে দিলে।

কিন্তু এই যাঃ। দানব-পাখিটা দেখে ফেলেছে। তার সেই মস্ত মস্ত ডানা দুটোর বেদম এক ঝটকা মেরে আট-ঠেঙোকে কুপোকাত করে সে ছুটল টোরার দিকে। টোরাকে পেছন থেকে আঁকড়ে ধরলে। ততক্ষণে আট-ঠেঙোও সেখানে হাজির। সে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল দানো-পাখির ঘাড়ে। তারপর পাহাড়ের ওপর টোরাকে নিয়ে টানামানি করতে করতে সে আবার এক লড়াই। পাহাড়ের ওপর থেকে তিনজনেই, এই পড়ে, কি সেই পড়ে! আর ওই রকম সাংঘাতিক টানামানি করলে টোরাই বা কেমন করে সামলাবে তার হাতের প্রদীপ! বেমক্কা হল কী, প্রদীপের আগুনে দানো-পাখির ডানায় লেগে গেছে ছেঁকা! সঙ্গে সঙ্গে ডানাটা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছে। দানোটা পুড়তে পুড়তে বিকট চিৎকার করে উঠল। চিৎকার করে টোরাকে মারল এক ধাক্কা। টোরা টাল সামলাতে পারল না। পিছলে পড়ল সে পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে, পাহাড়ের খাদে। আঁতকে জুজুর মত সিঁটিয়ে গেল টোরা। খাদ থেকে সে আরো অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে পড়তে-পড়তে আরও গভীরে ডুবে গেল টোরা।

৫

কিন্তু আশ্চর্য! পা ফসকে পড়ল না সে আছাড় খেয়ে। কোন আঘাত তো তার লাগল না! কে যেন ধীরে ধীরে ওকে নামিয়ে নিয়ে এল এই অন্ধকার গহ্বরে। না, আঘাত তার লাগবে না। তার হাতে যে দেবতার জ্বলন্ত প্রদীপ। এত বিপদেও সে তার হাতের প্রদীপটি শক্ত হাতে ধরে রেখেছে। সে নিবতে দেয়নি তার শিখাটি। আঃ! এই গভীর গহ্বরের অন্ধকারে এ-প্রদীপটি যেন টোরার বন্ধু। ওকে পথ দেখাবে!

তবু ভীষণ ভয় লাগছে টোরার। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে! এ যে শুধু অন্ধকার! কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। এ-কোথায় পড়ল সে। এখান থেকে ও কেমন করে উদ্ধার পাবে! পৃথিবীর নীচটা এত অন্ধকার!

না, সে হয়তো আর পারবে না, পারবে না বাঁচতে। এই জমাট অন্ধকার গহ্বরে সে বুঝি তিলে তিলে শুকিয়ে মরবে! কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেল টোরা। ওর মনে হচ্ছে, এখনই খুব চিৎকার করে কেঁদে ওঠে! কিন্তু পারল না। মনের ভেতরটা ছটফট করে উঠলেও, ওর গলা কথা বলতে পারছে না। অথবা মনে হয়, ও যেন কথা বলতে ভুলে গেছে! সত্যিই, ভোলবারই কথা। এখানে আকাশ নেই, আকাশের আলো নেই। গাছ নেই, পাখি নেই। শুধু অন্ধকার। টোরার যেন দম আটকে আসছে। আর মনে হচ্ছে, ওর হাতের প্রদীপ শিখায় ওর নিজেরই ছায়াটা যেন একটা ভয়ঙ্কর মূর্তি হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে কটমট করে

হঠাৎ কেমন যেন শিউরে উঠল টোরা! অমন থমকে কার দিকে চাইল সে!

টোরা দেখতে পেল, অন্ধকারে কালো কালো ছায়ার মত কারা যেন এদিক ওদিক থেকে ছুটে পালাচ্ছে! মনে হল, গহ্বরের আশে-পাশে, এবড়ো-খেবড়ো গর্তগুলোর মধ্যে তারা ঢুকে পড়ল। টোরার চোখে ধাঁধা লেগে গেছে! তুমি দেখলে কী করতে জানি না। কিন্তু টোরা ভয় পেল না। বরঞ্চ মনে ভরসা পেল। হয়তো ভাবল, এই নিথর অন্ধকারে ও শুধু একা নয়। এখানেও প্রাণ আছে। কে বলতে পারে, এ বিপদ থেকে ওই প্রাণ টোরাকে রক্ষা করবে না!

"শি-স-স-স।" ঝড় উঠলে যেমন শিস বেজে ওঠে, ঠিক তেমনি ভীষণ শব্দ শুনতে পেল টোরা হঠাৎ। তারপর কী ভয়ঙ্কর জোরে সেই শিসের সঙ্গে সত্যি-সত্যি ঝড় উঠল সেই অন্ধকার গহ্বরে। এলোমেলো ধাক্কা দিয়ে সেই ঝড় ছুটে আসছে টোরার দিকে। এই বুঝি তার হাতের প্রদীপ নিবে যায়! এইরে, কী করবে টোরা! না-বলে, না-কয়ে এমন ঝড় ওঠে কোত্থেকে, এই গহ্বরে। ঝড়ের ধাক্কায় নিজেই টাল সামলাতে পারছে না, প্রদীপ সামলাবে কেমন করে! এ কী বিপদ আবার! মনে হচ্ছে, এক্ষুনি সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে। কিম্বা হুস করে শুকনো পাতার মত শূন্যে উড়ে যাবে! টোরার আর কোন নিস্তার নেই। রাক্ষুসী ঝড় হাঁ বাড়িয়ে তেড়েমেড়ে ছুটে আসছে। তাকে গিলে খাবে! টোরা পালাতেও পারছে না। যেদিকে ও পা বাড়ায়, সেদিকেই ঝড়। ও যদি সামনে যায়, ঝড়ও আসে সামনে থেকে। ও যদি পিছন হাঁটে, ঝড়ও হাঁটে পিছন থেকে। নাস্তানাবুদ হয়ে গেল টোরা। টোরা আর দাঁড়াতে পারল না। বসে পড়ল। তারপর দু হাতের মুঠি দিয়ে আড়াল করলে প্রদীপের শিখাটি। কিন্তু কে শুনছে, কার কথা! হুস-স-স, হুস-স-স। ঝড় বইবে, ঝড় বইছে।

হঠাৎ থরথর করে কেঁপে ওঠে ওর চোখের পাতা দুটি! আঁতকে ওর বুকের ভেতরটা যেন থমকে যায়! টোরা সেই প্রদীপের আলো-ছায়ার অন্ধকারে দেখে কী, অগুনতি ভাঁটার মত লাল টকটকে চোখ তার দিকে প্যাটপ্যাট করে চেয়ে আছে। কী ভয়-জাগানো তাদের চেহারা! তারা যেন না-মানুষ, না-জন্তু। টোরা স্পষ্ট দেখল প্রদীপের আলোয়, তাদের মাথা-গুলো হাঁড়ির মত হেঁড়ে। ঝুলের মত ছন্ন-ছাড়া চুলের ছিরি! ঠ্যাঙগুলো সব ধনুকের মত বেঁকা বেঁকা। হাতগুলো নাটা-নাটা, খাটো খাটো! নীচের ঠোঁট, নীচের দিকে ঝুলে আছে। নাল গড়াচ্ছে। আর ডাব্বাডাব্বা নাকের গর্তগুলো হাঁপাতে-হাঁপাতে হাঁসফাঁস করছে। তাদের মুখ দিয়েই তো ঝড় ছুটছে! বাবা! তারা দিচ্ছে ফুঁ, উঠছে ঝড়। এবার টোরা ঠিক দেখতে পেয়েছে, তারা ফুঁয়ের ঝড় বইয়ে প্রদীপটা নিবিয়ে ফেলতে চাইছে। সর্বনাশ তো তাহলে!

না, সর্বনাশ না। আশ্চর্য বাপার! তারা যতই ফুঁ দিচ্ছে, প্রদীপ নেবা দূরে থাক, ততই তার আলোর রেশ বাড়ছে। প্রদীপ যেন আলোয় আলো করে দিচ্ছে সেই অন্ধকার।

নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছে টোরা, এ কেমন করে হয়। ঝড় উঠলে, গাছ পড়ে, ঘর ভাঙে, তুফান ওঠে, গাঙ ছোটে, জাহাজ ডোবে, হাতি মরে। অথচ তার হাতে তো একটা সামান্য

প্রদীপ। সে তো নিবছে না। উল্টে আরও যে সে ঝলমলিয়ে ওঠে!

সত্যিই! প্রদীপ আর নিববে না। টোরা তো জানে না, ওই পাহাড়-চূড়ার মন্দিরে যে প্রদীপ জ্বলছে, সেই জ্বলন্ত প্রদীপের স্পর্শে আর-একটি প্রদীপ জ্বলে উঠলে সে আর কোনদিন নেবে না। আর তাই শত চেষ্টা করেও সেই না-মানুষ, না-জন্তুরা তাদের ঝড়ের মত ফুঁয়ের তেজে নেবাতেই পারছে না প্রদীপ-আলো।

আচ্ছা, থাকলেই বা আলো। অন্ধকারে আলো জ্বললে ভালই তো! ওদের মতলবটা কী বলো তো? টোরার হাতের প্রদীপ নিবিয়ে দিয়ে কি ওকে মারবে? নাকি, অন্ধকারে যারা থাকে, তাদের চোখে অন্ধকারটাই আলো আর আলোটা অন্ধকার! হবেও বা।

সেই হাঁড়ির মত হেঁড়ে হেঁড়ে মাথাগুলো এবার হেলে হেলে টোরার দিকে এগিয়ে আসছে। টোরাও ভয়ে চোখ ঘুরিয়ে দেখছে তাদের। তারপর তারা যখন খুব কাছে চলে এসেছে, লাফিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "না, তোমরা আমার প্রদীপ নিবিয়ে দিও না।"

নিমেষের মধ্যে ফুঁয়ের ঝড় থেমে গেল। থামতেই সব ভো-ভা! কোথায় গেল সেই মুখগুলো? লাল-টকটক চোখ-গুলো? টোরা দেখতে পাচ্ছে না তো! কোথায় মিলিয়ে গেল?

ধড়ফড় করে দাঁড়িয়ে পড়ল টোরা। এখন প্রদীপের আলো জ্বলজ্বল করছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। টোরার চোখে ভয়-তাড়ানো অবাক চাউনি। তার চোখ খুঁজছে। ডিঙি-ডিঙি পা ফেলে হাঁটছে। কিন্তু আশ্চর্য, কেউ নেই। এগিয়ে যায় টোরা। উঃ বাবা! গহ্বরের গায়ে গায়ে এবড়ো-খেবড়ো গর্তগুলো যেন রাক্ষসের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। এই গর্তগুলোর মধ্যে লুকিয়ে পড়েনি তো! কে জানে! দেখি! উঁকি মারলে টোরা। আর ঠিক তক্ষুনি তার যেন মনে হল, ভয়ঙ্কর এই গর্তগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ভয়-জড়ানো রহস্য তাকে চোখ টিপে ডাকছে। কেঁপে উঠল টোরার বুকখানা। কিন্তু এখন ভয় পেলে তো চলবে না তার। এই বিপদে টোরাকে সাহসে বুক বাঁধতে হবে। এই ভয়ঙ্কর না-মানুষ না-জন্তুগুলো যদি তাকে মারতে চায়, মারুক। তবু এ-প্রদীপ টোরা প্রাণ থাকতে নিবতে দেবে না।

হঠাৎ থতমত খেয়ে গেল টোরা। একটা গর্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল কেন চট করে? ওই তো! তারা যেন ওকে দেখে এই গর্তের সুড়ঙ্গ দিয়ে চোঁ-চাঁ দৌড় দিচ্ছে।

টোরা গর্তের সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল। সামনে খাদ। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু। বিশ্রী খানা-খন্দ। লাফ মারলে টোরা। টোরা দেখবে ওরা কারা। তাই লাফাতে লাফাতে গভীর অন্ধকারে হারিয়ে গেল! টোরা একবার ভাবলও না, ঢুকছে তো, অন্ধকার থেকে বাইরে সে বেরুবে কেমন করে!

"আঃ—!" ঠিক যা ভেবেছি তাই! বেসামাল হয়ে টোরার পা পিছলে গেছে। ঈশ, মেয়েটা একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েছে। যা লাগান লেগেছে না! প্রদীপটা গেল নাকি? না, সেটি তার হাতছাড়া হয়নি। উঠতে গেল টোরা।

"গ্যাঁও, গ্যাঁও!" হঠাৎ অমন বিশ্রী সুরে দারুণ জোরে গোঙাচ্ছে কারা? গোঙাচ্ছে, না টোরাকে ভেঙাচ্ছে!

টোরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছে।

ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় ভীষণ আর্তনাদ করে উঠল, "উঃ!" খুব লেগেছে ওর কপালে।

এ কী! হঠাৎ ওর কপালে ঢেলা ছুড়ে মারল কে। টোরা ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে চাঁই চাঁই ঢেলা চারিদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসছে। ওর গায়ে লাগছে, মাটিতে ছড়িয়ে পড়ছে। টোরা প্রাণপণে সামাল দিচ্ছে। কিন্তু পারবে কেন! সামলাতে পারল না টোরা। চেঁচিয়ে উঠল, "আমায় মের না।"

টোরার মিষ্টি গলার প্রতিধ্বনি কাঁপতে কাঁপতে গহ্বরের অন্ধকারের মধ্যেকার কার কানে পৌঁছয় কে জানে! সত্যিই. নিমেষের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল সেই ঢেলা ছোড়া। আবার নিঝুম চারিদিক। সারা গায়ে আঘাত লেগেছে টোরার। কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এ নিঝুম অন্ধকারে ও কাকে ডাকবে। ওর যে বড্ড জল তেষ্টা পেয়েছে।

"আলোটা নিবিয়ে ফেল!" হঠাৎ গম্ভীর গলায় হুংকার ছেড়ে কে ডেকে উঠল! টোরার চোখ দুটি চনমন করে এদিক ওদিক তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক গলা চেঁচিয়ে উঠল, "আলোটা নিবিয়ে ফেল।"

"নিবিয়ে ফেল!"

"নিবিয়ে ফেল!"

"নিবিয়ে ফেল!"

চেঁচানিতে টোরার কান ঝালাপালা হয়ে যায়। সইতে পারছে না টোরা সে-চিৎকার। টোরা তারস্বরে ডেকে উঠল, "থামো।"

আশ্চর্য! আবার সব নিশ্চুপ! গলার সেই অদ্ভুত আর ভীষণ শব্দগুলো থেমে যেতেই, ভয় মেশানো সেই কালো অন্ধকারে প্রদীপের আলো কেমন যেন থমথম করছে। টোরা এগোতে পারছে না। পিছনে কিছু দেখতেও পাচ্ছে না। ওর হাত-পাগুলো থরথর করে কেঁপে-কেঁপে চমকে উঠছে। তারপর ওর অজান্তেই চোখের পাতা বেয়ে জল গড়ায়। টোরা বোধহয় কাঁদছে। কাঁদছে কার জন্যে? কাঁদছে বাদশার জন্যে?

না, মা আর বাবার জন্যে? আজ সবার জন্যে কাঁদবে টোরা। এখন যেন সবার কথা আপনা থেকে ওর মনে এসে বাসা বাঁধছে। টোরা জানে, আর কাউকে সে দেখতে পাবে না। কোন দিনও না।

"গ্যাঁও-গ্যাঁও-গ্যাঁও!"

হঠাৎ আবার কর্কশ গলার হুংকার শোনা যায়! কে ও? আগুনের ভাঁটার মত জ্বলজ্বলে চোখ জ্বেলে টোরার দিকে চেয়ে আছে?

"কে?" টোরার গলায় অস্ফুট ভয়-মেশানো স্বর।

সেই হুংকার বললে, "আলোটা নিবিয়ে ফেল, নইলে তোকে মেরে ফেলব!"

টোরা সেই আগুনের ভাঁটার মত জ্বলন্ত চোখ দুটোর দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলে, "কেন নিবিয়ে ফেলতে বলছ, আলো আমাদের শত্রু!"

"আমাদের চোখ জ্বলে যাচ্ছে, আমরা অন্ধ হয়ে যাচ্ছি। আলোর কী দোষ?"

"তোমরা কারা?"

"আমরা এই অন্ধকারে থাকি। পৃথিবীতে থাকতে থাকতে আমাদের দিন শেষ হয়ে গেলে, এই মাটির নীচে আমরা চলে আসি। সবাই বলে এর নাম মৃত্যু-পুরী। আমরা বলি অন্ধকার। দেখছি, তুই তো মরিসনি, তুই এখানে এলি কেমন করে? তুই কেন আলো এনেছিস? এক্ষুনি নিবিয়ে ফেল। আমরা সহ্য করতে পারছি না।" সে বললে।

টোরা উত্তর দিলে, "এ দেবতার আলো। এ আলোয় কেউ অন্ধ হয় না।"

এবার যেন সেই কর্কশ স্বর গর্জন করে উঠল, "ফের কথা বলছিস!"

টোরা বললে, "দেবতার আলো নেবাতে নেই।"

টোরার কথা শুনে সে রেগে জ্বলে উঠেছে। সে লাফ মারল টোরার সামনে। টোরা এবার স্পষ্ট দেখতে পেল। দেখতে পেল, একটা বিকট চেহারার, কিম্ভূতকিমাকার সেই না-মানুষ না-জন্তুটাকে। টোরার সামনে দাঁড়িয়ে সাংঘাতিক জোরে সে ফুঁ দিল প্রদীপের শিখায়! নিবছে না প্রদীপ। আলো ঝলমলিয়ে উঠছে!

যখন সে প্রাণপণে ফুঁ দিয়েও নেবাতে পারল না প্রদীপের আলো, তখন ধাঁই করে এক ধাক্কা মেরেছে টোরার প্রদীপে। আর দেখতে আছে! প্রদীপের শিখা ঝলকে উঠে তার মুখের ওপর ছিটকে পড়ল। আগুনের জ্বালায় প্রচণ্ড চিৎকার শুরু করে, দশ হাত দূরে সে সরে দাঁড়াল।

টোরা তাই দেখে নিজেই কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। কিন্তু আর দেরি নয়। এখানে আর দাঁড়ানো উচিত নয়। কিম্ভূত জীবটার হাত থেকে বাঁচতে হলে ওকে পালাতে হবে। কিন্তু কোথায় পালাবে? টোরা পিছন ফিরল।

সব্বনাশ! পিছনে ওই দেখো একটা কত বড় সাপ! ফোঁস ফোঁস করে এগিয়ে আসছে। সাপটাও কি মরা? সেও কি এই মৃত্যু-পুরীর বাসিন্দা। তা যদি হয়, মরে গেলে তো সব শান্ত হয়ে যায়! এমন নিষ্ঠুর কেন ওরা?

এখন আর পালাবার রাস্তা নেই টোরার। সাপটার জ্বল-জ্যান্ত ফণাটার দিকে তাকিয়ে টোরা হতাশ হয়ে ভাবলে, এই-বার তার শেষ। শেষকালে বোধহয় সাপই তাকে খাবে!

সত্যি! কথা নেই, বার্তা নেই সাপটা ফণা তুলে টোরাকে ছোবল মারতে গেল, "ফোঁস"। মুখে তার কী আওয়াজ!

টোরা সুট করে সরে গেছে। সাপটা রাগে ফোঁসাচ্ছে! একপাশে দাঁড়িয়ে টোরা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, "আমায় মারছ কেন?"

কে আর টোরার কথা কানে নিচ্ছে। সাপ সড়সড়িয়ে এগিয়ে আসছে টোরার দিকে। টোরা ভয়ে পাথর হয়ে গেল। সাপ টোরার সামনে ফণা তুলে খাড়া দাঁড়িয়ে পড়ল। টোরার মুখের কাছে মুখ এনে ফোঁস ফোঁস করে বললে, "কথা কানে নিচ্ছিস না কেন। আলোটা নিবিয়ে ফেল।" সাপটা যেন ফোঁস-ফোঁসিয়ে ধমক মারছে।

টোরা তাড়াতাড়ি প্রদীপটা তার পিছনে আড়াল করে লুকিয়ে রেখে, ভয়ে ভয়ে বললে, "না—।"

শেষ হয়নি টোরার মুখের কথা। তার আগেই সাপটা লাফিয়ে উঠে টোরাকে জড়িয়ে ধরল। জড়িয়ে ধরে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেললে টোরাকে। টোরার দম আটকে আসছে। মনে হচ্ছে, বাঁধনের চাপে ওর হাড়গোড় গুঁড়িয়ে টুকরো

টরে-টক্কা

গিরিধারী কুণ্ডু

যেখানেই যাক, গিয়ে খেতে চায় ছক্কা,
খবর পাঠিয়েছিল টরে-টরে টক্কা।
গিয়েছিল আক্রায়, কিন্তু সে শস্তায়
সেখানে না-পেয়ে কিছু শেষকালে পস্তায়।
তা হলে বরং কিনি একজোড়া নাগরা,
এই ভেবে প্লেনে উঠে চলে এল আগ্রা।
আগ্রায় বিগড়াল মগজের ঘিলু,
রাতদিন হাত নেড়ে গান গায় পিলু।
একমাথা চুল, শুধু মাঝখান সাফা,
সেইখানে আছে তার বুদ্ধিটা চাপা।
তবে কিনা এখনো সে খেতে চায় ছক্কা,
আর বলে মাঝে-মাঝে টরে-টরে টক্কা।

ছবি অহিভূষণ মালিক

টুকরো হয়ে যাবে এক্ষুনি। ও আর পারছে না। ও যে চেঁচিয়ে কাউকে ডাকবে, সে-শক্তিও আর নেই তার। এই বুঝি তার শেষ।

না, শেষ কেন হবে! ও তো কোন অন্যায় করেনি। আর তাছাড়া দেবতা তার সঙ্গে আছেন। তার হাতে দেবতার প্রদীপ জ্বলছে। ওর কে ক্ষতি করবে! তাই টোরার ওই ছোট্ট প্রাণটুকু প্রচণ্ড ক্ষমতায় ঝলকে উঠল। জ্বলন্ত প্রদীপের শিখাটি সে ঠেকিয়ে দিল, সাপের মুখে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল তার মুখখানা। যন্ত্রণায় দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে টোরাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সেই সাপটা গহ্বরের গর্তে। টোরা প্রাণপণে আগলে ধরল প্রদীপটা দু-হাত দিয়ে। প্রদীপ রক্ষা পেল, কিন্তু টোরা সামলাতে পারল না তার মাথাটি। গহ্বরের পাথরে ধাক্কা খেয়ে টোরা নিস্তেজ হয়ে পড়ে গেল।

তুমি হয়তো ভেবেছিলে, এই অন্ধকারের অন্ধকূপে টোরার চোখ দুটি চিরদিনের মত নিবে গেছে। ওর হয়তো আর কোনদিন ঘুম ভাঙবে না।

কিন্তু না। ওই দেখো, নিস্তেজ ওর হাতের আঙুল-গুলি ধীরে ধীরে কেমন কাঁপছে আবার। ক্লান্ত চোখ দুটি কেমন অনেক কষ্টে জেগে উঠছে। চোখের পাতা দুটি মেলে ধরার চেষ্টা করছে টোরা। ওই তো টোরা চাইল।

কিন্তু এ কী! এত আলো এল কোত্থেকে? যে অন্ধকার গহ্বর এতক্ষণ কালো অন্ধকারে ঢাকা ছিল হঠাৎ তার এ কী রূপ! আলোয় ঝলমল করছে চারিদিক। উঠে বসল টোরা। কই তার প্রদীপ? ওই তো! দেখো দেখো, প্রদীপের শিখাটি আলোয় আলো ছড়িয়ে, এই গহ্বরের অন্ধকারকে চোখ মটকে যেন ঠাট্টা করছে। এত কষ্টেও খুশিতে উছলে পড়ল টোরার মন। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল টোরা। ওর মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করছে। পা দুটি টলে টলে পড়ে যাচ্ছে। তবু ও দাঁড়িয়ে উঠে প্রদীপটি হাতে তুলে নিল। হঠাৎ একটি ঝুনঝুনি বেজে উঠল কোথা, "ঝুন-ঝুন, ঝুন-ঝুন।"

ভারি মিষ্টি তো ওই শব্দটি। কে আবার পায়ে মল বাজিয়ে নাচছে এখানে?

সত্যিই নাচছে! নাচছে তার প্রদীপের আলো, ওই ঝুন-ঝুন, ঝুনঝুনির তালে তালে। নাচতে নাচতে আলোরা গহ্বরের গায়ে গায়ে কত রকমের আঁকিবুকি ছড়িয়ে দিচ্ছে। কখনও তারা ফুল। কিম্বা ফুলঝুরি। কখনও তারা পাখি। অথবা গাছগাছালি। কখনও যেন আলোর পোশাক পরে উড়ে যায় শ্বেত-পরী!

আঃ! কী ভাল লাগছে! আনন্দে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিল টোরা। না, এখন সাপও নেই, সেই কিম্ভূতকিমাকার না-মানুষ না-জন্তুও নেই। মন ভরিয়ে ঝুনঝুনি বাজছে আর গহ্বরের দেওয়ালে দেওয়ালে ছবি ভাসছে।

কিন্তু সত্যিই তো ঝুনঝুনি বাজছে কোথায়? কে বাজাচ্ছে? আশে-পাশে আর তো কাউকে দেখতে পাচ্ছে না টোরা।

তাহলে তো দেখতে হয়।

একটি একটি পা ফেলে, এক পা এক পা এগিয়ে যায় টোরা। এগিয়ে যাচ্ছে প্রদীপটি হাতে নিয়ে। ফিরে ফিরে এদিক ওদিক মিটিমিটি চাইছে আর গহ্বরের আরও গভীরে নেমে যাচ্ছে।

চলতে চলতে হঠাৎ থমকে যায় টোরা। দাঁড়িয়ে পড়ে। আরে! আরে! একটা পাখি কেমন ঝুনঝুনি বাজিয়ে দোলনায় দুলছে! ও! টোরা তাহলে এতক্ষণ দোলনায় বাঁধা এই ঝুন-ঝুনির শব্দটাই শুনতে পাচ্ছিল। হ্যাঁ। এখন পাখিটা, দোলনাটা আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে টোরা। পাখিটা কি তার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে? বুঝতে পারে না টোরা।

"টোরাদিদি।" হঠাৎ দোলনা থামিয়ে পাখিটা ডাকল।

চমক ভাঙল টোরার। তাইতো, পাখিটা তার নাম জানল কেমন করে!

"আমাকে চিনতে পারছ?" পাখি জিগ্যেস করলে।

টোরার মুখে কথা ফুটল না।

"আমি ময়না।"

ময়না! টোরার বুকটা ছমছম করে ওঠে। গায়ে কাঁটা দেয়।

"মাকে খুশি করার জন্যে তোমায় কত কষ্ট করতে হল বল তো?" পাখি বললে।

টোরা ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই রইল পাখির দিকে। চেয়ে চেয়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, একি সত্যি! তাদের ময়না তার সঙ্গে কথা বলছে।

"মায়ের জন্যে এই পাতালের গহ্বরে তুমি বন্দী হয়ে আছ। তোমার ভয় করছে না?" পাখি জিগ্যেস করলে।

এবার টোরা কথা বললে। অস্ফুট স্বরে জিগ্যেস করলে, "আমি বন্দী?"

পাখি বললে, "হাঁ, তুমি বন্দী। যেমন আমায় বন্দী করে রেখেছিলে তোমাদের খাঁচায়!"

"আমরা তো তোমাকে বন্দী করিনি। আমরা তো তোমাকে ভালবেসেছি। আদর করেছি। বন্দীকে কেউ আদর করে, ভালবাসে?" টোরা উত্তর দিলে।

পাখি বললে, "আচ্ছা ধরো, তুমি যদি আর কোনদিন এ গহ্বর থেকে বেরিয়ে যেতে না পারো? আর কোনদিন মাকে দেখতে না পাও? দেখতে না পাও তোমার ওই ছোট্ট ভাই বাদশাকে বা তোমার বাবাকে? যদি তুমি কোনদিন আর তোমাদের বাড়ির জানলায় মুখ বাড়িয়ে কু ঝিক-ঝিক রেলের শব্দ শুনতে না পাও? কিম্বা ওই শব্দ শুনতে শুনতে তুমি গান গাইলে, তোমার গলায় গলা মিলিয়ে তোমার সঙ্গে বাদশা গান না গায়? তোমার সঙ্গে বাদশা খেলা না করে? রাতের বেলা মোমের আলো জেলে তোমার কাছে গল্প না শোনে? তার বদলে চিরদিন তুমি যদি এখানে বন্দী থাকো, আর আমরা সবাই তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, তোমাকে আদর করে, যত্ন দিয়ে তোমাকে গান শোনাই, তোমার ভাল লাগবে?"

"কেন একথা বলছ?" কেমন ভয়-জড়ানো গলায় জিগ্যেস করলে টোরা।

"কেন বলছি জানো? আমি মানি তোমরা আমাকে খুব ভালবাসতে। তোমার নরম মিষ্টি হাতের আঙুল আমার মাথায় ঠেকিয়ে তুমি রোজ আমায় কত আদর করতে। তুমি কত যত্ন করে আমায় খাবার দিতে। কিন্তু তুমি কি দেখে-ছিলে কোনদিন আমার চোখ দুটি? দেখেছিলে আমার চোখে জল? তুমি তো কোনদিন দেখনি আমি মায়ের জন্যে কাঁদি কি-না। তোমার মত আমারও ভাই আছে টোরাদিদি। তোমার মত আমিও তাদের গান শোনাতাম। তাদের সঙ্গে কত খেলা করেছি। ভোরের আকাশে সূর্যের ঝিকিমিকি আলোয় ডানা মেলে কতদিন আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে উড়ে বেরিয়েছি। ওই খোলা আকাশই যে আমাদের বাড়ি।"

পাখির কথা শুনতে শুনতে টোরার চোখের পাতা দুটি ছলছল করে উঠল। টুপ করে এক ফোঁটা জল মাটিতে

পড়ল।

পাখি বললে, "কাঁদছ টোরাদিদি?"

টোরা বললে, "তোমার যে এত দুঃখ, সে তো আমি জানতুম না।"

"টোরাদিদি, নিজে দুঃখ না-পেলে, অন্যের দুঃখ বুঝবে কেমন করে?" পাখি উত্তর দিলে।

টোরা কাঁদতে কাঁদতেই বললে, "পাখি, আমি যখন তোমায় দুঃখ দিয়েছি, তখন তুমি আমায় শাস্তি দাও!"

পাখি বললে, "না টোরাদিদি, তোমার কোন দোষ নেই। তুমি যা করেছ সে তো তোমার মাকে সুখী করার জন্যে। তুমি এই যে এত কষ্ট করলে, সেও তো তোমার মায়ের জন্যে। মাকে সুখী করার জন্যে যে এত কষ্ট সহ্য করে, সে কখনও শাস্তি পায়? সে সবার ভালবাসা পায়।"

"তাহলে তুমি আমায় ভালবাস?" জিগ্যেস করল টোরা।

"হ্যাঁ টোরাদিদি, আমি তোমায় ভালবাসি। ভালবাসি বলেই তোমাকে আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাবার পথ দেখিয়ে দেব।"

টোরার মুখখানা খুশিতে উছলে গেছে। বললে, "পাখি, তুমি যে এত ভাল, আমি তা বুঝতে পারিনি।"

পাখি বললে, "টোরাদিদি, তোমার হাতে প্রদীপ। তাই তোমাকে যাবার আগে একটি কাজ করতে হবে, পারবে?"

টোরা জিগ্যেস করলে, "কী কাজ, পাখি?"

"ওই দেখো, তোমার মাথার ওপর একটি লণ্ঠন দুলছে।"

চকিতে চোখ তুলল টোরা। জিগ্যেস করল, "আমায় কী করতে বলছ?"

"তোমার ওই প্রদীপের আলো দিয়ে ওই লণ্ঠনটি জ্বালিয়ে দাও। অন্ধকারে থাকতে আমার বড্ড কষ্ট হয়।"

"কেন, তুমি আমার সঙ্গে যাবে না? আমি কথা দিচ্ছি পাখি, তোমাকে আর আমি বন্দী করব না।"

পাখি উত্তর দিলে, "না টোরাদিদি, আমি তো এখান থেকে আর যেতে পারব না। আমি তো মরে গেছি। এখন আমি এই অন্ধকার গহ্বরেই থাকব। এই অন্ধকার গহ্বরই এখন আমার স্বর্গ! এখান থেকে আর আমি কোথাও যাব না। তুমি আলোটা জেবলে দাও। ওই আলোই হবে আমার বন্ধু।"

পাখির কথা শুনে টোরার বুকটা কেমন ভার হয়ে গেল। হ্যাঁ, সত্যিই তো! ওরই তো হাতের মুঠির চাপে পাখি প্রাণ হারিয়েছে! আড়ষ্ট চোখে পাখির মুখের দিকে চাইল টোরা! চোখ সরিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে তাকাল। ওই ঝুলন্ত লণ্ঠনটার দিকে। না, অনেক উঁচু না। সামনে ওই পাথরের চাঁইটার ওপর দাঁড়ালেই ওর হাত যাবে। ওখানে দাঁড়িয়ে টোরা হাত বাড়িয়ে, তার হাতের প্রদীপের আলো দিয়ে লণ্ঠনের আলো জ্বালাতে পারবে।

টোরাকে অমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পাখি জিগ্যেস করলে, "কী ভাবছ? জ্বালবে না?"

টোরা উত্তর দিলে, "হ্যাঁ, জ্বালব।"

টোরা হাত বাড়াল। ওর প্রদীপের শিখাটি দুলতে-দুলতে লণ্ঠনের শিখাটা ছুঁয়ে গেল। লণ্ঠন জ্বলে উঠল। ভেসে গেল সেই গহ্বর আলোর বন্যায়। যেখানে যত আলো ছিল সব যেন ছড়িয়ে পড়েছে সেই অন্ধকার গহ্বরে। স্বর্গের রঙিন ছবির মত সেই গহ্বর ঝলমলিয়ে উঠল। পাখির মনের অনেক, অনেক সুখ ওর দু চোখের পাতায় ছড়িয়ে পড়েছে। পাখি আনন্দে বলে উঠল, "আঃ!"

হঠাৎ টোরা দেখে কী, গহ্বরে সেই রঙিন স্বর্গে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি উড়ে আসছে। ফুল ফুটেছে। মৌমাছি নাচছে। ফুলে ফুলে গান গাইছে। টোরা অবাক হয়ে গেল। জিগ্যেস করলে, "এরা কোথা ছিল? এরা কারা?"

"এতদিন অন্ধকারে এরা অন্ধ হয়ে ছিল। এরা আমার বন্ধু। আমার আনন্দ।" পাখি খুশিতে উছলে উঠে বললে।

টোরা বললে, "আমিও এদের সঙ্গে আনন্দ করব।"

পাখি উত্তর দিলে "না টোরাদিদি, না। তোমার আনন্দ তোমার বাড়িতে। তোমার আনন্দ তোমার মা, তোমার বাবা, তোমার ভাই। তোমার আনন্দ এই গহ্বরের অন্ধকারে নয়, ওই নীল আকাশের নীচে। সে-আনন্দ তোমায় ডাকছে।"

পাখির কথা শুনে টোরার দু চোখ আবার জলে ভরে গেল।

পাখি বললে, "এখানে কাঁদতে নেই টোরাদিদি।"

টোরা তাড়াতাড়ি তার চোখ দুটিতে আঁচল চাপা দিলে। বললে, "না পাখি, আমি কাঁদছি না। তোমায় দেখছি।"

পাখি বললে, "টোরাদিদি, এবার তোমার যাওয়ার পালা। ওই দেখো তোমার পথ।"

"কই?"

"ওই যে পাথরের দরজা খুলে গেছে।"

টোরা অবাক হয়ে চাইল। হ্যাঁ সত্যিই তো! জিগ্যেস করলে, "ওখান দিয়ে আমার যেতে হবে?"

"ওখান দিয়ে তোমায় ওপরে উঠতে হবে। এই পাথরে পাথরে পা ফেলে।"

"তবে আমি যাই পাখি।"

পাখি আবার সেই দোলনায় দুলতে দুলতে, দোলনার ঝুনঝুনিটা বাজাতে বাজাতে বললে, "টোরাদিদি, তুমি সুন্দর।"

টোরা দু হাত বাড়িয়ে পাখিকে বললে, "তুমি আরও সুন্দর।"

পাখি আনন্দে টুটুর-টুটুর করে ডেকে উঠল। অমনি সুন্দর সেই আলো-ঝলমল গহ্বরের স্বর্গে অনেক, অনেক আনন্দ একসঙ্গে গান গেয়ে উঠল। আর সেই গান শুনতে শুনতে টোরা গহ্বরের দরজা ডিঙিয়ে পা ফেললে, একটি একটি পাথরের ওপর। একা একা সে এগিয়ে চলল। গহ্বর থেকে আকাশের দিকে। তার সঙ্গী শুধু তার হাতের এই প্রদীপ। আর সঙ্গী তার এই প্রদীপের আলোয় নিজের ছায়া।

তারপর হঠাৎ মুখ ফেরাল টোরা তার পিছনে। দেখে, এ তো শুধু তার ছায়া নয়। ওর পিছনে পিছনে ওরা কারা আসছে দল বেঁধে! সেই কিম্ভূতকিমাকার না-মানুষ না-জন্তুগুলো না? ওরাই তো ওকে ঢেলা মেরেছিল! ওরা কি আবার তাকে মারবে?

না। টোরা যে-পথ দিয়ে যাবে, সে-পথে ওরাও যাবে। টোরা যদি পথে বিপদে পড়ে, ওরা সে-বিপদ দূর করবে। তারপর টোরা যখন এই পাথরের পাহাড় পেরিয়ে ওপরে উঠে যাবে তখন ওরা বলবে হয়তো, "আমরা জানতুম না, তুমি এত লক্ষ্মী। তাই তোমার গায়ে আমরা হাত দিয়েছি। তোমায় মেরেছি। তুমি আমাদের ক্ষমা করো।" তারপর পাথরের ওপর গড়াতে গড়াতে ওরা আবার গহ্বরে নেমে আসবে। তখন কেউ জানতেও পারবে না, প্রাণহীন সেই পাখির সঙ্গে আরও কত প্রাণহীন জীব গহ্বরের স্বর্গে, আলোর নীচে বসে বসে টোরা নামে একটি মেয়ের জন্যে কাঁদছে। কেননা, সে যে তাদের জন্যে অন্ধকারে আলো জেবলে গেছে!

টোরা পৌঁছে গেল। পৌঁছে গেল পাতালের অন্ধকার

থেকে পাহাড়ের পায়ের কাছে। আকাশের দিকে চাইল টোরা। আঃ! শেষ রাতের আকাশ ভারি শান্ত। কে যেন খুব সাবধানে শান্ত আকাশের গা থেকে তারার চুমকি গাঁথা ওড়নাখানি ধীরে ধীরে সরিয়ে নিচ্ছে। একটু পরেই ভোরের মুখখানি দেখতে পাবে টোরা।

ঘণ্টা বেজে উঠল। কোথায়? ভারি গম্ভীর সেই ঘণ্টার ধ্বনি। সেই গম্ভীর সুর হাওয়ায় যেন কেঁপে কেঁপে নাচতে নাচতে, দূরে, আরও দূরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। শিউরে উঠল টোরা। হয়তো আনন্দে, কিম্বা ভাবনায়! তাড়াতাড়ি পা ফেলল টোরা। ওকে যে এখুনি পৌঁছুতে হবে দেবতার কাছে। যতক্ষণ না এ প্রদীপ তাঁর সামনে রাখতে পারছে টোরা, ততক্ষণ ওর নিস্তার নেই। ঠাকুর বলেছেন, তারপরেই টোরা সব ফিরে পাবে।

এসে গেছে টোরা। দেবতার সেই গুহার সামনে এসে দাঁড়াল। ওহো! ঘণ্টা যে গুহার ভেতর থেকেই ভেসে আসছে! তা হলে এ তো দেবতার ঘণ্টা।

হ্যাঁ, দেবতার ঘণ্টা। এই ঘণ্টা যেন ডাক দিচ্ছে টোরাকে। বলছে, "এস। এখানে তোমার জন্যে আনন্দ লুকানো আছে!"

ধীরে ধীরে ঢুকে গেল টোরা গুহার-মন্দিরে। তারপর দেবতার সামনে এসে দাঁড়ায় টোরা। ওই সেই দেবতা। দেবতার মুখের দিকে তাকিয়ে টোরার গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল দুচোখ দিয়ে। টোরা সোনার প্রদীপটা দেবতার পায়ের কাছে রাখলে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে হাতজোড় করে বললে, "ঠাকুর, আমি তোমার কথা রেখেছি। ফুলের চোখের জল দিয়ে তোমার সোনার প্রদীপ আবার জেলে এনেছি। এবার তুমি আমার ভাইকে ফিরিয়ে দাও।" বলে টোরা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ঠাকুরের পায়ে প্রণাম করল। আর ঠিক তক্ষুনি ঘণ্টার বাজনা নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

টোরা বুঝতে না বুঝতেই কে যেন ওর গায়ে হাত দিল! গায়ে হাত দিয়ে ডাকল, "দিদি!"

চমকে উঠল টোরা। এ কী! এ যে বাদশার গলা।

হ্যাঁ, বাদশাই আবার ডাকল, "দিদি!"

দিদি চকিতে মাথা তুললে। তার চোখ দুটি অবাক-বিস্ময়ে চেয়ে রইল বাদশার মুখের দিকে।

"দিদি, আমি।"

"বাদশা!" হঠাৎ চিৎকার করে উঠল টোরা। এমন চিৎকার সে যেন জীবনে আর কোনদিন করেনি। জড়িয়ে ধরল বাদশাকে। তারপর কেঁদে ফেলল, হাউহাউ করে।

বাদশা দিদির চোখের জল মুছতে মুছতে বললে, "কাঁদিস না দিদি। আমি জানতুম তুই এখানে আসবি। ঠাকুর আমায় বললেন যে। বললেন ঘণ্টা বাজাতে। ঘণ্টা বাজালেই তুই শুনতে পাবি। তাইতো আমি সারা রাত ঘণ্টা বাজিয়েছি।"

"সারারাত!" টোরা বাদশার চিবুকটি ধরে অস্ফুট স্বরে জিগ্যেস করলে।

"তাতে কী হয়েছে। ঘণ্টা বাজাতে আমার বেশ লাগছিল।"

দিদি জিগ্যেস করলে, "তুই এখানে কেমন করে এলি বাদশা?"

"তোকে খুঁজতে খুঁজতে।"

"আহা! কত কষ্ট হল তোর!"

"না রে! আমার একটুও কষ্ট হয়নি। দেখ না, আমি কি তোর মত কাঁদছি? কষ্ট হলে তো মানুষ কাঁদে।"

টোরা বাদশার কপাল থেকে এলোমেলো চুলগুলি সরিয়ে দিল ভারি যত্নে। তারপর ভাই-বোন শেষবারের মত ঠাকুরের পায়ে প্রণাম করল। উঠে দাঁড়াল। সোনার প্রদীপের আলোয় ওরা এবার স্পষ্ট দেখতে পেলে ঠাকুরের মুখখানি। ঠাকুরের চোখ দুটিতে হাসি ফুটেছে।

দিদির হাত ধরল বাদশা। ধীরে ধীরে গুহার মন্দির থেকে বাইরে বেরিয়ে এল দু-জনে। বাইরে, আকাশে রাত কেটে আলো এসেছে।

বাদশা দিদির চোখের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলে, "বাড়ি যাবি না?"

দিদি বললে, "চ"।

"কোনদিকে?"

"ওই তো, ওই দিকে।" আঙুল দেখাল টোরা, "ওই যেদিক দিয়ে রেলগাড়ি যায়, ওই পথ ধরে হাঁটব।"

যেদিকে দিদি আঙুল দেখাল, সেইদিকে বাদশা চোখ তুলে দেখলে। তাই তো! ওই দেখো, পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে রেল লাইনটা কেমন এঁকে বেঁকে চলে গেছে! ছুটে গেল বাদশা সেইদিকে। লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে হেঁকে উঠল, "কু-কু, ঝিক-ঝিক।" তারপর চেঁচিয়ে দিদিকে ডাক দিয়ে বললে, "দিদি, আজ আমি নিজেই রেলগাড়ি হয়েছি। তোকে বাড়ি নিয়ে যাব। ছুটে আয়, নইলে গাড়ি ইসটিশান ছেড়ে যাবে।"

বাদশার কথা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল টোরা। তারপর সত্যিই ছুটে গেল। বাদশার হাত ধরলে। গাড়ি ছুটল কু-কু, ঝিক-ঝিক।

ভোরের সোনার আলোর মত, যেন দুটি সোনার টুকরো গড়িয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের গা বেয়ে। দুটি ভাই-বোন, টোরা আর বাদশা।

ছবি বিমল দাশ

সাইক্লপের জয়-বাংলা

নবনীতা দেবসেন

টুমটুম আর পিকপিক একদিন বারান্দায় বৃষ্টির জলে নৌকো ভাসাচ্ছিল, এমন সময় একটা নৌকো বারান্দার বড় নালিটা দিয়ে গলে গেল। 'ধর ধর' করতে-করতে টুমটুমও জলের সঙ্গে নলের ভেতর পড়ে গেল। পড়েই ভ্যানিশ! পিকপিক তো একটু বড়, 'হায় হায়' করতে করতে সে তখন দিম্মার কাছে ছুটল, কেননা নালির পাইপ দিয়ে সে গলতে পারল না। বড্ড রোগা বলে টুমটুম সিধে গলে গেছে!

জলের তোড়ের সঙ্গে ভেসে গিয়ে টুমটুম পড়ল মাটির তলার নীল সমুদ্রে। দ্যাখে, তাদের নীল কাগজের নৌকোটা আগে-আগে ভেসে যাচ্ছে। টুমটুম কোনরকমে সাঁতরে গিয়ে সেটা ধরে উঠে বসল। ভয় পেলে তো আর বাড়ি পৌঁছুতে পারবে না, গালে হাত দিয়ে টুমটুম কেবল ভাবতেই লাগল আর ভাবতেই লাগল। এমন সময় নৌকো এসে ঠেকল একটা সুন্দর দ্বীপে। টুমটুম নেমে পড়ল, নৌকোটাকেও তুলে ডাঙাতে একটা শুকনো জায়গা দেখে শুকোতে দিল। কাগজটা ভিজে নৌকো প্রায় খুলে এসেছে। সঙ্গে দিদিও নেই, কে আবার গড়ে দেবে এমন সুন্দর নীল সিলোফেন কাগজের নৌকো? টুমটুম ফ্রকের কোনায় চোখের জল মুছে নাকের জল মুছে হাঁটতে লাগল। একটা মস্ত উঁচু পেয়ারা গাছের নীচে এসে তার মনটা একটু ভাল হল। কী সুন্দর ডাঁশা-ডাঁশা পেয়ারা ঝুলে আছে। টুমটুম ভাবলে, আহা, আমি যদি চড়তে পারতুম!

এমন সময়ে কে যেন তাকে মুঠোর মধ্যে ধরে শূন্যে তুলে নিলে। ও বাবা রে! ও মা রে! এ কীরে! টুমটুম চমকে চেয়ে দেখে, একটা বিশাল একচোখ-ওয়ালা দৈত্যের হাতে সে ধরা রয়েছে। টুমটুম তাকে চিনতে পারলেঃ সাইক্লপ! বাবা যে গ্রীসের রূপকথার বই দিয়েছেন, তাতে এদের গল্প আছে—ইউলিসিস এদের দেশে গিয়ে পড়েছিলেন।

তার হাতে একটা ডাঁশা পেয়ারা তুলে দিয়ে সাইক্লপ হেঁড়ে গলায় হুংকার দিয়ে বললে, "হুম! হুম! তুমি আমার পেয়ারা কাঁচাই খাও, আর আমি বরং তোমাকে ভেজে খাই!"

টুমটুম প্রায় কেঁদে ফেলে আর কী। তার বাঁ চোখে একেই ভয়ানক 'জয়-বাংলা' অসুখ করেছে, ফেঁপে ফুলে লাল জবার ফুল, আর ডানচোখেও হল বলে—কুটকুট করতে শুরু করেছে বহুক্ষণ, তার ওপর সাইক্লপ বলে কিনা ভেজে খাবে? হঠাৎ একটা দুর্বুদ্ধি তার মনে উদয় হল। সে বললে, "তোমার সঙ্গেই তো দেখা করতে এসেছি। ইউলিসিস রাজা আমাকে পাঠিয়েছেন। নমস্কার।" বলে সে সাইক্লপের চোখের খুব কাছাকাছি হেলে গিয়ে নমস্কার করলে। সাইক্লপের বিরাট চোখের মণিতে তার লাল ফ্রকপরা পুরো শরীরটার রঙিন ছায়া পড়ল। টুমটুম বললেঃ "তোমার চোখটা একটু লাল-লাল মনে হচ্ছে? আমার মতন জয়-বাংলা হয়নি তো?"

সাইক্লপের তো ইউলিসিসের নাম শুনেই গায়ের রক্ত জল হয়ে গেছে। তার ওপর 'জয় বাংলা'—'জয় হিন্দ' এসব ভাল ভাল বীরত্বপূর্ণ কথা শুনলে তার দৈত্যের রক্ত আরও জল হয়। সে ভিতু-ভিতু নরম গলায় বললে, "সেটা আবার কী? আমার চোখ তো এইরকমই।"

টুমটুম বুঝলে, ভেজে-টেজে খাবার কথা আর তার মনে নেই, তখন বললে, "উঁহু, বেশ বুঝেছি, তোমার জয়-বাংলাই হয়েছে। তুমি নিশ্চয় জয়-বাংলাওলা কোনো লোককে খেয়েছিলে সম্প্রতি?"

সাইক্লপ একটু ভেবে বললে, "পরশু অবশ্য একজন ভুঁড়িওয়ালা লোক তার গুপ্তধন লুকিয়ে রাখবে বলে মাটি খুঁড়তে-খুঁড়তে ঠিক এখানেই এসে পড়েছিল, তাকে দই-কচৌড়ি করে খেয়েছিলাম।"

টুমটুম বললে, "ঠিক এইখানেই এসে পড়েছিল? তবে আর বলতে হবে না। নির্ঘাত কোনো কালোবাজারী, কলকাতার লোক! আর সেখানে প্রত্যেকেরই 'জয়-বাংলা'। তোমারও 'জয়-বাংলা'ই হয়েছে। চোখ কুটকুট করছে না? ঈশ, কী লাল! ঐ তো দেখছি বেশ জলও পড়ছে।" বলেই টুমটুম তার কোঁকড়া চুলের একগাছি ছিঁড়ে সাইক্লপের চোখে ফেলে দিল।

অত বড় চোখ দিয়ে তো সে চুলের মত সূক্ষ্ম জিনিস দেখতে পায় না, সাইক্লপ কিছুই বুঝল না। কিন্তু কোঁকড়া চুলের জ্বালায় চোখ কুটকুটুনি শুরু হল। সাইক্লপ বলল, "সত্যি তো, চোখটা কেমন-কেমন করছে!"

টুমটুম বললে, "হয়েছে আর কী, জয়-বাংলা। স্যালাইন ওয়াটার দিয়ে ধোও, আরাম পাবে।" স্যালাইন ওয়াটার কাকে বলে? সাইক্লপ বাহাদুর তা জানেন না। "সেটা আবার কী?"

এমন সময় টুমটুম দেখে সত্যি - সত্যিই সাইক্লপের মস্ত চোখটা ভোরের সূয্যির মত টকটকে লাল হয়ে উঠল, চোখের কোণে মেঘের মতন পিচুটি জমতে লাগল! আরে আরে আরে, সত্যি-সত্যিই যে সাইক্লপের জয়-বাংলা হয়ে গেল? তার মানে টুমটুমের থেকেই ছোঁয়াচটা লাগল বোধ হয়? টুমটুম বললে, ও সাইক্লপ, তোমার সত্যি সত্যি জয়-বাংলা হয়েছে। ইউলিসিস আমাকে যে জরুরি কাজের জন্য পাঠালেন, সেটা কি তুমি আর পেরে উঠবে?"

সাইক্লপের এক মুঠোতে টুমটুম, আর অন্য মুঠোতে সে চোখ কচলাচ্ছে। "তুমি কী-যেন ওষুধ বললে? সেটা শিগগির দাও তো দেখি, আমার যে বড্ড কষ্ট হচ্ছে।"

টুমটুম বললে, "এই যে নীল সমুদ্রের জল, এটাই স্যালাইনওয়াটার—তুমি এই দিয়ে চোখ ধোও।"

সাইক্লপ কি সেকথা বিশ্বাস করবার পাত্র? সে বললে, "ইয়ার্কি রাখো, শিগগির এনে দাও স্যালাইনওয়াটার—নইলে তোমাকে বীটনুন দিয়ে কাঁচাই খেয়ে ফেলব।"

টুমটুম দেখল আচ্ছা মুশকিল! তখন বললে, "বেশ তো, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো, সেখানে লক্যালা থার্টি আছে, আমি তোমাকে দিচ্ছি।"

সাইক্লপ বললে, "আমি কী করে তোমায় নিয়ে যাব, রোদ লেগে আমার চোখ ব্যথা করছে যে।"

টুমটুম বললে, "কুছ পরওয়া নেই। চশমা বানিয়ে দিচ্ছি।" বলে তার নীল সিলোফেন কাগজের নৌকোটা খুলে ফেলে পেয়ারা গাছের সরু সরু কাঠি দিয়ে বেঁধে একটা চশমা-মতন তৈরি করে ফেললে সাইক্লোপের কানের মাপে। ঝাঁকড়া চুলে সেটা ভাল করে আটকে দিলে।

সাইক্লপ দেখলে, সারা পৃথিবীটা যেন জুড়িয়ে গেল। আকাশ বাতাস সব নীল! আহ্, এমন আরাম সে জীবনে পায়নি। সে বললে "এই বুঝি স্যালাইন ওয়াটার?"

টুমটুম বললে "না, এটা সানগ্লাস। এবার আমায় বাড়ি নিয়ে চলো, তোমাকে ওষুধ দেব।"

সাইক্লপ তখন ওপর দিকে তাকিয়ে ওকে এক হাত দিয়ে খুব উঁচুতে তুলে ধরল। টুমটুম দেখলে, ওমা! সে বারান্দার রেলিঙে পৌঁছে গেছে। এক দৌড়ে ঘর থেকে লক্যালার শিশিটা নিয়ে এসে দেখে, ভোঁ ভোঁ—কই, বারান্দায় তো কারুর হাতটাত নেই? এমন সময় বৃষ্টিজলের নল দিয়ে গুম গুম করে শব্দ হল। "হুম হুম—কই, ওষুধ কই?"

টুমটুম অমনি "এই যে ওষুধ" বলে শিশিটা নালির মধ্যে ফেলে দিলে। হুড়হুড় করে কিছু জল সেটাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল। টুমটুম ঠিক জানে, সাইক্লপ যেখানে চশমা পরে হাত মেলে বসে আছে, সেইখানে, তার মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়বে শিশিটা।

এমন সময়ে দিম্মাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে পিক-পিক এসে দেখে, টুমটুম উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে নালির ফুটো দিয়ে কী যেন দেখছে। পিকপিক অবাক হয়ে চোখ গোল গোল করে বললে, "কী করে উঠে এলি?"

টুমটুম বললে, "ম্যাজিক!"

ছবি সুনীল শীল

অন্যমনস্ক

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ছাতাটি বগলে, পোস্টকার্ড দিয়ে
মুখটা আড়াল করে,
নিধিরামবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন
আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে
বেলা বারোটায় কাঠফাটা রোদে,
বাসের অপেক্ষাতে।
আসতেই গাড়ি উঠলেন গিয়ে
সিঁড়ি দিয়ে দোতলাতে
তিনি তাড়াতাড়ি। দিল সীট ছাড়ি
ভক্ত পাঠক কেহ,
"থাক থাক্, কেন উঠছেন?" বলে
এলিয়ে ক্লান্তদেহ
বসলেন তিনি ঘাম মুছে যেই
কণ্ডাক্টার এসে
চাইল পয়সা; আধুলি একটি
বাড়িয়ে দিলেন হেসে।
টিকিট দিয়ে সে চলে গেল বাকী
পয়সা ফেরত দিয়ে।
পকেটে টিকিট রেখে নিধিরাম
পয়সা হাতেতে নিয়ে
বার করে ছোটো কবিতার খাতা
তাইতে গেলেন ডুবি।
চিৎপুর পার না হতে বাসেতে
ভিড় বেড়ে গেল খুবই।
গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে মানুষ;
যেই কণ্ডাক্টার
টিকিট দেখতে চায় নিধিরাম
পয়সা হাতেতে তার
দেন তুলে। ক্রমে হাতের পয়সা
নিঃশেষে ফুরোতেই
পকেটেতে খুঁজে দেখলেন সেথা
মনিব্যাগ তাঁর নেই!
বাড়িতেই ফেলে এসেছেন-না-কি
নিয়েছে পকেটমারে—
কে জানে? কেবল তিনটে টিকিট
বার হ'ল একবারে।
পড়লেন নেমে ছাতা ফেলে; নেই
ট্রেন ধরবার তাড়া;
ফিরলেন হেঁটে না-থাকায় গাঁটে
ট্রেনভাড়া বাসভাড়া।

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম ধাঁধা

চটপট বলো দেখি—

ক। কোন্ জায়গা কাকের বাসা?

খ। দাঁত মাজা যায় কোন জায়গা দিয়ে?

গ। কোন জায়গা দারুণ ঠান্ডা আর দারুণ মিষ্টি?

ঘ। কোন জায়গা সমুদ্র?

দ্বিতীয় ধাঁধা

চল্লিশ কিলোর এক বিরাট বাটখারা ছিল এক মুদির। শুধু ওই একটিমাত্র বাটখারা নিয়ে তো আর দোকান চালানো যায় না। তাই সে অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে বাটখারাটাকে চার টুকরো করে নিল। চারটে চার মাপের টুকরো। চার রকম ওজন। কিন্তু তাই দিয়েই সে দিব্যি কাজ চালিয়ে নিতে পারে। এক কিলো থেকে চল্লিশ কিলো পর্যন্ত ওজন করা আর শক্ত কাজ নয়।বলতে পারো, চারটে টুকরো কীভাবে ভাগ করেছিল সেই মুদি?

তৃতীয় ধাঁধা

একটি শব্দের আরম্ভে যা রয়েছে, শেষে তাই রয়েছে, মাঝে লুকিয়ে রয়েছে ইচ্ছে। শব্দটা কী বলতে পারো?

চতুর্থ ধাঁধা

নীচে কয়েকজন দেব-দেবী আর তার বাহনের নাম ছাপা হল। কিন্তু সব ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। ঠিকঠাক করে বসাতে পারো?

বিশ্বকর্মা	মৃগ	মনসা	ছাগ
বিষ্ণু	অশ্ব	গঙ্গা	গরুড়
অগ্নি	গর্দভ	শীতলা	হস্তী
সূর্য	মকর	ষষ্ঠী	হংস
যম	বিড়াল	পবন	মহিষ

পঞ্চম ধাঁধা

নীচে ছটা জায়গার নাম দেওয়া হল। এর মধ্যে লুকনো রয়েছে তোমাদের অতি প্রিয় এক চরিত্রের নাম। নামটা কী, বার করতে হবে।

১ কাগোশিমা	৩ আন্দামান	৫ ডুলুস
২ ভিয়েনা	৪ সফেদাবাদ	৬ মাদাগাস্কার

ষষ্ঠ ধাঁধা

নীচের চিঠিটায় কিছু কিছু '——' চিহ্ন দেওয়া আছে। মানানসই কিছু ফল বা তরকারির নাম বসালেই চিঠিটার মর্ম উদ্ধার করা সম্ভবপর। দেখ তো, পার কি-না?

ভাই ——ক,

তুমি যে নিরাপদে ———গুড়িতে পেঁছে গিয়েছ, এ-খবর পেয়ে ——রা নিশ্চিন্ত হলাম। এ—— অত টাকা ও সোনার অ——র নিয়ে রাতের গাড়িতে যাওয়া খুবই ভয়ের। প্রায়ই তো খা——রি ডাকাতির কথা শুনি। কোনো ——স্তর যে ঘটেনি ঈশ্বরের অ—— অনুগ্রহে বলতে হবে।

——শেদপুর থেকে ন—— এসেছিল কাল। ওর ছেলে ন——কিশোরের চাকরির জন্য ——শ করতে। ছেলেটি তো অকাল——, পড়াশুনায় অষ্ট——, টেস্টে স্কুলই অ্যা—— করেনি। এখান থেকে গেল দিদির বাড়ি, ওর দিদিরা ——ডাঙ্গার ভাড়া বাড়ি ছেড়ে এখন অল্প দূরে ——গাছিতে ফ্ল্যাট কিনেছে। জামাইবাবু ——পাহাড়ীতে কারখানা খুলেছেন। তবে যা কড়া লোক, নিজের নীতি থেকে এ——লও নড়বেন বলে মনে হয় না। ওর অবশ্য বিরাট ভরসা, বহু আগে থেকে —— করে রেখেছে। গাছে ——, গোঁফে তেল আর কাকে বলে। পারলে অবশ্য এই বাজারে —— ——ভ নয়।

আজ এখানেই শেষ ——ম। ইতি

——ল

সপ্তম ধাঁধা

কানতাকুগো পাকামাকোতু

না-না, কোনো বিদ্ঘুটে ভাষা নয়। কলকাতা থেকে শুরু করে পূর্ব উপকূল ধরে ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে পেঁছে ফের পশ্চিম উপকূল ধরে গুজরাট পর্যন্ত পেঁছনোর পথের পাঁচটি নদী ও পাঁচটি বন্দরের নামের আদ্যক্ষর এর মধ্যে লুকনো। সংকেত ভেদ করে নামগুলো বের করতে পার? পর পর সাজিয়ে বলতে হবে কিন্তু।

অষ্টম ধাঁধা

এক চাষী মৃত্যুকালে বলে গিয়েছিল যে, তার সম্পত্তির ১/৩ অংশ পাবে বড় ছেলে, ১/৪ অংশ মেজো ছেলে, ১/৬ অংশ সেজো ছেলে. ১/৮ অংশ ছোট ছেলে আর ১/৯ অংশ মেয়ে।

তার মৃত্যুর পর দেখা গেল, ওইভাবে ভাগ করা অসম্ভব। কেননা, সম্পত্তি বলতে শুধু কয়েকটি গোরু। আস্ত গোরু তো আর টুকরো করে ভাগ করা যায় না। ছেলে-মেয়েরা পড়ে গেল মহা ফ্যাসাদে। এক প্রতিবেশী ভদ্রলোক সব শুনে চট করে একটা সমাধানের পথ বাতলে দিলেন। তিনি করলেন কী, নিজের গোয়াল থেকে একটি গোরু ধার দিলেন ওদের। বললেন, এটাকে ধরে নিয়ে প্রথমে যে যার ভাগ বুঝে নাও। পরে আমারটা ফেরত দিয়ে দিয়ো। তাহলেই সমস্যা মিটে যাবে।

সত্যিই মিটে গেল। প্রত্যেকে খুশি মনে তার অংশ বুঝে নিল আর প্রতিবেশীটিও তার গোরু ফিরে পেলেন। বলতে পারো, মোট কটা গোরু ছিল সেই চাষীর আর ছেলে-মেয়েরা কে কটা করে পেল?

নবম ধাঁধা

এক মহিলা তাঁর জন্মদিনে পাঁচ জন প্রতি-

বেশিনীকে চায়ের নেমন্তন্ন করেছেন। গোলমতন একটা টেবিলে গৃহকর্ত্রীসমেত মোট ছ-জন মহিলা একসঙ্গে বসে চা খাচ্ছেন। মহিলাদের নাম শ্রীমতী মমতা, শ্রীমতী সাধনা, শ্রীমতী মায়া, শ্রীমতী নমিতা, শ্রীমতী জয়া ও শ্রীমতী দেবী। নামগুলো, বলা বাহুল্য, পরপর বলা হয়নি।
এদের মধ্যে একজন কানে কম শোনেন, একজন দারুণ মোটাসোটা, একজন বড়ো বেশি কথা বলেন, একজন খুব পরোপকারী, একজন শ্রীমতী দেবীর সম্পর্কিত বোন, একজন নিমন্ত্রণকর্ত্রী।
দেবীর বোন বসেছেন জয়ার ঠিক উল্টোদিকে, মুখোমুখি। কানে খাটো যিনি, তিনি বসেছেন সাধনার উল্টোদিকে—সাধনা আবার পরোপকারী মহিলা ও দেবীর বোনের মাঝখানে। মোটাসোটা মহিলাটি মায়ার মুখোমুখি, কানে খাটো মহিলার পাশে এবং দেবীর বোনের ডান পাশে। দেবীর বোনের উল্টোদিকে যে মহিলা তাঁর এবং সাধনার মাঝখানে বসেছেন পরোপকারী মহিলাটি। মমতা—যাঁর সঙ্গে নাকি প্রত্যেকেরই দারুণ ভাব, বিশেষ করে দেবীর—বসেছেন মোটাসোটা মহিলার পাশে এবং নিমন্ত্রণকর্ত্রীর উল্টোদিকে।
প্রত্যেকটি মহিলাকে আলাদা করে চিনে কে কোথায় বসেছে বলা যায় কি-না, দেখ তো ?

দশম ধাঁধা

কোন্ শব্দের শুরু বা শেষ নাই ?

নীচে উলটো করে উত্তর বসানো আছে

উত্তর

১। (ক) কাকদ্বীপ, (খ) দাঁতন, (গ) কুলপী, (ঘ) সাগর।
২। ১ কিলো, ৩ কিলো, ৯ কিলো এবং ২৭ কিলো। হিসেব করে দেখো এই চার রকম বাটখারা দিয়েই এক থেকে চল্লিশ কিলো পর্যন্ত ওজন করা সম্ভবপর।
৩। যাচ্ছেতাই (যা+ইচ্ছে+তাই)
৪। বিশ্বকর্মা—হস্তী, বিষ্ণু—গরুড়, অগ্নি—ছাগ, সূর্য—অশ্ব, যম—মহিষ, মনসা—হংস, গঙ্গা—মকর, শীতলা—গর্দভ, ষষ্ঠী—বিড়াল, পবন—মৃগ।
৫। 'গোয়েন্দা ফেলুদা'। প্রতিটি জায়গায় শুধু দ্বিতীয় অক্ষর পড়ে যাও—তাহলেই পাওয়া যাবে এই প্রিয় চরিত্রের নাম।
৬। শশা, জলপাই, আম, কলা, লঙ্কা, লিচু (খালি চুরি) আতা, সীম, জাম, কুল, ওল, সুপারি, কুষ্মাণ্ড, রম্ভা, লাউ নারকেল, কাঁকুড়, বেল, কচু, তাল, কাঁঠাল, কমলা (কম লাভ) করলা, কপি।
৭। গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, তাপ্তী, নর্মদা—এই পাঁচটি নদী এবং পারাদীপ, তুতিকোরিন, কোচিন, মাঙ্গালোর, কাণ্ডালা—এই পাঁচটি বন্দরের প্রথম অক্ষরগুলো নিয়ে ওই বিদ্ঘুটে শব্দ দুটি তৈরি হয়েছে।
৮। ৭১টি গোরু। বড় ছেলে ২৪, মেজ ১৮, সেজ ১২, ছোট ৯ এবং মেয়ে পাবে ৮টি গোরু।
৯। যেভাবে বসেছেন ছ-জন মহিলা তা হল, সাধনা, মায়া, জয়া, মমতা, দেবী ও নমিতা। এঁদের মধ্যে সাধনা নিমন্ত্রণ-কর্ত্রী, পরোপকারী মায়া, জয়া বেশী কথা বলেন, কানে খাটো মমতা, দেবী মোটাসোটা এবং নমিতা হলেন দেবীর বোন।
১০। বানাই। শুরু 'বা' এবং শেষ 'নাই'

ভুলি

দিব্যেন্দু পালিত

ভুলির সঙ্গে আমাদের যে খুব একটা চেনাজানা ছিল তা নয়। তবে অনেকদিন একসঙ্গে কাছাকাছি থাকতে-থাকতে দেখতে-দেখতে শুনতে-শুনতে যে-রকম ভাব-ভালবাসা গড়ে ওঠে, আর মায়া পড়ে যায় একটা, অনেকটা তেমনি, ভুলিও ক্রমশই আমাদের চোখ-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। তার নামটাও দিয়েছিলাম আমরা।

রবিবার কিংবা অন্য কোনো ছুটির দিনে যেদিন আমাদের বাড়িতে একটু ভালমন্দ খাওয়া-দাওয়া হত— কলাইয়ের থালায় উপছে পড়ত এ'টোকাঁটা, সেসব দিনে রাস্তায় বেরিয়ে 'ভুল-ই-' বলে ডাকলেই হল, দূর-দূরান্ত থেকে রেসের ঘোড়ার মতো দৌড়তে-দৌড়তে ছুটে আসত ভুলি। তার সঙ্গে আসত রাস্তার আর-পাঁচটা কুকুর—মানে তার বন্ধু-বান্ধবীরা। কিন্তু তাদের এতটুকু পাত্তা দিত না ভুলি। ব্যাপারটা বুঝে নিয়েই সে ঘেউ-ঘেউ-ঘ্যাক-ঘেউ-ঘেউ চিৎকার করে তফাত যেতে বলত তাদের; যেন বলত, অ্যাই হতভাগাগুলো, তোদের কী রে! বাবুরা আমাকে ডেকেছেন, তোরা ভিড় জমাতে আসছিস কেন! ভুলির ভাবভঙ্গি দেখে খুব মজা পেতাম আমরা। কুকুর হলে হবে কী, একটা নাম থাকার সুবিধে যে কত, তা সে বুঝত পুরোপুরি; তার সুযোগও নিত দস্তুরমতো। তার বন্ধু-বান্ধবীরা এতে দুঃখ পেত খুব। ভুলির ঘেউ-ঘেউ শুনে তাদের লেজ গুটিয়ে দূরে সরে যাওয়ার ধরন দেখেই বোঝা যেত তারা ভাবছে, হায়, কেন যে কেউ আমাদের কোনো নাম দেয়নি!

ভুলি তখন এ'টোকাঁটায় মুখ ডুবিয়ে গোগ্রাসে গিলে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে থালা-হাতে-দাঁড়ানো আমাদের দিকে, আর মুখে ঘর-র-র-র শব্দ করে বলতে চাইছে, দাঁড়িয়ে কেন, বাকী যা আছে ঢেলে দাও।

আমরা বলতাম, "ভুলি, এত স্বার্থপর হওয়া ভাল নয়।"

তখন না-শোনার ভান ক'রে ঘ'্যক-ঘ'্যক শব্দ করত ভুলি, আড়ে তাকাত সঙ্গীদের দিকে। যেন বলত, ঠিক আছে। আয়, দয়া করলাম।

থালায় অবশিষ্ট যা থাকত তা আমরা বিলি করে দিতাম অন্য কুকুরগুলোকে।

ভুলির সঙ্গে এইভাবে আমাদের একটা টানের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

কষ্টের সংসার ছিল আমাদের। চলত কোনোরকমে। তাই একপাল ভিখিরি দেখে আমরা যখন "যাও যাও, আর হবে না—" করতাম, কোত্থেকে ছুটে এসে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে ভুলিই সেরে দিত বাকী কাজটুকু। রাত্তিরবেলায় উটকো কেউ বাড়ির সামনে এলে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করত সে, যতক্ষণ না আমরা দরজা খুলে বেরিয়ে আসি, আর বলি, "যা ভুলি। চেনা লোক।" কিছুদিনের মধ্যেই ভুলির পাহারাদারির চোটে আমাদের বাড়ির খাপড়ার চালে আর বাগানে কুমড়ো কি শশার লোভে বাঁদরের উৎপাত বন্ধ হল। ভুলি জানত বাঁদরগুলো আসে তেঁতুলগাছ থেকে নেমে মসজিদের মাঠ পেরিয়ে, তাই তাদের ট্যাকল করত আমাদের বাড়ির পাঁচিলে ওঠবার আগেই। ওর বুদ্ধি আর ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাটিতে পৌঁছুনোর ধরন দেখে মাঝে মাঝে মনে হত মানুষ হয়ে জন্মালে ও কোনো বড় ফুটবল টীমে চানস্ পেয়ে যেত। ভুলির দাপটে পাড়ার বিড়ালগুলোও হয়ে থাকত তটস্থ। একবার একটা

বিড়ালকে কোণঠাসা করার পর রাগী বিড়ালটা তার নাক আঁচড়ে দেয়। ঘাবড়ে গিয়ে দিন দুয়েক একটু চুপচাপ ছিল ভুলি। তার পরে অবশ্য নিজেকে সামলে নেয় আবার।

আমরা বেশ বুঝতে পারতাম ভুলি আমাদের মন কাড়ার চেষ্টা করছে। শুধু আমার নয়, আমাদের বাড়ির প্রায় সকলেরই। তবে ব্যাপারটা যে একতরফা নয় তা বুঝতে অসুবিধে হত না কোনো—ঠিকই তো যে ভুলি সম্পর্কে আমাদেরও আগ্রহ বাড়ছিল একটু একটু ক'রে। মানুষের ভাষার সঙ্গে কুকুরের ভাষার সম্পর্ক নেই কোনো, তবু আমি ভুলিকে কী বলতে চাইছি বা ভুলি কী বলতে চাইছে আমাকে, সেসব বুঝতে কোনোই অসুবিধে হত না আমাদের। মজার কথা, এই সময় আমি কিছু-কিছু কুকুরের ভাষা শিখে ফেলি। যেমন, 'ভুক্' মানে 'মাছি', 'কুঁই-কুঁই-কুঁই' মানে 'ভুল হয়ে গেছে', 'ভো-র্‌র্‌র্'—মানে 'সাবধান, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে—'। এই রকম আরো।

একদিন কী হল বলি। আমাদের ছোট আর আধা-গ্রাম্য শহরের রিকশাওয়ালারা সেদিন কী কারণে যেন স্ট্রাইক করেছে। যাতায়াতের খুব অসুবিধে। বাবা গিয়েছিলেন কলকাতায়, ফেরাফিরির ঠিক নেই কোনো। তো ফিরবেন তো ফেরো সেইদিনই। অনেক রাত্রে কলকাতার ট্রেন থেকে নেমে দ্যাখেন চারিদিক ভোঁ-ভাঁ। উপায় নেই দেখে সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যেই স্যুটকেস হাতে ভয়ে ভয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলেন তিনি।

যখনকার কথা বলছি তখন রাত মানেই রাত; সন্ধের পরপর অন্ধকারে থমথম করত চারিদিক। খুব দরকার না পড়লে রাস্তায় বেরুত না কেউ। বেরুলেও একা বেরুত না বড়-একটা। খুব দূরে দূরে টিমটিম করে জ্বলত আট-কোনা কাঁচের বক্‌সে গ্যাসের আলো, তাতে রাতের ছমছমে ভাবটা বেড়ে যেত আরো। মাঝে-মাঝেই শোনা যেত শিয়াল আর কুকুরের চিৎকার। আবার ওরই মধ্যে ঘটে যেত দু-একটা বিশ্রী রকমের ছিনতাই বা খুন। এ-সবই মানুষকে শেখাত সাবধানী হতে। বাবার তো ভয় করবেই।

সে যাক, পরের দিন সকালে বাবা আমাদের একটা অদ্ভুত গল্প শোনালেন। স্টেশন থেকে ফেরার রাস্তায় দুটো সন্দেহজনক চেহারার লোক নাকি তাঁকে প্রায় ঘিরে ধরেছিল। ঠিক সেই সময় চিৎকার করতে করতে কোত্থেকে ছুটে আসে ভুলি আর তার দলবল। বেগতিক দেখে ঝট-পট সরে পড়ে লোক দুটো। আনন্দে ভুলি তখন বাবার গা শুঁকছে আর গড়াগড়ি দিচ্ছে পায়ের কাছে। ভুলির নেতৃত্বে তারপর ভুলির দলবল প্রায় প্রসেশন করে বাবাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে যায়।

এরপর ভুলিকে আপনজন বলে ভাবতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

বললাম, "বাবা, ভুলিকে পুষলে কেমন হয়!"

বাবা বললেন, "বেশ তো, পোষ না।"

আশ্বাস পেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আমি ডাকলাম, "ভুল-ই-ই—"

সংগে সংগে ছুটে এল ভুলি। হাতে খাবার-টাবার নেই দেখে অন্য কুকুরগুলো একবার উদাসীন চোখে তাকিয়ে যে যেমন ভাবে ছিল তেমনটিই থেকে গেল।

ভুলি আসতেই আ-চুক-চুক করে আরো কাছে ডাকলাম তাকে। আমার হাতে ছিল পুরনো শাড়ির মোটা পাড়। ওর ঘাড়টা চেপে ধরে গলায় পাড়ের ফাঁস পরিয়ে দিলাম একটা। আশ্চর্য! ভুলি প্রতিবাদ করল না কোনো। বরং খুশিই হল যেন। মুখে কুঁইকুঁই শব্দ করে দু-বার গা শুঁকল আমার, লেজটা নাড়তে লাগল ঘনঘন—যেন বন্দী হবার জন্যেই এতদিন মনে-মনে তৈরি হচ্ছিল সে।

ভুলি যে নেড়ী তা আমরা সকলেই জানতাম। কিন্তু সে যে এত নোংরা, খয়েরির ওপর সাদা ছোপ লাগা তার গায়ে যে ঘিনঘিনে রকমের বোঁটকা গন্ধ তা টের পেলাম ওকে ঘরে নিয়ে আসবার পর। এত কাছের থেকে তো আগে কখনো দেখিনি। এবার দেখলাম তার গা আর কান ভর্তি ছোটো বড়ো অসংখ্য এঁটুলি। রক্ত চুষে-চুষে বেশ নধর টইটম্বুর চেহারা হয়েছে সেগুলোর। এসব দেখে আমি একটু চিন্তায় পড়লাম। ঠিক সেই সময় বাজার করে ফিরছে ছোটকাকা, বাড়ির উঠোনে ভুলিকে ওইভাবে মহা-সমাদরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই একেবার হইহই করে উঠল।

"এ-হে-হে, এই নেড়ী কুত্তাটাকে আবার কে বাড়ির ভেতরে ঢোকাল!"

আমি বললাম, "পুষব ছোটকা—"

"এই নোংরা-খাওয়া কুকুরটাকে পুষবি!" চোখ কপালে উঠল ছোটকাকার। "বিদেয় কর, এক্ষুনি বিদেয় কর। খানিক আগেই দেখলাম চৌরাস্তার নর্দমার পাশে দাঁড়িয়ে নোংরা খাচ্ছে—"

শুনে গা ঘিনঘিন করে উঠল আমারও।

বাবা বললেন, "রাস্তার কুকুর, নোংরা তো খাবেই—"

থলে থেকে বেছেবুছে বাজার তুলে রাখছিল মা। বলল, "না বাপু, এ সব নোংরা জীব ঘরে এনে কাজ নেই। এখুনি তো আবার হেঁসেলে মুখ দেবে!"

আমি ভাবলাম, ঠিক। ভুলি যেমনই হোক, ঠিক কুকুরের মতো কুকুর নয়। ঠিক বাড়িতে পোষা যায় না। তখন আস্তে ওর গায়ে ঠেলা দিয়ে বললাম, "যা, ভাগ—"

ব্যাপারটায় হকচকিয়ে গিয়ে 'ভউ-উ-উ' করে একটা শব্দ করল ভুলি, হাঁ-করা চোখে তাকাল আমার দিকে। যেন বলতে চাইল, ব্যাপারটা কী! ডেকে এনে এরকম অপমান করার কী মানে-হয়!

আমি বললাম, "পালা! তোর গায়ে এঁটুলি। তুই নোংরা খাস।"

শুনে খানিক দূর তফাতে সরে গেল ভুলি। তারপর বেশ জোরে আর রাগী গলায় ঘেউ-ঘেউ ঘর-র-র করে ডেকে উঠল। যেন বলছে, কুকুর নোংরা খাবে না তো কী, মানুষে খাবে! যত্ত সব!

ছোটকাকা একটা তাড়া দিতেই লেজ গুটিয়ে গলায় বাঁধা শাড়ির পাড় সুদ্ধু ভোঁ-ভোঁ দৌড় দিল ভুলি।

বোধহয় অভিমান করেছিল আমাদের ওপর। দিন দু-তিন আর বাড়ির আনাচে-কানাচে দেখলাম না তাকে। এর-পর যেদিন দেখা হল, দেখি গলায় পাড়টা বাঁধা আছে, তখনো, পাড়ের ডগায় একটা ভাঙা টিনের কৌটো বেঁধে দিয়েছে কেউ। ছুটলেই রাস্তায় ঘষটানি খেয়ে বিশ্রী শব্দ তোলে সেটা—জড়িয়ে যায় পায়ে পায়ে। হোঁচট খেতে খেতে কোনোরকমে দৌড়য় ভুলি, দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে তাকায় টিনের কৌটোটার দিকে।

কষ্ট হল। বেচারা বিনা দোষে সারাক্ষণ টেনে বেড়াচ্ছে ওই বিদঘুটে আওয়াজ আর দড়ির ফাঁস! ফাঁসটা খুলে দেওয়া দরকার।

ডাকলাম, "ভুল-ই-ই—"

ভুলি চলে যাচ্ছিল। থেমে দাঁড়িয়ে দূর থেকে তাকাল

অবিশ্বাসের চোখে।

আমি আবার ডাকলাম, "আয়, ভুল-ই-ই...."

এবার কী ভাবল কে জানে, নড়বড়ে পায়ে এগিয়ে এল ভুলি। কাছে আসতে ঘাড় ধরে পাড়টা খুলে দিলাম আমি। রাস্তায় পড়ে থাকা সেই ফিতে আর টিনের কৌটোটার দিকে খানিক ঘাড় কুঁচকে তাকিয়ে লেজ নাড়তে শুরু করল ভুলি; ওই দুটো নির্বিকার বস্তুর থেকে দূরত্বটা বাড়িয়ে নিল আস্তে আস্তে। যখন বুঝল সত্যিই ও দুটো আর তার গলায় আপদ হয়ে ঝুলছে না, তখন আমার দিকে তাকিয়ে প্রায় অবহেলায় 'ভৌ' করে ডাক ছাড়ল—বুঝলাম ছোটখাটো ধন্যবাদ জানাল একটা।

সে-বছর বর্ষা এল সময়ের আগে। আর সে কী বৃষ্টি! বলা নেই কওয়া নেই, আকাশে মেঘ জমলেই যখন তখন নেমে পড়ে হুটহাট। একবার শুরু হলে কখন যে থামবে কেউই তা বলতে পারে না। দেখতে দেখতে বর্ষার মাটি-মাটি সোঁদা গন্ধে ভরে উঠল চারপাশের পৃথিবী। কচি সবুজ ঘিরে ভনভন করতে লাগল মশা, কেঁচোর কারুকাজ করা ঘরে ভরে উঠল মাটি, যেখানেই পা ফেল না কেন শুধু ব্যাঙের ছাতা!

এই দুর্যোগের মধ্যে ভুলি যে কোথায় হারিয়ে গেল খোঁজ পেলাম না কোথাও। এঁটোকাঁটা ফেলার সময় হাজার নাম ধরে ডাকলেও দেখা পাওয়া যেত না তার। কী যে হল কুকুরটার! ভেবে মাঝে-মাঝে মন খারাপ হত আমার। হয়তো চলে গেছে অন্য কোনো পাড়ায়, হয়তো মিশে গেছে অন্য কোনো দলে। ভাবতাম। তারপরেই আবার ভাবতাম, ধাঙড়রা পিটিয়ে মেরে ফেলেনি তো! তখন রাস্তায় কুকুরের সংখ্যা বেশী হয়ে গেলে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ডান্ডা পিটিয়ে মেরে ফেলার অর্ডার দেওয়া হত। কুকুর মারতে মোটা বাঁশের লাঠি হাতে ধাঙড়রা নেমে পড়ত দল বেঁধে।

এইভাবে কেটে গেল বেশ কিছুদিন।

বর্ষা থামেনি তখনো। দিনের বেশিটা সময়েই ভার হয়ে থাকে আকাশের মুখ। তবে ওরই মধ্যে মাঝে-মাঝে সে দান ছেড়ে দেয় শরৎকে। অল্প রোদ্দুর উঠলেই দেখা যায় আকাশের নীল, পেঁজা তুলোর মতো ছেঁড়া-ছেঁড়া হালকা মেঘ ঘুরে বেড়ায় সেখানে।

একদিন সকালে একটা অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ল। কুয়োতলার পাশে আমাদের বাড়ির গা-ঘেঁষা বাগানের দেয়ালের কাছে অনেকটা জায়গায় মাটি নেই। তার বদলে প্রায় হাতখানেক গভীর গর্ত, চওড়াও বেশ অনেকটা। মনে হয় এলোপাথাড়ি আঁচড় কেটে খাবলা-খাবলা মাটি তুলেছে কেউ। আর যে তুলেছে তার যে মাটিতে দরকার নেই কোনো —দরকার শুধু গর্তটায়, তাও বোঝা যায় গর্তের পাশে ছড়ানো ছিটানো ডাঁই-করা মাটি দেখে, এটা সাপ বা শিয়ালের গর্ত নয়, সিঁধেল চোরেরও কীর্তি নয়। তা হলে! রহস্যের কিনারা হল না কোনো।

সেদিনই সন্ধে থেকে শুরু হল ঘোর দুর্যোগ। এমন উথাল-পাথাল করা ঝড় অনেকদিন দেখিনি! যেন গোটা প্রকৃতিটাকে ভীষণভাবে খেপিয়ে দিয়েছে কেউ, রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সে বলছে, সব শেষ না-করা পর্যন্ত ছাড়ব না! ঝড় থামল তো শুরু হল আকুল-করা বৃষ্টি। বিদ্যুতের চমকানি আর মেঘের ডাকে চোখ-কান ধাঁধিয়ে যায়। থমথমে মুখে কোনোরকমে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা শুয়ে পড়লাম তাড়াতাড়ি।

তখনো ঘুম আসেনি চোখে। বৃষ্টির শব্দের মধ্যেই হঠাৎ মনে হল আমাদের নড়বড়ে খিড়কির দরজাটায় ধাক্কা দিচ্ছে কেউ। শব্দটা উঠছে থেমে থেমে, থেকে থেকে। এইভাবে কিছুক্ষণ চলবার পর হঠাৎই কানে এল কুকুরের ডাক। কুঁই-কুঁই কুঁক-কুঁক থেকে শুরু করে সে-ডাক ক্রমশ পরিণত হল কাতর আর্তনাদে।

আমি তখন উঠে পড়েছি। দেখলাম বাবাও উঠে পড়েছেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী ব্যাপার বল তো?"

শব্দটায় কান পেতে আমি বললাম, "মনে হচ্ছে, ভুলি—"

"ভুলি! ও, সেই কুকুরটা!"

ছোটকাকা গেছে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে। বাবারও শরীর ভাল নয়। তবু, ভেবেচিন্তে বাবা বললেন, "চল তো দেখি—"

সেই বৃষ্টিতে মাথায় চট ঢাকা দিয়ে হাতে লণ্ঠন আগলে আমরা ছুটে গেলাম দরজার দিকে।

দরজা খুলে দেখি, ঠিকই। পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কুঁই-কুঁই কুঁক-কুঁক অদ্ভুত অনুনয়ের স্বরে ডাকতে লাগল

ভুলি খরখরে জিব বের ক'রে হাত পা চেটে দিল আমাদের। যেন বলছে, দয়া করো, দয়া করো।

বাবা বললেন, "বৃষ্টিতে ঘাবড়ে গেছে। আসতে দে, রাতটা না হয় শুয়ে থাক বারান্দায়।"

দরজা ছেড়ে দিয়ে আমি বললাম, "আয়—"

ভুলি কেমন থমকে গেল একটু। চাপা 'ভৌ' শব্দ করল একটা। তার পরেই ছুটে গেল কুয়োতলার দিকে। সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে হঠাৎই উ-উ বিকট শব্দে কান্না জুড়ে দিল। অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে তাকে দেখাচ্ছিল আবছা শিয়ালের মতো।

"কিছু একটা হয়েছে," বাবা বললেন, "চল তো দেখি—।" বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে সমানে। আমরাও ভিজে একশা। ওরই মধ্যে ভুলিকে অনুসরণ করে কুয়োতলায় গিয়ে দেখি অদ্ভুত কান্ড। সেই রহস্যময় গর্তটার মধ্যে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে তুলোর পুঁটলির মতো তিনটি ছানা।

রহস্য পরিষ্কার হল। বাচ্চা হবে বলে আগেভাগেই গর্তটা খুঁড়ে রেখে গিয়েছিল ভুলি। অসময়ের বৃষ্টি মাটি করে দিয়েছে সব।

বাবা বললেন, "মহা মুশকিল তো! এই বৃষ্টিতে ভিজলে তো মরে যাবে বাচ্চাগুলো!"

আমি বললুম, "চলো, নিয়ে যাই।"

ভুলি বোধহয় বুঝতে পারল কথাটা। সেই বৃষ্টির মধ্যেই আমার কোমরের কাছে দু'পা তুলে মুখের সুড়সুড়ি দিতে লাগল পেটে।

বাড়ির বাইরে খিড়কির দরজার পাশে ছোট কুঁড়ে ছিল একটা। ঠাকুমার শ্রাদ্ধের সময় তৈরি হয়েছিল রান্নাবান্নার জন্যে। তারপর থেকে ওটা আর কাজেই লাগত না। ঠিক হল, ভুলির বাচ্চাদের ওইখানে রাখা হবে। আমি আর বাবা চটের শুকনো দিকে আস্তে আস্তে বাচ্চাগুলোকে তুলে মুড়ে নিয়ে চললাম কুঁড়েঘরের দিকে। ভুলি আসতে লাগল আমাদের পিছনে পিছনে। কুঁড়ের ভিতর নোংরা পাতাকুটো সরিয়ে চটের বিছানা করে শুইয়ে দেওয়া হল ভুলির তিনটি ছানাকে।

দিন চার-পাঁচের মধ্যেই বেশ গোলগাল হয়ে উঠল ছানাগুলো. কুতকুতে চোখ ফুটল তাদের। গায়ের রঙও পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল একটু-একটু করে। ভুলির সংগে সংগে গায়ে-গায়ে পায়ে-পায়ে লেপটে সেগুলো বেরুতে লাগল ক্রমশ—মাটি, গাছ, কাগজের টুকরো, শুকনো পাতা, খোলামকুচি যা পায় তাতেই মুখ দেয়। সাহস-ভরে যদি বা এক পা দু'পা এগোয়, যে-কোনো শব্দেই ছোট-ছোট পা ফেলে পিছন ফিরে দে-ছুট।

দেহাত থেকে দুধ দিতে আসত ভোলা গয়লা, লম্বা চওড়া পেল্লায় চেহারা তার। ভুলির তিন ছানার বড়ই পছন্দ তাকে—দেখামাত্র এসে গা পা শুঁকতে শুরু করে দিল। ঠিক সেই সময় নাকে খৈনির গুঁড়ো উড়ে এসে লাগতে বিকট শব্দে হেঁচে উঠল ভোলা। তাই শুনে কুঁই-কুঁই শব্দ তুলে পড়ি-কি-মরি করে দৌড় দিল বাচ্চাগুলো; আর তার বাচ্চাদের কিছু করা হয়েছে ভেবে ভুলিও জুড়ে দিল রাগী চিৎকার। রাগটা গেল না সহজে। তারপর থেকে ভোলাকে আসতে দেখলেই ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ করে তারস্বরে ডাক জুড়ে দিত ভুলি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওই পালোয়ান চেহারার ভোলাও সাহস পেত না নড়তে। চেঁচিয়ে বলত, "এ বাবুয়া, কুত্তা সামালো!" সে এক ঝকমারি ব্যাপার।

বাচ্চা হবার পর হঠাৎই যেন বেশি বেশি রাগী হয়ে উঠেছিল ভুলি। তেমনি বেড়ে গিয়েছিল তার খিদে। চুপসানো পেট নিয়ে এখন সে যখন-তখন ঢুকে পড়ে বাড়ির ভিতর। ভয়ডরের বালাই নেই; তাড়িয়ে না দিলে সোজা চলে যায় রান্নাঘরের দিকে। ধোয়ামোছা-করা মেঝেয় রেখে যায় কাদামাখা নোংরা পায়ের ছাপ। তার মুখ থেকে ভাতের হাঁড়ি বাঁচানোর জন্যে তাড়াহুড়োয় একদিন শাড়িতে জটাপটি লেগে মা আছাড় খেল উঠোনে। রোদ্দুরে কুলোয় সাজিয়ে শুকোতে দেওয়া হয়েছিল কলাইয়ের বড়ি, একদিন হঠাৎ মুখ দিয়ে এ'টো করে দিল সব! এসব দেখে আমি আর ছোটকাকা বেরুলাম তাকে শায়েস্তা করত। ছোটকাকার হাতে লাঠি, আমার হাতে বাঁশের বাখারি। যেন ভুলির একদিন কি আমাদের একদিন ব্যাপার!

এত তোড়জোড় দেখেও ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারল না ভুলি। যেখানে ছিল সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে এমনভাবে লেজ নাড়তে শুরু করল যেন কিছুই হয়নি। হঠাৎ পিঠে দমাদ্দম ঘা পড়তেই সম্বিৎ হল তার—ক্যাঁউ-ক্যাঁ-ক্যা করতে করতে পগার পার করার ধরনে এমন দৌড় দিল যে, সেদিন গোটা দিনই আর বাড়িমুখো হল না। রাতে শুতে যাবার আগে লণ্ঠন হাতে গেলাম কুঁড়েঘরে। ভুলির পাত্তা নেই, দেখি বাচ্চাগুলো এ ওর গায়ে জড়াজড়ি করে ঘুমুচ্ছে দিব্যি।

সেদিন ভোর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমার। তখনো আলো ফোটেনি; মশারির ভিতর আর ঘরের দেওয়ালে থম মেরে আছে অন্ধকার। সদ্য পাখি ডাকতে শুরু করেছে। ওরই মধ্যে শুনতে পেলাম উ-উ কান্না। মাঝে মাঝে থামে তো শুরু হয় আবার।

বিছানা থেকে উঠে ছোটকাকাকে ঠেলে তুললাম আমি।

"ছোটকা, শোনো!"

শব্দটায় কান রেখে ছোটকাকা বলল, "ওভাবে লাঠি দিয়ে পেটানোটা উচিত হয়নি। বেকায়দায় লেগে গেছে হয়তো!"

আমি বললাম, "চলো, দেখি একবার।"

ঘর খুলে উঠোনে, উঠোনের দরজা খুলে শীত-করা হাওয়ায় কুঁড়েঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা। খানিকক্ষণ থেমে থাকার পর উ-উ কান্না শুনে ছোটকাকা ডাকল, "ভুলি—আঃ, আঃ—"

শব্দটা থেমে গেল আচমকা। আবছা আলোয় দেখলাম কুঁড়ের ভিতর উঠে দাঁড়িয়েছে ভুলি মুখের চাপা ঘর্‌-র্‌-র্‌-র্‌ শব্দটাও কানে এল। ওর ভাবভঙ্গি দেখে ছোটকাকা বলল, "সরে আয়। কামড়াতে পারে—"

খানিকটা দূরে সরে দাঁড়াতেই পা পা করে এগিয়ে এল ভুলি। তারপর একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে দৌড় দিল রাস্তায়। থামল অনেকটা দূরে, একেবারে আমাদের নাগালের বাইরে গিয়ে। আবার আকাশের দিকে মুখ করে টেনে টেনে ডাকতে লাগল, 'উ-উ-উ—'

ওর দিকে চোখ রেখে আমরা ঢুকে পড়লাম কুঁড়ের ভিতর। কুঁই-কুঁই করে একটা বাচ্চা এগিয়ে এল আমাদের কাছে। তারপরেই অবাক! এ কী! অন্য দুটো ছানা গেল কোথায়!

আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও সে দুটোকে পাওয়া গেল না কোথাও। শুধু কুয়োতলার কাছে পাওয়া গেল তাদের বিছানার একটা টুকরো, তাতে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ।

"বুঝলি," ছোটকাকা বলল, "ভুলি বোধহয় ফেরেনি রাত্রে। সেই ফাঁকে শিয়ালে নিয়ে গেছে—"

আমার মুখে কথা ফুটল না কোনো। ভাবনা থেকে একটা কান্না এসে আটকে গেল গলায়। দেখলাম একা অন্য ছানাটা তখনো কুঁই-কুঁই ক'রে ঘুরঘুর করছে আমাদের আশেপাশে। সাদার ওপর কালো আর খয়েরির ছিটে লাগা বড় সুন্দর শরীর তার। ভয় নেই, ভাবনাও নেই কোনো। কেউ কিছু বলছে না দেখে ছোটকাকার ধুতির একটা অংশ মুখে পুরে চিবুতে শুরু করল দিব্যি।

ছাড়িয়ে নিয়ে ছোটকাকা বলল, "এটা এখনো নোংরা খেতে শেখেনি। এটাকে তো পুষতে পারিস!"

বাচ্চাটাকে আস্তে তুলে নিলাম কোলে। তার নরম গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে চোখ তুলে দেখি হাত দশেক দূরে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে অবাক চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে ভুলি।

বুটিদার বাচ্চাটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে মনে মনে বললাম, ভুলি, একদিন খুব বৃষ্টির রাতে তোর বাচ্চাগুলোকে আমরাই বাঁচিয়েছিলাম। আজ আমরাই তাদের মারলাম! তুই আমাদের ক্ষমা করিস। তোর এই বাচ্চাটা এখন থেকে আমাদের কাছেই থাকবে—

ভুলি কী বুঝল কে জানে! কান্না ভুলে নোংরা-খেকো নেড়ীটা তখন লেজ নাড়তে শুরু করেছে। দূর থেকেই আহ্লাদী গলায় বলল, 'ভৌ—'

ছবি যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

মিস সরখেলের বেড়াল

লিটনগঞ্জের উকিল নন্দদুলাল সিংহকে সবাই বলে নাদু সিঙ্গি। তাঁর সঙ্গে ডাক্তার নাড়ুগোপাল নন্দী বা নাড়ু ডাক্তারের বেশ গলাগলি ভাব। সেটা অবশ্য থাকাই উচিত। একেবারে পাশাপাশি বাড়ি। একজনের ছাদ থেকে অন্যজনের ছাদে দিব্যি বেড়াল-চলাচলের সুবিধে আছে। এ তল্লাটে উল্লেখযোগ্য বেড়াল একটাই। তার মালিক এই উকিল-ডাক্তার কেউ না, অন্য একজন। তিনি আবার যে-সে নন, এই মহকুমা শহরের জাঁদরেল লেডি-মুন্সেফ। থাকেন দু বাড়ির পেছনে যে ছোট্ট খাল, তার ওপারে সরকারী কোয়ার্টারে। নাম করুণাময়ী সরখেল। সংক্ষেপে মিস কে সার্কেল। সরখেল ইংরিজিতে সার্কেল হতে আপত্তি কী? অন্তত কোথাও এ অব্দি আপত্তি ওঠেনি।

খালের ওপর তক্তা বিছিয়ে সাঁকো করা আছে। অতএব বেড়ালের খাল পেরুনোর সমস্যা নেই। তারপর উকিলবাড়ির কিচেনের পিছনে নোনা আতার গাছে উঠলেই তো কিচেনের ছাদ। নাদু সিঙ্গির বিশাল অ্যালসেশিয়ান রনি একবার গরগর করে উঠেই তাচ্ছিল্যে মুখ ঘোরায়। মিস সার্কেলের বেড়াল ভানুমতী উকিলবাড়ির ছাদে কিছুক্ষণ রোদ পুইয়ে হাই তুলে এবং আড়মোড়া ভেঙে ডাক্তারবাড়ির ছাদে চলে যায়। কার্নিসে উঁকি মেরে নীচে কিচেনের দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে থাকে। নাড়ু ডাক্তার কুকুর পছন্দ করেন না। তাঁর শখ পাখির। উঠোনে কাঠের উঁচু দাঁড়ে পায়ে শেকলবাঁধা কাকাতুয়া আছে। তার নাম আবার চেঙ্গিস খাঁ। মহা ধড়িবাজ সে। ভানুমতীর সাড়া পেলেই 'চুন্নী আয়া! চুট্টিন আয়া' বলে হুলুস্থুল বাধিয়ে বসবে। চুন্নী বা চুট্টিন মানে মেয়ে-চোর। চেঙ্গিস খাঁ বাংলা বলতেই পারে না। তবে হিন্দীও ভুল বলে।

মজাটা হচ্ছে এই, নাদু সিঙ্গি মাছ মাংস খান না।—স্রেফ নিরামিষভোজী। আর নাড়ু ডাক্তার নাকি হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভাল্লুক কিংবা সাপ, ব্যাঙ আরশোলা, টিকটিকি সবই মানুষের খাদ্য মনে করেন। শুধু তাই নয়, তাঁর মতে, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে অত বাছাবাছির জন্যেই তো এদেশে লোকের এমন হাড় জিরজিরে চেহারা, বারোমাসে তেরটা অসুখ বিসুখ।

দুই বন্ধুতে এ নিয়ে তর্কাতর্কি হয়েই থাকে। তাই বলে ভাব এতটুকু চটেনি এ পর্যন্ত। বরং দিনে দিনে আরও বেড়েছে। এই বৃদ্ধির কারণ আর কিছুই নয়, মিস সরখেলের বেড়াল। বেড়ালটা সত্যি দিনে দিনে বড্ড বেশি জ্বালাচ্ছে। নাদু সিঙ্গির পেটে অম্বলের অসুখ। নাড়ু ডাক্তারের পরামর্শে রোজ দুসের করে দুধ খান। পাচক পাঁচু ঠাকুর ইদানীং প্রায়ই নালিশ করছে, "হাকিমের বেড়ালে দুধে মুখ দিয়ে পালাল স্যার।"

"বেড়াল? কোন বেড়াল? কার বেড়াল?" নাদু সিঙ্গি প্রকাণ্ড আইনের বই থেকে মুণ্ডু বের করে বলেন।

পাঁচু জানায়, "আবার কার? খালপারের হাকিম মেমসায়েবের।"

"মেমসায়েবের? কোন মেম? মেম না হাকিম—কী বলছ হে?"

পাঁচু বোঝে স্যার এখন আইন-আদালতের মধ্যে বন্দ হয়ে আছেন। মেমসায়েবকেও এখন উনি হাকিমের চেয়ারে দেখবেন। অতএব ব্যাপারটা খাবার টেবিলেই তুলতে হবে।

খাবার টেবিলে দুধের দুঃসংবাদ শুনে নাদু সিঙ্গি বেজায় রেগে যান। খুব চ্যাঁচামেচি করেন। দেখে নেব, মামলা ঠুকে দেব ইত্যাদি বলেও শাসান। কিন্তু আদালতের হাকিমের বিরুদ্ধেই মামলা! জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ? তখন রাগটা পড়ে রনির ওপর। "নেমকহারাম! হতচ্ছাড়া বাঁদর! শুধু কাঁড়িকাঁড়ি গিলছ আর ভুঁড়ি বাগাচ্ছ!"

কুকুরকে বাঁদর বলে গাল দিলে কুকুরের বড্ড অভিমান হয়। রনি গুম হয়ে থাকে। আর এসব শুনে নাড়ু ডাক্তার বলেন, "বলেছিলুম না? রনিকে মাংস খাওয়াও।, ওকেও নিরিমিষ দুধ রুটি বিস্কুট খাইয়ে রেখেছ! জোরটা পাবে কোথায় শুনি?"

নাদু সিঙ্গি বিরক্ত হয়ে বলেন, "আহা! হাকিমের বেড়াল দুধটা চেটেপুটে মেরে দিলে রনিও তো উপোস থাকবে! রনির সেটা বোঝা উচিত। এমন গাধা তো দেখা যায় না!"

কুকুরকে বাঁদর বলা, গাধা বলা! কুকুরের পক্ষে খুব অপমানজনক তো বটেই। রনি যেন ইচ্ছে করেই ভানুমতীকে সুযোগ দেয়।

ইতিমধ্যে একদিন নাড়ু ডাক্তারের বাড়িতে এক কাণ্ড হল। শহরের পাশে নদী। নদীতে এক ঝাঁক ইলিশ ধরল জেলেরা। নাড়ু নন্দী শহরের জনপ্রিয় ডাক্তার। জেলেপাড়ার লোকেদেরও তো অসুখ বিসুখ হয়। হরু জেলে বিকেলে একটা ইলিশ ভেট দিয়ে গিয়েছিল। সে কিছুতেই দাম নেবে না। "ওরে বাবা! গরিবের মা বাপ আপনি! দাম নিলে অধর্ম হবে!" বলে সে পায়ের ধুলো পর্যন্ত মাথায় নিল।

তো সেই ইলিশের ওজন পাক্কা দেড় কিলো। খুব হইচই হল বাড়িতে। ডাক্তারগিন্নি আজ নিজের হাতে রাঁধবেন। এক ইলিশের হরেক রকম রান্নায় বড় পাকা উনি। রাঁধতে একটু সময়ই লাগল। রেঁধে ডাক্তারগিন্নি বারান্দায় এসেছেন, বড্ড গরম লেগেছে। কিচেনে ফ্যান নেই। পা বাড়াচ্ছেন ঘরের দিকে। ফ্যানের তলায় একটু বসবেন। ঝি মেয়েটি বারান্দায় বসে সময় গুনছে, কখন ভাত তরকারি নিয়ে বাড়ি যাবে। একটু ঢুলুনিও চেপেছে হয়তো। হেন সময়ে চেঙ্গিস খাঁ যাচ্ছেতাই চ্যাঁচামেচি জুড়ে দিল। "চুন্নী আয়া! চুট্টিন আয়া!" তক্ষুনি সাজোসাজো রব পড়ে গেল বাড়িতে। ডাক্তারগিন্নি মার মার বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। ঝি চাকর বাকর যে-যেখানে ছিল হইচই করে উঠল—মার! মার! ধর! পালাল! নাড়ু-ডাক্তার ডিস্পেন্সারিতে তখনও রোগী দেখছিলেন। হাতে ইঞ্জেকসনের সিরিঞ্জ্। আদ্ধেকটা ঢুকেছে ছুঁচ। রোগীকে সেই অবস্থায় রেখে দৌড়ে এলেন। ওদিকে রোগী আর্তনাদ জুড়ে দিয়েছে। ইলিশ বলে কথা—বিশেষ করে লিটনগঞ্জের মতো জায়গায়। সেই কবে এক ঝাঁক ইলিশ ধরা পড়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। তখন এস ডি ও ছিলেন রেনবো সাহেব। ইলিশ খেয়ে বলেছিলেন, "হামি বোডলি হোটে চাই না!" পরের বছর আর নদীতে ইলিশ মিলল না বলেই না অমন জনদরদী এস ডি ও বদলি হয়ে গিয়েছিলেন মনের দুঃখে। সেই ট্রাডিশানের ইলিশ!

নাড়ু ডাক্তার ভেতরে ঢুকেই প্রথমে বন্দুক বের করলেন। তারপর উঠোনের গোলমালে ও ভিড়ের মধ্যে আকাশের দিকে নল তুলে পরপর দুটো ফায়ার করলেন।

তক্ষুনি এর ফলটা হল মারাত্মক। পাড়ার লোকেরা ভাবল ডাকাত পড়েছে। সবুজ সঙ্ঘের ছেলেরা ক্লাবঘরে ক্যারম খেলছিল। তারা লাঠিসোটা ইটপাটকেল নিয়ে চলে এসেছে। মোড়ের পানের দোকানে রামধারী সিং কনস্টেবল হাত বাড়িয়ে খৈনি নিচ্ছে। লোকেরা চেঁচিয়ে উঠল, "খৈনি খাবার সময় নেই সিংজী! থানামে খবর দো, আভি খবর দো!" হকচকিয়ে উঠে বেচারা রামধারী চ্যাঁচাতে লাগল, "ঘোলি মারো! ঘোলি মারো!"

ওদিকে উকিলবাড়ির ছাদ থেকে নাদু সিঙ্গি চ্যাঁচাচ্ছেন, "নাড়ু! ফায়ার কোরো না, ফয়ার কোরো না! আমি সিঙ্গিমশাই!"

নাড়ু ডাক্তার বন্দুক নামিয়ে পাল্টা চেঁচিয়ে বললেন "বেড়াল! তোমার ছাদে বেড়াল!"

নাদু সিঙ্গি ছড়ি নিয়েই ছাদে উঠেছিলেন ব্যাপার বুঝতে। বেড়াল শুনে মাথা খারাপ হয়ে গেল। ছাদময় ছড়ির বাড়ি মারতে-মারতে খুব লম্ফঝম্ফ জুড়ে দিলেন। শেষ অব্দি ছড়িটাই ভেঙে গেল।

কিন্তু কোথায় বেড়াল? গোলমালটা হয়েছে এখানে ঃ মিস সরখেলের আদরের বেড়াল ভানুমতী বরাবর সিঙ্গিবাড়ির ছাদ হয়ে এবাড়ি যাতায়াত করে। ওর পথটা সবার চেনা। আর চেঙ্গিস খাঁ ওকে ছাদে দেখতে পেলেই চেঁচিয়ে ওঠে। এও সবার জানা। অতএব ভানুমতী যে ছাদেই আছে এই ভেবে সবাই ছাদের দিকে মুখ করেই চ্যাঁচাচ্ছিল।

এদিকে একটু পরেই রটে গেছে, ব্যাপারটা মোটেও ডাকাতি নয়, বেড়ালঘটিত। তাই বাইরের লোকেরা হাসাহাসি করতে করতে চলে গেল। ডাক্তরবাড়িতেও হইচই ক্রমশ থেমে এল। নাড়ু ডাক্তারের একমাত্র ছেলে হাঁদুরও ক্ষিদে পেল। মায়ের কাছে ভ্যাঁ করে বলল, "আমাকে খেতে দিচ্ছ না কেন, মা?" তখন ডাক্তারগিন্নি রান্নাঘরে গেলেন।

গিয়েই টের পেলেন কী ঘটেছে প্রকৃতপক্ষে। টের আরও পাইয়ে দিল চাকর হাবলু। সে হাঁফাতে হাঁফাতে মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাল। যতক্ষণ হুলুস্থুলু হচ্ছিল, ততক্ষণ বেড়ালটা আরাম করে বসে ডেকচি সাফ করেছে। কাঁটাগুলো ইচ্ছেমতো ছড়িয়েছে। এবং জানলা গলিয়ে লাফ দিলে যে তার হাড়গোড় ভাঙবে না, তাও সম্ভবত এতদিনে টের পেয়েছে। "নইলে দেখুন না, রডে লোম লেগে রয়েছে! এই যে!"

আর তার চেয়েও বড় কথা, বেড়ালের মোট নটা প্রাণ। ছাদ থেকে ফেলে দিলেও বেড়াল দিব্যি গা ঝেড়ে উঠবে এবং দিব্যি হেঁটে যাবে। নটা প্রাণ না থাকলে এটা সম্ভবই হত না। হাবলু সবিস্তারে বেড়াল সম্পর্কে তার জ্ঞানেরও পরিচয় দিল।

তো যাক্ গে, যা হবার তা হল। নাড়ু ডাক্তারের ইলিশ খাওয়া হল না। সারারাত ঘুমও হল না। কখন সকাল হবে, কখন কোর্ট কাছারি খুলবে, তার অপেক্ষায় ছটফট করতে থাকলেন।

স্বয়ং হাকিমের বিরুদ্ধে মামলা! নাদু সিঙ্গি প্রথমেই বেঁকে বসলেন। নাড়ু ডাক্তারের সঙ্গে অনেক কালের বন্ধুত্ব আছে, তা ঠিকই। তাই বলে জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করা? বললেন, "তারচে' বরং বেড়ালটাকে জব্দ করার ফন্দিফিকির খুঁজে বের করা যাক্!"

নাড়ু ডাক্তার তেতো হয়ে বললেন, "জব্দ কী বলছ? বন্দুকে কার্ট্রিজ পুরে রেডি রেখেছি। যদি তুমি এ-মামলা না নাও, আমি ওটাকে দেখলেই গুলি করে মারব।"

নাদু সিঙ্গি ব্যস্তভাবে হাত নেড়ে বললেন, "খবর্দার খবর্দার! ডোন্ট ডু দ্যাট! পাল্টা এমন কেস ঠুকে বসবেন মিস সরখেল, বিপদে পড়ে যাবে। বুড়ো বয়সে ঘানি টানার রিস্ক্ নিও না।"

নাড়ু ডাক্তার গুম হয়ে একটু বসে থাকার পর বললেন "তাহলে এ কেস তুমি নেবে না?"

নাদু সিঙ্গি বোঝাতে চেষ্টা করলেন। "আহা! আইন যে বড্ড গোলমেলে। ব্যাপারটা ঘটেছে রাত্তিরে। কোন বেড়াল তোমার ইলিশ খেয়েছে, প্রমাণ করবে কীভাবে?"

ছেলেধরা
সাধনা মুখোপাধ্যায়

১

ঘুর্ ঘুর্ ছেলেধরা
মনে অভিসন্ধি
কাঁধেতে লম্বা ঝোলা
করে চলে ফন্দি—
কী করে বাচ্চা ছেলে
করবে যে বন্দী।
তাই দেখে হেঁকে কন
মহাশয় নন্দী,
"অচেনা লোকের সাথে
করবে না সন্ধি।"

২

ছেলেধরা ছেলেধরা
রটল গুজবটা,
মাঝখান থেকে মার
খায় বুড়ো লোকটা।
ঢিল লেগে কেটে গেল
তার মুখ-চোখটা,
ভাল নয় অনুমানে
মারবার ঝোঁকটা।
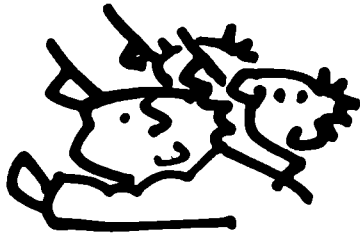
"দেখ নাদু, আমাকে শিখিও না। এতকাল ওকালতি করছ, সাক্ষীদের কী বলাতে হয় জানো না? চালাকি করছ?" নাড়ু ডাক্তার আরও রেগে গেলেন।

নাদু সিঙ্গি বললেন, "তুমি বড্ড বোকার মতো কথা বলছ, নাড়ু। একে হাকিম, তার ওপর মহিলা। হেরে ভূত হয়ে যাবে। মিস সরখেল আইনের পোকা। জানো না, তাই বলছ।" বলে ওঁর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, "বরং তারচে' তুমি তো ডাক্তার, বেড়ালটাকে এমন কিছু ওষুধ খাইয়ে দাও, যাতে খুব নেশা হবে। তারপর ওটাকে বস্তায় পুরে কোন গাঁয়ের মাঠে ফেলে দিয়ে আসবে।"

নাড়ু ডাক্তার এ পর্যন্ত শুনেই উঠে পড়লেন। কোন কথা না বলে হনহন করে চলে এলেন। মামলা করবেনই।

কিন্তু লিটনগঞ্জের কোন উকিল বা মোক্তারই যে তাঁর কেস নিতে চান না। আসামীর নাম শুনেই জিভ কেটে পিছিয়ে যান। তাহলে আর কেমন করে মামলা হবে? আইন ব্যাপারটা সত্যি বড্ড গোলমেলে। এদিকে নাদু সিঙ্গি ভয় দেখিয়েছেন। বেড়ালটার পেছনে লাগলে মিস সরখেল নাকি ঘানি টানিয়ে ছাড়বেন। সেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মনের রাগ মনে রয়ে গেল। আর এর ফলটা হল এই, এতকালের বন্ধুত্বে নাদু সিঙ্গির সঙ্গে, তাতে ছেদ পড়ল। প্রথমে দেখা হলে এড়িয়ে যেতেন। তরপর দেখা হলে কথা বন্ধ হল।

নাড়ু ডাক্তার তাঁর ছাদে সিঙ্গিবাড়ির দিকটায় উঁচু কাঁটা-তারের বেড়া দিলেন। একে কাঁটা, তার ওপর ফোকরগুলো এত ছোট্ট যে, ইঁদুর গলবারও সাধ্যি নেই। শীতের রোদ পোহাতে উঠে দুজন আপন-আপন ছাদে পায়চারি করেন। কেউ কারুর দিকে তাকান না।

মজার কথা, যথারীতি সমানে সিঙ্গিবাড়ি দুধ নিয়ে গোলমাল বাধে। পাঁচু ঠাকুর গোমড়ামুখে জানায়, "মুখ দিয়ে গেল চোখের সামনে। সে-দুধ স্যারকে জেনেশুনে কী করে খেতে দিই, স্যার?"

নাদু সিঙ্গি গর্জে ওঠেন, "নেমকহারাম রনিটা করছে কী? অ্যাঁ? খাওয়া বন্ধ করে দেব! আর তুমি হতভাগাও কি কানা না খোঁড়া?"

পাঁচু ঘাড় চুলকে বলে, "ফ্যানটা গালতে বসেছি, আর ঢুকেছে কখন।"

"রোসো। দেখাচ্ছি মজা!" বলে অস্থির নাদু সিঙ্গি পায়চারি করেন। দুধের অভাবে অম্বলটা বেড়েছে আবার। নাড়ু ডাক্তারের সঙ্গে কথা বন্ধ। অন্য ডাক্তারের ওপর বিশ্বাস নেই। অভ্যাস এতকালের! অথচ তাঁর নিজের তো কোন দোষ নেই। খামোকা নাড়ুবাবু কথা বন্ধ করেছেন। নাদু সিঙ্গি এমন বেহায়া নন যে, তবু গায়ে পড়ে কথা বলতে যাবেন!

হুঁ, সব গোলমালের মূলে ওই বেড়ালটাই বটে। তাতে কোন ভুল নেই। বেড়ালটা না থাকলে সমস্যাই থাকে না। কিন্তু বেড়ালটা হাকিমের হয়েই যত গোলমাল বেধেছে। তাকে জব্দ করতেও ভয় হয়। আইনজ্ঞ মহিলা। কোন ফাঁকে ফাঁদে ফেলে ঘানি টানিয়ে ছাড়বেন, বলা তো যায় না। তাছাড়া, জমি সম্পত্তিঘটিত মামলার উকিল নাদু সিঙ্গি। মিস সরখেলের কোর্টেই তাঁর ওকালতি।

ওদিকে ডাক্তার-বাড়িতেও কদিন পরে যথারীতি একই কাণ্ড শুরু হয়েছে। রান্নাঘর থেকে ডাক্তার-গিন্নি হয়তো একটু বেরিয়েছেন, ফিরে গিয়ে দেখেন, মাছের হাঁড়িতে কাঁটা! মাংসের হাঁড়িতে হাড়!

চেঙ্গিস খাঁয়ের হল কী? সে কেন আগের মতো চেঁচিয়ে সতর্ক করে না? তাকে নাড়ু ডাক্তার খুব তম্বি করেন।

ছবি অহিভূষণ মালিক

কাকাতুয়াটা শুধু ঝিমোয়। বুড়ো হয়ে গেল নাকি? আর বেড়ালটা আসেই বা কোন পথে? হাবুল-চাকর গিন্নির খুব নেওটা। সে মুগুর দেখিয়ে বলে, একবার টিকিটি দেখলেই হয়!

অগত্যা মরীয়া হয়ে অতিষ্ঠ নাড়ু ডাক্তার একদিন মিস সরখেলের কাছে গেলেন। এমন চলতে থাকলে তো প্রোটিনের অভাবে অকালে মারা পড়বেন। খালের সাঁকো পেরিয়ে হাসি-মুখেই গেলেন অবশ্য। কিন্তু গিয়েই দেখলেন, তাঁর আগে নাদু সিঙ্গি গিয়ে বসে আছে। সামনে চায়ের কাপ। খুব জমিয়ে গল্পসল্প হচ্ছে। মিস সরখেল বললেন, "হ্যাল্লো ডক্টর! আসুন, আসুন! কী সৌভাগ্য! বসুন, বসুন!" তাঁর কোলে বেড়ালটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। গা জ্বলে যায়।

নাড়ু ডাক্তার বসলেন না। আড়চোখে সিঙ্গিকে দেখে নিয়ে সোজা বললেন, "দেখুন মিস সরখেল, এসেছিলুম বিশেষ একটা জরুরি ব্যাপারে। তা..."

মিস সরখেল বললেন, "এনিথিং প্রাইভেট? ঠিক আছে। আচ্ছা মিঃ সিনা, কথা তো যা বলার বলেছি। চেষ্টা করে দেখুন, আমার ধারণার প্রমাণ পেয়ে যাবেন। উইশ ইউ গুড লাক!"

নাদু সিঙ্গি আড়চোখে নাড়ু ডাক্তারকে দেখতে দেখতে বাকি চাটুকু ঢকঢক করে গিলে ফেললেন এবং নমস্কার ঠুকে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেলেন।

"বসুন ডক্টর নন্দী।" হাসিমুখে মিঠে গলায় বললেন মিস সরখেল।

নাড়ুবাবু বসলেন। বললেন, "কথাটা আপনার এই বেড়াল সম্পর্কে।"

মিস সরখেল খিলখিল করে হেসে উঠলেন "ও ডক্টর নন্দী! আপনিও দেখছি আমার ভানুমতীর বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে এসেছেন। মিঃ সিনাও ঠিক একই ব্যাপারে এক ঘণ্টা ভ্যাজর ভ্যাজর করলেন! বাট হোয়াট ইজ দা ট্রাবল? ভানুমতী কী এত জ্বালাচ্ছে আপনাদের? কী রে ভানুমতী! ওদের বুঝি খুব জ্বালাতন করিস, দুষ্টু মেয়ে?" বলে উনি বেড়ালের গালে আঙুল দিয়ে টোকা দিলেন। ভানুমতী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল—মিঁয়াও! মিস সরখেল আরও হেসে কুটিকুটি হলেন। "শুনছেন তো, বলল—না।"

নাড়ু ডাক্তার বললেন, "আপনার বেড়াল..."

হাত তুলে বাধা দিলেন মিস সরখেল, "ও নো নো ডক্টর নন্দী! প্লীজ! আমার ভানুমতী সম্পর্কে কোন কথা শুনতে আমি রাজি নই! শি ইজ মাই ওনলি পেট্! শুনেছি আপনাদের কারুর কুকুর আছে, কারুর নাকি কাকাতুয়া আছে—শুধু আমারই থাকবে না? এ কী আব্দার?"

নাড়ু ডাক্তার মনে মনে রেগে তক্ষুনি চলে এলেন। সাঁকো পেরিয়ে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল, বাগানে নাদু সিঙ্গি পা টিপে টিপে তাঁর বাড়ির দিকে এগোচ্ছেন। অমন করে হাঁটছেন কেন? নাড়ু ডাক্তার গাছের আড়ালে দাঁড়ালেন। দেখলেন, নাদু সিঙ্গি তাঁর রান্নাঘরের জানালায় উঁকি দিচ্ছেন। ব্যাপারটা রহস্যজনক। নাড়ু ডাক্তার ঝোপঝাড়ের আড়ালে একটু এগোলেন। শুকনো পাতায় যেই না পড়া, মচমচ শব্দ উঠল। অমনি সিঙ্গি চমকে উঠে ঘুরলেন। তারপর নাড়ু ডাক্তারকে দেখেই হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন। তারপর আবার জানলায় উঁকি দিলেন।

নাড়ুবাবুও পাশে গিয়ে উঁকি দিলেন। হুঁ, পাঁচু ঠাকুর দুধের কড়াইয়ে মুখ ডুবিয়ে রয়েছে। তার মানেটা কী? খুব

সহজ! নাড়ুবাবু কিছু বলার জন্যে ঠোঁট ফাঁক করতেই সিঙ্গি ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করার ইশারা দিলেন। তারপর ও'র হাত ধরে সাবধানে টেনে নিয়ে গেলেন।

ওপাশে ডাক্তার-বাড়ির রান্নাঘর। এমনি জানলা। দুই বন্ধু উঁকি মেরে দেখলেন—ডাক্তার বাড়ির চাকর, যার নাম হাবলু, মাংসের ডেকচির ওপর হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নাড়ুবাবু আবার ঠোঁট ফাঁক করলেন। কিন্তু নাদু সিঙ্গির চিমটি খেয়ে চুপ করে গেলেন। হুঁ, তাহলে এই!

দুই বাড়িতে নতুন ঠাকুর-চাকর বহাল হয়েছে। দুই বন্ধুর ভাব হয়েছে আবার। ডাক্তারের ছাদ থেকে তারের বেড়াটা তুলে নিয়ে গিয়ে বাগানে বসানো হয়েছে। আর ভানু-মতী? সে আগের মতোই আসে মাঝে মাঝে। রনি গরগর করে। চেঙ্গিস খাঁ চেঁচিয়ে বলে—চুন্নী আয়া! চুট্টি আয়া! কিন্তু কেউ গ্রাহ্যই করে না।

এই বুলিটা কিন্তু হাবলুই শিখিয়েছিল কাকাতুয়াটাকে। আর ইলিশ চুরির পরদিন পেটের অসুখ হয়েছিল হাবলুর। গোপনে রমেন কম্পাউন্ডারের কাছে ওষুধ খেয়েছিল। এখন রমেন খুব ভয়ে-ভয়ে কাটাচ্ছে। ডাক্তারবাবুর কানে গেলেই হয়েছে।

নাদু সিঙ্গি বলেন, "আফটার অল, হাকিমের বেড়াল। বেআইনি কাজ করবে কেন? বড়জোর পাতের কাঁটাটা, নয়তো দুধের কড়াই মাজবে বলে রেখেছে, তখন কলতলায় একবার চাটল—ব্যস! এ তার আইনত পাওনা। কী বলো হে ডাক্তার?"

সায় দিয়ে নাড়ু ডাক্তার বলেন, "হুঁ। মিস সরখেল যেমন ভদ্র, ও'র বেড়ালটাও তাই।"

ছবি মদন সরকার
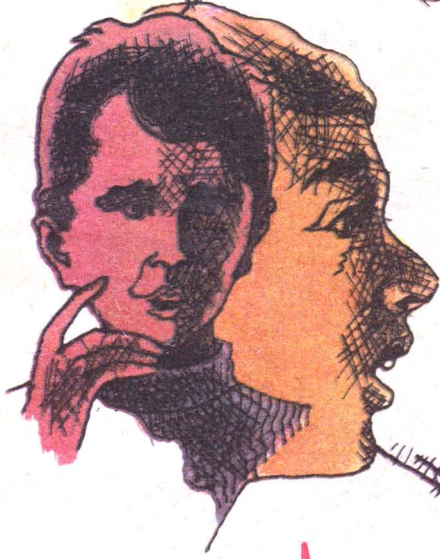
সোনার বিস্কুট

শেখর বসু

ছবি অলোক ধর

টাবলু, জয় আর শংকর তিনজনে খুব বন্ধু। ওরা এক পাড়ায় থাকে, এক স্কুলে পড়ে। তিনজনেরই অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে গেছে। টাবলু এবার ক্লাস টেনে উঠবে, জয় আর শংকর নাইনে। টাবলু এক ক্লাস উঁচুতে পড়ে বলে জয় আর শংকর ওকে টাবলুদা বলে ডাকে, কথা বলে অবশ্য তুই-তুই করে। টাবলুদাকে নিয়ে ওদের গর্বের শেষ নেই। টাবলু যেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি খেলাধুলোয়। বরাবর পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়, ওদিকে আবার ইন্টার-স্কুল বক্সিংয়ে পরপর দুবছরের চ্যাম্পিয়ন। স্কুল বা পাড়ার ফুটবল, ক্রিকেট টিম ওকে ছাড়া তৈরি হয় না। আর যা ম্যাজিক দেখায় না টাবলু, বড়রা পর্যন্ত ওর ম্যাজিক দেখে হাঁ হয়ে যায়। বড়দের সঙ্গে বড়-বড় বিষয়

নিয়ে কথা বলতে পারে টাবলু। যেমন, দেশের বেকার সমস্যা, বিদেশে চিংড়ি মাছ আর ব্যাঙ রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আনা, ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক। এ-সব কথার মানে জয় আর শংকর ঠিক বুঝতে পারে না, কিন্তু টাবলু যখন এই সব নিয়ে বড়দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তর্ক করে তখন অহংকারে ওদের বুক ফুলে ওঠে। ওদের মনে হয় টাবলুর কথাই ঠিক, টাবলুই শেষ পর্যন্ত তর্কে জিতে গেছে।

জয়ের মা আর শংকরের কাকীমা প্রায়ই ওদের বলেন "দেখ তো, সব কিছুতেই টাবলু কেমন সেরা ছেলে আর তোরা! তোরা পারিস না ওর মতো হতে?" অন্য কারও সঙ্গে তুলনা টানলে জয় আর শংকর খুব চটে যেত, কিন্তু টাবলুর কথা আলাদা। টাবলু সব ব্যাপারেই ওদের চাইতে অনেক, অনেক ওপরে। ওরা সেটা ভালভাবে জানে, আর জানে বলেই টাবলুর প্রশংসায় ওরা খুব খুশি হয়ে ওঠে। টাবলুর মতো বন্ধু পাওয়া তো ভাগ্যের কথা।

টাবলুর গায়ে প্রচণ্ড জোর, বুকে দারুণ সাহস, আর মাথায় ভীষণ বুদ্ধি। এই তিনটে এক সঙ্গে খাটিয়ে টাবলু গত বছর এই সময় মধুপুরে একটা ডাকাত ধরেছিল। সঙ্গে অবশ্য জয় আর শংকর ছিল, তবে ওরা জানে ওদের আলাদা কোনো কৃতিত্ব নেই। কিন্তু টাবলু এত ভাল যে, সবাইকে ডেকে ডেকে বলে বেড়িয়েছিল, "একা কি আর ডাকাতটাকে ধরতে পারতাম, ভাগ্যিস সঙ্গে জয় আর শংকর ছিল।" গত বছর অ্যানুয়াল পরীক্ষা দিয়ে ওরা বাড়ির লোকদের সঙ্গে মধুপুর বেড়াতে গিয়েছিল। সব মিলিয়ে পনেরো দিন ছিল ওরা। সেই দিনগুলোর কথা কেউ একদিনের জন্যেও ভুলতে পারেনি। এবার পরীক্ষা হয়ে যাবার পরে মধুপুরের অ্যাড-ভেঞ্চারের কথা খুব বেশি করে মনে পড়ছিল ওদের। কিন্তু এবার তিন বাড়ির বড়দের কেউই কোথাও বেড়াতে যাবে না। বেড়াতে যাবার কথা বলতে-বলতে জয় আর শংকর কেঁদে ফেলেছে পর্যন্ত, কিন্তু বড়দের কাউকেই রাজী করাতে পারেনি।

সবারই নাকি কী-সব দরকারী কাজ আছে।

টাবলু বলল, "বড়রা যাবে না তাতে কী হয়েছে, আমরা যাব।"

জয় চোখ বড়-বড় করে বলল, "একা-একা?"

শুনে টাবলু হাসল। "তিনজনে গেলে কি আর একা-একা হয়।"

প্রায় তোতলা হয়ে শংকর জিজ্ঞেস করল, "কোথায়, কোথায় যাব আমরা?"

"নেপাল।"

"ন্যাপাল!"

"ন্যাপাল নয়, নেপাল।"

"সে তো অনেক দূর।"

"তা একটু দূর।"

"অদ্দূরে ছাড়বে আমাদের?"

"কেন ছাড়বে না, আমরা কি বড় হইনি?"

টাবলু বলল, "শোন্, বড়রা যে এবার আমাদের কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবে না, পরীক্ষা শুরু হবার আগেই আমি টের পেয়ে গিয়েছিলাম। তাই আমি নিজে-নিজেই একটা প্রোগ্রাম তৈরি করেছি। আমার ছোটমামা থাকেন নেপালে, তাঁর ওখানেই উঠব, একটা চিঠিও ছেড়ে দিয়েছি গত সপ্তাহে। নেপাল তো বিদেশ, সংগে একটা পরিচয়পত্র থাকা ভাল। সতুদা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সতুদা বলেছেন, নিজের প্যাডে আমাদের জন্যে দু-চার লাইন লিখে দেবেন। লিখবেন, এরা ভারতীয় নাগরিক, শিক্ষামূলক ভ্রমণে নেপালে যাচ্ছে। নীচে সই, তার নীচে অফিসের স্ট্যাম্প, ব্যস, আর কী চাই।"

সব শুনে উত্তেজনায় জয় আর শংকরের গা-হাত-পা কেঁপে উঠল। টাবলুদা একা-একা এদ্দূর ভেবেছে, একা-একা এদ্দূর এগিয়েছে। কিন্তু, বাড়ির কথা ভেবেই ওদের মন খারাপ হয়ে গেল, বাড়ি থেকে কি ওদের ছাড়বে! কাছাকাছি হলে না হয় কথা ছিল, কিন্তু নেপাল—সে তো অনেক দূর। শংকর বলল, "আমাদের কথা কেউ শুনতেই চাইবে না, তোকে বাড়ির মত করাতে হবে।"

টাবলু একটু চটে উঠে বলল, "এর আবার মত করাবার কী আছে? তোদের বয়েসী ছেলেরা বিদেশে কী না করছে! একা-একা নৌকো নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে, একা-একা অন্য দেশে বেড়াতে যাচ্ছে, দল বেঁধে পাহাড়ে উঠছে আর তোরা সামান্য এখান থেকে ওখানে বেড়াতে যেতে পারবি না?"

জয় আর শংকর দুজনেই বুঝতে পারল, টাবলু এই কথাগুলো সত্যি-সত্যি ওদের বলছে না। কথাগুলো টাবলু তৈরি করে রাখছে ওদের বাবা-মাদের বলার জন্যে। টাবলুর চোখে-মুখে আত্মবিশ্বাস, এভাবে যদি বলতে পারে তাহলে বাবা-মায়া হয়ত শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে যাবেন।

টাবলু হাসতে হাসতে বলল, "সতুদা বলেছে, ওই চিঠিটায় আমাকে তোদের দুজনের অভিভাবক করে দেবে। অভিভাবক হিসেবে আমাকে কেমন মানাবে রে?"

জয় আর শংকর একইসংগে উত্তর দিল "টেরিফিক।" টেরিফিক শব্দটা কিছুদিন হল ওরা টাবলুর কাছ থেকেই শিখেছে। সত্যি, টাবলুকে অভিভাবক হিসেবে দারুণ মানাবে। টাবলু লম্বায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি, ছিপছিপে চেহারা বলে আরও লম্বা দেখায়। মুখে অল্প-অল্প দাড়ি-গোঁফ গজিয়েছে। বয়সের তুলনায় বেশ একটু বড়ই মনে হয় টাবলুকে।

ওদের কথা হচ্ছিল টাবলুদের ছাতের ঘরে বসে। ঘরে কিংবা ছাতে আর কেউ নেই, কিন্তু টাবলু হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল, "আমাদের তিনজনকে চারটে করে জিনিস অবশ্যই সংগে নিতে হবে। গতবার মধুপুরে এই জিনিসগুলো কাছে না থাকায় খুব অসুবিধেয় পড়তে হয়েছিল। জিনিসগুলো হল : এক—ছুরি, দুই—দড়ি, তিন—টর্চ, চার—টিনফুড। কেন, কিছু বুঝতে পারলি?"

শংকর আর জয় কারণটা কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিল, কিন্তু ওদের কৌতূহল এত তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, আন্দাজ খাটিয়ে সময় নষ্ট না করে দুদিকে মাথা নাড়িয়ে "না" বলে দিল।

টাবলু একটু কেসে গলা আরও নামিয়ে বলল, "ছুরি কিসে লাগে? আত্মরক্ষায় আর শত্রুকে আক্রমণ করতে। দড়ি লাগে শত্রুকে বাঁধতে কিংবা শত্রুদের দোতলা, তিনতলা থেকে দড়ি ঝুলিয়ে পালিয়ে যাবার কাজে। টর্চের দরকার বেয়াড়া জায়গায় ঘুটঘুটে অন্ধকারে পথ চলাতে। আর, টিনফুড? ধর, এমন জায়গায় গিয়ে পড়লাম যেখানে জনমনিষ্যি নেই। সেখান থেকে লোকালয়ে পৌঁছতে দু-তিনদিন লেগে যাবে। এই দু-তিনদিন খাব কী? না, টিনের খাবার।"

অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়ে জয় আর শংকরের গা শিরশির করে উঠল। শংকর আর বসে থাকতে পারল না, উঠে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, "ব্যাপারটা একটু খুলে বল্ না টাবলুদা।"

টাবলু খুব রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে বলল, "এখন না, পরে, দেখি।"

শংকর আর জয় দুজনেই জানে, টাবলুর এই "দেখি"-টা মারাত্মক। যতই জিজ্ঞেস করা যাক না কেন, টাবলু আর কিছু ভাঙবে না। "দেখি" মানে শুধু ওর নিজেরই দেখা, আর কাউকে কিছু না দেখানো।

প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে জয় আর শংকরের দু-তিনদিন কেটে গেল। পরীক্ষা হয়ে গেছে, কোথায় মজা করে বেলা পর্যন্ত ঘুমোবে, তা না, ভোর হতে না হতেই ওদের ঘুম ভেঙে যায়। আর, ঘুম ভেঙে গেলে বিছানায় শুয়েও থাকতে পারে না। শরীরের মধ্যে অদ্ভুত ছটফটানি শুরু হয়ে যায়, মাথার মধ্যে আজগুবি সব চিন্তা ঘোরে। উঠে পড়ে বিছানা থেকে। কিন্তু উঠেই বা কী করবে? হাতে কোনো কাজকম্ম নেই। গল্পের বইয়ে মন বসে না, মন দিয়ে খেলাধুলোও করতে পারে না অনেকক্ষণ।

দুজনে দেখা হলেই শুধু ফিসফিস আর ফিসফিস। কী হবে, কেমন করে হবে, এই নিয়ে শুধু কথা। নেপালের রাস্তা-ঘাট, পাহাড়-পর্বত সম্পর্কে যা শুনেছে, কল্পনায় তার দশগুণ বাড়িয়ে তোলে ওরা। অদৃশ্য শত্রুর চেহারা, চক্রান্ত নিয়েও ওদের ভাবনার শেষ নেই। ছুরি, দড়ি, টর্চ আর টিনফুডের কথা ওঠার পর থেকেই ওদের বারবার মনে হচ্ছে এবার সাঙ্ঘাতিক কিছু-একটা ঘটে যাবে।

জয় আজ দুদিন হল ভোরের দিকে খালি হাতে ব্যায়াম শুরু করে দিয়েছে। অ্যাডভেঞ্চারে যাবার আগে গায়ে একটু জোর বাড়িয়ে নেওয়া দরকার, না হলে শত্রুর বিরুদ্ধে ও লড়বে কী করে! অবশ্য ব্যায়াম করার কথা ও শংকর আর টাবলুকে বলেনি, বললেই ওরা খ্যাকখ্যাক করে হেসে উঠবে। রোগাপটকা বলে জয়ের মনে এমনিতেই একটু দুঃখ আছে, তাই নিয়ে কেউ হাসাহাসি করুক ও চায় না।

জয় আর শংকর দুজনেই বাড়ি থেকে ছুরি, দড়ি আর টর্চ যোগাড় করে লুকিয়ে রেখেছে। কাজ যতটা এগিয়ে রাখা যায় ততই ভাল। বাকি রইল শুধু টিনফুড। ওদের বাড়িতে টিনের কৌটোয় চাল, ডাল, ময়দা, সুজি, মশলাপাতি ইত্যাদি

আছে, কিন্তু টিনে থাকলেই তো আর টিনফুড হয় না। টিন-ফুড কিনতে হবে। কিনতে হলে পয়সা দরকার, অত পয়সা ওদের কাছে এখন নেই। টাকাপয়সার অবশ্য অভাব হবে না যদি বাড়ি থেকে মত দেয়। কিন্তু মত দেবে কি! দুজনেই বলি-বলি করেও কিছু বলেনি বাড়িতে। ওরা বললে যদি ব্যাপারটা কেঁচে যায়, তার চাইতে টাবলুর বলা ভাল। কিন্তু টাবলুর হলটা কী?

সেদিন নিজেই অত আগ্রহ করে ওদের সবকিছু বলল, তারপর থেকে একেবারে চেপে গেছে। বেড়াতে যাবার পরি-কল্পনা নিয়ে জয় আর শংকর হাজাররকম প্রশ্ন তোলে, কিন্তু টাবলু শুধু 'হুঁ-হাঁ' করে, অনেকসময় মনে হয় কথাগুলো ওর কানেই যাচ্ছে না। দিনরাত্তির ছাতের ঘরে বসে মচমচে হলুদ পাতার একটা ইংরেজী বই পড়ে। বইটার মলাট ছেঁড়া, পাতাগুলোর কোনা ভাঙা, আর অক্ষরগুলো কী ক্ষুদে-ক্ষুদে, বইটার কোত্থাও একটি ছবি পর্যন্ত নেই। এরকম বই দেখলেই রাগ হয়ে যায়। অথচ টাবলু যেন বইটার মধ্যে ডুবে আছে, মাঝেমধ্যে জায়গায়-জায়গায় লাল পেনসিল দিয়ে আন্ডারলাইন করে। একটা পাতা পড়া হয়ে গেলে আর একটা পাতা এত যত্ন করে ওলটায় যেন একটু ধাক্কা লাগলেই ছাপানো অক্ষরগুলো বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে হুড়মুড় করে খসে পড়বে।

স্কুলের পড়ার বইয়ের বাইরে জয় আর শংকর একটাও ইংরেজী বই পড়ে না। পড়তে যে ওদের ইচ্ছে করে না তা নয়, তবে ইংরেজী বই দেখলেই ওদের কেন যেন স্কুলের বইয়ের কথা মনে পড়ে যায়। আর, সেইজন্যেই পড়া হয়ে ওঠে না। অবিশ্যি ইংরেজি বইয়ের ছবি দেখতে ওদের খুব ভাল লাগে, খেলার বই হলে তো কথাই নেই। টাবলু গাদা-গাদা ইংরেজী গল্পের বই পড়ে, টাবলুর এই গুণটি নিয়েও ওদের খুব গর্ব, কিন্তু এখন ওই যাচ্ছেতাই বইটা না পড়লেই হত না! শংকর খুব বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "কীসের বই ওটা, ডিটেকটিভ?"

টাবলু বই থেকে চোখ না তুলেই উত্তর দিল, "উহুঁ।"

"তবে কী? অ্যাডভেঞ্চার?"

"উহুঁ।"

"ভূতের?"

"উহুঁ।"

"খেলার?"

"উহুঁ।"

"তবে কীসের?"

"উহুঁ।"

টাবলুর রকমসকম দেখে জয়েরও খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওর উত্তর শুনে হাসি আর চেপে রাখতে পারল না। হো-হো করে হেসে উঠল। হাসি শুনে টাবলু বিব্রত মুখে ওদের দিকে তাকাল, তারপর বলল, "ও হ্যাঁ. তোদের বলা হয়নি, আজকেই ছোটমামার চিঠি পেয়েছি। যাবার তারিখ জানাতে লিখেছে, বাস স্টপে আমাদের জন্য গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে।"

শুনে লাফিয়ে উঠল জয় আর শংকর। শংকর বলল, "তুই কী অদ্ভুত রে, এই কথাটাই এতক্ষণ বলিসনি আমাদের?"

টাবলু আবার বইটা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। ওদের উচ্ছ্বাস আর অত বড় দুটো লাফকে একেবারে গ্রাহ্যই করল না। চিঠিতে কী-কী লেখা আছে, তাই নিয়ে আর একটা কথাও বলল না। পরপর পাঁচ-সাতটা প্রশ্ন করল জয় আর শংকর, কিন্তু একটারও উত্তর দিল না টাবলু। রেগে গিয়ে জয় একটানে ওর হাত থেকে বইটা কেড়ে নিল। কেড়ে নিতেই টাবলু এমন-ভাবে হাঁ-হাঁ করে উঠল যেন জয় বই না নিয়ে ওর একখানা হাত খুলে নিয়েছে। বইটা পেছনদিকে লুকিয়ে জয় দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। ওর চোয়াল শক্ত, কিছুতেই বইটা দেবে না।

টাবলু অনুনয়ের গলায় বলল, "দিয়ে দে, দিয়ে দে, প্লিজ দিয়ে দে। অনেকদিনের পুরনো বই, নষ্ট হয়ে যাবে।"

শুনে জয় এমন ভাব দেখাল যেন কথাগুলোর ও মানেই বুঝতে পারেনি। পেছন থেকে শংকর ওকে উস্‌কে দিল, "কক্ষনো দিবি না, কী এক বই হয়েছে, তিনদিন ধরে কথা বলার সময় পর্যন্ত পাচ্ছে না। নেপাল যাবি না তো আমাদের নাচালি কেন অ্যাদ্দিন?"

"কে বলল, যাব না?" জয়ের হাত থেকে বইটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে-করতে উত্তর দিল টাবলু।

"কত যে যাবি বোঝা গেছে, যাবার ইচ্ছে থাকলে ছোট-মামার চিঠি পাওয়ার কথা এত দেরিতে বলতিস না।"

"দেরি কোথায়!"

"দেরি না? সেই কখন এসেছি, আর এখন বাড়ি ফেরার সময় কথাটা বললি।"

"আরে বাবা! বললাম তো।"

"আসলে তোর বেড়াতে যাবার ইচ্ছে নেই।"

"কে বলল নেই?"

"ইচ্ছে থাকলে তুই এভাবে বই মুখে দিয়ে বসে থাকতিস না দিনরাত্তির।"

"তাই বলে আমি চুপ করে আছি না কি। এই তো আজ সকালেই সতুদাকে ফোন করেছিলাম। নেপালে যাবার কাগজপত্র সব রেডি হয়ে গেছে, কাল গিয়ে নিয়ে আসব।"

ছোটমামার চিঠি এসেছে শুনে জয় আর শংকর আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল, কিন্তু এই কথাটা শুনে ওরা একেবারে পাথর হয়ে গেল। এত বড় একটা খবর, অথচ এ নিয়ে এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি টাবলু! আর এখনই বা কীভাবে বলল! যেন বলতে চায়নি, নেহাত কথার পিঠে কথা চাপাতে গিয়ে খবরটা বেরিয়ে পড়েছে।

এত বড় একটা বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে ওদের কয়েক মুহূর্ত লেগে গেল। সেই ফাঁকে টাবলু জয়ের আলগা মুঠো থেকে ওই বইটা বার করে নিল। টাবলুর মুখে রহস্যময় হাসি। বইয়ের পাতা ওলটাতে-ওলটাতে বলল "কাল দুপুরে তোরা বাড়ি থাকিস না, আমি গিয়ে মাসীমাদের মত করাব। হাতে ছোটমামার চিঠি আর সতুদার সার্টিফিকেট থাকলে ও'রা অমত করতে পারবে না! অ্যাদ্দিন বাড়িতে কিছু বলিনি কেন বুঝতে পেরেছিস? যা, পালা, রাত হয়ে গেছে, এ-কদিন বাড়িতে একটু বেশি করে গুড বয় হয়ে থাকতে হবে, বুঝলি। কাল বিকেলে আসিস।"

প্রচণ্ড উত্তেজনায় জয় আর শংকরের মুখ থেকে কোনো কথাই বেরুল না কিছুক্ষণ। শংকর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, "সত্যি টাবলুদা, কী যে বলব তোকে!"

জয় জ্বলজ্বলে চোখের মণি ফ্যাকাশে করে বলল, "সবই হবে, তবে বাড়ি থেকে কিছুতেই ছাড়বে না আমাকে।"

টাবলু আবার বইয়ের মধ্যে তলিয়ে গেছে, ওই কথার উত্তরে ঠাণ্ডা গলায় শুধু বলল, "দেখি।"

বাড়ি ফিরে গেল জয় আর শংকর। দুজনের কেউই সে রাত্রে ভাল করে খেতে পারল না। খাবে কী করে? চাপা অস্বস্তি আর উত্তেজনা ওদের গলা আর বুকের মধ্যে জমাট বেঁধে আছে।

জয় লুকিয়ে-লুকিয়ে বাবা-মায়ের মুখের দিকে তাকাল কয়েকবার। বোঝার চেষ্টা করল, বাবা-মা সত্যিই লোক কেমন! টাবলুদাকে যদি এক কথায় থামিয়ে দেয়। যদি বলে, "না-না, ওকে

একা-একা ছাড়ব না, যা বাঁদর একখানা!"

সে-রাত্রে দুজনের কারোরই ঘুম এল না অনেকক্ষণ। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে এপাশ-ওপাশ করল মাঝরাত্তির পর্যন্ত। ঘুমোবার পরে আজেবাজে স্বপ্ন দেখল। ওদিকে আবার ঘুম ভেঙে গেল সাতসকালে।

ঘুম থেকে উঠে জয় ব্যায়াম করতে গেল, কিন্তু ব্যায়ামে মন বসছিল না একটুও। রাতে ভাল ঘুম হয়নি, তাই গা-হাত-পা ম্যাজম্যাজ করছিল ভীষণ। আর একটু সকাল হতেই শংকর এল ওদের বাড়িতে। আসতেই নিচু গলায় শলা-পরামর্শ শুরু হয়ে গেল। একই কথা, একই যুক্তি ঘুরেফিরে এল বেশ কয়েকবার, কিন্তু ওরা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না বাড়িতে মত দেবে কি দেবে না!

জয়ের বাবা সকাল সাড়ে-আটটার সময় খবরের কাগজ পড়া বন্ধ করে দাড়ি কামাতে যান। আজ নটা বেজে গেল, অথচ উনি কাগজ ছেড়ে উঠলেন না। জয়ের তখন মনে পড়ে গেল যে, আজ রোববার। পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পরে কবে কী বার ওর সবসময় মনে থাকে না। আজ রোববার, তার মানে বাবা সন্ধে পর্যন্ত বাড়িতে থাকবেন। জয়ের বুক-কাঁপুনি নতুন করে শুরু হয়ে গেল। টাবলুদা বেড়াতে যাবার কথা মাকে

বললেই মা বাবাকে দেখিয়ে দেবে, আর বাবা হয়ত এককথায় সব নাকচ করে দেবেন। শংকরের অবশ্য বাবার চাইতে মাকেই বেশি ভয়।

দুপুরবেলায় ওরা তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে ক্রিকেট ম্যাচ আছে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর সারাদিন এদিক-ওদিক টো-টো করে ঘুরে বিকেলবেলায় টাবলুর ছাতের ঘরে গিয়ে হাজির হল। টাবলু সেই বইটা পড়ছে, ওদের দিকে না তাকিয়ে বলল, "বোস।"

ওরা না বসে টাবলুর পাশে এসে দাঁড়াল। শংকর গতকাল দেখে গিয়েছিল টাবলু একশ পঁচাশি পাতাটা পড়ছে। বইটা মোট দুশো কুড়ি পাতার, ভেবেছিল কাল রাতেই বইটা শেষ হয়ে যাবে। আজ এসে পৃষ্ঠাসংখ্যার দিকে তাকিয়ে ও অবাক হয়ে গেল, একশ নব্বই। তার মানে চব্বিশ ঘণ্টায় মাত্র পাঁচ পৃষ্ঠা পড়েছে! খুব রাগ হয়ে গেল শংকরের, আর রাগের কথা বলতেই টাবলুদা একটু হেসে বলল, "এই নিয়ে তিনবার

আমি বইটা শেষ করছি, অদ্ভুত ইণ্টারেস্টিং বইটা।"

ইণ্টারেস্টিং বই নিয়ে একটুও মাথা ঘামাল না জয়. টাবলুর কাঁধে ধাক্কা দিয়ে বলল, "গিয়েছিলি বাড়িতে? বলেছিস?"

টাবলু বইটা ভাঁজ করে রেখে গম্ভীর গলায় বলল. "গিয়েছিলাম।"

শুনেই জয় আর শংকরের ফর্সা মুখ লালচে হয়ে উঠল। "তারপর?"

"তারপর, সব বললাম?"

"কী বলল?"

"বলল, ছাড়বে না।"

"ছাড়বে না!"

"না, তবে...।"

"তবে?"

"আমি হাল ছাড়লাম না। সব বুঝিয়ে বললাম, ছোট মামার চিঠি আর সতুদার সার্টিফিকেট দেখালাম, তারপর..."

"তারপর?"

"তারপর অনেক কষ্টে রাজী করালাম।"

"রাজী? সত্যি রাজী?"

"হ্যাঁরে বাবা, হ্যাঁ।"

শুনে জয় আর শংকর এমন নাচ জুড়ে দিল যে, দুপদাপ শব্দ শুনে টাবলুদের ঠাকুর ব্যাপার কী দেখার জন্যে ছাতে উঠে

এল। ঠাকুরকে দেখে ওদের নাচ বেড়ে গেল আরও। প্রায় পাঁচ মিনিট নাচার পরে ওরা দুজনেই জড়িয়ে ধরল টাবলুকে। সত্যি, টাবলুদার জবাব নেই! টাবলু হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল, "ওকাল্ট সায়ান্স কাকে বলে জানিস?"

"কী সাইন্স?"

"বল তো ব্ল্যাক আর্ট কাকে বলে?"

"ব্ল্যাক আর্ট হচ্ছে—কালো...কালো...।"

"না না, কালোটালো না, ব্ল্যাক আর্ট হচ্ছে সত্যিকারের জাদু, এই যে বইটা দেখছিস না, একে বই না বলে সোনার খনি বলা উচিত।"

"ওহ্, বইটা ম্যাজিকের, নতুন ম্যাজিক-ট্যাজিক কিছু শিখলি?"

টাবলু একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, "আমরা ম্যাজিক বলতে তো শুধু হাতসাফাইয়ের কথা জানি, এ বইটা সে-সব নিয়ে নয়, এ হচ্ছে সত্যিকারের জাদু। এই জাদু জানা থাকলে আস্ত একটা পাহাড় উড়িয়ে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। ইচ্ছেমতো ঝড় বৃষ্টি নামানো যায় আকাশ থেকে, সমুদ্র দুভাগ করে হেঁটে যাওয়া যায় ভেতর দিয়ে, আরও সব অদ্ভুত-অদ্ভুত ব্যাপার ঘটানো যায়।"

ঘটনাগুলো অবিশ্বাস্য, কিন্তু টাবলুর চোখ মুখ আর বলার ভঙ্গির মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল যে জয় আর শংকর কথাগুলো একেবারে উড়িয়ে দিতে পারল না।

টাবলু বলল, "বইটা হচ্ছে ব্ল্যাক আর্ট অব টিবেট নিয়ে লেখা। এক সময় জাদুর চর্চায় তিব্বত সারা পৃথিবীর মাথার ওপরে ছিল, এখন আর ততটা নেই, কিন্তু যা আছে তারও তুলনা মেলা ভার।"

শংকর দুম করে বলল, "চল না আমরা তিব্বতে যাই।"

টাবলু দুদিকে মাথা নেড়ে বলল, "এখন আর সে উপায় নেই, তবে তিব্বতে যেতে না-পারলেও আমরা তিব্বতীদের কাছে যেতে পারি।"

"কী ভাবে?"

"ভারতের অনেক জায়গাতেই তিব্বতীরা ছড়িয়ে আছে। বুড়ো তিব্বতীদের কেউ-কেউ নিশ্চয় ওই সব জাদু জানে।"

জয় দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল, "ওই সব জাদুর দু-একটা যদি জানা যেত কী দারুণ হত বল্ তো!"

কয়েক মুহূর্ত কেউ আর কোনো কথা বলল না, সবাই বোধহয় চুপ করে অদ্ভুত সব জাদুর কথা ভাবল।

টাবলু বলল, "শোন, ট্রেনে রিজার্ভেশন পেয়ে গেলে পরশু দিন সন্ধেবেলাতেই আমরা রওনা হয়ে যাব। হাতে থাকল দেড় দিন, এই দেড়দিনের মধ্যে সব গুছিয়ে-টুছিয়ে নিতে হবে। অযথা একগাদা জিনিসপত্তর নিবি না, এমন লাগেজ নিবি যাতে হাতে ঝুলিয়ে কি পিঠে বেঁধে আমরা অনায়াসে ঘুরতে পারি।"

শংকর চকচকে মুখ করে বলল, "টাবলুদা, ছুরি দড়ি আর টর্চ আমার যোগাড় হয়ে গেছে।"

"আমারও।" জয় গলা মেলাল।

ওরা ভেবেছিল কথাটা শুনে টাবলু খুব বাহবা দেবে, কিন্তু টাবলু একটাও কথা না বলে ওই বইটা টেনে নিয়ে আবার পড়তে শুরু করে দিল।

মংগলবারের বিকেল। এই দেড় দিন ওদের হাওয়ায় ভেসে কেটে গেল। ট্রেনের টিকিট, রিজার্ভেশন, কেনাকাটা, গোছানো সব হয়ে গেছে। সন্ধেয় ট্রেন। ওরা বাবা-মা আর বড়দের ঢিব ঢিব করে, প্রণাম করে, আর একবার সাবধানে থাকার উপদেশ শুনে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল। ট্যাক্সি সাঁ করে ছুটে ওদের স্টেশনে নামিয়ে দিল। টাবলুর কাছে জয় আর শংকর কুড়িটা করে টাকা দিয়ে দিয়েছে। টাবলুর নিজেরটা নিয়ে এখন ষাট টাকার ফান্ড, ফুরিয়ে গেলে আবার ফান্ড তৈরি হবে। সব খরচখরচা এক হাতে হবে, অর্থাৎ টাবলুর হাত দিয়ে। টাবলু ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিল।

ট্যাক্সি স্টেশনে থামতেই লাল-জামা-পরা দুটো কুলি ওদের ট্যাক্সির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কিন্তু যখন দেখল ওদের কাছে তিনটে ব্যাগ ছাড়া আর কিছু নেই তখন বেচারারা শুকনো মুখ করে ফিরে গেল। টাবলু বলল, "দেখলি তো, অল্প লাগেজ নিয়ে ঘোরার কী মজা, যখন যেখানে খুশি টকাটক চলে যাও, মালপত্র বইবার জন্যে কারও ওপর নির্ভর করতে হবে না।"

প্ল্যাটফর্মে গাড়ি এসে গিয়েছিল। বেশ ভিড় চারিদিকে। টাবলু বলল, "সাবধানে, হারিয়ে যাস না কেউ।" খুঁজে খুঁজে ওরা ওদের কম্পার্টমেন্টটা পেয়ে গেল। কম্পার্টমেন্টের গায়ে একটা টাইপ করা নামের লিসট ঝোলানো, এক গাদা লোক হুমড়ি খেয়ে সেগুলো দেখছে। টাবলু একে-তাকে সরিয়ে ঠিক সামনে এগিয়ে গেল, ওর পেছন পেছন জয় আর শংকর। লিসটে যাত্রীদের নামের পাশে বার্থ নম্বর লেখা আছে। ওই তো, ওই তো ওদের নাম—মিস্টার সুজয় মুখোপাধ্যায়, মিস্টার সুগত মিত্র আর মিস্টার শংকর সেন। টাবলুর ভাল নাম সুগত, জয়ের ভাল নাম সুজয়, আর শংকরের ভাল নাম, ডাক নাম একই। নামের আগে মিস্টার লেখা দেখে ওদের তিন জনেরই কেমন গা শিরশির করে উঠল। মিস্টার! তার মানে ওরা বড়, আর পাঁচজন বড়দের মতো বড়।

বার্থ নম্বর দেখে নিয়ে ওরা কম্পার্টমেন্টে উঠল। একটু এগোতেই ওরা পেয়ে গেল নম্বরগুলো, দুটো নীচের বেঞ্চি আর একটা ওপরের। ওপরের ঝুলন্ত বেঞ্চিটা দেখে জয় আর শংকর একই সঙ্গে লাফিয়ে উঠল।

"আমি ওপরেরটায় শোব।"

"না, ওটা আমার।"

ওদের ঝগড়া বেধে ওঠার মুখে টাবলু চাপা ধমক দিয়ে বলল, "কী, হচ্ছে কী! ছেলেমানুষি করছিস কেন?" "ছেলেমানুষি" শব্দটা মিস্টার সুজয় আর মিস্টার শংকরকে একেবারে চুপ করিয়ে দিল।

আসার সময় ওরা দেখেছে অন্যান্য কম্পার্টমেন্টে কী ভিড়, কী ভিড়! কিন্তু এই কামরাটায় লোকজন খুব কম। আসলে এই কামরাটা শুয়ে যাবার যাত্রীদের জন্যে রিজার্ভ করা। মাথা-পিছু একটা করে আস্ত বেঞ্চ। অনেকে এর মধ্যেই বিছানা পাততে শুরু করে দিয়েছে। টাবলুর হাতে ঘড়ি আছে, ওই ঘড়িতে সাতটা কুড়ি বাজতেই বাঁশি বাজিয়ে ট্রেনটা নড়েচড়ে উঠল, তারপর চলতে শুরু করল আস্তে আস্তে। ট্রেন ছাড়তেই ওদের কামরার অনেক যাত্রী জানলার বাইরে হাত গলিয়ে হাত নাড়তে শুরু করে দিল। যারা তুলে দিতে এসেছিল তারাও হাত নাড়তে লাগল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। জয় শংকরদের কেউ তুলে দিতে আসেনি, টাবলুই বারণ করেছিল সঙ্গে আসতে। কিন্তু ট্রেন ছাড়তেই প্ল্যাটফর্মের ভিড়ের মধ্যে মায়ের মুখখানা দেখতে পেল জয়। মাকে ছাড়া ও কোনোদিন কোথাও যায়নি। হঠাৎ ওর কেমন যেন মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু ট্রেনটা যখন খুব জোরে ছুটতে শুরু করল তখন টাবলু আর শংকরের ঝলমলে মুখের দিকে তাকিয়ে ও বাড়ির কথা ভুলে গেল একদম।

শংকর জানলার ধারে বসে ছিল। বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, "যা দারুণ লাগছে না টাবলুদা, কী বলব তোকে! জয়, যা ওপরে উঠে শুয়ে পড়, আমি আজ রাত্তিরে আর শোবই না।"

জয় হেসে উঠল, "কে শোবে না, তুই? ঘুমের জন্যে রাত্তিরে তুই ভালভাবে খেতে পর্যন্ত পারিস না, তুই জেগে থাকবি সারা রাত্তির?"

ওর কথা শুনে টাবলু আর শংকর হেসে উঠল। শুধু মজার কথা নয়, যে-কোনো কথাতেই ওরা হেসে উঠছিল একসঙ্গে। ওরা এত খুশি বোধ হয় আর কখনও হয়নি। জীবনে এই প্রথম অভিভাবক ছাড়া ওরা বেড়াতে যাচ্ছে, তাও আবার ধারে-কাছে নয়, বাড়ি থেকে অনেক দূরে।

কামরার এদিকে আরও তিনজন আছে। একজন ঝাঁকড়া গোঁফ-ওয়ালা, মোটা, গম্ভীর লোক। লোকটার হাতে টাইমটেবল, লোকটা ট্রেনে ওঠার পর থেকে টাইমটেবল পড়ছে, আর মাঝে-মধ্যে ওদের দিকে তাকাচ্ছে কটমট করে। সামনে বসে অকারণে এভাবে তাকালে কার না খারাপ লাগে! শংকর ফিসফিস করে বলল, "আমরা খুব হাসছি তো, সেইজন্যে লোকটা চটে গেছে।"

জয় বলল, "না রে, আমি তাড়াহুড়ো করে ট্রেনে ওঠার সময় এই লোকটার পা মাড়িয়ে দিয়েছিলাম, সেইজন্যেই বোধ হয় খেপে আছে।"

টাবলু লোকটাকে একবার খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বলল, "কোনোটাই আসল কারণ নয়, আসলে লোকটার চাউনিটাই কটমটে, ওর ভাল লাগলেও কটমট করে তাকাবে।"

শংকর বলল, "তাহলে ওর নাম দেওয়া যাক মিস্টার কটমট।" তাই না শুনে জয় আর টাবলু হো-হো করে হেসে উঠল। হাসতেই মিস্টার কটমট ওদের দিকে তাকাল কটমট করে।

বাকি দু-জনের একজন বুড়ো ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের বাঁ হাত আর বাঁ পা প্লাস্টার করা। বয়েস হয়েছে তো বোধ হয় পা পিছলে পড়ে গিয়ে ভেঙেছেন। সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা, মনে হয় ওঁর মেয়ে। ওদের সামনে ওদিকে জানালার কাছে ওপর-নীচে দুটো বেঞ্চি। দুই ভদ্রলোকই অবাঙালী। ওপরের জন পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছেন। নীচের ভদ্রলোক একটা বিরাট টিফিন কেরিয়ার খুলে সিটের ওপর বাটিগুলো সাজাচ্ছেন। আস্তে আস্তে বাটি থেকে পুরি-তরকারি, বড় বড় লাড্ডু আর চাটনি বেরিয়ে এল। হাওয়ায় খাবারের গন্ধ ভেসে এসে ওদের তিন জনেরই নাকে লাগল। জয় বলল, "টাবলুদা, আমরাও তো এখন খেয়ে নিতে পারি।"

"তা পারি, ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে ফেলাই ভাল।" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল টাবলু।

শংকর গম্ভীরভাবে বলল, "আমি শুনেছি, ট্রেনে উঠে বেশি রাত্তিরে নাকি খেতে নেই।"

ওরা বেঞ্চির ওপর একটা খবরের কাগজ বিছিয়ে যে যার ব্যাগ থেকে খাবার-দাবার বার করল। প্রত্যেকের বাড়ি থেকেই তিন জনের মতো খাবার দিয়ে দিয়েছে। কাগজের ওপর খাবারের পাহাড় হয়ে গেল। লুচি, আলুর দম, পরোটা-তরকারি, নিমকি, সন্দেশ, ক্ষীরের চপ আর কেক। মিস্টার কটমট একবার কটমট করে ওদের খাবারের দিকে তাকিয়ে আবার টাইমটেবল পড়তে শুরু করে দিল। ওদিকের লোকটা পুরি-তরকারি খেতে-খেতে ওদের খাবারের দিকে মাঝে-মধ্যে তাকাচ্ছিল জুলজুল করে।

তিন জনে যত খুশি খেয়েও সব খাবার শেষ করতে পারল না। টাবলু বাকি খাবারটা একটা পলিথিনের প্যাকেটে জড়িয়ে ব্যাগের মধ্যে চালান করে দিয়ে বলল, "এগুলো সকালে খাব আমরা। পথে একদম খাবার নষ্ট করা উচিত নয়।" তারপর হাতঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে সামনের বুড়ো ভদ্রলোককে বলল, "দাদু, আপনি এইভাবে ওপরে উঠে শোবেন কী করে? নীচের দুটো বেঞ্চিই আমাদের, আপনি একটা নিন, আমাদের কেউ ওপরে চলে যাবে।"

শুনে ভদ্রলোক খুশি হয়ে বললেন, "বেশ বেশ।" টাবলু আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল তার আগেই ভদ্রলোক আবার চোখ বুজে ঝিমোতে শুরু করে দিলেন। সঙ্গের ভদ্রমহিলা টাবলুকে একবার দেখে নিয়ে মুখ ঘোরালেন জানলার দিকে।

তাই দেখে জয় আর শংকরের একটু রাগ হয়ে গেল। টাবলু গায়ে পড়ে এত বড় একটা উপকার করল, ওদের তো আরও অনেক কিছু বলা উচিত ছিল। সে কথা টাবলুকে বলতেই টাবলু বলল "না না, ওভাবে ব্যাপারটাকে দেখিস না। ভদ্রলোকের অত বড় একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পাচ্ছেন, এখন কি ওঁর গল্প করার মতো অবস্থা আছে।"

সব কটা জানলায় কাঁচের সার্সি ফেলা, কিন্তু মাঝেমধ্যে কোত্থেকে যেন ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছিল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া আরও ঠান্ডা হয়ে উঠছিল। টাবলু, জয় আর শংকর—তিন জনের গায়েই পুরোহাতা সোয়েটার, ওরা শার্টের কলারগুলো তুলে কান ঢেকে গল্প করছিল। টাবলু হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল, "তোদের আসল কথাটাই বলা হয়নি।" আসল কথা শোনার জন্যে জয় আর শংকর টাবলুর কাছাকাছি এগিয়ে এসে বসল।

টাবলু গলা আরও নামিয়ে বলল, "এখন না, সবাই শুয়ে পড়ুক, তার পরে বলব।" টাবলু আর কোনো কথা না বলে ব্যাগ খুলে কাগজের একটা প্যাকেট বার করল। প্যাকেট খুলতেই বেরিয়ে পড়ল মলাট ছেঁড়া, মচমচে সেই পুরনো বইটা। এই বইটা দেখে দুদিন আগে জয় আর শংকরের কী রাগ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন বইটায় কী লেখা আছে জানার জন্যে ওদের খুব কৌতূহল হল। তবে এই কৌতূহলটা ছাপিয়ে আর একটা কৌতূহল মাথা চাড়া দিয়ে উঠল—টাবলুদার আসল কথাটা কী?

একটু পরেই মিস্টার কটমট, বুড়ো ভদ্রলোক আর পুরি-খাওয়া লোকটার বড় বড় হাই উঠতে লাগল। তারপর এক এক করে সবাই শুয়ে পড়ল। বুড়ো ভদ্রলোক শুলেন ওদিকের নীচের বেঞ্চিটায়। টাবলু বইটা ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে সিলিংয়ের দুটো আলোর একটা নিবিয়ে দিল। টিমটিমে একটা আলোয় ঘরটা এখন আবছা অন্ধকার অন্ধকার। জয় আর শংকর টাবলুর গা ঘেঁষে বসল। টাবলু এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, "আমরা কিন্তু এখন নেপাল যাচ্ছি না।"

শুনে শংকর আর জয় একইসঙ্গে আঁতকে উঠল, "সে কী!"

টাবলু একটু চুপ করে থেকে বলল, "নেপালে যাব কয়েকদিন পরে।"

"তাহলে এখন কোথায় যাচ্ছি?" কাঁপা-কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল জয়।

"যাচ্ছি রুটুংয়ে।"

"রুটুং! কোথায় সেটা?"

"নেপালের কাছেই। ছোট্ট একটা পাহাড়ী জায়গা, এর নাম বিশেষ কেউ জানে না।"

"হঠাৎ ওখানে যাচ্ছি কেন?"

"ওটাই তো আসল কথা। যাচ্ছি ব্ল্যাক আর্ট অব টিবেট শিখতে।"

"রুটুং কি তিব্বতে?"

"না না, ভারতেই। তবে ওখানে প্রচুর তিব্বতী থাকে, তাদের মধ্যে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই ওইসব জাদু জানে।"

"জানলেই বা শেখাবে কেন?"

"আমরা শিষ্য হয়ে যাব। শিষ্যদের গুরুরা সব শেখায়।

রামায়ণ, মহাভারতের গুরুরা শিষ্যদের কত ভালবাসতেন, পড়িসনি? অর্জুন, উতঙ্ক—এইসব শিষ্যদের দেখ। প্রিয় শিষ্য হতে পারলে গুরুরা অনেক সময় তাঁদের গুপ্ত বিদ্যাও দিয়ে দেন।"

"কিন্তু শিষ্য হতে গেলে তো অনেকদিন থাকতে হয়, আমরা অদ্দিন থাকব কী করে?"

"অদ্দিন থাকতে যাব কেন? তিন চারদিনের মধ্যে যা শেখা যায় তাই শিখব। ভেবে দেখ্, ওই সব জাদুর একটাও যদি শিখতে পারি, আমরা কী না করতে পারব!"

উত্তেজনায় জয় আর শংকরের কথা বন্ধ হয়ে গেল কিছুক্ষণ। কিন্তু, বাড়ির কথা মনে পড়তেই ভয় পেয়ে গেল দুজনেই। জয় বলল, "বাড়ি থেকে বারবার বলে দিয়েছে, নেপালে গিয়েই যেন পৌঁছসংবাদ জানিয়ে চিঠি দিই।"

"আমাকেও বলেছে।" শংকর বলল।

টাবলু কেমন যেন নিষ্ঠুরভাবে হেসে উঠে উত্তর দিল, "আমাকে কি বলেনি? আমাকেও বলেছে। তবে, বাড়ির প্রত্যেকটা কথা শুনতে গেলে আর অ্যাডভেঞ্চার করা যায় না। এই তো গতবার মধুপুরে—আমাদের কি বাড়ি থেকে ডাকাত ধরতে বলে দিয়েছিল? নেপালে তো যাচ্ছিই, একটু দেরি হবে এই যা, গিয়ে চারদিন আগের তারিখ বসিয়ে চিঠি ছেড়ে দেব। বাড়িতে ভাববে, পোস্টাফিসের গোলমালে চিঠি আসতে দেরি হয়েছে।"

টাবলুর এত চমৎকার সমাধানেও জয় আর শংকরের মন থেকে ভয় দূর হল না। শংকর হঠাৎ বলে উঠল, "টাবলুদা, তুই তো ছোট মামাকে যাবার তারিখ জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছিস. ছোটমামা বাস স্টপে ওয়েট করবে—তার কী হবে!"

টাবলু গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "না, অপেক্ষা করবে না।"

কথাটার মানে বুঝতে না পেরে জয় আর শংকর ফ্যালফ্যাল করে টাবলুর মুখের দিকে তাকাল। জানলার সার্সির ফাঁক দিয়ে মাঝে মধ্যে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছিল, কিন্তু ওরা তিনজনে এতই উত্তেজিত যে, কারোরই তেমন শীত লাগছিল না। টাবলু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল. "ছোটমামাকে আমি টেলিগ্রামই পাঠাইনি।"

"সে কী! তবে যে বললি..."

"এটুকু মিথ্যে না বললে বাড়ি থেকে আমাদের ছাড়তই না।"

"তাহলে নেপালে যখন যাব?"

"যাবার আগে রুটুং থেকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেব ছোটমামার কাছে।"

জয় আর শংকরের মুখ দিয়ে আর একটাও কথা বেরুলো না। ওরা দুজনেই বুঝতে পারল, সব কিছুর পেছনে টাবলুর একটা মস্ত প্ল্যান আছে। ওই মলাট-ছেঁড়া বইটা একটানা তিনবার পড়ার রহস্যও ওরা যেন ধরতে পারল।

টাবলু বলল, "নে, শুয়ে পড়, অনেক রাত্তির হয়ে গেছে, ভোরবেলাতেই আমাদের আবার ট্রেন থেকে নামতে হবে। অ্যালার্ট থাকিস, ভোরে ঘুম না ভাঙলে কিন্তু কেলেঙ্কারি।"

কেউ আর একটাও কথা না বলে ব্যাগ থেকে বিছানাপত্তর বার করে, পেতে শুয়ে পড়ল। ট্রেনের দুলুনিতে তাড়াতাড়ি ঘুম এসে যাওয়ার কথা, কিন্তু জয় আর শংকরের কিছুতেই ঘুম এল না। রাজ্যের উদ্ভট চিন্তা দুজনের মাথার মধ্যে। ভয়, আনন্দ আর উত্তেজনায় শীতের মধ্যেও ওদের গা-হাত-পা জ্বালা-জ্বালা করছিল। ঘুম এল মাঝ রাত্তিরে তারপরে সে কী অঘোর ঘুম!

ভোরবেলায় টাবলুর ধাক্কাধাক্কিতেও ওদের ঘুম ভাঙতে চায় না কিছুতেই। ঘুমের ঘোরে জয় ভাবল, মা বোধহয় ওকে তুলে দিচ্ছে। বিড়বিড় করে বলল, "উঠছি, উঠছি, আর একটু পরে, পরীক্ষা তো হয়ে গেছে. এরকম করছ কেন?" বলতেই টাবলু হেসে উঠে টেনে এক চাঁটা কসাল ওর মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করে উঠে বসল জয়। তারপর দুজনে মিলে শংকরকে তুলে দিল। টাবলু ঘড়ি দেখে বলল. "হাতে আর আধঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় আছে, চটপট হাত মুখ ধুয়ে রেডি হয়ে নে।"

এই কামরাটায় দুটো বাথরুম আছে, ওরা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিল। ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুলেই জয় আর শংকরের ভীষণ খিদে পেয়ে যায়। সে কথা বলতেই টাবলু ব্যাগ থেকে পলিথিনে মোড়া খাবারগুলো বার করল। সবে ওরা খাবার মুখে দিয়েছে. এমন সময় মিস্টার কটমটের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙতেই মিস্টার কটমট একবার ওদের দিকে. আর একবার খাবারের দিকে তাকাল কটমট করে।

একটু পরেই ওই বুড়ো ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙল। ভদ্রলোকের হাতে পায়ে প্লাস্টার, খুব কষ্ট করে উঠে বসলেন উনি, তারপর ওপরের বেঞ্চিতে শোয়া ওই ভদ্রমহিলাকে ডেকে দিলেন। ডাকতেই ভদ্রমহিলা ছোট্ট লোহার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন নীচে।

সাড়ে-ছটা বেজে গেছে, অথচ বাইরেটা এখনও ফর্সা হয়নি। জানলার বাইরে শুধু কুয়াশা আর কুয়াশা। কুয়াশার দিকে তাকিয়ে খুব তৃপ্তির সঙ্গে খাবার খেতে লাগল ওরা তিনজন। রাত্রের খাবারগুলোর স্বাদ সকালে যেন আরও বেড়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সব খাবার শেষ হয়ে গেল।

খাওয়া হয়ে গেলে বিছানাপত্তর ভাঁজ করে.ওরা ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। ঘন কুয়াশা এখন অনেক পাতলা হয়ে গেছে। দূরের গাছপালা স্পষ্ট হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। ট্রেনের গতি একটু কমতেই টাবলু জানলার সার্সি তুলে মুখ বাড়াল বাইরের দিকে। একটু পরেই একটা ছোট্ট স্টেশনে এসে ট্রেন থামল। স্টেশনের নামটা পড়ে নিয়ে টাবলু লাফিয়ে উঠল. "ওঠ, ওঠ. এখানেই নামতে হবে।"

যে যার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে নেমে পড়ল ট্রেন থেকে। ওদের পেছন-পেছন নামল হাতে-পায়ে প্লাস্টার লাগানো ওই বুড়ো ভদ্রলোক, আর ভদ্রমহিলা। নামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনটা ছেড়ে দিল, এত ছোট স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ায় না বেশিক্ষণ। ওরা ক'জন ছাড়া, অন্যান্য কামরা থেকে দু-তিনজন মোট পাহাড়ী লোক নেমেছে। ট্রেনটা হুশ হুশ্ করে চলে যেতেই সারা প্লাটফর্ম খাঁ-খাঁ করে উঠল। ট্রেনের এই কটা যাত্রী ছাড়া আর কোথাও কাউকে চোখে পড়ল না ওদের. এমন কী গেটে টিকেট কালেক্টর পর্যন্ত নেই। টাবলু বলল, "তাড়াতাড়ি পা চালা। শুনেছি, এইসময় এখান থেকে একটা বাস ছাড়ে, ওটা মিস্ করলে খুব মুশকিলে পড়তে হবে।" বলেই টাবলু লম্বা-লম্বা পা ফেলতে লাগল। ওর চলার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে অল্প-অল্প ছুটতে হচ্ছিল জয় আর শংকরকে। গেট পেরিয়ে বাইরে আসতেই ওরা দেখে দূরে দাঁড়িয়ে একটা বাস হর্ন বাজাচ্ছে। "ওই বাসটাই হবে, ছোট্।"

ছুটতেই জয়ের মুখ-খোলা ব্যাগ থেকে একটা রংচংয়ে বাক্স লাফিয়ে মাটিতে পড়ে চতুর্দিকে একগাদা চকোলেট ছড়িয়ে দিল। চকোলেট ওদের তিনজনেরই খুব প্রিয়, এতগুলো চকোলেট ফেলে রেখে তো আর বাসে ওঠা যায় না। তিনজনেই উবু হয়ে বসে টপাটপ চকোলেট কুড়িয়ে বাক্সে ভরতে শুরু করে দিল। ওদের পাশ দিয়ে ওই বুড়ো ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা বাসের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বেশ কয়েকটা চকোলেট ওদের বোধহয় কষ্ট বাড়াবার জন্যে ক্রিকেট মাঠের বাউণ্ডারি লাইনের মতো অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সব কুড়িয়ে তুলতে ওদের সময় গেল কিছুক্ষণ। হঠাৎ বাসের দিকে তাকিয়ে টাবলু চমকে উঠে বলল, "আরে!" সঙ্গে সঙ্গে জয় আর শংকরও তাকাল ওদিকে, কিন্তু ওরা অবাক

হবার মতো কিছুই দেখতে পেল না। বাসটা যেমন ছিল তেমন আছে, বাসের কাছাকাছি পেঁৗছে গেছেন ওই বুড়ো ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা, আর কোথাও কিচ্ছু নেই। অথচ টাবলুর চোখেমুখে এখনও রীতিমত বিস্ময়। জয় আর শংকর উদগ্রীব হয়ে একই সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "কী? কী? কী রে?"

টাবলু ওদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, "দৌড়ো।"

ব্যাগের মুখে হাত চাপা দিয়ে ওরা এক দৌড়ে বাসের কাছে পেঁৗছে গেল। টাবলুই পেঁৗছল সবার আগে। কনডাকটরকে কী যেন জিজ্ঞেস করে টাবলু বলল, "ওঠ, ওঠ, এটা রুটুং যাবে।"

ওরাই শেষ যাত্রী, ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাস ছেড়ে দিল।

জানলার ধারে তিনজনে বসার মতো একটা সিট পেয়ে গেল ওরা। সিটে বসেই শংকর টাবলুকে জিজ্ঞেস করল, "কী রে? তুই অমন করলি কেন? কী দেখেছিস?" উত্তর শোনার জন্যে জয় মুখটাকে বাড়িয়ে দিল। টাবলু ঠোঁটের ওপর আঙুল চেপে আস্তে শব্দ করল—স্‌ স্‌ স্‌ স্‌ স্‌। তারপর ইঙ্গিতে সামনের সিটটা দেখিয়ে দিল। সামনের সিটে ওই বুড়ো ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা। টাবলু এমন কী বলবে যে, ওরা শুনে ফেললে অসুবিধে হবে? অনেক ভেবেও এই রহস্যের কিনারা করতে পারল না জয় আর শংকর। ওরা অনেক কষ্টে কৌতূহল চেপে বাসের ভেতরটা দেখে নিল।

বাসে ওরা তিনজন আর সামনের দুজন ছাড়া আর একটিও বাঙালী যাত্রী নেই। বাকি সবই পাহাড়ী লোক। বাস সোজা বেশ কিছুটা ছুটে এসে ঝাঁকুনি দিয়ে বাঁক নিল, একটু গিয়ে আবার বাঁক, আর একটু গিয়ে আবার বাঁক। টাবলু বলল, "বাস পাহাড়ে উঠছে।" শুনেই জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বাইরে তাকাল জয় আর শংকর। ওরা জীবনে এই প্রথম পাহাড়ে উঠছে, টাবলু অবশ্য এর আগে উঠেছে তিনবার।

বাঁক ঘুরে ঘুরে বাসটা যত ওপরে উঠছে, রাস্তার ধারের খাদটা গভীর হয়ে উঠছে তত। বাসটা মাঝেমধ্যে রাস্তার এত ধার দিয়ে যাচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল এই বুঝি উল্টে গেল। এ-সব ভেবে গা শিরশির করে উঠছিল জয় আর শংকরের। জয় ব্যাগ খুলে চকোলেটের বাক্সটা বার করল, তারপর তিনজনে তিনটে চকোলেট মুখে ফেলে আবার বাইরের দিকে তাকাল। চড়া রোদ্দুর উঠে গেছে, অথচ হাওয়ায় বেশ শীত ভাব। টাবলু বলল, "এ আর কী এমন শীত, পাহাড়ের যত ওপরে উঠবি, শীত তত বাড়বে।"

জয় গম্ভীরভাবে বলল, "তা কিন্তু হওয়া উচিত নয়। পাহাড়ের ওপরে ওঠা মানে সূর্যের কাছাকাছি পেঁৗছে যাওয়া, আর সূর্যের কাছাকাছি গেলে তো শীতের বদলে বেশি গরম লাগার কথা।" শুনে টাবলু আর শংকর হো-হো করে হেসে উঠল।

অসভ্যের মতো হাসতে দেখে জয় একটু চটে গিয়ে বলল, "বোকার মতো হাসিস না, যুক্তি দিয়ে বোঝা তো।" তেমন যুক্তি দেখাতে না পেরে শংকর আর টাবলু আরও জোরে হেসে উঠল।

আর ঠিক তক্ষুনি ক্যাচ করে ব্রেক কষে থেমে গেল বাসটা। ড্রাইভারের পাশের কাচের জানলা দিয়ে ওরা দেখল, একটা সাদা-কালো রং করা মস্ত খুঁটি আড়াআড়ি করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে রাস্তার ওপর। খুঁটির পাশে খাকি রংয়ের জামা আর হাফ প্যান্ট পরা তিন-চারটে লোক।

বাসটা বেশ জোরেই ব্রেক কষেছে, আর তাতেই বোধহয় সামনের ওই বুড়ো ভদ্রলোকের ভাঙা হাতে-পায়ে চোট লেগে গিয়েছে। ভদ্রলোক যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগলেন। ভদ্রলোককে ছটফট করতে দেখে জয়ের খুব কষ্ট হল। বাজে ড্রাইভার, এত জোরে কেউ ব্রেক কষে! কিন্তু, এ জন্যে বাসের অন্যান্য যাত্রীদের কেউ কিচ্ছু বলল না ড্রাইভারকে। কেউ কিছু বললে জয়ও ড্রাইভারকে দু-কথা শুনিয়ে দিত, কিন্তু সবাই চুপ করে আছে দেখে একা-একা মুখ খুলতে সাহস হল না ওর। ওই ভদ্রমহিলা হাত-ব্যাগ খুলে ওষুধ খাইয়ে দিলেন বুড়ো ভদ্রলোককে। ওষুধ খেয়েও ভদ্রলোকের যন্ত্রণা কমল না, সমানে ছটফট করতে লাগলেন উনি।

একটু পরেই ওই খাকি জামাপ্যান্ট পরা লোকগুলো উঠে এল বাসের মধ্যে। এসেই কাউকে কিচ্ছু না বলে এর-তার ব্যাগ, সুটকেস খুলে কী যেন খুঁজতে শুরু করে দিল। সিটগুলোর নীচেও উঁকি মেরে দেখল। তবে জয়, শংকর আর টাবলুর ব্যাগে কেউ হাত দিল না। একজন শুধু সামনে এসে ওদের মুখের দিকে তাকিয়েই চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ওই লোকগুলো নেমে গেল বাস থেকে। নামবার একটু পরেই রাস্তার ওই লম্বা সাদা-কালো খুঁটিটা সরিয়ে নেওয়া হল। দুবার হর্ন বাজিয়ে ওদের বাসটা ছুটতে লাগল আবার। শংকর জিজ্ঞেস করল, "টাবলুদা ওই খাকি জামা-পরা লোকগুলো কারা?"

"কাস্টমসের লোক, এ-রাস্তা দিয়ে নিশ্চয়ই চোরাই চালান-টালান হয়," উত্তর দিল টাবলু।

জয় বড়-বড় চোখ করে বলল, "চোরাই চালান, তার মানে স্মাগলিং, কী স্মাগল হয় রে?"

টাবলু ওর কথার কোনো উত্তর দিল না। টাবলুর দাঁতে দাঁত, চোয়ালটা একটু ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, আর কপালে অনেকগুলো ভাঁজ। খুব জটিল কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করলে টাবলুর মুখটা এইরকম হয়ে যায়। জয় আর শংকর দুজনেই খুব ভালভাবে জানে যে, টাবলু এখন আর একটা কথাও বলবে না।

সোজা রাস্তা এখন আর ধরতে গেলে একদম নেই। বাসটা খালি ঘুরছে, ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠছে। এত ঘুরলে মাথা ঝিমঝিম করে, ঘুম পায়। জয় আর শংকর বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে কে জানে, হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে ওদের ঘুম ভেঙে গেল। বাসটা দাঁড়িয়ে আছে। টাবলু বলল, "নাম।"

"এসে গেছে রুটুং?"

"উঁহু, খাবি না?"

অধিকাংশ যাত্রীই নেমে গেছে বাস থেকে। ওরাও নেমে পড়ল। এখানে রাস্তাটা একটু চওড়া, বাসটা দাঁড়িয়ে আছে পাহাড় ঘেঁষে। ওদিকে একটা ছোট্ট টিনের চালাঘর, তার সামনে বাসের যাত্রীদের ভিড়। এই চালাঘরটাই বোধ হয় এই এলাকার একমাত্র হোটেল, একমাত্র রেস্টুরেন্ট, একমাত্র সবজির দোকান আর একমাত্র মুদিখানা। আর কোথাও কোনো দোকান নেই। একটা থুত্থুড়ে বুড়ো লোক, আর পিঠে বাচ্চা-বাঁধা মাঝবয়েসী একটা বউ খদ্দের সামলাচ্ছে।

টাবলু দোকানে ঢুকে ছটা সেদ্ধ ডিম কিনে নিয়ে এসে বলল, "আমাদের খাবার মতো এখানে আর কিচ্ছু নেই।" ডিমগুলো শংকরের হাতে ধরিয়ে টাবলু এক ছুট্টে বাসে উঠে গেল, একটু পরেই ফিরে এল এক হাতে একটা পাউরুটি আর এক হাতে জ্যামের শিশি নিয়ে।

দোকানে চেয়ার-টেবিল বা বেঞ্চির পাট নেই, ওরা একটু দূরে গিয়ে একটা সাদা পাথরের টুকরোর ওপর বসল। চারদিকটা উঁচু-উঁচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা, কী দারুণ লাগছিল দেখতে। চারদিক দেখতে দেখতে ওরা ডিম সেদ্ধ, পাউরুটি আর জ্যাম খেল। ওদের ধারে কাছে আর কেউ নেই। টাবলু হঠাৎ গম্ভীর মুখে বলল, "ওই বুড়োটা ডেনজারাস।"

"কোন বুড়োটা?"

"ওই যে হাত-পা প্লাস্টার-করা বুড়োটা।"

"কেন? কেন?"

"বাসে ওঠার মুখে যখন আমাদের চকোলেট পড়ে গেল, তখন দেখলাম...।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, কী দেখেছিলি রে?"

"বাসে ওঠার রাস্তায় একটা ভাঙাচোরা বাড়ি আছে না?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ।"

"ওর পাশ দিয়ে যাবার সময় লোকটা প্লাস্টার-করা পা নিয়ে বেশ কিছুটা জোরে দৌড়ে গেল।"

"সে কী!"

"হ্যাঁরে, নিজের চোখে দেখা। অথচ পাঁচজনের সামনে লোকটা ভদ্রমহিলার কাঁধে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে।"

শুনে শংকরের চোখ বড়-বড় আর মুখ সামান্য হাঁ হয়ে গেল। ওরা একটা কথাও বলতে পারল না। একটু চুপ করে থেকে টাবলু বলল, "কাস্টমসের লোকগুলো যখন বাসে চেকিং করতে এল, তখন আমি বুঝতে পারলাম, লোকটা আসলে কী?"

"কী কী?"

"কী বুঝতে পারলি না?"

"না তো।"

"আচ্ছা চেকিংয়ের সময় ছাড়া সারা রাস্তায় লোকটাকে একবারও উঃ, আঃ করতে দেখেছিস?"

"না, না তো।"

"ওর যত কষ্ট শুধু চেকিংয়ের সময়ই বেড়ে উঠল, আবার বাস ছাড়তেই সব কষ্ট সেরে গেল।"

সমস্ত ঘটনাগুলো পরপর সাজিয়ে দেখতেই জয় আর শংকরের গা ছমছম করে উঠল। টাবলু মুখ কঠিন করে বলল, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লোকটা স্মাগলার।"

"স্মাগলার!"

ড্রাইভার হঠাৎ হর্ন বাজাতে শুরু করে দিল, বাস বোধ হয় ছাড়বে এবার, অনেকেই এর মধ্যে উঠে পড়েছে বাসে। ওরাও ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল। সব যাত্রী তুলে নিয়ে বাসটা ছুটতে শুরু করল আবার।

সিটে বসেই উশখুশ করতে লাগল জয় আর শংকর। ওদের সামনের সিটেই বসে আছে স্মাগলারটা, পেছন থেকে মুখ দেখার উপায় নেই, অথচ ওদের দুজনেরই এই মুহূর্তে বুড়োটার মুখ দেখার ইচ্ছে করছিল ভীষণ। ওদের এপাশ-ওপাশ করতে দেখে টাবলু চাপা গলায় ধমক দিয়ে বসল, "ওরকম করিস না, সন্দেহ করবে।"

বাস আর-একটু ওপরে উঠতেই রোদ্দুর আর মেঘের খেলা শুরু হয়ে গেল হঠাৎ। এই রোদ্দুর, এই মেঘ—এই মেঘ এই রোদ্দুর। আগের তুলনায় শীত বেড়ে গেছে বেশ। ঠাণ্ডা হাওয়া পুরোহাতা সোয়েটার, গরম জামা গেঞ্জি ভেদ করে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছিল সারা গায়ে। আর একটা অদ্ভুত জিনিস শুরু হয়ে গেল এই মাত্তর, ওদের কানে মাঝে-মধ্যে কেমন যেন তালা লেগে যাচ্ছিল। টাবলু বলল, "বেশি শীতে এরকম হয়।"

বিকেল নাগাদ ঝমঝম করে একটা পাহাড়ী নদীর সেতু পেরিয়ে বাস এসে দাঁড়াল একটা ছোট্ট লোকালয়ে। কণ্ডাকটর চেঁচিয়ে বলল, "রুটুং, রুটুং।"

এই সেই রুটুং, ব্ল্যাক আর্ট অব টিবেট শেখার জায়গা। ওরা জানলা দিয়ে এমনভাবে বাইরে তাকাল, যেন এক্ষুনি আশ্চর্যজনক কিছু ওদের চোখে পড়বে। কিন্তু তেমন কিছুই চোখে পড়ল না, সব কিছুই অত্যন্ত সাধারণ।

ওরা কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে নেমে পড়ল বাস থেকে, আর তার-পরেই চমকে গিয়ে দেখল ওই বুড়ো, স্মাগলারটা আর ভদ্রমহিলাও নেমে এসেছে বাস থেকে। ওদের নামিয়ে দিয়ে বাস ছেড়ে দিল আবার।

ভদ্রমহিলার কাঁধে হাত দিয়ে বুড়োটা হেঁটে যাচ্ছে ওই দিকে। জয় আর শংকর অবাক হয়ে দেখল, বুড়োটা দিব্যি হাঁটছে। একটু খোঁড়াচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এত জোরে লোকটাকে হাঁটতে দেখেনি আগে। বাস রাস্তাটা পেরিয়ে গিয়ে লোকটা ঢালু রাস্তা ধরল। রাস্তটা বেশ ঢালু, একটু পরেই ওদের আর দেখা গেল না। টাবলু বলল, "চল্ তো দেখি কোথায় যাচ্ছে।"

শংকর ছুটতে যাচ্ছিল, টাবলু বারণ করল, "ছুটিস না, বুঝে ফেলবে।"

রাস্তার ধারে গিয়ে ওরা কাউকে দেখতে পেল না। পাহাড়ী রাস্তা সোজা কিছুটা নেমে গিয়ে বাঁদিকে বেঁকে গেছে। ওরা বাঁকের মুখ পর্যন্ত নেমে গিয়েও কাউকে দেখতে পেল না। জোরে জোর পা ফেলে আরও কিছুটা এগিয়ে গেল। অবাক কাণ্ড! কেউ কোথাও নেই। আর কিছুটা যাবার পরে দেখে পথটা দুভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে। জয় আর শংকর বাঁদিকের পথটা ধরে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিল, টাবলু নিষেধ করল, "এভাবে যাওয়াটা ঠিক হবে না, ধরা পড়ে যেতে পারি। জায়গাটা খুব ছোট্ট, কাল ঠিক খুঁজে বার করব, বুড়োটাকে। এখন চল হোটেলের খোঁজ করি, অন্ধকার হয়ে গেলে মুশকিলে পড়তে হবে, অচেনা জায়গা।"

পথটা বেশ ঢালু, ওরা এর মধ্যে যে এতটা নেমে এসেছে বুঝতে পারেনি। খাড়াই পথ বেয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে এত শীতের মধ্যেও ওদের ঘাম ছুটে গেল প্রায়।

বাস-রাস্তাটা ধরতে গেলে একদম ফাঁকা দু-চারটে লোক এদিক-ওদিক দাঁড়িয়ে আছে। সবাই পাহাড়ী লোক। একজনের কাছে গিয়ে শংকর জিজ্ঞেস করল, "এখানে থাকার হোটেল কোথায় আছে বলতে পারেন?"

শুনে লোকটা এমনভাবে তাকাল যে, পরিষ্কার বোঝা গেল ও শংকরের কথার একটা বর্ণও বুঝতে পারেনি।

টাবলু তখন বলল, "ইঁহা রহনে কা কোঈ হোটেল-উটেল হ্যায়

লোকটা হিন্দীও বুঝতে পারল না।

জয় টক করে বলল, "এনি হোটেল হিয়ার?"

লোকটা এবার হেসে উঠে দুর্বোধ ভাষায় কী যেন বলতে শুরু করে দিল।

দেখতে দেখতে ওদের চারদিক ঘিরে পাহাড়ী লোকদের একটা ছোটখাট ভিড় হয়ে গেল। টাবলু, জয় আর শংকর পালা করে তিন ভাষাতেই ওদের প্রশ্নগুলো করে যেতে লাগল। প্রশ্নগুলো শুনে দুর্বোধ ভাষায় তর্ক বেধে গেল ওদের মধ্যে। এমন সময় মোটামুটি ভাল জামাকাপড় পরা একটা পাহাড়ী লোক এসে বলল, "ওটেল? আও মেরে সাথ।"

লোকটা ওদের অনেকটা হাঁটিয়ে নিয়ে একটা দোতলা কাঠের বাড়িতে ঢোকাল। ঢুকতেই টুকটুকে লাল গাল একগাদা বাচ্চা কাচ্চা আর খুব লোমওলা তিনটে বেঁটে কুকুর ওদের ঘিরে দাঁড়াল। একটু পরেই মাঝবয়েসী দুটো মেয়ে আর একটা লোক এল। এদেরই বাড়ি, এই বাড়িতেই এরা নিজেদের সংসার আর হোটেল চালায়। এরা কাজ চালাবার মতো হিন্দী জানে, বাংলাও জানে অল্প-অল্প।

থাকা-খাওয়ার জন্যে মাথাপিছু পাঁচ টাকা, অর্থাৎ দিনে পনেরো টাকা লাগবে তিনজনের। দোতলার কোণের ঘরটা পেয়ে গেল ওরা। দুটো খাট জোড়া দেওয়া, বিছানা, বালিশ আর ভারী কম্বল আছে। টাবলু বলল, "এত শস্তায় এত ভাল বন্দোবস্ত, ভাবা যায় না। আসলে এখানে টুরিস্ট বিশেষ আসে না, বুঝলি।"

সন্ধে হতেই জাঁকিয়ে শীত পড়ল। ঘরের জানলা বন্ধ করে কম্বল মুড়ি দিয়ে হ্যারিকেনের আলোয় ওরা গল্প করল কিছুক্ষণ। তারপর নীচে গিয়ে গরম-গরম ভাত, আলু-পেঁয়াজের তরকারি আর ডাল খেয়ে এল খুব তৃপ্তি করে। খেয়েদেয়ে প্রচণ্ড ঘুম পেয়ে গেল জয় আর শংকরের, ওরা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। টাবলু কিন্তু তক্ষুনি শুল না, নোট বই বার করে হ্যারিকেনের সামনে বসে খুব ভেবে-ভেবে কী-সব যেন নোট করতে শুরু করে দিল। গতবার মধুপুরে ডাকাত ধরার আগেও টাবলু ঠিক এইভাবে শোবার আগে সাংকেতিক ভাষায় নোট বইতে অনেক কিছু লিখত।

৩

সবার আগে ঘুম ভাঙল শংকরের। কাচের জানলা দিয়ে ঝলমলে রোদ এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে, ও শুয়ে শুয়েই দূরের একটা নীল পাহাড়ের মাথা দেখতে পেল। ধপধপে সাদা মেঘের টুকরো পাহাড়ের মাথা ছুঁয়ে ভাসছে। এমন দৃশ্য ও কোনো-দিন দেখেনি। লাফিয়ে উঠে দুই টানে জয় আর টাবলুর কম্বল সরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "দেখ দেখ।" ওর চিৎকারে তড়াক করে উঠে বসল দুজন। উঠে বসেই জয় রেগে গেল, তারপর বিড়বিড় করে শংকরকে কী-সব বলে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল আবার। টাবলু আর শুল না, একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে কাচের জানলাটা খুলে দিল। খুলতেই হু-হু করে ঠান্ডা হাওয়া ছুটে এল ঘরের মধ্যে। টাবলু জানলা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে চারদিক দেখে নিয়ে বলল, "বাঃ ব্রাইট ওয়েদার, চ আমরা চটপট বেরিয়ে পড়ি, জয়কে তোল।"

কিন্তু, এখন জয়কে তুলতে গেলেই ও নির্ঘাত হাত-পা ছুঁড়বে, ভীষণ ঘুমকাতুরে জয়। শংকর এবার একটু ভেবেচিন্তে এগোল। প্রথমেই ও নিজের আর টাবলুর কম্বল দুটো লুকিয়ে ফেলল আলমারিটার মধ্যে, তারপর ঘরের দরজা খুলে রেখে টান মেরে জয়ের কম্বলটা তুলে নিয়ে এক দৌড়ে নীচে পালিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ওর কানে এল জয়ের প্রচণ্ড চিৎকার আর টাবলুর গলাফাটানো হাসি। চিৎকার থামার বেশ কিছুক্ষণ পরে ও আস্তে-আস্তে উঠে এল ওপরে।

আধ ঘন্টার মধ্যে ওরা হাতমুখ ধুয়ে, জেলি মাখিয়ে পাউরুটি খেয়ে, বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। চারদিক কী সুন্দর দেখতে, তাকিয়ে-তাকিয়ে ওদের আর আশ মিটছিল না। জায়গাটা যে এত চমৎকার, কাল সন্ধেবেলায় ওদের একবারও মনে হয়নি। টাবলু সঙ্গে ক্যামেরা নিয়ে এসেছে, ক্লিক ক্লিক করে একটা পাহাড়ের আর একটা ঢালু রাস্তার ছবি তুলে নিল। জয় বলল, "টাবলুদা, আমাদের ছবি তুলবি না?"

"তুলব।"

"তোলার সময় তোর ঘড়িটা আমি পরব।"

টাবলু উত্তর দেবার আগেই শংকর হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "য়োঃ, যা না সরু-সরু হাত, তুই কি ঘড়ি পরবি, পরব আমি।" শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে কেউ ঠাট্টা করলে জয়ের খুব রাগ হয়ে যায়, তার ওপর আজ সকালেই আবার শংকরটা ওর কম্বল কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। শোধ তোলার জন্যে জয় তাড়া করল শংকরকে। শংকর ছুটতে লাগল, শংকরের পেছনে জয়, ওর পেছনে টাবলু। ছুটতে-ছুটতে ওরা তিন রাস্তার মাথায় এসে পৌঁছল। মোড়ে একটা পুলিশ দাঁড়িয়ে, পুলিশের সামনে দৌড়তে নেই, ওরা তাই দৌড় থামিয়ে এদিক-ওদিক দেখতে-দেখতে টুরিস্টদের মতো হাঁটতে লাগল।

এটাই বোধ হয় রুটুংয়ের সবচাইতে ব্যস্ত জায়গা। পরপর পাঁচ-সাতটা দোকান, দুটো ছোট অফিসবাড়ি আর একটা ছোট পোস্টাফিস। পোস্টাফিস দেখে টাবলু বলল, "আমরা এখান থেকেই ছোটমামাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেব।"

আরও কিছুটা এগোবার পরে ডানদিকে একটা সরু রাস্তা চোখে পড়ল। রাস্তার দুদিকে বসে অনেকগুলো মেয়ে সবজি আর ডিম বিক্রি করছে, কেনাকাটাও করছে মেয়েরা। টাবলু বলল, "এখানে মেয়েরাই সব, ছেলেরা খুব কম কাজ করে।"

শংকর টিপ্পুনি কাটল, "জয়, তুই তাহলে এখানে থেকে যা, খালি খাবি আর ঘুমোবি।"

জয় কী যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই টাবলু চাপা গলায় বলে উঠল, "চুপ! চুপ! লোকটাকে দেখ।"

লোকটা ওদের সামান্য আগে-আগে হাঁটছিল। একেবারে বুড়ো লোক, হাঁটু থেকে মাথা পর্যন্ত রঙীন আলখাল্লা জড়ানো। গলায় লাল-নীল পাথর, শেকড় আর কড়ির মালা। লোকটা হাঁটতে হাঁটতে কয়েকবার পেছন ফিরে তাকাল, তবে ওদের দিকে নয়, আরও পেছনে। লোকটা পাহাড়ী, মুখে খোচা-খোচা সাদা দাড়ি, গায়ের রং হলুদ।

টাবলু প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে চাপা গলায় বলল, "লোকটাকে আমার তিব্বতী বলে মনে হচ্ছে, এ নিশ্চয়ই ব্ল্যাক আর্ট জানে।"

শুনে জয় আর শংকরের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। টাবলু আরও নিচু গলায় বলল, "লোকটাকে ফলো করতে হবে।"

বুড়ো লোকটা খুব আস্তে-আস্তে হাঁটছিল, এত আস্তে যে টাবলুরা যতই আস্তে হাঁটুক না কেন ঠিক ওকে পেরিয়ে যাবে। টাবলু হঠাৎ বসে পড়ে ফস করে টান মেরে জুতোর ফিতে খুলে ফেলে সময় নিয়ে বাঁধতে লাগল। কেউ দেখলে ভাববে, জুতোর ফিতে খুলে গেছে তাই বাঁধছে। টাবলুর বুদ্ধির তারিফ করল জয় আর শংকর ফিস-ফিস করে।

আবার কিছুটা হেঁটে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার ভঙ্গি করে সময় কাটাল কিছুক্ষণ টাবলু। বুড়ো লোকটা আস্তে আস্তে হাঁটছে, হাঁটছে তো হাঁটছেই, থামার আর নাম নেই।

এই লোকটা সেই সব জাদু জানে, যা জানলে আস্ত একটা পাহাড় উড়িয়ে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়, ইচ্ছেমতো ঝড়বৃষ্টি নামানো যায় আকাশ থেকে, সমুদ্র দু ভাগ করে হেঁটে যাওয়া যায় ভেতর দিয়ে। টাবলুর এই কথাগুলো জয় আর শংকরের মাথার মধ্যে ঘুরছিল সমানে। সেই জাদুকরকে পাওয়া গেছে, এখন যদি উনি দয়া করে দু-একটা জাদু ওদের শিখিয়ে দেন! এই সব ভাবতে ভাবতে জয় আর শংকরের গলার ভেতরটা শুকিয়ে উঠছিল।

কিন্তু যদি অন্যরকম হয়! জয়ের হঠাৎ আরব্য উপন্যাসের কথা মনে পড়ে গেল। জাদুকর যদি চটে গিয়ে ওদের কালো কুকুর কিংবা ভেড়া বানিয়ে দেন! ফিসফিস করে সে-কথা বলতেই টাবলু অসন্তুষ্ট হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে।

হাঁটতে-হাঁটতে দোকানপাট, বাজার অনেক পেছনে পড়ে গেল। আশেপাশে লোকজন, বাড়িঘর কিচ্ছু নেই। মোড় ঘুরতেই একটা কুঁড়েঘর চোখে পড়ল, জাদুকর সেদিকেই এগিয়ে চলেছেন, ওটাই বোধ হয় ওঁর সাধনার জায়গা।

কুঁড়েঘরে ঢোকার মুখে টাবলু ছুটে গিয়ে ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। পায়ে হাত দিতেই জাদুকর অবাক হয়ে টাবলুর দিকে তাকালেন। সেই ফাঁকে জয় আর শংকরও প্রণাম সেরে নিল।

টাবলু বলল, "আমরা অনেক দূর থেকে আপনার কাছে এসেছি। দয়া করে আমাদের আপনার শিষ্য করে নিন। আমরা জাদু শিখতে চাই।"

কথা শুনেও জাদুকরের অবাক ভাব কাটল না। কয়েক

মুহূর্তে চুপ করে থেকে উনি দুর্বোধ ভাষায় কী সব বলতে শুরু করলেন। টাবলু তখন আগের ওই কথাগুলোই হিন্দী আর ইংরেজীতে অনুবাদ করে শোনাল, কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হয়েছে বলে মনে হল না।

তিনটে ভাষার একটাতেও জাদুকর উত্তর দিলেন না, তিনি হাত নেড়ে, গলার স্বর ওপরে তুলে ওই ভাষাতেই একটানা অনেক কিছু বলে যেতে লাগলেন। জাদুকরের একটা চোখের মণি সাদা, মুখে অসংখ্য রেখা, গায়ের হলুদ চামড়া সামান্য ঝুলে পড়েছে। জয়ের মনে হল, জাদুকর ওদের কথা বুঝতে পেরেছেন। এখন যা বলছেন তা কোনো ভাষা নয়, নিশ্চয়ই মন্ত্র। ওই মন্ত্রে এক্ষুনি একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে যাবে। অবিশ্বাস্য কিছু দেখার জন্যে জয় এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

জাদুকর হঠাৎ মন্ত্র পড়া থামিয়ে টাবলুর হাত ধরে ঘরে ঢোকার ইঙ্গিত করলেন। জাদুকরের পেছন-পেছন ওরা তিনজনেই ঢুকে পড়ল ঘরটায়। ঘরের দরজাটা জানলার মাপে, মাথা নিচু করে ঢুকতে হল। ঘরের ভেতরটা কী অন্ধকার, কী অন্ধকার! অন্ধকারে চোখ সয়ে যেতেই ওদের প্রথমে চোখে পড়ল একটা মোষের মাথার মতো কঙ্কাল। দেখেই ওদের মেরুদণ্ড দিয়ে ঠাণ্ডা জলের মতো কী যেন নেমে গেল। নিজেদের বুকের ঢিবঢিব শব্দ নিজেরাই শুনতে পাচ্ছিল পরিষ্কার।

ঘরের কোণে একটা ছোট্ট চারপাই, তার ওপর কম্বল-বিছানা ডাঁই করা। বিছানার পাশেই একটা শুকনো গাছের ডাল আর কাঠকুটো। ওদিকে একটা ছোট জলের বালতি, তিন-চারটে টিনের কৌটো আর একটা কাঠের থালা।

ঘরে ঢুকে জাদুকরকে বেশ খুশি-খুশি লাগছিল। উনি দেয়ালে টাঙানো একটা মস্ত ঝোলা নীচে নামালেন। লাল-নীল-সবুজ নানা রঙের কাপড়ের তাপ্পি লাগানো ঝোলা। ঝোলা দেখেই ওদের তিনজনের চোখ চকচক করে উঠল। ওরা তিনজনেই জানে, প্রত্যেক জাদুকরের কাছেই এইরকম একটা ঝোলা থাকে, ঝোলায় থাকে আশ্চর্য-আশ্চর্য সব জিনিস।

জাদুকর ঝোলা থেকে প্রথমেই যে জিনিসটি বার করলেন সেটা দেখে ওদের বুক কেঁপে উঠল। একটা বিশাল চকচকে ভোজালি। ভোজালিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে উনি একটা টিনের কৌটো বার করলেন। টিন থেকে কী যেন বার করে এগিয়ে দিলেন ওদের দিকে। আলুর মতো জিনিসগুলো আসলে কী, ওরা খুঁটিয়ে দেখেও চিনতে পারল না।

জাদুকর তখন ওর থেকে একদা টুপ করে নিজের মুখে ফেলে দিয়ে ইঙ্গিতে ওদের খেতে বললেন। ওগুলো তাহলে খাবার জিনিস। ওরা তিনজনে তিনটে তুলে নিল। টাবলু আর শংকর একটু ইতস্তত করে ওগুলো খেয়ে ফেলল, জয় কিন্তু খেতে গিয়েও পারল না, কী বিশ্রী গন্ধ! তা ছাড়া অন্য একটা সন্দেহ ঝট করে ওর মনের মধ্যে ঢুকে গেল। এগুলো খাবার পরেই ওরা যদি কালো কুকুর কিংবা ভেড়া হয়ে যায়! জয় খাবার ভান করে ওটা লুকিয়ে ফেলল পকেটের মধ্যে।

ওদের ওগুলো খেতে দেখে জাদুকর কেমন যেন ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে উঠলেন, তারপর প্রায় ছুটে গেলেন ঘরের কোনায়। কাঠের থালায় পান্তা ভাত, ডাল আর আস্ত পেঁয়াজ নিয়ে এসে ওদের খাওয়ার জন্যে ইঙ্গিত করলেন। টাবলু বলল, "আপনি খান, আমাদের পেট ভর্তি। আপনি খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিন, আমরা বিকেল নাগাদ আবার আপনার কাছে আসব।" বলে ও গড় হয়ে প্রণাম করল জাদুকরকে, তারপর পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার করে ওর পায়ের কাছে রাখল।

দেখাদেখি জয় আর শংকরও প্রণাম করল। টাবলু ফিসফিস করে বলে দিল, "গুরুদক্ষিণা দিস।"

প্রণাম আর দক্ষিণায় জাদুকর খুব খুশি। হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে ওই দুর্বোধ ভাষায় অনেক কিছু বললেন ওদের। ওরা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। লম্বা-লম্বা পা ফেলে বেশ কিছুটা এগিয়ে আসার পরে টাবলু চকচকে চোখমুখ করে বলল, "ওই বইটায় জাদুকরের চেহারার যে বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে এর চেহারা হুবহু মিলে গেছে। এত তাড়াতাড়ি যে একে পেয়ে যাব ভাবতে পারিনি।"

শংকর উত্তেজিত হয়ে সায় দিল, "আমিও না। কিন্তু টাবলুদা, উনি আমাদের কথা বোঝেন না, আমরাও ওর ভাষা বুঝি না, জাদু শিখব কী ভাবে?"

"কেন, আমরা তো এখানে আরও দু-তিনদিন আছি, এর মধ্যে যদি তিব্বতী ভাষাটা শিখে নিই?"

জয়ের এই সমাধানে শংকর চটে উঠে বলল, "কী বললি? দু-তিনদিনের মধ্যে একটা নতুন ভাষা শিখে নিবি? কী আমার পণ্ডিত রে! জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তো ইংরিজি শিখছিস, এখনও তো ইংরিজির নামে তোর গায়ে জ্বর আসে। বল তো অ্যাডহিয়ারের পরে কী প্রিপজিশন বসবে।"

ঝগড়াটা দানা বাঁধার মুখে টাবলু ওদের থামিয়ে দিয়ে শান্ত গলায় বলল, "অত বড় গুণীর কাছে ভাষাটা কোনো সমস্যাই নয়। উনি সব জানেন, তবে মনে হয় এখন কিছু না বোঝার ভান করে আমাদের পরীক্ষা করছেন।"

মাথার ওপর ঝলমলে সূর্য ছিল, হঠাৎ কোত্থেকে ভেসে এল রাশি-রাশি কালো মেঘ। দেখতে দেখতে চারদিক কালো হয়ে গেল। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া যেন পাহাড়ের ওদিকে লুকিয়ে ছিল, সূর্য ঢেকে যেতেই ছুটে এল শাঁ-শাঁ করে। ওরা বেশ জোরে জোরে হাঁটছে, কিন্তু গা গরম হচ্ছে না একটুও। টাবলু বলল, "ছোট, মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসবে, আশেপাশে মাথা বাঁচাবার কোনো জায়গা নেই।"

ছুটে ছুটে বাজারের কাছে আসতে-না আসতেই ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি নেমে গেল। ওরা দৌড়ে গিয়ে একটা দোকানের ছাউনির নীচে দাঁড়াল। বৃষ্টি, সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া। এত গরম জামাকাপড় পরে থাকা সত্ত্বেও ওদের গা-হাত-পা কেঁপে যাচ্ছিল ঠকঠক করে।

জয় পকেটে হাত ঢোকাতেই কী একটা ঠেকল ওর হাতে, বার করে দেখে জাদুকরের দেওয়া সেই খাবারটা। সঙ্গে সঙ্গে ও খুঁটিয়ে দেখে নিল টাবলু আর শংকরকে, কই ওদের গায়ে তো কালো কুকুর কিংবা ভেড়ার কোনো চিহ্ন ফুটে ওঠেনি, যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে। তাহলে জাদুকর লোক ভাল। ভাল লোককে অবিশ্বাস করতে নেই, তাছাড়া এই খাবারটা না খাওয়ার কথা যদি জাদুকর মন্ত্রের জোরে জেনে ফেলেন! জেনে যদি ওর ওপর চটে যান! এইসব ভেবে জয় আঙুলের চাপে খাবারটা দু টুকরো করে গিলে ফেলল।

একটু পরেই বৃষ্টি ধরে গেল, কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়া আগের মতোই আছে, আকাশ কালো মেঘে ভর্তি। ওরা নেমে পড়ল রাস্তায়, তারপরে জোর কদমে হাঁটতে লাগল হোটেলের দিকে। রাস্তার মোড় ঘুরতেই শংকর দেখল উল্টো দিক থেকে একটা লোক হেঁটে আসছে। লোকটার সঙ্গে বাসের সেই হাত-পা-প্লাস্টার-করা বুড়োটার চেহারার দারুণ মিল। তবে, এ-লোকটার বয়েস চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ, আর সেই বুড়োটার বয়েস হবে সত্তরের কাছাকাছি।

শংকর বলল, "দেখ্ দেখ্, এই লোকটাকে, বাসের ঐ বুড়োটার মতো দেখতে না?" টাবলু আর জয় লোকটাকে একবার দেখে নিল, কোনো কথা বলল না। ওদের দজনের মাথাতেই শুধু জাদুর কথা ঘুরছে। লোকটা শিস দিতে দিতে ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল।

পাহাড়ী রাস্তায় ওঠাটা কষ্টের, কিন্তু নামাটা বেশ মজার, আর একটু উঠলেই ঢালু রাস্তা পাওয়া যাবে। ঢালু রাস্তা পেতেই ওরা এক নিমেষে অনেকটা চলে গেল। হঠাৎ টাবলু ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "দৌড়ো।" বলেই যে পথ ধরে আসছিল সেই পথেই ছুটতে লাগল বাঁই বাঁই করে।

কেন, কী জন্যে—জয় আর শংকর কিছু বুঝতে পারল না, কিন্তু ওরাও ছুটতে লাগল টাবলুর পিছু-পিছু। টাবলু বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। ছুটতে-ছুটতে জয় বলল, "টাবলুদা বোধ হয় ক্যামেরাটা ফেলে এসেছে।"

ছুটতেই ছুটতেই শংকর উত্তর দিল, "হতে পারে।

দৌড়তে দৌড়তে ওরা আবার বাজারের কাছে চলে এল। টাবলু এদিক-ওদিক তাকিয়ে হতাশ গলায় বলল, "পেলাম না। ইশ্ আমি কী বোকা!" জয় আর শংকর কথাটার মানে বুঝতে পারল না। ক্যামেরা তো টাবলুদার কাঁধেই ঝুলছে, তাহলে আবার ও কী হারাল! টাবলু মাথার চুল খামচে ধরে বলল, "এত সামান্য ব্যাপার, অথচ একবারও আমার মাথায় খেলল না।"

"কী হয়েছে বলবি তো?"

"ওই যে ওই লোকটা...।"

"কোন্ লোকটা?"

"ওই যে লোকটা, বললি না বাসের বুড়োটার মতো দেখতে।"

"হ্যাঁ, কী হয়েছে তাতে?"

"আরে, ওই লোকটাই তো সেই বুড়োটা।"

"বুড়োটা!"

"বুড়োর ছদ্মবেশ ধরেছিল, বুড়ো সাজা কী আর এমন কঠিন।"

টাবলুর কথা শুনে জয় আর শংকরের চোখ দুটো প্রায় ঠিকরে বেরিয়ে এল। টাবলু আফশোসের গলায় বলল "লোকটার হাতপায়ের প্লাস্টারগুলোও নকল। নকল না-হলে ভাঙা পায়ে কেউ ওভাবে ছুটতে পারে! বলা যায় না, ওই প্লাস্টারের মধ্যেই হয়ত চোরাই জিনিস ছিল। লোকটা নির্ঘাত দাগী স্মাগলার, তখনই আমার সন্দেহ করা উচিত ছিল যে, লোকটা ছদ্মবেশ ধরেছে।"

জয় আর শংকরের হাত-পা কেঁপে উঠল। শীতেও হাত-পা কাঁপে, কিন্তু এ কাঁপুনি সে কাঁপুনি নয়। শুধু কাঁপুনিই নয় সেই সঙ্গে গাও ছমছম করছে। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই, এখন যদি ওই লোকটা দলবল সমেত সামনে এসে হাজির হয়।

আকাশ আরও কালো হয়ে গেছে, চারদিকে চাপ-চাপ অন্ধকার। এমন সময় মিহি সুতোর মতো বৃষ্টি শুরু হল। টাবলু বলল, "এ বৃষ্টি এখন আর ধরবে না মনে হয়, চল হোটেলে ফিরে যাই।" ছুটে তিনমাথার মোড়ে পৌঁছুতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল বেশ জোরে। ওরা একটা অফিস বাড়ির ঝুল-বারান্দার নীচে দাঁড়াল। একটানা বৃষ্টি চলল অনেকক্ষণ। পাহাড়ী জায়গায় জল দাঁড়ায় না, সমতল হলে ঠিক এক হাঁটু জল জমে যেত।

বৃষ্টি একবার থামতেই ওরা ছুটে হোটেলে ফিরে এল। টাবলুর ঘড়িতে তখন ঠিক দুটো। খিদেয় তিনজনেরই পেট চোঁ-চোঁ করছে। ওরা সোজা খাবার টেবিলে বসে পড়ল। খাবার-দাবার সব রেডি ছিল, এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে। গরম-গরম ভাত, গরম ডাল, তরকারি, ডিমভাজা আর গাজর-শশা-পেঁয়াজের স্যালাড। এত খিদে পেয়ে গিয়েছিল যে, ওরা একটাও কথা না বলে খেতে শুরু করে দিল। রান্নার কী স্বাদ, মনে হচ্ছিল এত

ভাল রান্না ওরা জীবনেও খায়নি। বাড়িতে যা খায় তার ডবল খেল তিনজনেই। খেয়েদেয়ে ওরা নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

কাঠের চালে ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছে সমানে। এখন দুপুর অথচ জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে মনে হয় সন্ধে হয়ে গেছে, চারদিক অন্ধকার। আর কী শীত, গায়ে কম্বল জড়িয়েও ওদের শীত কাটতে চাইছিল না। টাবলু করুণ মুখ করে বলল, "এ বৃষ্টি আজ আর থামবে বলে মনে হচ্ছে না।"

বৃষ্টি না থামলে ওরা হোটেল ছেড়ে বেরোতে পারবে না। ছাতা, বর্ষাতি থাকলে অবশ্য ওরা বেরিয়ে পড়ত, কিন্তু সে সব তো ওদের কাছে নেই। বৃষ্টি, স্রেফ বৃষ্টির জন্যেই ওদের জীবনের একটা মস্ত সুযোগ নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। জাদুকরের কাছে এখন ওদের যাবার কথা, কথা দেওয়া আছে। বৃষ্টি থামাবার জন্যে ওরা তিনজনেই মনে-মনে ভগবানকে ডাকতে লাগল, কিন্তু এই পাহাড়ের ভগবানও বোধহয় ওদের ভাষা বোঝেন না, বৃষ্টি ধরার বদলে আরও বেড়ে গেল। দেখতে দেখতে আরও অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। তারপর একসময় টাবলু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মন খারাপ করে বলল, "সন্ধে হয়ে গেছে।"

সারা সন্ধে-রাত্তির ধরে বৃষ্টি হল, পরদিন সকালেও বৃষ্টি থামল না। কাচের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে ওদের চোখে ব্যথা হয়ে গেল, কিন্তু বৃষ্টি থামার কোনোরকম লক্ষণ চোখে পড়ল না কারও। দুপুরের দিকে একবার কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি কমে এসেছিল, তারপরেই শুরু হল দ্বিগুণ জোরে। প্রচণ্ড বৃষ্টি, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া, মাঝে মধ্যে হোটেলের কাঠের চাল, কাঠের দেয়াল কেঁপে উঠছিল থথর করে, মনে হচ্ছিল এই বুঝি উড়ে যায়! সন্ধের পরে ঝড় থেমে গেল, কিন্তু বৃষ্টি থামল না।

দুদিন ধরে একটানা হোটেলে বসে বসে হাঁপিয়ে উঠেছিল টাবলু, জয় আর শংকর। বৃষ্টির জন্যে ওদের বিরাট একটা পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। জাদুকরের সঙ্গে দেখা না হলে এতটা আফশোস হত না। দেখা হল, তারপর আসল কাজ শুরু হওয়ার মুখেই বৃষ্টি!

মাঝরাত্তিরে হঠাৎ চাপা গুমগুম শব্দে ওদের তিনজনেরই ঘুম ভেঙে গেল। শব্দটা দূরে থেকে ভেসে আসছে, কিন্তু কিসের শব্দ ওরা কিছুতেই বুঝতে পারল না। ভোর হতে না হতেই চেঁচামেচি, চিৎকারে ওদের ঘুম ভেঙে গেল আবার। ঘুম ভাঙতেই দেখে বাইরে চমৎকার রোদ উঠেছে, বৃষ্টি নেই একদম। কী সুন্দর সকাল, কিন্তু বাইরে এত চিৎকার কেন? গায়ে চাদর জড়িয়ে ওরা তিনজনেই ছুটে নীচে নেমে এল।

রাস্তায় পাহাড়ী লোকগুলোর চোখেমুখে আতঙ্ক। চিৎকার করতে করতে সবাই এদিক-ওদিক দৌড়দৌড়ি করছে। হঠাৎ ওদিকের বাড়ি থেকে একটা বুড়ী বেরিয়ে এসে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে সে কী কান্না! টাবলু একটা লোককে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?" লোকটা হাতমুখ নেড়ে উত্তেজিত হয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় একটানা অনেক কিছু বলে গেল, টাবলু একটা বর্ণও বুঝতে পারল না। এমন সময় হোটেলের লোকটার দেখা পাওয়া গেল, ওর কাছ থেকেই জানা গেল পুরো ব্যাপারটা।

কাল মাঝরাত্তিরে বিশাল-বিশাল ধস নেমেছে রুটুংয়ে। সেই ধসে বহু ঘরবাড়ি এমন কি দুটো আস্ত গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, লোকজন মারা গেছে বিস্তর। রুটুংয়ে যাতায়াত করার যে-দুটো সেতু ছিল সে-দুটোও ভেসে গেছে নদীর জলে। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নাকি এত বড় ধস নামেনি রুটুংয়ে।

এত বড় দুর্ঘটনার খবর শুনে ওদের তিনজনেরই খুব মন খারাপ হয়ে গেল। ওই যে বুড়ীটা রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে নিশ্চয়ই ওর কেউ মারা গেছে ধসে। কাল মাঝরাত্তিরের চাপা গুমগুম শব্দের রহস্যও ওদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, ওগুলো নিশ্চয়ই ধস নামার শব্দ।

টাবলু বলল, "চল তো জাদুকরের খবর নিয়ে আসি।" এখানে জাদুকরই ওদের একমাত্র প্রিয়জন, সুতরাং তার খবর নেওয়া দরকার। ওরা জোর পায়ে হেঁটে, কিছুটা ছুটে বাজারের কাছে পৌঁছে গেল। বাজারটা পেরিয়ে যাবার পরেই রাস্তা একেবারে নির্জন। কিছুটা যাবার পরে ওরা অবাক হয়ে দেখল, রাস্তা জুড়ে একটা বিরাট পেয়ারা বাগান। সেদিন তো এখানে কোনো পেয়ারা বাগান ছিল না, তাহলে কি ওরা রাস্তা ভুল করেছে! কিন্তু রাস্তাই বা ভুল হবে কী ভাবে, বাজারের পেছন দিকে এটাই তো একমাত্র রাস্তা। টাবলু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে ওপর দিকে আঙুল তুলে বলল, "দেখ দেখ।

ওরা দেখল, রাস্তার সঙ্গে লাগানো উঁচু পাহাড়টার গা কে যেন চেঁছে দিয়েছে, অনেক জায়গা জুড়ে একটাও গাছপালা নেই, পাথুরে লাল মাটি বেরিয়ে পড়েছে। ওদের বুঝতে অসুবিধে হল না যে, পেয়ারা বাগানটা ছিল পাহাড়ের মাথায়, ধসে পড়েছে নীচে। ধস যে এত ভয়ংকর ওদের ধারণাই ছিল না, দেখে গা শিউরে উঠল। বেশ কয়েকটা পেয়ারাগাছ ধসে পড়তে পড়তে মাটির সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে গেছে, তবে অনেকগুলো দাঁড়িয়ে আছে মাটির ওপর। সব গাছগুলোই ফলন্ত, ডাঁশা ডাঁশা পেয়ারা ঝুলছে গাছে।

হতভম্ব ভাব কাটার একটু পরেই ওরা তিন লাফে গাছে উঠে পেয়ারা পাড়তে শুরু করে দিল। পেয়ারাগুলো কী মিষ্টি, ভেতরটা লাল। শংকর বলল, "আজ আমরা পেয়ারা খেয়েই ব্রেকফাস্ট করব।" ওরা বিস্তর পেয়ারা খেল, ছড়াল তার দশগুণ, তারপর বড়-বড় পেয়ারায় দু-পকেট বোঝাই করে নেমে এল গাছ থেকে।

টাবলু বলল, "চল এবার জাদুকরের কাছে যাই।" ওরা পেয়ারা-বাগানটা পেরিয়ে ওপাশের রাস্তায় গিয়ে পড়ল। কিছুটা এগোবার পরেই রাস্তাটা বেঁকে গেছে, ওই বাঁকটা নিলেই জাদুকরের ঘর দেখা যাবে, কিন্তু বাঁক নেবার পরেও ওরা ঘরটা দেখতে পেল না। কী আশ্চর্য! ঘরটা তো ওখানেই ছিল, গেল কোথায়!

টাবলু কিছুটা ছুটে গেল, তারপর আঁতকে উঠে বলল, "ধস।" জয় আর শংকরও দৌড়ে গেল, কাছাকাছি যেতেই ওদের পাগুলো যেন আটকে গেল মাটির সঙ্গে। জাদুকরের বাড়ির পেছনেই একটা গভীর খাদ, সেই খাদে নেমে গেছে ওপরের অনেক কিছু। লালচে মাটির একটা বিশাল রাস্তা চলে গেছে খাদের মধ্যে। অনেকটা জায়গা নিয়ে বিরাট একটা হাঁ, ওই হাঁয়ের ওপরেই ছিল জাদুকরের ঘর। ওরা পা টিপে টিপে খাদের ধারে গিয়ে উঁকি মারল নীচে। অতল খাদ, বাড়িঘরদোরের কোনো চিহ্নও ওদের চোখে পড়ল না।

তিনজনের কেউই কথা বলতে পারল না কিছুক্ষণ। শংকর শুধু আস্তে আস্তে কী যেন বলল, কিন্তু ওর গলা এত ভার-ভার যে, ওর কথা কেউ বুঝতে পারল না। আরও কিছুক্ষণ ওইভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ওরা ফিরতে শুরু করল। তিনজনেরই এত মন খারাপ যে, কেউ কারও সঙ্গে কোনো কথা বলল না। বাজারের কাছাকাছি এসে টাবলু বলল, "আমার মন বলছে কী জানিস, জাদুকর মারা যাননি, উনি মন্ত্রের জোরে নিজেকে বাঁচিয়েছেন। কিছু বলা যায় না, উনি হয়ত নিজের ঘরটাকেও উড়িয়ে নিয়ে গেছেন অন্য কোথাও।"

কথাটা জয় আর শংকরের খুব মনে ধরল, এটাই তো স্বাভাবিক, যিনি মন্ত্র পড়ে পাহাড় উড়িয়ে দিতে পারেন তিনি

নিজের ঘর ওড়াতে পারবেন না? এভাবে ভাবতে পেরে ওদের মন বেশ হাল্কা হয়ে গেল। ওরা পকেট থেকে পেয়ারা বার করে খেতে খেতে রাস্তার তিনমাথার মোড়ে এসে পৌঁছল।

পোস্টাফিসটা চোখে পড়তেই টাবলু বলল, "তিনরাত্তির কেটে গেল এখানে, আর দেরি করা যায় না, চল ছোটমামাকে এবার টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দিই। টেলিগ্রাম যেতেও তো একটু সময় নেবে।"

পোস্টাফিসের কাউণ্টারে যে লোকটা বসে ছিল ওদের কথা শুনে হিন্দীতে বলল, "টেলিগ্রাম তো এখন যাবে না।"

"কেন?"

"ধসে লাইন-টাইন সব খারাপ হয়ে গেছে।"

"সে কী! সারবে কবে? কদ্দিন লাগবে?"

"কিছু বলা যায় না।"

"আন্দাজ?"

"তা, কমসে কম পনেরো-বিশ দিন।"

"টেলিগ্রাম না যাক, চিঠি—চিঠি যাবে তো?"

"কী করে যাবে? রুটংয়ে যাতায়াত করার দুটো ব্রিজই ভেঙে গেছে, রাস্তাঘাটের অবস্থাও যাচ্ছেতাই। মানুষজন যেতে না পারলে চিঠি যাবে কী করে?"

ওরা তিনজনে মন খারাপ করে বেরিয়ে এল পোস্টাফিস থেকে। এখন উপায়! একে একে অনেককে জিজ্ঞেস করে, সব শুনে, ওদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। রুটং থেকে বাইরে যাবার সব রাস্তাই ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে। বাস-চলাচল এক মাসের আগে কোনোমতেই শুরু হবে না, কেউ-কেউ বলল, তিন চার মাসও লেগে যেতে পারে। খাবার জলের পাইপ লাইন ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, ফসলও নষ্ট হয়ে গেছে একদম। রুটংয়ের মজুত খাবারও ফুরিয়ে যাবে সপ্তাহখানেকের মধ্যে। তারপর? আতঙ্কে পাহাড়ী লোকগুলোর হলুদ মুখ আরও হলুদ হয়ে গেছে।

সব দেখেশুনে টাবলু শুকনো মুখে বলল, "যে করেই হোক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে।"

"কিন্তু বাসটাস তো নেই, যাব কী করে?"

"কিছু না পেলে হেঁটে যাব।"

"হেঁটে! রাস্তা চিনব কী করে?"

টাবলু কোনো কথা না বলে ওদিকের ছোট্ট পুলিশ-ফাঁড়িটায় ঢুকে পড়ল, ওর পেছন-পেছন গেল জয় আর শংকর। পুলিশ অফিসার চমৎকার বাংলা জানেন, সব শুনে বললেন, "অনেকটা রাস্তা, তোমরা কি অতটা হেঁটে যেতে পারবে?"

টাবলু কী যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই জয় বলল, "খুব পারব, হাঁটতে তো আমাদের খুব ভাল লাগে।"

ওর কথা শুনে পুলিশ অফিসার হেসে ফেলে বললেন, "ভেরি গুড। তাহলে, ওয়েদার ভাল থাকলে তোমরা কাল আর্লি মর্নিংয়েই রওনা হয়ে যাও। এখানে চলে এস, আমি তোমাদের সঙ্গে একটা লোক দিয়ে দেব, সে তোমাদের কিছুটা এগিয়ে দেবে। তারপর ম্যাপ দেখে হাঁটবে, আমি একটা ম্যাপ বানিয়ে দেব তোমাদের জন্যে। পথে দু-একটা গ্রাম পড়বে, রাস্তা চিনতে না পারলে গ্রামের লোকদের জিজ্ঞেস করে নিও। রাত্রে হল্ট করবে নাথান মিলিটারি ক্যাম্পে। ওখানকার ক্যাপটেন আমার খুব বন্ধু, আমি একটা চিঠি লিখে দেব। ও, কে?"

পুলিশ অফিসার ওদের চেনেন না, জানেন না, অথচ ওদের জন্যে এত করছেন! টাবলু, জয় আর শংকর তিনজনেই রীতিমত অভিভূত হয়ে পড়ল। কাল সকালে এখানে আসার কথা জানিয়ে বেরিয়ে যাবার মুখে অফিসার ওদের ডেকে বললেন, "সঙ্গে যথেষ্ট খাবার নিয়ে নেবে, পথে একদম খাবারদাবার পাবে না। আর একটা জিনিস নিতে কক্ষনো ভুলবে না—সেটা হল নুন, সঙ্গে অনেকটা নুন নিয়ে যাবে।"

"নুন!"

"হ্যাঁ, নুন। পথে অনেক জোঁক আছে। জোঁক ধরলেই জোঁকের মুখে নুন ছড়িয়ে দেবে, ব্যস সঙ্গে সঙ্গে খসে পড়বে। নুন না দিয়ে টানাটানি করলে কিন্তু কিছুতেই ছাড়াতে পারবে না।"

মন দিয়ে কথাগুলো শুনে ওরা সোজা ফিরে এল হোটেলে।

৪

ভোরবেলায়, ধরতে গেলে একই সঙ্গে, ওদের তিনজনের ঘুম ভেঙে গেল। বেড়াতে এসে এই দুতিনদিনের মধ্যেই ওদের ভোরে ওঠার চমৎকার অভ্যাস হয়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠেই ওরা কাচের জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। বাহ্! চমৎকার রোদ উঠেছে। ব্যাগ-ট্যাগ ওদের রাতেই গোছানো হয়ে গিয়েছিল। হাতমুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে ওরা সোজা চলে গেল খাবার টেবিলে। ব্রেকফাস্ট সেরে দুপুরের খাবারের তিনটে প্যাকেট আর অনেক-গুলো কমলালেবু নিয়ে নিল সঙ্গে। এছাড়া ওদের সঙ্গে আছে তিন টিন বিস্কুট, দুটো বড় কেক আর আড়াই বাক্স চকোলেট। পথে খাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। হোটেলের পাওনা মিটিয়ে, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে ওরা যখন পুলিশ-ফাঁড়ির সামনে এসে দাঁড়াল তখন পৌনে সাতটা বাজে।

ওরা পৌঁছবার একটু পরেই পুলিশ অফিসার এলেন। এসেই ওদের একবার দেখে নিয়ে গম্ভীর মুখে আকাশের দিকে তাকালেন। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে চারদিক দেখে নিয়ে হাসিমুখে বললেন, "ওয়েদার খুব ভাল, তোমরা তাহলে রওনা হয়ে যাও। সুব্বা, সুব্বা।"

ওর ডাক শুনে ফাঁড়ি থেকে মাঝবয়েসী যে পাহাড়ী লোকটা বেরিয়ে এল তার নামই সুব্বা। সুব্বা এসে সেলাম ঠুকল। অফিসার পাহাড়ী ভাষায় ওকে কী সব বুঝিয়ে দিয়ে টাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই হচ্ছে তোমাদের গাইড, কিছুটা পথ তোমাদের সঙ্গে যাবে।"

উনি পকেট থেকে দুটো কাগজ বার করলেন। একটা ম্যাপ ম্যাপটা টাবলুকে বুঝিয়ে দিলেন। অন্যটা মিলিটারি ক্যাম্পের ক্যাপটেনের নামে চিঠি। চিঠি দেখালে ক্যাপটেন ওদের রাত্রে থাকা-খাওয়ার সব বন্দোবস্ত করে দেবেন। নাথানের পরে রাস্তা-ঘাট খুব একটা খারাপ হয়নি, সকালে হাঁটতে শুরু করলে দুপুরের মধ্যে বাস স্টপে পৌঁছে যাবে। ওখান থেকে বাসে চড়ে রেল স্টেশনে পৌঁছতে তিন-চার ঘণ্টার বেশি সময় লাগার কথা নয়।

একটু থেমে পুলিশ অফিসার বললেন, "তবে, ওয়ান থিং, তোমরা যদি কখনও দেখ পাহাড়ের ওপর থেকে নুড়ি গড়িয়ে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে সরে যাবে। ধস নামার আগে পাহাড় থেকে নুড়ি, ছোটখাট পাথর—এইসব গড়িয়ে পড়ে। সাবধানে যাবে। তাহলে আর দেরি কোরো না, রওনা হয়ে যাও— গুড বাই।"

ওরা রওনা হতেই অফিসার বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, এক মিনিট, তোমরা কি আমার ওপর অ্যানয়েড হয়েছ? চটে গেছ?"

শুনে ওরা তিনজনই খুব লজ্জা পেয়ে গেল। শংকর বলল, "ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন, আপনি আমাদের জন্যে এতকিছু করলেন, আর আমরা আপনার ওপর চটে যাব!

অফিসার বললেন, "তাহলে কেন তোমরা আমাকে থ্যাংকস দিলে না, গুড বাই করলে না?"

বলার সঙ্গে সঙ্গে টাবলু বলল, "থ্যাঙ্কিউ ভেরি মাচ। গুড

বাই।" জয় আর শংকরও তাই বলল। অফিসার তাই শুনে মিটমিটি হেসে হাত নেড়ে বললেন, "বাই।"

ওরা রওনা হয়ে গেল। আগে সুব্বা, পেছনে-পেছনে ওরা তিনজন। কিছুটা হাঁটার পরে জয় পকেট থেকে চকোলেট বার করে টাবলু আর শংকরকে দিল। শংকর বলল, "সুব্বাকে দে।" সুব্বা কিছুতেই নেবে না, তিনজনে মিলে জোর করায় নিল। চকোলেট মুখে দিয়ে সুব্বার সে কী হাসি! সুব্বা অল্প-স্বল্প হিন্দী জানে। চকোলেট খাওয়ার পর থেকেই লোকটা ওদের খুব বন্ধু হয়ে গেল।

পিচের রাস্তা ধরে ওরা দিব্যি হাঁটছিল, হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে দেখে রাস্তা উধাও। সামনে ছোট খাদের মতো, খাদে তালগোল পাকানো মাটি আর কাদা। কী ভয়ংকর ধস, ওরা এবার কোনদিকে যাবে?

রাস্তার ওই অবস্থা দেখে সুব্বা একটুও বিচলিত হল না, চারদিক দেখে নিয়ে খাদের মধ্যে নামতে শুরু করে দিল। পেছন-পেছন ওরা। মাটি পেছল, তাই খুব সাবধানে পা টিপে-টিপে নামছিল। খাদের ভেতরে এর মধ্যেই খুব সরু একটা পায়ে-চলা-পথ তৈরি হয়ে গেছে। সেই পথ দিয়ে ওরা অনেকটা হেঁটে ওদিকের পাহাড়ে গিয়ে উঠল। পাহাড়ের ধার দিয়েও সরু পথ, ওই পথ ধরে ওরা ঘুরে-ঘুরে পাহাড়ে উঠতে লাগল। যত ওপরে উঠছে, পাশের খাদ তত গভীর হচ্ছে। কোনো-কোনো জায়গায় ওদের একেবারে খাদের ধার দিয়ে হাঁটতে হচ্ছিল, হাঁটতে হাঁটতে খাদের দিকে তাকালে বুক কেঁপে ওঠে।

বেশ কিছুটা ওপরে ওঠার পরে ওরা হঠাৎ দেখে সামনের বিশাল পাহাড়টা কে যেন ধারালো যন্ত্র দিয়ে অর্ধেক কেটে ফেলে দিয়েছে। ধস যে এত সাংঘাতিক, না দেখলে ওরা বিশ্বাসই করতে পারত না। নীচে অতল খাদ. খাদের একেবারে তলায় ফিতের মতো সরু পাহাড়ী নদী। ফিতের মতো নদীটা যে আসলে বিরাট, ওরা তিনজনেই বুঝতে পারল। এত উঁচু থেকে নীচের সব জিনিসই ছোট্ট-ছোট্ট দেখায়. কিন্তু সত্যি-সত্যি ওগুলো ছোট্ট নয়।

সুব্বা বলল, এই কাটা পাহাড়ের গা বেয়ে ওপারে পৌঁছুতে হবে, এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। সর্বনাশ! ভাবলেই তো হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, কী করে যাবে ওরা! পাহাড়টা মাঝখান দিয়ে কাটা, পাথরের দেয়াল, গাছপালা নেই যে ধরে ধরে যাবে। মানুষরা তো আর টিকটিকি নয় যে. খাড়াই দেয়াল বেয়ে যেতে পারবে। পার হতে গিয়ে যদি পা ফস্কায় তাহলে অত নিচু খাদের ভেতর থেকে ওদের শরীরের একটা টুকরোও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পাহাড়ের দেয়ালে আঙুল-দশেক চওড়া একটা খাঁজ আছে, ওটাই হচ্ছে পেরুবার একমাত্র রাস্তা। সুব্বা বলল, "পার হবার সময় কেউ নীচের দিকে তাকাবে না, তাকালে মাথা ঘুরে যাবে। আর, কক্ষনো পা টিপে-টিপে হাঁটবে না, একটু বরং জোরেই হাঁটবে। বৃষ্টিতে মাটি-পাথর নরম হয়ে আছে, আস্তে হাঁটলে পায়ের তলার মাটি খসে যাবে. আর খসে গেলেই—"

সব শুনে তিনজনেরই কথা বন্ধ হয়ে গেল। বুক ঢিব্-ঢিব্ করতে লাগল সমানে। সুব্বা তাড়া লাগাল, "দেরি হয়ে যাচ্ছে। বেশি দেরি হয়ে গেলে বিকেলের মধ্যে মিলিটারি ক্যাম্পে পৌঁছুতে পারব না। অন্য কোথাও থাকার জায়গা নেই, আর রাত্তির হয়ে গেলেই এই পাহাড়ে শের, ভাল্লু বেরোয়।" কিন্তু সামনের মৃত্যুকূপের কাছে বাঘ-ভাল্লুকের ভয়ও ওদের তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছিল।

সুব্বা হঠাৎ ওদের তিনটে ব্যাগ কেড়ে নিয়ে মাথায় চাপিয়ে পাহাড়ের ওই খাঁজ ধরে তরতর করে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে হাত নেড়ে ওদের আসতে বলল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে টাবলু মরিয়া হয়ে বলল. "চল্।"

প্রায় দুশো ফুট বিপজ্জনক রাস্তা ওরা কী ভাবে যে পেরিয়ে এল, নিজেরাই বিশ্বাস করতে পারছিল না। ওদিকে পৌঁছেই ওরা মাটিতে বসে পড়ল ধপ্ ধপ্ করে. নিশ্বাস ফেলতে লাগল জোরে জোরে, যেন এতক্ষণ ওরা একবারও নিশ্বাস ফেলেনি।

সুব্বা ওদের দিকে তাকিয়ে হাসতে-হাসতে বলল "বাহাদুর।" প্রশংসা করল. কিন্তু ওদের বেশিক্ষণ বসতে দিল না। আবার হাঁটা শুরু হল। রাস্তা খারাপ. তবে আগের তুলনায় যথেষ্ট ভাল। দুপুর দেড়টা নাগাদ ওরা একটা গ্রামে এসে পৌঁছল। এখানকার গ্রামগুলো বেশ মজার. আট-দশটা ঘর নিয়েই একটা গ্রাম। গ্রামের লোকগুলো অবাক হয়ে টাবলুদের দেখছিল। সুব্বা এবার ফিরে যাবে, বাকি পথটা ওদের ম্যাপ আর গ্রামের লোকজন ভরসা।

সুব্বাকে ওরা তক্ষুনি-তক্ষুনি ছাড়ল না। ওকে দুপুরে খাওয়ার নেমন্তন্ন করে একটা গাছের নীচে বসে পড়ল। খাবারের তিনটে প্যাকেট চার ভাগ করে খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেল ওরা। খাওয়া-দাওয়া শেষ করেই সুব্বা ফেরার পথ ধরল। ওরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে রওনা হল নাথানের দিকে।

পথ চিনতে ওদের অসুবিধা হচ্ছিল না, কারণ একটা পথই একটানা অনেক দূরে চলে গেছে। অনেকদূর পৌঁছবার পরে ওরা দেখে দুটো পথ দুদিকে বেঁকে গেছে। টাবলু ম্যাপ বার করল, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারল না। রাস্তায় আর কোনও লোকজনও নেই যে জিজ্ঞেস করবে। বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পরে একটা লোকের দেখা পেল। লোকটা বলে দিল. ডানদিকের রাস্তা। ডানদিকের রাস্তাটা খুব খারাপ, এই দিকটায় বেশি ধস নেমেছে।

দুর্গম পথ ধরে কিছুটা যেতে যেতে না যেতেই হঠাৎ আকাশ অন্ধকার হয়ে এল। চাপ-চাপ কালো মেঘ আকাশে, সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া। যদি আবার বৃষ্টি নামে! ওদের সঙ্গে ছাতা-বর্ষাতি নেই. ধারে কাছে মাথা বাঁচাবার জায়গাও নেই কোথাও। টাবলু বলল, "তাড়াতাড়ি চল।" কিন্তু যা রাস্তা, তাড়াতাড়ি যাবে কী করে. জোরে হাঁটতে গিয়ে জয় হোঁচট খেয়ে পড়ল একবার। ভেজা মাটিতে পড়ে ওর সারা গায়ে কাদা লেগে গেল, পাটাও ব্যথা-ব্যথা করছে। তবে, এসব এখন দেখবার সময় নেই. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওরা হাঁটতে লাগল।

চারটে বাজে মোটে, অথচ আকাশ এত অন্ধকার হয়ে এসেছে যে, মনে হচ্ছিল ছটা বেজে গেছে। টাবলু বলল, "এসে গেছি প্রায়, আর বেশি দূর নয়, তাড়াতাড়ি পা চালা।" আরও কিছুটা যাবার পরে দেখে সামনের পাহাড়ের বেশ কিছুটা ধসে গেছে খাদের মধ্যে। খাদটা আগের সেই খাদের মত গভীর নয়, কিন্তু পড়ে গেলে নির্ঘাত ছাতু হয়ে যাবে। ভাঙা পাহাড়ের দেয়ালে সরু একটা পথের মতো। ওখানে পা দিয়েই শংকর "আঃ" করে চেঁচিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ওকে ধরে ফেলল টাবলু। না ধরলে ঠিক খাদের মধ্যে পড়ে যেত শংকর। পাহাড়ের গায়ের পথটা জলে কাদায় দারুণ পেছল. ওর ওপর দিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাহলে উপায়?

সেই সকাল থেকে হেঁটে হেঁটে ওরা তিনজনেই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। শরীর আর চলছে না। ব্যাগ টেনে টেনে কাঁধে, হাতে প্রচণ্ড ব্যথা, পা টনটন করছে। হাওয়া এখন বেশ কনকনে। জয়ের চোখমুখ ছলছল করছে, পরপর কয়েকবার হাঁচল ও।

টাবলু বলল, "এদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না। চল, পাহাড়ের ওপর দিয়ে যাই. একটু ঘুর পথ হবে ঠিক. কিন্তু এ-ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।"

ওরা ছোটছোট গাছপালা ধরে খাড়াই পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। বেশ কিছুটা ওঠার পরে কিছুটা সমতল জায়গা।

এবার ডান দিকে যেতে হবে। ডান দিকের জঙ্গল বেশ ঘন। জঙ্গলে ঢোকার মুখে লাফিয়ে পিছিয়ে এল শংকর। সাপ! একটা বিশাল পাহাড়ী সাপ অনেকটা জায়গা জুড়ে শুয়ে আছে। এত বড় সাপ ওরা কখনও দেখেনি। সাপ দেখে ওরা দৌড়ে পিছিয়ে এল অনেকটা, কিন্তু সাপটা ওদের তাড়া করা দূরে থাক, ফণা পর্যন্ত তুলল না। টাবলু বলল, "সাপটা বোধহয় জন্তু-জানোয়ার খেয়ে ঘুমোচ্ছে, চল আমরা ওদিক দিয়ে যাই।"

ওদিক দিয়ে ওরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আন্দাজে-আন্দাজে দিক ঠিক করে হাঁটছে। জঙ্গল কোথাও ঘন, কোথাও হাল্কা। হাঁটার শেষ নেই, অথচ লোকালয়ের কোনোরকম চিহ্ন ওদের চোখে পড়ছিল না। জঙ্গলের মধ্যে দিনের আলো এমনিতেই কম, সেই আলোটুকুও এক সময় নিবে গেল দপ্ করে। ওরা ব্যাগ থেকে টর্চ বার করে জ্বালল। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে হাতে টর্চ না থাকলে এক পা চলা অসম্ভব।

দিনের আলোয় নাথানের দিক আন্দাজ করে ওরা হাঁটছিল, কিন্তু অন্ধকার হতেই ওদের দিক ভুল হয়ে গেল একেবারে। জঙ্গল ক্রমশ ঘন হয়ে উঠছিল, তবে ওরা কি গভীর জঙ্গলের দিকে হাঁটছে!

কোথাও কোনো শব্দ নেই, শুধু পায়ের তলায় শুকনো পাতা ভাঙছে—মচ্ মচ্ মড়াৎ। ওরা প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছিল, এই বুঝি সামনে দুটো হিংস্র চোখ জ্বলে উঠবে, চোখ দুটো বাঘ-ভাল্লুক কিংবা অন্য কোনো বুনো জানোয়ারের। মাঝে মধ্যে সামনে লম্বা দুটো ঠ্যাংয়ের মতো গাছের ঝুরি বা ডাল দেখে ওদের বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছিল। এই জঙ্গলটা অশরীরীদের থাকার পক্ষে আদর্শ জায়গা। ওদিকে আবার সাপের ভয়ে প্রতিটি পা ফেলছিল দেখে দেখে।

জয় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "আলো! আলো!" টাবলু আর শংকর দেখল, একটু দূরে কালো অন্ধকার চিরে এক চিলতে আলো বেরিয়ে এসেছে। আলো, তার মানে নিশ্চয়ই ওখানে কোনো বসতি আছে, ছোট্ট একটা পাহাড়ী গ্রামও হতে পারে ওটা।

আলোর দিকে চোখ রেখে ছুটতে লাগল ওরা। কাছাকাছি পৌঁছে অবাক হয়ে দেখল একটা গুহার ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা বেরিয়ে এসেছে। গুহার মুখে ঠাসা গাছপালা। গাছপালার ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে ওরা একটা ছোট দরজা দেখতে পেল। দরজাটা বন্ধ। দিনের বেলা হলে ওরা গুহা কিংবা দরজাটা দেখতেই পেত না।

ওরা কী করবে না করবে ভাবছে এমন সময় জয় খুব জোরে জোরে হেঁচে ফেলল দুবার। আর, সঙ্গে সঙ্গে গুহার দরজা খুলে তিনটে লোক ছুটে বেরিয়ে এল। ওদের এক হাতে টর্চ আর এক হাতে পিস্তল। টাবলুরা কিছু বোঝার আগেই লোক তিনটে ওদের ঘিরে ফেলল। উত্তেজিত গলায় পাহাড়ী ভাষায় কী সব বলতে বলতে লোকগুলো ওদের ঠেলে গুহার ভেতরে নিয়ে গেল। গুহায় লণ্ঠন জ্বলছে, সেই আলোয় টাবলু, জয় আর শংকর অবাক হয়ে দেখল তিনজন লোকের মধ্যে একজন সেই লোকটা। এই লোকটাকেই সেদিন ওরা রুটুংয়ে দেখেছিল, এই লোকটাই হাত-পা-ভাঙা বুড়োর ছদ্মবেশ ধরে ওদের সঙ্গে একই ট্রেনে, একই বাসে চেপে রুটুংয়ে এসেছিল। সেই বুড়োটা আর এই লোকটা যে একই মানুষ, এ ব্যাপারে ওদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না।

লোকটাও মনে হয় ওদের চিনতে পেরেছে, কিন্তু না চেনার ভান করে বলল, "তোমাদের কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। আমাকে চেন তোমরা?"

"আপনাকে "

শংকর সত্যি কথাটাই বলে ফেলতে যাচ্ছিল, টাবলু ওর পা মাড়িয়ে থামিয়ে দিয়ে বলল, "না তো।"

লোকটা কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল, "এখানে তোমরা কী ভাবে এলে?" টাবলু এবার সত্যি কথাই বলল, কিন্তু লোকটার চোখমুখ দেখে মনে হল টাবলুর কথা ও বিশ্বাস করেনি।

জয়ের চোখমুখ বেশ ছলছল করছে, বোধহয় ঠাণ্ডা লেগে গেছে, কোনোরকমে হাঁচি সামলে নিয়ে বলল, "আজ রাত্তিরের মতো দয়া করে আমাদের এখানে থাকতে দিন, কাল সক্কালেই আমরা চলে যাব।"

লোকটা নিষ্ঠুরের মতো হেসে উঠে বলল, "আমাদের এখানে থাকা খাওয়ার কোনো অসুবিধে নেই, কিন্তু কেউ একবার ভুল করে এসে পড়লে তাকে আমরা আর ফিরে যেতে দিই না।"

শুনে অজানা ভয়ে শিউরে উঠল টাবলু, জয় আর শংকর।

এই লোকটা বাঙালী, বাকি দুটো পাহাড়ী। লোকটা পাহাড়ী ভাষায় ওদের সঙ্গে কী সব পরামর্শ করে দেয়ালের কাছে গিয়ে একটা বোতাম টিপল। সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালটা ঘর্ঘর করে সরে গেল। দেয়ালের পেছনে একটা ঘর। লোকটা সেই ঘরে ওদের নিয়ে এসে বলল, "রাত্রে এখানে থাক, কাল সকালে তোমাদের বন্দোবস্ত হবে।" বেরিয়ে গিয়ে লোকটা আর একটা বোতাম টিপল। দেয়ালটা বন্ধ হয়ে গেল আবার।

দেয়ালটা বন্ধ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ছুটে গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা মারল। হাতে বেশ ব্যথা লাগল, কিন্তু এক চুলও নড়ল না দেয়ালটা।

ওরা হাতের টর্চগুলো জ্বালল। পাথরের দেয়াল, ঘরে একটাও জানলা-দরজা নেই। এক কোণে দুটো খাট পাতা, খাটে বিছানা-কম্বল। ওপর দিকে টর্চ ফেলে দেখে, সিলিংটাও পাথরের তৈরি। দেয়ালের মাথায় একদিকে একটা বড় ঘুলঘুলির মাঝখানে একটা লোহার গরাদ। কিন্তু, ঘুলঘুলিটা প্রায় তিন-মানুষ উঁচুতে, ওটা দিয়ে যে বাইরে তাকাবে তার উপায় নেই।

ওরা কেউ কোনো কথা বলতে পারল না কিছুক্ষণ। এমন একটা বিপদের মধ্যে যে পড়বে, কেউ কল্পনাই করতে পারেনি। আর এই বিপদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। ওই লোকটার নিষ্ঠুর হাসি আর কথাগুলো বারবার মনে পড়ছিল ওদের। ...এখানে কেউ একবার এসে পড়লে তাকে আমরা আর ফিরে যেতে দিই না...কাল সকালে তোমাদের বন্দোবস্ত হবে...

কী বন্দোবস্ত হবে কে জানে, তবে সেটা যে খুব ভয়ংকর কিছু-একটা হবে, এটা সবাই বুঝতে পারছিল। হঠাৎ বাড়ির কথা মনে পড়ায় জয়ের খুব কান্না পেয়ে গেল। যদি মায়ের সঙ্গে আর দেখা না হয়!

টাবলু বলল, "আজ আমরা পালা করে ঘুমোব, একসঙ্গে ঘুমোলেই কেলেঙ্কারি। দুজন ঘুমোবে, একজন জেগে থাকবে।"

"কেন? কেন?"

"একটা মতলব মাথায় এসেছে, দেখি কদ্দুর কী করা যায়।"

"কী মতলব?"

"বলছি। আগে কিছু খেয়ে নিই। খিদে পায়নি তোদের?"

একটু আগেই জয় আর শংকরের ভীষণ খিদে পেয়েছিল, কিন্তু বিপদে পড়ার পরেই ওদের খিদে মরে গেছে একদম। নেহাত টাবলুদা বলল তাই ব্যাগ খুলে ওরা খাবার দাবার বার করল। কেক আর বিস্কুটগুলো কী দারুণ খেতে, কিন্তু এগুলো জয় আর শংকরের কাছে এখন বিস্বাদ লাগছিল। খেতে হবে তাই খাওয়া। টাবলুদা কিন্তু বেশ তৃপ্তি করে খেল।

খাওয়া হয়ে গেলে টাবলু বলল, "নে, তোরা এবার শুয়ে পড়। ঠিক দুঘণ্টা পরে শংকরকে ডেকে দিয়ে আমি শোব, আমাকে আবার দুঘণ্টা পরে ডেকে দিবি, বুঝলি?" অনিচ্ছা সত্ত্বেও জয় আর শংকর শুয়ে পড়ল। সারাদিনের প্রচণ্ড ক্লান্তির পরে ওরা

শুয়ে-শুয়ে বেশিক্ষণ দুশ্চিন্তা করতে পারল না, একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

টাবলু ঘড়ি দেখে ঠিক দুঘণ্টা পরে শংকরকে ডেকে দিল। শংকর প্রথমে কিছুতেই উঠতে চাইছিল না, কিন্তু তারপরেই যেই মনে পড়ে গেল কোথায় শুয়ে আছে, অমনি লাফিয়ে উঠল। টাবলু ওকে চাপা গলায় বলল, "জেগে থাকবি। খবরদার ঘুমিয়ে পড়িস না। আমাকে ডেকে দিবি ঠিক দুঘণ্টা পরে। এই নে ঘড়ি।" টাবলু হাতঘড়িটা খুলে শংকরকে দিয়ে শোবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল।

শংকর বসে থাকল চুপ করে। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখছিল, সময় যেন আর কিছুতেই কাটতে চাইছে না। এইভাবে বসে থাকতে থাকতে ও ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়। হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই লাফিয়ে উঠে ঘড়ি দেখে—একী! তিনটে বেজে গেছে।

ধাক্কা দিয়ে ও টাবলুকে তুলে দিল। টাবলু ঘড়ি দেখে বলল, "ইশ্! এত দেরি করে ডাকলি কেন?"

শংকর কী যেন কৈফিয়ত দিতে যাচ্ছিল, টাবলু মুখে আঙুল চেপে ওকে থামিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, "জয়কে তোল।" জয় উঠে পড়ল।

টাবলু আস্তে-আস্তে বলল, "তোরা ব্যাগ থেকে দড়ি আর ছুরি বার কর।" ওরা বার করল। টাবলু নিজের আর ওদের দড়িদুটো একসঙ্গে পাকিয়ে পাকিয়ে একটা মোটা দড়ি বানাল। তারপর সব চাইতে বড় ছুরিটার পেটে দড়ির একটা ধার বাঁধল।

খাটের ওপরদিকে ঘুলঘুলিটা, টাবলু বলল, "ওই ঘুলঘুলিটার ওপরে টর্চের আলো ফেল।" শংকর আলো ফেলল। টাবলু খাটের ওপরে দাঁড়িয়ে ছুরি-বাঁধা দড়িটা ঘুলঘুলিটার গরাদ লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। ছুরিটা তিন চারবার দেয়ালে, সিলিংয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল।

টাবলুর মতলবটা জয় আর শংকরের কাছে পরিষ্কার, উত্তেজনায় ওদের গা-হাত-পা কেঁপে উঠছিল মাঝেমধ্যে। ছুরিটা হঠাৎ একবার গরাদে লেগে ঠন্‌ন্‌ন্ করে শব্দ তুলতেই ওরা চমকে উঠল। নিস্তব্ধ রাতে এই মৃদু শব্দটাই খান খান হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। টাবলু দেয়ালে কান পেতে বোঝার চেষ্টা করল, এই শব্দ আর কারও কানে গেছে কি না। না, কোথাও আর কোনো শব্দ উঠল না। তার মানে কেউ শুনতে পায় নি।

আরও কয়েকবার ওই ভাবে চেষ্টা করতে করতে ছুরি সমেত দড়িটা জড়িয়ে গেল ঘুলঘুলির গরাদে। টাবলু বলল, "জয়, তুই আমাদের মধ্যে সবচাইতে হাল্কা, আস্তে আস্তে দড়িটা বেয়ে ওঠ, উঠে দড়িটা শক্ত করে গরাদের সঙ্গে বেঁধে দে।"

নীচে থেকে টাবলু আর শংকর কিছুটা ঠেলে ওপরদিকে তুলে দিল জয়কে, তারপর ও আস্তে আস্তে দড়ি বেয়ে উঠে পড়ল বড় ঘুলঘুলিটায়। গরাদে শক্ত করে বাঁধল দড়িটা। একটাই গরাদ, গরাদের ফাঁক দিয়ে ওরা দিব্যি গলে যেতে পারবে বাইরে।

টাবলু নীচে থেকে চাপা গলায় বলল, "শাবাশ! এবার নেমে আয়।"

জয় নেমে এলে টাবলু উঠল ওপরে। ঘুলঘুলি দিয়ে মাথা গলিয়ে বাইরে তাকাল। চাঁদের আলোয় সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। একটু দূরে জঙ্গল, পাহাড়। একবার জঙ্গলে ঢুকতে পারলে ওদের কেউ আর খুঁজে পাবে না। কিন্তু, কেউ কোথাও নেই তো! টাবলু এদিক-ওদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। না, কোথাও কেউ নেই।

এই ঘুলঘুলিটার লাগোয়া, কোনাকুনি আর একটা ঘুলঘুলি। ঘুলঘুলির মুখে ঝাপসা হলুদ আলো, তার মানে ঘরে আলো জ্বলছে। কেউ জেগে আছে কি!

টাবলু একহাতে গরাদ ধরে, শরীরের বেশ কিছুটা বাইরে

ঝুলিয়ে দিয়ে ওই ঘুলঘুলিটার মুখে চোখ রাখল। ঘরটা কাঠের বাক্স আর ঝুড়িতে বোঝাই। বাক্সগুলো চায়ের বাক্সের মতো, আর ঝুড়িগুলো কমলালেবুর ঝুড়ির মতো। কোণের দিকে কার যেন পা! ও কোনোরকমে মাথাটা আর একটু বাড়াতেই একটা লোককে দেখতে পেল। লোকটার মাথায় টুপি, গায়ে ওভারকোট, লোকটা ঝুঁকে পড়ে একটা কোট সেলাই করছে। লোকটা বোধহয় পাহারাদার।

টাবলু বাইরের দিকটা আর একবার দেখে নিয়ে নীচে নেমে এসে জয় আর শংকরকে ফিসফিস করে বলল, "খুব সাবধানে পালাতে হবে, একটুও শব্দ করবি না, পাশের ঘরে একটা লোক জেগে আছে।"

টাবলু ব্যাগ থেকে আর একটা দড়ি বার করে ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বলল, "শোন, আগে আমি বেরিয়ে যাব। এই দড়িটার সঙ্গে ওই দড়িটা বেঁধে দিচ্ছি। আমি নেমে যাবার পরে তোরা এই দড়িটা ধরে টানলে মোটা দড়িটা আবার তোদের হাতে চলে আসবে। আর, আমি ঘুলঘুলিতে ওঠার পরে তোরা দড়িতে তোদের ব্যাগ বেঁধে দিবি, আমি ব্যাগগুলো নিয়ে নেমে যাব। সাবধান! সাবধানে আসবি, একদম শব্দ করিস না।"

টাবলু সরু দড়িটার সঙ্গে মোটা দড়িটা বেঁধে উঠে গেল ওপরে। ওঠার পরে জয় আর শংকর দড়ির সঙ্গে ওদের ব্যাগ বেঁধে দিল। টাবলু ওগুলো টেনে তুলল, তারপর ব্যাগসমেত দড়ি বাইরে ঝুলিয়ে দিয়ে নেমে গেল আস্তে আস্তে।

ও নেমে পড়ার পরে সরু দড়িটা ধরে টানতেই মোটা দড়িটা হাতে এসে গেল জয় আর শংকরের। একইভাবে দড়ি বেয়ে বেরিয়ে গেল জয়। এবার শংকরের পালা। একা-একা থাকার জন্যে ওর ভীষণ বুক ঢিব-ঢিব করছিল। দড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে মনে হল হাতে জোর নেই একদম। হাতে জোর নেই মনে হতেই ওর গায়ের জোরও যেন কমে গেল। যদি ও পালাতে না পারে! কিন্তু, পালাতে না পারার পরিণাম তো ভয়ংকর। ওই লোকগুলো ওকে আর আস্ত রাখবে না।

মরিয়া হয়ে দড়ি বেয়ে ওপরে উঠল শংকর। ঘুলঘুলির গরাদ চেপে একটু দম নিয়ে দড়িটা ধরে ও বাইরে ঝুলে পড়ল। হাতের মুঠো থেকে দড়ি একবারও আলগা হয়নি, কিন্তু মাটিতে পা দেবার সময় ও টাল সামলাতে পারল না, পড়ে গেল ধপ করে। নীচে নুড়ি-বেছানো ঢালু জমি, মাটিতে পড়ার পরে দু-পাক গড়িয়ে গেল শংকর। নিস্তব্ধ রাতে সামান্য এই শব্দটাকেই মনে হল বাজ পড়ার শব্দ। শংকর অপ্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা অন্য শব্দ শুনতে পেল। কে যেন ছুটে আসছে এদিকে। টাবলু জয় আর শংকরকে দুহাতে টেনে নিয়ে ওপাশের দেয়ালের আড়ালে সরে গেল।

একটু পরেই ওখানে টর্চের গোল আলো এসে পড়ল আলোর পেছন-পেছন একটা লোক। লোকটার এক হাতে ভোজালি, অন্য হাতে টর্চ। লোকটা কাছাকাছি এসে টর্চের আলো ঘোরাতে লাগল চারদিকে। দেয়ালের ওপর দিয়ে আলো ঘুরে গেল, দেয়ালের পেছনেই ওরা। লোকটা এদিক-ওদিক ঘুরে কিছু দেখতে না পেয়ে ফিরে যাবার সময় হঠাৎ ঘুলঘুলির গরাদ থেকে ঝুলে থাকা দড়িটা দেখতে পেল। দড়িটা কয়েকবার টানাটানি করে লোকটা বোধহয় ধরে ফেলল রহস্যটা। তারপর যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকেই ফিরে যেতে লাগল জোর পায়ে।

দেয়ালের পাশ দিয়ে যাবার সময় টাবলু হঠাৎ নিঃশব্দে কয়েক পা ছুটে গিয়ে লোকটার পিঠে টোকা মারল। লোকটা চমকে ঘুরে তাকাতেই টাবলু প্রচণ্ড এক ঘুষি মারল লোকটার মুখে। লোকটা আপ্ বলে ছিটকে মাটিতে পড়ে স্থির হয়ে গেল। পরপর দু-বছরের ইন্টার-স্কুল বক্সিং চ্যাম্পিয়ন টাবলুর এক ঘুষিতেই অজ্ঞান হয়ে গেল লোকটা। টাবলু জয় আর শংকরের দিকে তাকিয়ে বলল, "পালা।" চাঁদের আলোয় জঙ্গল লক্ষ্য করে ওরা ছুটতে লাগল প্রাণপণে।

ছুটতে ছুটতে ওরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। সন্ধেবেলায় এই জঙ্গলে ঢুকে ওদের কী ভয় না করছিল, আর এখন মনে হল, জঙ্গলের মতো নিরাপদ আশ্রয় বোধহয় পৃথিবীতে আর দুটো নেই। জঙ্গল গভীর না হওয়া পর্যন্ত ওরা ছুটতে লাগল সমানে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে এসে টাবলু হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, "ওই লোকটাকে না মারলে লোকটা তক্ষুনি গিয়ে আমাদের পালাবার কথা বলে দিত সবাইকে। লোকটা মনে হয় আধঘন্টাটাক অজ্ঞান হয়ে থাকবে, এই আধঘন্টার মধ্যে আমরা অনেকদূর চলে যাব।"

কিছুক্ষণ হাঁটার পরে জঙ্গলের ঘন ডালপালা ভেদ করে আবছা আলো ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। ওই আলো দেখে লাফিয়ে উঠে জয় বলল, "ভোর হচ্ছে।" আর একটু হাঁটার পরেই পরিষ্কার ভোরের আলো ফুটে উঠল চারদিকে। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল অসংখ্য পাখির কিচিরমিচির। গাছের মাথায় যে এত পাখি বসে আছে, রাতের অন্ধকারে একবারও বোঝা যায়নি। আরও কিছুক্ষণ হাঁটবার পরে ঘন জঙ্গল ফুরিয়ে গেল। খোলা জায়গায় এসে ওরা ভাল করে তাকাল আকাশের দিকে। আকাশের একদিক লাল করে সূর্য উঠছিল।

দেখতে দেখতে সূর্য দূরের নিচু পাহাড়টার মাথায় লাফিয়ে উঠল। চারদিক এখন বেশ পরিষ্কার, কুয়াশা কেটে গেছে অনেকটা। ধারেকাছে কোথাও রাস্তাঘাটের কোনোরকম চিহ্ন নেই। একটু ইতস্তত করে ওরা সোজা হাঁটতে লাগল।

জয় আর শংকরের আগের মতো বুক ঢিবঢিব করছে না, কিন্তু নিরাপদ জায়গায় না পৌঁছনো পর্যন্ত ওরা পুরোপুরি নির্ভয় হতেও পারছে না। টাবলুদার বুদ্ধি, সাহস আর প্রচণ্ড ঘুষির কথা ভাবলে এখনও উত্তেজনায় ওদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। তবে, প্রশংসা করতে গিয়ে ওরা ধমক খেয়েছে টাবলুর কাছে। টাবলুর মুখ বেশ গম্ভীর, আরও গম্ভীর গলায় বলেছে, "চুপ কর, বিপদ এখনও কাটেনি।" ধমক খেয়ে জয় আর শংকর দুজনেই ভেবে রেখেছে, এবার বিপদে পড়লে এমন-কিছু একটা করতে হবে যাতে টাবলুদার পর্যন্ত তাক লেগে যায়।

আরও কিছুটা হাঁটার পরে একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে ঝিরঝির-ঝিরঝির শব্দ ভেসে এল। শব্দ শুনেই চমকে উঠল জয় আর শংকর। অপরিচিত কোনো শব্দ শুনলেই ওদের কেমন যেন গা ছমছম করে উঠছিল, যদি আবার ওদের হাতে পড়ে যায়!

টাবলু কিন্তু ওই শব্দটা লক্ষ করেই হাঁটতে লাগল। একটু পেছনে জয় আর শংকর। পাথরের ওপরে উঠতেই ওরা খুব সরু একটা ঝর্না দেখতে পেল। সামান্য উঁচু থেকে ঝরাপাতার ওপরে ঝর্নার জল আছড়ে পড়ছে, শব্দ উঠছে ঝিরঝির ঝিরঝির। জল দেখেই জয় আর শংকর টের পেল যে, তেষ্টায় ওদের গলা কাঠ হয়ে গেছে। আঁজলা ভরে জল খেল তিনজনেই। কী মিষ্টি জল। জল খেয়ে, চোখেমুখে জল ছিটিয়ে তিনজনেই বসে পড়ল বড় পাথরটার ওপরে। টাবলু এই প্রথম মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "কীরে, খাওয়াদাওয়া হবে না? ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে যে।"

জয় আর শংকর তেষ্টা পাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল, খিদে পাওয়ার কথা যে ভুলে যাবে তাতে আর অবাক হওয়ার কী আছে।

জয় বলল, "আমার খিদে পায়নি, তোরা খা।"

শংকর বলল, "আমারও খেতে ইচ্ছে করছে না।"

ওদের কথা শুনে টাবলু গলা ছেড়ে হেসে উঠে বলল, "বললাম না, বিপদ এখনও কাটেনি, আরও বড় বিপদ হয়ত আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। বিপদে পড়লে সবার আগে কিসের দরকার বল তো দরকার সাহস আর বুদ্ধির। পেটে খিদে থাকলে সাহসও দেখাতে পারবি না, বুদ্ধিও খুলবে না। নে, খেয়ে নে চটপট"

টাবলু ব্যাগ খুলে কেক আর বিস্কুট বার করল। জয় আর শংকর খাব না খাব না করেও দিব্যি খেল। খাওয়াদাওয়া করে তিনজনে আবার ঝর্নার জল খেল পেট ভরে। টাবলু বলল, "বেশি করে জল খেয়ে নে, আবার কোথায় জল পাব তার ঠিক নেই।"

খাওয়ার পরে তিনজনেরই শরীরমন বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। জয় ব্যাগ খুলে বেশ কয়েকটা কমলালেবু বার করল, তার পর তিন ভাগ করে বলল, "এগুলো পকেটে রেখে দে, জল না পেলে লেবু খাব আমরা।"

টাবলু হেসে উঠে বলল, "দেখছিস শংকর, খেয়েদেয়ে জয়ের কেমন বুদ্ধি খুলে গেছে।" ওর কথা শুনে জয় আর শংকর দুজনেই হেসে ফেলল।

ঝর্নার জলের সরু নালাটার ধার দিয়ে ওরা হাঁটতে লাগল। টাবলু বলল, "ঝর্নার জলই আমাদের গাইড। নালাটা যেদিকে গেছে আমরাও সেদিকে যাব। গাঁয়ের কোনো লোক নির্ঘাত জল নিতে আসবে, আমরা তার কাছ থেকেই রাস্তার খোঁজ পেয়ে যাব

কথাটা জয় আর শংকরের খুব মনে ধরে গেল। সত্যিই তো! ওরা রুটুংয়ে থাকার সময়ই দেখেছে, পাহাড়ের লোকরা ঝর্নার জল খায়। সুতরাং জল খেতে কিংবা নিতে কেউ-না-কেউ আসতে পারে।

হেঁটে হেঁটে ওদের পা ব্যথা হয়ে গেল। কই, একটা লোকেরও তো দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। বুনো ঘাস, আর চারদিকের জংলী গাছপালা দেখে মনে হয়, এদিকে কেউ কখনও আসে না। কিন্তু, বাঁক নিতেই ওরা নালার ওপরে একটা ছোট্ট সাঁকো দেখতে পেল, সাঁকোর দুদিকে পায়ে হাঁটার সরু পথ। দুটো পথের যে-কোনো একটা ধরলেই ওরা লোকালয়ে পৌঁছতে পারবে। উত্তেজিত গলায় শংকর কী যেন বলতে যাবে ঠিক তক্ষুনি সাঁকোর নীচে থেকে চারটে পাহাড়ী লোক ওপরে উঠে এল। একজনের হাতে পিস্তল, ওদের দিকে তাক করা।

পিস্তল হাতে লোকটা কী যেন বলতেই ওরা ছুটে এসে টাবলু, জয় আর শংকরকে ধরে ফেলল। ওই লোকটা তারপর এগিয়ে এসে পিস্তলটা টাবলুর বুকে ঠেকিয়ে বলল, "আগে চলো। ভাগনেকা কৌশিশ করোগে তো গোলি মার দুংগা।"

লোক তিনটে টাবলু, জয় আর শংকরের হাতের আঙুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে শক্ত করে ধরে উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল। ওদের পেছন-পেছন পিস্তল হাতে লোকটা।

এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল এক নিমেষে। জয় আর শংকর ব্যাপারটা ভাল করে বোঝার আগেই দেখে ধরা পড়ে গেছে। তখন ওরা দুজনেই ভেবে রেখেছিল যে, আবার যদি বিপদে পড়ে তাক-লাগানো কিছু একটা দেখিয়ে দেবে সবাইকে। কিন্তু কোথায় গেল সেই পরিকল্পনা! উদ্বেগ, পরিশ্রম আর দুশ্চিন্তায় দুজনেরই গা-হাত-পা ঝিমঝিম করছে। জয়ের হঠাৎ গলার ভেতরটা ভারি হয়ে উঠল, কান্না পাওয়ার আগে যেমন হয় ঠিক সেইরকম। টাবলু মুখ সামান্য নিচু করে গম্ভীর হয়ে হাঁটছিল।

আবার সেই জংগল। জংগল পেরিয়ে ওরা সেই গুহার সামনে এসে দাঁড়াল। ঠাসা গাছপালার আড়ালে গুহাটা। জানা না থাকলে কারও বোঝার সাধ্যি নেই যে, এখানে এত বড় একটা গুহা আছে। ওরা কাছাকাছি আসতেই গুহার দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকতেই বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

বাইরের চড়া রোদ্দুর থেকে গুহার আবছা আলোয় এসে ওরা কিছুই দেখতে পেল না প্রথমে। একটু পরেই ওদের চোখ সয়ে গেল। বুড়োর ছদ্মবেশ ধরেছিল যে লোকটা, সেই লোকটা সামনে দাঁড়িয়ে। লোকটার চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছিল। কয়েক মুহূর্ত ওদের তিনজনকে দেখে নিয়ে লোকটা কর্কশ গলায় বলল, "তোমাদের আমি সাদাসিধে ছেলে ভেবে ভুল করেছিলাম। খুব চালাকি শিখেছ, না? তোমরা তো ছেলেমানুষ, চালাকি করে আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে টেক্কা দিতে পারেনি। এখান থেকে পালাবার সবকটা রাস্তা আমি বন্ধ করে রেখেছিলাম, আজ হোক, কাল হোক, ঠিক ধরা পড়ে যেতে তোমরা।"

কথা বলতে বলতে লোকটা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে টাবলুর জামার কলার ধরে খুব জোরে ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বলল, "তোমার খুব ঘুষির জোর হয়েছে, না? একটু পরেই তোমাদের সব জোর শেষ করে দেব।"

জয়ের গলার ভেতরটা আরও ভার-ভার হয়ে গেছে, আর একটু পরেই বোধহয় ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়বে, কিন্তু লোকটাকে টাবলুর কলার টানতে দেখে হঠাৎ ওর রাগ হয়ে গেল ভীষণ। ও বেশ চেঁচিয়ে বলল, "ভাল হবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি। অত বড় লোক—ছোটদের গায়ে হাত তুলতে লজ্জা করে না? ছোটলোক, অসভ্য।"

জয়কে রাগতে দেখে লোকটা বিশ্রীভাবে হেসে উঠে বলল, "অ্যা, রোগাপটকা ছোকরা, তার আবার তেজ দেখ। একটু দাঁড়াও, সব রাগ তোমাদের একেবারে ঠান্ডা করে দিচ্ছি। আর তোমাদের বাড়ি ফিরতে হবে না।"

বাড়ির কথা বলতেই জয়ের মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। ওর গলা ভার হয়েই ছিল, চোখ ছলছল করছিল, আর সামলাতে পাবল না নিজেকে, ওর চোখ থেকে দু ফোঁটা জল গাল গড়িয়ে মাটিতে পড়ল টপ টপ করে।

লোকটা দুর্বোধ ভাষায় একটা পাহাড়ী লোককে কী যেন বলল। লোকটা এগিয়ে এসে ওদের পকেটে হাত ঢুকিয়ে, কোমর টিপে সার্চ করতে শুরু করল। ওদের পকেটে টাকা-পয়সা, চকোলেট, রুমাল আর ডট পেন ছিল, লোকটা সে-সব কিছু নিল না, শুধু টাবলুর পকেট থেকে সতুদার লেখা চিঠিটা বার করে নিয়ে ওই লোকটাকে দিল।

লোকটা ছোট্ট চিঠিটা বারকয় পড়ে নিয়ে বলল, "এ চিঠি কার?"

টাবলু উত্তর দিল, "আমাদের।"

"তোমাদের?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু, এটা তো নেপালে যাবার চিঠি।"

"হ্যাঁ, আমরা নেপালেই যাচ্ছি। চিঠিটা সতুদা লিখে দিয়েছে। নেপালে আমার ছোটমামা থাকে।"

"এটা কি নেপালে যাবার রাস্তা?"

"এদিক দিয়েও যাওয়া যায় শুনেছি।"

"তা যায়, কিন্তু নেপাল যাবার জন্যে কেউ এখানে আসে না। রুটুংয়ে কেন গিয়েছিলে?"

"এমনি।"

"এমনি! এমনি-এমনি কেউ কোথাও যায় না। সত্যি করে বলো কেন গিয়েছিলে?"

"বলছি তো এমনি।"

"আবার এমনি! কথা কী করে বার করতে হয় আমি জানি।"

লোকটা খ্যাপা জন্তুর মতো টাবলুর দিকে এগোতেই টাবলুদের পেছন থেকে জড়ানো ভারি গলায় কে যেন বলে উঠল, "পল্, কাম হিয়ার।"

টাবলু, জয় আর শংকর তিনজনেই পেছন ফিরে দেখল, একদম পেছনদিকে চেয়ারে এক সাহেব বসে আছে। সাহেবের পরনে বুক-খোলা পাঞ্জাবি আর প্যান্ট। মুখে চাপ দাড়ি, মাথায় লম্বা চুল। সাহেবের মুখটা অসম্ভব লাল, হাতে একটা লম্বা সিগারেট।

পল্ নামে ওই বাঙালী লোকটা সাহেবের কাছে এগিয়ে গেলে সাহেব ওর হাত থেকে সতুদার লেখা চিঠিটা নিয়ে পড়ে কী যেন বলল ফিসফিস করে। শুনতে শুনতে পলের চোখমুখ চকচক করে উঠল। ও বলল, "রাইট, রাইট ম্যাক।"

একটু পরে লোকটা ফিরে এসে হাসিমুখে বলল, "তোমাদের কপাল খুব ভাল, সাহেব তোমাদের ছেড়ে দিতে বলেছে। শুধু ছেড়ে দেওয়াই নয়, একেবারে নেপালে পৌঁছে দেওয়া। আমরা নেপালে যাচ্ছি, তোমরাও যাবে আমাদের সঙ্গে। আমরা বিকেলে রওনা হব।"

শুনে ওরা তিনজনেই অবাক হয়ে গেল ভীষণ। জয় আর শংকর ঘুরে ঘুরে সাহেবকে দেখতে লাগল। ইশ্ কী ভাল লোক সাহেব! পুলিশ অফিসারের মতো একেও ধন্যবাদ জানাবার জন্য ছটফট করছিল শংকর আর জয়। কিন্তু, লাল টুকটুকে সাহেবের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে ওরা সাহস পাচ্ছিল না।

ওদের আবার কাল রাত্রের সেই ঘরটায় নিয়ে যাওয়া হল। তবে, এবার আর ঘরের দরজা বন্ধ করা হল না। ওদের পিছু-পিছু দুটো পাহাড়ী লোক এসে ঘরের মধ্যে বসে থাকল গ্যাট হয়ে। বসে আছে তো বসেই আছে, ওঠার আর নাম নেই। এরা যে পাহারাদার, ওদের তিনজনের কারোরই বুঝতে অসুবিধা হল না।

লোকদুটো বাংলা বোঝে না, কিন্তু কেউ মুখের সামনে চুপ করে বসে থাকলে কথা বলা যায়! ওদের তিনজনের কেউই কথা বলল না অনেকক্ষণ। বিপদ নেই জেনে জয় আর শংকরের মন বেশ হাল্কা হয়ে গেছে, কিন্তু টাবলুর মুখ অসম্ভব গম্ভীর। গম্ভীর মুখ করে তখন থেকে কী যেন ভেবে যাচ্ছে।

দুপুরে জয় চাপা গলায় টাবলুকে বলল, "ওই লোকটার গায়ের রং কালো কুচকুচে, অথচ সাহেবদের মতো নাম—পল্।"

টাবলু উত্তর দিল, "সাহেবী উচ্চারণে পল্, আসলে বোধহয় পল্ নয়।"

"কী তবে?"

"পাল, পদবী পাল।"

"আমরা তাহলে ওকে পালবাবু বলে ডাকব।"

জয়ের কথা শুনে টাবলু আর শংকর হেসে ফেলল। ধরা পড়ার পরে এই ওদের প্রথম হাসি। হাসির পরে আবার চুপচাপ।

বিকেলে পালবাবু এসে বলল, "চলো, এবার বেরোতে হবে।" বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনটে লোক মোটা কালো কাপড় দিয়ে ওদের চোখ বাঁধতে শুরু করল।

শংকর প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, টাবলু ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "যা করছে করুক, আপত্তি করে লাভ নেই।"

চোখ বাঁধা হয়ে গেলে লোক তিনটে ওদের হাত ধরে বাইরে নিয়ে এল। তিনজনের কেউই কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। তবে অনেকের কথা শুনতে পাচ্ছিল। সব মিলিয়ে বোধহয় জনাদশেক লোক হবে। বাইরে ঠান্ডা হাওয়া বইছে হু হু করে। এমন সময় ঘর্ঘর করে শব্দ উঠল, মনে হয় গুহার দরজা বন্ধ হচ্ছে। শব্দটা থামতেই একটু দূর থেকে পালবাবুর গলা শোনা গেল, "চলো এবার।" বলতেই ওদের হাত ধরে তিনটে লোক এগোতে লাগল সামনের দিকে।

সোজা রাস্তা ধরতে গেলে নেইই। চোখ-বাঁধা অবস্থায় উঁচু-নিচু পথ ভাঙতে ওদের কষ্ট হচ্ছিল খুব। টাবলু হঠাৎ পকেট থেকে একটা কমলালেবু বার করে খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে জয় আর শংকরকে বলল, "কমলালেবু আছে না তোদের কাছে?"

"আছে।"

"খা।"

"আমার খেতে ইচ্ছে করছে না," উত্তর দিল জয়।

"ইচ্ছে না হলেও খা।"

"কেন?" প্রশ্ন করল শংকর।

"কেন আবার, এমনি। সবগুলো খাবি, একটাও রাখিস না।"

টাবলুর বলার মধ্যে এমন কিছু ছিল যে, ওরা আর প্রতিবাদ করতে পারল না। পকেট থেকে কমলালেবু বার করল দুজনেই।

বহুক্ষণ ধরে চড়াই-উতরাই ভেঙে-ভেঙে ক্লান্ত হয়ে ওরা সমতলে এসে পৌঁছল। সোজা পথে কিছুটা হাঁটার পরে লোকগুলো ওদের চোখের বাঁধন খুলে দিল। কিন্তু, ওরা তক্ষুনি-তক্ষুনি তাকাতে পারল না, বাইরের আলোয় জ্বালা ধরে গেল চোখে। কিছুক্ষণ চোখ রগড়াবার পরে ওরা আস্তে-আস্তে সবকিছু দেখতে পেল আবার।

সামনে লম্বা পিচের রাস্তা। রাস্তার ওপরে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে। একটা ছোট, আর একটা বেশ বড়। ছোট গাড়িটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাহেব। পালবাবু বড় গাড়িটার দরজা খুলে টাবলুদের দিকে তাকিয়ে বলল, "উঠে পড় চটপট।" ওরা উঠে পড়ল। সঙ্গের লোকগুলো মুহূর্তের মধ্যে মালপত্র তুলে গাড়িতে উঠে বসতেই গাড়িদুটো ছুটতে লাগল শাঁ-শাঁ করে।

টাবলু জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে চারদিক দেখছিল। পালবাবু বলল, "বাইরে তাকিও না। সিটে বসে থাক চুপ করে।" টাবলু কোনো উত্তর না দিয়ে যেমনভাবে দেখছিল সেইভাবেই দেখতে লাগল। পালবাবু হঠাৎ ড্রাইভারকে কী যেন বলতেই ড্রাইভার ঘ্যাঁচ করে গাড়ি থামিয়ে দিল।

পালবাবু গম্ভীর গলায় টাবলুদের বলল, "যাও তোমরা ভেতরে গিয়ে বোসো।"

গাড়িটা অনেকটা ভ্যানের মতো দেখতে। পেছনে লম্বা-লম্বা সিট, কিন্তু একটাও জানালা নেই। ওরা সেখানে বসতেই পালবাবু একটা ফ্লাস্ক খুলে তিন গ্লাস দুধ ঢেলে ওদের দিকে এগিয়ে দিয়ে খুব নরম গলায় বলল, "দুধটা খেয়ে নাও। গাড়ি এখন একটানা অনেকক্ষণ চলবে, না খেলে কষ্ট পাবে।"

টাবলু রাগের ভঙ্গিতে উত্তর দিল, "আমরা ছেলেমানুষ নই। দুধ খাই না।"

পালবাবু কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল, তারপর আরও নরম গলায় বলল, "কে বলল ছেলেমানুষরাই শুধু দুধ খায়, বড়রাও খায়। তোমাদের খাওয়া হয়ে গেলে আমরাও খাব। নাও, শিগগির খেয়ে নাও।"

টাবলু একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে গ্লাস তুলে নিয়ে চোঁ করে দুধটা খেয়ে ফেলল। দেখাদেখি জয় আর শংকরও খেল। পালবাবু মুচকি হেসে ফ্লাস্কের মুখ বন্ধ করল, নিজেরা আর খেল না। গাড়ি আবার ছুটতে লাগল শাঁ-শাঁ করে।

একটু পরেই টাবলু, জয় আর শংকরের প্রচন্ড ঘুম পেয়ে গেল। এত ঘুম যে চোখের পাতা টেনে রেখেও ওরা জেগে থাকতে পারছিল না। এখন তো সবে সন্ধে, এত ঘুম তো ওদের পাবার কথা নয়! এক এক করে তিনজনই লম্বা সিটের ওপর

শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

৫

সবার আগে ঘুম ভাঙল শংকরের। চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ওর চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। চারদিকের কিছুই ও চিনতে পারল না। গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়ার কথা মনে পড়তেই ও লাফিয়ে উঠে টাবলু আর জয়কে তুলে দিল। টাবলু আর জয় ওর দুপাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। চারদিকে তাকিয়ে ওরাও চমকে গেল ভীষণ। ছিল গাড়িতে, ঘরের মধ্যে এল কখন!

ঘরটা সাজানো গোছানো, কাচের জানলা দিয়ে একটু দূরের পাহাড় দেখা যাচ্ছে। টাবলু প্রায় ছুটে গিয়ে ঘরের দরজা খুলতে গেল, পারল না, বাইরে থেকে দরজা বন্ধ। ঘটনাটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না ওরা। এখন সকাল আটটা, কাল সন্ধেবেলায় ঘুমোবার পরে এত কান্ড ঘটে গেছে! ঘুমোবার পরে কেউই আর জাগেনি, তার মানে ঘুমন্ত অবস্থায় ওদের ঘরে তুলে আনা হয়েছে। এ-ঘরটা ওরা জীবনে দেখেনি, জানলা দিয়ে বাইরের যা-কিছু দেখা যাচ্ছে সবই অপরিচিত। ওরা তাহলে এখন কোথায়! কী উদ্দেশ্যেই বা ওদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছে?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে টাবলু বলল, "আমাদের এখানে নিয়ে আসা হবে বলেই কাল দুধ খাওয়ানো হয়েছিল।"

"দুধ?"

"হ্যাঁ, দুধের মধ্যে নির্ঘাত ঘুমের ওষুধ মেশানো ছিল।"

"ঘুমের ওষুধ!"

"ওষুধ না খেলে আমরা কেউই এভাবে ঘুমোতাম না।"

শংকর কী যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই দরজা খুলে গেল খুট করে। পালবাবু। পালবাবু হাসি-হাসি মুখ করে জিজ্ঞেস করল, "কী, ঘুম ভাঙল?"

টাবলু ওর কথার উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করল, "আমাদের কোথায় আনা হয়েছে?"

"কোথায় মানে?"

"মানে, এ-জায়গাটার নাম কী?"

"ওহো, সেটাও তোমরা জানতে পারনি। এটাই তো নেপাল।"

"নেপাল!"

শুনে টাবলু বিস্মিত হল, কিন্তু জয় আর শংকরের মুখ ঝলমল করে উঠল খুশিতে। টাবলু বলল, "নেপালে যখন এসেছি, তখন আর আমাদের আটকে রাখছেন কেন? ছেড়ে দিন এবার।"

পালবাবু হ্যা হ্যা করে হেসে বলল, "কে বলল আটকে রেখেছি, হাত মুখ ধোও, খাওয়া দাওয়া কর, তারপর তো যাবে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।"

বলে পালবাবু চলে গেল। লোকটাকে জয় আর শংকরের এখন আর খুব একটা খারাপ লাগছিল না। লোকটা ওদের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করেছিল সত্যি, তবে এখন মনে হয়, ও ওর ভুল বুঝতে পেরেছে। কিন্তু টাবলুদার মুখ এত গম্ভীর কেন?

আধঘণ্টার মধ্যে ওরা জামাকাপড় পরে তৈরি হয়ে গেল। তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকল পালবাবু, ওর পেছন-পেছন একটা লোক, লোকটার হাতে মস্ত একটা প্যাকেট। প্যাকেট খুলে পালবাবু তিনটে চমৎকার কোট তিনজনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নাও, পরে নাও। দেখ তো কেমন হয়েছে?"

টাবলু বলল, "আপনাদের কোট আমরা নেব কেন?"

"আরে বাবা, এগুলো আমাদের নয়, তোমাদের।"

"আমাদের!"

"হ্যাঁ তোমাদের। কাল যা ঘুমোচ্ছিলে, তাই ঘুমের মধ্যেই দর্জি মাপ নিয়ে গিয়েছিল, আর্জেন্ট অর্ডার।"

"আমাদের জন্যে হঠাৎ কোট বানাতে গেলেন কেন?"

"আমি বানাতে বলিনি।"

"কে বলেছে?"

"সাহেব। সাহেব আমাদের বস্। সাহেবের খুব ভাল লেগে গেছে তোমাদের। ভালবেসে কেউ কিছু দিলে নিতে হয়। নাও, তাড়াতাড়ি পরে নাও।"

টাবলু একটু ইতস্তত করে কোটটা গায়ে চাপাল। ওকে পরতে দেখে জয় আর শংকরও পরল। কোটগুলো কী সুন্দর দেখতে আর কী চমৎকার ফিটিংস। শংকরের ভীষণ ইচ্ছে করছিল ওদিকের আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। কিন্তু, লজ্জা করছিল বলে যেতে পারল না। জয়েরও লজ্জা করছিল, তবে তার কারণ অন্য। কোটটা গায়ে দিয়ে ওর ভীষণ ভারি-ভারি ঠেকছিল। রোগা পটকা বলে ওর মনে মনে দুঃখ আছে খুব, এখন যদি বলে কোটটা ভীষণ ভারি, তাহলে এক্ষুনি সবাই ওকে নিয়ে হাসাহাসি করবে।

ঘরের লাগোয়া আর একটা ঘর। সেই ঘরে ঢুকতেই দেখে টেবিলে খাবার সাজানো। লোকটা ওদের বসতে বলে নিজেও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। ডবল ডিমের পোচ, টোস্ট আর কর্নফ্লেকস। কাল রাত্রে দুধ ছাড়া আর কিছুই খাওয়া হয় নি, একবার বলতেই ওরা তিনজনে খেতে শুরু করে দিল।

খাওয়া হয়ে গেলে চা এল, চা খেতে-খেতে লোকটা বলল, "শোনো, হঠাৎ একটা জরুরী দরকার পড়ে গেছে, এক জায়গায় যেতে হবে আমাকে। তোমরাও চলো আমার সঙ্গে। ফিরে এসে তোমাদের ছোটমামার বাড়িতে পৌঁছে দেব।"

টাবলু বলল, "পৌঁছে দেবার দরকার নেই, আমরা নিজেরাই চিনে যেতে পারব। আপনি আপনার কাজে যান, আমরা চলে যাই।"

"তাই কখনও হয় নাকি, অচেনা-অজানা জায়গা, কোত্থেকে কী হয়!"

"না, কোনো অসুবিধে হবে না। আমরা ঠিক চিনে যেতে পারব।"

"তা ঠিক। কিন্তু সাহেব যে তোমাদের সঙ্গে একবার দেখা করতে চান।"

"কেন?"

"কেন আবার, এমনি। তোমাদের ভাল লেগে গেছে তাই।"

"কোথায় আছেন সাহেব?"

"যেখানে যাচ্ছি, সেখানেই।"

"কদ্দুর?"

"বেশি দূর নয়। ওখান থেকে তোমাদের ছোটমামার বাড়িও কাছে হবে।"

বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে, তারপর কোট উপহার দেবার ফলে ওই সাহেবের ওপর জয় আর শংকরের বেশ দুর্বলতা এসে গেছে। সাহেব খুব ভাল, ওদের জন্যে এত করলেন, আর ওরা তাঁর সঙ্গে একটু দেখাও করবে না? শংকর হঠাৎ ওদের কথার মধ্যে ঢুকে পড়ে বলল, "টাবলুদা, চল না একটু দেখা করেই আসি।"

পালবাবু হেসে বলল, "বাহ্, এই তো গুড বয়ের মতো কথা।"

টাবলুর মুখ দেখেই বোঝা গেল, হঠাৎ আগ বাড়িয়ে এভাবে কথা বলার জন্যে শংকরের ওপর মনে মনে ও চটে গেছে খুব। কিন্তু রাগ না দেখিয়ে ও গম্ভীরভাবে পালবাবুকে বলল, "ঠিক আছে, চলুন।"

রাস্তায় বেরিয়ে পালবাবু বললেন, "আর একটা দরকারি কথা, আমরা বাসে চেপে যাব, বাসের মধ্যে তোমরা কিন্তু আমার সঙ্গে

একটাও কথা বলবে না। এমনভাবে যাবে যেন তোমাদের সঙ্গে আর কেউ নেই। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তাহলেও বলবে না। বলবে, তোমরা তিনজনে নেপালে বেড়াতে এসেছিলে, এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছ।"

টাবলু বলল, "কিন্তু আমরা তো বাড়ি ফিরে যাচ্ছি না, আর নেপালও আমাদের দেখা হয়নি।"

"আরে বাবা, এটুকু বানিয়ে বলতে পারবে না? না বললে...।"

"না বললে?"

"না বললে আমরা সবাই বিপদে পড়ব।"

"কেন?"

"পরে বলব। আর এই নাও তোমাদের সতুদার চিঠি, কাস্টমসের লোকেরা দেখতে চাইলে দেখিয়ে দিও।"

"কাস্টমস কেন? আমরা কি সত্যি সত্যিই বাড়ি ফিরে যাচ্ছি?"

"আরে বাবা, বাড়িই যদি ফিরে যাবে তাহলে তোমাদের আর নেপালে আনা হল কেন? ইন্ডিয়া বর্ডারে আমার একটু দরকার আছে, সাহেবও আছেন ওখানে, পাঁচ মিনিট কথা বলবে, তারপর আমরা সোজা তোমাদের ছোটমামার বাড়িতে চলে যাব। ওখান থেকে একটা শর্ট কাট রাস্তা আছে।"

লোকটার কথা শুনে টাবলু আরও গম্ভীর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ হাঁটার পরে দেখা গেল, দূরে একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা বলল, "ওই বাসটায় উঠবে। এই নাও তোমাদের বাসের টিকিট, এই টাকাগুলোও রাখ তোমাদের সঙ্গে।"

"টাকা কেন?" জিজ্ঞেস করল টাবলু।

লোকটা একটু হেসে বলল, "রাস্তায় কিছু খেতে-টেতে ইচ্ছে করলে খাবে।"

টাবলু টিকিট তিনটে লোকটার হাত থেকে নিয়ে দেখতে দেখতে বলল, "টাকা রেখে দিন, লাগবে না।"

টাকা নেবার জন্যে লোকটা আরও কয়েকবার সাধাসাধি করল, কিন্তু টাবলু নিল না। লোকটা তখন টাকাগুলো পকেটে ঢুকিয়ে রেখে বলল, "তাহলে আর দেরি কোরো না, যাও, বাসে গিয়ে উঠে পড় আমি আসছি পেছন-পেছন। মনে থাকে যেন, বাসের মধ্যে তোমরা আমাকে চেন না।"

মাথা নেড়ে ওরা বাসের দিকে হাঁটতে লাগল। জয় একবার পেছন ফিরে দেখল, লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে।

রাস্তাটা খুব একটা চওড়া নয়, কিন্তু বেশ পরিষ্কার, গর্ত-টর্ত নেই কোথাও। ডানদিকে পাহাড়, বাঁ দিকে সামান্য নিচু খাদ। খাদের ওপাশে প্যাগোডার মত বাড়ি, ওখান থেকেই বোধ হয় ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছে।

বাসের কনডাকটরকে টিকিট দেখাতেই লোকটা ওদের বসার জায়গা দেখিয়ে দিল। ড্রাইভারের পেছনে পাশাপাশি তিনটে সিট ওদের। বাসটা যাত্রীতে বোঝাই হয়ে গেছে প্রায়। শংকর মুখ ঘুরিয়ে যাত্রীদের দেখতে-দেখতে হঠাৎ চমকে উঠল। ওই লোক দুটো না? হ্যাঁ, ওই লোকদুটোই তো কাল ঘরের মধ্যে ওদের পাহারা দিচ্ছিল। টাবলু আর জয়কে বলতেই ওরাও লোকদুটোকে দেখল। টাবলু কোনো মন্তব্য করল না। জয় বলল, "মনে হচ্ছে ওরাই, কিন্তু...।"

একটু পরে ড্রাইভার কয়েকবার হর্ন বাজিয়ে বাস ছেড়ে দিল। কিন্তু, পালবাবু কোথায়? ওরা তিনজনে মুখ ঘুরিয়ে তাকাতেই দেখল, ওদের ঠিক পেছনের সিটে পালবাবু গম্ভীর হয়ে বসে আছে। কখন এসে বসেছে, ওরা কেউই দেখতে পায়নি।

বাস স্টার্ট নিয়েই টেনে ছুটতে লাগল। রাস্তায় লোকজন বিশেষ নেই। জানলা দিয়ে রোদ্দুর এসে পড়েছে গায়ে, মিষ্টি রোদ্দুর। জয় পকেট থেকে চকোলেট বার করে শংকর আর টাবলুকে দিয়ে নিজে একটা মুখে পুরে দিল।

আধ ঘণ্টাটাক ছোটার পরে বাসটা একটা কাঠের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়াতেই বাসের দরজা খুলে খাকি-জামা-পরা দুটো লোক উঠে এল ভেতরে। রুটুং যাবার পথে বাসে চেকিং হয়েছিল। লোক দুটোকে দেখেই জয় আর শংকর বুঝতে পারল যে, এরা কাস্টমসের লোক। লোকদুটো বাসের মালপত্তর আর যাত্রীদের চেক করে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। ওদের একবার দেখে নিয়ে ব্যাগ তিনটে ওপর-ওপর একটু টিপে নেমে গেল বাস থেকে। ওরা নেমে যাবার পরে বাস আবার ছুটতে লাগল সামনের দিকে।

এবার সোজা রাস্তা কম। খালি বাঁক আর বাঁক। ড্রাইভার অনবরত স্টীয়ারিং ডানদিকে বাঁদিকে ঘোরাচ্ছে। এত বাঁক যে মাথা ঝিমঝিম করছিল জয় আর শংকরের।

ঘন্টাদেড়েক পরে আবার একটা চেক পোস্ট এল। এবার কাস্টমসের লোকেরা প্রথমেই এল টাবলুদের কাছে। একজন অফিসার গোছের লোক ওদের দিকে তাকিয়ে ইংরেজীতে বলল, "তোমরা কোত্থেকে আসছ?"

টাবলু কোনো উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে সতুদার লেখা চিঠিটা বার করে এগিয়ে দিল। চিঠিটা পড়ে অফিসার চলে যাচ্ছিল, টাবলু হঠাৎ বলল, "আমি একটু নীচে নামতে পারি?" অফিসার বলল, "ও, ইয়েস।"

টাবলু নেমে গিয়ে ওদিকের ছোট্ট একটা খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়াল। মিনিট পাঁচেক পরে শালপাতার ঠোঙায় খাবার নিয়ে ফিরে এল। খাবার দেখে জয় আর শংকর খুশি হয়ে ঠোঙায় হাত দিতেই টাবলু ফিস ফিস করে বলল, "পচা খাবার, খাস না। হাতে নিয়ে খাওয়ার ভান কর, তারপর লুকিয়ে-লুকিয়ে জানলা দিয়ে ফেলে দিবি।"

টাবলুর কথা শুনে জয় আর শংকর অবাক হয়ে গেল। শংকর বলল, "পচা খাবার যখন, কিনলি কেন?"

টাবলু গলা আরও নামিয়ে বলল, "আমি তো সত্যি-সত্যি খাবার কিনতে যাইনি, খবর আনতে গিয়েছিলাম, খবর পেয়েছি।"

"কী খবর?"

"পরে বলব।"

চেকিং হয়ে গেলে বাস আবার দৌড়তে লাগল। বাসের গোঁ গোঁ শব্দ আর থরথর কাঁপুনির মধ্যে টাবলু খুব নিচু গলায় জয় আর শংকরকে বলল, "ঘন্টাখানেক পরে আর একটা চেক পোস্ট আসবে, ওটাই নেপালের শেষ চেক পোস্ট; চেক পোস্টে আমি যা করব, তোরাও তাই করবি, ক্যাবলার মতো বসে থাকিস না।"

কেন? কী ব্যাপার? এ-সব প্রশ্ন তুলল না জয় আর শংকর। টাবলুদার থমথমে মুখ দেখেই ওরা বুঝতে পেরেছে যে, ও এখন এ-নিয়ে আর একটা কথাও বলবে না। খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতেও সাহস হচ্ছিল না ওদের, কারণ ঠিক পেছনের সিটেই বসে আছে ওই লোকটা। বাস যত এগোচ্ছিল, জয় আর শংকরের কৌতূহল উত্তেজনা আর উদ্বেগ বেড়ে যাচ্ছিল তত।

চেক পোস্টের সামনে এসে বাসটা থেমে গেল। কিন্তু, কই, টাবলুদা তো কিছুই করছে না। ওর মুখটা অসম্ভব গম্ভীর আর লালচে হয়ে উঠেছে। কাস্টমসের চারজন লোক উঠে পড়েছে বাসে। দুজন চেক করছে বাসের পেছনে, আর দুজন সামনে। চারজনই মনে হয় নেপালী। একটা লোক চেক করতে করতে ওদের সামনে আসতেই টাবলু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে লোকটার পেটে টেনে এক ঘুষি মারল। লোকটা উফ্ করে বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বাসের মধ্যে শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড হৈ-চৈ। কাস্টমসের বাকি তিনটে লোক ছুটে এল ওদের কাছে। আসতেই টাবলু

ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘুষি চালাতে লাগল। কিন্তু, একা তিনজনের সঙ্গে পারবে কী করে! ওরা ধরে ফেলল টাবলুকে।

পুরো ঘটনাটা এতই আকস্মিক যে জয় আর শংকর পাথরের মতো হয়ে গিয়েছিল। ওই লোকগুলো যখন টাবলুকে টেনে-হিঁচড়ে বাস থেকে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ জয় আর শংকরের টাবলুর শেষ কথাটা মনে পড়ে গেল, "আমি যা করব, তোরাও তাই করবি।" মনে পড়তেই ওরা লাফিয়ে পড়ল ওই লোকগুলোর ওপর। শংকর টাবলুকে ছাড়াবার চেষ্টা করল, আর জয় যে-লোকটা টাবলুর হাত ধরেছিল তার হাত কামড়ে দিল জোরসে। লোকটা আহ্ বলে এক ঝটকা মারতেই জয় ছিটকে পড়ল বাসের দরজার ওপর। ওর মাথাটা দরজায় ঠুকে গেল ঠকাস করে।

জয় আর শংকরকেও ধরে ফেলল কাস্টমসের লোকেরা। তারপর ওদের তিনজনকেই টানতে টানতে নিয়ে যেতে লাগল। একটু দূরে একটা বাড়ি, বাড়ির সামনে দুজন পুলিশ রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে. সেইদিকেই টাবলুদের নিয়ে যাচ্ছিল ওরা।

পালবাবু হঠাৎ ছুটে এসে পাহাড়ী ভাষায় কাস্টমসের লোকদের কী-সব বলতে শুরু করে দিল। পালবাবুকে দেখেই টাবলু চেঁচিয়ে উঠল, "ধরুন, অ্যারেস্ট হিম।" লোকগুলো টাবলুর কথাকে পাত্তাই দিল না।. টানতে টানতে ওদের নিয়ে চলল ওই বাড়িটার দিকে।

জয় আর শংকর পেছন ফিরে পালবাবুকে আর দেখতে পেল না। বাড়িটায় ঢুকতেই একটা বড় ঘর। ঘরে একজন হোমরা চোমরা পুলিশ অফিসার সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে বসে। কাস্টমসের লোকগুলো অফিসারকে উত্তেজিত হয়ে কী-যেন বলতেই অফিসার চোখ পাকিয়ে টাবলুদের দিকে তাকিয়ে গরগর করে বলল. "য়্যু লিটল রাফিয়ান্স. আইল মেন্ড য়্যু।"

টাবলু ঠান্ডা গলায় বলল. "জাস্ট এ মিনিট।" বলেই ওর গায়ের কোটটা খুলে ফেলল. তারপর প্যান্টের পকেট থেকে বার করল নেল কাটার। নেল কাটারের সঙ্গে লাগানো একটা ছোট্ট ছুরি। কোটটা টেবিলের ওপর পেতে টাবলু ওই ছুরি দিয়ে কোটের কলার চিরে ফেলল, সঙ্গে সঙ্গে চকচকে বিস্কুটের মতো কয়েকটা জিনিস ঠকঠক করে পড়ল টেবিলের ওপর। ওগুলো দেখেই চমকে লাফিয়ে উঠে অফিসার বলল. "গোল্ড বিস্কিট!"

সোনার বিস্কুট দেখে কাস্টমসের লোকগুলো অবাক হয়ে গেল। জয় আর শংকরও থ।

টাবলু দু-চার কথায় অফিসারকে ঘটনাটা জানিয়ে বলল, "আগে ওই লোকটাকে ধরুন, পরে সব খুলে বলব।" শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই অফিসার কোমর থেকে পিস্তল বার করে ইঙ্গিতে ওদের সঙ্গে আসতে বলে ছুটে বেরিয়ে গেলেন রাস্তায়। রাস্তায় নেমেও ছুট।

বাসে পালবাবুকে পাওয়া গেল না. পাওয়া গেল না ওই দুটো পাহাড়ী লোককেও। ধারে কাছে কোথাও নেই। এই তো একটু আগেও ছিল, এর মধ্যে একেবারে হাওয়া হয়ে গেল! অফিসার বলল, "যাবে কোথায়, ঠিক ধরে ফেলব। লোকগুলোর আইডেনটি-ফিকেশন মার্ক বলো। দেখতে কেমন? কী ধরনের জামাকাপড় পরে আছে?"

টাবলু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব বলতে লাগল। অফিসার মনোযোগ দিয়ে শুনতে-শুনতে ফিরে এলেন তাঁর টেবিলে। টাবলু যখন পালবাবু আর ওই পাহাড়ী লোক দুটোর জামা-কাপড়ের বর্ণনা দিচ্ছিল, তখন জয় উত্তেজিত হয়ে বলল, "ওরা কিন্তু ছদ্মবেশ ধরতে পারে।"

অফিসার জয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হোয়াট বেশ?"

শুনে জয় খুব বিব্রত হয়ে দুবার বলল, "ছদ্মবেশ, ছদ্মবেশ।"

কিন্তু অবাঙালী অফিসারের মুখ দেখে বোঝা গেল উনি শব্দটার মানে ধরতে পারেননি। জয় তখন ফিসফিস করে টাবলুকে জিজ্ঞেস করল, "এই টাবুলদা, ছদ্মবেশের ইংরেজী কী রে?"

টাবলু একটু হেসে ফেলে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল অফিসারকে। অফিসার মোটামুটি কাজ চালাবার মতো বাংলা জানেন। টাবলু ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে কথা বলছিল অফিসারের সঙ্গে।

সব শুনে অফিসার পরপর চারটে ফোন করে টাবলুকে বললেন, "এই এলাকা থেকে বেরোবার সব কটা রাস্তায় পাহারা বসে যাচ্ছে এক্ষুনি। ঠিক ধরে ফেলব লোকগুলোকে।"

জয় আর শংকরের কোটের কলার কাটতেও অনেকগুলো সোনার বিস্কুট বেরিয়ে পড়ল। অফিসার বিস্কুটগুলোকে থাক থাক করে সাজিয়ে রাখলেন টেবিলের ওপর। চকচকে বিস্কুট-গুলোর গা থেকে আলো ঠিকরে পড়ছিল।

সোনার বিস্কুটের ছোট্ট পাহাড়ের সামনে বসে টাবলু, জয় আর শংকর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ঘটনাটা অফিসারকে বলল। শুনতে শুনতে অফিসার কী সব নোট করলেন, তারপর বললেন, "আচ্ছা, কাল বিকেলবেলায় তোমাদের যেখান থেকে গাড়িতে তোলা হয়েছিল, সেই জায়গাটার নাম জানতে পেরেছ কেউ?"

টাবলু বলল, "জায়গাটার নাম মনে হয় থাংপা।"

"কী করে জানলে?"

"আমাদের গাড়িতে তোলার পরে আমি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রেখেছিলাম। গাড়ি কিছুটা যাবার পরে একটা পেট্রল পাম্প পড়েছিল। সাইন বোর্ডে ঠিকানার জায়গায় লেখা ছিল থাংপা।"

অফিসার উত্তেজিত হয়ে বললেন, "গুড। আমরা এক্ষুনি ওখানে যাব। ওদের হাইড আউট, মানে যেখানে তোমাদের আটকে রেখেছিল, সেই জায়গাটা চিনতে পারবে?"

টাবলু উত্তর দিল, "বোধহয় পারব।"

অফিসার বললেন, "বাই দি ওয়ে, তোমার ছোটমামার ফোন নাম্বারটা দাও। খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি, বিকেলের দিকে তিনি এখানে চলে আসবেন। বাই দিস টাইম...নাউ, রাশ।"

মিনিট তিনেকের মধ্যে পুলিশ বোঝাই দুটো জীপ ছুটতে লাগল থাংপার দিকে। প্রথম জীপে সামনের সিটে পুলিশ অফিসার আর টাবলুরা। অফিসার নিজেই জীপ চালাচ্ছিলেন। জীপ দুটো ছুটছিল ঝড়ের মতো।

ঘণ্টা আড়াই এক নাগাড়ে জীপ ছুটে থাংপা পেট্রল পাম্পের সামনে এসে দাঁড়াল। টাবলু বলল, "এবার সোজা চলুন, আস্তে আস্তে।" আরও কিছুটা জীপ এগোবার পরে টাবলু বলল, "ওই তো সেই তিনটে গায়ে-গায়ে লাগানো গাছ, এখানে, এখানেই থামুন।" গাড়ি থামবার সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশরা টকাটক লাফ মেরে নেমে পড়ল রাস্তায়। টাবলুরাও নামল।

রাস্তার দুদিকেই ঠিক একই ধরনের মাঠ। টাবলু ডান-দিকের রাস্তায় নেমে পড়ল। ওর পাশে অফিসার, জয় আর শংকর, পেছন-পেছন পুলিশরা। মাঠটা সোজা চলে গেছে জঙ্গলের দিকে। জঙ্গলের সামনে থমকে দাঁড়াল টাবলু। এই পর্যন্ত ওর দিব্যি মনে আছে, কিন্তু বাকি পথটা তো ওদের চোখ বেঁধে আনা হয়েছিল। টাবলু প্রথমে ডানদিকে গেল, কিছুটা যাবার পরে ফিরে এল। ফিরে এসে সোজা হাঁটতে লাগল, কিন্তু কিছুক্ষণ হাঁটার পরে ফিরে এল আবার। এবার বাঁ দিকে, বাঁ-দিকের পথটা ভীষণ উঁচু-নিচু। ওই পথ ধরে কিছুটা যাবার পরে টাবলু হঠাৎ ছুটে গিয়ে কী যেন একটা কুড়িয়ে নিয়ে জ্বলজ্বলে মুখ করে বলল, "হ্যাঁ, এই দিকেই আসুন।"

টাবলুর হাতে এক টুকরো কমলা লেবুর খোসা। খোসাটা দেখেই জয় আর শংকর বুঝতে পারল, কেন ওদের চোখ বেঁধে নিয়ে আসার সময় টাবলুদা কমলালেবুগুলো খেতে বলেছিল। রাস্তায় পড়ে-থাকা কমলালেবুর খোসাগুলো পথ চেনার চিহ্ন।

কমলালেবুর খোসা দেখে দেখে উঁচু-নিচু ঘোরানো পথ ধরে ওরা এক সময় গুহাটার সামনে এসে হাজির হল। অফিসার ইঙ্গিত করতেই পুলিশরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল গুহাটা। গুহার দরজা খোলার কায়দাটা টাবলু আগেই দেখে রেখেছিল। বোতাম টিপতেই ঘর্ঘর শব্দ তুলে খুলে গেল দরজা। কিন্তু, ঘরের মধ্যে তো কেউ নেই, পাশের ঘরটাও ফাঁকা। অফিসার দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "খবর পেয়ে গেছে মনে হয়, সব কটা পালিয়েছে।"

কিন্তু, এখানে আর একটা ঘর আছে, সেই ঘরটা গেল কোথায়! ঘুলঘুলি দিয়ে পালাবার সময় ঘরটা দেখতে পেয়েছিল টাবলু। ঘরে ছিল প্যাকিং বাক্স আর ঝুড়ি। টাবলুর কথামতো একজন ঘুলঘুলিতে উঠে উঁকি মেরে দেখল, হ্যাঁ সত্যিই ঘর আছে। ঘর আছে অথচ দরজা নেই, এমন তো হতে পারে না!

এই ঘরের মধ্যে একটা কাঠের আলমারি আছে, আলমারিতে কিছু নেই। আলমারির ভেতরের দেয়ালটা অফিসার লাঠি দিয়ে ঠুকে বললেন, "এটা পাথর নয় কাঠ, কাঠটা খুলে ফেল।" কাঠটা খুলতেই ছোট্ট একটা দরজা বেরিয়ে পড়ল।

হাতে পিস্তল নিয়ে সবার আগে ওই ঘরে ঢুকলেন অফিসার, পেছন-পেছন বাকি সবাই। এ ঘরেও কেউ নেই, শুধু কতগুলো কাঠের বাক্স আর ঝুড়ি আছে। বাক্সের ডালা খুলে দেখা গেল চায়ের পাতা। ঝুড়ির মধ্যে কমলালেবু। অফিসার গম্ভীরভাবে চায়ের পাতা আর কমলালেবু পরীক্ষা করে হুকুম দিলেন, ঝুড়ি-বাক্সগুলো উলটে দাও।

একটা চায়ের বাক্স মেঝেতে উপুড় করে দিতেই কী যেন চিকচিক করে উঠল চায়ের মধ্যে। হাতে নিয়ে দেখা গেল, ওগুলো সোনার বিস্কুট। কমলালেবুর ঝুড়ি ওলটাতেই বেরিয়ে এল ক্যামেরা আর ঘড়ি। কোনো বাক্সেই শুধু চা নেই, কোনো ঝুড়িতেই শুধু কমলালেবু নেই। দেখতে দেখতে একটা খালি চায়ের বাক্সের অর্ধেক ভরে গেল চোরাই ঘড়ি, ক্যামেরা আর সোনার বিস্কুটে। উত্তেজনায় কারও মুখে কোনো কথা নেই, অত শীতের মধ্যেও অফিসারের কপাল ভিজে, গেছে ঘামে। বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছে টাবলু, জয় আর শংকর। ওরা নিজেদের চোখগুলোকেও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিল না।

অফিসার ওই গুহায় চারজন পুলিশকে লুকিয়ে থাকতে বললেন। চোরাকারবারীরা যদি আসে, ধরবে। হাতঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে অফিসার টাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "চলো, এবার আমরা যাই।"

একজন পুলিশ ঘড়ি-ক্যামেরা-সোনার বিস্কুটের বাক্সটা মাথায় তুলে নিল। তারপর, চারজন বাদে বাকি সবাই বেরিয়ে পড়ল গুহা থেকে।

এতক্ষণ সময় যে কী ভাবে কেটে গেল, কেউই ঠিক বুঝতে পারছিল না। খালি উত্তেজনা, উত্তেজনা আর উত্তেজনা। ওরা যখন আবার চেক পোস্টে পৌঁছল, তখন সন্ধে হয়ে গেছে। অফিসারের ঘরে ঢুকতেই টাবলু দেখল ছোটমামা বসে আছে। ছোটমামা ওকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। ছোটমামার চোখমুখ

দেখলেই বোঝা যায় এতক্ষণ ধরে উনি ভীষণ চিন্তা করছিলেন। ছোটমামা বললেন, "যা খুশি কর তোরা, কিন্তু বাড়ির লোকদের একটা খবর তো দিবি। বাড়ির লোকেরা দুশ্চিন্তায় ছটফট করছে।"

টাবলু লাজুক মুখে কী যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই অফিসার ছোটমামাকে বললেন, "বকবেন না ওদের। ওরা যা করেছে তার তুলনা নেই। গত দশ বছরের মধ্যে এত বড় চোরাচালান আমরা ধরতে পারিনি। বসুন, সব বলছি, কফি খান।"

ছোটমামা একটু হেসে বসলেন, তারপর টাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "একটু আগে এখান থেকেই ট্রাঙ্ক কলে বাড়ির লোকদের জানিয়ে দিয়েছি যে, মূর্তিমানরা সব বহাল তবিয়তে আছে। কাল সকালের ফ্লাইটেই তোদের বাড়ি পাঠিয়ে দেব।"

টাবলু বলল, "কক্ষনো না। বাড়ির লোকেরা যখন খবর পেয়ে গেছে তখন আর অত তাড়াহুড়োর কী আছে। নেপালে এসে নেপাল না দেখে গেলে লোকে বলবে কী।"

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার কানে লাগিয়ে কী শুনে প্রচণ্ড খুশি হয়ে উঠলেন অফিসার। পাহাড়ী ভাষায় কথা বলতে বলতে হঠাৎ মাউথপীসে হাত চাপা দিয়ে টাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "দ্যাট পল্ হ্যাজ বীন অ্যারেস্টেড।"

কথা শেষ করে রিসিভার নামিয়ে রেখে অফিসার বললেন, "ধরা পড়ে গেছে লোকটা, এখানে নিয়ে আসতে বলে দিয়েছি, এক্ষুনি এসে যাবে।"

একটু পরেই সবার জন্যে কফি আর গরম গরম পকৌড়া এসে গেল। কফি খেতে খেতে অফিসার টাবলুদের অ্যাডভেঞ্চারের গল্প রসিয়ে রসিয়ে শোনাতে লাগলেন ছোটমামাকে। গল্পও শেষ হল আর অমনি টাবলুদের পেছনে খটাশ খটাশ করে ভারি বুটের শব্দ উঠল। সবাই তাকিয়ে দেখে দুজন কনস্টেবলের সঙ্গে পালবাবু। পালবাবুর হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি। পালবাবু হিংস্র চোখে টাবলুর দিকে তাকাতেই টাবলু ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলল, "কী পালবাবু, চিনতে পারছেন?"

পালবাবুর চোয়ালদুটো অনবরত ওঠানামা করছিল, চাপা গলায় উত্তর দিলে, "তোমাদের আমি প্রথমদিনই চিনতে পেরেছিলাম, সেই জন্যেই শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম একেবারে, তা না সাহেবের মাথায় বুদ্ধি খেলল, তোমাদের দিয়ে কাজ হাসিল করাবে। এখন বোঝো ঠ্যালা!" পালবাবু কথাগুলো এমনভাবে বলল যেন ও নয়, সাহেবই ধরা পড়েছে।

অফিসার গম্ভীরভাবে বললেন, একে এখন লক-আপে ঢোকাও। পালবাবুকে কনস্টেবলরা লক-আপে নিয়ে গেল। ছোটমামা বললেন, "তাহলে এখন আমরা চলি। অনেক দূর যেতে হবে।"

অফিসার "ও কে" বলে হ্যান্ডশেক করলেন ছোটমামার সঙ্গে, তারপর টাবলুদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। এক-এক করে টাবলু, জয় আর শংকর তিনজনেই হ্যান্ডশেক করল অফিসারের সঙ্গে।

ছোটমামার সঙ্গে গাড়ি ছিল। ড্রাইভারের পাশে বসল ছোটমামা, পেছনের সিটে টাবলুরা। গাড়ি ছুটতেই শংকর ফিস ফিস করে বলল, "আচ্ছা টাবলুদা, তুই হঠাৎ কাস্টমসের লোকদের মারতে গেলি কেন?"

"ধরা পড়ার জন্যে," উত্তর দিল টাবলু।

"কিন্তু ওভাবে ধরা না পড়ে আমরা তো সোজা কাস্টমসের লোকদের বলতে পারতাম।"

"তা পারতাম। কিন্তু ওদের যদি ঠিক মতো বোঝাতে না পারতাম। তাছাড়া পাল লোকটা ঠিক পেছনেই বসে ছিল, ও আবার নতুন কী চাল চালত কে জানে। লোকটার পকেটে আমি পিস্তলও দেখেছিলাম।"

"আচ্ছা, কোটের কলারে সোনার বিস্কুট আছে কী করে বুঝলি?"

"অত খাতির করে কোট উপহার দিতেই সন্দেহ হয়েছিল। সন্দেহ আরও বাড়ল কোটটা ভীষণ ভারি দেখে। কোটের কলার টিপে দেখলাম, প্যাডের বদলে অন্য কিছু আছে। তবে ওগুলো সোনার বিস্কুট বলে বুঝতে পারিনি অবশ্য। কাস্টমস, বর্ডার, বাসে কথা-না-বলা, এইসব শুনে আমার সন্দেহ পাকা হয়েছিল। বুঝতে পেরেছিলাম কোটের মধ্যে চোরাই মাল আছে।"

"খাবারের দোকানদারের কাছে কী খবর আনতে গিয়েছিলি তখন?"

"আর কটা চেক পোস্ট আছে। চেক পোস্টগুলো পেরিয়ে গেলে আমাদের আর কিচ্ছু করার থাকত না। কাজ উদ্ধারের পরে ওদের গুহা দেখে ফেলার দোষে লোকগুলো নির্ঘাত মেরে ফেলত আমাদের।"

শুনে কেঁপে উঠল জয় আর শংকর। একটু চুপ করে থেকে জয় বলল, "তোর কিন্তু ওই কমলালেবুর খোসা ফেলে রাখার বুদ্ধিটা দারুণ হয়েছে টাবলুদা।"

"বুদ্ধিটা কিন্তু ধার করা," একটু থেমে থেমে উত্তর দিল টাবলু।

"ধার করা! কী রকম?"

"রামায়ণ পড়িসনি? ওই যে রাবণ যখন সীতাহরণ করছিল তখন সীতা কী করেছিল? গায়ের গয়নাগাটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল, যাতে ওই চিহ্ন দেখে রামচন্দ্র বুঝতে পারে সীতাকে কোনদিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

টাবলুর ধার-করা বুদ্ধির কথা শুনে হেসে উঠল জয় আর শংকর। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় ধমক দিয়ে টাবলু বলল, "হাসিস না একদম, আমার কিন্তু ভীষণ মন খারাপ হয়ে আছে।"

"কেন? কেন?"

"তিব্বতী গুরু পেলাম, অথচ জাদু শেখা হল না।"

যা-সব ঘটনা ঘটে গেছে পরের পর, জয় আর শংকরের জাদু শেখার কথা মনেই ছিল না একদম। এখন মনে পড়তে ওদের দুজনেরও মন খারাপ হয়ে গেল।

টাবলু খুব নিচু গলায় বলল, "এ-সব কথা কারুকে বলবি না। পরেরবার আমরা আবার গুরুর খোঁজে যাব। ব্ল্যাক আর্ট অব টিবেট শিখতেই হবে।"

জয় আর শংকর আরও নিচু গলায় বলল, "আচ্ছা।"

ছবি অলোক ধর
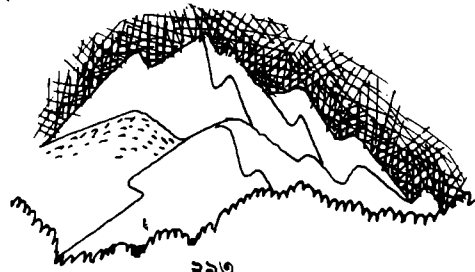
পাগলা দাশু যদি বড়মামা হয়

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বাপ্পা বড়দের নিয়ে আর পারে না। বাড়িতে বাপ্পার চেয়ে সবাই বড়। সবারই বাবা-মা সাধারণত বড়ই হয়ে থাকেন সুতরাং তাঁদের কথা হচ্ছে না। যদিও বাপ্পার বাবা-মা একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। এমনিতে বেশ হাসিখুশি, কিন্তু মাঝে-মাঝে যখন বাবা-মাতে ঝগড়া হয়, তখন বাপ্পা স্পষ্টই বুঝতে পারে তার কপালে আজ দুর্ভোগ আছে। তখনই বাবা-মা বাপ্পার পড়াশোনা সম্বন্ধে হঠাৎ খুব মনোযোগী হয়ে যান। যিনি আগে বাপ্পার নাগাল পান, তিনিই বাপ্পাকে পড়াতে বসে যান, আর বাপ্পার কোন ভুল হলে কি কোন প্রশ্নের জবাব দিতে দেরি হলেই আর দেখতে হবে না, ঠাঁই-ঠাঁই ঠাস-ঠাস দুম-দুম। এর কারণ বাপ্পা ধরতে পারে না। কিন্তু'তার পুরো সাড়ে-নয় বছর বয়সে বাপ্পা দেখেছে, বড়দের কোন ব্যাপারে মানে খুঁজতে নেই—খোঁজার মানে হয় না। বড় হলেই মানুষ বেশ একটু হাঁদাড়ে হয়ে যায়।

বাড়িতে বাবা-মা ছাড়া বিমলাদি আছে। রান্নাবান্না করে। এক জোর করে বাপ্পাকে খাওয়াবার চেষ্টা করা ছাড়া তার বিরুদ্ধে বাপ্পার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু আরো একটি প্রাণী একই সঙ্গে বাপ্পাদের বাড়িতে বাস করে। তাকে প্রাণী বলা ব্যাকরণসম্মত হবে কিনা বাপ্পা জানে না। আসলে সে বাপ্পার দিদি, নাম গোপা। কেউ-কেউ আদর করে ধোপা বলে। এই একটি দিদিতেই বাপ্পার সমস্ত দিদি-জাতটার ওপর ঘেন্না ধরে গেল। বয়সে মোটে দু-চার বছরের বড় হবে, কিন্তু বোলচাল শুনলে এবং সর্দারি দেখলে মনে হবে মার চেয়ে অল্পই ছোট। কথায়-কথায় চেঁচানি—মা, দেখে যাও বাপ্পা কী করল! ওর গলা শুনলে বাপ্পার মনে হয়, মিনি-বাসের কনডাকটর হলে দু'পয়সা রোজগার করতে পারত। অথচ, কী করে বাপ্পা জানে না, ওর দিদি স্কুলের পরীক্ষা-গুলোতে বেমালুম প্রথম হয়। গানে ওর দারুণ নাম। ও নাকি দারুণ গান গায়। মাঝে মাঝেই নানারকম প্রাইজ পায়। ওর দিদির এত প্রশংসা শুনে বাপ্পা আরো স্থিরনিশ্চিন্ত হয়েছে যে, বড়রা একদম বোকা।

এ তো গেল বাড়ির কথা। বাড়ির বাইরের লোকদের নিয়েই কি একটু স্বস্তি আছে? সেখানেও এক দঙ্গল বড়রা আছেন। বড় মেজ সেজ ইত্যাদি ছয় মামা। এ ছাড়া আরো কত যে কারা আছেন, তাদের সকলের হদিশ রাখতে পারে না বাপ্পা। বাপ্পার এ ছাড়া দুই কাকা আছেন। তাঁদের মোটামুটি পছন্দই করে বাপ্পা। কিন্তু তাঁরা থাকেন কলকাতার বাইরে। আসলে কাকাদের চেয়েও বেশী পছন্দ বুটুন, তিলক আর মুনিয়াকে। বুটুনরা সবাই বাপ্পার চাইতে ছোট। আর তিলক তো ওকে গুরু মানে। খুব ছোটবেলা গুরুজী বলে ডাকত। কাকাদের ওখানে গেলে বাপ্পা আর বোম্বাগড়ের রাজার মধ্যে কোনো তফাত থাকে না। কিন্তু পৃথিবীতে আনন্দ জিনিসটা খুব বেশি পাওয়া যায় না, তাই বাপ্পাদের স্কুলের ছুটি যেন আর আসতেই চায় না। অথচ বড়মামার ধারণা, ওদের স্কুল নাকি কামস্কাটকায় বৃষ্টি হলেও ছুটি থাকে।

সুতরাং বাপ্পাকে কলকাতাতেই থাকতে হয়, আর মাঝে-মাঝেই মামাদের পাল্লায় পড়ে যেতে হয়। মামাবাড়ির আব্দার বলে একটা কথা চালু আছে। এ-ব্যাপারটা বাপ্পা একদমই ধরতে পারে না। আদর বলতে একটু-আধটু মামীরাই যা করে। মামাদের আদরের কথা বাপ্পা ভাবতেই পারে না। অথচ ছড়ায় বলে, মামীরা নাকি ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসে। বোঝো কথা। বাপ্পার বড়মামী শুচিবায়ুগ্রস্ত, তিনি ঝাঁটা ধরলে দুটো কার্বলিক সাবান খরচা হবে। অন্যরাও কেউ ধরে না। মোদ্দা কথা, মামীরা বেশ ভাল। কিন্তু মামারা? বাপ্পার ধারণা, তার মামারা অল্পবিস্তর সবাই পাগল। সবাই হৈচৈ হাঁকডাক করে কাজ করে। খেপে গিয়ে চেঁচায়, নয়তো খ্যাখ্যা করে হাসে। ওদের মধ্যে কে যে বেশি পাগল, সে-বিষয়ে যে যাই বলুক, বাপ্পার কোনও সংশয় নেই। সে জানে, পাগলামিতে বড়মামার ধারকাছ দিয়েও কেউ আসতে পারে না।

বড়মামার সঙ্গে পাগলা দাশুর অনেকটাই মিল খুঁজে পায়

বাপ্পা। ওর ধরণ পাগলা হনু বড় হয়ে বড়মামার মতই হয়েছিল। একটা জায়গায় শুধু খটকা লাগে। সুকুমার রায়ের বর্ণনায় পাগলা দাশুর যে ছবি আছে, তার চেয়ে অনেকটাই মোটা বড়মামা। সকাল বেলা তাই ব্যায়াম করবার জন্য তিনি বেড়াতে বেরেন। যেদিন খেয়াল হল, সেদিন রাস্তা দিয়ে বিকট হেঁড়ে গলায় গান গাইতে-গাইতে আসেন— "হরিনাম কী মধুর।" হরিনাম হয়ত মধুর, কিন্তু বড়মামার গলায় নিশ্চয় নয়। ওই হেঁড়ে চিৎকারে যদি ঘুম ভাঙে—না ভাঙাই আশ্চর্য—তাহলে ল্যাঠা চুকে গেল, নইলে সটান চলে আসবেন বাপ্পার খাটের কাছে। তারপর ধাক্কিয়ে উঠিয়ে দিয়ে বলবেন, "আর কত ঘুমোবে হনুবাবু?" ভোরবেলা ওই ধরনের বিতিকিচ্ছিরি হাঁকডাক কারুর ভাল লাগে না, লাগতে পারে না। তাছাড়া 'হনু' নামটাতেই বাপ্পার আপত্তি। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। এর পরেই বড়মামা শুরু করেন স্কুল সম্বন্ধে নানা অপমানকর কথাবার্তা। "হনুদের পাঠশালা চলছে কেমন? ছাত্রদের ল্যাজ কতটা বাড়ল?" ইত্যাদি নানা আবোল-তাবোল কথা।

তবু বাড়ির মধ্যে বড়মামাকে কিছুটা সহ্য করা যায়। কিন্তু রাস্তায়? সেখানে বড়মামার ব্যবহারের কথা ভাবলে বাপ্পার অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়। সেদিন বিমলাদি বাড়ি নেই—বাবার কী কারণে সকাল-সকাল অফিস, মায়ের শরীরও ভাল নয়। বাপ্পাকে কে স্কুলে নিয়ে যাবে, তাই নিয়ে গবেষণা চলছে বাড়িতে। এমন সময় বড়মামার প্রবেশ। মাথায় একটা পেল্লায় টোকা। টোকা কী জানো? পাড়াগাঁয়ের চাষীরা যা মাথায় দিয়ে খেতে কাজ করে, তাকে টোকা বলে। বড়মামা একগাল হেসে মাকে বললেন, "ব্যস্, আর ছাতা হারাবার ভয় রইল না। এই একটা টোকা গৌহাটিতে কিনলাম। রোদও আটকাবে, বৃষ্টিও আটকাবে। খাসা জিনিস।" তারপর যেই শুনলেন বাপ্পার স্কুলে যাওয়া নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে, বললেন, "তাতে কী হয়েছে, আমিই নিয়ে যাব।" বাপ্পার ওইরকম একটা বিদঘুটে টোকা মাথায় দেওয়া লোকের সঙ্গে বেরোবার একদমই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বেরোতেই হল। একটা কারণ মায়ের চোখ-রাঙানি, আর দ্বিতীয় কারণ, স্কুলের এক বন্ধু আজ তাকে দুটো মার্বেলগুলি দেবে বলেছে। সুতরাং স্কুলে যাওয়াটাও জরুরি।

টোকা মাথায়, একটা ফতুয়া গায়ে, পরনে পাজামা, চটি ফটফটিয়ে বড়মামা চলেছেন বাঁহাতে ধরা রয়েছে বাপ্পার ডান হাত। লজ্জায় বাপ্পার মাথা কাটা যাচ্ছিল। লোকে কেমন করে জানি বড়মামার দিকে তাকাচ্ছিল। বাপ্পা চোখ বন্ধ করে রাস্তা দিয়ে চলতে থাকল। কিন্তু কতক্ষণ আর চলবে? এক-জন রিকশাওয়ালা একগাল হেসে বড়মামার কাছে এসে দাঁড়াল। প্রশ্ন করল, "কোথা থেকে এই মাথলা পেলেন?" মামা বললেন, "মাথ্লা না, টোকা।" রিকশাওয়ালা বলল, "আমাদের দেশে মাথ্লা বলে।" মামা বললেন, "তাই নাকি? তা তো জানতাম না।" তারপর মহাখুশি হয়ে বর্ণনা দিলেন, কোথা থেকে কিনেছেন, কত লেগেছে ইত্যাদি। তারপর বেশ পরিতৃপ্তির হাসি হেসে আবার চলতে শুরু করলেন। কিছুদূর বাদেই আবার থামা। বড়মামার এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এবারও টোকা বা মাথ্লা নিয়ে আলোচনা হল। বাজারের জিনিসপত্রের দাম কীভাবে হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে, এমনভাবে চললে লোকে বাঁচবে কী করে ইত্যাদি নিয়ে আলো-চনাও হল। তারপর ভদ্রলোক বললেন, "এই ছেলেটি কে? স্কুলে যাচ্ছে বুঝি?" বড়মামা ভীষণ অবাক-টবাক হয়ে বললেন "ছেলে আবার কোথায় দেখলেন? ইটি তো সাক্ষাৎ ল্যাজকাটা হনুমান। আপনার মানুষ বলে মনে হল? আশ্চর্য তো!" তারপরই বললেন "কাছেই একটা হনুদের পাঠশালা আছে, সেখানে ও লাফালাফি শিখতে যায়, তাই নিয়ে যাচ্ছি বটে। তা আপনি বুঝলেন কেমন করে?" ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে আমতা-আমতা করতে করতে চলে গেলেন।

বাপ্পা আবার চোখ বুজে ফেলল। মনে-মনে সাংঘাতিক রাগ হতে থাকল। সেই সেবার যখন 'বসে আঁকো' প্রতি-যোগিতায় বাপ্পা প্রথম হয়েছিল, তখন এই বড়মামাই বুক ফুলিয়ে 'হবে না?' বলে কী একটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়ে-ছিলেন, যার মোদ্দা কথাটা হল মানুষের স্বভাব নাকি মামা-দের মতো হয়। তাহলে বাপ্পা যদি ল্যাজকাটা হনুমান হয় তবে বড়মামা কী? কিন্তু সে-কথা বলবে কী করে? তার আগেই বড়মামার আরেকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। এ-ভদ্রলোককেও মামা চেনেন। এমন কী, বাপ্পাও চেনে। বাপ্পা-দের পাড়াতেই থাকেন। দেখলে খুব শান্তশিষ্ট মনে হয়। তিনি প্রশ্ন করলেন, "কী, ভাগ্নেকে স্কুলে পৌঁছতে যাচ্ছেন?" বড়মামা অম্লান বদনে উত্তর দিলেন, "পাগল? পড়াশোনা করে না একদম। শেষপর্যন্ত তো সেই তরি-তরকারি ফিরি করে বেড়াবে। তারই তালিম দিচ্ছি।" সেদিন বাপ্পা প্রতিজ্ঞা করে-ছিল যে, সারাজীবন যদি স্কুলে না যেতে হয়, সেও আচ্ছা, বড়মামার সঙ্গে আর কখনো নয়।

এই গল্প শুনে ওই হাড়জ্বালানো দিদিটার হিহি করে সে কী হাসি! বাপ্পার হেনস্তাতে দিদি স্পষ্টই খুশি।

কে বলে ভগবান নেই? বাপ্পা অনেকবার দেখেছে, ভগবান কেমন করে শাস্তি দেন। কয়েক সপ্তাহ বাদেই একেবারে হাতে হাতে ফল। সেদিন দিদিদের স্কুলের যাকে বলে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। দিদি শুধু যে প্রথম পুরস্কার পাবে তাই না, অভিনয়ও করবে। লক্ষ্মী-পরীর ভূমিকা ওর। মায়ের লাল শাড়িটা পরেছে। মুখে অনেক পাউডার আর নানারকম সব রঙ লাগিয়েছে। মায়ের ওড়নাটাও মাথায় দিয়েছে। বারেবারেই আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ও ভাবছে ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। ওদের অনুষ্ঠানটা বেশ ক্যাবলা-ক্যাবলা লাগল বাপ্পার, কিন্তু হাত-তালি পড়ল প্রচুর। অনেকগুলি বই হাতে বেরিয়ে এল দিদি। বড়মামা কিন্তু ঠিক হাজির হয়েছেন ভাগ্নীর অভিনয় দেখতে। দিদি বেরিয়ে এসে বড়মামাকে প্রশ্ন করল, "বড়মামী আসেনি?" বড়মামা বললেন, "না রে, কাজে আটকে গেছেন।" বলেই বললেন, "তাতে কী, চল্ তোকে তোর বড়মামীকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। চল আমাদের বাড়ি।" বলেই একটা রিকশা ভাড়া করে ফেললেন। তাতে বাপ্পাকে আর দিদিকে ওঠালেন। আর বাপ্পার মাকে বললেন, "তুই বাড়ি চলে যা, আমি ওদের পরে পাঠিয়ে দেব।" মা অত্যন্ত বাধ্য মেয়ের মত তা-ই করলেন। দুপুরবেলা একটা মেয়ে অত রঙ মেখে মাথায় হাতে গলায় ফুলের মালা লাগিয়ে রিকশা করে চলেছে, এমন দৃশ্য কলকাতায় খুব দেখা যায় না। বিভিন্ন ধরনের লোক রাস্তা দিয়ে চলতে-চলতে দিদিকে দেখছিল। যেই কারুর সঙ্গে বড়মামার চোখাচোখি হচ্ছে, বড়মামা তাদের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, "এদের বাড়ি খুব ছোটবেলায় বিয়ে হয়। এর সবে কাল বিয়ে হয়েছে, আমি নতুন কনেকে নিয়ে চলেছি।" লোকেরা কেউ হাসছে, কেউ-কেউ যেন বিশ্বাসও করল মনে হল। দিদি বারবার খেপে-খেপে উঠছে। বড়মামা নির্বিকার।

বড়মামীর কাছে এসে ঝেঁঝে উঠল দিদি। "এই পাগল নিয়ে চলা যায় না। পাগলা দাশু গল্পতেই ভাল। কারুর বড়-মামা পাগলা দাশু হলে বাঁচা দায়।"

দিদিকে যতই খারাপ লাগুক, বাপ্পা বলতে বাধ্য হল যে, কথাটা নিছক সত্যি।

ছবি বিমল দাশ

হেড এগজামিনার

কী করে নম্বর বাড়াতে হয়

সবার আগে জানা দরকার—কী পড়তে হবে, আর কীভাবে পড়তে হবে। তারপরেই কিসের দরকার বলো তো? দরকার—কী লিখতে হবে, আর কীভাবে লিখতে হবে। পরীক্ষায় নম্বর বাড়াতে গেলে এ-দুটো বিষয় তোমাদের জানতেই হবে। জানা কিন্তু খুব সহজ। চারজন হেড-এগজামিনারের অমূল্য এই উপদেশগুলি পড়ে নিয়ে সেই মতো চললেই দেখবে, কত সহজে বেশ কিছু নম্বর বেড়ে গেছে। সাধারণ, অসাধারণ সব ছাত্র-ছাত্রীই এই পরামর্শে উপকৃত হবে। সারা বছর ধরে খাটাখাটনি করেও যদি পরীক্ষায় ভাল ফল না করা যায়, কার না মন খারাপ হয়ে যায় বলো? অথচ তোমরা যদি সামান্য কয়েকটি কৌশল জেনে নিয়ে উত্তর লেখো, তাহলে আর পরীক্ষার ফলাফল দেখে একটুও দুঃখ পাবে না। গত বছর এবং তার আগের বছরও পুজোবার্ষিকীতে চারজন হেড-এগজামিনার তোমাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই পরামর্শে উপকৃত হয়েছিল অসংখ্য মাধ্যমিক-পরীক্ষার্থী। তারা আমাদের চিঠি দিয়ে সে-কথা জানিয়েছে। এবার যারা পরীক্ষা দেবে তাদের কথা ভেবে এ-বছরও আমরা এই বিভাগটি রাখলাম। এবারের পরামর্শও নিখুঁত এবং বিজ্ঞানভিত্তিক। মাধ্যমিক পরীক্ষার ধরন-ধারণ একেবারে পালটে গেছে। আগের মতো না-বুঝে গড়গড় করে মুখস্থ করে তড়বড় করে লিখে দিলেই এখন আর পাস করা যায় না। এখন তোমাদের বুঝেশুনে পড়তে হবে, মাথা খাটিয়ে উত্তর লিখতে হবে পরীক্ষার খাতায়। এই ব্যাপারে তোমাদের সহজ, সাধারণ অথচ অব্যর্থ পরামর্শ দিয়েছেন বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত আর অঙ্কের চারজন হেড-এগজামিনার। এঁদের কথামতো চললে পরীক্ষায় তোমাদের নম্বর বাড়বেই।

বাংলার হেড এগজামিনার লিখছেন

এই পরামর্শ যখন তোমাদের হাতে পৌঁছবে, তখনও মূল **পরীক্ষা মাস পাঁচেক দূরে।** এই সময়টা ধরে প্রস্তুতির কিছু **বিশেষ কৌশল** আশ্রয় করলে সেটা রপ্ত হয়ে যাবে আর নম্বর বাড়াতে নিশ্চিত সাহায্য করবে।

১॥ হিসেবমত কাজ

বাংলা লেখার পরীক্ষায় অনেক সময়। সময়ের অভাবের **অভিযোগ কেউ তুলতে পারবে না।** ১৮০ মিনিটে ৮০ নম্বরের **উত্তর** দিতে হবে। বেশির ভাগ উত্তরই আকারে ছোট। কোন্ **প্রশ্নের উত্তরে** কতটা সময় নেবে, তার একটা হিসেব দেওয়া **হল—**

প্রথম পত্র। ২টি বড় প্রশ্ন (১০+১০ নম্বর)—২০+২০ মিনিট। ২টি ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন (৭+৭ নম্বর)—১২+১২ মিনিট। ২টি আলোচনামূলক সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (৩+৩ নম্বর)—৫+৫ মিনিট। অর্থাৎ পাঠ্যবইয়ের কাব্যাংশের জন্য (৪০ নম্বর)—৭৫ মিনিট। প্রবন্ধরচনা (২০ নম্বর)—৪০ মিনিট। বঙ্গানুবাদ (১০ নম্বর)—২০ মিনিট। ভাবসম্প্রসারণ বা সারাংশ (১০ নম্বর)—২০ মিনিট। আরও ২৫ মিনিট সামগ্রিক সংশোধনের জন্য হাতে রইল।

দ্বিতীয় পত্র। ২টি বড় প্রশ্ন (১০+১০ নম্বর)—২৫+২৫ **মিনিট। ২টি ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন** (৮+৮ নম্বর)—১৫+১৫ **মিনিট।** ৩টি আলোচনামূলক সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (৩+৩+৩ নম্বর) —৫+৫+৫ মিনিট। অর্থাৎ পাঠ্য বইয়ের গদ্যাংশের জন্য (৪৫ নম্বর)—৮৫ মিনিট। ব্যাকরণ (পাঠ্যান্তর্গত ১০ নম্বর + সাধারণ ২৫ নম্বর)—৬০ মিনিট। আরও থাকবে ৩৫ মিনিট সংশোধনের জন্য।

বাংলা পরীক্ষায় অনেক সময় পাবে মনে রেখে, তাকে **ঠিকঠাক কাজে** লাগাবার জন্য কয়েকটা নিয়ম মানা যেতে পারে—

(ক) **যখনই** টেস্টপেপার থেকে উত্তর লেখা অভ্যাস করবে, **ঘড়ি সামনে রাখবে,** সময়ের হিসেব মেনে চলবে। ক্রমে দেখবে **সময়ের তাল মিলিয়ে লেখা স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে।**

(খ) **যখন এইভাবে নিজেই বুঝতে পারছ বাংলায় সময়ের অভাব নেই তখন** হাতের লেখার দিকে নজর দেবার ভরসা পাবে। সুশ্রী লেখার জন্য পাঁচ মাসের অভ্যাসে চমৎকার ফল মিলবে।

২॥ জোর দেবে কোথায়

পাঠ্যবই সকলেই বেশি জোর দিয়ে সারা বছর ধরে পড়ে আসছ। এবারে একটু বাইরের অংশে বিশেষ করে ব্যাকরণে—বঙ্গানুবাদে বেশি নজর দিলে কেমন হয়? পাঠ্যবইয়ে মোট ৮৫ নম্বর, আর বাইরের অংশে ৭৫ নম্বর। কিন্তু সচরাচর দ্বিতীয়াংশেই কিছু বেশি নম্বর পাওয়া যায়। একেবারে ঠিক হিসেব দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু মোটামুটি (এটা এক ধরনের গড় হিসেব বলতে পারো) দেখা যায়—

প্রথম পত্রে যে ৪০ পায় সে পাঠ্যাংশে ১৮ + বাইরের অংশে ২২ পায়।

প্রথম পত্রে যে ৫০ পায় সে পাঠ্যাংশে ২২ + বাইরের অংশে ২৮ পায়।

আবার, দ্বিতীয় পত্রে যে ৫০ পায় সে পাঠ্যাংশে ২০+ ব্যাকরণে ৩০ পায়।

দ্বিতীয় পত্রে যে ৬০ পায় সে পাঠ্যাংশে ২৫+ব্যাকরণে ৩৫ (পুরো) পায়। এমন উদাহরণও প্রচুর, যেখানে ব্যাকরণে ২৫/৩০ পাবার জোরেই অনেকে বাংলায় পাস করে বা ভাল নম্বরও পায়। আবার ব্যাকরণে খারাপ করলে কিছুতেই বেশি নম্বর তোলা যায় না। ব্যাকরণ ঠিক হলে পুরো নম্বর জুটবে, এমন তো আর কিছুতে নয়। সেজন্য বলব—

(ক) বাকি পাঁচ মাস ব্যাকরণে জোর দাও। ভালভাবে টেস্ট পেপার সমাধান করো।

(খ) খাতার মাঝখানে স্পষ্ট করে উত্তর লেখা অভ্যাস করো। যেমন পদান্তর—

দীর্ঘ—দৈর্ঘ্য

যোগ্য—যোগ্যতা

বা সমাস ও ব্যাসবাক্য নির্ণয়—

কমবেশি—কম ও বেশি (দ্বন্দ্ব)

রাজপুত্র—রাজার পুত্র (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)

অর্থাৎ লেখার দোষে যেন পরীক্ষকের চোখ এড়িয়ে ১ নম্বরও নষ্ট না হয়।

(গ) বঙ্গানুবাদ, প্রবন্ধ-রচনা ভাবসম্প্রসারণের উপরে বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই তেমন জোর দেয় না। এই পাঁচ মাস এদের দিকে বিশেষ নজর দেবার সময়।

৩॥ বঙ্গানুবাদ যেন বাংলা হয়

বঙ্গানুবাদে মাত্র ১০ নম্বর। কিন্তু ৮ পর্যন্ত পাওয়া যায়। প্রতি বাক্যের জন্য পৃথক নম্বর ঠিক থাকে। বাক্য বড় বা জটিল হলে একটু বেশি নম্বর। সরল আর ছোট হলে কম নম্বর। এবিষয়ে পরামর্শ হল—

(ক) প্রথমে মূল ইংরেজির যথাযথ অনুবাদ করো। তারপরে প্রতিটি বাক্য ধরে তার সংশোধন করো। এমনভাবে করবে যাতে তোমার লেখা বাংলা যেন খাঁটি বাংলা হয়। এতে একটু কাটাকুটি হতে পারে। তার জন্য 'ফেয়ার' করে লেখা উচিত। বড়জোর পাঁচ মিনিট বেশি লাগবে। কিন্তু নম্বর বাড়বেই।

(খ) ইংরেজি জটিল বাক্যকে দরকার মতো ভেঙে বাংলায় দুটি সরল বাক্য করে নিতে পার। অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজের ক্রিয়াপদটি অসমাপিকা করেও বাক্যটি সরল করা যায়, অ্যাডজেকটিভ ক্লজ বিশেষণে, নাউন ক্লজ বিশেষ্যে বদলে নিয়ে বাংলা বাক্যকে অনেক স্বাভাবিক করা যায়। এগুলি একটু জেনে আর অভ্যাস করে নেবে।

(গ) 'ফেয়ার' করে লিখবার সময়ে বাক্যগুলি পৃথক-পৃথক অনুচ্ছেদে সাজাও। কারণ আগেই বলেছি, প্রতি বাক্যের জন্য আলাদা নম্বর ধরা আছে।

৪॥ প্রবন্ধ-রচনা ও শব্দসংখ্যা

শব্দসংখ্যা নিয়ে একটা ভুল ধারণা চালু আছে—ভাবসম্প্রসারণ ৮০ শব্দ আর প্রবন্ধ ৩০০ শব্দের মধ্যে লিখতে হবে। একথা গত বছরের প্রশ্নে কোথাও বলে দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে আমার পরামর্শ—

(ক) লেখাটা ভাল করার জন্য যেমন দরকার লিখবে। ৪।৫ পৃষ্ঠা হলেই বা আপত্তি কিসের? সংক্ষেপে লেখা ভাল, কিন্তু তাতে অনেক ধার থাকা চাই। অনেকের লেখাতেই সে-ধার নেই। এখনও অনেক পরীক্ষক আছেন যাঁরা পৃষ্ঠা-সংখ্যা দেখে নম্বর দেন।

(খ) তবে এককথা বারবার লিখবে না।

(গ) প্রদত্ত সূত্রগুলি বাঁ-ধারে লিখবে। একটা সূত্রের আলোচনা হয়ে গেলে একটু জায়গা ছেড়ে নতুন সূত্র আরম্ভ করবে।

(ঘ) যদি প্রশ্নে শব্দসংখ্যা বলে দেওয়া হয়, তবে মোটামুটি তা মনে রাখবে—হুবহু মানার কোনো দরকার নেই।

পরিশেষে বলি, যে-পরামর্শ দিলুম সেটা মেনে চলো। দেখবে, নম্বর কিছু-না-কিছু বাড়বেই।

ইংরেজির হেড এগজামিনার লিখছেন

আমাদের মাধ্যমিকের পাঠক্রমে বাংলা ফার্স্ট ল্যাঙ্গোয়েজ আর ইংরেজি সেকেন্ড ল্যাঙ্গোয়েজ। ফলে যুক্তিসংগতভাবেই ইংরেজির মান বাংলা থেকে এক ধাপ নিচু। ইংরেজিতে মৌখিকও নেই। টানা ইংরেজি লেখার সুযোগ আছে মাত্র চল্লিশ নম্বরের প্রশ্নে। বাকি ষাট নম্বরের প্রশ্নের উত্তর একদম টুকরো-টুকরো।

এসবের জন্য ইংরেজিতে শুধু পাস-নম্বর পাওয়া খুব সহজ। কিন্তু যে-পরীক্ষার্থী ইংরেজিতে অন্য অনেকের থেকে অনেক ভাল, তার পক্ষে তার গুণের প্রমাণ রাখা বেশ কঠিন। অথচ সেই পরীক্ষার্থী তো ইংরেজিতে বেশি নম্বর না পেলে খুশি হবে না! সে কী করে বেশি নম্বর পেতে পারে?

পরীক্ষক জানেন, পরীক্ষার্থী অনেক রকমের। তাদের মোটামুটি দুভাগে বিন্যস্ত করা যায়। এক অংশ ইংরেজিতে কেবল পাস করলেই বেঁচে যায়। অন্য অংশ ইংরেজিতেও বেশি নম্বর চায়। তুমি কী করে পরীক্ষককে বুঝিয়ে দেবে যে, তুমি পরীক্ষার্থীদের ওই দ্বিতীয় অংশের একজন?

১। গুরুত্ব দেবার জন্য জানা কথা আবার বলি—খাতাটি ঝকঝকে-তকতকে রাখতে হবে। তোমার হাতের লেখা পড়তে যেন পরীক্ষকের মোটেই কষ্ট না হয়। বরং তোমার খাতার পাতায় তাকিয়েই যেন পরীক্ষক তৃপ্তি পান।

২। ইংরেজি ভাল জানার প্রমাণ রাখার সব থেকে বেশি সুযোগ রয়েছে চারটি প্রশ্নে। এই চারটি হল—ট্রানস্লেশন, প্যারাগ্রাফ, লেটার, সামারি। এখানেই বিশেষ করে নিজের গুণের পরিচয় দিতে হবে। যেমন ট্রানস্লেশন। কেবল আক্ষরিক এবং ব্যাকরণ ও বানান নির্ভুল হলেই ভাল হল, এমন তো নয়। ছিয়াত্তর সালের ট্রানস্লেশনের দ্বিতীয় পঙক্তিটি ছিল—উল্লম্ফন, দীর্ঘলম্ফ, সিধা ছুট প্রভৃতি। প্রথম কথাটির ইংরেজি সবাই লিখবে—হাই জাম্প, দ্বিতীয় কথাটির ইংরেজি কেউ লিখবে—লং জাম্প, কেউ লিখবে ব্রড জাম্প, কিন্তু তৃতীয় কথাটির বেলায়? স্ট্রেট রান লিখলে তো ঠিক হবে না। কারণ স্পোর্টসের পরিভাষায় স্ট্রেট রান বলে কোনো কথা নেই। ভেবে দেখ, সিধা ছুট কথাটির কত রকম ইংরেজি হয়। মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করেও দেখতে পারো। যেটি সব থেকে ভাল, তুমি যদি সেটি লেখ, তবেই পরীক্ষক বুঝবেন, তুমি ইংরেজিতে ভাল এবং তোমাকে অন্য অনেকের থেকে বেশি নম্বর দেবেন।

৩। অনেকেই বিভিন্ন বিষয়ে অন্যের লেখা প্যারাগ্রাফ ও লেটার মুখস্থ করে রাখে। পরীক্ষক কিন্তু পড়েই বুঝতে পারেন, কোনটি তোমার নিজের লেখা আর কোনটি কোনো বয়স্ক ব্যক্তির লেখা। তোমার নিজের লেখায় অবশ্যই লুসিডিটি ও সুইটনেস থাকবে। এই দুটি লক্ষণ না থাকলে পরীক্ষক নম্বর দেবার বেলায় খুব দরাজ হবেন না। অথচ এক-আধটু ব্যাকরণের ভুলটুল থাকলেও, তোমার নিজের লেখার লুসিডিটি ও সুইটনেস পরীক্ষককে খুশি করবে এবং নম্বর দেবার সময় তাঁর হাত খুলে যাবে।

৪। সামারি লিখতে হবে নিজের কথায়। প্রশ্নপত্রে ছাপানো অনুচ্ছেদের কিছু-কিছু অংশ বেছে-বেছে খাতায় কপি করে দিলে নম্বর আসবে না। কয়েকবার পড়ে অনুচ্ছেদটি বুঝে নিয়ে, তার সারাংশ নিজের কথায় লিখলে তোমার লেখাটি অবশ্যই লুসিড ও সুইট হবে এবং ভাল নম্বর আসবে।

৫। যে-সব কবিতা ও গদ্যরচনা তোমাদের পাঠ্য সেগুলির প্রত্যেকটি ভারী কথার সমার্থক ও বিপরীতার্থক ইংরেজি কথা জেনে রাখতে হবে। মূল গদ্যরচনা ও কবিতাগুলি পড়তে হবে অত্যন্ত যত্নে। তাহলে যাকে অবজেকটিভ টাইপ বলা হয়, সেই সব টুকরো প্রশ্নের উত্তর খুব তাড়াতাড়ি নির্ভুলভাবে দিতে পারবে।

৬। টুকরো প্রশ্নের ছোট-ছোট উত্তর লিখবার সময় তাড়াতাড়িতে সাধারণত ভুল হয় আর্টিকেল এবং প্রিপজিশনের। এই জাতের ভুল যাতে না হয় সেদিকে সতর্ক নজর রাখতে হবে। কারণ টুকরো প্রশ্নের টুকরো উত্তর প্রায় সবারই জানা। মোটামুটি একই উত্তর হবে। তার মধ্যে যারা ওই ভুলগুলো করবে না, তারা ইংরেজিতে নিজেদের গুণের প্রমাণ রাখবে।

৭। আরো একটি প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে যথাযথ আর্টিকেল এবং প্রিপজিশনের প্রয়োগ জানতে হবে। এই প্রশ্নটি হল—শূন্যস্থান পূরণ।

৮। এছাড়া ব্যাকরণের আর যে প্রশ্ন তাকে বলা যায়—

ট্রান্সফরমেশন। ভয়েস, ডিগ্রী, ন্যারেশন ইত্যাদির পরিবর্তন। ব্যাকরণের এই প্রাথমিক সূত্রগুলি প্রচুর দৃষ্টান্তসহ বুঝে রাখলে এই সব সহজ প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারবে এবং অঙ্কের মতন পুরো নম্বর পাবে।

আসলে মাধ্যমিকের বাংলা থেকে ইংরেজি অনেক সহজ— এই কথাটি মনে রাখলে আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

হেড এগজামিনারের অভিজ্ঞতা থেকে এবারে এই সব পরামর্শ দিলাম প্রধানত তাদের, যারা ইংরেজিতে ভাল এবং বেশি নম্বর আশা করে। এই সব পরামর্শ গ্রহণ করলে বেশি নম্বর আসবেই।

সংস্কৃতের হেড এগজামিনার লিখছেন

১৯৭৭ সালের পরীক্ষা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষতের দ্বিতীয়বার মাধ্যমিক পরীক্ষাগ্রহণ পর্ব শেষ হল। সুতরাং পরপর দু'বছরের পরীক্ষার ফলে সংস্কৃতের প্রশ্ন-পত্রের ধরন যেমন মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে, তেমনি দুবছরের অভিজ্ঞতা থেকে সংস্কৃতে কী করে ভাল নম্বর তোলা যায় তার সম্বন্ধেও ধারণা স্পষ্টতর হয়েছে। আমাদের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা থেকে পরীক্ষায় ভাল ফল করার বিষয়ে মোটামুটি কয়েকটি ইঙ্গিত করা যেতে পারে।

প্রথমত ল্যাঙ্গোয়েজ গ্রুপ বা ভাষাবিভাগের তিনটি বিষয় হল বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত। সংস্কৃত যেহেতু মৃতপ্রায় ভাষা, সেইজন্য স্বভাবতই এর প্রতি আকর্ষণও কম। কিন্তু মজা হচ্ছে বাংলা বা ইংরেজির মত সাহিত্যিক ভাষায় যত নম্বর ওঠে, সংস্কৃতে তার চেয়ে নম্বর ওঠে অনেক বেশি। তার কারণ হল সংস্কৃত হচ্ছে প্রধানত ব্যাকরণভিত্তিক ভাষা, সুতরাং ব্যাকরণ একটু জানা থাকলে সংস্কৃতে অঙ্কের মতো ছাঁকা নম্বর ওঠানো খুবই সহজ। সেইজন্য পরীক্ষার্থী যদি সামান্য কয়েকটি সূত্র মনে রাখে, তাহলে সংস্কৃতে ভাল নম্বর তোলা আদৌ কষ্টকর নয়। এক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের প্রথম কাজ হল সংস্কৃত পাঠ্যগ্রন্থটি ভাল করে পড়তে হবে, অর্থাৎ প্রতিটি সন্ধিপদ ভেঙে এবং পদগুলির প্রত্যেকটির অর্থ বুঝে গদ্য এবং পদ্যগুলি পড়তে হবে। এর ফলে দুটি উপকার হবে। প্রথমত অনুবাদ করা সহজ হবে এবং দ্বিতীয়ত গল্পটাও ভাল করে জানা হয়ে যাবে। অনুবাদের যে-প্রশ্ন দেওয়া হয়, তাতে পনের নম্বর থাকে, সেটি যথাযথ অনুবাদ করতে পারলে এবং তার ভাষা যদি পরিমার্জিত হয়, তাহলে তাতে পুরো নম্বর পেতে কোনই অসুবিধা হবার কথা নয়।

গল্প ভাল জানা থাকায় প্রশ্নপত্রের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর করা খুবই সহজ হয়। উপরন্তু ঐ প্রশ্নে কে, কাকে, কখন, কেন এবং কেমন করে এই সব প্রশ্নের উত্তর পৃথক-পৃথক করে লিখতেও সুবিধা হয় এবং তাতে নম্বরও বেশি উঠবে। গল্প বা গল্পাংশ ভাল করে জানা থাকার আরও একটা সুবিধা আছে। প্রশ্নপত্রের চতুর্থ প্রশ্নে অর্থাৎ ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গের উল্লেখের কথা না থাকলেও এমন ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় যার অর্থ পরিষ্কার করতে গেলে প্রসঙ্গের উল্লেখ করতেই হয়। তাছাড়া উদ্ধৃতিটি কোথা থেকে গৃহীত তা অতি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে কারণ তাতে অনুল্লেখ নম্বর থাকে। তারপর ব্যাখ্যায় শ্লোকগুলিতে আপাত-অর্থের পিছনে যদি অন্তর্নিহিত অন্যকিছু অর্থ থাকে তা লিখতে হবে এবং তুলনামূলক ভাব থাকলে অর্থাৎ কার সঙ্গে কার তুলনা করা হয়েছে, তা নির্দিষ্ট করে লিখলে নম্বর বেশি উঠবেই।

আর একটা প্রশ্ন আসে, যাকে ইংরেজিতে কমপ্রিহেনশন টেস্ট বলা যায়। এতে একটি অনুচ্ছেদ (সংস্কৃত অক্ষরে) তুলে দিয়ে সংস্কৃতেই কতকগুলি প্রশ্ন করা হয়। এই প্রশ্নের সর্বাধিক লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই প্রশ্নের উত্তরগুলি ক্রমানুসারেই সাজানো থাকে। এই প্রশ্নে বেশি নম্বর তোলার সহজ ও নির্ভুল উপায় হল বাক্যগুলিকে পূর্ণবাক্য বা কমপ্লিট সেনটেন্স করে উত্তর দেওয়া অর্থাৎ বাক্যে উদ্দেশ্য-পদ এবং সমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বিধেয় অংশ যেন ঠিকমতো সাজানো থাকে সেদিকে লক্ষ করতে হবে।

অতঃপর ব্যাকরণের কথা বলি। পাঠ্য অংশের ব্যাকরণ— কারক-বিভক্তি, প্রকৃতি-প্রত্যয়, সমাস ও বাচ্যপরিবর্তন—এগুলি পাঠ্য অংশের অনুবাদের সঙ্গেই পড়ে রাখা উচিত। বারংবার পড়তে-পড়তেই ব্যাকরণ অংশ অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ থেকে পুরো নম্বর পেতে আর কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। এর বাইরে যে সাধারণ ব্যাকরণের প্রশ্ন আসে, তাতে শব্দরূপ ও ধাতুরূপ তো থাকবেই, বিশেষ করে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অংশগুলি (যেমন—হন্ ধাতু লোট্ হি =জহি) সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হবে। শব্দরূপ ও ধাতুরূপ ঠিকমতো জানা থাকলে সংস্কৃতে অনুবাদ করাও সহজ এবং নির্ভুল হয়। যুগ্মশব্দ বা শব্দদ্বৈতের পার্থক্য ভাল করে জানতে হবে এবং শব্দ দুটি দিয়ে এমনভাবে বাক্যরচনা করতে হবে যাতে দুটি শব্দের অর্থগত পার্থক্য ধরা যায়। এতে পরীক্ষক পূর্ণ নম্বর দিতে বাধ্য।

তেমনি অব্যয়গুলির অর্থসহ বাক্যরচনার বেলাতেও বাক্যগুলি যাতে সম্পূর্ণ ও নির্ভুল হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এতেও পুরো নম্বর সহজেই পাওয়া যায়।

অনুবাদ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় এই যে, বাক্যগুলি বাংলায় অনূদিত করাই থাকে, এতে বাংলায় অর্থ বুঝতে যেমন সুবিধা হয় তেমনি সংস্কৃতে অনুবাদ করতেও সুবিধা হয়।

এতে বিভক্তিগুলির যথাযথ প্রয়োগ এবং বচন, কাল ও পুরুষ অনুযায়ী ক্রিয়ার ঠিকমতো ব্যবহার করলে বেশি নম্বর নিশ্চয়ই উঠবে।

সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করার সহজ পথ হল প্রথমেই তার সমাপিকা ক্রিয়াটি বার করতে হবে। তারপর বিভক্তির চিহ্ন দেখে অন্যান্য পদ অর্থাৎ কর্তা, কর্ম ইত্যাদি বুঝে নিতে হবে। তাহলে তার অর্থ সহজেই বোধগম্য হবে। তখন ঠিকমতো সাজিয়ে যদি বাক্য গঠন করা হয়, এবং ভাষাটি যদি স্বচ্ছন্দ হয়, তাহলে বেশি নম্বর পেতে কোনই অসুবিধা হবার কথা নয়।

আর একটা কথা—শ্লোক মুখস্থ দেওয়া হয় 'সূক্তি রত্নাবলী' থেকে। সুতরাং সূক্তি রত্নাবলীর শ্লোকগুলি যদি মুখস্থ করে বাড়িতে বেশ কয়েকবার লেখা হয়, তাহলে এই প্রশ্নের পুরো নম্বর যে কেউ পেতে পারে।

সবশেষে আরো একটা কথা বলি—বানান সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, দন্ত্য ন, মূর্ধন্য ণ, তালব্য শ, দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ ই ঈ উ, ঊ—এইগুলি লেখার সময়, বিশেষত ব্যাকরণ অংশ লিখতে খুবই খেয়াল রাখতে হবে।

সংস্কৃতের একজন প্রধান পরীক্ষক হিসাবে আমি মনে করি উপরের এই উপদেশগুলি মেনে চললে সংস্কৃত বিষয়ে বেশি নম্বর তুলতে কোনই অসুবিধা হবার কথা নয়। বেশি নম্বর উঠবেই।

অঙ্কের হেড এগজামিনার লিখছেন

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রবর্তিত দশক্লাসের পরীক্ষা দ্বিতীয়বার হয়ে গেল। গত বছরের মত এবারও অধিকাংশ ছাত্রই অঙ্কে অনুত্তীর্ণ হয়েছে। তাই আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের সঙ্গে আমরা সকলেই বেশ দুশ্চিন্তায় পড়েছি।

ছাত্রছাত্রীদের অঙ্কের ব্যাপারে চিন্তা যাতে কমে, তার জন্যই এই লেখা।

অঙ্কে ছাত্রদের মোটামুটি দুটি দল আছে। এক—যাদের অঙ্কে বিশেষ মাথা নেই। এবং দুই—যাদের অঙ্কের মাথা খুব পরিষ্কার।

প্রথম দলের সমস্যার কথাই আগে আলোচনা করা যাক। তোমরা যদি অঙ্কের প্রাথমিক ব্যাপারগুলি সম্পর্কে একটু সতর্ক হও এবং নিচু ক্লাসের সহজ অঙ্কগুলি ও সেই নিয়মের অন্যান্য অঙ্ক মন দিয়ে করো, তাহলে পাস করার মত নম্বর তো বটেই, ৫০ থেকে ৬০ নম্বরও অতি সহজেই তুলে নিতে পারবে।

প্রশ্নপত্রের মোটামুটি দুটি অংশ। প্রথম—অবজেক্টিভ টাইপ। এবং দ্বিতীয়—বড় বড় অঙ্ক ও জ্যামিতি। এখন, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অঙ্কের পাঁচটি বিভাগই খুব ভাল করে রপ্ত করতে হবে।

অবজেকটিভ অঙ্কে থাকে ১৬ নম্বর। এতে ১০ নম্বর তুলতে হলে অঙ্কের নিম্নলিখিত বিভাগগুলি মন দিয়ে অভ্যাস করা চাই।

পাটীগণিত

১। সরল অঙ্ক সমাধানের নিয়ম।

২। দশমিক সংখ্যার ভগ্নাংশে পরিবর্তন।

৩। ভগ্নাংশের দশমিক সংখ্যায় পরিবর্তন।

৪। বর্গমূল নির্ণয় পদ্ধতি।

জ্যামিতি

বিভিন্ন ধরনের ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, সামান্তরিক, বৃত্ত, রম্বস প্রভৃতি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান ও এগুলির সঠিক সংজ্ঞা।

বীজগণিত

যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং সাধারণ কয়েকটি ফর্মুলা। এগুলি খাতায় লিখে লিখে অভ্যাস করা দরকার। তারপর এইসব ফর্মুলা যেসব অঙ্কে প্রয়োজন, সেইসব অঙ্ক করতে হবে। ফর্মুলা ভুললে অঙ্ক করা অসম্ভব।

পরিমিতি

বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, ত্রিভুজ, বৃত্ত, সমকোণী চৌপল, লম্ব-বৃত্তাকার চোঙ, গোলক প্রভৃতির ক্ষেত্রফল, ঘনফল, পরিধি, পরিসীমা ইত্যাদির ফর্মুলা মনে রাখতে হবে। এগুলি থেকে ছোটখাট অঙ্কও আসতে পারে।

ত্রিকোণমিতি

উচ্চতা ও দূরত্বের ছোটখাট অঙ্ক অভ্যাস করা দরকার। এছাড়া অভেদ, মাননির্ণয় প্রভৃতির সাধারণ নিয়মাবলী শিখতে হবে।

দ্বিতীয় অংশের অর্থাৎ বড়সড় অঙ্কের জন্য :—

বীজগণিত

উৎপাদক, লসাগু ও গসাগু নির্ণয়, সমীকরণের লেখচিত্র সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী ও সমাধান বিশেষ কঠিন নয়।

জ্যামিতি

উপপাদ্যের প্রমাণ ভুলে গেলেও প্রশ্নানুযায়ী শুধুমাত্র চিত্র আঁকলেও কিছু নম্বর পাওয়া যাবে। রেখা ও কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করা, লম্ব আঁকা, বৃত্ত ও বৃত্তের স্পর্শক আঁকা, সদৃশকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন প্রভৃতির নিয়মাবলী মনে রাখতে হবে। এগুলির প্রায় সবই নিচু ক্লাসে শেখান হয়ে থাকে।

পাটীগণিত, পরিমিতি ও ত্রিকোণমিতির প্রশ্নের অঙ্কগুলি বারবার অভ্যাস করতে হবে। পাটীগণিতে সুদকষা, শতকরা, মিশ্রণ, সম্ভূয়-সমুত্থান ভাল করে অভ্যাস করলে ভাল নম্বর পাওয়া যায়।

সুতরাং, একটু চেষ্টা করলেই অঙ্কে শুধু পাস করা কেন, তার চেয়ে কিছু বেশী নমবর প্রায় সকলেই পেয়ে যেতে পারো। শুধু দুটো কথা মনে রাখতে হবে। এক—মুখস্থ করে অঙ্কে নম্বর পাওয়া খুব কঠিন। দুই—প্রত্যেক পরীক্ষার্থীরই উচিত অঙ্কের প্রতি চিরাচরিত ভীতি কাটিয়ে ওঠা।

মেধাবী ছাত্রদের প্রতি :—

সাধারণ ছাত্রদের যা বললাম, তাতে খুব ভাল নম্বর পাওয়া যায় না। তোমাদের আরও কতকগুলি বিশেষ ব্যাপারের দিকে মনোযোগী হতে হবে।

(১) খাতাটি যেন ঝকঝকে ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়।

(২) প্রতিফলন, আবর্তন ঘূর্ণন প্রতিসাম্য ও করেস-পন্ডেন্স—এই কয়েকটি নতুন জ্যামিতিক জিনিস শেখা।

(৩) বীজগণিতে বাস্তব রাশি, এগুলির বিভিন্ন প্রক্রিয়া, সেট থিয়োরি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান ও ডিটারমিনান্ট পদ্ধতিতে সমীকরণ সমাধান, অসমীকরণ সংক্রান্ত প্রশ্নাবলীর লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান অভ্যাস করা দরকার।

(৪) পরিমিতিতে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত জটিল অঙ্কগুলির সমাধান।

(৫) ভাল ভাল স্কুলের নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সমাধান।

(৬) নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও আরও কয়েকটি অংক বইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ।

গণিতের ক্ষেত্রে এইসব বিষয়গুলি মেনে চললে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা খুব সহজেই ভাল নম্বর তুলে নেবে। চাই কী ৮০ থেকে ৯০-এর ওপরেও পেয়ে যেতে পারে।

শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়

পর্ষৎ কীরকম উত্তর চান

শ্রীশান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়ের একটা পরিচয়, তিনি দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ একজন অধ্যাপক; আর অন্য পরিচয় এই যে, তিনি মধ্যশিক্ষা পর্ষতের ডেপুটি সেক্রেটারি (অ্যাকাডেমিক)। সুতরাং তিনিই যখন জানিয়ে দিচ্ছেন যে, পর্ষৎ কীরকম উত্তর চান, তখন প্রতিটি মাধ্যমিক-পরীক্ষার্থীরই উচিত হবে—এই লেখাটি খুবই মনোযোগ দিয়ে পড়া। তাই না?

পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের কাছে আমরা কীরকম উত্তর চাই এ-কথার একটাই জবাব: ভাল উত্তর। এই ভালর সংজ্ঞা বা মাত্রা নিয়ে মতভেদের অবকাশ হয়তো থাকতে পারে। কিন্তু ভাল কী, সে-কথা বোধহয় সংশ্লিষ্ট সকলেই বুঝতে পারেন। যেমন যে-কোনও ছাত্র পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর লিখে নিজেই বুঝতে পারে ভাল পরীক্ষা দিয়েছে কিনা। কতটা ভাল, তা নিয়ে প্রশ্ন হতে পারে। মেধার তারতম্য অনুসারে ভালর মাত্রাভেদ নিশ্চয়ই থাকবে। তবে বয়স ও অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করে একটি স্কুলের ছাত্রের উত্তরের মান মোটামুটি ভাল, না বেশ ভাল, না খুব ভাল, অভিজ্ঞ শিক্ষকের পক্ষে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা বোধহয় কঠিন নয়।

কঠিন নয় বিশেষ করে আমাদের নতুন ধরনের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে। পূর্বে বিদ্যালয়-স্তরেও রচনাশ্রয়ী (এসে-টাইপ) প্রশ্নের প্রাধান্য ছিল। ফলে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটা একেবারে গৌণ ছিল না। তাই মূল্যায়নের সুনির্দিষ্ট কোন মাপকাঠি তৈরি করা তত সহজ ছিল না। এখন ঐধরনের আশঙ্কা প্রায় অমূলক বলা যেতে পারে প্রশ্নগুলি যখন প্রধানত বিষয়মুখী (অবজেকটিভ টাইপ) সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক এবং সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক।

একটা কথা এখন মনে হয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, পরীক্ষায় মুখস্থ বিদ্যাকে (ক্র্যামিং) আর মূলধন করা চলবে না। পাঠ্য-পুস্তকগুলি আদ্যন্ত পড়তে হবে। বুঝতে হবে। কারণ প্রতিটি বিষয়ে সমগ্র পাঠক্রম জুড়েই প্রশ্ন থাকার কথা। আর প্রতিটি বিষয় থেকে বহু রকমের নতুন-নতুন প্রশ্ন করা যেতে পারে, যার ফলে পরের পরীক্ষাগুলিতে নিশ্চিত প্রশ্ন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং আগে যেমন পাঠ্যবস্তুর কয়েকটি প্রধান অংশ বেছে নিয়ে অনুমিত বা সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি তৈরি করলেই ভাল নম্বর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকত, এখন তেমনটি চলবে না।

প্রথমে ভাষার কথায় আসি। তিনটি ভাষায় পূর্ণমান ৪০০। অধিকাংশ পরীক্ষার্থীরই প্রথম ভাষা বাংলা। অন্য ষোলটি অনুমোদিত ভাষার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম অনুসৃত হবে। বাংলা প্রশ্নপত্রটি দেখলেই প্রথমে যে কথাটি নজরে পড়ে তা হচ্ছে: প্রশ্নের উত্তর যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'যথাযথ' কথার অর্থ, যে-প্রশ্নের জন্য যতটুকু উত্তর দেওয়া দরকার ঠিক ততটুকুই লিখতে হবে। বেশিও নয়। কমও নয়। এই মাত্রাজ্ঞানের উপর উত্তরের মান নির্ভর করে।

আর একটি কথা: মূল প্রশ্নের অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের উত্তর রচনার সময় পৃথক-পৃথক অনুচ্ছেদ ব্যবহারের নির্দেশ আছে। প্রদত্ত প্রশ্নের প্রতিটি অংশের জন্য পৃথক-পৃথকভাবে মূল্যমান নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন অংশের উত্তর লিখতে কতটুকু সময় নেবে এবং কেমনভাবে কতটুকু লিখবে সে বিষয়ে পরীক্ষার্থীকে সচেতন করা। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর যেমন তাকে দিতে হবে তেমনি উত্তরের আঙ্গিকটির দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। নিছক রচনাশ্রয়ী প্রশ্নে ছাত্র তার সময়-সীমা শ্রম ও বক্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারত না। স্বভাবতই উত্তর যথাযথ করার ভাবনা তেমন ছিল না। ফলে বিষয়বহির্ভূত বহু অপ্রাসঙ্গিক জিনিস উত্তরের মধ্যে চলে আসত। বাংলা ও ইংরেজি উত্তরপত্রে এই ত্রুটি অল্পবিস্তর প্রায় সকলের মধ্যে দেখা যেত। প্রশ্নের অস্পষ্টতার জন্য ছাত্র সব সময়ে বুঝতে পারত না কতটা লিখলে ভাল হবে। এখন প্রশ্নের মধ্যে সে অস্পষ্টতা থাকছে না।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'লুই পাস্তুর' নিবন্ধ থেকে প্রশ্নাংশ তুলে ধরছি। গত বছরে প্রশ্ন ছিল: কোন আবিষ্কারের জন্য লুই পাস্তুর জগদ্‌বিখ্যাত? এবারের প্রশ্ন: লুই পাস্তুরের আবিষ্কারের পরিচয় দাও।

গত বছরের প্রশ্নের উত্তরে একজন লিখল: জলাতঙ্ক প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য। আর একজন লিখল: লুই পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগ নিবারণের সিরাম আবিষ্কার করে জগদ্‌বিখ্যাত হয়েছিলেন।

প্রথম উত্তরটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ। কারণ বাক্যটিই অসম্পূর্ণ। দ্বিতীয় উত্তরটি ভাল। কারণ সংক্ষিপ্ত, যুক্তি-সম্মত এবং যথাযথ।

ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষার প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় অনুরূপভাবে চিন্তা করতে হবে। প্রশ্ন দেখা যায় Who says this and in what connection? প্রশ্নটির দুটি অংশ। সুতরাং দুটি অনুচ্ছেদে উত্তর দেওয়া বাঞ্ছনীয় এবং দুটি অংশের কোনটিতেই বাক্য যেন অসম্পূর্ণ না থাকে। দ্বিতীয় কথা পাঠ্যবস্তু (টেক্সট) থেকে প্রশ্নে যেখানে নির্দেশ থাকে প্রথম অংশ দুটি বাক্যের মধ্যে, দ্বিতীয় অংশ পাঁচটির বেশি বাক্যে নয়, এবং তৃতীয় অংশ তিনটি বাক্যে উত্তর করতে হবে সেখানে সেই নির্দেশ যথাযথ পালন করতে হবে। শুধু জানলেই হবে না। সেই জানাটুকু প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে সুন্দরভাবে গুছিয়ে প্রকাশ করতে হবে। তবেই উত্তর ভাল বলে চিহ্নিত হবে। অল্প কথায় বক্তব্য ঠিকমত প্রকাশ করার ক্ষমতা আছে কিনা সেটা বিশেষভাবে পরীক্ষণীয়। আবার প্রথম প্রশ্নে যেখানে এক-এক করে চার নম্বর কিংবা তিন নম্বর প্রশ্নে এক-এক করে তিন নম্বর, সেখানেও কিন্তু উত্তর একটা শব্দের মধ্যে থাকলেও প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাক্যে উত্তর দেওয়া ভাল। যেমন ১(এ) cruel শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ চাওয়া হয়েছে। সেখানে শুধু kind শব্দটা না দিয়ে লেখা উচিত: The word opposite in meaning to 'cruel' is kind'. অথবা The word 'kind' is opposite in meaning

to 'cruel' ঠিক তেমনিভাবে এক নম্বর ও তিন নম্বর প্রশ্নের অন্যান্য অংশগুলির উত্তর লিখতে হবে।

পাঠ্যপুস্তকের প্রশ্ন ছাড়াও রচনামূলক প্রশ্ন যেমন 'প্যারাগ্রাফ' 'লেটার' এবং 'সামারি' ইত্যাদি লেখার জন্য নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। সেই সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তথ্য ছাত্রছাত্রী যত সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারবে, তার উত্তরের মান তত উন্নত হবে।

ব্যাকরণের ক্ষেত্রেও মামুলি মুখস্থ বিদ্যা বর্জনের ব্যবস্থা হচ্ছে। ইডিয়ম-ফ্রেজ সম্বলিত প্রশ্নে তোতাপাখির বাক্যবুলি এখন আওড়াতে হয় না। ইডিয়মগুলির অর্থ সঠিকভাবে জানলে তবেই এই প্রশ্নের উত্তর করা যাবে। ইংরেজি ব্যাকরণের সঙ্গে বানান সম্পর্কেও যতদূর সম্ভব সতর্ক হতে হবে। অনেক ভাল-ভাল ছাত্রছাত্রীর উত্তরপত্রের মধ্যেও মারাত্মক বানান-ভুল দেখা যায়। অথচ একটু সাবধান হলেই এই ভুলগুলি এড়ানো যায়। একটি বেশ ভাল উত্তরপত্রে Reference বানানে দুটো r, reckon বানানে wr এবং এইরকম কয়েকটি ভুল থাকলে ছাত্রটির সম্পর্কে পরীক্ষকের ধারণা খারাপ হবেই। 'বানানের জুজু' অনেক তুলে ধরা যায়। তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। শুধু এইটুকু বলা বোধহয় দরকার ঃ সাধারণ ভুলের জন্য অনেক মাশুল দিতে হয়। সুতরাং এরকম ভুল যাতে না ঘটে সে-বিষয়ে ছাত্রদের সজাগ থাকতে হবে। ভাবপ্রকাশের জন্য বাক্যরচনার সময় tense-এর সঠিক ব্যবহার করতে হবে। ক্রিয়াপদ অনেক সময়েই তারা ঠিকমত ব্যবহার করে না।

তৃতীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত গদ্য ও পদ্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণও শিখতে হবে। যেমন সংস্কৃতে, তেমনি অন্য তৃতীয় ভাষার ক্ষেত্রে একই নিয়ম। এখানে ব্যাকরণে ২৫ এবং অনুবাদে ২০ নম্বরের মধ্যে সহজেই প্রায় পুরো নম্বর পাওয়া যায় উত্তর মোটামুটি নির্ভুল হলে। পাঠ্যগ্রন্থের গদ্য ও পদ্যের প্রশ্নের উত্তর মোটেই কঠিন মনে হবে না পাঠ্যবিষয়গুলি ভাল করে পড়া থাকলে।

ভাষার পরেই বিজ্ঞানের প্রাধান্য। গণিত, জড়বিজ্ঞান ও জীবনবিজ্ঞান তিনটি নিয়ে যে গ্রুপ বা বিভাগ তার পূর্ণমান ৩০০। জীবনবিজ্ঞানের সঙ্গে এখনো সকলের সম্যক পরিচয় হয়নি। তাই প্রথমেই জীবনবিজ্ঞানের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা বোধ হয় ভাল। এটিতে প্রশ্নের ধরনে চারটি প্রকারভেদ লক্ষ করা যায়। প্রথমটি বিষয়মুখী (অবজেকটিভ টাইপ) ও আবশ্যিক। ছোট ছোট প্রশ্ন, এক বা দু নম্বরের। প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নপত্রের উপরেই লিখতে হচ্ছে। এই অংশের উত্তরের জন্য সমর্থনযোগ্য যুক্তি বা ব্যাখ্যা দিতে হয় না। সুতরাং একটাই উত্তর ঃ 'হ্যাঁ' বা 'না'-এর মত।

দ্বিতীয় ধরনের প্রশ্নে সংক্ষিপ্ত উত্তর। উত্তরের দুটি অংশ, কী ও কেন। অর্থাৎ উত্তরের সঙ্গে যুক্তি থাকে। তৃতীয় ধরনের প্রশ্নের উত্তরে তিনটি ভাগ ঃ (১) তথ্যের বিবরণ (২) যুক্তিসহ বর্ণনা (৩) বর্ণনার মধ্যে সঠিক শব্দের (টেকনিক্যাল টার্মস) প্রয়োগ। যেমন আঙুলের কোষের পুষ্টি সম্পর্কে বলতে গেলে অন্ত্রে খাদ্যহজম হওয়ার কথা থেকে রক্তে মিশ্রণের কথা, শিরার সাহায্যে হৃৎপিণ্ডে রক্তের সঞ্চালন এবং হৃৎপিণ্ড থেকে ধমনীর মাধ্যমে আঙুলের কোষে ছড়িয়ে পড়ার কথা বলতে হবে। চতুর্থ ধরনের প্রশ্নে ছবি আঁকা এবং ছবির বিভিন্ন অংশের সঠিক নামকরণ করতে দেওয়া হয়। পরীক্ষণ (এক্সপেরিমেনটেশন) শিক্ষালাভের উপর গুরুত্ব দেওয়ার জনাই এটা আবশ্যিক। প্রশ্নপত্রটি বিশ্লেষণ করলেই প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে সঠিক ধারণা হবে। এখন সাধারণের জন্য যেমন সহজ প্রশ্ন আছে তেমনি যোগ্যতর পরীক্ষার্থীদের জন্য কিছু জটিল প্রশ্নও আছে। নইলে যোগ্যতার প্রকৃত যাচাই কেমন করে হবে?

জড়বিজ্ঞানেও অনুরূপভাবে প্রশ্নের রীতি পরিবর্তিত হয়েছে। প্রশ্নগুলি তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম বিভাগে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যা নিয়ে সাধারণ জড়বিজ্ঞান থেকে প্রশ্ন; বাকী দুটি বিভাগের একটিতে পদার্থবিদ্যা এবং অন্যটিতে রসায়ন থেকে প্রশ্ন (১৬+৩২+৩২)। প্রশ্নগুলি সংক্ষিপ্ত-উত্তরভিত্তিক। তথ্যের বিবরণ বড় একটা দিতে হয় না। দুরকম উত্তর হতে পারে অর্থাৎ কোন অস্পষ্টতা থাকতে পারে, এ-রকম প্রশ্ন থাকে না। সমস্যা তুলে কীভাবে সমাধান হতে পারে জানতে চাওয়া হয়। বিষয়টি ভালভাবে না জানলে ঠিক উত্তর হবে না। প্রশ্নগুলি মূলত বিষয়মুখী (অবজেকটিভ টাইপ) এবং কিছু-কিছু বিবরণমূলক। শূন্য স্থান পূরণের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের জ্ঞান পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

গণিতের প্রশ্ন শুরু হচ্ছে অবজেকটিভ টাইপের প্রশ্ন দিয়ে যার উত্তর প্রশ্নপত্রের উপরেই লিখতে হয়। পরবর্তী অংশে বীজগণিত, পাটীগণিত, ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি ও পরিমিতি থেকে প্রশ্ন থাকছে। প্রশ্নপত্রে কিছু-কিছু বাস্তব সমস্যা এবং জীবনের বাস্তব ছবি তুলে ধরা হচ্ছে। গণিতের বিভিন্ন শাখার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কিছু কিছু অঙ্ক বীজগাণিতিক সমীকরণ অথবা লেখচিত্র বা পাটীগণিতের মাধ্যমে করা যায় বোঝা যাচ্ছে। জ্যামিতির প্রশ্নের ধরন সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। এখন আর উপপাদ্য প্রমাণ করতে দেওয়া হয় না। উপপাদ্যের কয়েকটা অংশ দেওয়া হয়। তার থেকে উপপাদ্য সম্পূর্ণ করে নিতে হয়। জ্যামিতিতে পরীক্ষার্থীর দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছে। যুক্তি ভাল করে শিখতে হবে। যাই হোক, সব মিলিয়ে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় গণিতের শতকরা ৫০ ভাগ প্রশ্ন সহজ, ৩০ ভাগ মাঝারি এবং বাকী ২০ ভাগ কঠিন। এই কঠিন অংশেই উচ্চমেধাসম্পন্ন ছাত্রদের মান নির্ণীত হয়ে থাকে।

ভারত ও তার জনগণ অর্থাৎ ইতিহাস ও ভূগোলে মোট ২০০ নম্বর। ইতিহাসের প্রশ্নপত্র আলোচনা করলে চার রকমের প্রশ্ন দেখতে পাব। এক ঃ বিষয়মুখী প্রশ্ন (অবজেকটিভ টাইপ) ঃ তিনভাগে বিভক্ত সমগ্র পাঠক্রমের তিনটি বিভাগ থেকেই প্রশ্ন হয়েছে। এর বিকল্প ঃ প্রদত্ত মানচিত্রে ঐতিহাসিক স্থান নির্দেশক প্রশ্ন। দুই ঃ সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ এটি আবশ্যিক। তিন ঃ সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ অনুপাত অনুসারে তিনটি বিভাগ থেকেই করা হয়েছে। চার ঃ রচনাত্মক প্রশ্ন। তথ্যবহুল উত্তর যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা পরীক্ষার্থী অর্জন করেছে কিনা প্রয়োজনমত দীর্ঘ উত্তরে তারই পরীক্ষা। বলা বাহুল্য প্রশ্নগুলির মূল্য-মান অনুযায়ী উত্তরের পরিধি নির্ভর করবে। ভূগোলের পাঠক্রমকে অনুরূপভাবে ভাগ করে প্রশ্নপত্র রচিত হয়। এখানে পাঁচটি পর্ব। নির্দেশ আছে প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঠিক ও সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নের প্রকারভেদ একইভাবে করা হয়েছে এবং কাঠিন্যের স্তরভেদও অনুরূপ।

আবার সেই গোড়ার কথায় ফিরে আসি। কারণ, কী লিখলে, কীভাবে লিখলে ভাল নম্বর পাওয়া যায় তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। বাঁধা নিয়ম হল ভাল করে লিখলে ভাল নম্বর পাওয়া যায়। ভাল করে লেখার মূল কথা হল বই খুঁটিয়ে পড়া, নিজের ভাষায় লিখতে শেখা। আর লিখতে গিয়ে প্রশ্নপত্রের গোড়ায় যে নির্দেশ দেওয়া থাকে তা মনে রাখা। প্রশ্নপত্রের নতুন রীতির সঙ্গে পরিচয় যত নিবিড় হবে উত্তরের মান ও প্রকাশভঙ্গি তত উন্নত হবে।

প্রথম দেবাশিস, প্রথমা সোমা জানাচ্ছে

'পরীক্ষার জন্য কীভাবে তৈরি হয়েছিলাম'

মাসিক আনন্দমেলার পাতাতেই বেশ কয়েক মাস আগে সেন্ট লরেন্স স্কুলের ফার্স্ট বয় দেবাশিস বসুর পরিচিতি বেরিয়েছিল। সেই দেবাশিসই এই ১৯৭৭ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। অভিনন্দন জানাবার জন্যে ওদের শরৎ বসু রোডের বাড়িতে যেতেই এক মুখ হেসে অভ্যর্থনা জানাল দেবাশিস।

বললাম, "ফার্স্ট হওয়ার খবর পাওয়ার পরে আনন্দমেলার কথা মনে পড়েছিল?"

"পড়বে না আবার!" লাজুক মুখে দেবাশিস বসতে বলল আমাকে।

দেবাশিস মোট ৮৫৭ নম্বর পেয়েছে। ইংরেজি ৬৭, বাংলা ১৫২, সংস্কৃত ৮৭, ফিজিক্যাল সায়ান্স ৯০, লাইফ সায়ান্স ৭৮ অঙ্ক ৯৩, অতিরিক্ত অংক ৮১, ইতিহাস ৭৮, ভূগোল ৮৬ এবং কর্মশিক্ষা ইত্যাদিতে ৭১।

আগের কথার জের টেনে দেবাশিস বলল, "প্রথম সংখ্যা থেকেই আমি আর আমার দাদা মাসিক আনন্দমেলার পাঠক। এই পত্রিকা থেকে অনেক উপকার পেয়েছি। নিয়মিত 'লেখাপড়া' বিভাগটি ছাড়াও পুজো সংখ্যার বিশেষ রচনা 'কীভাবে নম্বর বাড়াতে হয়' আমার দারুণ কাজে এসেছিল।"

"আনন্দমেলার সঙ্গে তোমার এতদিনের পরিচয়! জানতাম না তো।"

"হ্যাঁ। লিখবেন, আমি নিজেকে আনন্দমেলারই একজন বলে মনে করি।"

পাশ থেকে সোৎসাহে সম্মতি জানালেন দেবাশিসের সবকিছুর প্রেরণাদাত্রী মা ছন্দা বসু আর দাদা দীপংকর।

"টেস্টের পরে পড়ার সময় বাড়িয়ে দিয়েছিলে?"

"না। সেই ৮।৯ ঘণ্টাই পড়তাম।"

যে-কোনও বিষয়েই দেবাশিস প্রথমে স্কুলের নির্বাচিত বইটির একটি গোটা অধ্যায় খুব ভালভাবে পড়ে নিত। তারপর পড়ত ওই বিষয়ের ওপর অন্যান্য বই। বাইরের বইয়ে পাওয়া বাড়তি পয়েন্টগুলোও ও সযত্নে নোট করে নিত। এমনি করেই সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ওর ধারণা সুন্দরভাবে তৈরি হয়ে যেত।

"তারপর উত্তরের সংক্ষিপ্তসারের মতন করে নিতাম। আবার বইয়ের সঙ্গে মেলাতাম কিংবা শিক্ষকদের কাছে জিজ্ঞাসা করতাম। মেলানো বা আলোচনার পরে কিছু প্রশ্নোত্তর বই কিংবা টেস্ট পেপার্স থেকে সমাধান করতাম। যেগুলো বিশেষভাবে বুদ্ধির প্রশ্ন বা 'চ্যালেঞ্জ' বলে মনে হত সেগুলোর পূর্ণাংগ উত্তর তৈরি করে স্কুলের শিক্ষকদের দিয়ে সংশোধন করিয়ে নিতাম।"

সেন্ট লরেন্স স্কুলেই একাদশ শ্রেণীতে পড়ছে দেবাশিস। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক এবং ফোর্থ সাবজেক্ট বায়োলজি নিয়ে। সেন্ট লরেন্সের শিক্ষকমণ্ডলী সম্পর্কে ওর শ্রদ্ধা ও আস্থা অগাধ।

ইংরেজির মাধ্যমে পড়াশোনা করার জন্যই দেবাশিসের ইংরেজির ভিত শক্ত। টেক্সট বই খুব ভাল করে পড়ত, বাইরের নোট বইয়ের আকর্ষণ ওর কাছে কিছুমাত্র ছিল না। ক্লাসে পড়ানোর সময় ফাদার সিলভাই ক্ষেত্রবিশেষে যে-সব মূল্যবান আলোচনা করতেন, ও সেগুলো খাতায় নোট করে রাখত এবং পরে পড়ে নিত। টেস্ট পেপার্স তো ব্যবহার করতই। নিয়মিত ক্লাস-টেস্টের ফলেও প্রস্তুতি ভালভাবেই হয়ে যেত। আর সিলেবাসে গ্রামার যা আছে তা ওর কাছে জলবৎ তরলং। বাংলার ক্লাসে আলোচিত বিষয়গুলি বাড়িতে লিখে অভ্যাস করত দেবাশিস।

লেখা আর লেখা! লেখাই দেবাশিসকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে।

ও সবচেয়ে বেশি পড়েছে লাইফ সায়ান্স ও ফিজিক্যাল সায়ান্স। এবং লিখেছেও সবচেয়ে বেশি।

"ক্লাসের বই পড়তাম। যতটা সম্ভব বাইরের রেফারেন্স বই পড়তাম। সিলেবাস অনুযায়ী বই, উঁচু স্ট্যান্ডার্ডের বইয়ের বিশেষ বিশেষ অংশ—সবই।"

রবার্টস-এর "বায়োলজি অব ফাংশনাল অ্যাপ্রোচ" বইয়ের কথা ও আবার জানাল, আর কুণ্ডু-দাশ-কুণ্ডু, তারকমোহন দাশ এবং রবীন্দ্রনারায়ণ পালের বইয়ের কথা।

"লাইফ সায়ান্সে লেটার পেলে না কেন?।"

কুণ্ঠিতভাবে ও জানাল, লাইফ সায়ান্স ও সংস্কৃত পরীক্ষা অসুস্থ অবস্থায় দিয়েছে। তাছাড়া, পরীক্ষাকেন্দ্রে অবজেকটিভের প্রশ্নপত্র বিলির গোলমালে কুড়ি মিনিট সময় নষ্ট হয়েছিল।

ফিজিক্যাল সায়ান্সে কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রীকিঙ্কর গাঙ্গুলীর সাহায্যের কথা স্মরণ করল দেবাশিস। বিষয়টিতে চার্ট তৈরি করে পড়ার পদ্ধতি অনুসরণ করে সুফল পেয়েছে বলে মনে করে ও।

অংকে দেবাশিস ওর এক পিসি—শ্রীমতী প্রতিমা সেনের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। ক্লাস সিক্স থেকেই পিসি ওকে অঙ্ক দেখিয়ে দেন। উনি বরাবর বলে আসছেন, "কঠিন হোক, সহজ হোক, কোনও অংকই বাদ দেবে না।" তাই দেবাশিস এক্সারসাইজের সব অংকই করত। এবং অংক অভ্যাস করত রোজই।

ভূগোলে, ইতিহাসে দেবাশিস বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রস্তুত হয়েছে। ওর সব সময়েই লক্ষ্য ছিল বিষয়ের মূলে পৌঁছানো। যেমন ভূগোলে পোশাক, বাসস্থান, খাদ্য পড়তে গিয়ে চিন্তা করেছে ঐ সব বিষয়ে দেশভেদে বিভিন্নতার কারণ কী। ওর বিশ্বাস এইভাবে পড়েই ও উপকৃত হয়েছে। "এভাবে পড়লে কতকগুলো সাধারণ সূত্র পাওয়া যায়, সেগুলো প্রয়োগ করতে পারলেই হল।"

> 'প্রথম সংখ্যা থেকেই মাসিক আনন্দমেলার পাঠক' দেবাশিস বসু এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। ওদিকে মেয়েদের মধ্যে প্রথম সোমা রায়চৌধুরী আনন্দমেলার প্রতিনিধিকেই জিজ্ঞেস করে বসে—'সত্যি, খুব ভাল আনন্দমেলা, তাই না?'

ম্যাপের ব্যবহার দেবাশিস যথেষ্ট করেছে। ভূগোলে দেবাশিস দুটি বই থেকে দারুণ উপকার পেয়েছে এবং সে দুটি ও সকলকে জানাতে চায়। সরলকৃষ্ণ দত্ত ও মনোরঞ্জন ভাণ্ডারীর অষ্টম শ্রেণীর ভূগোল বইটি ওর মতে একটা 'গোল্ড মাইন'। "ভূগোলের উত্তর সঠিকভাবে লেখার কায়দা এর মতন আর কোনও বইতে পাইনি। এই দেখুন না, পাট-শিল্পের উপর (১) উৎপত্তি, অবস্থানের কারণ (২) উৎপাদন (৩) শিল্পের সমস্যা (৪) সম্ভাবনা—এইরকম করে সুন্দরভাবে আলোচনা রয়েছে। আবার, দুর্গাপুরে কী-কী কারণে লোহ-ইস্পাত কারখানার অবস্থান হয়েছে তার অজস্র কারণ দেওয়া রয়েছে—'রানীগঞ্জ কয়লাখনি থেকে প্রচুর উঁচু মানের কয়লা ও দুর্গাপুর কোক ওভেন কারখানা থেকে কয়লা পাওয়ার সুবিধা, ডি ভি সি থেকে বিদ্যুৎ ও জল পাওয়ার সুবিধা, সিংভূমের খনিগুলি থেকে লোহ আকরিক পাওয়ার সুবিধা। কী সুন্দর বই বলুন তো!" অপর বইটি দেখলাম প্রীস অ্যান্ড উড-এর ফাউন্ডেশন অব জিওগ্রাফি।

সেইরকম ইতিহাসে ডি এন কুন্দ্রা ও নিমাইসাধন বসুর বই দুটির নাম করল দেবাশিস। আর শিক্ষক শ্রীঅজিত দাশগুপ্তের। ইতিহাসও ওর পদ্ধতি সেই একই—মূলে প্রবেশ করা। "যেমন, বিভিন্ন সাম্রাজ্যের পতনের কারণ আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, কতকগুলি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হলেই সাম্রাজ্যের পতন হয়। যদি সেগুলি বোঝার চেষ্টা করি, তাহলেই তো আমার অর্ধেক কাজ শেষ।" এইভাবেই ইতিহাস আয়ত্ত করেছে দেবাশিস।

সংস্কৃতে শ্রীহৃষীকেশ বসুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে দেবাশিস সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে অনুবাদে। বহুদিন ধরে সব সময়েই কোনও কিছু অংশকে অনুবাদ করতে করতে ওর সংস্কৃতে দখল এসেছে। "ট্রানস্লেশন করতে পারলেই তো ভাষায় দখল আসে।" প্রসঙ্গত ও এ সি দে-র বইটির নাম করল। এই বইটি থেকেও ও উপকৃত হয়েছে।

দেবাশিসের বাবা শ্রীদেবদাস বসুর সঙ্গে দেখা হল না। উনি প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিসের অফিসার। আনন্দমেলার পক্ষ থেকে দেবাশিসকে আবার অভিনন্দন জানিয়ে অফিসে ফেরার জন্যে প্রস্তুত হলাম। বিদায় দিতে এগিয়ে এসে দেবাশিস বলল, "যা বললাম, আনন্দমেলার পাঠক-পাঠিকাদের যদি তা কাজে লাগে তাহলে আমি ভীষণ খুশি হব, এ-কথাটাও লিখবেন কিন্তু।"

দেবাশিসদের আদি বাড়ি খুলনায়। খুলনার কাটিপাড়া গ্রামে—যে গ্রাম ভারতকে দিয়েছে আচার্য পি সি রায়। সোমাদের বাড়িও বাংলাদেশে—ফরিদপুরে। সোমার বাবা শ্রী পি কে রায়চৌধুরী জেনারেল ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের অফিসার। মা শ্রীমতী ঝুনু রায়চৌধুরী। ঢাকা বেতারের এককালের খুব নামকরা সংগীতশিল্পী, আকাশবাণীতেও গেয়েছেন।

আটশো কুড়ি পেয়ে বাগবাজার মাল্টিপার্পাস গার্লস স্কুলের সেকেন্ড গার্ল সোমা ফাইনালে মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে। যুক্ত তালিকায় ফোর্থ। ওর নম্বর ঃ ইংরেজী ৬৫, বাংলা ১৩৩, সংস্কৃত ৭০, অঙ্ক ৯২ অতিরিক্ত অঙ্ক ৯৫, ফিজিক্যাল সায়ান্স ৯০, লাইফ সায়ান্স ৮০, ইতিহাস ৮০, ভূগোল ৮১ কর্মশিক্ষা ইত্যাদি ৬৮। লেটার পাওয়ার ব্যাপারে সোমা দেবাশিসকে হারিয়ে দিয়েছে। সোমা ভর্তি হয়েছে লেডি ব্র্যাবোর্নে। বিজ্ঞানের বিষয় চারটিই নিয়েছে।

মাসিক আনন্দমেলা থেকে আসছি শুনে ওর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, "কীভাবে নম্বর বাড়াতে হয় আলোচনাটা আমাকে খুবই কাজ দিয়েছে।"

জিজ্ঞেস করলাম, "কাজ দিয়েছে কীভাবে?"

"ভালোভাবে শেখা থাকলেও অনেকেই ভাল নম্বর তুলতে পারে না—উত্তর লেখার ধরনটা না জানা থাকার জন্যে। ওটা পড়ে ঐ

ধরন সম্পর্কে সুন্দর ধারণা পেয়েছি। আর মাসিক আনন্দমেলার 'লেখাপড়া' বিভাগ থেকে বিভিন্ন স্কুলের ফার্স্ট বয় ও গার্লদের পড়াশোনার পদ্ধতি সম্পর্কে পরিচিত হতে পেরেছি। কুন্তকের বানান শেখানোর কায়দাটাও ভারী সুন্দর। সত্যি, খুব ভাল আনন্দমেলা তাই না?"

আমাকেই প্রশ্ন করে বসল সোমা রায়চৌধুরী। একেবারে ছেলেমানুষ। ওর জন্ম ১৯৬২ সালের ২৬ মার্চ।

শুনে অবাক হলাম, পরীক্ষার মাত্র তিন সপ্তাহ আগে ওর অ্যাপেনডিক্স অপারেশন হয়। পরীক্ষার সময়েও যথেষ্ট দুর্বল ছিল, সব সময়েই ওর সঙ্গে ওষুধ থাকত। অনেকেই পরীক্ষায় বসতে নিষেধ করেছিলেন ওকে। শুধু মা বলেছিলেন, "কপাল খারাপ হলে পরের বার পরীক্ষার সময়ও আবার একটা-কিছু ঘটতে পারে।"

সোমা ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা পড়ত প্রতিদিন।

ও সবচেয়ে বেশি সময় দিত অঙ্কে। গত বছর আগস্টেই ওর অঙ্কের সিলেবাস শেষ হয়ে গিয়েছিল। অঙ্ককে ও সত্যিই খুব ভালবাসে। কঠিন মনে হলে একই অঙ্ক বারবার করত। "জ্যামিতির 'এক্সট্রা'ও খুব করতাম।" ওর অতিরিক্ত অঙ্কপ্রীতি দেখে মা বকুনি দিতেন, কারণ উনি ভেবেছিলেন, এর ফলে অন্যান্য বিষয়ে সোমা জোর দেবে না। অঙ্কের ওপর সোমা খুব জোর দিয়েছে। কেননা, "লেখা একটু এদিক-ওদিক হলেই অনেক নম্বর কাটা যায়। একবার ক্লাস সিক্সে, একটা চিহ্ন দিইনি বলে দশ নম্বর কাটা গিয়েছিল। আর একবার একটা অঙ্ক সাদামাটা পদ্ধতিতে করার জন্যে পুরো নম্বর পাইনি। সেই থেকে আর লেখার ভুল হয়নি।" অঙ্কে টেস্ট পেপার্স এবং বাইরের বইয়ের মধ্যে যাদব চক্রবর্তীর বই ও খুবই ব্যবহার করেছে।

ফিজিক্যাল সায়ান্সে সোমা প্রথমেই চ্যাপটার বুঝে নিত, তারপর নিজেই প্রশ্ন তৈরি করত। কিছু-কিছু প্রশ্ন টেস্ট পেপার্স থেকেও খুঁজে বের করত। "ছবি আঁকাটা বিশেষভাবে অভ্যাস করতাম। সব প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গেই ছবি থাকলে ভাল নম্বর পাওয়া যায়।"

বস্তুত ছবি আঁকাটা সোমাকে দারুণভাবে সাহায্য করেছে। ফাইনালে ও যেখানে পেরেছে ছবি এঁকেছে। ছবি আঁকায় ওর হাত বরাবরই ভাল। এই প্রসঙ্গে ওর স্কুলের 'শিল্পলোক'-এর নাম করল। ওখানেই ওর ছবি আঁকার হাতেখড়ি। "এটা যে আমাকে কীভাবে সাহায্য করেছে তা বলে বোঝাতে পারব না।" এমন কী ইতিহাসেও সোমা ছবি এঁকেছে। না, ম্যাপ নয়। সে-তো আছেই। ছবি মানে ছবিই। ওর দুঃখ ইতিহাসে ফাইনালে ছবি আঁকার সুযোগ বিশেষ পায়নি। "শুধু সমুদ্রগুপ্তের আমলের মুদ্রার ছবিটা এঁকে দিয়েছি।" ঘরের দেওয়ালে সোমার আঁকা দুটি সুন্দর ছবি সকলেরই চোখে পড়বে। ভূগোলে ও প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গেই ছবি এঁকেছে।

ইতিহাস ও ভূগোলে সোমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন মা। স্কুলের দিদিরা তো সব বিষয়েই সবরকম সাহায্য করেছেন। হেসে বলল, "জানেন, ইতিহাস আর ভূগোলে লেটার দুটো আসলে মা-ই পেয়েছেন। স্কুলের দিদিদেরও প্রত্যেকের কাছেই আমি ঋণী"

সোমা বরাবরই বেশি বই পড়ায়

আর্মাডিলো

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

ঝুমার পোষা জন্তু ছিল
আর্মাডিলো আর্মাডিলো
ওজন কিছু বেশিই ছিল
এক কেজি কম একুশ কিলো.
ঝুমার পোষা আর্মাডিলো
পিঁপড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল
বায়না যে তার পিঁপড়ে খাবে
ঝুমার কোলে হাওড়া যাবে
কিন্তু ভারি শরীর যে তার
বইতে ঝুমার মুখখানি ভার
কোল থেকে তাই নামিয়ে দিল
দুঃখ পেল আর্মাডিলো
হল না আর হাওড়া যাওয়া
পছন্দসই পিঁপড়ে খাওয়া
হপ্তাদুয়েক কষ্টে ছিল
ঝুমার পোষা আর্মাডিলো।

বিশ্বাসী। সব বিষয়েই ও অনেকগুলি করে বই পড়েছে। "বেশি বই পড়লে পয়েন্টস বেশি পাব।" আবার পড়ার চেয়ে ও জোর দিয়েছে লেখায়।

"একবার লেখা দশবার পড়ার সমান—আমি এই কথাটা খুব বিশ্বাস করি।"

ওর বাবা বললেন, "আমার এম এ পর্যন্ত যা কাগজ লেগেছে তা বোধ হয় শুধু ওর ক্লাস টেনেই খরচ হয়েছে, এমনই লেখার বহর!"

সোমা একটা জিনিসের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করল। ওদের স্কুলে হোম ওয়ার্কের চেয়ে ক্লাস ওয়ার্কের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। পড়িয়েই সংগে সংগে লিখতে দেওয়া হয় এবং সংগে-সংগেই সংশোধন করে দেওয়া হয়। এটা খুব কার্যকর বলে সোমা মনে করে।

সোমা বাড়িতে খুব ট্রানস্লেশন করেছে। টেস্ট পেপার্স থেকে এবং স্কুলের বই থেকে। গ্রামার লেটার এসে—এসবও। প্রচুর লিখেছে। ইংরেজিতে টেক্সট ও খুব ভাল করে পড়েছে। গ্রামারে স্কুলের বই ছাড়াও 'রেন'-এর বইটি ব্যবহার করেছে। বাংলা ও ইংরেজির মত যত্ন নিয়ে পড়েছে। টেস্ট পেপার্স থেকে ব্যাকরণের প্রশ্নোত্তর তৈরি করেছে। সেইগুলোই বেশি করেছে যেগুলোয় ওর বেশি অসুবিধা হত। রচনা ও কোনো বই থেকে অভ্যাস করেনি। নিজে লিখত। সোমা মনে করে বাইরের বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস পড়তে-পড়তে, নিজের রচনারীতি আপনা আপনিই ভাল হয়ে যায়। আর একটা কথা। সোমাদের পরিবারে বেশ কয়েকজন সাহিত্য করেন। ওর বাবা প্রভঞ্জন রায়চৌধুরীর নাম অনেকেই জানেন।

সংস্কৃতে লেটার ফসকে যাওয়ায় সোমার খুব দুঃখ। টেক্সট ভাল করে পড়েছে। টেস্ট পেপার্স থেকে এবং নিজেও সম্ভাব্য প্রশ্ন তৈরি করেছে। ঐ সব প্রশ্নের উত্তর সংস্কৃতের দিদিকে দিয়ে দেখিয়ে নিয়েছে। "গ্রামার, ট্রানস্লেশনে খুবই জোর দিতাম। সিলেবাসের বাইরের গল্পগুলোও পড়তাম। মনে মনে সংস্কৃতে অনুবাদ কত যে করেছি। এত করেও লেটার হল না।" দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোমা।

সোমা ফিজিক্যাল সায়ান্সে জে এন রায়, অসিত দাস, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত—সমর গুহ আর বংগীয় বিজ্ঞান পরিষদের বই খুব মন দিয়ে পড়েছে। হায়ার সেকেণ্ডারি সিলেবাসের নামকরা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রির বইও পড়েছে। যেমন, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্তের ফিজিক্স বই, সমর গুহর কেমিস্ট্রি। সিলেবাসে না থাকলেও ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রির অংক করেছে, কারণ "ওতে মৌল ধারণা পরিষ্কার হয়"। উত্তর লেখার ব্যাপারে সব সময় খেয়াল রেখেছে যাতে উত্তর 'টু-দি-পয়েন্ট' হয়। ভূগোলে সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য ও জগন্নাথ বসু, নীলোৎপল শ্যামের বই আর 'ভারত বসুধা' পড়েছে। এ-ছাড়াও স্কুলের দিদিরা যেসব বই দিয়েছেন সেগুলোও পড়েছে। লাইফ সায়ান্সে পড়েছে তারকমোহন দাশ, কুন্ডু-দাশ-কুন্ডু, হরিদাস গুপ্ত ও রবীন্দ্রনারায়ণ পালের বই। স্কুলের দিদিদের কাছ থেকেও নোটস নিয়েছে। প্র্যাকটিকাল করেছে। "বায়োলজি বক্স কিনে আনলাম, আর সালা কাটলাম।" প্র্যাকটিকাল ক্লাস করে করে ধারণা অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে গেছে। "লাইফ সায়ান্সে বাড়িতে ভীষণ আঁকতাম। ফিজিক্যাল সায়ান্সের চেয়েও অ-নে-ক বেশি।"

ইতিহাসে সোমাকে সাহায্য করেছে অতুল রায় আর কিরণ চৌধুরীর বই। "ইতিহাস মা-ই তৈরি করে দিতেন। বি এ ক্লাসের ইকনমিক্স, ইতিহাস বই থেকে মা লিখে দিয়েছেন কত। স্কুলের দিদিও প্রচুর সাহায্য করেছেন। "ক্লাসে অনেক বই থেকে দিদি পড়াতেন, আমি টুকে নিতাম। কলেজ থেকে বই এনে, বা খবরের কাগজ দেখে মা উত্তর তৈরি করে দিতেন। ইতিহাসের উত্তরও লিখে অভ্যাস করতাম। তবে নিজের ইচ্ছেয় নয়, মায়ের চাপে।"

চলে আসবার সময় জিজ্ঞাসা করলাম, "আনন্দমেলার পাঠকপাঠিকাদের কিছু বলবে না?"

"কী আর বলব। শুধু এইটুকুই কামনা করি, আনন্দমেলা থেকে আমি যেমন উপকার পেয়েছি আগামীবারের পরীক্ষার্থীরাও যেন সেইরকমই উপকার পায়।"
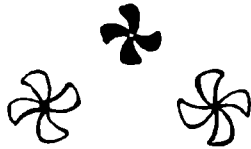
সরল প্লট

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

যাচ্চলে! চোখ খুলেই সূর্য! এইজন্যেই পিকলুর মেজাজটা কিছুতেই ভাল থাকতে পারে না। ঠিক ছিল সূর্যর আগে পিকলু উঠবে। লেকের ধারে ব্যাঙাচি তোলার প্ল্যান ছিল। সব ভেস্তে গেল। এতক্ষণে বোধ হয় সে-সব ব্যাঙাচিরা ব্যাঙ্‌ হয়ে গেছে। জীববিজ্ঞানের গোড়ার কথাগুলো জানবার আগ্রহ দেখাবার পরদিন থেকেই পিকলু আবিষ্কার করেছে যে, সূর্য ভদ্রলোক ওকে সব সময় একটা কোণঠাসা ইঁদুরের মত করে রেখেছেন। ভোরবেলার সব মজার অ্যাডভেঞ্চারগুলো সূর্যের দৃষ্টি লেগে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

আর একটা ব্যাপারেও পিকলুর মনে বেশ একটু সন্দেহ জেগেছে। এই যে পৃথিবী ভদ্রমহিলা, যাকে লেখকরা প্রকৃতি দেবী বলে আদিখ্যেতা করে থাকেন, তাঁর তো দিব্বি পোয়া বারো। সূর্য মশাইকে বলে রেখেছেন, ভোরবেলা হলেই পূব দিকে উঠবে, সন্ধেবেলা পশ্চিমে অস্ত যাবে। শীতে হাড় কাঁপাবে, গরমে হাঁফ ধরাবে। মহাকাশে নিজের বৃত্ত করে রেখেছেন। তাতে গা ভাসিয়ে দিয়ে লাট্টুর মত খেলার ছলে ঘুরে ঘুরে এগোচ্ছেন। মেমসায়েবদের ব্যালে নাচের মত ব্যাপার। আকাশ জুড়ে রাজ্যের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব। চাঁদ-বাবাজী একটু ন্যালাখ্যাপা গোছের ফ্যাকাশে ধরনের নিকটাত্মীয়। তাকে সর্বক্ষণ ল্যাজে-ল্যাজে রেখেছেন। নিজের বেলায় সব নিয়ম-কানুন বাঁধা। সেখানে উনি একেবারে একাই একশো। বিজ্ঞানের বই পড়ে পিকলুর মনে হয় যে, প্রকৃতি দেবী মানুষটি ভয়ানক ধরনের একটি প্রাণী এবং এঁকে ইলেকশান করে হারানো যায় না।

তাই সূর্য মশাই দেখ্‌-না-দেখ্‌ তরতর করে পাঁচতলা বাড়ির ছাদের আলসে পর্যন্ত উঠে গেলেন। আর পিকলুর কী হল? ওর বেলায় কাঁচকলা। গণ্ডা-গণ্ডা বোকা-বোকা নিয়ম, যার প্রত্যেকটি যে অতি বোগাস, তা পিকলু স্রেফ তর্ক করে প্রমাণ করে দিতে পারে।

সাত-পাঁচ ভাবারও উপায় নেই। মেজদা ঘরে ঢুকে একটু হেসে বলল, "তোর 'সায়েন্স ফর চিলড্রেন' ডুকরে-ডুকরে কাঁদছে দেখে এলাম।"

পিকলু চোখ কুঁচকে উত্তর দিল, "তাই নাকি? তুমি চোখ মুছিয়ে দিয়ে এলেই পারতে।"

মেজদা এবার হা-হা হো-হো করে হেসে উঠল। "দিতাম, কিন্তু তোর ঐ দিপুদা আর কুনালদাকে দেখলাম বেজায় হাত-পা চুলকোচ্ছে আর যত রাজ্যের পিঁপড়ে এনে একটা দ্বীপপুঞ্জ বানিয়ে তাতে ছেড়ে দিচ্ছে। পিঁপড়ের সামাজিক ব্যবহার দেখা হচ্ছে। শঙ্করদাও ও খেলায় মেতেছেন। বাপ্‌রে, আট-দশটা পিওর পাগলের খপ্পরে পড়ে মরব নাকি?"

পিকলু এসব কথা কানে না তুলে বলল, "ছোট্‌কা

COME CLOSER TO THE WORLD OF
TV ENTERTAINMENT

Telerama
introduces
Telereach

Another breakthrough from Telerama—the TV specialists :

Telerama's unique TV Booster Amplifier TELEREACH is designed to make television viewing possible in fringe areas.

TELEREACH offers 5 super-star features :

★ Telereach amplifies weak signals to feed the required signal level to the TV input—to give clear, noise-free reception in places normally too distant for TV viewing.

★ Telereach gives you 'peaked' amplification for any specific channels you require, depending on your location.

★ Telereach is the result of advanced research by people who know all about TV's.

★ Telereach is backed by Telerama's expertise and know-how, and built with quality components to meet exacting standards of performance.

★ Telereach is the *only* booster amplifier manufactured by TV specialists.

TELEREACH—
a special TV accessory
from the TV specialists !

Single channel Rs. 335/-
Multichannel: Rs. 365/-
Sales Tax extra

TL/CAS—4R1

কোথায়?"

"নীচে।"
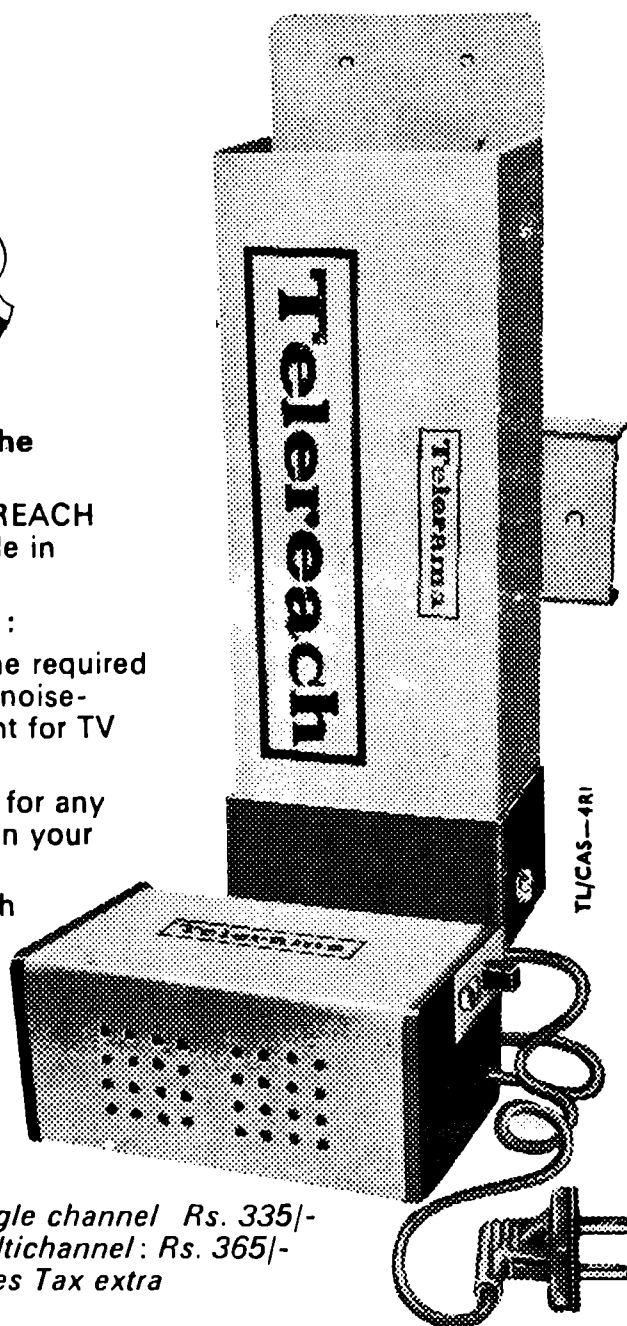
"যাই।"

"ওখানে যাচ্ছিস নাকি?"

"হুঁ।"

"রোববার সকালটা পারিস্‌ও কষ্ট করতে। তাছাড়া তোর যেসব ব্যাঙাচিগুলো তোলার কথা ছিল, সেগুলো রোদ পোয়াচ্ছে দেখে এলাম। তোর বন্দনাদি রুমাদিরা তাদের পাশে বসে 'জীববিজ্ঞান-কী-জয়' বলে চেঁচাচ্ছে। আর সোমনাথদা, নির্মলদারা 'জয় মা প্রকৃতি' বলে তোর পথ চেয়ে বসে আছেন।"

"তাই তো যাচ্ছি। তোমরা হিন্দি সিনেমা দেখোগে না সোনাদিদের সঙ্গে।"

"দুৎ! এসব আর চলে না। একদিন পিটিয়ে সিনেমা হাউসগুলো ভেঙে ফেলব।"

মেজদাকে আর বেশী কথা বলার সুযোগ না দিয়ে পিকলু নীচে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। এমন তীরবেগে নামল যে, সিঁড়ির মুখে ছোটকার সঙ্গে পিকলুর লাগল মুখোমুখি ধাক্কা।

"করিস কী, করলি কী?" বলে ছোটকা হুমড়ি খেয়ে পড়ে দলাদলা কেঁচো কুড়োতে লাগল।

পিকলুর নাকে বেশ লেগেছিল। কাঁদার মত। কিন্তু অতগুলো লিঙ্‌লিঙে কেঁচো দেখে নাকের ব্যথা সামলে পিকলু ব্যাঙাচির শোক কেঁচোয় ভুলে ছোট্‌কাকে সাহায্য করতে লাগল। কেঁচোগুলোকে একটা কলাই-করা বাটিতে তুলে ফেলল দুজনে।

"যাক বাবা, অনেক কষ্টে পাওয়া।"

"ছোটকা, তুমি কি কেঁচোর চাষ করবে? এসব কি সায়েন্স ফর চিলড্রেনের জন্যে?"

ছোটকা মাথা নেড়ে 'না' জানাল। তারপর ছিপ, চার, মাছ রাখার জাল, মাথার টুপি—এইসব বগলদাবা করে পিকলুর দিকে দুষ্টুমি-ভরা চোখে চেয়ে বলল, "আজ আর প্রকৃতি বিজ্ঞান নয়। আজ প্রাকৃতিক ভোজন। তোদের বিজ্ঞানে যেসব মাছ পেকে ঝিঁকুট হয়ে যাচ্ছে, তাদের ধরা হল বুদ্ধিমান মানুষের কাজ। তাদের খাওয়া হল সর্বকালের মানুষের আনন্দ। চল চল, প্রকৃতির নিয়মে কিছু মাছ ধরে আনি।"

মেজদা ইতিমধ্যে এসে হাজির হয়েছিল। হুড়মুড়িয়ে বলে উঠল, "পিক্‌লু না যায় না যাক। আমি যাব তোমার সঙ্গে ছোটকা। আমার ছিপ আছে।"

"ইশ্‌। এতদিন রবিবারে মর্নিং শো কিম্বা খেলা নিয়ে কাটালে, আজ হঠাৎ আমাদের বিজ্ঞানের গায়ে হাত দিলে চলবে কেন?"

"মাছ ধরা বিজ্ঞান নয়।"

"আলবত বিজ্ঞান।"

"হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ—গ্রেট জোক্‌! চল ছোটকা, ওকে সায়েন্স ফর চিলড্রেনে ছেড়ে দিয়ে যাই। গত রবিবারে বজবজের আসিক আহমদ এতগুলো শিশি ভরে টিকটিকি গিরগিটি এনেছিল যে, সোমনাথদা হাঁ হাঁ করে বলে উঠেছিলেন, আর না, আর না, জীবজগৎ ফাঁকা করে দিও না বাছা। পিকলুর কাছেই শোনা গল্প। ও-ই বলুক।"

বিজ্ঞানের ব্যাপারে মেজদার মত এমন আকাট পিক্‌লু আর কাউকে দেখেনি। যাই হোক মেজদা আর ছোটকার দুটো ছিপ নেওয়া-হল। পথে রুটি আলুর দম কিনে নিয়ে ওরা তিনজন চলল ছোটকার ঠিক করা পুকুরটার দিকে। সূর্য ওঠা থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত যত ইচ্ছে মাছ ধরতে পারো দশটা টাকা দিলে। সে সব ছোটকাই ম্যানেজ করেছে। নেই নেই করে তিরিশটা টাকা গলে গেল। কিন্তু ছোটকার মনে কোন সন্দেহ নেই যে, ও পঞ্চাশ টাকার মাছ হেসেখেলে তুলে আনবে। জায়গাটা নাকি মাছে মাছে আইঢাই করছে।

পথে ছিপ দুটো নিয়ে ভারি বেকায়দা হতে হল। ছোটকার একটা দোষ হচ্ছে যে, বাইরের কেউ যদি ওকে একটা সোজা কথা জিজ্ঞেস করে তো ও তখুনি একটা ত্যাড়াব্যাঁকা উত্তর দেবে। ৮০ নম্বর বাস ধরা হল গড়িয়ায়। জানলা দিয়ে ছিপ বার করার সময় একজন হাসি-হাসি মুখওয়ালা স্মার্ট ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "ছিপ? রাজপুরে মাছ ধরার প্রোগ্রাম?"

"আজ্ঞে না। ছিপ নয়। আমাদের এই বৈজ্ঞানিক গবেষণার টিমটি এই সব যন্ত্রপাতি দিয়ে গ্রামাঞ্চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। এই যে যাকে আপনি ছিপ ভাবছেন, তা হল আসলে এরিয়াল—আমাদের বিশেষ ধরনের কাজে এটা অপরিহার্য!"

ভদ্রলোক অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললেন, "এই ছোট্ট ছেলেটিও এই টিমে আছে? আশ্চর্য! বড় জোর ন' বছর বয়েস হবে।"

পিকলু গম্ভীর হয়ে বলল, "সাড়ে নয়।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা হৈ চৈ উঠল—পাশের বাস থেকে। বাসটা উল্টো দিক থেকে আসছিল। আমাদের ছিপের ডগায় তার ড্রাইভারের টুপি উঠে এসেছে। খুব একটা হৈ-হল্লা হাসি-ঠাট্টার মধ্যে পিকলু শুনল একজন বলছেন, "এই মাছ-ধরার পাগলামিগুলো ছেড়ে দিলেই তো পারে লোকে। ওঠে তো লবডঙ্কা।" উত্তরে সেই ভদ্রলোকের গলা শোনা গেল, "এই সব পাগলামি নিয়েই তো বাঙালী জাত। এঁরা মাছ-ধরাকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা মনে করেন।"

পৌঁছেই যা শুরু হল। ভাল জায়গাগুলো সব দখল হয়ে গেছে সূর্য ওঠার আগেই। ঝাঁকে ঝাঁকে লোক মস্ত পুকুরটার চার ধারে বসে আছে ধ্যানমগ্ন হয়ে। দৃষ্টি সব ফাতনার দিকে। এদের দলটাকে এত দেরিতে আসতে দেখে অনেকে চোখ কুঁচকে ওদের দেখলেন। ছোটকা আর মেজদা ঝপাঝপ সব প্রস্তুতি করে ফেলল দেখে পিকলু রীতিমত চমকে গেল। এরা তো বেশ পারে। একটা নেড়িকুকুর দাঁড়িয়ে বেঁধে একটা ছোট মতন ছেলে— পিকলুর চাইতেও অন্তত বছর খানেকের ছোট হবে—গ্যাঁট হয়ে ওদের পাশে বসে নানা ধরনের জ্ঞান দিতে লাগল।

"ছিপটারে নাইচে-নাইচে নিয়ে যাও বাবু। আমি তুক করো দিচ্ছি। মন্তর জানি—বেস্তর মাছ উঠবে।"

মেজদার ধৈর্য ভেঙে গেল। "তবে রে—" বলে ওকে তেড়ে যেতেই নেড়ি কুকুরটা তেড়ে এল। ওপার থেকে হাসিমাখা গলায় একজন বললেন, "ঘাঁটাবেন না। বিচ্ছু নাম্বার ওয়ান আপনিই উৎসাহ পড়ে যাবে। একটু ধৈর্য ধরুন।"

ছেলেটার উৎসাহ পড়া তো দূরের কথা, বেশ বেড়ে গেল। উঠে গিয়ে মেজদার পাশে বসল। কুকুরটা গিয়ে জালি ব্যাগটা শুঁকতে থাকল। মেজদা ছিপটা জুত করে জলের ওপর ধরতেই ও ঝপ্‌ করে একটা ইঁটের টুকরো ফেলে জলে ঢেউ তুলে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ার মত বলে গেল, "আয়জল বায়জল পিত্তি চচ্চাড় উলকুটি ধুলকুটি—হাড় গুড় গুড়-মাছের রানীর প্রাণ কুড় কুড়——"

এরকম সব আলতু ফালতু অনেকটা বকে যাবার প
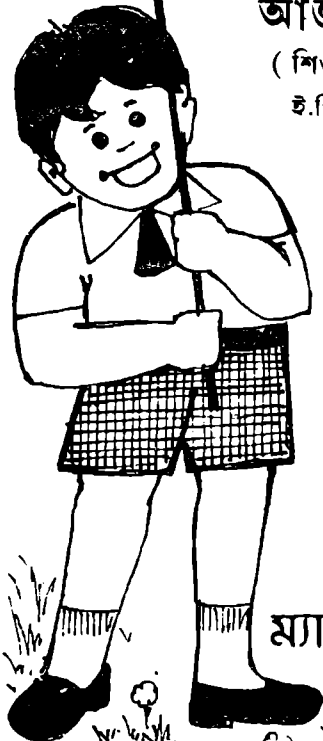
পিক্‌লু ঠিক করল ওকেই এ ব্যাপারে কিছু করতে হবে। তাকিয়ে দেখল, ছোটকা ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবের মত আধখোলা চোখ জোড়া ফাতনার মাথায় আটকে রেখে যোগাসনে বসে। বড় মাছ ওঠার জন্যে বড় জালি ব্যাগ, ছোট মাছের জন্য কাঁচের বোয়ম। মেজদা গম্ভীর মুখে অন্য পারে চোখ রেখে ছিপ ধরে বসে রয়েছে। কারুর মুখে কথা নেই। কেবল ঐ দুষ্টু ছেলেটা এক নাগাড়ে বকে চলেছে। ছেলেটা হঠাৎ পিকলুর দিকে ঘুরে বসে বলল, "তুই কে রে—বোকার মত বসে বসে জাবর কাটতেছিস্?"

"তুই কে রে—বক্ বক্ করে পরমায়ু কমিয়ে ফেলছিস?"

পিক্‌লুর কথা শুনে ছেলেটা খুব খানিকটা হেসে নিয়ে বলল, "তুই কী পড়িস রে?"

"ক্লাস ফোর। তুই?"

"কেলাস ওয়ান। পড়ি না। পড়তাম। সেবারে ম্যাস্টার খুব আড়ং ধোলাই দিলে। শুধুমুধু। আমার তো কচু। ম্যাস্টারের হাতের সুখ করার জন্যে যদি ন্যাকাপড়া হয় তো ঝাঁটা মারি অমন পড়াশুনোর মুখে।"

"নাম কী তোর?"

ছেলেটা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বলল, "মীর আমজাদ আলি খান।"

"যাঃ, সে তো মস্ত একজন ওস্তাদের নাম।"

"একজন অ্যাক্‌টরও আছে। তোর নাম কী?"

"পিক্‌লু।"

"পিক্‌লু? সে তো একজন কুস্তিগীরের নাম।"

"গুল মারছিস?"

"সত্যি বলছি।"

ঠিক এই সময় সেই মস্ত মাছটা পড়ল ছোটকার বঁড়শির ফাঁদে। ব্যস্, চার ধার থেকে পিল্‌পিল্ করে লোক উঠে এল। মেজদা নিজের ছিপ তুলে ফেলে লম্ফঝম্প শুরু করল। ছোটকার জীবনে এই প্রথম বড় রুই ছিপে পড়েছে। "সুতো ছাড়ুন মশাই, সুতো ছাড়ুন।" "খেলিয়ে তুলুন।" "আরে, করছেন কী, টানুন, মাঝ দরিয়ায় গেলেই গভীর জলে ডুব দেবে।" ছোটকার কপালে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম দেখা দিল। ছোটকা মাছ খেলাবে কী, মাছই ওকে খেলাতে লাগল। মেজদা কী করবে বুঝতেই পারছে না। একবার এদিকে যায় একবার ওদিকে। পিক্‌লু যেন স্ট্যাচু। কিন্তু মীর আমজাদ আলি খানকে দেখে কে। যত তার কুকুর চেঁচায়, তত সে নিজে।

"লড়ে যান বাবু। জান লড়িয়ে দিন। সুতো ছেঁড়ে ছিঁড়বে। তাই বলে মাছের কাছে হেরে যাবেন? রেডি থাক্ ভুতো। মন্তর ঝাড়ছি—লাগ্ লাগ্—মাছের রানীর প্রাণ কুড় কুড়——"

ছোটকা চিৎকারে করে উঠল, "ছিপ টেনে নিয়ে যাচ্ছে, পারছি না।"

সত্যিই ছিপটা কেমন যেন হয়ে গিয়ে সাঁ সাঁ করে জলের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। সবাই যেন ছবি, অ্যালবামে আঁটা ছবি। কেউ নড়তে পারছে না। হঠাৎ আমজাদ আলি ঝপাং করে লাফ দিল জলে। সঙ্গে সঙ্গে ওর ভুতো কুকুর। ছিপ চেপে ধরে সাঁতার কেটে খানিকটা এগিয়ে গেল। তারপর মুখে ছিপটা চেপে ধরে টানতে টানতে ফিরতে লাগল। তারপর যা খেলা শুরু হল পিকলু হাঁ। কী একখানা ছেলে! ক্লাস ওয়ান অবধি পড়েছে কিন্তু মাছের বিষয়ে সব জানে। কী-ভাবে খেলাচ্ছে মাছটাকে।

বেশ খানিকক্ষণ এমনি চলার পর ভুতো লাফ দিয়ে উঠল

ডাঙায়। আর সঙ্গে সঙ্গে ঝপাৎ করে খেলোয়াড় ওস্তাদ মীর আমজাদ আলি খানের পায়ের কাছে অন্তত চার কেজি ওজনের রুই মাছটা আছড়ে পড়ল।

মোহনবাগান গোল দিলেও বোধহয় এমনি আওয়াজ তুলে তার সমর্থকরা উৎসাহ দেখায় না। ছোটকা আমজাদকে জড়িয়ে ধরল। "কী ছেলে, কী ছেলে!" খুব লাজুক হয়ে গেল ছেলেটা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "বাবু, একটা কথা বলব?"

"বল না।"

একটু বোকা বোকা হেসে ও বলল, "মাছটার খুব তেজ। খুব সাহস। ওটাকে ছেড়ে দিন। এমন লড়াই করল, খুব দরদ হল দেখে।"

সকলে আবার স্ট্যাচু! বলে কী ছেলেটা? কিন্তু ছোটকা বুঝল। পিক্‌লুও বুঝল। আরও কেউ কেউ বুঝল। কিন্তু মেজদা আর ভুতো বুঝল না। মেজদা প্রস্তাব শুনেই ছুটে তুলে আনতে গেল মাছটাকে। কেন না, ছোটকাকে ও চেনে। জানে, নির্ঘাত ছেড়ে দেবে। অথচ

এমন মাছ। মাছটাকে যেই ও জাপ্‌টে ধরতে গেছে, ভুতো সঙ্গে সঙ্গে কামড়ে ধরতে গেল মস্ত ল্যাজটা। সঙ্গে সঙ্গে দুটো প্রকান্ড আছাড় খেয়ে মাছটা জলের ধারে চলে গেল। তৃতীয় লাফে ও পড়ল জলে।

মেজদা কপাল চাপড়ে নিজের ছিপটা তুলে নিতেই জল থেকে বঁড়শিতে ধরা পড়া ছোট পুঁটি মাছটা লাফিয়ে নেচে উঠল।

রেগে গরগর করে মেজদা মাছটাকে বঁড়শি থেকে খুলে নিয়ে 'দুত্তোর' বলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। লাফ দিয়ে জলের ধার থেকে পুঁটিটাকে দুহাতে আল্‌তো করে তুলে নিল পিক্‌লু। জল ভরা বোয়মে ছেড়ে দিতেই মাছটা খেলতে শুরু করল। আমজাদ হাততালি দিয়ে উঠল, "ওটা পুষবি পিক্‌লু?"

"হুঁ, আমাদের বড় চৌবাচ্চায় ছাড়ব। খেতে দেব— বড় হবে।"

মেজদা মুখ ভেঙচে বলল, "পুঁটি মাছ বড় হলে তোর বিয়ের সময় ভোজ দিস্‌।"

আমজাদ হেসে বলল, "কেন গো, পুঁটি বড় হয়ে সরল পুঁটি হবে। সে বড় সরেশ মাছ গো দাদা।"

এমন সময় পিক্‌লু যা ভেবেছিল তাই হল। রসে ভঙ্গ দিয়ে পশ্চিম দিকে ঝপ্‌ করে সূর্য প্রকৃতি দেবীর নিয়ম মত অস্ত গেলেন। এবার তো অন্ধকার নেমে আসবে। কাল সোমবার। মানে পাঁচ দিন একনাগাড়ে ইস্কুল।

মাছটাকে বোতলে বাগিয়ে ধরে পিক্‌লু ছোটকাকে বলল, "চলো, এবার যাই। কী তাড়াতাড়ি দিনটা কাটল দেখলে।"

ছোটকার মুখখানা কেমন হয়ে গিয়েছিল। ভিড়ের লোকেদের মধ্যে একজন যাবার সময় বলে গেলেন, "বেশ পাগল-ছাগল টাইপের পার্টিটা।"

ছোটকা খাবারগুলো বার করল। আমজাদ আর ভুতোকে বেশী করে দিল। মেজদা প্রায় খেলই না। খেতে খেতে আমজাদ বলল, "তুই স্যারের, মানে নির্মলদার ওখানে পিঁপড়ে পুষিস্‌ না?"

"পুষতাম। এখন ব্যাঙাচি পুষব ঠিক করেছি। তুই কী করে জানলি?"

স্যারের সঙ্গে মাঝে মাঝে কলকাতায় যাই। আমাদের গেরামে পড়াতে আসেন।"

"ও তাই নাকি? তুই ধানক্ষেত বিদ্যালয়ে আছিস?"

"হ্যাঁ।"

পিক্‌লু খুশি হয়ে আরও দুটো রুটি দেয় আমজাদকে। আমজাদ লাজুক-লাজুক মুখে বলে, "এই শোন্‌, আমার নাম কিন্তু মীর আমজাদ আলি খান নয়। আমার নাম জাকির। আর পিক্‌লু নামে কোন কুস্তিগীর নেই রে।"

পিক্‌লু হাসে, "শুধু জাকির তো? জাকির হোসেন নয়?"

যাবার সময় এসে যায়। বাসে উঠতে উঠতে পিক্‌লু চেঁচায়, "ব্যাঙাচি পেলে আনিস।"

চিৎকার করে জাকির উত্তর দেয়, "আনব। পুঁটি মাছটার খবর দিস।"

হাততালি দিয়ে ছোটকা বলে ওঠে, "দিস্‌ ইজ্‌ জীব-বিজ্ঞান।"

ছবি বিমল দাশ

আমার কোচিং

প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুটবল-খেলোয়াড় ছিলাম। আজ আমি কোচ। খেলা যখন শুরু করেছিলাম, তখন কোনদিন ভাবিনি, এ দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে। আমার গুরু রহিম সাহেবের আদেশে আমি কোচ হয়েছি। ১৯৫৮ সাল থেকে আমি রহিম সাহেবের ছাত্র। খেলার নানা বিষয়ে প্রশ্ন করতাম। এইসব প্রশ্নে এতটুকু বিরক্ত হতেন না। খুশি হতেন। ১৯৬২ সালে এশিয়ান গেমস ফুটবলে ভারত জয়ী হল। আমাদের সেই জয়ের অনেকটা কৃতিত্ব ছিল তাঁর। দেশে ফিরে এলাম। একদিন রহিম সাহেব আমায় ডাকলেন। কাঁধে হাত রেখে বললেন, "প্রদীপ, আমার শরীরটা ভেঙে পড়ছে। বেশিদিন আর কোচিংয়ের দায়িত্ব নিতে পারব না। আমার ইচ্ছা, ফুটবল খেলা থেকে অবসর নেবার পর তুমি আমার শূন্য স্থান পূরণ করার চেষ্টা করো। আমি আশীর্বাদ করে যাচ্ছি, তুমি সফল হবে।"

খেলা ছেড়েছি ১৯৬৮ সালে। ১৯৬৯ সাল থেকে কোচ। বাটা ফুটবল দলের কর্মকর্তারা ১৯৬৯ সালে আমাকে দলের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। তখন কোচ হিসাবে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে শিখিয়ে ছিলাম। বাটার ভাঙাচোরা দল। নাম-করা খেলোয়াড় ছিল না। তবে খেলোয়াড়দের শেখার আগ্রহ ছিল। বাটা সুপার লীগে উঠেছিল। লীগ তালিকায় তৃতীয় স্থানও পেয়েছিল তারা। দারুণ উৎসাহিত হয়েছিলাম।

এই বছরেই ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন, আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের কোচিংয়ের (ফিফা কোচিং) জন্য বাংলা থেকে আমাকে ও চুনীকে নির্বাচিত করেন। বিখ্যাত কোচ ডেটমার ক্রামার এবং আরও কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত কোচের কাছ থেকে সাড়ে তিন মাসের শিক্ষা নিয়ে আমরা দুজন প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট নিয়ে ফিরে আসি।

১৯৭০ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব থেকে ডাক আসে। মারডেকা এবং এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দলকে শিক্ষা দেবার দায়িত্ব থাকায় এ-প্রস্তাবে রাজী হই না। ১৯৭১ সালে আবার অনুরোধ আসে। ভারতীয় দলের কয়েকটি কোচিং ক্যাম্পের দায়িত্ব নেবার জন্য দ্বিতীয়বারের অনুরোধও আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়।

১৯৭২ সালে আবার ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তারা আসেন। মোহনবাগান থেকেও অনুরোধ আসে। দোনোমনায় পড়ে যাই। আমার স্ত্রী বলেন, প্রথম যাঁরা অনুরোধ জানিয়েছেন, তাঁদের কাছেই তোমার যাওয়া উচিত। ১৯৭২ সালে ইস্টবেঙ্গলের কোচ হই। এ ছাড়া ইন্দোনেশিয়া ও রাশিয়া সফরের জন্য ভারতীয় দলকেও আমাকে শিক্ষা দিতে হয়।

ইস্টবেঙ্গলে সেবারে নতুন মুখ গৌতম সরকার, মোহন সিং, অশোক ব্যানার্জি প্রবীর মজুমদার, আকবর। পুরনোদের মধ্যে সুধীর কর্মকার, সমরেশ চৌধুরী শান্ত মিত্র, স্বপন সেনগুপ্ত, হাবিব ও প্রসাদ। নতুন ও পুরনো মিশিয়ে ইস্টবেঙ্গল হয় দুর্বার। কোন গোল না খেয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ন। ইতিহাসকে তারা পুনরাবৃত্ত করল ৭১ বছর পর। লীগ, শীল্ড, ডুরান্ড, রোভার্স জয়ের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হল। ভারতের চারিদিকে উড়ল ইস্টবেঙ্গলের বিজয় পতাকা। ১৯৭৩, ১৯৭৪, ১৯৭৫ সালে ইস্টবেঙ্গলের শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাধ্য ছিল না কারও।

১৯৭৬ সালে মোহনবাগানে আসি। দীর্ঘদিন পর ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ন। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে আই এফ এ শীল্ড ও দার্জিলিংয়ে গোল্ড কাপে যুগ্ম জয়। এ ছাড়া রোভার্স ও বরদৌলি ট্রফি।

খেলার প্রতিভা স্বতঃস্ফূর্ত। এই প্রতিভা নিয়ে মানুষ জন্মায়। কোচেরা সেই প্রতিভাকে পালিশ করে ঝকঝকে চকচকে করে তোলে। আমিও তাই করি।

যেমন পশ্চিমবঙ্গে, তেমনি ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও অধিকাংশ খেলোয়াড় আসে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। প্রয়োজনীয় খাবার পায় না। দুর্বল শরীর। প্রথমেই আমি তাদের শক্তি বাড়াবার চেষ্টা করি। এরপর একে একে গতি, সহনক্ষমতা, দক্ষতা বাড়াবার দিকে নজর দিয়ে থাকি। শরীরকে বলশালী করতে জিমনাস্টিকসের কিছু কিছু শিক্ষা দিতে হয়। গতির জন্য অ্যাথলেটিকস।

প্রত্যেক খেলোয়াড়ের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। সেই বৈশিষ্ট্যকে পরিবর্তন না করে তাকে নির্ভুল ও উন্নত করার চেষ্টা করি। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, গৌতম সরকারের খেলা দেখে বুঝেছিলাম ওর মানসিকতা হল লড়াইয়ের। আমি ওকে রক্ষণাত্মক খেলা এবং বিপক্ষের কাছ থেকে মাঝ মাঠে বল ছিনিয়ে নিতে প্রথমে আগ্রহী করেছিলাম। পরে আক্রমণকে সহায়তা করার শিক্ষা দিয়েছিলাম। সুরজিৎ সেনগুপ্তকে দেখে বুঝেছিলাম, কলকাতা মাঠে এ জাতীয় প্রতিভা কয়েক বছরের মধ্যে আসেনি। ভাল ছাত্র পেলে শিক্ষকেরও আনন্দ হয়। প্রাণ ঢেলে শিক্ষা দিতে যে-কোন শিক্ষক ভালবাসে।

খেলোয়াড়দের আন্তরিকভাবে ভালবাসতে চেষ্টা করি। তাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে আগ্রহী থাকি। এতে খেলোয়াড়দের আরও কাছে পাওয়া যায়। তারা পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করতে পারে শিক্ষকের উপরে। মানসিক শান্তি পায়।

ফুটবল মরসুম শুরুর আগে ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের শিক্ষার প্রয়োজন। শারীরিক ক্ষমতা বাড়ানো, অধিগত বিদ্যা আরও ক্ষুরধার করা ছাড়া স্ট্রাপিং, পাসিং, ড্রিবলিং, শুটিং প্রভৃতির শিক্ষা চলে। খেলোয়াড়দের প্রতিভা বুঝে এই শিক্ষার ব্যবস্থা কম-বেশি করে থাকি।

এরপর চালাই গ্রুপ ট্রেনিং। দুজনের বিরুদ্ধে দুজন, তিনজনের বিরুদ্ধে তিনজন, এইভাবে খেলোয়াড়ের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাই। ওয়ান টাচ ফুটবল অর্থাৎ বল না থামিয়ে শুধু মাত্র গতির পরিবর্তন ঘটিয়ে আক্রমণ ও রক্ষণ উভয় কাজই করতে শেখাই। আধুনিক ফুটবলে এটা একান্ত প্রয়োজনীয়। এরপর ডিপ ডিফেন্স, মাঝমাঠ এবং পুরোভাগের খেলোয়াড়দের বিশেষ-বিশেষ শিক্ষা দিয়ে থাকি।

কোচেদের সাফল্য বা ব্যর্থতা বহুলাংশে নির্ভর করে খেলোয়াড়দের সাফল্যের উপর। ১৯৭২-১৯৭৫ সালে ইস্টবেঙ্গলের কোচ ছিলাম। ইস্টবেঙ্গল ভারতে সব থেকে শক্তিশালী দল ছিল। এর জন্য আমার থেকে খেলোয়াড়দের কৃতিত্বই ছিল বেশি। যাদের পেয়েছিলাম তাদের শেখার আগ্রহ ছিল। ক্ষমতাও ছিল। যখন যে পরিকল্পনা করেছি, সেটা সফল হয়েছে। সাফল্যে আরও উৎসাহিত হয়েছি। ক্লাব-কর্মকর্তা, সদস্য, সমর্থক সকলেই সমবেতভাবে সাহায্য করেছেন।

১৯৭৬ সালে মোহনবাগানে আসি। আমার ভাগ্য ভাল ছিল। সকলের সাহায্যে এখানেও এসে পেলাম সাফল্য। ইস্টবেঙ্গল দীর্ঘদিন পর পরাজিত হল। মোহনবাগান লীগ পেল। শীল্ডে যুগ্ম জয়। অন্যান্য রাজ্যেও মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা সাফল্য দেখাল।

এ বছর লীগে ইস্টবেঙ্গলের কাছে মোহনবাগানের পরাজয় নিয়ে অনেকে আমাকে অনেক কথা বলেছেন। অপমান, লাঞ্ছনা পেয়েছি। মাথা পেতে গ্রহণ করেছি সব। কিন্তু আমার সমস্যা কিছু ছিল। হাবিব, সুভাষ, আকবর ও শ্যাম আমার চার ভারতীয় ফরোয়ার্ড। এর সঙ্গে তরুণ মানস, বিদেশ ও শুভঙ্কর। ফরোয়ার্ডে চারজন খেলে। অথচ যাকেই বসাব, তার মনে দাগ পড়বে। খেলার মধ্যেও ফুটে উঠবে সেই মনোভাব। সুভাষ, শ্যাম, হাবিবের খেলায় বয়সের ছাপ পড়েছে। গতি মন্থর হয়েছে। এ ছাড়া রক্ষণভাগেও বেশ কিছু সমস্যা আছে।

কিন্তু এসব বাধা সত্ত্বেও ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলার সূচনায় হাবিব যদি গোল করতে পারত বা দু গোল খাবার পর শ্যাম আকবর এবং সুভাষ যদি সহজ সুযোগ নষ্ট না করত তাহলে খেলার ফল কী হত কে বলতে পারে? প্রথমে গোল করে এগিয়ে যাওয়ার এক বিরাট সুবিধা আছে। গতবার লীগে মোহনবাগান প্রথমে গোল করে এই সুবিধাই পেয়েছিল। খেলায় ভাগ্যও একটা বড় জিনিস। অবশ্য এ সব বলে ইস্টবেঙ্গলের যোগ্যতাকে আমি বিন্দুমাত্র ছোট করতে চাইছি না। শুধু যারা আমাকে দিনের পর দিন সুযোগ পেলেই অকারণে অপমান করে চলেছেন, তাঁদের বিবেচনার জন্য এইটুকু জানিয়ে রাখলাম। আমি এও জানি, ভবিষ্যতে যদি মোহনবাগানের সাফল্য দেখাতে পারি, তাহলে ঐ অপমান আবার অভিনন্দন হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে।

ফোটো মনোজিৎ চন্দ

কেমন করে কোচ করি

অমল দত্ত

ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে ছোট্ট ফিয়েট গাড়িটা হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছিল। চারদিকে পড়ন্ত বিকেলের ঝই-ঝই আলো। সোলেমান ড্রাইভ করছে, পিছনের সীটে আমি। যাকে আনতে যাচ্ছি, সেই সুবোধের বাড়িটাই আমরা চিনি না। শুধু জানি ওর বাড়ি ধবধবিতে।

কিন্তু তার আগে সুবোধকে কেন আনতে যাচ্ছি, সেইটাই বলে নিই।

'৫৭ সালে বিলেত থেকে কোচিং শিখে বছর দুয়েক হাতে-কলমে কাজ করার কোন সুযোগ পাইনি। '৫৯ সালের গোড়ার দিকে ইনটারন্যাশনাল ক্লাবের নানীদা এসে বললেন, "অমল, আমরা তো এবার ফার্স্ট-ডিভিশনে উঠেছি, কিন্তু টাকা নেই প্লেয়ার কেনবার, তাই তোমার শরণাপন্ন হয়েছি, তুমি যদি টিমটাকে বাঁচাও!"

ইয়োরোপে তখন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রচণ্ড নামডাক। ম্যানেজার ম্যাট বুসবি ম্যাঞ্চেস্টারেরই জনাকয় প্রতিভাধর তরুণকে দীর্ঘদিন এক সঙ্গে রেখে এবং ট্রেনিং দিয়ে ঐ আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন। তাঁরই অনুসরণে হাওড়ার দাশনগরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডিভিশনের গুটিকয় তরুণ উঠতি খেলোয়াড়কে নিয়ে তিনমাসের একটা ক্যাম্প করা হল। সকাল-বিকেল দুবেলায় চার ঘণ্টার অনুশীলন। খালি রবিবারে যে যার বাড়ি যেতে পারে। যাতায়াতের জন্য বাসের একটা মান্থলি। খাওয়া-দাওয়া খুবই সাধারণ মাপের। থাকতে হত একটি মাত্র বড় ঘর, আমাকে নিয়ে ২২ জন। লীগে সেবার দারুণ খেলেছিল ইনটারন্যাশনাল। আর তারই পরিণতিস্বরূপ পরের বছর দলের নিয়মিত নজন খেলোয়াড় দল-বদল করল। সেই হাহা-করা শূন্যতা ভরাবার জন্যই উঠতি খেলোয়াড় সুবোধের বাড়ি যাওয়া।

গাঁয়ের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েগুলো, যারা গ্রামে ঢোকবামাত্রই মোটরটাকে ঘিরে ধরেছিল, তারাই আমাকে এ-বাড়ির পুকুরের পাশ দিয়ে, ও-বাড়ির গোয়ালঘরের ভেতর দিয়ে সুবোধের বাড়ি নিয়ে গেল। ওদের যে বিখ্যাত ভাঁপা দইয়ের ব্যবসা, তা জানা ছিল না। উঠোন জুড়ে বড়-বড় কাঠের উনুনে, বিরাট বিরাট কড়ায় দুধ ফুটছে। তারই মিষ্টি গন্ধ চারদিকের বাতাসে ম' ম' করছে।

আমাকে এক ভাঁড় ভাঁপা দই খেতে দেওয়া হল। অপূর্ব স্বাদ। আর তারপরই নাটকটা শুরু হয়ে গেল। বাড়ি জুড়ে চারদিক থেকে এক সঙ্গে কান্নার ফোঁস-ফোঁসানি ভেসে আসতে লাগল আমার কানে। হ্যারিকেনের ছায়া-ছায়া আলোর ভিতর দিয়ে দেখছিলাম, সারা মুখে ঘোমটা টেনে বিভিন্ন বয়সের মহিলারা আমার থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে যেন সমবেতভাবে অনুরোধ করছেন—সুবোধকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যেও না।

সেই সময়ে আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন থানার দারোগা, সুবোধকে এদের ভেতর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। সেই বিমূঢ় মুহূর্তে, আমি যখন ঠিক করতে পারছিলাম না যে, পালাব, না অপেক্ষা করব, তখন দেখি, ষোলো-সতেরো বছরের ছিপছিপে কৃষ্ণবর্ণ সুবোধ, উঠোনের ভিতর দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। মুখ তার ভাবলেশহীন, চোয়াল শক্ত; হাতে ছোট্ট টিনের বাক্স যার ওপরে লাল রঙের একটা বড় গোলাপ ফুল আঁকা। গাড়িটা যখন চলতে শুরু করল সুবোধ একবারও তার বাড়ির দিকে মুখ ঘোরাল না।

পৃথিবীতে যত সফল কোচ আছেন, তাঁদের প্রত্যেকের কোচিং-পদ্ধতি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল; একের সঙ্গে অপরের সেখানে কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, তা কেমন করে হয় বা সম্ভব? তাহলে ব্যাপারটা খুলে বলতে হয়।

ফুটবলের ক্রীড়া-শৈলী, আঙ্গিক, পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয় অধিগত করে কোচ যখন তাঁর কোচিং-জীবন শুরু করেন, তখন সেই প্রথম পর্বে—হেলেনিও হেরেরা বা আলফ র‍্যামসের সঙ্গে অমল দত্তের কোন তফাত থাকে না। কিন্তু দায়িত্বের গুরুভার ও প্রতিনিয়ত-উদ্ভূত সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ও তার সমাধান করতে করতে প্রতিটি সফল কোচ এক সময়ে তাঁর নিজের অজান্তেই একটা ঘরানায় পরিণত হন।

উপরোক্ত প্রসঙ্গে কটকে অনুষ্ঠি
সন্তোষ ট্রফির একটি বিপর্যয়ের কথা ম
পড়ে—যার জন্য দায়ী আমি নিজে। সেব
ওড়িশা রাজ্য-দল প্রথম সন্তোষ ট্রফির সেমি
ফাইনালে পোঁছয়। এইখানে পোঁছতে তা
খুব অল্পদিনে পর পর পাঁচটি ম্যাচ খেল
হয়। তার ভেতর শেষের ম্যাচ দ
হায়দরাবাদের বিপক্ষে খুবই 'টাফ' ছি
তাই ক্লান্তি ও ফুটবলের একঘেয়েমি কাটা
সব খেলোয়াড়কে নিয়ে আমি পুরী যা
সমুদ্রের ঢেউ যে খেলোয়াড়দের পাগল ক
দেবে, এবং এরা যে কেউ দু-তিন ঘণ
আগে জল ছেড়ে উঠতে চাইবে না, সে খেয়
আমার ছিল না। সবার ওপর, তার প
দিনই মহীশূরের সঙ্গে সেমি-ফাইনা
প্রথম লেগের খেলা। মহীশূর সে-ব
বাঙলাকে হারিয়ে সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী হ

পরের দিনের খেলায় আমাদের ব
খেলোয়াড়ই তার আগেকার খেলার ম
পোঁছতে পারল না। আমরা এক গো
হারলাম। সকলেই একবাক্যে প্রশ্ন করে
ওড়িশার খেলোয়াড়রা এত ক্লান্ত কেন? উ
খুঁজতে গিয়ে অভিজ্ঞতা হল—সমুদ্রের ন
জলে সাঁতার শরীরকে ভারী করে। কে
দ্বিতীয় লেগের খেলায় ঐ খেলোয়াড়
মহীশূরের সঙ্গে ২-২ গোলে শুধু ড্র ক
না, খেলার পর সকল প্রদেশের ফুট
অনুরাগী দর্শকরাই স্বীকার করলেন
আমাদের জেতা উচিত ছিল।

২

কোন বিষয়ে কেউ সাফল্য
করতে চাইলে প্রথমে তাকে সেই বিষ
সহজাত-দক্ষতা নিয়ে জন্মাতে হ
কোচিংয়ের শুরুতেই সেজন্য আমি অ
খেলোয়াড়দের কার কতটা সহজাত-দ
আছে সেটা মেপে বার করবার চেষ্টা ক
স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, এ-ধরনের মাপবার
কোন যন্ত্র আছে? উত্তরে বলতে হয়,
এখানে অভিজ্ঞতাই মূলধন। তবে বিজ্ঞান
যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ এই অভিজ্ঞতাকে এ
শক্ত ভিতে পোঁছে দিতে বিশেষ সাহায্য ক
কিন্তু তা সত্ত্বেও যে ভুল হয় এবং তা
মারাত্মক হতে পারে, তারই একটা কা
এখানে তুলে ধরছি।

সেবার কটক গেছি ওড়িশার জু
জাতীয় দলকে কোচ করতে, দুমাসের জ
তিরিশ জনকে ক্যাম্পে রেখে বাকী চা

জনকে বাদ দিতে হল, বিষ্টু বেহেরাও তাদের ভেতর একজন। লম্বায় ছ' ফুট এবং থপথপে মোটা। কিন্তু স্বভাবে অসাধারণ নম্র ও শিখতে ইচ্ছুক। ক্যাম্পে ওকে না রাখলেও রাতটুকু ছাড়া কখনও সে আমার কাছছাড়া হত না। বাধ্য হয়েই ওকে একটু অনুশীলনের সুযোগ দিতে হত, তাও চারজন গোলকীপারের অনুশীলনের পর।"

পরের বছর কটক-কম্বাইন্ড খেলতে এল আই এফ এ শীল্ড। ধর্মতলার মোড়ে যে হোটেলটায় ওদের খেলোয়াড়রা উঠেছিল, তারই দোরগোড়ায় একহারা ছ' ফুট লম্বা একটি ছেলে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। প্রথমে চিনতে পারিনি। পরিচয় দিতে অবাক হয়ে গেলুম। বিষ্টু বেহেরা! ও কিন্তু বলেনি। চুপটি করেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওর এক সঙ্গী জানাল, "আপনি কটক ছাড়বার পর বিষ্টু রোগা হবার জন্য খাওয়া-দাওয়া অর্ধেক করে দিয়েছে। ভাত, আলু, চিনি এবং মিষ্টি ছোঁয়ই না। দিনে দুবেলায় তিন-চার ঘণ্টা, আপনি যেগুলো দেখিয়ে দিয়ে এসেছিলেন, সেগুলো নিয়মিত অনুশীলন করে বিষ্টু এখন ওড়িশার এক-নম্বর গোলকীপার।

কিন্তু সহজাত-দক্ষ খেলোয়াড় পেলেই যে আমি নিশ্চিত হই, তা নয়। ভাবনাটা আমার থেকেই যায়। সকলেই জানে, ফুটবল অসাধারণ পরিশ্রমের খেলা, বিশেষ করে আধুনিক ফুটবলে, গোলকীপারকে বাদ দিয়ে বাকী দশজনের ৭০ কিংবা ৯০ মিনিট এতটুকু স্থির হয়ে দাঁড়াবার অবকাশ নেই। তাই ফুটবলারদের অনুশীলন-পর্বের শুরুতেই সহনশীলতা, গতি, শক্তি ও নমনীয়তা বাড়াবার জন্য, প্রচুর খাটতে হয়, যেটা আবার বেশির ভাগ সময়ই খেলোয়াড়দের কাছে একঘেঁয়ে লাগে। একঘেঁয়েমি আমাদের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়। সফলকাম কোচ সর্বদাই সেজন্য তাঁর ট্রেনিং পদ্ধতিতে আনন্দময় ও নিত্য-নতুন বৈচিত্র্যে ভরিয়ে রাখেন—যাতে খেলোয়াড়দের শেখবার আগ্রহটা চলন্ত, গতিশীল থাকে।

১৯৬৯ সালের কথা। আমি তখন কোচ করছি মোহনবাগানকে। মোহনবাগানে সে-বছর নায়িম, আলতাফ, প্রসাদ, হাবিব এবং বলাই দে প্রমুখ কয়েকজন দক্ষ ফুটবলার থাকলেও ইস্টবেঙ্গল দল ছিল নামী খেলোয়াড়ে ভরতি, যেমন—থঙ্গরাজ, সুধীর, জন, শান্ত, কাজল, প্রশান্ত, পরিমল, কান্নন, অশোক চ্যাটার্জি, সাদাতুল্লা এবং ভৌমিক।

তাই অনুশীলন-পর্বের গোড়াতেই আমি চাইছিলাম এবং শুরুও করেছিলাম আমাদের খেলোয়াড়দের সহনশীলতা ও গতি বাড়াতে। সহনশীলতা ও পেশীর শক্তি (বিশেষ করে পায়ের) বাড়ানোর জন্য শুকনো বালির ওপর দৌড় খুবই ফলপ্রদ পদ্ধতি—যা খুবই প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু অসুবিধা হল, এত বালি পাই কোথায়? কলকাতা তো আর সমুদ্রের ধারের শহর নয় বোম্বাই কিংবা মাদ্রাজের মত। এখানে একটি মাত্র জায়গায় বালির 'ট্র্যাক' আছে, রেসকোর্সের ভিতর যেখানে কেবলমাত্র রেসের ঘোড়ারা অনুশীলন করতে পারে।

একদিন খুব ভোরে দারোয়ানদের অমনোযোগিতার সুযোগে আমি আমার দলবল নিয়ে উপরোক্ত বালির 'ট্র্যাকে' দৌড়তে লাগলাম। এক মাইলের ওপর ঐ বিরাট ট্র্যাকটার যখন মাঝামাঝি গেছি, তখন হঠাৎ দেখি উল্টোদিক থেকে কয়েকটি ঘোড়া তীব্র-বেগে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। আমরা যে ট্র্যাক ছেড়ে সরে যাব সেটুকু সময়ও পাইনি। ভীষণ দুর্ঘটনা থেকে একটি রেসের ঘোড়াকে বাঁচাল তার জকি। বাদবাকী ঘোড়-সওয়াররা সবাই ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। আমরাও সবাই বালির ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। এমন সময় পিছন থেকে খটখটিয়ে ঘোড়া চালিয়ে এল একটি পুলিস ঘোড়-সওয়ার। গম্ভীরভাবে বলল, "পুলিশ কমিশনার সাহাব আপলোগোকো বোলাতা।"

আমাকেই অগত্যা এগোতে হল। দূর থেকে ঠিক চিনতে পারিনি। কাছে গিয়ে দেখি—পি কে সেন।

আমাকে উদ্দেশ করে খুব উঁচু গলায় রেগেমেগে বললেন, "আপনারা কারা? সাইন-বোর্ড দেখেননি যে, এখানে কেবল ঘোড়ারাই ছুটতে পারে?"

আমি আমার পরিচয় এবং উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে বলতে মনে হল খানিকটা ঠাণ্ডা হলেন। উনি নিজেও মোহনবাগানের একজন নামকরা হকি খেলোয়াড় ছিলেন। আমরা যখন মাথা নিচু করে ফিরছি, তখন আমাকে আলাদা ডেকে বললেন, "দেখুন এখানে দৌড়তে হলে বেলা আটটার পর আসবেন। ঘোড়াদের অনুশীলন তখন শেষ হয়ে যায়। আমি 'টার্ফ-ক্লাবে'র কর্মকর্তাদের বলে দেব।"

ফুটবল তো একজনের খেলা নয়, এগারোজনের খেলা। এগারোজনের এগারোটা জায়গা। প্রত্যেকের পজিশন অনুযায়ী আবার কিছুটা নিজস্বতা আছেই। অথচ এগারোজনকেই খেলাতে হবে এক উদ্দেশ্যে। তাই প্রত্যেক খেলোয়াড়কেই আমি চেষ্টা করি 'সম্পূর্ণ-ফুটবলার' করে গড়ে তোলবার। তা যদি কোন কারণে সম্ভব নাও হয়, তাহলে চেষ্টা করি অন্তত তার জায়গায় তাকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে।

গত বছরের ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহন-বাগানের লীগের খেলাটার কথাই ধরা যাক। খেলার আগে মোহনবাগানের চেয়ে আমরা এক পয়েন্ট এগিয়ে ছিলাম, অর্থাৎ এ খেলায় ড্র করলেও আমরা লীগের তালিকাতে সবার উপরেই থাকতাম। প্রস্তুতি-পর্বে লেফট-আউট কেষ্ট মিত্রকে অনেকবারই বলেছিলাম, "সুরজিত, শ্যাম ও রণজিতের উপর কড়া নজর রাখতে গিয়ে মোহনবাগানের ডিফেন্ডাররা তোমার দিকে নজর দিতে ভুলে যাবে, তুমি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার কোরো।"
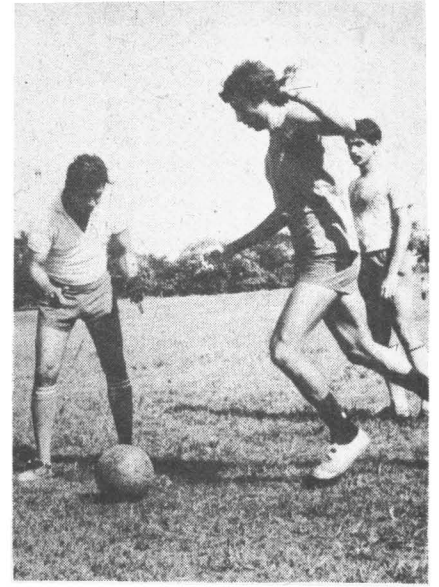
প্রথমার্ধে কেষ্ট যে সুযোগ পেয়েছিল, সেটা পোস্টের বাইরে শট নেয়। বিরতির সময় আবার কেষ্টকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, "আমরা এক গোলে পেছিয়ে আছি, তুমি আবার সুযোগ পাবে, এবার অন্তত পোস্টের ভেতর শটটা রাখবে।"

খেলা শেষ হবার কয়েক মিনিট আগে মধ্য-মাঠ থেকে একটা সুন্দর চলনের মাধ্যমে বিপক্ষের পোস্টের ৫।৬ গজের ভেতর কেষ্ট একটা ফাঁকা বল পেয়েছিল। গোলকীপারকে অসহায় পেয়েও এবং শট নেবার অনেকটা সময় পাওয়া সত্ত্বেও সে নিজে শট না নিয়ে শ্যামের কাছে বলটি ঠেলে দেয়। বলটি ঠিক-মত দিতে না পারায় শ্যামও সে-বল গোলে মারতে পারেনি। কেষ্টর এই অপারগতা কোচ হিসেবে আমার কাছে তো বটেই, বহু ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের কাছেও দুর্বোধ ও ক্ষমাহীন ত্রুটির নজির হয়ে আছে।

বিলেতে আমাদের কোচিং-ক্লাসে একজন মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন করেছিলেন, কেন ফুটবলাররা উত্তর জীবনে কোচ হতে চায়? অর্থাৎ কোন মানসিকতা তাকে উদ্বুদ্ধ করে এ-জাতীয় জীবন বেছে নিতে?

সেদিন এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তো দূরের কথা, প্রশ্নটাকেই ঠিকমত ধরতে পারিনি। ফ্যালফ্যাল করে প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকিয়েই নিজের কর্তব্য শেষ করেছিলাম।

কিন্তু আজ যদি উপরোক্ত প্রশ্নের মুখোমুখি হই, তাহলে বিনা দ্বিধায়, এক মুহূর্ত চিন্তা না করেই উত্তর দেব, "দিনের পর দিন বিনিদ্ররজনী যাপন, পেটের আলসারে ভোগা এবং দলের পরাজয়ের সবটুকু গ্লানি মাথায় নিয়ে দল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার বাসনাই বড়দলের কোচ হতে চাওয়ার পিছনে প্রেরণার কাজ করে।"

ফোটো মনোজিৎ চন্দ

সিনেমা স্যুটিং-এর একটা দিন
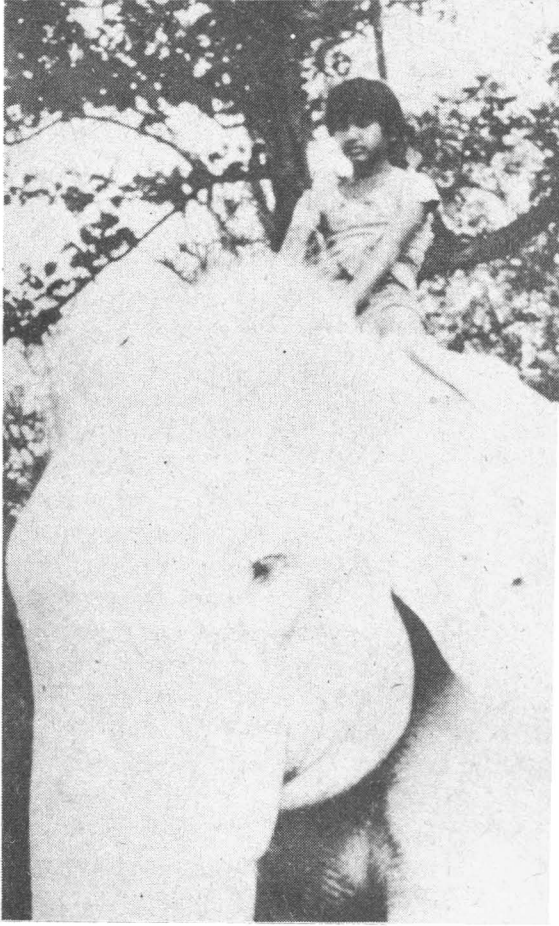
অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম তোমাদের জন্যে একটা ছবি করব। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে সব প্রযোজক বা প্রোডিউসার শুধুমাত্র বড়দের জন্যে ছবি করতে বেশী উৎসাহী। যেই বলি এবার একটা শিশুদের জন্যে ছবি করা যাক অমনি তাঁরা পিছিয়ে যান। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত শ্রীজালান এবং শ্রীআগরওয়াল রাজী হলেন। আমরাও কোমর বেঁধে লেগে গেলাম তোমাদের জন্যে "সফেদ হাতি" (সাদা হাতি) নাম দিয়ে একটা ছবি করতে। আমাদের দেশের অতি মনোরম বন এবং বনের প্রাণী এই গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়। এ গল্পের নায়ক ঐরাবত নামে একটি শ্বেত হস্তী। কিন্তু কোথায় পাই শ্বেত হস্তী। রেওয়াতে সাদা বাঘ পাওয়া গেছে। লোকমুখে শুনলাম সেখানে নাকি একটি সাদা হাতিও আছে। কিন্তু খবর নিয়ে জানলাম স্রেফ বাজে কথা। কথিত আছে বর্মা মুলুকে সাদা হাতি পাওয়া যায়, সেটাও বাজে কথা। কারণ আমরা সেখান থেকেও খবর এনেছিলাম। কটা রংয়ের হাতি কিছু পাওয়া যেত কিন্তু আমি চাইছি একেবারে দুধের মত সাদা স্বপ্নের মত সুন্দর একটি হাতি। কি করে সাদা হাতি পেলাম সেটা এখন নাই বা বল্লাম। তোমরা ছবি দেখার পর সে সম্বন্ধে একদিন আলোচনা করা যাবে। এই ছবিতে সাদা হাতি ছাড়াও প্রচুর কালো হাতির প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া প্রয়োজন ছিল রয়েল বেংগল টাইগার, চিতাবাঘ, ভাল্লুক, অজগর এবং একটি শংখচূড় সাপের। তামিলনাড়ু রাজ্যে মধুমলয় জংগলে সব কিছু পাওয়া যাবে এবং তোমাদের জন্যে ছবি করছি বলে ওখানকার সরকার সব ব্যবস্থা করে দেবেন এই আশ্বাস পেয়ে একদিন সবাই মধুমলয় জংগলের দিকে রওনা হলাম। আমার সংগে অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্যামেরাম্যান, সাউন্ড ইনজিনিয়ার প্রভৃতি মিলে প্রায় একশ জন লোক। ব্যাপারটা যে এত বিরাট হবে তা আগে ভাবিনি। যাই হোক, এখানে একদিনের ঘটনা তোমাদের বলি। ছবিতে একটি দৃশ্যে দেখানো হবে যে আমাদের শিশু অভিনেতা শিবু গভীর রাতে জংগল দিয়ে হেঁটে চলেছে—এমন সময় একটা চিতাবাঘ তার পিছু নেয়। হঠাৎ শিবুর নজরে পরে চিতাবাঘ তার পেছনে। সে প্রাণপণে দৌড়ুতে থাকে। চিতাবাঘও তার পিছনে পিছনে ছোটে। এই দৃশ্যটি তুলবার জন্যে আমরা সবাই কাঁধে ক্যামেরা-সাউন্ড মেশিন প্রভৃতি নিয়ে গভীর জংগলে ঢুকলাম। সবাই নিঃশব্দে হেঁটে চলেছি। ক্যামেরাম্যান হাতেই ক্যামেরা রেখেছেন। যদি হরিণের দল পাওয়া যায় তাহলে ছবি তোলা হবে। ঐ জংগলে এত হরিণ নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায় যে ভাবতে অবাক লাগে। যাই হোক, বেশ খানিকটা এগোবার পর দূর থেকে বিরাট এক হুংকার শুনলাম। ফরেস্ট গার্ড হেসে বল্লে, "বুনো হাতি—আমাদের আর এগোতে বারণ করছে।" ভয়ে সবার মুখ শুকিয়ে গেল। আমরা আর না এগিয়ে একটা পছন্দমত জায়গা খুঁজে নিলাম। আমাদের সংগে খাঁচায় দুটো চিতাবাঘ ছিল। তার মধ্যে একটা খুব দুষ্টু ছিল। শিশু অভিনেতা শিবু যার বয়েস মাত্র সাত-আট বছর তার সংগে দুষ্টু চিতাবাঘটার কোন দৃশ্য তুলতে আমার নিজের কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। যদিও স্যুটিং-এর সময় যথেষ্ট সাবধান হয়ে ছিলাম। চিতাবাঘের যিনি ট্রেনার তিনি সব সময়ে দশ-বার জন লোক দিয়ে চারদিক ঘিরে রাখতেন। একটু গোলমাল করলেই লোকগুলো চিতাবাঘটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। বন্য জন্তুদের নিয়ে ছবি করতে গেলে এইভাবেই করতে হয়। পৃথিবীবিখ্যাত ছবি "বরন্ ফ্রি"তে সার্কাসের সিংহ

ব্যবহার করা হয়েছিল। যাই হোক, দুষ্টু চিতাটা নিয়ে বেশ দুর্ভাবনা হচ্ছিল কারণ আরও একটা দৃশ্য ছিল যেখানে চিতাটা শিবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অনেক ভেবে চিতার ট্রেনার শ্রীপরমেশরণকে বল্লাম অন্য চিতাটা আনতে, দুষ্টু চিতাটা নিয়ে কাজ করতে অস্বস্তি বোধ করছি। শ্রীপরমেশরণ রাজী হলেন কারণ, তাঁর মতে বাঘ অনেক শান্ত কিন্তু চিতা স্বভাবতই চতুর এবং কখন কি করবে বোঝা যায় না। যাই হোক, নতুন চিতাটা আনা হলো। চিতাটা দেখতে খুব সুন্দর। গায়ে লোম চকচক করছে—মসৃণ চামড়া, চোখের চাহনি কেমন যেন উদাস। ক্যামেরা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে চিতাটাকে রাখা হলো আর শিবুকে বিশ গজ দূরে। দুজনেই ক্যামেরার দিকে ছুটে আসবে এই আশায়। ক্যামেরা চলতে লাগলো। ইশারায় বল্লাম চিতাটাকে ছাড়তে। চিতাটা একবার আমাদের দিকে দেখলো—তারপর একবার গভীর জংগলের দিকে—হঠাৎ লোকগুলোর মাথার ওপর দিয়ে একটা বিরাট লাফ দিয়ে নিমেষে গভীর জংগলে অদৃশ্য হলো। আর ফেরেনি।

তপন সিংহ

৯-৯-৭৭

বাংলায় পোর্তুগীজ

অখিলেশ্বর ভট্টাচার্য

কোনও ভাষাই একেবারে ষোলআনা খাঁটি নয়। কোনও জাতিই অন্য জাতির সংস্পর্শে না এসে একেবারে আলাদা হয়ে থাকতে পারে না। পরস্পর মেলামেশার ফলে ভিন্ন-ভিন্ন ভাষা থেকে নতুন-নতুন শব্দ এসে ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করে। শব্দ ধার করেনি, এমন কোনও জাতি দেখা যায় না। ধার-করা শব্দ ভাষার পরিবর্তন জানিয়ে দেয় এবং সেইসঙ্গে জাতির ইতিহাসের স্বাক্ষরও বহন করে। সাতসমুদ্রের পারে ইউরোপের একটি দেশ পোর্তুগাল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেই দেশের অধিবাসী ভাস্কো দা গামা আফ্রিকার উপকূল ঘুরে সমুদ্রপথে ভারতে আসার পথ আবিষ্কার করেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই পোর্তুগীজ বণিকরা বাংলা দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে শুরু করে। এর ফলে পোর্তুগিজ ভাষার অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়।

পোর্তুগিজদের কাছ থেকে আমরা অনেক নিত্য ব্যবহার্য জিনিস পেয়েছি। এই সব বস্তুর পোর্তুগিজ নামও বাংলায় গৃহীত হয়েছে। তার মধ্যে বালতি, বয়াম, বোতল, বোতাম, ইস্তিরি, আলমারি আলপিন, আলকাতরা, সাবান, পিরিচ, পিপে, গামলা, পরাত, সায়া, ফিতে, তোয়ালে, চাবি, কাতান কানেস্তারা, টোকা প্রভৃতি শব্দ উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, তামাক শব্দটিও পোর্তুগিজ ভাষা থেকেই আমরা পেয়েছি।

পোর্তুগিজরা এদেশে এনেছিল নানাবিধ ফল। আতা, আনারস, নোনা, পেঁপে এবং পেয়ারা। তালিকায় আরও আছে। তার মধ্যে আছে সপেটা এবং সান্তারা অর্থাৎ কমলালেবু। পোর্তুগিজ জলদস্যুরা এত সুন্দর-সুন্দর ফল এদেশে আমদানি করেছিল, ভাবতে অবাক লাগে। এই সব মনোরম ফল আমদানি করে জলদস্যুতার পাপ অনেকটা খণ্ডন করেছে বলে মনে হয়। শুধু কি ফল? অত্যন্ত ভাল সবজি, ফুলকপি, বাঁধাকপি ও ওলকপি, যা না হলে শীতের বাজার কানা, আমরা পেয়েছি পোর্তুগিজদের কাছ থেকে।

আমরা স্ত্রী-পুরুষ অনেকেই, শুধু বুড়োরা ছাড়া, আচার খেতে ভালবাসি। আচার আমদানি করেছিল পোর্তুগিজরাই। আরও কিছু খাদ্য আমরা এদের কাছ থেকে পেয়েছি। যেমন সাগু বা সাবু এবং পাউরুটি। সাগু বা সাবু না হয় অপ্রিয় পথ্য। কিন্তু পাউরুটি? গোঁড়া, উদার, ধনী, দরিদ্র, শ্রমিক, কৃষক, সকলের ঘরেই এখন পাউরুটির অবাধ প্রবেশ। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার পোর্তুগিজ Pao শব্দের অর্থ 'রুটি।' তার সঙ্গে রুটি যোগ করা হয়েছে বোধহয় বস্তুটি অনায়াসে চিনে ফেলার জন্য। ঘরবাড়ি এবং ঘরবাড়ি তৈরির উপকরণ সংক্রান্ত কিছু কিছু শব্দ আমরা পোর্তুগিজদের কাছ থেকে নিয়েছি। যেমন—কামরা, পেরেক, বরগা, জানলা, গরাদে, মিস্ত্রী ও গুদাম। নৌ-সম্বন্ধীয় শব্দ 'মাস্তুল' ও 'বয়া' পোর্তুগিজ শব্দ।

আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদের মূলে একটি বইয়ের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। সে বইটির নাম "আংকল টম'স কেবিন", যার বাংলা অনুবাদ 'টমকাকার কুটির'। ক্রীতদাস প্রথা শুধু আমেরিকাতেই ছিল না। পোর্তুগিজ জলদস্যুরা দলে দলে আমাদের দেশের স্ত্রী-পুরুষদের ধরে নিয়ে দাসরূপে বিক্রি করত। আরাকানের অধিবাসী মগেরাও একাজে হাত পাকিয়েছিল। এমন কী, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও দাস-শিশুর দল বোঝাই করে বড় বড় নৌকা গঙ্গা নদী দিয়ে কলকাতায় আসত। ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষ থেকে ক্রীতদাস বাইরে পাঠানো বে-আইনী ঘোষণা করেন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে দাসপ্রথা ও দাস-ব্যবসা রহিত হয়। জলদস্যুর একটি প্রতিশব্দ আমাদের শব্দ-ভাণ্ডারে এসেছে। সেটি 'বোম্বেটে'। মজার কথা, এই 'বোম্বেটে' শব্দটি পোর্তুগিজ শব্দ।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, বাংলা ভাষায় ধারকরা পোর্তুগিজ শব্দ কত আছে? উত্তরে বলা যায়, খুব বেশি নয়। এদের সংখ্যা একশোর কিছু উপরে। অনেক বিষয়ে পোর্তুগিজরা একটি করে শব্দ বাংলা ভাণ্ডারে দিয়েছে। সংখ্যায় একটি করে হলেও সে-সব শব্দ মোক্ষম। একেবারে ব্রহ্মাস্ত্রের মত। 'নিলাম' তার মধ্যে একটি। নিলাম করা, নিলাম ডাকা আজও সমানে চলেছে। শপথ করার জন্য একটি শব্দ পোর্তুগিজরা চালু করেছিল। শব্দটি 'মাইরি'। মেরী মায়ের নাম করে শপথ। মধ্যযুগের বাংলায় এ শব্দটির প্রচলন দেখা যায়। এখনও আমাদের দেশে মাইরি শব্দের প্রচলন আছে। 'সেঁকো' বিষ, যার নাম, আর্সেনিক, পোর্তুগিজ শব্দ। বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। মাসকাবারের 'কাবার' শব্দ পোর্তুগিজ ভাষা থেকে নেওয়া। কাবার শব্দের অর্থ শেষ। কোনও কিছুকে চিহ্নিত করার জন্য পোর্তুগিজ 'মার্কা' শব্দের প্রয়োজন। মার্কা দেওয়া, মার্কা করা, মার্কা মারা—এসব পোর্তুগিজ শব্দের দৌলতেই হচ্ছে। ইস্পাত পোর্তুগিজ শব্দ। কাজী নজরুল ইসলামের 'প্রভাতী' কবিতার একটি পংক্তিতে আছে, 'এন্তার গান তার ভাসে ভোর বাতাসে।' এন্তার শব্দের অর্থ অজস্র বা দেদার। চট করে আমরা ভাবতে পারি, এটি ফারসী বা আরবী শব্দ, নজরুলের লেখায় যা প্রচুর পাওয়া যায়। আসলে, এটি একটি পোর্তুগিজ শব্দ। বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে।

ওষুধের মধ্যে আমরা নিয়েছি একমাত্র পোর্তুগিজ শব্দ 'সালসা'। সালসা রক্তশোধক ঔষধ। বাংলা ভাষায় 'আয়া' শব্দটি আমরা ওদের কাছ থেকেই পেয়েছি। খানা অর্থাৎ খাত বা ডোবা পোর্তুগিজ শব্দ। 'কেদারা' শব্দ থেকে অনুমিত হয়, পোর্তুগিজদের কাছ থেকেই আমরা চেয়ারের ব্যবহার শিখি। পরবর্তী কালে ইংরেজি 'চেয়ার' পোর্তুগিজ 'কেদারা'কে হটিয়ে দিয়েছে। 'বিন্তি' এক ধরনের তাসখেলা। এটি পোর্তুগিজ শব্দ। কাবুলিওয়ালাও গান গায় এবং এই কলকাতায় গড়ের মাঠে তাদের নাচতে দেখি। সুতরাং যখন শুনি 'বেহালা' শব্দ পোর্তুগিজদের কাছ থেকে পাওয়া, তখন আমরা অবাক হইনে এই ভেবে যে, অত সুন্দর বাদ্যযন্ত্র জলদস্যুদের হাতে বাজত কী করে!

'আরমাডা' শব্দের অপভ্রংশ হারমাদ। আমাদের দেশে হারমাদ বলা হত পোর্তুগিজ জলদস্যুদের। এককালে সমুদ্রগামী বাণিজ্যপোতে পণ্যসম্ভার নিয়ে চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম বন্দর থেকে বাঙালী সওদাগরেরা দূর-দূরান্তে বাণিজ্য করতে বেরুত। পোর্তুগিজ জলদস্যুরা এদেশীয় বাণিজ্য-জাহাজের উপর হামলা করত। তার ফলে বাংলার বহির্বাণিজ্য ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এরই একটি ছবি আছে কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে :—

> ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
> রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারমাদের ডরে॥

**হঠাৎ দেশে উঠলো আওয়াজ হো হো হো হো !
চমকে সবাই তাকিয়ে দেখে সিপাই বিদ্রোহ !
নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী, ঝাঁসির রানী লক্ষ্মী,
সবার হাতে অস্ত্র, নাচে বনের পশুপক্ষী ।**

সকালে সুকান্তের এই ছড়াটা খোকন পড়া শুরু করলেই খোকনের বাবা তাড়াতাড়ি অফিস বের হবার চেষ্টা করে, না হোলে খোকার হাজার প্রশ্ন ঃ **কবে, কেন, কোথা**য় **নানা**সাহেব, তাঁতিয়া টোপী ঝাঁসির রানী কাদের সংগে হো হো আওয়াজ তুলে লড়ায়ে মেতেছিলো ? হাজারবার খোকার বাবা খোকাকে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছে, তবু থেকে গেছে খোকার মনে এখনো হাজার প্রশ্ন, শেষ যেন আর হোতে চায় না তার **সিপাই বিদ্রোহকে** জানার।

তাই সাতসকালে খোকার মুখে আবার সেই ছড়া শুনে অফিস কামাই হবার ভয়ে খোকার বাবা তাড়াহুড়ো লাগাচ্ছিল—এমন সময় খোকার মা এসে হাসতে হাসতে বলল, তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, তোমাকে আর খোকার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না, খোকার সব প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে এগিয়ে এসেছে **শান্তিগোপালের তরুণ অপেরা**। তাঁরা এবারে পালা বেঁধেছেন **মধু গোস্বামীর সিপাই মিউটিনি।** চলো খোকাকে নিয়ে একদিন সেই পালা দেখে আসি। সব শুনে খোকার বাবা অফিসে এসেই রিং করলেন **৫৫-৭১২১**-এ। কবে, কোথায় হচ্ছে বলুন তো আপনাদের নতুন পালা ? টেলিফোনে জানতে চাইলেন খোকার বাবা !

খোকাদের মামা বাড়ীর গাঁয়ে বসছে **শান্তিগোপালের তরুণ অপেরার** আসর —পালা ঃ সিপাই মিউটিনি। হাতে চাঁদ পেল খোকার মা……।

সারা রাত জেগে ছোট্ট খোকা বুক ভরে, চোখ ভরে দেখলো, জানলো, শুনলো **সিপাই বিদ্রোহের খবর।**

বাবা তাঁর ভাবলেন যাক খোকার হাত থেকে বাঁচা গেল ! কিন্তু ওমা ! যে-কে-সেই, আবার খোকার গুনগুনুনি ঃ আচ্ছা ঠাকমা, তুমি ওদের চাল দিচ্ছো কেন ? ঠাকমা জবাব দেয় ঃ ওরা যে আমাদের জমিতে ধান ফলায়, জলে ভিজে, রোদে পুড়ে, ওদের খেতে দিতে হবে না ?

খোকার জবাব ঃ ধান যখন ওরা নিজেরাই ফলায়, তখন নিজেরাই তো সেই ধান নিয়ে খেতে পারে। যেমন মা নিজে রাঁধে, আমার আর বাবার খাওয়ার পর নিজেই হাঁড়ি থেকে ভাত নিয়ে খায়। বল না, ওরাই যখন ধান ফলায়, তখন ওরাই আবার সেই ধান তোমাদের থেকে হাত পেতে চায় কন ?

প্রশ্ন শুনে খোকার বাবা আবার মাথায় হাত দিয়ে বসে, আবার সুরু হবে খোকার উৎপাত—কে জবাব দেবে তাকে ! যাঁরা ধান ফলায়, ধান তাঁদের হয় না কেন?

হঠাৎ খোকার মামা এসে হাজির হয়—সব শুনে বলে তার জামাইবাবুকে ভয় নেই, আবার স্মরণ করুন **শান্তিগোপালের তরুণ অপেরাকে**, ওঁদের এই মরসুমেরই আর একটি পালা ভূমিহীন গরীব চাষীদের জীবনের দুঃখ ও সংগ্রামের কাহিনী ঃ **শম্ভু বাগ রচিত ঃ রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা।**

কাক বনাম নাক

বলরাম বসাক

সেই এক হাত লম্বা বকুনবুড়োকে মনে পড়ছে ? সেই যার দাড়িতে বুক ঢেকে থাকত? যার অ্যাত্তো বড় মোচার মত নাক ? এখনো মনে পড়ল না ? আমাদের সেই বকুনবুড়ো লজেন্স খেত চুকচুক করে। লজেন্স না-পেলে কোটের বোতাম চুষত। সে একদিন যা করল না! সক্কাল বেলা ঘুম থেকে উঠে চোখমুখ না-ধুয়ে দাঁত না-মেজে গুটি গুটি চলে এল বাড়ি থেকে। নীলচে মতন হিঞ্চে বনে সবুজ সোনালি ব্যাঙ ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ করছিল, টুক করে মাথা তুলে দেখলে কী টিয়ে-রং পাতার হলদে-মতন বাঁশঝাড়গুলোর পাশ দিয়ে বকুনবড়ো গুটি গুটি হেঁটে যাচ্ছে। যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়াল।

কৎবেল গাছের তলায় সাদা বাতাসার মত ব্যাঙের ছাতা। একটা বেশ বড়সড় ব্যাঙের ছাতার ওপর এক হাত লম্বা বকুনবুড়ো সোয়া হাত লম্বা নাক, গ্যাঁট হয়ে বসল। তারপর পায়ের ওপর পা রেখে খানিকক্ষণ দোলাল। শেষে কোটের পকেট থেকে একটা ফুটবল খেলার বাঁশি বের করল, বাজাল, পুররররররর।

কৎবেলগাছের সব চাইতে বড় ডালটার রঙ খয়েরি। তার মাঝখান থেকে চার-পাঁচটা ছোট ছোট ডাল বেরিয়েছিল। সেই ডালগুলোর ওপর বসেছিল লম্বা-ঠোঁট, সবুজ-ঠোঁট, মোটা-ঠোঁট, ছুঁচো-ঠোঁট, কাঁচি-ঠোঁট, কালো কুচকুচে বেয়াল্লিশটা কাক।

অনেক দূরে একটা লাল-পাতা হলতে-পাতা গাছ, তার ভেতরে বসে একটা কোকিল আমসত্ত্ব খাচ্ছিল, আর গান গাইছিল, কু-উ কু-উ। তাই শুনে কৎবেল গাছের কাকগুলোও গাইতে চেষ্টা করল, ক-অ ক-অ। আর ঠিক তক্ষুনিই কিনা বেজে উঠল বকুনবুড়োর সেই হুইসল। পুররররর পুরররর। কিছুতেই থামছে না। কাকগুলো কেমন করে গান গাইবে? আর কি পারা যায় ? এ রকম করে বাঁশি বাজালে কেউ গাইতে পারে?

ইশ্, বারবার বাজাচ্ছে। এমন চটে গেল কাকগুলো, ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে এল কৎবেল গাছের নীচে। সেই সাদা বাতাসার মত ব্যাঙের ছাতাগুলোর ওপর গোল হয়ে উড়ল। ভাল করে দেখল কে ফুটবলের বাঁশি বাজাচ্ছে। বকুনবুড়োর নাকটাকেই সবার আগে দেখতে পেল কি-না, তাই নাকটাকেই বিয়াল্লিশটা কাক আচ্ছা করে ঠুকরে দিল। আরেকটা কাক বকুনবুড়োর মুখ থেকে ফুটবল খেলার বাঁশিটা কেড়ে নিতে যাচ্ছিল, তখন বকুনবুড়ো বাঁশিটা টপ করে মুখের মধ্যে পুরল।

কিন্তু নাকের দফা-রফা করে কাকগুলো চলে গেল। ইশ, এমন সুন্দর নাক ছিল বকুনবুড়োর, মোচার মতন দেখতে ছিল, এখন কী বিচ্ছিরি হয়ে গেল।

কোথা থেকে খুনখুনে এক বুড়ি, চুল নয়তো শনের নুড়ি, হাতে ফুলকো লুচির থালা, তুরতুর করে ছুটে এল। বকুন-বুড়োর চে' এক বেঘত লম্বা দেখতে। ওহো, এ যে বকুনবুড়োর বউ, চিনতেই পারিনি। বকুনবুড়োর সামনে দাঁড়িয়ে মুখ নেড়ে নথ নেড়ে, চোখ ঘুরিয়ে গালে একটা হাত রেখে বলল "ওমা কোথায় যাব গা। সাত সকালে, দাঁত না-মেজে, মুখ না-ধুয়ে গুরুঠাকুরের নাম না-জপে, ইখানে বসে বসে কী হচ্ছে শুনি।"

অন্যদিন হলে বকুনবুড়ো ফোকলা দাঁতে মিষ্টি করে হেসে বলত, "পেরভাবতী, আমি কিন্তু বেড-টি পাইনি।"

কিন্তু আজ কিছুই বলল না। শুধু একটা আঙুল দিয়ে নাক দেখাল। আরেক হাতের আরেকটা আঙুল দিয়ে কাক দেখাল। তারপর কাকের দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটল। জিভ

দেখাল। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "তবে র‍্যাঁ হতচ্ছাড়া কাঁক, তোঁদের সব কটাকে যদি খতম করতে না পারি তাহলে আমি বকুনবুড়োই নই, হ্যাঁ।" তারপর তার বউয়ের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে বলল, "পেঁরভাবতী, আমি বন্দুক কিনতে চললুম, বুঝেছো? হতচ্ছাড়া কাঁক আঁমার নাক ঠুকরে দিয়েছে। এর পিতিকার না করে ছাড়ছিনে।" বলেই বকুনবুড়ো ফুলকো লুচিগুলো হাম হাম করে খেয়ে এক ছুটে চলে গেল।

বন্দুক কিনতে কোথায় গেল বলো তো? ইস্টিশানের দিকে গেল। সেখান থেকে কলকাতায় যাবে। কলকাতায় গিয়ে বন্দুক কিনবে।

এই যে নীল রঙের ইস্টিশান। বকুনবুড়ো এদিক তাকায় সেদিক তাকায়। লালবাতি জ্বলছে এদিক ওদিক। মাঝখান দিয়ে দুটো দুটো চারটে রেল লাইন। ডান দিকে ছোট্ট একটা হলদে কাঠের ঘর। তার ভেতরে এইটুকুনি-এইটুকুনি টেবিল-চেয়ার-আলমারি। একটা চেয়ারে আধ হাত লম্বা এক খুদে বুড়ো বসে বসে দেশলাই-কাঠি খাচ্ছিল। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে একটা ঘণ্টা বাজাল, ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং।

একী, একী, সবুজ বাতি জ্বলল। আর অনেকদূরে কতগুলো দেশলাইবাক্সে তৈরি একটা রেলগাড়ি আসছে ঝিক-ঝিক ঝিক-ঝিক প্যাঁও-প্যাঁও-ও-ও-ও-ও -ও-ও।

আরে আরে রেলগাড়ি এসে গেল যে। বকুনবুড়োর টিকিট কাটা হয়নি, "ও টিকিটবাবু, একটা দিন না।"

বকুনবুড়ো দেখে কী, আধ হাত লম্বা সেই খুদে বুড়োটা কানখাড়া খরগোশের মত গুরগুর করে ছুটে এল, পা পর্যন্ত দাড়ি-গোঁফ বুড়োটার। বকুনবুড়ো উবু হয়ে সেই খুদে বুড়োটাকে দেখতে লাগল। এ যে দেখছি খুন-খুনো-খুনো। "তাড়াতাড়ি টিকিট দাও, গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে।"

খুদেবুড়ো হাতের তেলোয় চোখ আড়াল করে বকুনকে দেখল। "একছো বছলের বুলো আমি, চোকে ভাল দেক্ছিনি, গলার ছরে বুঝতে পাচ্ছি—কে র‍্যা তুই, আমাদের বকুন না?"

আরে আরে, বকুনবুড়ো চমকে ওঠে, এ যে বকুনবুড়োর মাস্টার মশাই। ঢিপ করে পেন্নাম করে বকুনবুড়ো বলল, "মাস্টার মশাই, তুমি তো মাস্টার মশাই ছিলে, ইস্টিশান মাস্টার কী করে হলে?"

খুদেবুড়ো খিক্ খিক্ করে খুউব হাসলে, তারপর বললে, "আগে ছিলাম হেড মাচটার। পোমোছন্ পেয়ে হলাম ব্যান্ড মাচটার। তারপর হলাম পোচ্ট মাচ্টার। তারপর হলাম রিং মাচ্টার। এখন হয়েচি ইচ্টিছান মাচ্টার।" বলে, বেশ বুকটুক ফুলিয়ে খুদে বুড়ো বকুনবুড়োর দাড়িটা আদর করে নেড়ে দিল, বলল, "তারপর বকুন, তুই নাকে টমেটো নিয়ে কোথায় যাচ্চিস র‍্যা......?"

"টমেটো নয় মাষ্টারমশাই, কাকগুলো আমাঁউ নাঁউ আঁউ-আঁউ আঁউ।" আর বলতে পারল না বকুনবুড়ো আঁউ আঁউ করে কেঁদে ফেলল। তখন বকুনবুড়োর মাষ্টারমশাই সেই খুদে বুড়োটা করলে কী, কোথ্‌থেকে একটা বেত এনে উঁচিয়ে বলল, "চোপ্, এত বড় বুড়োধাড়ী, পঁচাশি বচ্ছর বয়স্, এখনো বাচ্চাদের মত ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদে।"

বকুনবুড়ো তখন একটুও না কেঁদে জুলজুল করে তাকিয়ে থাকে। একবার একটু জিব্ টিব্ চেটে, ঢোঁক্ ঢোক গিলে মিনমিন করে বলতে চাইল কাকগুলো তার নাক ঠুকরে দিয়েছে। কিন্তু বলতে পারল না। খুদে বুড়ো মাস্টারমশাই আবার চেঁচিয়ে বলল, "চোপ!" তারপর বেত নেড়ে বলল, "হ্যাঁ-রে বকুন, তুই বড্ড দুচ্টু হয়েচিস। তুই নাকি এক-জামিনের দিন নামতা পরীক্ষা না দিয়ে পালিয়ে গিচিলি।"

"সে তো পঁচাত্তর বছর আগে মাস্টারমশাই।"

"চোপ।" খুদে বুড়ো ভেংচি কেটে বলল, "ফাঁকিবাজ, পঁচাত্তর বছরের হিছেব দেকাচ্ছিস্। দাঁড়া, দাঁড়া ঐ বেঞ্চিটার ওপর।"

বকুনবুড়ো কী আর করে। এদিক তাকায়, ওদিক তাকায়। তার আর বন্দুক কেনা হল না। কাকগুলোকে শায়েস্তা করা গেল না। প্লাটফরমের ওপর কয়েকটা বেঞ্চি ছিল। তার একটার ওপর উঠে দাঁড়ায় বকুনবুড়ো।

"বল, একের নামতা বল," খুদেবুড়ো বলল।

"মাস্টারমশাই কাকগুলো আমার নাক......"

"আবার বাজে কথা, বল একের নামতা।"

"কাকগুলো—"

"ফের বাজে কথা?"

"কাক—"

"আবার ইয়ার্কি? নামতা বল্।"

"নামতা?

কাক এক্কে কাক।
কাক দুগুণে ঢাক।
তিন কাকে তাকুর তাকুর,
চার কাকে চাক।"

শুনে খুদে বুড়ো মাস্টারমশাই বেশ করে মাথাটাথা ঝাঁকিয়ে বলল, একী রে, তুই কাকের নামতা বলছিস্ যে। অ্যাঁ?"

বকুনবুড়ো বলতেই থাকে

"পাঁচ কাক্কে পাক্কা,
ছয় কাক্কে ছক্কা,
সাত কাক্কে শাক,
আট কাক্কে অক্কা,
নয় কাক্কে নাক।"

বাস, এই নাক পর্যন্ত বলে বকুনবুড়ো খুদে বুড়োকে জিজ্ঞেস করে, "মাস্টারমশাই, দশ কাক্কে কী হবে?"

"এই সেরেচে," বকুনবুড়োর মাস্টারমশাই খুদে বুড়ো মাথা চুলকায়। "কী হবে? একে তো কাকের নামতা, তায় আবার দশ কাকে কী হবে,...তাই তো!"

এ-ম্যাঁ বকুনবুড়োর মাস্টারমশাই সেই খুদে বুড়োটা না কাকের নামতা জানে না। তাই বলতে পারল না। খুব লজ্জা-টজ্জা পেয়ে বকুনবুড়োকে বেঞ্চিতে বসিয়ে নতুন গুড়ের মোয়া খেতে দিল। নাকের ওপর তুলো আর গঁদের আঠা দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। তারপর গাঁটের পয়সা খরচা করে একটা বন্দুক কিনে দিল। তারপর টুলের ওপর দাঁড়িয়ে খুদে বুড়ো মাস্টারমশাই বকুনের কানের কাছে মুখটা এনে ফিসফিস করে বলল "দচকাক্কে কী হয় বলতে পারিনি—একথাটা কাউকে বলিচ্‌নি কিন্তু। তোকে অন্য আরেকদিন বলে দোব। কেমন?"

"আচ্ছা।" বলেই বকুনবুড়ো একহাতে মোয়া আরেক হাতে বন্দুক, নাকে এত্তো বড় ব্যান্ডেজ আর মুখে ফুটবল খেলার বাঁশি নিয়ে চলে এল সেই কৎবেল গাছটার তলায়। পুররররররর বাঁশি বাজাল কখনো, কখনো কামড়ে মোয়া খেল। আর গুড়ুম গুড়ুম করে বন্দুক উঁচিয়ে গুলি ছুড়ল কাকের দিকে। একটাও কি কাক উড়ল? মোটেই না। কেন উড়ল না বলো তো? খেলনা বন্দুক যে, তার ওপর মুখে শব্দ করতে হয়—গুড়ুম।

ছবি বিমল দাশ

পুজোয় চাই
নতুন জুতো
Bata
বাড়ীর সবার জন্য বাটার জুতো

পূজা
আলোকোজ্জ্বল উৎসবে
রয়েছে এক ছন্দ
অন্তরে জাল বুনছে
রঙীন এক আনন্দ।
খাটাউ
ভয়েলসে
দি খাটাউ মাকনজী
স্পিনিং অ্যাণ্ড উইভিং কোম্পানী লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : লক্ষ্মী বিল্ডিং, সৌরজি বল্লভদাস মার্গ, বম্বে-৪০০ ০৩৮.
মিল: হেনস রোড, বাইকুল্লা, বম্বে-৪০০ ০২৭.
পাইকারী দোকান : মুলজী জেঠা মার্কেট, বম্বে-৪০০ ০০২.
KMS/61/PREM ASSOCIATES/BEN